যাযাবর অমনিবাস

যাযাবর



যাযাবর অমনিবাস

যাযাবর

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
—কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৮৩
—মাঘ ১৩৮৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
—কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৮৪
—ফাল্গুন ১৩৯০

JAJABAR OMNIBUS Rs. 40.
By
JAJABAR

Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700073

প্রকাশক :

সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

জানকিনাথ সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রচ্ছদ :

গৌতম রায়

মুদ্রাকর :

নিউ শশী প্রেস
অশোককুমার ঘোষ
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম ঃ ৪০ টাকা

এযাবৎ প্রকাশিত আমার বিভিন্ন গ্রন্থের
এই প্রথম সংকলন
স্বর্গগত পিতৃদেবের অবিস্মরণীয় স্মৃতির উদ্দেশে
উৎসর্গ করলাম।

নিউদিল্লী
মাঘ, ১৩৮৯

এই বইতে আছে

প্রকাশকের নিবেদন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বাংলা সাহিত্যে যাযাবরের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। লেখকের প্রথম বই "দৃষ্টিপাত" প্রকাশিত হওয়া মাত্রই বাঙালী শিক্ষিত সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অভূতপূর্ব। সেকালের বিমুগ্ধ পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে আজও বই-এর অনেক লাইন, অনেক অংশ স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন। বস্তুতঃ এক নূতন গদ্যরীতি ও অভিনব রচনা-শৈলীর চমৎকারিত্বে "দৃষ্টিপাত" বাংলা রম্যরচনার ক্ষেত্রে trend setter—পথিকৃতের আসন দখল করিয়া রহিয়াছে।

তাহার পরে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থকারের আরও চারখানা বই প্রকাশিত হইয়াছে। একখানা উপন্যাস ও একখানা ইতিহাসভিত্তিক রাজনৈতিক চিত্র। তৃতীয়টি স্যাটায়ার ও হিউমার জড়িত প্রবন্ধ সমষ্টি এবং চতুর্থ বইটি ছোট ও বড় গল্প সংগ্রহ। প্রত্যেকটিই ভিন্ন স্বাদের। সংযুক্তি ও বিষয়বস্তু—form এবং content-এর দিক দিয়া প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র। জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন যে "অত্যন্ত পরিমিত লেখা এবং একই ধরণের লেখার পুনরাবৃত্তি না করা যাযাবরের সাহিত্য-কর্মের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।"

"যাযাবর অমনিবাসে" লেখকের এযাবত পুস্তকাকারে প্রকাশিত সমুদয় রচনা একত্র সংগৃহীত হইল। ইহা ছাড়া আরও কিছু লেখা সাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে সেগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার পরে "অমনিবাসের" পরবর্তী মুদ্রণে সংযোজনের ইচ্ছা আছে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুক্রম অনুসারে বিভিন্ন গ্রন্থ 'অমনিবাসে' সন্নিবিষ্ট হইল। সেই ক্রমান্বয় অনুযায়ী 'অমনিবাসে'র সর্বপ্রথমে "দৃষ্টিপাত" ও সর্বশেষে "হ্রস্ব ও দীর্ঘ" স্থান পাইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থের শেষ অধ্যায় "গ্রন্থ-পরিচিতি"তে প্রত্যেকটি বই-এর প্রথম প্রকাশকাল উল্লেখিত হইল।

যাযাবর বাংলাভাষায় ক্রিকেট-সাহিত্যেরও জনক। স্বনামে রচিত "খেলার রাজা ক্রিকেট" পর্যায়ের বইগুলি শুধু বাংলা নহে, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, হিন্দী ইত্যাদি যে কোনো ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রেও ক্রিকেট সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। উহাতে "যাঁরা খেলেন তাঁরা পাবেন খেলা শেখার নির্দেশ, যাঁরা খেলা দেখেন তাঁরা পাবেন খেলা বোঝার সংকেত আর যাঁরা খেলেন না এবং খেলা দেখেনও না তাঁরা পাবেন সাহিত্যে নূতন বিষয়বস্তুর সন্ধান।"

ক্রিকেট সংক্রান্ত বইগুলি রসের বিচারে 'যাযাবর' নামে লিখিত গ্রন্থগুলি হইতে ভিন্ন গোত্রের। এই কারণে সেগুলি 'অমনিবাসে' ছাপা হইল না। ক্রিকেট সম্পর্কে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বইগুলি ও বিভিন্ন মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিকে ছাপা প্রবন্ধ-সমূহ ভবিষ্যতে একটি পৃথক গ্রন্থাবলীতে প্রকাশের অপেক্ষায় রহিল।

কলিকাতা

ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ প্রকাশক

দৃষ্টিপাত

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৫৩

সংকলয়িতার নিবেদন

এই রচনাটির একটু ভূমিকা আবশ্যক।

১৯৩৬ সালে একটি বাঙালী যুবক লণ্ডনে ব্যারিস্টারি পড়িতে যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে গাওয়ার স্ট্রীটের ভারতীয় আবাসটি জার্মান বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হইলে আত্মীয়বর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে যুবকটি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। স্যার ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আলোচনার প্রাক্কালে বিলাতের একটি প্রাদেশিক পত্রিকা তাহাকে তাঁহাদের নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে পাঠান। লণ্ডনে অবস্থানকালে ঐ পত্রিকায় সে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিত।

দিল্লীতে যাইয়া যুবকটি তাহার এক বান্ধবীকে কতগুলি পত্র লেখে। বর্তমান রচনাটি সেই পত্রগুলি হইতে সংকলিত। পত্রলেখক ও পত্রাধিকারিনীর একমাত্র একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত পত্রগুলির আর কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই, যদিও পত্রে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীদের যথার্থ পরিচয় গোপনের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম ধামের পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়াছে।

এই স্বল্পপরিসর পত্ররচনার মধ্যে লেখকের যে সাহিত্যিক প্রতিভার আভাস আছে, হয়তো উত্তরকালে বিস্তৃততর সাহিত্যচর্চার মধ্যে একদা তাহা যথার্থ পরিণতি লাভ করিতে পারিত। গভীর পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল পূর্বে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার অকালমৃত্যু সেই সম্ভাবনার উপরে নিশ্চিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

সাত ঘণ্টা আকাশচারণের পরে উইলিংডন এয়ারপোর্টে ভূমি স্পর্শ করা গেল। বিমানঘাটিটি আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু গুরুত্বে প্রধান। পূর্ব গোলার্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইঙ্গ মার্কিন ও চৈনিক সমর-বিশারদদের এটা আগমন ও নিষ্ক্রমণের পাদপীঠ। প্রাত্যহিক পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে এর বহুল উল্লেখ।

আমাদের বাহনটি ডাগলাস্ ডাবল এঞ্জিন জাতীয়। খেচর কুলপঞ্জীতে ফ্লাইং ফোর্ট্রেস ও লিবারেটার প্লেনের পরেই এর স্থান। নিকষ না হলেও ভঙ্গকুলীন বলা যেতে পারে। এর আকার বিশাল, গর্জন বিপুল ও গতি বিদ্যুৎপ্রায়।

পুরাণে পুষ্পকরথের কথা আছে। তাতে চেপে স্বর্গে যাওয়া যেত। আধুনিক বিমান রথের গন্তব্যস্থল মর্তলোক। কিন্তু সারথি নিপুণ না হলে যে-কোন মুহূর্তে রথীদের স্বর্গপ্রাপ্তি বিচিত্র নয়।

বিমানঘাটির কর্মকর্তা বাঙালী। ভদ্রলোক বয়সে তরুণ এবং ব্যবহারে অমায়িক। এর স্ত্রী মণিকা মিত্রের সৌন্দর্য-খ্যাতি নয়াদিল্লীর অনেক বঙ্গললনার মর্মবেদনার কারণ।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে নামতে হয়। বিস্ময়কর এক অনুভূতি। এই তো সকালবেলায় ছিলেম কলকাতায়। দমদমের পথে গ্যাসের আলোগুলি সব তখনও নেভেনি। ফুটপাথে খাটিয়ার উপরে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানী দোকানদারেরা নিদ্রামগ্ন, কর্পোরেশনের উড়ে কুলীরা জলের পাইপ থেকে গঙ্গোদকের দ্বারা রাজধানীর বহুজনমর্দিত পথগুলির ক্লেদমুক্তির আয়োজনে ধাবমান। সাইকেলের হাতলে স্তূপীকৃত খবরের কাগজ চাপিয়ে হকাররা যাচ্ছে এ দুয়ার থেকে ও দুয়ারে।

সদ্যগত রজনীর সুষুপ্তির রেশ ধরণীর বুক থেকে তখনো নিঃশেষে মুছে যায়নি। আকাশের কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডিত চাঁদ দূরবর্তী তরুশ্রেণীর শীর্ষে রুগ্না রমণীর নিষ্প্রভ মুখের মতো দ্যুতিহীন। মিট্ মিট্ করে জ্বলছে গুটি কয়েক মুমূর্ষু তারা। পথের পাশে গাছের ডালে ডালে পাখীদের কাকলী শুরু হয়েছে ধীরে ধীরে! দমদম বিমানঘাটির দূরবর্তী পাটকলের উত্তুঙ্গ চিমনিটা আকাশের পটে আঁকা আবছা ছবির মতো দেখাচ্ছে। বিমান কোম্পানীর সাদা ধবধবে য়ুনিফর্ম পরিহিত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা টিকিট পরীক্ষা ও মাল ওজন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্তসমস্ত। দূরে বারাসতের রাস্তা দিয়ে চলেছে সারিবন্দী মন্থরগতি গরুর গাড়ি, বাতাসে ভেসে আসছে তাদের তৈলতৃষিত চাকার ক্ষীণ আর্তনাদ।

দেড়টা বাজতেই নয়াদিল্লী। মাঝে শুধু বামরৌলীতে ঘণ্টা খানেকের বিশ্রাম,—প্রাতরাশের প্রয়োজনে। ব্যবস্থা থাকলে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পুনরায় দিল্লি থেকে সন্ধ্যা নাগাদ কলকাতায় ফিরে মেট্রোতে সিনেমা দেখা যায়। রেলযোগে প্রায় দেড়-দিনের পথ। দূরকে নিকট এবং দুর্গমকে সহজাধিগম্য করেছে যে-বিজ্ঞান, তার জয় হোক।

মনে আছে শৈশবের কথা। দুপুরে গৃহকর্তারা কর্মস্থলে। আহারাদির পর প্রাত্যহিক দিবানিদ্রার অব্যর্থ ঔষধ বঙ্কিমের উপন্যাস হাতে মা পাশের

ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শয়ান। তাঁর সেই স্বল্পায়ু বিশ্রামক্ষণটি যাতে চপলস্বভাব বালকের সশব্দ দৌরাত্ম্যে খণ্ডিত না হয় সেজন্য পিতামহী নাতিকে নিয়ে বসেছেন। বৃদ্ধা তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষুর উপরে নিকেলের চশমা জোড়াটা এঁটে মৃদু স্বরে পড়ছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। খানিকক্ষণ এপাশ, ওপাশ, উসখুস করে মাথার বালিশটা নিয়ে লোফালুফির পরে হঠাৎ এক সময়ে কানে আসত

রাবণ বসিল চড়ি পুষ্পক রথেতে।
বিদ্যুতের সম গতি আকাশ পথেতে ॥

অমনি স্তব্ধ উৎকর্ণ হয়ে উঠতেম। অরণ্য, পর্বত, সাগর, জঙ্গম অতিক্রম করে রথ চলেছে শূন্যপথে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো, দূর হতে দূরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। মধ্যাহ্নদিনের কর্মহীন অলস প্রহরগুলি শিশুমনের নিরঙ্কুশ কল্পনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। দশাননের সৌভাগ্যে ঈর্ষা জন্মাত। একলক্ষ পুত্র ও ততোধিক পৌত্র সংখ্যার জন্য নয়, তার যদৃচ্ছ আকাশভ্রমণক্ষমতার জন্য।

সেদিনের বৃদ্ধা পিতামহী তাঁর ভক্তি, বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে দীর্ঘকাল গত হয়েছেন। তাঁরই নাতি-নাতনীরা যে অদূর ভবিষ্যতে লংকাধিপতির সমকক্ষ হয়ে উঠবে সে-কথা কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দণ্ডকারণ্য থেকে স্বর্ণলঙ্কা নিকষাতনয় কয় দণ্ডে পৌঁছেছিলেন তার উল্লেখ কৃত্তিবাসে আছে কিনা মনে নেই, কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লী,—ন শ' তিন মাইল পথ আমরা সাত ঘণ্টায় অতিক্রম করেছি। এতে উত্তেজনা আছে কিন্তু উপভোগ নেই। কমলালেবুর বদলে ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাওয়ার মতো।

প্রাগবিমান যুগে পথ অতিক্রমণটাই ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; নানাজনের সংস্পর্শে আসবার একটা সুপরিসর অবকাশ তাতে মিলত। মন্দগতি গরুর গাড়ির কথা থাক; রেলভ্রমণেও মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা যোগাযোগ ঘটে, বিমান-যাত্রায় তার সম্ভাবনা মাত্র নেই। যুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্ষেও বিমান চলাচল বহুলতর হবে। রাত ন'টায় গ্রেট ইস্টার্নে ডিনারের পর দমদমে প্লেনে উঠে পরিপাটি নিদ্রা দিলে পরদিন সকালে বম্বের তাজে ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাবে। সেদিন না থাকবে ঘুষ অথবা ঘুষির জোরে টিকিট কেনার হাঙ্গামা, না থাকবে কুলীর কলহ বা সহযাত্রীর কোলাহল। জানালার কাছে 'চাগ্রাম' হেঁকে কেউ ঘুম ভাঙাবে না। পানিপাঁড়ে তার বালতি থেকে তৃষ্ণার্ত যাত্রীর অঞ্জলি ভরে দেবে না। এবং টিনের চালার ঘুমটি ঘরের ফটক আটকে যে পয়েণ্টস্‌ম্যান সবুজ নিশান দেখিয়ে গাড়ি 'পাশ' করে তারও আর দর্শন মিলবে না। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস।

বিমানঘাঁটির বাইরে এসে দেখা গেল, যানবাহনের চিহ্নমাত্র নেই। বেলা প্রায় দেড়টা। মার্চের রৌদ্রদগ্ধ আকাশ পাণ্ডুর এবং বাতাস প্রচুর ধূলিকীর্ণ। সামনে এ্যাশফালটমের রাস্তা জনবিরল। রুক্ষ প্রান্তরের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঊর্ধ্ব অধঃ—যে-দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে উত্তপ্ত বাতাসের একটা কম্পমান নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর নয়। রুদ্র বৈশাখ—কথাটা এতকাল রবি ঠাকুরের কাব্যে পড়া ছিল; কিন্তু 'লোলুপ চিতাগ্নি শিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর' বলতে সত্যি যে কি বোঝায় দিল্লীর নিদাঘ মধ্যাহ্নে তারই খানিকটা আভাস পাওয়া গেল।

সহযাত্রীদের সাতজন বিদেশীয়। তাঁদের খাকী অঙ্গাবরণে যথাযথ সামরিকগোত্রের নিঃসন্দেহ নির্দেশ। ত্রিপলঢাকা বৃহদাকার এক মোটর-লরিতে মাল ও মালিকেরা একই সঙ্গে বোঝাই হয়ে অন্তর্হিত হল।

হোটেলে স্থান নির্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং গন্তব্যস্থল অজ্ঞাত, পথ অপরিচিত অথচ ভরসা একমাত্র নিজের আদি ও অকৃত্রিম চরণযুগল। তারই শরণ নিয়ে পথে বিচরণ শুরু করব কিনা ভাবছিলেম।

"আপনি কোথায় যাবেন, চলুন, নামিয়ে দিচ্ছি।"

গভীর রাত্রিতে নিশি ডাকে বলেই তো শুনেছি। তবে কি দিনেও ? না ; পিছনে তাকিয়ে দেখি নিজের মোটরের দোর খুলে দাঁড়িয়ে আছেন একমাত্র বেসামরিক যাত্রাসহচর এ. এস্. বোখারি,—ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের ফুয়েরার।

রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নের নিরুপায় পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মনে হলো,—স্বয়ং উর্বশী 'লহ লহ জীবন বল্লভ' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়লেও বোধ হয় এত খুশি হতেম না।

সংবাদপত্র ও বেতারজগতে বোখারি সাহেবের নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই সমপরিমাণ যদিও সরকারী সুখ্যাতির সোপানে সোপানে, দুর্গম প্রমোশনের শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর তিনি আজ সর্বাধিনায়ক।

বেতার-পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ছদ্মনামে রসরচনা দ্বারা উর্দু সাহিত্যেও একদা তিনি বহুবিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভদ্রলোক অসাধারণ বাকপটু এবং পরিহাসরসিক। লাওনেল ফিল্ডেন তাঁকে অধ্যাপনার ক্ষেত্র থেকে বেতারজগতে আমদানি করেন। কলেজের লেকচার রুম থেকে রেডিওর স্টুডিও। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের শিশির ভাদুড়ীর তিনি সগোত্র।

শুধু তিনি একাই নন, তাঁর অনুজ জেড. এ. বোখারিও ফিল্ডেনের অনুগ্রহ প্রচ্ছায় অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর অঙ্গনে বাসা বেঁধেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে, এককালে ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের কৌতুক-আখ্যা ছিল, ইণ্ডিয়ান বি. বি. সি.—বোখারি ব্রাদার্স কর্পোরেশন।

নয়াদিল্লীর রাস্তাগুলি নয়নাভিরাম। ঋজু, প্রশস্ত এবং ছায়াচ্ছন্ন। মসৃণ পীচের আস্তরণ, ডাস্টবিন থেকে উপচীয়মান জঞ্জালস্তূপের দ্বারা পঙ্কিল নয়। যানবাহনের সংখ্যা পরিমিত ; পদাতিকদের পক্ষে অনেকটা নিরাপদ। ভারতের অন্যান্য শহরের ন্যায় সতত সঞ্চরমান নির্ভীক বৃষভকুল এখানকার রাজপথে দৃশ্যমান নয় এবং পথপার্শ্বের কোন গৃহের অলিন্দ থেকে অকস্মাৎ তাম্বুলরাগ নিরীহ পথচারীদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকা নেই। মাঝে মাঝে গোলাকৃতি ক্ষুদ্রাকার পার্ক, সেখান থেকে সাইকেলের চাকার স্পোকের মতো একাধিক পথ নানাদিকে প্রসারিত। পার্কগুলির নাম প্লেস, আকৃতি একই। উইন্ডসর প্লেসের সঙ্গে ইয়র্ক প্লেসের তফাৎ যা, সে শুধু নামে। সবগুলিই সযত্নে রচিত এবং রক্ষিত।

রাস্তার পরিচয় আমলাতান্ত্রিক। সরকারী দপ্তরখানার পূর্বতন বহু ইংরেজ কর্মচারীদের নাম পথের প্রান্তসীমায় সুস্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত। মোগল বাদশাহ বাবরের চাইতে চীফ-কমিশনার বেলা সাহেবের গুরুত্ব এখানে অধিক। তাই নূরজাহান লেন অপেক্ষা বেয়ার্ড রোড অধিকতর অভিজাত। বোঝা গেল, নয়াদিল্লীর নগরপালদের আর যাই থাক, বিনয়ের অপবাদ নেই। প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, একটি

রাস্তার নামকরণ রবীন্দ্রনাথের নামে তাঁর জীবদ্দশায়ই হয়েছে, কবির জন্মস্থানে আজও যা সম্ভব হয়নি। গাঁয়ের যোগীর পক্ষে ভিখ পাওয়া সহজ নয়।

বোখারি সাহেব যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, তার নাম কুইন্‌স্‌ওয়ে। নামটি ভালো। বাংলা রাণীরদীঘির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নাম নিয়ে কবিত্ব করার মতো মনের অবস্থা তখন নয়। ক্ষুৎ, পিপাসা ও ক্লান্তি নামক যে ক'টি অসুবিধাজনক অবস্থা মানবদেহকে বিব্রত করে থাকে আপাতত তাদের নিরসন প্রয়োজন।

যুদ্ধের হিড়িকে গভর্নমেন্টের দপ্তরখানার বিস্তার ঘটেছে অভাবনীয় বেগে। কেরানী, দপ্তরী, সাহেব, সুবোয় শহরের ঘরবাড়ি পরিপূর্ণ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে আছে সেক্রেটারিয়েটের বহু তিন-হাজারী চার-হাজারী মনসবদার। নানা দিকদেশ থেকে এসেছে খবরের কাগজের রিপোর্টার। হোটেল, বোর্ডিং-হাউস সর্বত্রই এক রব,—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ বাড়ি। প্রচুর দক্ষিণা কবুল করেও সাতদিনের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় একটা মাথা রাখবার স্থান সংগ্রহ করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—বহুদিন মনে ছিল আশা; রহিব আপন মনে, ধরণীর এক কোণে, ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা। অনুমান হয়, কবি এককালে দিল্লীতে ছিলেন।

যিনি আতিথ্য দিলেন, তিনি একটা বেসরকারী কোম্পানীর স্থানীয় কর্ণধার। নিজের কর্মকুশলতায় কোম্পানীকে এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নয়াদিল্লী শহরটা সৃষ্টি হয়েছে সরকারী প্রয়োজনে; কপালে তার জয়পত্র আঁটা,—"অন্‌ হিজ ম্যাজেস্টিস্‌ সার্ভিস।" জামসেদপুরকে যদি বলি স্টীল-টাউন, তবে নয়াদিল্লীকে বলা যেতে পারে স্টীলফ্রেমের টাউন। শহরের জনসংখ্যা গড়ে উঠেছে সেক্রেটারিয়েটকে কেন্দ্র করে। চাপরাশী, দপ্তরী, কেরানী, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আকীর্ণ এই শহরে বেসরকারী ব্যক্তিদের কল্কে পাওয়া ভার। এখানকার সম্মান ও প্রতিপত্তির উৎস থাকে ইণ্ডিয়া গেজেটের পাতার মধ্যে। যে-অল্পসংখ্যক বেসরকারী লোক এখানকার সেক্রেটারী, জয়েন্ট-সেক্রেটারী প্রভাবান্বিত সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তারা যথার্থই শ্রদ্ধার যোগ্য। আমার হোস্ট সেন মহাশয় স্থানীয় সংকটত্রাণ সমিতির সভাপতি, কালীবাড়ির সম্পাদক, বাঙালী ক্লাবের কর্মকর্তা এবং আরও একাধিক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট সদস্য।

ভদ্রলোকের আলমারিতে সারিবাঁধা 'সবুজপত্রের' বাঁধানো খণ্ড দেখে বোঝা যায় তাঁর রুচি। ভোজনপর্বে সেটা অধিকতর পরিস্ফুট হলো। শুক্‌তো, ভাজা, ডাল, তরকারী, মাছ, টক ও একটু দৈ। সাধারণ ভদ্র বাঙালী পরিবারে যা প্রাত্যহিক আহার অতিথির জন্যও সেই ব্যবস্থা। অপরাহ্নে নারিকেলের কুচি সহযোগে চিঁড়ে ভাজা বা বাড়িতে তৈরী খানকয়েক লুচি। চায়ের সঙ্গে পান্তুয়া রসগোল্লার সমারোহ এবং ভাতের সঙ্গে চপ-কাটলেটের বাহুল্য দ্বারা প্রত্যহই অতিথিকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা নেই যে, এ গৃহে সে একজন বহিরাগত আগন্তুক মাত্র। সহজ হওয়ার মধ্যেই আছে কালচারের পরিচয়, আড়ম্বরের মধ্যে আছে দম্ভের। সে দম্ভ কখনও অর্থের কখনও বিদ্যার, কখনও বা প্রতিপত্তির।

দুই

বৈষ্ণব কাব্যের শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে একদা 'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর' বলে আক্ষেপ করেছিলেন। দিল্লীর কনট প্লেসকে বৃন্দাবনের কুঞ্জগলি বলে কোন মতেই ভুল করবার সম্ভাবনা নেই, তার পুরনারীরা কেউ বৃষভানুনন্দিনী নন। কিন্তু এখানকার শ্রীমতীরাও নিদাঘ রজনীতে ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করেছেন।

না করে উপায় ছিল না। সমস্ত দিন ধরে মার্তণ্ডদেব এখানে যে প্রচণ্ড কিরণ বিকিরণ করেন, তাতে ঘরের ভিতরটা প্রায় টাটা কোম্পানীর অগ্নিগর্ভ বয়লারের মতো তেতে থাকে। মাথা গুঁজতে গেলে মাথা কুটতে ইচ্ছে হয়। পাখা খুলে দিলেও আগুনের হল্কা লাগে। সুতরাং বাইরে ঘুমানো ছাড়া গতি নেই।

শুধু মেয়েদের নয়, ছেলে বুড়ো বাচ্চাকাচ্চা সবারই এক অবস্থা। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনে জমিতে ঘটি ঘটি জল ঢেলে উত্তপ্ত ধরণীকে করা হয় শীতল। তার উপর খাটিয়া বিছিয়ে পড়ে সারি সারি বিছানা। দেখে মনে হয়, যেন সরকারী হাসপাতালের তিন, পাঁচ বা সাত নম্বর ওয়ার্ড। স্বামী, স্ত্রী, শ্বশুর শাশুড়ী, ননদ, ভাজ, পুত্র কন্যা সবাই শুয়েছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। মাথার উপরে নেই আচ্ছাদন, শয্যা ঘিরে নেই কোন আবরণ। অনভ্যস্ত চোখে হঠাৎ যেন একটু দৃষ্টিকটু ঠেকে।

কিন্তু পৃথিবীতে অন্য আর পাঁচটা নীতিবোধের ন্যায় আমাদের শালীনতা জ্ঞানটাও আপেক্ষিক। দেশাচারের দ্বারা তার রকমফের ঘটে, প্রয়োজনের খাতিরে হয় রদবদল। কলকাতার বড়বাজারের রাস্তায় দেখা যায়, খাটো কাঁচুলি আর আঠারো গজি ঘাগড়ার মধ্যপথে মেদবহুল দেহের অনেকখানি অনাবৃত রেখে অসঙ্কোচে চলেছেন মারোয়াড়ী মহিলা। আমাদের বাঙালী তরুণীদের মধ্যে কারও মতি হবে না সে সজ্জারীতিতে। হাঁটুর উপরে-ওঠা স্কার্ট পরে ইংরেজ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা যাচ্ছে যত্র তত্র। কিছু খারাপ লাগছে না তো চোখে। অথচ আমাদের অতি আধুনিকাদের মধ্যেও কোন দুঃসাহসিকা তার ক্রেপ শাড়ির ঝুল পায়ের গোড়ালি থেকে জানু পর্যন্ত উন্নীত করতে পারবেন না। যদি বা পারেন, লজ্জায় চোখ তুলে তাঁর দিকে কেউ তাকাতে পারব না।

একই বস্তু কেমন করে শুধু মাত্র আবেষ্টন ভাষা ও পরিবেশের তফাতে শ্লীল ও অশ্লীল ঠেকে তার আরও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আছে সিনেমায়। শ্বশুর ভাশুর, পুত্রবধূ ও কন্যা-জামাতা একসঙ্গে মেট্রোতে বসে গ্রেটা গার্বো ও চার্লস্ বোয়ারের দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন আর আলিঙ্গন দেখতে যাঁরা কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হন না, বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকার নিরামিষ প্রণয় নিবেদন দৃশ্য তাদেরই অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে দেখেছি। শরীরতত্ত্বের আলোচনায় যে কথা বাঙলায় বলতে বাধে, ইংরেজীতে তা নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে তর্ক করা হয় অনায়াসে।

গরমকালে ঘরে শুলে যে-দেশে জ্বরে ধরে, সে-দেশে মেয়ে পুরুষকে বাইরে ঘুমোতে হয় এবং তিন চারটে করে আলাদা উঠান যখন শতকরা নিরানব্বুই জনের বাড়িতেই রাখা সম্ভব নয় তখন শ্বশুর, জামাতা, মা ও মেয়ে এক জায়গায় খাট না

বিছিয়েই বা করে কী? নয়াদিল্লী সার্বজনীন শহর। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চি, কোশল থেকে এখানে ঘটেছে জনসমাগম। আহারে তারা যদি বা নিজ নিজ রুচিকে রেখেছে বজায়, শয়নে মেনে নিয়েছে একই রীতি। পাঞ্জাবী মেয়েদের বসন এ রকম কমিউনিটি শ্লিপিং-এর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোড়ালির কাছে আঁট পায়জামা। শিথিলবন্ধন শাড়ির মতো অলক্ষ্যে নিদ্রিত দেহের উপর অবিন্যস্ত হওয়ার আশংকা নেই।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল সে হচ্ছে ফিরিওয়ালার ক্যাভেলকেড। দুধ, সব্জি, মাছ, মাংস, ডিম, সবই এখানে ঘরে বসে পাওয়া যায়। পসারিণী যদিও বা নেই, পসরা আসে দরজায়। মাথায় চেপে নয় সাইকেলে। ঐ জিনিসটা এখানে অসংখ্য। কলকাতায় সাইকেল চাপতে দেখি খবরের কাগজের হকারকে। কিন্তু নয়াদিল্লীতে গয়লা, ধোপা, নাপিত, জেলে, কসাই, ব্লাউজের ছিট, গায়ের সাবান বিক্রেতা আসে সাইকেলের পিছনে মস্ত ঝুড়ি বা বাক্স চাপিয়ে। মহানগরীর সওদাগরেরাও পদাতিক নয়।

প্রভাতে উঠিয়া যে-মুখ দেখিনু, তার বেসাতি দুধ। ছ্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়ার মতো হাড়গোড় বেরকরা জীর্ণদেহ সাইকেল, তার পিছনের ক্যারিয়ারের দু'পাশে বাঁধা দুধের দুটি টব। টিনের তৈরী, তলায় জলের কলের মতো ট্যাপ, ঘোরালে দুধ বেরোয়। সামনের হাতলে ঝুলছে অনুরূপ গুটি দুই পাত্র। আশ্চর্য বহন ও চলন ক্ষমতা এই দ্বিচক্ররথের। আশ্চর্যতর তার চাকা, চেন ও দুগ্ধভাণ্ডের সম্মিলিত ঐকতানবাদন। টিনের টবগুলির উপরের দিকে ঢাকনি আছে, তাতে তালা আঁটা। বলা বাহুল্য দুগ্ধের বিশুদ্ধতা এবং গয়লার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ক্রেতাকে আশ্বস্ত করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা অসাবধানী লোকের ছাতায় ঘটা করে নাম লেখার মতো। নীরং ত্যক্ত্বা ক্ষীরং গ্রহণ করতে হলে পাঁচ সের দুধকে দু'সেরে দাঁড় করাতে হয়।

গয়লার পরে "কলকাত্তাকা হিলশা লো, করাচীকা চিংড়ি" হাঁক দিয়ে এল মাছওয়ালা। বলা বাহুল্য সে-ইলিশ বেশীর ভাগই বঙ্গজ নয়, এলাহাবাদের। তবে অনেক মানুষের মতো তারাও সব সময়ে চেহারায় ধরা পড়ে না, পড়ে স্বাদে। মাছওয়ালার সাইকেলের পিছনে ঝুড়ির উপরে মিহি জালের আবরণ, মাছির অত্যাচার নিবারণের জন্যে।

সাব্জিওয়ালা আসে একে একে। কেউ হাঁকে,—লেউকী লো, কেউ হাঁকে পালং অথবা গোবী। কারো বা ঝুড়িতে আছে টিমাটো, ভিণ্ডি, হরা ধনিয়া এবং সীতা ফল অর্থাৎ কুমড়ো। রজক বাইসিকেলের পশ্চাতে যে পর্বতপ্রমাণ কাপড়ের বোঝা চাপিয়ে আসে তা দেখে ত্রেতাযুগে পবননন্দনেরও বিস্ময়ের উদ্রেক হতে পারত।

মেয়েদের চুল ও ছেলেদের দাড়ি দু-এরই সমান প্রসাধন প্রয়োজন, সমান সময়-সাপেক্ষ। তফাত শুধু এই যে, প্রথমটির যত্ন বৃদ্ধিতে, দ্বিতীয়টির বিনাশে। চুল রোজ বাঁধতে হয়, দাড়ি রোজ কামাতে। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে এবং যে আপিস করে সে ক্ষুরও চালায়,—এ কথা সত্য। তবুও বেণীরচনায় ভ্রাতৃজায়া বা ননদিনীর সহায়তা পেলে মেয়েরা খুশী হন; ক্ষৌরকার্যে নর-সুন্দরের সাহায্য পেলে অনেক ছেলে আয়েস বোধ করে। তাই সকাল আটটা থেকে দ্বারে দ্বারে হানা দেয় হাজাম।

তার সঙ্গে আছে খুব ছোট্ট পিতলের একটি পোর্টেবল চুল্লী, অনেকটা ইক্‌মিক্‌ কুকারের মতো আকৃতি। তাতে শীতের দিনে সর্বদা জল গরম হয়। শীতের দেশের বাসিন্দারা জানেন, ডিসেম্বরের সাঁইত্রিশ ডিগ্রির শীতে গালে ঠাণ্ডা জল দেওয়ার চাইতে চড় দেওয়া ভালো।

সাড়ে ন'টা থেকে শুরু হয় আপিস অভিযান। প্রথমে চাপরাশী দল। গায়ে খাকী রং-এর উর্দি, মাথায় পাগড়ি ও কটিতে লাল সর্পাকৃতি তিন চার ফেরতা কোমর-বন্ধ। দু'-একজনের কোমরবন্ধে সুদৃশ্য খাপের মধ্যে হাতীর দাঁতের বাটওয়ালা ক্ষুদ্র ছুরিকা। মোগল বাদশাহের আমলে খোজা প্রহরীদের অনুকরণ। তারা অনারেবল মেম্বর বা সেক্রেটারীদের চাপরাশী। আর্দালী বাহিনীতে মেজর জেনারেল। তাদের সাইকেলের পিছনে লাল খেরো কাপড়ে বাঁধা এক গুচ্ছ ফাইল, যা সাহেবরা প্রত্যেক শনিবারই বাড়ি নিয়ে যান কাজ করার জন্যে এবং বেশীর ভাগই সোমবারে ফিরিয়ে আনেন একবারও না ছুঁয়ে।

চাপরাশীদের পরে যায় কেরানী, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরা।

সাইকেল, সাইকেল, সাইকেলের পর সাইকেল। ঠিক যেন একটা সাইকেলের প্রসেশন। তার সঙ্গে আছে টাঙ্গা। সেও দ্বিচক্রযান। ঘোড়ায় টানে। সামনে পিছনে চারজন বসা যায়,—কিন্তু মুখোমুখি নয়, পিঠোপিঠি। মাথার উপরে সামান্য একটু ক্যাম্বিসের আচ্ছাদন ; তাতে রৌদ্রতাপ বা বৃষ্টিধারা কোনটাই পুরোপুরি নিবারিত হয় না। আরোহণ ও অবরোহণের কালে পুরুষদের পক্ষে হয় জিম্‌ন্যাস্টিকের পরীক্ষা, শাড়িপরিহিতাদের পক্ষে ভব্যতার। একটু সতর্কতার অভাবেই পতন ও মূর্ছা অসম্ভব নয়।

টাঙ্গার গতি মন্থর, আসন আরামহীন এবং পরিবেশ নাসারন্ধ্রের পক্ষে ক্লেশকর। সম্প্রতি আমেরিকানদের দাক্ষিণ্যে দক্ষিণার হার হয়েছে বৃদ্ধি। আগে যে রাস্তাটুকুর মাশুল ছিল চার আনা, তার জন্য এখন বারো আনার কমে টাঙ্গাওয়ালারা কথাই বলে না ; কিংবা এমন কিছু বলে, যা না শোনাই ভালো। তবে দশটা পাঁচটায় সেক্রেটারিয়েটের পথে সহযাত্রী মেলে। টাঙ্গাওয়ালা "দপ্তরকো, দপ্তর জানেবালা আইয়ে", বলে চেঁচিয়ে সংগ্রহ করে সওয়ারী। তাতে ভাড়ার অংশ বিভক্ত হয়ে পকেটের পক্ষে সুসহ হয়। ভাগের মা গঙ্গা পায় না, কিন্তু ভাগের টাঙ্গা গন্তব্যস্থল অবধি গিয়ে পৌঁছয়।

সাড়ে দশটার মধ্যে গোটা শহরটার সমস্ত পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হলো পথে। সব পথের একই লক্ষ্য—সেক্রেটারিয়েট। বাবু পালাল পাড়া জুড়াল, গিন্নি এল পাটে।

ইম্পিরিয়ল সেক্রেটারিয়েটটি নবনির্মিত। শুধু সেক্রেটারিয়েট নয় এখানকার বাড়িঘর, পথঘাট, হাটবাজার সবই নতুন। নয়াদিল্লী শহরটা আপস্টার্ট, বারানসী প্রয়াগ এমন কি কলকাতা মুর্শিদাবাদের মতোও এর পশ্চাতে কোন ট্র্যাডিশন নেই। সে হঠাৎ টাকা-করা ওয়ার কনট্রাক্টর, সাত পুরুষের বনেদি জমিদার নয়। কিন্তু যুগটাই যে ভুঁইফোড়দের। এ যুগে জুড়ি গাড়ির চাইতে বেবী-অস্টিন, সাত লহরীর চাইতে মফ্‌চেন এবং খেয়াল গান অপেক্ষা গজলের আদর বেশী। বিত্ত হলেই হলো, নাই বা রইল বৈভব।

মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত পথ কিংসওয়ে, ভাইসরয়'স হাউসের লৌহদ্বার অবধি

প্রসারিত। তারই দু'পাশে সেক্রেটারিয়েটের দুই মহল,—নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক। আকৃতি, রং, রেখা, গঠনভঙ্গি হুবহু এক। যেন ময়রার দোকানে 'আবার খাবো' বা জলতরঙ্গ ছাঁচে গড়া এক এক জোড়া সন্দেশ। নর্থ ব্লকের সিঁড়ির মাথায় প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ পরিকল্পনাকার এডুইন লুটীনস এবং তাঁর সহযোগী সার হার্বার্ট বেকারের নাম।

নয়াদিল্লীর প্রায় সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী বাড়িগুলিই মুখ্যতঃ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থাৎ গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণ, যদিও পুরোপুরি নয়। থাম আর গম্বুজ। আর্চের সংখ্যা কম। যা আছে তাও রোমান ধরনের অর্ধবৃত্তাকার, মুসলিম পদ্ধতির সূক্ষ্মাগ্রভাগের নয়। থামগুলি চতুষ্কোণ নয়, গোলাকার। নয়াদিল্লীর পত্তনে গ্রীক স্থাপত্যকে গ্রহণের পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা শক্ত। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা এই যে, জলবায়ু ও আবহাওয়ার দিক দিয়ে গ্রীস উত্তর ভারতের সমতুল্য, যদিও তার গ্রীষ্ম অপেক্ষাকৃত সহনযোগ্য এবং শীত অপেক্ষাকৃত কঠোরতর। উত্তর ভারতের মতো গ্রীসেরও বাতাস অনার্দ্র, আকাশ নির্মেঘ এবং রৌদ্র নির্মল। সুতরাং গ্রীক স্থাপত্য নয়াদিল্লীর পক্ষে স্থায়িত্বের দিক দিয়ে অধিকতর উপযোগী হবে, স্থপতিদের মনে এ বিশ্বাস দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়।

কিন্তু নয়াদিল্লীর স্থাপত্যকে পুরোপুরি কোনো একটা বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়া ঠিক নয়। সেটা ক্ল্যাসিক্যাল বটে কিন্তু একেবারে নির্ভেজাল নয়। সেক্রেটারিয়েট দালানে হিন্দু পদ্ধতিরও চিহ্ন আছে,—সারনাথে দৃষ্ট অশোকস্তম্ভের অনুকরণে গঠিত স্তম্ভগুলিতে। আছে প্রবেশ-তোরণ ও অন্যান্য অংশে হস্তী, ঘণ্টা প্রভৃতি অলংকরণে! তারই সঙ্গে আছে মুসলিম স্থাপত্যরীতির পাথরের জালি, ফতেপুর সিক্রিতে চিস্তির কবরে যার বহুল নিদর্শন। রাজমিস্ত্রিরা বেশীর ভাগই এসেছে জয়পুর, রাজপুতানার অন্যান্য স্থান এবং আগ্রা থেকে। জনশ্রুতি এই যে, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাজ নির্মাতাদের উত্তরপুরুষ। নর্থ এবং সাউথ, দু'ব্লকেরই মাথায় বিরাট গম্বুজ, অনেকটা রোমের সেণ্ট পল গির্জার অনুরূপ, যদিও এতে কিছুটা মুসলিম স্থাপত্যের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। চোখে দেখে মনে হয় না যে, গম্বুজ দুটির উচ্চতা কুতুবশীর্ষ থেকে মাত্র একুশ ফুট কম। দুটি ব্লকে মিলিয়ে সেক্রেটারিয়েটে কক্ষ আছে প্রায় এক হাজার, সব ক'টি মিলিয়ে বারান্দার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় আট মাইল। ইলাহী কাণ্ডই বটে!

সাধারণতঃ সরকারী দপ্তরখানার সঙ্গে আর্টের বড় একটা সম্পর্ক থাকে না। তার নামে যে-দৃশ্যটি আমাদের কল্পনায় আসে তা এক রাশি নথি, দলিল, দস্তাবেজ ও হিসাব নিকাশ। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত টেবিলের উপর ফাইল ঘাঁটাই যেখানে একমাত্র কাজ, সেখানে গৃহের গঠনভঙ্গি বা পরিবেশ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই নে। সে দালানের জানালা কি রং-এর, সিঁড়ি কি ঢং-এর সে প্রশ্ন আমাদের মনেই আসে না। পুলিশকোর্টের দেয়ালে অজন্তার ফ্রেস্কো পেণ্টিং আমরা আশা করি নে। কিন্তু দেখলে কি খুশি হতেম না? অন্ততঃ নয়াদিল্লীর সেক্রেটারিয়েটকে সুদৃশ্য করার চেষ্টা দেখে আনন্দিত হয়েছি।

লাল পাথরে গড়া বিরাট ভবন। মাঝখান দিয়ে দূরপ্রসারিত পথ। পথের দু'পাশে শ্যামল দূর্বার আস্তরণে ঢাকা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মাঝে মাঝে কৃত্রিম ঝিল,

তাতে সারিবন্দী ফোয়ারা থেকে অবিরাম উৎসারিত হচ্ছে জলরাশি। [illegible] পরিপ্লাবিত মরসুমী ফুলের,—ডেজী প্যানসী, এ্যাস্টর ও হলি-হক্স।—কেয়ারীর [illegible] রচিত [illegible] একটি করে কমলালেবু গাছ। বহুযত্নে বৃত্তাকারে ছাঁটা তার ডালপালা, মনে হয় যেন বাঁটের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক একটি খোলা ছাতা।

দালানের ভিতরটাকেও কেবলমাত্র কাজের উপযোগী না করে “সুনয়না” করার প্রয়াস আছে। নর্থ ও সাউথ ব্লকে কমিটি রুম নামক যে বৃহৎ কক্ষগুলি আছে তাদের সিলিং এবং দেয়াল চিত্রশোভিত। বম্বে স্কুল অব আর্টের শিল্পীদের আঁকা। চিত্রগুলির বিষয়বস্তু ভাল কিন্তু দুঃখের বিষয় অঙ্কনচাতুর্য প্রসংসনীয় নয়। এই কক্ষগুলিতে নানা রকম কমিটি, কনফারেন্স বসে। সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের প্রথম প্রেস-কনফারেন্স বসল সাউথ ব্লকের কমিটি রুমে।

ক্রীপসের বিমান নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসে পৌঁছল দিল্লীতে। বেলা তখন দুটো। সুতরাং বেলা চারটায়—মাত্র দু'ঘণ্টার ব্যবধানে—একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকার মধ্যে তৎপরতার পরিচয় আছে যথেষ্ট। সাউথ ব্লকের সবটাই মিলিটারীর দখলে, বেসামরিক দপ্তরের মধ্যে মাত্র হোম ডিপার্টমেন্ট আছে একটি টেরে। অবস্থান নৈকট্যের কারণ বোধ হয় স্বভাবসাদৃশ্য। ভারতে পুলিশ আর মিলিটারি প্রায় কাছাকাছি। স্বগোত্র না হলেও স্বজাতি বটে।

দরজায় কড়া সামরিক পাহারা। সাংবাদিক ও রিপোর্টারদের জন্য ইনফরমেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে ব্যবস্থা হয়েছে প্রবেশপত্রের।

প্রচুর বক্‌শিশ ও প্রচুরতর তাড়না দ্বারা টাঙ্গাওয়ালাকে উৎসাহিত করা সত্ত্বেও সাউথ ব্লকের দরজায় এসে যখন অবতীর্ণ হলেম চারটে বাজতে মিনিট খানেক মাত্র বাকী। বেচারার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু টাঙ্গার ঘোড়াগুলি ভারতীয় যোগী-পুরুষদের মতো নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ও নির্বিকার; কোন কিছুতেই তাদের উত্তেজিত করা সহজ নয়। বেগবৃদ্ধি প্রায় সাধ্যাতীত।

ঊর্ধ্বশ্বাসে রওনা হলেন কনফারেন্স কক্ষের উদ্দেশে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ সার ফ্রেডারিক পাক্‌ল, ইনফরমেশন বিভাগের কর্ণধার। পরিচিত বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে বললেন, ক্রীপসের অপেক্ষা করছেন। গোটা দুই সিঁড়ি উপরে যাচ্ছিলেন একটি শ্বেতাঙ্গ, মনে হলো সদ্য আগত ইংরেজ মার্কিন রিপোর্টারদের অন্যতম। হঠাৎ পিছিয়ে নেমে এসে সার ফ্রেডারিককে জিজ্ঞাসা করলেন, “Did you say Cripps? That's me.”

এর চেয়ে বজ্রপাত হওয়া ভালো ছিল।

আমরা বিস্মিত, পাক্‌ল স্তম্ভিত, পারিষদেরা হতবাক।

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্য। ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করতে এসেছেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রস্তাব নিয়ে। আছেন ভাইসরয়ের প্রাসাদে। সুতরাং প্রেস কনফারেন্সে আসবেন বড়লাটের ক্রাউন মার্কা গাড়ি চেপে, আগে চলবে লাল মোটর সাইকেলে পাইলট সার্জেণ্ট, পাশে থাকবে ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী বা অনুরূপ কোনো হোমরা চোমরা পথ প্রদর্শক। জমকে জলুসে চিনতে বিলম্ব হবে না এক মুহূর্ত। এইটেই আশা করছে সবাই। হা হতোস্মি, কোথায় প্রাইভেট সেক্রেটারী আর কোথায় বা আগে পিছনে পিস্তলকোমরে সার্জেণ্ট পাহারা। সঙ্গে

একটি মাত্র ভাইসরয়'স হাউসের চাপরাশী, বোধ করি সেও শুধু পথ চিনিয়ে দেওয়ার জন্য।

সরকারী কায়দা কানুন, ফর্মালিটি পরিহার করে আড়ম্বরহীন, সহজ ও সরল একটি পরিবেষ্টন সৃষ্টি করলেন ক্রীপস্। তাঁর আন্তরিকতায় ভারতবর্ষের আস্থা গভীরতর হলো, তাঁর চেষ্টার সাফল্য কামনা করল জনসাধারণ, তাঁর সুখ্যাতি অকৃপণ ভাষায় কীর্তিত হলো সর্বপ্রদেশে ও সর্ব ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে।

কনফারেন্সে ক্রীপস্ আবেদন জানালেন সংবাদিকদের, তাঁরা যেন ক্রীপস্ প্রস্তাবের সারমর্ম নিয়ে অযথা গবেষণা না করেন। নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনার পূর্বে সংবাদপত্রে মীমাংসা-প্রস্তাবের কল্পিত বিবরণ প্রকাশের দ্বারা যেন অবাঞ্ছিত বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি না হয় রাজনীতিক মহলে। বলা বাহুল্য, সে আবেদনের প্রয়োজন ছিল।

সবচেয়ে বিস্ময়কর,প্রস্তাবের ভবিষ্যত সম্পর্কে ক্রীপসের মনে অবিচলিত আস্থা। ওয়ার ক্যাবিনেটের সর্বসম্মত এই মীমাংসা-প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে অনায়াসে গ্রহণীয় হবে, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের বিরোধ অপনীত হবে এবং দীর্ঘকাল ধরে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে-অদম্য অভিলাষে ভারতের অগণিত নরনারী দুরূহ ত্যাগ ও দুঃসহ নির্যাতন বরণ করেছে তার সার্থক পরিণতি ঘটবে, এ বিষয়ে ক্রীপসের মনে সংশয়ের লেশ মাত্র ছিল না।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মনোভাব কারো অজ্ঞাত নয়। জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের প্রতি ক্রীপসের সহানুভূতি, বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দও তেমনি অতিপরিচিত তথ্য। চার্চিল ইম্পিরিয়লিস্টদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল। ক্রীপস্ সোশ্যালিস্টগোষ্ঠীতেও সবচেয়ে প্রগতিশীল। জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন,—সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাব রচনায় প্রধানমন্ত্রী ও সার স্ট্যাফোর্ডের মতৈক্য হলো কী করে? চার্চিল তাঁর মতবাদ ত্যাগ করেছেন, না কি সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বদলেছেন?

প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে ক্রীপস্ উত্তর করলেন, কোনোটাই নয়, দুজনারই মতের মিল হওয়ার মতো একটা নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এর আগে চোখে পড়েনি।

কনফারেন্স থেকে যখন বাইরে এলেম, ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় ছ'টার কোঠায়। অপরাহ্ণ বেলার শান্তরোষ সূর্যের অ-তপ্ত রশ্মি পড়েছে সেক্রেটারিয়েট ভবনের রক্তাভ প্রাচীরে। সামনের ফোয়ারার উৎসারিত জল কম্পিত ধারায় বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বৃত্তাকার প্রস্তর-আধারে। ঋজু, দীর্ঘ কীংসওয়েের প্রান্তভাগে দেখা যায় ওয়ার-মেমোরিয়াল, বিগত মহাযুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈন্যদের স্মরণলেখা যার গায়ে উৎকীর্ণ। দূরে ইন্দ্রপ্রস্থের পাষাণদুর্গের ভগ্নাবশেষ রূপসী তরুণীর পাশে পলিতকেশ, বিগতযৌবনা বৃদ্ধা পিতামহীর মতো নয়াদিল্লীর বর্তমান বৈভবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কালের অমোঘ বিধান, অপ্রতিরোধনীয় পরিণাম।

পিছনে তাকিয়ে দেখি উন্নতশির ভাইসরয়'স হাউসের বিরাট গম্বুজের শীর্ষে বাতাসে মৃদু আন্দোলিত য়ুনিয়ন জ্যাক,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সনাতন গৌরবচিহ্ন। দু'শ' বছর ধরে ভারতবর্ষে রয়েছে অচল, অটল ও অনপনেয়। এই মাত্র যে কনফারেন্স শেষ হলো, তাতে আশ্বাস ছিল ঐ পতাকার বর্ণ পরিবর্তনের।

সে বর্ণ গৈরিক হবে কি সবুজ হবে, তাতে চরকা থাকবে কি অর্ধ চন্দ্র থাকবে সে প্রশ্ন পরের। আপাতত এইটিই বড় কথা যে, সে নতুন হবে, ভারতীয় হবে। কিন্তু সে কবে গো কবে?

তিন

গৃহকর্ত্রীর সাত বছরের মেয়ে রেবা এসে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল, "মিনি সাহেব, ইংরেজ জিতবে কি জাপান জিতবে?"

মিনি সাহেব নামের পিছনে আছে ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয়, ভাষাতত্ত্বও।

বিলাতে গেলে আমাদের প্রথম রূপান্তর ঘটে বেশে, দ্বিতীয় নামে। দেশে থাকতে যারা পল্টু, গদাই, সুরেন কিংবা সুবোধ বিদেশে তারাই সেন, রয়, মিটার অথবা ব্যানার্জী। নয়াদিল্লীটা খাঁটি বিলাত নয়,—এরসাৎস। এখানেও ব্যক্তির পরিচয় নামের আদিতে নয়, অন্তে। পি. এল্. আহ্বানার আদ্য অক্ষর দুটি কিসের সংক্ষেপ তা নিয়ে কারও ঔৎসুক্য নেই, শেষেরটুকু জানলেই হলো। পদমর্যাদার উপরে নির্ভর করে সম্বোধনের বিশেষণ। কেরানী হলে আহ্বানার সাফিক্স বসে বাবু, অফিসার হলে প্রেফিক্স লাগে মিস্টার।

কিন্তু মুখে মুখে কথার ধারা বদল হয়, নামেরও পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে চাকর, বেয়ারা, আর্দালী, পিওনের অশিক্ষিত উচ্চারণে অনেক সময় চলতি বিকৃতি থেকে আসল আকৃতি আঁচ করাই কঠিন হয়। ব্যানার্জী বেনারসী হন, মিঃ ম্যাকার্টিস হন মারকুট্টি সাহেব। সেনগৃহের পরিচারিকা বিলাসিয়ার আদি বাস রামগিরি পর্বতের সানুদেশে। ভাষা কিছুটা দ্রাবিড় এবং কিছুটা আর্য, উচ্চারণ মারাত্মক। সুতরাং কবে কেমন করে কোন শব্দের অপভ্রংশ ও কোন শব্দের অর্ধাংশ মিলিয়ে তার মুখে মিনি সাহেবে দাঁড়িয়ে গেছি সে গবেষণায় সুনীতি চাটুয্যের শরণ নিতে হবে।

"বল না, মিনি সাহেব, কে জিতবে। ইংরেজ না জাপান?" প্রশ্নকর্ত্রী তাড়া দিলেন।

প্রশ্নটা নতুন নয়। ইতিপূর্বে আরও অনেকের কাছে শুনতে হয়েছে এ জিজ্ঞাসা। জবাব অবশ্য দিতে হয়নি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী নিজেই দিয়েছেন উত্তর, চেয়েছেন শুধু সমর্থন। যাঁরা তা দেননি, তাঁরাও কী শুনলে খুশি হবেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র রাখেননি কখন, ঠিক যেমন স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, নতুন শাড়ীটায় তাঁকে কেমন দেখাচ্ছে। সুতরাং পাল্টা প্রশ্ন করলেম, "তুমি বল, কে জিতবে।"

"ইংরেজ!" স্বর গম্ভীর, প্রত্যয়ব্যঞ্জক। স্বয়ং চার্চিলের পক্ষেও বোধহয় এতটা নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু প্রতিপক্ষ কাছেই ছিল। বোনের উত্তর কানে যেতেই ভাই ছুটে এল! "কী বললি? ইংরেজ জিতবে? জিতবে না হাতি। জাপানীদের সঙ্গে পারবে ইংরেজ? ফু!" বাক্যের সঙ্গে যোগ করল ভঙ্গি! ঠোঁট বাঁকিয়ে মুখে চোখে এমন একটা গম্ভীর তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করল যাতে শ্রোতাদের পক্ষে ইংরেজের

জয় সম্পর্কে ক্ষীণতম আশা পোষণ করাও হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য হবে।

বুড়ো রেবার চাইতে মাত্র দু'বছরের বড়। কিন্তু অভিভাবকত্বের ধারা প্রায়ই বয়সের অনুপাত মেনে চলে না। বিশেষতঃ বুড়ো স্কুলে ভর্তি হয়েছে, রেবার এখনও বাকী। সুতরাং তর্ক বিতর্কের মাঝপথে বুড়ো যখন মাস্টার বা অন্য ছাত্রদের নজির উল্লেখ করে, রেবাকে তখন বাধ্য হয়ে বোবা হতে হয়। "বিশু আমাদের ক্লাশের ফার্স্ট বয়; সে বলেছে। তার চাইতে তুমি বেশী জান কিনা?" এ যুক্তির উপরে আর তর্ক চলে না।

কিন্তু আজ তো ফার্স্ট বয়ের মতামত নয়। এ যে তার নিজের বিশ্বাস। তাই রেবা দমল না।

"কেন জিতবে না, ঠিক জিতবে।" কিন্তু কণ্ঠে যেন সে-দৃঢ়তার আভাস পাওয়া গেল না।

বুড়ো অপরিসীম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ইংরেজ জার্মানের সঙ্গেই পারে না, আর পারবে জাপানের সঙ্গে! হুঃ, হেরে ভূত হয়ে যাবে।"

"কেন হারবে? ইংরেজের কত কামান বন্দুক কত এরোপ্লেন। আছে জাপানীদের এরোপ্লেন?"

"জাপানীদের এরোপ্লেন নেই? হা হা হা! এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে ইংরেজের রিপালস্ আর প্রিন্স অব ওয়েলস ডুবিয়ে দিল কে শুনি? পারল ইংরেজ জাপানীদের কিছু করতে? ইংরেজের এরোপ্লেন তো সব ভাঙা, কী হয় তা দিয়ে?"

"ইংরেজের এরোপ্লেন ভাঙা, মিনি সাহেব? ভাঙা যদি তবে আকাশে ওঠে কেমন করে?" করুণ কণ্ঠে আপীল জানালেন ইংরেজ হিতাকাঙ্ক্ষিণী।

কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই বুড়ো বলল, "ওঠে আর পড়ে যায়। কাল পত্রিকায় লেখেনি 'বিমান দুর্ঘটনা'? কলকাতায় এরোপ্লেন আকাশে উড়তে গিয়ে পড়ে গেছে। তাতে মানুষ মরেছে।"

অকাট্য প্রমাণ। শুধু ঘটনা নয়, একেবারে দিন তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ। এর পরে তর্ক করা কঠিন। তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে ক্ষীণ প্রতিবাদ করল রেবা। "দেখো, ইংরেজ হারবে না।"

"তুমি কত জানো! হারবে, হারবে, হারবে। জাপানীরা চার্চিলকে হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে বেঁধে এনে তারপর ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবে।" বলে, এমন বীরদর্পে প্রস্থান করল বুড়ো যেন জাপানী নয়, সে নিজেই চার্চিলের বন্ধনের উদ্যোগ করতে গেল।

রেবা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, "কখনও নয়, জাপানীরা পারবে না। পারবে মিনি সাহেব?"

তাকে কাছে টেনে আদর করে বললেম, "না পারবে না। আর পারলেই বা কী? বাঁধুক না চার্চিলকে; আমাদের রেবা দিদিমণিকে তো আর বাঁধতে পারছে না।"

"ইংরেজ হেরে গেলে বিল্‌দের কি হবে? বিলের বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে, মাকে নিয়ে যাবে, জন, লুসী ও এ্যানী সব্বাইকে তো বেঁধে নেবে?" বিল মানে প্রতিবেশী উইলিয়ম। রেবাদের পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সিম্‌স দম্পতির বারো বছরের ছেলে জন। লুসী ও এ্যানী তারই দুই বোন।

"তা নিক না ধরে বিল্‌দের। ওদের ট্যাবী কুকুরটা আমাদের বিলাসিয়াকে সেদিন

কামড়ে দিচ্ছিল যে।”

মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি প্রকাশ করল রেবা। বলল, “না, ধরে নেবে না ওদের। বিল আমাকে চকোলেট দেয়, টফী দেয়। বলেছে একদিন তার সাইকেল চড়তে দেবে।”

ও হরি! এতক্ষণে বৃটেনবান্ধবীর প্রবল ইংরেজ-হিতৈষণার আসল কারণটা বোঝা গেল। চকোলেট, টফী, তার উপরে আবার সাইকেল চড়তে দেওয়ার আশ্বাস। এর পরেও ইংরেজের পরাজয় কল্পনা করা অত্যন্ত কৃতঘ্নতার পরিচয় হবে। বিস্ময়ের কিছুই নেই। ভারতবর্ষে ইংরেজ অনুরাগী যে ক'জন আছেন তাঁদের সবারই ঐ এক অবস্থা। চকোলেট, টফী না হোক, কারো চাকরি, কারো প্রমোশন, কারো বা রায়সাহেব, খানবাহাদুর বা সি. আই. ই. নাইটহুড খেতব।

কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বাধা পড়ল। সস্ত্রীক ঘোষ সাহেব হানা দিলেন। এই দম্পতিটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে মাত্র দিন কয়েক। কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা অল্পকালের মধ্যেই অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করেছে। মিসেস বললেন, “চলুন ওখলায়।”

“সে কোথায়? পেরু না কামস্কাট্‌কায়?”

“তার চাইতে কিছুটা কাছে। মথুরার পথে, এখান থেকে মাইল আটেক। ফিরতি পথে নিজামুদ্দিন দেখিয়ে আনব।”

ওখলা জায়গাটা একটা দ্বীপের মতো। যমুনার ধারাকে একটি কৃত্রিম খালের মধ্যে দিয়ে ভিন্নমুখী করা হয়েছে সেখানে। সে-খাল বেষ্টন করেছে এক টুকরো ভুমিখণ্ড। বৃক্ষবহুল, ছায়াচ্ছন্ন। একপাশে সরকারী সেচ বিভাগের দপ্তর, বাকীটা প্রমোদ-উদ্যান। খালের মুখ খোলা ও বন্ধ করার জন্য আছে লকগেট, তার উপরে প্রশস্ত সেতু। টাঙ্গা ও মোটর অনায়াসে যেতে পারে। ছুটির দিন দলে দলে লোক আসে পিক্‌নিক করতে। ওখলা নয়াদিল্লীর বটানিকস।

স্থানটি মনোরম। চারিদিকের ধূসর রুক্ষ ধূলিকীর্ণ দেশে একটুখানি স্নিগ্ধ, শ্যামলতার আমেজ মেলে। যমুনার অগভীর প্রবাহ খালের দিকে প্রসারিত করার জন্য দীর্ঘ বাঁধ। তার উপর দিয়ে উপচীয়মান শুভ্র জলধারা গড়িয়ে পড়ছে ওপাশে। বেদীর মতো পাথর দিয়ে বাঁধানো সেখানটা। চাষীদের ছেলেরা কাপড় দিয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত। খালের মুখে ছিপ ফেলে বসে আছেন দু'-একজন সাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁদের ধৈর্য বিপুল এবং আশা সীমাহীন। গাছের নীচে ফরাস বিছিয়ে বসেছেন কোন শেঠ, প্রসাদ বা গুপ্তজী। চোরী বাজারে বিরাট লোহার আড়ৎ। সারা সপ্তাহ হন্দর হিসাবে লোহা বেচে অর্থ উপায় করেছেন প্রচুর। রবিবারে এসেছেন প্রমোদ-ভ্রমণে। সঙ্গে এসেছে বিপুলকায়া গৃহিণী, আধডজন পুত্রকন্যা, গোটা চারেক বৃহদাকার টিফিন-কেরিয়ার, জলের সোরাই আলবোলা ও ভৃত্য।

এসেছে কাঁধের উপরে পিতলের চাক্‌তি বসানো খাকী গায়ে ইংরেজ, ক্যানাডিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন। বাহুসংলগ্না ফিরিঙ্গী বান্ধবী। স্কন্ধে চামড়ার ফিতে দিয়ে লম্বমান ফটোগ্রাফের ক্যামেরা। প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের প্রণয়কাণ্ডের উৎকট আতিশয্য দেখে মাঝে মাঝে লজ্জিত হতে হয় দর্শকদেরই।

স্বদেশে ইংরেজকে কখনও দেখিনি এমন মাত্রাজ্ঞানহীন। শনিবার বিকেলে

পিকাডিলীতে দেখেছি প্রণয়ীযুগলের দল। কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস ঠিক ভদ্রপল্লীর বিধানানুযায়ী নয় বটে, কিন্তু তবুও অদৃশ্য, অলিখিত একটা রেখা টানা আছে যা লঙ্ঘন করে না কেউ। সে রেখা সুনীতির নয়, সুরুচির। ডিসেন্সীকে ইংরেজ ভালবাসে মনে প্রাণে। ইন্ডিসেন্ট বলার বাড়া গাল নেই ইংলণ্ডে। ছাব্বিশ মাইল জল পার হলেই কন্টিনেন্টে দেখা যায় না এ রুচিবোধ। শালীনতার অঙ্গুলি নির্দেশকে সেখানে তরুণ তরুণীরা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় অকুণ্ঠিত চিত্তে।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে যে-ইংরেজ, সে ঐ সুরুচির রেখাটির কথা ভুলে গিয়েছে নিঃশেষে। ব্রিটেনের বাইরে ব্রিটিশ কলঙ্কের কদর্য কাহিনী আছে Somerset Maugham-এর গল্পে ভূরি ভূরি। পালামৌ ভ্রমণে সঞ্জীবচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। ব্রিটেন-অরণ্যের বাইরে ইংরেজকে দেখলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না ডারুইন-তত্ত্বে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের এই নির্লজ্জ উচ্ছৃংখলতার প্রধান কারণ এই যে, চার পাশের দর্শকদের ওরা মানুষ বলেই গণ্য করে না। আমরা ওদের সম্বন্ধে কী ভাবি না ভাবি তা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। নেই আমাদের সামনে ভদ্র আচরণের দায়িত্ব। আরও একটা কারণ আছে, সেটা গভীরতর। এদেশে ইংরেজ তার পরিবার ও সমাজ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এখানে সে বল্গাহীন অশ্ব। সে যেন কলকাতার মেসে থাকা মফঃস্বলের ধনী জমিদারনন্দন। পিছনে অভিভাবকের এতটুকু নেই রাশ, হাতে টাকা আছে রাশি রাশি।

দুটি ইংরেজ দম্পতি এসেছেন নয়াদিল্লী থেকে সাইকেল চেপে এই দারুণ গ্রীষ্মে। স্নানার্থে। নদীতে জল কোথাও বুকের উপর নয়, কিন্তু স্বচ্ছ। তারই মধ্যে ঘণ্টা কয়েক ধরে তাঁদের সন্তরণ অর্থাৎ সন্তরণের চেষ্টা চলল সোৎসাহে। ওপারে বালুচরে যে মৎস্যার্থী বকের দল ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর ন্যায় নিশ্চর, নিথর, জলের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি দাঁড়িয়ে শিকারের প্রতীক্ষা করছিল, স্নানার্থীদের সশব্দ জলক্রীড়া ও কলহাস্যে তাদের স্থৈর্য ক্ষুণ্ণ হলো। সচকিত হয়ে বারংবার তারা স্থান পরিবর্তন করতে লাগল।

স্ত্রী-পুরুষে এই মিলিত স্নানপর্বটা তেমন রুচিকর নয় আমাদের দেশে। প্রাচীন-পন্থীদের কথা ছেড়েই দিলেম। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে যাঁরা ইংরেজের অনুগামী তাঁদের মধ্যেও মেয়েরা এটা খুব স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না। ক্লাবে জিন বা ভারমুথ পান করে পরপুরুষের সঙ্গে ওয়লজ নাচতে যাঁদের বাধে না, তাঁরাও সহস্নানটা খুব প্রীতির চোখে দেখেন না।

স্থির চিত্তে বিচার করলে বোঝা যাবে, এর মূলে আছে আমাদের সংস্কার। কিন্তু সংস্কারের মুক্তি তো যুক্তি দিয়ে হয় না, যেমন বুদ্ধি দিয়ে জয় হয় না ভূতের ভয়। সংস্কার রাতারাতি পরিহার করতে হলে চাই বিপ্লব, রয়ে সয়ে করতে হলে চাই অভ্যাস।

আমাদের প্রাচীন সমাজে নরনারীর একটা সম্মিলিত সত্তা খুব স্পষ্টরূপে স্বীকৃত নয়। উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক, পরিবেশ বিভিন্ন এবং কর্তব্য আলাদা। একমাত্র ধর্মাচরণ ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষের একত্র করণীয় কিছুর উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রে নেই। অর্জুনের

রথে সুভদ্রার সারথিত্যকে বাদ দিলে সমগ্র পুরাণ, কাব্য ও সাহিত্যে স্বামী-স্ত্রীর মিলিত কর্মের দ্বিতীয় উপাখ্যান মিলে না। সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গ নিয়েছিলেন কাঠ কুড়োতে নয়, স্বপ্নে দেখা অমঙ্গলের ভয়ে। সেকালে পুরুষেরা করত যজন, যাজন, অধ্যাপনা, হলকর্ষণ ও বাণিজ্য। মেয়েরা করত গো-ব্রাহ্মণের সেবা রন্ধন ও গৃহমার্জনা। উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের সময় ও সুযোগ ছিল সংকীর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র নিশীথে শয্যাগৃহের স্বল্পপরিসর অবকাশের মধ্যেই তা নিবদ্ধ ছিল।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবার-প্রথাও স্বামী-স্ত্রীর সর্বব্যাপী যোগাযোগকে বাধাগ্রস্ত করেছে পদে পদে। সেখানে স্বামী এবং স্ত্রী একটা বৃহৎ সংসারযন্ত্রের স্ক্রু বা বল্টু মাত্র, উভয় মিলে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটা সৃষ্টি নয়। সরগমের তারা আলাদা দুটি সুর; দুয়ে মিলে একটি অখণ্ড সঙ্গীত নয়। চৌধুরী বাড়ির মেজগিন্নী পারেন না বাড়ির আর তিনটি জা ও পাঁচটি ননদকে রেখে একা স্বামীর সঙ্গে সিনেমায়, কিম্বা গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যেতে। বঠ্ঠাকুরের মনেও আসবে না একা বড়গিন্নীকে দার্জিলিং কি সিমলা পাহাড়ে বেড়িয়ে আনার কথা।

নরনারীর মিলিত অস্তিত্বের ধারণাটি আমাদের সমাজে অধুনাজাত। স্ত্রী পুরুষের পৃথক সত্তা পুরোপুরি মেনে নিয়েও উভয়ের মিলিত জীবনের একটি সমগ্ররূপ সম্প্রতি আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছি এবং স্বীকার করতে দোষ নেই যে এ জ্ঞান আমরা য়ুরোপের কাছ থেকে পেয়েছি। এখনও পুরুষ দশটা-পাঁচটায় আপিস করে, আদালতে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় এবং মেয়েরা ঘরকন্নার তত্ত্বাবধান করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু দু'পক্ষের রেস্পনসিবিলিটি আলাদা হলেও পলিসির যোগ থাকে। এ যুগের স্ত্রীরা আদার ব্যাপারী হয়েও স্বামীদের জাহাজের খবর রাখেন।

গৃহ এখন কেবলমাত্র স্ত্রীর প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দের বিচারেই গঠিত নয়। বাইরে পুরুষের বন্ধুত্ব, সামাজিকতা ও অবসর বিনোদনও শুধু স্বামীর নিজস্ব অভিরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবজন্তুর মতো বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবার লুপ্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে। স্বামী, স্ত্রী ও দু'চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে যে নাতিবৃহৎ সংসার, তাতে স্বামীর স্থান গৃহকর্তার। সে স্বনামে পুরুষো-ধন্য। সে গৃহে স্ত্রীর পরিচয়ও মেজ, সেজ বা ছোট বউ রূপে নয়, আপন সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীরূপে।

অনেকেই ভুলে যান যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনের পরিপূর্ণতাও প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে,—সেটা আকস্মিক নয়। বিবাহ সে পরিপূর্ণতার লাইফ ইনসিওরেন্স নয়, গ্যারাণ্টি তো নয়ই। সে শুধু মীনস্, সে য়েণ্ড নয়। সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত অধিকার দিয়ে বিবাহ স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ক্ষেত্রটিকে সুপরিসর ও নির্বিঘ্ন করে মাত্র। তাকে সফল করতে হয় উভয় পক্ষের সযত্ন চেষ্টায়, নিরলস সাধনায়। আগে প্রেম ও পরে বিবাহকে যাঁরা সমস্ত দাম্পত্য সমস্যার সমাধান জ্ঞান করতেন, তাঁরা এখন ঠেকে শিখেছেন যে, কোর্টশিপ করে বিয়েও ফুল-প্রুফ নয়, যেমন নয় ইন্টারভিউ দিয়ে কর্মচারী নিয়োগ।

স্বামী এবং স্ত্রী দিনে দিনে একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে আপন রুচির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা এবং মতবাদের দ্বারা। পরস্পরকে গঠন করে নিজ অভিলাষানুযায়ী, সৃষ্টি করে পলে পলে। এই দেওয়া নেওয়া, ভাঙা গড়া চলে অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে এবং

অনেকটা অবিসংবাদে। সেটা সুগম হয় নিকটতম সান্নিধ্যের দ্বারা। সান্নিধ্য শুধু গৃহে নয়, বাইরেও।

মানুষের মন বহু-বিচিত্র, তার পরিচয়ের নাই শেষ। তার সত্তা ধ্রুব নয়, পরিবেশের পরিবর্তনে তার প্রকাশ হবে বিভিন্ন। স্ত্রী স্বামীকে চিনবে নানা পরীক্ষায়, উৎসবে ব্যসনে চেব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে। স্বামী স্ত্রীকে আবিষ্কার করবে তিল তিল করে নিত্য নব আবেষ্টনে, যেমন মণিকার হীরা, পান্না মুক্তাকে করে নতুন ডিজাইনের বালাতে, চুড়িতে চন্দ্রহারে। সুতরাং স্ত্রী যদি জলকেলির সঙ্গিনী হন, তবে তাঁকে এমন একটি বিশিষ্টরূপে পাই, যা সকাল বেলার সধূম চায়ের পেয়ালা-হস্তে প্রতীক্ষা-মানা গৃহিণীর মধ্যে নেই। স্ত্রীকে নাচঘরে অপরের বাহুলগ্না দেখে যাঁরা রাগ না করেন, তাঁরা তাঁকে স্নানের সহচরী পেলে দুঃখিত হবেন কেন? নারীদেহ সুইমিং কস্টিউমে দেখলেই শকড্ হবেন এযুগে মার্কিন সিনেমা দেখে যাঁরা চোখ পাকিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ নেই।

ঘোষজায়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। ফিরবার পথে মোটর থামালেন নিজামুদ্দিনের দরজায়। দরজা খুলে গেল ইতিহাসের এক অনধীত অধ্যায়ের।

পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী তৈরী করেছিলেন একটি মসজিদ সেদিনকার দিল্লীর এক প্রান্তে। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে একদা এক ফকির এলেন সেই মসজিদে। ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়া। স্থানটি তাঁর পছন্দ হলো। সেখানেই রয়ে গেলেন এই মহাপুরুষ। ক্রমে প্রচারিত হলো তাঁর পুণ্যখ্যাতি। অনুরাগী ভক্তসংখ্যা বেড়ে উঠল দ্রুত বেগে।

স্থানীয় গ্রামের জলাভাবের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর। মনস্থ করলেন খনন করবেন একটি দীঘি যেখানে তৃষ্ণার্ত পাবে জল, গ্রামের বধূরা ভরবে ঘট এবং নামাজের পূর্বে প্রক্ষালন দ্বারা পবিত্র হবে মসজিদে প্রার্থনাকারীর দল। কিন্তু সংকল্পে বাধা পড়ল অপ্রত্যাশিতরূপে। উদ্দীপ্ত হলো রাজকোষ। প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান গিয়াসুদ্দিন তোগলকের বিরক্তিভাজন হলেন এক সামান্য ফকির দেওয়ানা নিজামুদ্দিন আউলিয়া।

তোগলক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দিনের পিতৃপরিচয় কৌলিন্য-যুক্ত নয়। ক্রীতদাসরূপে তাঁর জীবন আরম্ভ। কিন্তু বীর্য এবং বুদ্ধির দ্বারা আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালেই গিয়াসুদ্দিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন বিশিষ্ট ওমরাহরূপে। সম্রাটের 'মালিক'দের মধ্যে তিনি হয়েছিলেন অন্যতম।

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে ছয় বৎসর পর পর রাজত্ব করল দুজন অপদার্থ সুলতান, যারা আপন অক্ষম শাসনের দ্বারা দেশকে পোঁছে দিল অরাজকতার প্রায় প্রান্ত সীমানায়। গিয়াসুদ্দিন তখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা। এমন সময় খসরু খান নামক এক ধর্মত্যাগী অন্ত্যজ হিন্দু দখল করল দিল্লীর সিংহাসন। গিয়াসুদ্দিন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে অভিযান করলেন পাঞ্জাব থেকে দিল্লী, পরাজিত ও নিহত করলেন খসরু খানকে, সগৌরবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বাদশাহী তক্তে।

গিয়াসুদ্দিনের দৃঢ়তা ছিল, শক্তি ছিল, রাজ্যশাসনের দক্ষতা ছিল। কিন্তু ঠিক সে অনুপাতেই তাঁর নিষ্ঠুরতাও ছিল ভয়াবহ। একদা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের

অসাবধানী রসনায় রটনা শোনা গেল গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর। সুলতানের কানেও পৌঁছল সে ভিত্তিহীন জনরব। কিছুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করে সুলতান আদেশ করলেন তাঁর সিপাহসালারকে, "লোকে আমাকে মিথ্যা কবরস্থ করেছে, কাজেই আমি তাদের সত্যি সত্যি কবরে পাঠাতে চাই।" অগণিত হতভাগ্যের জীবনান্ত ঘটল নিমেষে; গোরস্থানে শবভুক পশু পক্ষীর হলো মহোৎসব।

কিন্তু গিয়াসুদ্দিনের বিচক্ষণতা ছিল। সেকালে মুঘলদের আক্রমণ এবং তাঁর আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন ছিল উত্তর ভারতের এক নিরন্তর বিভীষিকা। গিয়াসুদ্দিন তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে পত্তন করলেন নূতন নগর, তৈরী করলেন নগর ঘিরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং প্রাচীরদ্বারে দুর্জয় দুর্গ। একদিকে ক্ষুদ্র পর্বত আর একদিকে প্রাচীরবেষ্টিত নগরী, মাঝখানে খনিত হলো বিশাল জলাশয়। বর্ষার দিনে শৈলশিখর থেকে ধারাস্রোতে জল সঞ্চিত হতো এই জলাশয়ে; সংবৎসরের পানীয় সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস থাকতো প্রজাপুঞ্জের।

ফকির এবং সুলতানে সংঘর্ষ ঘটলো এই নগর নির্মাণ, কিম্বা আরও সঠিকভাবে বললে বলতে হয় নগরপ্রাচীর নির্মাণ উপলক্ষ করেই।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দীঘি কাটাতে মজুর চাই প্রচুর। গিয়াসুদ্দিনের নগর তৈরী করতেও মজুর আবশ্যক সহস্র সহস্র। অথচ দিল্লীতে মজুরের সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত, দু'জায়গায় প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বাদশাহ চাইলেন মজুরেরা আগে শেষ করবে তাঁর কাজ, ততক্ষণ অপেক্ষা করুক ফকিরের খয়রাতী খনন। কিন্তু রাজার জোর অর্থের, সেটা পরিমাপ করা যায়। ফকিরের জোর হৃদয়ের, তার সীমা শেষ নেই। মজুরেরা বিনা মজুরিতে দলে দলে কাটতে লাগলো নিজামুদ্দিনের তালাও। সুলতান হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'তবে রে—।'

কিন্তু তার ধ্বনি আকাশে মিলাবার আগেই এত্তালা এল আশু কর্তব্যের। বাংলা-দেশে বিদ্রোহ দমন করতে ছুটতে হলো সৈন্য সামন্ত নিয়ে।

শাহজাদা মহম্মদ তোগলক রইলেন রাজধানীতে রাজ-প্রতিভূরূপে। তিনি নিজামুদ্দিনের অনুরাগীদের অন্যতম। তাঁর আনুকূল্যে দিবারাত্রি খননের ফলে পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীর জলাশয় জলে পূর্ণ হলো অনতিবিলম্বে। তোগলকাবাদের নগর-প্রাচীর রইল অসমাপ্ত।

অবশেষে সুলতানের ফিরবার সময় হলো নিকটবর্তী। প্রমাদ গণনা করল নিজামুদ্দিনের অনুরাগীরা। তারা ফকিরকে অবিলম্বে নগর ত্যাগ করে পলায়নের পরামর্শ দিল। ফকির মৃদু হাস্যে তাদের নিরস্ত করলেন,—"দিল্লী দূর অস্ত্"। দিল্লী অনেক দূর।

প্রত্যহ যোজন পথ অতিক্রম করছেন সুলতান। নিকট হতে নিকটতর হচ্ছেন রাজধানীর পথে। প্রত্যহ ভক্তরা অনুনয় করে ফকিরকে। প্রত্যহ একই উত্তর দেন নিজামুদ্দিন,—দিল্লী দূর অস্ত্।

সুলতানের নগর প্রবেশ হলো আসন্ন, আর মাত্র একদিনের পথ অতিক্রমণের অপেক্ষা। ব্যাকুল হয়ে শিষ্য প্রশিষ্যেরা অনুনয় করল সন্ন্যাসীকে, এখনও সময় আছে, এই বেলা পালান। গিয়াসুদ্দিনের ক্রোধ এবং নিষ্ঠুরতা অবিদিত ছিল না কারো

কাছে, ফকিরকে হাতে পেলে কী দশা হবে তাঁর সে কথা কল্পনা করে তারা ভয়ে শিউরে উঠল বারংবার। স্মিত হাস্যে সেদিনও উত্তর করলেন বিগতভয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, —"দিল্লী হনুজ দূর অস্ত্।" দিল্লী এখনও অনেক দূর। হাতে জপের মালা ঘোরাতে লাগলেন নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে।

নগরপ্রান্তে পিতার অভ্যর্থনার জন্য মহম্মদ তৈরী করেছেন মহার্ঘ মণ্ডপ। কিংখাপের সামিয়ানা। জরীতে, জহরতে, ঝলমল। বাদ্যভাণ্ড, লোকলস্কর, আমীর ওমরাহ মিলে সমারোহের চরমতম আয়োজন। বিশাল ভোজের ব্যবস্থা, ভোজের পরে হস্তীযূথের প্রদর্শনী-প্যারেড।

মণ্ডপের কেন্দ্রস্থলে ঈষৎ উন্নত ভূমিতে বাদশাহের আসন, তার পাশেই তাঁর উত্তরাধিকারীর। পরদিন গোধূলি বেলায় সুলতান প্রবেশ করলেন অভ্যর্থনা মণ্ডপে। প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। সিংহাসনের পাশে বসালেন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে। কিন্তু সে মহম্মদ নয়, তার অনুজ।

ভোজনান্তে অতি বিনয়াবনত কণ্ঠে মহম্মদ অনুমতি প্রার্থনা করলেন সম্রাটের। জাহাঁপনার হুকুম হলে এবার হাতীর কুচকাওয়াজ শুরু হয়। হস্তিযূথ নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনি নিজে। গিয়াসুদ্দিন অনুমোদন করলেন স্মিতহাস্যে।

মহম্মদ মণ্ডপ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন ধীর শান্ত পদক্ষেপে।

কড়্ কড়্ কড়্ড় কড়াৎ।

একটি হাতীর শিরসঞ্চালনে স্থানচ্যুত হলো একটি স্তম্ভ। মুহূর্ত মধ্যে সশব্দে ভূপাতিত হলো সমগ্র মণ্ডপ।

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্য কাঠের থাম। চাপাপড়া মানুষের আর্ত কণ্ঠে বিদীর্ণ হলো অন্ধকার রাত্রির আকাশ। ধূলায় আচ্ছন্ন হলো দৃষ্টি। ভীত সচকিত ইতস্ততঃ ধাবমান হস্তিযূথের গুরুভার পদতলে নিষ্পিষ্ট হলো অগণিত হতভাগ্যের দল। এবং সে-বিভ্রান্তকারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে উদ্ধারকর্মীরা ব্যর্থ অনুসন্ধান করল বাদশাহের।

পরদিন প্রাতে মণ্ডপের ভগ্নস্তূপ সরিয়ে আবিষ্কৃত হলো বৃদ্ধ সুলতানের মৃতদেহ। যে প্রিয়তম পুত্রকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন মনে মনে, তার প্রাণহীন দেহের উপরে সুলতানের দুই বাহু প্রসারিত। বোধ করি আপন দেহের বর্মে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁর স্নেহাস্পদকে।

সমস্ত ঐহিক ঐশ্চর্য প্রতাপ ও মহিমা নিয়ে সপুত্র গিয়াসুদ্দিনের শোচনীয় জীবনান্ত ঘটল নগরপ্রান্তে। দিল্লী রইল চিরকালের জন্য তাঁর জীবিত পদক্ষেপের অতীত।

দিল্লী দূর অস্ত্। দিল্লী অনেক দূর।

চার

নিজামুদ্দিনের দরগায় প্রবেশ করে আজও প্রথমেই চোখে পড়ে আউলিয়া খনিত পুকুর। তার পাশ দিয়ে আসা গেল এক প্রশস্ত চত্বরে যার মাঝখানে সমাধিস্থ হয়েছে ফকিরের দেহ। সমাধির উপরে ও আশেপাশে রচিত হয়েছে সুদৃশ্য ভবন ও অলিন্দ। উত্তরকালে সম্রাট সাজাহান সমাধির চারদিক ঘিরে তৈরী করেছেন শ্বেত পাথরের খিলান; প্রাঙ্গণ বেষ্টিত করেছেন সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত জালিকাটা পাথরের দেয়ালে। দ্বিতীয় আকবর রচনা করেছেন সমাধির উপরিস্থ গম্বুজ। ফকিরের পুণ্য নামের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করে নিজেকে তাঁরা ধন্য জ্ঞান করেছেন।

গিয়াসুদ্দিনের রাজধানী তোগলকাবাদ আজ বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বি. বি. সি. আই. রেলওয়ে লাইন গেছে তার উপর দিয়ে। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় এবং টুরিস্টদের দ্রষ্টব্য হিসাবে আজ তার গুরুত্ব। নিজামুদ্দিনের দরগায় আজও মেলা বসে প্রতি বছর। দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যকামীরা আসে দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। সেদিনের রাজধানী তার অভ্রভেদী অহংকার নিয়ে বহুদিন আগে মিশেছে ধূলায়; দীন সন্ন্যাসীর মহিমা পুরুষানুক্রমে ভক্তজনের সশ্রদ্ধ অন্তরের মধ্য দিয়ে রয়েছে অম্লান। তার আকর্ষণ দূরকালে প্রসারিত।

হিন্দুর অন্তিম অভিলাষ গঙ্গাতীরে দেহরক্ষার ন্যায় শত শত বর্ষ ধরে দিল্লীর বিত্তশালীরা কামনা করেছেন আউলিয়ার কবরের নিকটে সমাধিস্থ হতে, চেয়েছেন জীবনান্তে 'মীর মজলীসে'র সান্নিধ্য। তাই তার আশেপাশে আছে সংখ্যাতীত আমীর ওমরাহের সমাধি। তারই মধ্যে একটির গর্ভে আছে কবি আমীর খসরুর দেহাবশেষ।

খসরুর প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর; খ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত। দিল্লীর কবিগোষ্ঠীতে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। আলাউদ্দিন খিলজীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল গভীর। আপন অনুপম ছন্দে গ্রন্থিত করে খিজির খানের বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি কালজয়ী অমরত্ব দান করে গেছেন।

নিজামুদ্দিনের সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে আর একজন কবি রয়েছেন চিরনিদ্রিত, যাঁর রচনা আজও উর্দু সাহিত্যে অজাতশত্রু। কবি গালিবের সমাধিটি আড়ম্বরহীন, সাধারণ প্রস্তর-বেদিকায় মাত্র আবৃত। উনবিংশ শতাব্দীর উর্দু সাহিত্য অম্লান রেখেছে তাঁর স্মৃতি, কাব্যে ও গাথায়। জগতে বহু ঐশ্বর্যময় সৌধ রচিত হয় অক্ষম ব্যক্তিদের সমাধির উপরে। কিন্তু কবি'পরে ভার থাকে নিজ মেমোরিয়্যালের।

হিন্দু যুগে রেওয়াজ ছিল না স্মৃতিসৌধের। তার কারণ মরলোকের চাইতে পরলোকের দিকে হিন্দুদের দৃষ্টি ছিল বেশী। তাই শ্মশানে দালান খাড়া করে প্রিয়জনের স্মৃতি অক্ষয় করার কথা কখনও তাদের মনে হয়নি। মৌর্যরাজদের আমল থেকে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত কোনো হিন্দু রাজা রাখেননি কোনো স্মৃতি-সৌধ। রাজপুত রাজন্যেরা গড়েননি কোনো এতমদ্দৌলা, সফদারজঙ্গ বা হুমায়ুন'স্ টুম্ব। তাঁরা জলাশয় খনন করেছেন, মন্দির স্থাপন করেছেন, ভূমিদান, গোদান করেছেন ব্রাহ্মণকে। সমস্তই জগৎ-হিতায়। অশোক যে স্তম্ভ রচনা করেছিলেন, তা নিজ কীর্তি ঘোষণার

জন্য নয়, জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে। বুদ্ধ গড়েছিলেন চৈত্য ও বিহার সঙ্ঘের জন্য, শঙ্করাচার্য স্থাপন করেছেন মঠ বেদান্তচর্চার মানসে।

সে-যুগে হিন্দুর জীবনে শেষ কথা ছিল ভক্তি। সূর্যমুখী ফুলের মতো তার সমস্ত কর্ম, চিন্তা, ধ্যান, ধারণা, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভগবানের নামে ঊর্ধ্বমুখীন। ঐহিক সম্পর্ককে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। যখন কা তব কান্তা কস্তে পুত্র, তখন প্রেম দিয়ে আর হবে কী? মায়াময়মিদম্ অখিলং বিশ্বম্। কাজেই পিতাকে হতে হয়েছে পরমং তপঃ, স্বামীকে হতে হয়েছে পতিদেবতা, স্ত্রীকে হতে হয়েছে সহধর্ম্মিণী। নারী যে সহমৃতা হয়েছে তার কতটা প্রেমের আকর্ষণে আর কতটা পুণ্যলোভবশে তা বলা শক্ত। স্বয়ম্বরা যাঁরা হয়েছেন, তাঁরা প্রেমে পড়ে নয়। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের গলায় মালা দিয়েছিলেন তাঁর খ্যাতি ও বৈভবের জন্য যেমন একালের তরুণীরা আংটি পরিয়ে দেন আই. সি. এসের অঙ্গুলিতে।

মুসলমানেরাই আনল ভিন্ন জীবনাদর্শ। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তাদের নয়। তারা পরকালকে থোড়াই পরোয়া করল, ইহকালকে করল সর্বস্ব। তারা জীবনকে করল ভোগ, কাঁদল, কাঁদালো এবং ভালোবাসল। তাই নারীর জন্য করল লুণ্ঠন, প্রেমের জন্য করল অপহরণ এবং প্রিয়জনের জন্য হনন ও বহু অপকর্ম সাধন। বলা বাহুল্য, এর সবগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু প্রেম কি কারও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে? মেনে চলে নীতির অনুশাসন? অহল্যা করেছে সমাজের বা শাস্ত্রের সমর্থনের অপেক্ষা? মহাভারতের অর্জুন করেছে? বৃন্দাবনের কানু করেছে? করেছে রিজিয়া বেগম, মেরী ওয়ালেউস্কা বা লেডি হ্যামিল্টন?

মুসলমানেরা প্রিয়তম-প্রিয়তমার স্মৃতিকে করতে চেয়েছে কালজয়ী। রাখতে চেয়েছে স্মারকচিহ্ন। তাই সৌধ গড়েছে পিতার, পতির, পত্নীর এমন কি উপপত্নীর সমাধিতে। হিন্দুরা তপস্বী, তারা দিয়েছে বেদ ও উপনিষদ। মুসলমানেরা শিল্পী, তারা দিয়েছে তাজ ও রঙমহল। হিন্দুরা সাধক, তারা দিয়েছে দর্শন। মুসলমানেরা গুণী, তারা দিয়েছে সঙ্গীত। হিন্দুর গর্ব মেধার, মুসলমানের গৌরব হৃদয়ের। এই দুই নিয়েই ছিল ভারতবর্ষের অতীত; এই দুই নিয়েই হবে তার ভবিষ্যৎ। একটিকে বাদ দিলেই পাকিস্তান,—মিস্টার মহম্মদ আলি জিন্না না চাইলেও।

যাত্রাসহচরী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি ক্ষুদ্র মর্মর সমাধির প্রতি। সেটি সম্রাটদুহিতা জাহানারার।

ইতিহাসে সম্রাট আলমগীরের শাসন বিধর্মীনির্যাতনের দুরপনেয় কলঙ্কে মলিন; সে-তথ্য স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আছে। কিন্তু এই হৃদয়হীন অথচ অমিত-বিক্রম যোদ্ধা নৃপতির জীবন যে দুটি বিশিষ্ট উপদ্রুতা বন্দিনীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত ছিল, সে-কথা যথোচিত বিদিত নয় জগতে।

জাহানারা ও জেবুন্নেসা দু'জনেই ছিলেন আওরঙ্গজেবের অতি নিকটতম আত্মীয়া। একজন অনুজা, অপর জন আত্মজা। দু'জনেই ছিলেন রূপসী, দু'জনেই ছিলেন অসাধারণ নির্ভীক ও তেজস্বিনী। দু'জনেই চিরকুমারী এবং দু'জনেরই জীবনের সুদীর্ঘকাল কেটেছে আওরঙ্গজেবের কারাগৃহে।

কিন্তু আরও এক জায়গায় এই দুই দুর্ভাগিনীর মিল ছিল গভীরতর। তারা দু'জনেই ছিলেন কবি। মুঘল যুগের মহিলা কবি।

জাহানারার সমগ্র রচনা সযত্নে রক্ষিত হয়নি। গহন অরণ্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো প্রায় সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে ধূলিতে হয়েছে বিলীন। দু' একটি মাত্র নিদর্শন আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

জেবুন্নেসার কাব্যখ্যাতি অধিকতর বিস্তৃত। 'জেব উল্-মুনশোয়াতে' সত্যিকার কাব্যপ্রতিভার চিহ্ন আছে। বিখ্যাত পারশী কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ানে মখ্ফীর' রচয়িত্রীরূপেও জেবুন্নেসার উল্লেখ আছে অনেক গ্রন্থে, যদিও পণ্ডিতেরা সম্প্রতি সে-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

জাহানারা আমাকে আকৃষ্ট করেছেন শৈশব থেকে। ইতিহাস পরীক্ষার পূর্বক্ষণে সন তারিখে কণ্টকাকীর্ণ মুঘল কাহিনী কণ্ঠস্থ করার দুরূহ প্রয়াস করতেম প্রাণপণে দীর্ঘরাত্রিব্যাপী। ঘুমে চোখের পাতা আসতো জড়িয়ে, দেহ হত অলস, মাথা ঝিমিয়ে পড়তো ঢুলুনিতে। ওরই মধ্যে জাহানারার উপাখ্যান পড়ে কল্পনায় আঁচ করার চেষ্টা করতেম তাঁর চেহারা।

প্রথম যৌবনে জাহানারা বাদশাহ বেগমের মর্যাদা ভোগ করেছেন বিপুল মহিমায়। হারেমে করেছেন একাধিপত্য। অপ্রতিহত অনুগ্রহ ও শাসন বিতরণ করেছেন দুই হস্তে। কন্যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সাজাহানের প্রিয়তরা। তাঁর জন্য সম্রাট তৈরী করেছিলেন দিল্লীর জুম্মা মসজিদ, ভারতের বৃহত্তম মুস্লিম ভজনালয়।

জাহানারার স্নেহভাজন ছিল এক বাঁদী। অতর্কিতে একদিন আগুন লাগল তার বসনে। সে আগুন নেভাতে গিয়ে শাহজাদী নিজে দগ্ধ হলেন সাংঘাতিকরূপে। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে এল হাকিম, হলো নানারকম এলাজ। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। সম্রাটনন্দিনীর জীবন সংশয় দেখা দিল।

বিচলিত সাজাহান এত্তালা দিলেন এক সাহেব চিকিৎসককে। গ্যাব্রিয়েল বাউটন। সুরাটে ইংরেজ কুঠির ডাক্তার। বাউটন বললেন, ওষুধ দিতে হলে রোগিণীকে চোখে দেখা চাই। শুনে সভাসদেরা হতবাক হলেন। বলে কি বেয়াদব! শাহানশাহ বাদশাহের জেনানা মানে না কম্‌বক্ত?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতৃস্নেহ জয়লাভ করল সামাজিক প্রথার উপরে। সাজাহান সম্মত হলেন বাউটনের প্রস্তাবে। অল্পকাল মধ্যে আরোগ্যলাভ করলেন জাহানারা। তাঁর অনুরোধে সাজাহান বাউটনকে দিতে চাইলেন পুরস্কার, যা চাইবে তাই পাবে।

আভূমিনত কুর্ণিশ করে বাউটন বললেন, নিজের জন্য কিছুই চাইনে। কলকাতার এক শ' চল্লিশ মাইল দক্ষিণে বালাশোরে ইংরেজের কুঠি নির্মাণের জন্য প্রার্থনা করি একটুকরো ভূমিখণ্ড। ইংরেজকে দান করুন এদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।

বাউটনের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো! স্বজাতিহিতৈষণার এত বড় দৃষ্টান্ত আর একটি মাত্র আছে আধুনিক কালে। সেটি ইহুদী বৈজ্ঞানিক ডক্টর কাইম ভাইজমানের।

উনিশ শ' ষোল সালে প্রথম মহাযুদ্ধের যখন সংকটজনক কাল, ইংলণ্ডে বিস্ফোরক উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান অ্যাসিটোনের অভাব, তখন কৃত্রিম অ্যাসিটোন তৈরীর ভার নিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ বললেন, প্রফেসর, সমগ্র ব্রিটেনের ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার সফলতা বিফলতার উপরে। আমি চাই তাড়াতাড়ি কাজ, তাড়াতাড়ি ফললাভ।

অধ্যাপক বললেন, তথাস্তু।

দিবারাত্রির অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম অ্যাসিটোন। পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করলেন ব্রিটেনকে এই বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভাইজমান।

কৃতজ্ঞ লয়েড জর্জ তাঁকে ডেকে দিতে চাইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

ভাইজমান প্রত্যাখ্যান করলেন সবিনয়ে।

লয়েড জর্জ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পিয়ারেজ? অর্থ?

"কিছু নয়। একটি মাত্র যাঞ্চা আছে আমার। আমার স্বজাতির জন্য চাই নির্দিষ্ট একটি দেশ, ইহুদীদের ন্যাশন্যাল হোম।"

কিছুকাল পরে বালফোর ঘোষণায় ইহুদীদের জন্য পালেস্টাইনে নির্দিষ্ট হলো জাতীয় বাসস্থান। অবশ্য কাগজেপত্রে। আজও প্রকৃত অধিকার স্থাপিত হলো না ইহুদীদের। বরং ইদানিং কনসার্ভেটিভরা প্যালেস্টাইনে আরবদেরই করতে চাইছেন সুয়োরাণী, মধ্য প্রাচ্যে ইংরেজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়োজনে। কৃতজ্ঞতা কথাটা আছে ইংরেজের ভাষায়, নেই ইংরেজের চরিত্রে।

জাহানারার অনুগ্রহে ইংরেজেরা বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করলেন ভারতবর্ষে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনা করলেন সকলের অলক্ষ্যে। সেই জাহানারার চরিত্রেই কলঙ্ক আরোপ করে ইতিহাস রচনা করেছে ইংরেজ। এতে বিস্মিত হইনে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেন্সনে স্ট্যাফোর্ডশায়ারে বাড়ি হাঁকিয়ে আছেন, তিনিই ভারতের নিন্দা করেন সবচেয়ে জোর গলায়। লিওপোল্ড এমারীই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু, কারণ তার জন্ম গোরখপুরে।

জাহান্যরার জীবননাট্যের শেষ দৃশ্যগুলি বেদনাবিধুর।

সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারাশিকো ছিলেন পিতার সর্বাপেক্ষা প্রীতিভাজন। কিন্তু তাঁর অনুরক্তি ছিল খৃস্টি ধর্মে। সেটা মুশ্লিম সমাজে জনপ্রিয়তার কারণ নয়। পিতার অসুস্থতার সংবাদে সুজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে রওনা হলেন দিল্লী অভিমুখে। বারাণসীর যুদ্ধে দারা তাঁকে করলেন পরাজিত। আওরঙ্গজেব তখন মোরাদকে বললেন, এ ছলনা চাতুরীময়, পৃথিবীর কোনো কিছুতেই লোভ নেই তাঁর। তাঁরা দু'জনে মিলে দারাকে পরাজিত করলে সাজাহান যদি পরলোকগত হন—আল্লার দোয়ায় তিনি যেন সেরে ওঠেন—তবে দিল্লীর সিংহাসন হবে তাঁর অর্থাৎ মোরাদের। মদ্যপ মোরাদের প্রতীতি হলো এই আশ্বাসে। দারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন পাঞ্জাবে, এক উৎসব রজনীর অবসানে সুরামত্ত মোরাদ হলো বন্দী, আওরঙ্গজেব নিজেকে ঘোষণা করলেন সম্রাটরূপে। পিতা সাজাহানকে কয়েদ করে আবদ্ধ করলেন আগ্রা দুর্গের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে।

আওরঙ্গজেব জাহানারাকে দিতে চেয়েছিলেন বাদশাহ বেগমের পদ। কিন্তু জাহানারা প্রত্যাখ্যান করলেন সে অনুরোধ। স্বেচ্ছায় বরণ করলেন সাজাহানের সহ-বন্দীত্ব। পিতার পরিচর্যার জন্য। চতুর্দিকে ক্রুর প্রবঞ্চনা, সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতার ঘন অন্ধকারের মধ্যে সেদিন একমাত্র জাহানারা রইলেন অচল, অটল, অকম্পিত দীপশিখার মতো দীপ্তিময়! সাজাহানের দ্বিতীয় কন্যা রোশেনারা আওরঙ্গজেবের পক্ষ নিলেন, হলেন তাঁর প্রিয়পাত্রী। দিল্লীর সিভিল লাইনসে আছে তাঁর উদ্যান। সেখানে এ আমলে স্থাপিত হয়েছে রোশেনারা ক্লাব, দিল্লীর

মণ্টিকার্লো। দশ টাকা পয়েণ্টে স্টেকে ব্রিজ খেলার খ্যাতি আছে তার উত্তর ভারতে।

দিনের পর দিন গত হয়, মাসের পর মাস। চক্রাকারে আবর্তিত হয় ষড় ঋতু। গ্রীষ্ম গত হয় তার উত্তাপ ও প্রভঞ্জন আহুতি নিয়ে। বর্ষার মেঘকজ্জল দিবসের দীর্ঘ ছায়া নামে যমুনার কালো জলে। বর্ষণমুখর রাত্রির বিদ্যুৎ চমকে উৎফুল্ল ভবন-শিখীরা নৃত্য করে প্রাসাদের মর্মর অলিন্দে। শরতের আলো-ছায়া বিজড়িত প্রভাতে নদীতীরে কাশের বনে লাগে দোলা। হেমন্ত আনে কুহেলী; শীত দেয় হতাশ্বাস। বসন্তে ফুলের মঞ্জরী আন্দোলিত হয় শিরীষের শাখা প্রশাখায়। আগ্রার প্রাসাদ প্রাচীরের অন্তরালে জাহানারার বন্দী-জীবনে একটি করে বৎসর হয় বৃদ্ধি, আয়ু থেকে খসে পড়ে একটি করে বছর। কর্মহীন অবসরে শাহজাদী কবিতা রচনা করেন আপন মনে।

একদা নিশীথকালে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে সাজাহানের কাছে এসে পৌঁছল একটি সুদৃশ্য মোড়ক। পুত্র পাঠিয়েছে পিতাকে উপহার। তবে কি অনুতপ্ত পুত্রের ক্ষমা প্রার্থনার প্রথম নিদর্শন? আগ্রহকম্পিত হস্তে বৃদ্ধ সাজাহান খুললেন মোড়ক। পরতের পর পরত। খুলতে খুলতে শেষকালে হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র দারাশিকোর খণ্ডিত মুণ্ড। সম্রাট মূর্ছিত হয়ে পড়লেন জাহানারার অংকে।

সাজাহানের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাহানারা রইলেন তাঁর পাশে। স্থবির পিতার পরিচর্যা করলেন অমিত নিষ্ঠা ও অবিচলিত ধৈর্যে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন করলেন দিল্লীতে।

অবশেষে রমজানের এক পুণ্য তিথিতে মৃত্যুর শান্ত শীতল ক্রোড়ে মুক্তি লাভ করলেন বন্দিনী। তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর দেহ সমাধিস্থ হলো ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির পার্শ্বে। সে সমাধির উপরে না রইল মণ্ডপ, না রইল আচ্ছাদন, না রইল ঐহিক ঐশ্বর্যের লেশমাত্র আভাস। শুধু তাঁরই স্বরচিত একটি কবিতা উৎকীর্ণ হলো তার গায়ে,—

"বেগায়র সবজা না পোশাদ কসে মাজারে মারা
কে কবর পোষে গড়িবান্ হামিন্ গিয়াহ বসন্ত্।"

"একমাত্র ঘাস ছাড়া আর যেন কিছু না থাকে আমার সমাধির উপরে। আমার মতো দীন অভাজনের সেই তো শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন।"

পুণ্যশ্লোক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অনুগামিনী সাজাহান দুহিতা নশ্বর জাহানারার এই তো যোগ্য সমাধি।

আসন্ন সন্ধ্যায় শান্ত নিস্তব্ধতায় শ্রদ্ধানম্র চিত্তে সামনে এসে দাঁড়ালেম আমরা তিন দর্শনার্থী। কারো মুখে ছিল না কথা, কিন্তু মনে ছিল ভার।

নব শ্যাম দূর্বাদল ছেয়ে আছে ক্ষুদ্র জিরলঙ্কার সমাধি। নির্মল নীল আকাশ থেকে প্রত্যহ নিশীথে সঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির, প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ অরুণের প্রথম কিরণরেখা, সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোধূলি আলোকের সোনালী আভা। তারা কি পায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে সমাধিস্থ সেই অঙ্গের ললিত সুবাস? পায় তাঁর সুকুমার বক্ষের নীচে ভাঙ্গনত হৃদয়ের মৃদু স্পন্দন ধ্বনি?

পাঁচ

প্রভাতের সবচেয়ে বড় সেন্সেশন। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ক্রীপস্‌ প্রস্তাবের সারমর্ম। নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া বিবরণ। শোনা গেল, গবর্নমেণ্ট বিচলিত হয়েছেন এ সংবাদ প্রকাশে। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তারা তদন্ত শুরু করেছেন সংবাদের সূত্র সম্পর্কে।

সাংবাদিক মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। কারণ প্রস্তাবগুলির কিছুটা আঁচ আমরা সবাই পেয়েছিলেম গত ক'দিন ধরেই। প্রকাশ করা হয়নি, জেণ্টলম্যানস এগ্রীমেণ্ট স্মরণ করে। ইংরেজ ও আমেরিকান সহ-সাংবাদদাতারা অনুমান করলেন, ভাইসরয়'স কাউন্সিলের কোন মহামান্য সদস্যের কাছ থেকে বেরিয়েছে এ খবর।

জনশ্রুতি এই যে, ক্রীপস্‌ যে-দিন এলেন, বেলা সাড়ে বারোটা থেকে অনাহারে ভাইসরয়'স্‌ হাউসে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এই মাননীয় সদস্যগণ। বেলা দুটোয় এলেন ক্রীপস্‌। লর্ড লিনলিথগো আলাপ করিয়ে দিলেন তার সঙ্গে সারিবন্দী দণ্ডায়মান নিজ সহকর্মীদের। ক্রীপস্‌ করমর্দন করলেন সবার সঙ্গে, নিরাসক্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন, "হাউ ডু ইউ ডু?" দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে মুহূর্তে অন্তর্হিত হলেন আপন নির্দিষ্ট কক্ষে।

তাঁরা আশা করেছিলেন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ক্রীপস্‌ তাঁর প্রস্তাব আলোচনা করবেন তাঁদের সঙ্গে, জানতে চাইবেন তাঁদের অভিমত। সেদিক দিয়েও হতাশ হলেন। ক্রীপস্‌ প্রস্তাবের সারমর্ম অনুদ্ঘাটিত রইল তাঁদের কাছে। আশ্চর্য নয় যে, তাঁরা ক্ষুণ্ণ হলেন। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর হলেও, হাজার হোক, মানুষের শরীর তো! শোনা যায়, অবশেষে ভাইসরয়ের সুপারিশে বিগত রাত্রে লাট প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এক ভোজ-সভায় ক্রীপস্‌ তাঁর প্রস্তাবের চুম্বক জানিয়েছেন তাঁদের। আজই প্রভাতে সংবাদপত্রের উৎসাহী নিজস্ব রিপোর্টারের জবানীতে ঘটল তার প্রকাশ। ধূম দ্বারা যদি পর্বতের বহ্নি অনুমান করা সম্ভব হয়, তবে বিদেশী সংবাদদাতাদের সন্দেহ একেবারে অগ্রাহ্য করা কঠিন।

সংবাদ 'স্কুপ' করার অধিকার সাংবাদিকের আছে। কিন্তু তারও একটা অলিখিত মাত্রা আছে। জাতির বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেখানে সাংবাদিকের আপন বিবেক সেন্সর করে তার কপি। এডোয়ার্ড দি এইটথের রাজ্য ত্যাগের ঘটনা মনে পড়ছে সুস্পষ্ট। মে মাস থেকে ব্রিটেনের সকল সংবাদপত্র জানতো সিম্পসন-এডোয়ার্ড প্রণয়-কাহিনী। ফ্লীট স্ট্রীটে কানাঘুষায় শুনেছেন অনেকেই। কেউ প্রকাশ করেনি মুদ্রিতাক্ষরে। সরকারী দপ্তরের কোনো অনুশাসন ছিল না, ছিল না কোনো আইনগত বাধা। একদিন জার্মানীর বিরুদ্ধে সেকেণ্ড ফ্রণ্ট হবে। কোথায়, কোনখানে করবে মিত্রশক্তি আক্রমণ সে-তথ্য জানা হয় তো সম্ভব হতে পারে স্টুয়ার্ট গেলডার বা ড্রু পিয়ার্সনের। তাঁরা কদাচ প্রকাশ করবেন না সে সংবাদ, যদিও ক্রীপস্‌ প্রস্তাবের চাইতে সে কম বড় 'স্কুপ' নয়।

সকল প্রশ্নের বড় প্রশ্ন সততার। ক্রীপস্‌ আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন ব্রিটেন এবং ভারতের কল্যাণের নামে। আমরা সবাই সম্মতি দিয়েছিলেম বিনা প্রতিবাদে। পূর্ব প্রকাশের দ্বারা এই ভারতীয় সাংবাদিক ভঙ্গ করলেন সে প্রতিশ্রুতি। তাই

লজ্জিত বোধ করছি আমরা সমস্ত ভারতীয়েরা। জেন্টলম্যানরা যদি জার্নালিস্ট হতে পারেন, জার্নালিস্টরা জেন্টলম্যান হতে পারবেন না কেন ?

ভাইসরয়'স হাউস থেকে ক্রীপস্ এসেছেন তিন নম্বর কুইন ভিক্টোরিয়া রোডে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সার এণ্ডরু ক্লো-র বাংলোয়। ক্লো আসামের আগামী গভর্নর। গদি দখলের আগে দু'মাসের ছুটি নিয়ে গেছেন মুসৌরী না আলমোড়ায়, বিশ্রাম মানসে।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলারদের বাড়িগুলি সরকারী। সুদৃশ্য। একতলা দালান। ঈষৎ পীতাভ রং ; সামনে অতিবিস্তৃত অঙ্গন। এত বড় যে দু'দিকে গোলপোস্ট খাড়া করে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ খেলা যায়। সবুজ ঘাস, লন্-মোর দিয়ে পরিপাটি ছাঁটা। মাঝখানে বৃত্তাকার ফুলের কেয়ারী। তাকে বেষ্টন করে টকটকে লাল সুরকির রাস্তা ; মোটর ঘোরাতে বেগ পেতে হয় না এতটুকুও। ফটকের গায়ে একপাশে কাচের উপরে বড় হরফে লেখা বাড়ির নম্বর। কাচের একদিকে ছোট্ট একটু খুপরি। রাত্রিবেলায় তাতে লণ্ঠন জেবলে রাখা হয়, অনেক দূর থেকেও যাতে বাড়ির নম্বরটা চোখে পড়ে। দালানের সম্মুখে পোর্চ, তার নীচে গাড়ি দাঁড়ায়। বারান্দার দু'পাশে দুটি ছোট কুঠরী। সেখানে অনারেবল মেম্বারের সেক্রেটারী ও স্টেনোগ্রাফারের দপ্তর।

হুবহু একই ধরনের ছ'টি বাড়ি। সেক্রেটারিয়েটের সুমুখ থেকে দুই বাহুর মতো দু'দিকে প্রসারিত দুটি রাস্তা—কিং এডোয়ার্ড ও কুইন ভিক্টোরিয়া রোডের উপরে। যেন ছ'টি যমজ ভাই, ডিয়োনি কুইন্টোপ্লেটসের দোসর।

আতিশয্যের দ্বারা অত্যন্ত ভালো জিনিসকেও যে কতখানি হাস্যকর করে তোলা যায় তার দৃষ্টান্ত আছে নয়াদিল্লীর নগরপরিকল্পনায়। য়ুনিফর্মিটির বাতিকে পাওয়া স্থপতিরা শহরটাকে শ্রী দিতে গিয়ে ছাঁচ দিয়েছেন, বাড়ি দিতে গিয়ে ব্যারাক। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মূলগত ঐক্য প্রকাশ করার নাম সৃষ্টি। গজ, ফুট বা ইঞ্চি মিলিয়ে সামঞ্জস্য বিধানের নাম নকলনবিসি। প্রথমটা যিনি করেন তাঁকে বলি ব্রহ্মা, দ্বিতীয়টা যিনি করেন তাঁর নাম বিশ্বকর্মা। প্রথমটার মধ্যে আছে আর্ট, পরেরটার মধ্যে আছে ক্রাফট।

পুরাকালে নগর-পত্তনের গোড়াতে ছিল নৃপতি। রাজার অবস্থিতি ও অভিরুচি অনুসরণ করে গড়ে উঠতো জনপদ, তাঁর প্রাসাদকে কেন্দ্র করে আমীর ওমরাহেরা তুলতো সৌধ, সাধারণেরা বাঁধতো বাসা, শ্রেষ্ঠিরা সাজাতো বিপণি। রাজশক্তির পতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে রাজধানীর ভাগ্যে এসেছে বিপর্যয়, নগর নগরীর ঘটেছে বিলুপ্তি বা বৃদ্ধি। আগ্রা, আওরঙ্গাবাদ ও ফতেপুর সিক্রিতে আজও রয়েছে তার নির্ভুল নিদর্শন।

একালে রাজ্যের চাইতে বাণিজ্যের কদর বেশী। লেডী ডাক্তারের স্বামীর মতো রাজার মহিমাও এখন আর আপন বীর্যবত্তায় নয়, প্রজাদের বাণিজ্য-বিস্তারে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্য দেশেও এখন বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে—কখনও স্বনামে কখনও বা বেনামীতে। তাই এ-যুগের মহানগরীর centre of gravity থাকে ক্লাইভ স্ট্রীটে বা হর্নবি রোডে। তাদের প্রেরণার মূল চেম্বার অব প্রিন্সেস নয়, চেম্বার অব কমার্স। তাই ওয়াশিংটনের চাইতে নিউইয়র্কের

গুরুত্ব হয় বেশী, লক্ষ্নৌকে ছাপিয়ে ওঠে কানপুর, পাটনাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় টাটানগর।

আধুনিক ভারতবর্ষে নয়াদিল্লী হচ্ছে একমাত্র সিটি যেখানে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রভুত্ব নেই। সেখানে বৈশ্য নেই। ব্রাহ্মণও না। আছে শুধু ক্ষত্রিয়। অবশ্য তাদেরও আয়ুধের পরিবর্তন ঘটেছে। মডার্ন ক্ষত্রিয়েরা অসিজীবী নয়, মসিজীবী। প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা ব্যূহ রচনা করে হাত পাকিয়েছিলেন। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ব্যাস সবই রুলমাফিক। আধুনিক ক্ষত্রবীরেরা ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে হাত এবং চুল দুই-ই পাকিয়ে দেন, তারও নির্দেশ হলো precedent। সুতরাং নয়াদিল্লীর পথ, ঘাট, বাড়ি, ঘর সব কিছুরই পিছনে আছে কেবলই এক রকম হওয়ার প্রয়াস। দোকান-পাট থেকে শুরু করে রাস্তা, পার্ক, কোয়ার্টার, মায় পথের পাশে জামগাছের সারি পর্যন্ত সব কিছুই যেন খাকী কোর্তা-পরা পল্টনের মতো সঙ্গীন উঁচিয়ে এটেনশনের ভঙ্গিতে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

নতুন আস্তানায় ক্রীপসের সভা বসল পাত্র-মিত্র নিয়ে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক কুপল্যান্ড, এবং ক্যানাডার সমাজতন্ত্রী গ্রেহাম স্প্রাই আছেন তাঁর দপ্তরে।

কুপল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একবার লণ্ডনের এক বিতর্ক-সভায়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য আছে যথেষ্ট, ঔদার্য আছে কিনা জানিনে।

ক্রীপসের সঙ্গে একে একে সাক্ষাৎ করেছেন মৌলানা আজাদ, গান্ধীজি, পণ্ডিত নেহরু ও মিস্টার জিন্না। আজাদের সঙ্গে দোভাষী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আর একজন কংগ্রেসী মুসলমান। ব্যারিস্টার মিস্টার আসফ আলী। আসফ আলীর জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশ, কর্মস্থান দিল্লী, শ্বশুরবাড়ি বাংলায়। তাঁর স্ত্রী অরুণা আসফ আলীর পৈতৃক উপাধি ছিল গাঙ্গুলী, অতি নিকট আত্মীয় সম্পর্ক আছে রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরাদেবীর সঙ্গে।

পণ্ডিত জওহরলালের ইংরেজী জ্ঞানের খ্যাতি তাঁর দেশপ্রীতিরই মতো বহু-বিদিত। জীবিত ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও তাঁর তুল্য ইংরেজী রচনাকুশলী বড় বেশী নেই, একথা স্বীকার করেছেন বহু ইংরেজ সমালোচক। গান্ধীজির ইংরেজী জওহরলালের ন্যায় সাহিত্যপ্রধান নয় কিন্তু তার স্বচ্ছতা ও অলংকারহীন মাধুর্য বহুক্ষেত্রে বাইবেলের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মিস্টার জিন্না ছিলেন প্রথিতযশা ব্যবহারজীবী। ইংরেজীতে সওয়ালে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। ক্রীপসের সঙ্গে একটি মাত্র লোক আলাপ করেছেন—ক্রীপসের ভাষায় নয় নিজের ভাষায়। ইংরেজীতে নয় উর্দুতে। যদিও কাজ চালাবার মত ইংরেজী তিনি জানেন বলে জনশ্রুতি শুনেছি বহু বার। মৌলিকতা আছে মৌলানার। তার জয় হোক।

ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয়, কিন্তু ইংরেজী আমাদের শিখতে হয়। তাতে ক্ষোভ নেই। হয়ত লাভই আছে। স্বাজাতিকতার আধুনিক ধারণা, ইংরেজীতে যাকে বলে ন্যাশন্যালইজম্‌, তার বেশীটা আমরা পেয়েছি ইংরেজী শিক্ষার ফলে। কিন্তু এদেশে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্মকুশলতার মাপকাঠিও দাঁড়িয়েছে ইংরেজী বলা ও লেখার কৃতিত্বে। এটা হাস্যকর। কলেজে পরীক্ষার খাতায় যে-ছেলে ভালো ইংরেজী লেখে, চাকুরির বাজার থেকে বিবাহযোগ্যা কন্যার উদ্বিগ্না জননী পর্যন্ত সর্বত্র

তার আদর আছে। এ-দেশের নেতাদের সম্পর্কেও তাই বিদেশী পর্যটকেরা যখন বলেন যে he speaks faultless English আমরা তখন আনন্দে গদগদ হই। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা সতেজ প্রতিবাদ আছে মৌলানা আজাদের আচরণে। ক্রীপস্ই হোন, ভাইসরয়ই হোন, কিম্বা স্বয়ং জর্জ দি ফিফ্থই হোন, যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভাষা না বলতে চান বা না পারেন তবে আমিই বা তাঁর ভাষা বলতে যাব কেন? সাবাস!

গান্ধীজী ক্রীপসের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। তাঁকে বারান্দার সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলেন ক্রীপস্। মুহূর্তমধ্যে সাংবাদিকেরা চক্রব্যূহ রচনা করলেন তাঁকে ঘিরে। চোখে তাঁদের জিজ্ঞাসা, মুখে তাঁদের আগ্রহ, উত্তেজনা ও উদ্বেগের ছাপ। স্মিতহাস্যে উদ্বেল জনতাকে অভ্যর্থনা করলেন তিনি। বিনাবাক্যে নিরস্ত করলেন বহু উদ্যত প্রশ্ন।

ক্রীপসের রসবোধ আছে। রহস্য করে বললেন, গান্ধীজির হাসি দেখে সাংবাদিকরা যেন ক্রীপস্ প্রস্তাবের গুণ বিচার না করেন। ঘর থেকে বেরোবার সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে তিনি গান্ধীজিকে শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রবল হাস্যধ্বনি উত্থিত হলো এই কৌতুকালাপে।

কিন্তু কাশীর পাণ্ডা, বিয়ের ঘটক এবং বীমার দালালের চাইতেও নাছোড়বান্দা আছে জগতে। তার নাম রিপোর্টার। গান্ধীজির আলোচনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন তাঁরা। অঙ্গুলিনির্দেশে ক্রীপস্কে দেখিয়ে উত্তর করলেন মহাত্মা, "ওকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার কিছু বলার নেই।"

"প্রস্তাবটি এমনই চীজ যে, দেখেই আপনি হতবাক?" প্রশ্ন করলেন এক ঝানু সাংবাদিক।

"You naughty boy" বলে প্রসন্ন হাস্যে সমাপ্তি ঘটালেন আলোচনার। মোটরে উঠে যুক্ত করে অভিবাদন করলেন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে। প্রস্থান করলেন বিরলা ভবনোদ্দেশে।

ইনফরমেশন বিভাগের ক্যাম্প হয়েছে পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, সাংবাদিকদের সুবিধার্থে। সেখানে হানা দিচ্ছি আমরা রিপোর্টারের দল প্রত্যহ প্রাতে, দুপুরে, বিকালে ও সন্ধ্যায় অমিত উৎসাহে। যদিও কবে কখন কোন ভারতীয় নেতা ক্রীপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তার বেশী আর কিছুই জানার উপায় নেই সেখান থেকে।

ক্যাম্প আপিসের কর্তা জগদীশ্ নটরাজন, ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার এর প্রতিষ্ঠাতা বম্বের বিখ্যাত সাংবাদিক কে. এস. নটরাজনের পুত্র। পাইওনীয়রের সম্পাদকগোষ্ঠী থেকে এসেছেন গভর্নমেণ্টে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য জানেন অনেক, ইংরেজী বলেন স্বচ্ছন্দে, উচ্চারণে নেই তামিলজনোচিত ধ্বনিবিকৃতি। একদিন নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল তাঁর গৃহে।

নটরাজন গৃহিণী মাদ্রাজী নন,—এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তাঁর পিতৃকুল বম্বে পরিবারের খ্যাতি আছে টেনিস খেলায়, মাতৃকুলের মূল অনুসন্ধান করা যায় বঙ্গদেশে। তাঁর মাতামহী ব্যানার্জী-কন্যা ছিলেন, সে হিসাবে বল্লাল সেনের সৃষ্ট কৌলীন্যে দাবী আছে। পিয়ানো বাজাতে পারেন চমৎকার।

আধুনিক অনেক প্রগতিশীল বাঙালী পরিবারেও ভারতীয় রূপটি খুব স্পষ্ট নয়। গৃহের কর্তা হয়তো বিদ্যার্জন করেছেন বিদেশে। অক্সফোর্ডে ইংরেজী, গ্লাসগোতে এঞ্জিনিয়ারিং, এডিনবরায় ডাক্তারী বা লিংকনস্ ইনে ব্যারিস্টরী পড়ে দেশে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন কর্মজীবনে, অর্থার্জন করেছেন অজস্র ধারে। তাঁদের বসনে স্যুট, অশনে সুপ এবং আসনে কৌচ। তাঁদের গৃহিণীরা পার্টি দেয়, ক্লাবে যায়, ব্রিজ খেলে পুরুষ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অসংকোচে। সে গৃহে চাকরেরা বয়, মায়েরা মেমসাব, এবং মেয়েরা মিসিবাবা।

বিলাতে না গিয়ে যাঁরা সাহেব, তাঁরা আরও দুর্ধর্ষ। কংগ্রেস থেকে লীগে যোগ দেওয়া মুসলমানের মতো, হিরোডকে করেন আউটহিরোড। শ্লিপিং পায়জামা না পরে ঘুমানো বা ছুরিকাঁটা দিয়ে না খাওয়াকে তাঁরা প্রায় মধ্যযুগের গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন বা সতীদাহের ন্যায় রোমহর্ষক বর্বরতা জ্ঞান করে থাকেন।

তবুও একথা মানতে হবে যে, ইংরেজ অথবা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিয়ে করে আমরা আমাদের সংস্কৃতির মূল থেকে যেমন নিঃশেষে উৎপাটিত হই এমন আর কিছুতেই নয়। বাঙালী গৃহিণীরা যতই চুল খাটো করুক, গিমলেট গিলুক, রং করা ঠোঁটের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ফিরিঙ্গী উচ্চারণে ভুল ইংরেজী বলুক, সংস্কার থাকে Coty বা ম্যাকস্ফ্যাক্টর-ঘষা চামড়ার তলায়। রক্তে থাকে ঠাকুমা দিদিমাদের অন্ধ-বিশ্বাসের রেড কর্পাসল। তাই মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক করতে খোঁজ পড়ে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার, স্বামীর অসুখে লুকিয়ে মানত করেন সুবচনীর, ছেলের কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠীর দিনে থাকেন উপোস। পুরুষেরা হোটেলে যতই খান স্টেক বা ভিল, মা-বাবার শ্রাদ্ধ করেন গুরু পুরোহিত ডাকিয়ে যথারীতি।

সব চেয়ে দুর্ভাগ্য ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জনক-জননীর সন্তানেরা। তারা পিতার সমাজ থেকে বিচ্যুত, মাতার সমাজ দ্বারা বর্জিত। তারা না ভারতবর্ষের, না ইংলণ্ডের। কোন দেশের প্রতি তাদের দেশাত্মবোধ জাগবে, কোন জাতির প্রতি মমত্ববোধ? তারা বাবার কাছে পাবে নামের পদবী, মায়ের কাছে থেকে পাবে গায়ের রং, কার কাছ থেকে পাবে মনোভাব? তারা সত্যিকার বর্ণসঙ্কর, শুধু জন্মে নয়, আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে। ভারতীয়-য়ুরোপীয় বিবাহজাত সন্তানেরা আজ পর্যন্ত হয়নি কোনো উঁচু দরের শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা সংগীতজ্ঞ। তাদের দৌড় বড় জোর রেলের বড় সাহেব নয় তো টেলীগ্রাফের ডিরেক্টর।

য়ুরোপের সমাজ অনেকটা সার্বজনীন। ইংলণ্ড থেকে ইটালী পর্যন্ত মোটামুটি তার একই রূপ। ইংরেজ, ফরাসী, চেক, হাঙ্গেরিয়ানের প্রায় একই বেশ, একই পরিবেশ, একই আচার-আচরণ। সমগ্র য়ুরোপে লোক ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার ও সাপারে বসে ঘড়ি ধরে, খায় ছুরি কাঁটায়। থিয়েটারে যায় শনিবারে রাত্রে, গির্জায় জানু পেতে ভজনা করে রবিবারে। ভাষার বিভেদ ছাড়া য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সামাজিক মিল আছে সর্বত্র। লণ্ডনের ইংরেজ স্বামীর অস্ট্রিয়ান স্ত্রীকে দেখেছি অন্য আর পাঁচজন ইংরেজ গৃহিণীর মতো অনায়াসে সমাজে প্রতিষ্ঠিতা। স্বামী, পুত্র, কন্যা নিয়ে তার গৃহের সঙ্গে অন্য আর পাঁচটি ইংরেজ পরিবারের নেই তফাত। ছেলেমেয়েরা বেড়ে উঠছে ঠিক অন্য আর পাঁচটি ডিক, পল বা হ্যারিংটন পুত্র-কন্যার মতো।

অবশ্য সমস্যা যে একেবারে নেই, তা নয়। সে সমস্যা প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যক্ষ-গোচর নয় কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষণে দেখা দেয় স্বামী-স্ত্রীর মনে। যেমন লর্ড'সে টেস্ট ম্যাচের সময় কোন পক্ষের এ্যাশেজ লাভ কামনা করবে ইংরেজ স্বামী আর অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রী? মহাযুদ্ধে কার জয়লাভ উৎফুল্ল হবে জার্মান মিস্টার, কোন পক্ষের পরাজয়ে মুহ্যমান হবেন তাঁর রাশিয়ান মিসেস?

তবুও দূর ভবিষ্যতে কোন দিন য়ুনাইটেড স্টেট্‌স অব য়ুরোপ যদি গড়ে ওঠে, যদি সম্ভব হয় এক কথ্য ভাষা, তবে কল্পনা করা কঠিন নয় য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর বৈবাহিক যোগাযোগ। তখন স্পেনের তরুণ হামেশা বিয়ে করবে নরওয়ের তরুণী ঠিক যেমন এখন করে স্কচেরা ওয়েলসের। যেমন আমাদের কোন্নগরের কনেকে ঘরে নিয়ে আসে, বরিশালের বর।

ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জীবনের মর্ম আলাদা, সমাজের গঠন বিভিন্ন। একান্নবর্তী পরিবারের কথা বাদ দিলেও আমাদের সমাজ কেবল ব্যক্তি ও তার স্ত্রীপুত্রের মধ্যেই নিবন্ধ নয়। বহু আত্মীয় পরিজনগোষ্ঠীর প্রতি নানাবিধ দায়িত্ব এবং সম্পর্কের দ্বারা তার প্রভাব ও ক্ষেত্র দূরপ্রসারিত। তাই পূর্ব পশ্চিমের বৈবাহিক যোগাযোগে ব্যক্তিগত জীবন সুখের হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়, কিন্তু তা দ্বারা কোনোকালে ঘটবে না দুই মহাদেশের সামাজিক মিলন। য়ুরোপের স্ত্রীলোক মাত্রই আমাদের পক্ষে পরস্ত্রী।

নটরাজনের ভোজ সভায়, পরিচয় ঘটল এক মারাঠি ব্রাহ্মণের সঙ্গে। বয়স চল্লিশের অনেক উপরে, মাথায় কালোর চাইতে সাদার ছোপ বেশী, বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা। সব চেয়ে আশ্চর্য তার চোখ দুটি। দীর্ঘায়ত নয়ন, অবনী ঠাকুরের আঁকা ভারতীয় চিত্রকলার অর্জুনের মতো। তাতে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে বটে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে আছে আষাঢ়ের জলভারনত ঘনমেঘের মতো কালো গম্ভীর ছায়া। সাধারণতঃ চোখে পড়ে না পুরুষের এমন অসাধারণ চোখ।

কিন্তু নয়াদিল্লীর সোসাইটিতে চারুদত্ত আধারকারের খ্যাতি পানীয়ঘটিত। এক বৈঠকে তিনি দশ পেগ হুইস্কি পান করতে পারেন অবলীলাক্রমে। চোখের পাতা কাঁপবে না এতটুকু। সেটা অভূতপূর্ব নয়। আরও দু'চার জন পারেন তা। কিন্তু আধারকারের কৃতিত্ব শুধু পানীয়ের গ্রহণে নয়, উদ্‌ভাবনেও। সংখ্যাতীত মিক্সিং জানা আছে চারুদত্তের। ককটেল তৈরীর বহু পদ্ধতি তাঁর নখাগ্রে। ডিনারে, পার্টিতে নিমন্ত্রণকারিণীরা আগে ভাগে পরামর্শ করেন আধারকারের সঙ্গে। মহানন্দে মন্ত্রণা দেন তিনি। "কে কে আসছে, কতজন আসছে? যদি তিন রাউণ্ডেই ঘায়েল করতে চাও, তবে প্রথমে দাও রাম অরেঞ্জ, তারপর জিন অ্যাণ্ড লাইম। তারপর হুইস্কি। মেয়েদের জন্য মাঝখানে ব্রাণ্ডি দিতে পার জিঞ্জারেলের সঙ্গে মিশিয়ে। কী বললে, রাম-অরেঞ্জ কেমন করে করবে জানো না! হোয়াট এ পিটি! আচ্ছা শিখিয়ে দিচ্ছি। shaker-এর মধ্যে সিকি ভাগ নাও ইটালিয়ান ভারমুথ। ইটালিয়ান নেই? আচ্ছা অভাবে ফ্রেঞ্চই দাও। মেশাও সিকি ভাগ কমলালেবুর রস, অর্ধেক ঢালো রাম। বেশী করে বরফ, আর সামান্য একটু দারুচিনির রস। ব্যস। আচ্ছা করে মিশিয়ে এবার ককটেল গ্লাসে পরিবেশন কর।"

নটরাজন গৃহিণী বললেন, "মিনি সাহেব, (আমার মিনি সাহেব নামটা সেন সাহেবের অন্দরমহল থেকে বাহির বিশ্বে ছড়িয়ে পরেছে বন্ধুজনের সকৌতুক সম্বোধনে) যদি নতুন নতুন কক্‌টেল চাখতে চান তো মিস্টার আধারকারের বুদ্ধি নেবেন।"

স্মিত হাস্যে আধারকার বললেন, "হ্যাঁ, চাকরি থেকে রিটায়ার করে আমার রেসিপিগুলোর পেটেন্ট নেবো ভাবছি। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো—If it's a drink, consult আধারকার। ঘরে ঘরে মিসেস বিটনের মতো নতুন গৃহিণীদের আলমারিতে থাকবে আধারকার'স বুক অব ড্রিংকস্।"

কিন্তু আমার জন্যে এ সবের চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ভোজন পর্বের শেষে অতিথিদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বেহালা বাজিয়ে শোনালেন আধারকার। দরবারী কানেড়ার সুর। গৎ নয়, শুধু আলাপ। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে বাজালেন অপূর্ব দক্ষতায়। বাজনা শেষে আমার পানে তাকিয়ে বললেন, "বলতে পারো কী সুর বাজালেম, মিনি সাহেব ?"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেম খানিকক্ষণ, উত্তর দেওয়ার কথাই মনে রইল না। পরিষ্কার বাংলা।

"কী, একেবারে থ' হয়ে রইলে যে ?" এবারও বাংলায়।

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেম, "আপনি আশ্চর্য। বাংলা শিখলেন কেমন করে ?"

"একি একটা প্রশ্ন ? তুমি ইংরেজী শিখেছ কেমন করে ?"

"আমি শিখেছি পেটের দায়ে।"

"আমি শিখেছি প্রাণের দায়ে। না, না, আর প্রশ্ন নয়, curiosity is a feminine vice."

বিদায় নেওয়ার আগে আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "মিনি সাহেব, 'তুমি' বলছি বলে চটোনি তো মনে মনে ? তুমি তো বয়সে অনেক ছোটই হবে। আমি থাকি রটেণ্ডাম রোডে, বাইশ নম্বর। এস একদিন সন্ধ্যাবেলা, বাংলা বলবো, বেহালা শোনাবো, আর দেব টপ-হ্যাট। টপ-হ্যাট জানো তো ? জানো না ? অর্ধেক জিন, সিকিভাগ ফ্রেঞ্চ ভারমুথ, সিকিভাগ ইটালিয়ান। একফোঁটা বিটার্স, তার সঙ্গে খুব খানিকটা বরফ।"

আধারকারের বাড়িতে গেলেম। টপ-হ্যাটের লোভে নয়, লোকটির আশ্চর্য আকর্ষণে। একদিন গেলেম, দু'দিন গেলেম। তারপর প্রত্যহ। কখনও বা সকালে এবং বিকেলে। অনেকদিন ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত সবই সমাধা হয়েছে তাঁর ওখানে। অল্প সময়ে আন্তরিকতা এত ঘনিষ্ঠ হলো যে, আধারকার পুরুষ না হলে নিন্দুকের কুৎসারটনায় কলঙ্কিত হতে পারতো আমার নাম। তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যা থাকলে নয়াদিল্লীর গৃহিণীরা সম্ভবপর বর কল্পনা করে মুখরোচক আলোচনায় অবসর বিনোদন করতে পারতেন অলস মধ্যাহ্নে।

কিন্তু কন্যা দূরে থাক, কন্যার জননীর চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না অকৃতদার আধারকারের গৃহে। গোটা তিন চার চাকর, বেয়ারা খানসামা নিয়ে আধারকারের হোম গভর্নমেণ্ট। তার একমাত্র রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের ভার তাঁর নিজের, বাকী এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেটিভ, মায় জুডিশিয়ারী পর্যন্ত সমস্তটাই চাকরদের হাতে। খাঁটি প্রজাতন্ত্র।

প্রজাতন্ত্র বললেও ক্ষতি নেই, ভৃত্যদের পক্ষে।

তর্ক চলে, আলোচনা হয়। রাজনীতি, ধর্ম, ওয়র স্ট্র্যাটেজি, মাঙ্ক সিনেমা স্টার পর্যন্ত। কোন বিষয় বাদ পড়ে না। মাঝে মাঝে হয় কাব্যালোচনা। রবি ঠাকুরের বহু কবিতা ও কবিতাংশ আধারকারের কণ্ঠস্থ। গভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে, নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, "বল, কোথায় আছে?" বলতে পারলে বলেন, "সাবাস্! Now you have earned a drink, নাও একটা অরেঞ্জ গিম্‌লেট—খানিকটা জিন ও কমলালেবুর রস। এই বয়, সাবকোবাস্তে—" কোনো দিন বলেন, "আজ পরীক্ষা। বল, কোথায় আছে—আমারে যে ডাক দেবে তারে বারংবার এ জীবনে ফিরেছি ডাকিয়া; সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে, খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।"

"পারলে না? আচ্ছা আর পাঁচ মিনিট সময় দিলুম। তবু পারলে না, হাঃ, হাঃ, বাঙালী হয়ে বাংলা কবিতার বাজিতে অবাঙালীর কাছে হারলে। লোকে শুনলে বলবে কী হে? আচ্ছা আগে মাথা সাফ্ করে নাও। বয়,—লাও একঠো ব্রুক্‌লীন। একটা টাম্বলারে অর্ধেকটা বরফের টুকরো, কিছুটা ফ্রেঞ্চস্টাইল ভারমুথ, কিছুটা ড্রাই জিন্। আচ্ছা করে নেড়ে দুফোঁটা অরেঞ্জ বিটার্স। ডিল্লিসস্।"

একদিন জিজ্ঞাসা করেন, "মিনি সাহেব, প্রেমে পড়েছ কখনও?"

"না।"

"বল কী হে, ইয়ং ম্যান, বিলেতে ছিলে, প্রেমে পড়নি, একথা বিশ্বাস করবে কে?"

"বিশ্বাস করা উচিত। There are more things in heaven and earth..."

"কিন্তু There are more girls in Piccadilly and Licester Square-ওতো বটে।"

"আসল কথা কী জানেন? প্রেমে পড়লে চেহারাটা বড্ড বোকা বোকা দেখায়, সিনেমায় দেখেছি। সে ভয়ে এগোতে সাহস করিনি।"

উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন আধারকার। "বোকা বোকা দেখায়, হাঃ, হাঃ, হাঃ, Just imagine প্রেমে না পড়ার কারণ। বার্নার্ড শ' এর চাইতে ভালো কিছু বলতে পারতেন না। তুমি একটি genius। না, তোমাকে আজ নতুন কিছু না দিতে পারলে মান থাকে না। Try রাম ব্রুইয়ট। চার চামচে রাম, এক চামচে লাইম, এক রত্তি চিনি, আধ পেয়ালা ব্ল্যাক কফির সঙ্গে মিশিয়ে। ওয়াণ্ডারফুল!"

দিনের পর দিন বাড়ে বিস্ময়। ক্রমশঃ আকৃষ্ট হই এই মারাঠা ব্রাহ্মণের প্রতি। আশ্চর্য এর জীবন। কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে গভীর এর অনুরাগ, বেহালা বাদনে অসাধারণ এর দক্ষতা। আয় করেন প্রচুর, ব্যয় করেন প্রচুরতর। বেশীর ভাগই মদ খাওয়া এবং খাওয়ানোয়। অথচ অশোভন আচরণ করতে দেখিনি কখনও। দম্ভ করে বলেন, "মিনি সাহেব, তোমাদের শরৎ চাটুয্যে লিখেছেন,—যে মদ খায় সে কোনো দিন না কোনো দিন মাতাল হয়েছে নিশ্চয়। যে অস্বীকার করে সে হয় মিছে কথা বলে, নয় তো মদের বদলে জল খায়। শরৎ চাটুয্যে দেখেননি চারুদত্ত আধারকারকে। দেখলে বই থেকে ঐ লাইন দুটি তুলে দিতেন।"

স্ত্রী নেই আধারকারের সে-কথা সবাই জানে। কিন্তু আত্মীয়, পরিজন? কারও

জানা নেই কোনো তথ্য। হাসিতে, খুশিতে, গল্পে, গুজবে, সরগরম রাখেন মজলিস, মুখরিত করেন নিজ গৃহের প্রাত্যহিক বন্ধুসমাগম। তবু চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এহ বাহ্য। কী এক গভীর দুঃখের ভার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ঐ ভাবানত নয়নের অন্তরালে, নিঃসঙ্গ জীবনের পশ্চাতে আছে অপরিসীম বেদনার ইতিহাস। কিন্তু কৌশলে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আবৃত্তি করেন আধারকার,—

আমারে পাছে সহজে বোঝ তাইতো এত লীলার ছল ;
বাহিরে যার হাসির ছটা, ভিতরে তার চোখের জল।

ছয়

দু'জন ইংরেজ একত্র হ'লে গড়ে একটা ক্লাব, দু'জন স্কচ একত্র হ'লে খোলে একটা ব্যাংক, দু'জন জাপানী করে একটা সিক্রেট সোসাইটি। দু'জন বাঙালী একত্র হ'লে করে কী? দলাদলি? তা করে এবং বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায়ই করে। কিন্তু তাছাড়া আরও একটা জিনিস করে। স্থাপন করে একটি কালীবাড়ি। উত্তর ভারতের এমন শহর দুর্ঘট যেখানে বাঙালী আছে কিছু সংখ্যক অথচ কালীবাড়ি নেই একটি।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে কালীমূর্তিটি সুখদৃশ্য নয়। বীণাবাদিনী সরস্বতীর সুষমা বা কমলাসনা লক্ষ্মীর শ্রী নেই তাঁর মসীকৃষ্ণ দেহে। ভগবতী দুর্গার হাত দশটি, প্রহরণ সমপরিমাণ। কিন্তু কালীমূর্তির কাছে তাঁকে অনেক শান্ত ও সুকুমার মনে হয়। কণ্ঠে তাঁর নরমুণ্ডের মালা, কটিতে তাঁর ছিন্নবাহুর গুচ্ছ, এক হাতে ধৃত মুক্ত কৃপাণ, আর হাতে দোলে খণ্ডিত শির। অতি বিস্তৃত আননের কোনো-খানে নেই কমনীয়তার লেশমাত্র আভাস, নয়নে নেই স্নিগ্ধনত দৃষ্টি। নিরাবরণ বক্ষ, নিরাভরণ দেহ। লোলায়িত রসনা। স্বদেশীয় ভক্তরা বলেন, মা ভয়ংকরা ; ক্যাথারিন মেয়ো বই লিখে বলেন, বীভৎস।

এই রুদ্র ভয়াল মূর্তিকে ভালোবাসে বাঙালী। শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিস্রোত আনলেন তার চিহ্ন রইল একটি মাত্র বিশেষ শ্রেণীতে। কালীর ভক্তরা আছেন দেশব্যাপী। শুধু শাক্তদের মধ্যেই তাঁর পূজারীরা নিবদ্ধ নয়। তাঁর পূজা নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষকের কুটীর থেকে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। পুরাকালে কাপালিকেরা শবাসনে সাধনা করেছে দেবী কালিকার, তান্ত্রিকেরা আরাধনা করেছে শ্যামামায়ের, দস্যুদল লুণ্ঠন মানসে নির্গত হয়েছে নৃমুণ্ডমালিনী কালীর অর্চনা করে। আধুনিক যুগেও অসুস্থ আত্মীয়ের আরোগ্য কামনায় বাঙালী মেয়েরা মানৎ করেন মা কালীর কাছে, পল্লীতে মহামারী দেখা দিলে সরলচিত্ত অধিবাসীরা পূজা করে ভক্তিভরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর ধ্যান করেছেন দক্ষিণেশ্বরে, তাঁরই ভজনা করেছেন সাধক রামপ্রসাদ ; রচনা করেছেন অপূর্ব শ্যামা-সঙ্গীত।

বাঙালীর পক্ষে এই কালীপ্রীতি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বিস্ময়কর মনে হবে। তাঁর শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক গঠন বাঙালীকে আকৃষ্ট করবে কোমলতার প্রতি, স্নিগ্ধতার প্রতি, মাধুর্যের প্রতি,—এইটেই আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙ্গালীকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তার প্রকৃতিকে যাঁরা যথার্থরূপে অনুশীলন করেছেন তাঁরা

জানেন, এই আপাতবিরোধিতাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কুসুমের মৃদুতা এবং বজ্রের কাঠিন্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার প্রকৃতিতে। তাই ভীরুতার অপবাদ যেমন তার বহুপ্রচারিত, চরম দুঃসাহসিকতার জয়তিলকও তারই ললাটে।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনেরও সংঘাত সংঘর্ষ আজ বহুব্যাপ্ত, আসমুদ্র-হিমাচল তার বিস্তার ও বেগ। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্ব প্রদেশের সর্বসাধারণ। মারাঠী এসেছে, মাদ্রাজী এসেছে, এসেছে গুজরাতী, পার্শী ও বেহারী। ভরেছে জেল, সয়েছে নির্যাতন। কিন্তু স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় বাঙালীই সাধন করেছে অগ্নিমন্ত্রের, দিয়েছে দক্ষিণা, জীবন দিয়ে পরিশোধ করেছে দেশমাতৃকার ঋণ। একমাত্র বাঙলা ছাড়া ভারতবর্ষের কোথায় স্কুলের ছেলে বরণ করেছে ফাঁসি, মেয়েরা ছুঁড়েছে পিস্তল, পলিতকেশ অন্তঃপুরিকা বুক এগিয়ে নিয়েছে গুলীর আঘাত?

রিডিং রোডের উপর যে কালীমন্দিরটি স্থাপিত হয়েছে মিলিত উদ্যোগ ও আর্থিক প্রচেষ্টায়, তার জন্য নয়াদিল্লীর বাঙালী সমাজের গর্ব করার অধিকার আছে। আত্মঘাতী বুদ্ধির কর্মনাশা হঠকারিতায় সে কেবলই করে কলহ, ঘটায় ভেদ, ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠান,—এ অপবাদ বাঙালীর। বোধ হয় একেবারে অমূলকও নয়। একক প্রচেষ্টায় বাঙালীর কৃতিত্ব তুলনাহীন। তার মেধা তার ঋদ্ধি, তার নৈপুণ্য সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু বহুজনের সম্মিলিত কর্ম দ্বারা একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যথেষ্ট শক্তি দেখায়নি বাঙালী—কথাটা গভীর পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। তাই এই কালীবাড়িটি দেখে মন খুশী হয়। কোনো রাজন্যব্যক্তির অনুগ্রহে নয়, নয় কোনো বিত্তশালীর একক অর্থানুকূল্যে, প্রবাসী বাঙালীদের প্রদত্ত ও সংগৃহীত চাঁদায় গড়ে উঠেছে এই মন্দির, স্থাপিত হয়েছে বিগ্রহ।

সরকারী দপ্তরখানায় জীবিকার্জনের তাগিদে উত্তর ভারতের এই মহানগরীতে এসেছে বাঙালী। তাদের কেউ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে আয় করেছেন প্রচুর অর্থ, কেউ সাধারণ কেরানীর কাজে পেয়েছেন পরিমিত বেতন। তাঁরা সবাই দিয়েছেন দান,—স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধায়। অল্প অল্প করে জমেছে অর্থ, ভরেছে দেবীর ভাণ্ডার। সাধুবাদ দিই তাঁদের। তাঁরা ধন্য।

মন্দিরটি পরিকল্পনা করেছেন যে স্থপতি তাঁর নাম জানি নে, কিন্তু প্রশংসা করি। আড়ম্বরহীন, বাহুল্য-বর্জিত, সহজ, সরল গঠন। বড়বাজারের গন্ধ নেই, নেই মার্কিনী ঢং-এর অতি আধুনিক স্ট্রীমলাইন। দূর থেকে দেখে চোখ তৃপ্ত হয়, কাছে গেলে মন শুচিতায় ভরে ওঠে।

গুটি কয়েক সোপান অতিক্রম করে উপরে উঠলে বিস্তৃত অলিন্দ, ঈষৎ উচ্চ জালিকাটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে মন্দির, চারিদিক ঘিরে পথ। সে পথে দর্শনার্থীরা প্রদক্ষিণ করে বিগ্রহ, দ্বারে লম্বমান ঘণ্টা-ধ্বনি করে মন্দিরের ধূলি নেয় মাথায়। আপন অন্তরের কামনা নিবেদন করে ভক্ত নরনারীর দল। আকাশের আলো এবং বাইরের বাতাস আসতে বাধা নেই এতটুকুও। মন্দিরের অভ্যন্তরে নেই অন্ধকার, নেই পুষ্পপত্র ও গঙ্গোদকের দ্বারা আর্দ্র অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়া।

মন্দিরের প্রাঙ্গণটি সুপরিসর। একদিকে আরাবল্লী পর্বতের 'রীজ'। পাথরের

খাড়া দেয়াল, সিমেন্ট দিয়ে জোড়া। অন্যদিকে রাস্তা এবং রেলিং। পিছনে এক কোণে পুরোহিতের বাসস্থান। ছোট্ট একটি কোয়ার্টার মন্দির কর্তৃপক্ষের তৈরী।

দূরদেশে দেবীর নিয়মিত পূজার আয়োজনে পুরোহিত সংগ্রহ খুব সহজ নয়। বাঙলা থেকে কাউকে এনে রাখতে হলে চাই তাঁর জন্য নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা। তাঁর পরিজন প্রতিপালনের নিশ্চিত আশ্বাস। তাই মন্দিরের কর্তৃপক্ষ পুরোহিতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন মাসিক মাসোহারা। তার গ্রেড আছে, ইনক্রিমেন্ট আছে, ছুটির ব্যবস্থা আছে। আছে প্রণামী, দর্শনীর প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত। এ যুগে দেব-সেবককেও চাকরির ফান্ডামেন্ট্যাল রুলস্ মেনে চলতে হয়।

মানুষের জীবন যখন জটিল হয়নি, তখন তার অভাব ছিল সামান্য, প্রয়োজন ছিল পরিমিত। সেদিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক ছিল না বিত্তের। সে বিদ্যা দান করতো ছাত্রকে, জ্ঞান বিতরণ করতো শিষ্যকে, ভজন পূজন করতো নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নে। সে নির্লোভ, নিরাসক্ত, শুদ্ধাচারী, সাত্ত্বিক। সে-দিন বিগত, তার সঙ্গে সে ব্রাহ্মণও তিরোহিত। একালে পুরোহিতেরও সংসারযাত্রার উপকরণ হয়েছে বৃদ্ধি। তার স্ত্রীর জন্য চাই সায়া, সেমিজ ও ব্লাউজ, ছেলের জন্য মেলিনস ফুড, মেয়ের জন্য হেজ্‌লীন স্নো। ইহকালের সমাজ, সংসার ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীন হয়ে শুধু যজমানের পরকালীন মঙ্গল চিন্তা করলে তার নিজের পরকাল ঘনিয়ে আসে। তাই মন্দিরের পূজারীর জন্য রাখতে হয়েছে বিনাভাড়ায় বাসস্থান, তাতে বিজলী আলো আছে, কলের জল আছে, আছে ভদ্র স্বল্পবিত্ত বাঙালী পরিবারের উপযোগী সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন।

সিঁড়ির পাশে জুতা খুলে রেখে উঠলেম মন্দিরে। অকৃপণভাবে পুরোহিত দিলেন দেবীর পাদোদক, দিলেন নির্মাল্য ও প্রসাদকণিকা।

কলকাতার মতো মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্যুটপরা বাঙালীর উপস্থিতি এখানকার সমাজে পরিহাসের উদ্রেক করে না। কারণ বসনকে এখানে ব্যক্তির পরিধেয় বলেই গণ্য করে, মনোভাবের পরিচয়রূপে নয়। এটি সম্ভব হয়েছে শুধু শহরে বিভিন্ন পরিচ্ছদের মানুষের অবস্থিতির ফলে। এখানে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, পাঞ্জাবী সিং, মহারাষ্ট্রীয় বাঈ, বাঙালী বিধবা আসে প্রণাম নিবেদনে। তাদের বেশ, ভূষা, এমন কি বস্ত্র পরিধানের রীতিনীতি সমস্তই বিভিন্ন। তারা ভক্ত, এইটেই তাদের একমাত্র পরিচয়, পরিচ্ছদটা তাদের শীত, আতপ ও নগ্নতা নিবারণের উপকরণ মাত্র।

মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর। সেখানে শরৎকালে ত্রিপলঢাকা মণ্ডপে দুর্গা-পূজা হয় মহা আড়ম্বরে। বাঙালী ছেলে-মেয়েদের হাতেগড়া কারুশিল্পের প্রদর্শনী বসে। দিনের বেলায় বালকবালিকারা প্রায় প্রসাদ, নিশাযোগে থিয়েটারে গোঁপ কামিয়ে মিহি স্বরে মেয়ের পার্ট করে সখের দলের তরুণ সম্প্রদায়।

কালীমন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় কালীকীর্তন হয়। শ্যামাবিষয়ক গান, কীর্তনের পদ্ধতিতে মূল গায়েন ও দোহার মিলে গাওয়া হয়। রচনা ভক্তিমূলক, সুর বৈচিত্র্য-হীন। তাতে মহাজন পদাবলীর লালিত্য নেই, নেই সাধকের একক ভক্তিনিবেদনের গাম্ভীর্য ও আবেগ। জিনিসটা সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত এবং ভক্তিতন্ত্রের দিক থেকে অনাবশ্যক অনুকরণ। সব দিক দিয়েই অসার্থক। কালীর অঙ্গনে রামপ্রসাদী সুরে ভক্তের কণ্ঠে—'শ্মশান ভালো বাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি,' জাতীয় গানই হচ্ছে

শেষ কথা।

গানের আসরে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর পরিচয় ঘটল তাঁর নাম মোহিতকুমার সেনগুপ্ত, বয়স পঞ্চাশের ওপরে, শরীর অকৃশ, দৈর্ঘ্য সাধারণ বাঙালীজনোচিত, অডিট একাউন্টস সার্ভিসের লোক। সুদক্ষ অফিসার বলে খ্যাতি আছে সরকারী মহলে। বর্তমানে যানবাহন বিভাগের আর্থিক উপদেষ্টা। বেতন এবং পদমর্যাদা দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। এঁর আর দু'ভাইয়ের নাম বাংলাদেশে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সুপরিচিত। পরীক্ষার আগে এম্. সেনের ইকনমিক্স ও মিহির সেনের সিভিক্স পড়েনি এ-দশকে এমন বিদ্যার্থীর সংখ্যা বেশী নেই। ছাত্রজীবনে সেনগুপ্ত নিজেও প্রথিতযশা ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজীনের তিনি দ্বিতীয় ছাত্র-সম্পাদক।

ভদ্রলোক মৃতদার, অমায়িক এবং নয়াদিল্লীর বাঙালী সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত। বাঙালীদের সমুদয় ক্রিয়াকর্মে যোগ আছে ঘনিষ্ঠ। কীর্তনের আসরে তাঁর উপস্থিতি দেখা যায় অবধারিত।

ফ্লীট স্ট্রীটে আছে খবরের কাগজ, সেভিল রো'তে দরজী। নয়াদিল্লীর রিডিং রোডেও তেমনি মন্দির। একটি নয়, দুটি নয়, পর পর তিনটি। রাস্তাটার নাম টেম্পল স্ট্রীট হলে ক্ষতি ছিল না।

শ্রীযুগলকিশোর বিরলার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরটি বোধ করি ভারতবর্ষে বর্তমান শতাব্দীতে নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ দেবনিবাস। শুধু আকারে নয়, গঠন পরিপাট্যে ও অর্থব্যয়ের বিপুলতায় এর জুড়ি আছে বলে জানা নেই। দূর দূরান্ত থেকে আসে লোক। শুধু ভক্ত নয়, নিছক দর্শনাভিলাষীরাও। আসে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, পারসিক, খৃস্টান। আসে য়ুরোপীয় ও এমেরিকান টুরিস্ট। সকালে সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে নানা ভাবে, নানা দিক থেকে ফটো তুলে খালি করে ক্যামেরার স্পুল।

প্রায় বারো বছর আগের কথা। পিতৃনাম চিহ্নিত করে যুগলকিশোর স্থাপন করতে চাইলেন একটি মন্দির যেখানে হিন্দুমাত্রেরই থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার। বিরলাদের আদিবাস জয়পুরে, সেখানে এ-মন্দিরের সার্থকতা সীমাবদ্ধ। বছরে ক'জন লোক যায় সেখানে, ক'জন খবর রাখে সেখানকার? স্থান নির্বাচিত হলো দিল্লী, ভারতবর্ষের রাজধানী,—শুধু আজকের ভারতবর্ষের নয়, শত সহস্র বৎসর থেকে। এখানে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেছে মহাভারতের কুরুপাণ্ডব, বাস করেছে সংযুক্তা পৃথিরাজ। শিরিতে ছিল সম্রাট কুতবুদ্দিন, লাল কেল্লায় রাজদণ্ড ধরেছে বাদশাহ সাজাহান। যমুনার দুই তীরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আরাবল্লীর বনভূমি, অধুনা বিলুপ্ত জনপদের পথধূলিতে কত শক হূনদল, পাঠান, মোগল একদেহে হলো লীন। ভাবীকালের ভারতবর্ষেরও দিল্লী হবে নগরমালিকার মধ্যমণি। আর যাই হোক, স্বাধীন ভারতের রাজধানী হবে না ওয়ার্ধা।

উনিশ শ' বত্রিশ সালে শুরু হলো মন্দিরের নির্মাণ কার্য। বহু এঞ্জিনিয়র, বহু কর্মী, শত শত রাজমিস্ত্রী, মুটে মজুর খাটতে লাগলো ছ'বছর ধরে অবিশ্রাম। উনিশ শ' আটত্রিশ সালে সম্পূর্ণ হলো মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণের আরাধনার স্থান, ধনকুবের বিড়লা ভ্রাতৃবর্গের জনক রাজা বলদেও দাস বিড়লার নামে উৎসর্গীকৃত।

মন্দিরের গঠনভঙ্গীটি ভারতীয় স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। লাল পাথরের চূড়া,

ধারগুলিতে আছে গৈরিক। মনে হয় যেন লাল জমিতে গেরুয়া পাড়। রাজপথ থেকে শ্বেত পাথরের অতি বিস্তীর্ণ সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সেখান থেকে উঠেছে মন্দির। মেঝে ও দেয়ালে বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরখণ্ডের সমাবেশে রচিত বর্ণাঢ্য আলিম্পন ও পুষ্পসম্ভার। প্রাচীর গাত্রে আছে অজস্র ফ্রেস্কো পেইণ্টিং। জয়পুর শিল্প-বিদ্যালয়ের শিল্পীরা অঙ্কন করেছে সে-সব চিত্র। তাদের বিষয়বস্তু ও অঙ্কনচাতুর্য প্রশংসনীয়। জয়পুর শিল্পবিদ্যালয়ের যিনি অধ্যক্ষ—কোশল মুখার্জি—তিনি বাঙালী; নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলার উদ্ভাবক নন্দলাল, অসিতকুমার, সমর গুপ্ত প্রভৃতির সতীর্থ। বিড়লা মন্দিরটির পরিকল্পনায়ও আর একজন বাঙালী স্থপতির যথেষ্ট অংশ আছে, এ কথা জেনে আনন্দিত হওয়ার কারণ আছে আমাদের।

মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ আছে শ্বেতপাথরের। প্রত্যহ অগণিত নরনারীর কুসুমার্ঘে প্রায় আচ্ছন্ন তাঁর চরণ ও পাদপীঠ। দ্বারে লৌহ-পেটিকা, উপরের ছিদ্রপথে ভক্তেরা রাখে প্রণামী। মন্দিরের বাম পার্শ্বে বিরাট ধর্মশালা, সেটি বিড়লা জননীদের স্মৃতিরক্ষার্থে। ধর্মশালার সংলগ্ন নাট মণ্ডপ। তাতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভজন সংগীত করেন সুকণ্ঠ গায়ক। সহস্রাধিক শ্রোতা অনায়াসে বসতে পারে সে সভায়। মাইক্রো-ফোনের সাহায্যে বাইরে সর্বসাধারণের শ্রবণায়ত্ত করার ব্যবস্থাও নিখুঁত। মন্দির-প্রবেশের বহু দূরে থাকতেই কানে এল সে গান—শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজ মন হরণ ভব ভয় দারুণম।

মন্দিরের পিছনে একটি বৃহদাকার পার্ক। এটি পরবর্তী রচনা। সাধারণ লোকের চমকলাগার মতো অনেক আয়োজন আছে এই পার্কে। পাথরের বিরাটকায় হস্তী, তার শুঁড় দিয়ে ফোয়ারার জল ঝরছে ঝর ঝর ধারায়। আছে পাথরের কুমীর, তারও মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছে জল। ফোয়ারা, পুষ্পবীথিকা, কৃত্রিম স্রোতস্বতী ও গিরিগহ্বর প্রভৃতি একাধিক আকর্ষণ আছে বালক, বালিকা ও দেহাতীদের। প্রতিদিন অপরাহ্ন বেলায় ভিড় জমে তাদের। কেউ বসে বিশ্রামবেদীতে, কেউ দোলে দোলনায়, কেউ বা পরিক্রমণ করে এদিকে থেকে ওদিক। অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি শেঠ যুগলকিশোর। যুদ্ধপূর্বকালের অর্থমূল্যে মন্দির ও পার্কের নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা।

বিড়লা পরিবারের তিনজন, পাঞ্জাবের আর্য প্রতিনিধি সভার প্রতিনিধি তিনজন এবং স্থানীয় সনাতন ধর্মসভা থেকে তিনজন মিলে এক ট্রাস্ট। তাঁরাই রক্ষণাবেক্ষণ করেন মন্দির এবং তার সংলগ্ন উদ্যান, ধর্মশালা প্রভৃতি। আধুনিক মনোভাবের পরিচয় আছে পরিচালন ব্যবস্থায়। প্রতিনিধিরা প্রতি তিন বৎসরান্তে নির্বাচিত হন। ছোট খাটো ব্যাপারেও আধুনিকতার ছাপ আছে।

মন্দির প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে রাখবার ব্যবস্থাটি চমৎকার। সিঁড়ির ঠিক গোড়াতেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। দেয়ালে জুতা রাখার র‍্যাক। সেখানে জুতা জমা দিতে হয়। মালিককে দেওয়া হয় সংখ্যাঙ্কিত কার্ডবোর্ডের একটি চাকতি। অনুরূপ আর একটি চাকতি এঁটে রাখা হয় জুতার গায়ে, যাতে একজনের হাইহিল লেডি'স সু'র সঙ্গে অন্যজনের কাবুলী চপ্পল বদল না হয়ে যায়। চাকতি ফেরত দিলেই ঠিক নিজের জুতাজোড়া এনে হাজির করে জুতাঘরের কর্মচারী যেমন স্যাভয়, গ্রভনর বা কলকাতার গ্রেট ইস্টার্নে টুপী, ছাতা কিম্বা লাঠি।

মহাত্মা গান্ধী দ্বার উদ্ঘাটন করেন এ মন্দিরের। তাঁর চাইতে যোগ্যতর পুরোধা ছিল না এ-অনুষ্ঠানের। ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও হরিজনের সমান প্রবেশাধিকার যে মন্দিরে, তার দরজা তিনি খুলবেন না তো খুলবে কে? বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত রইল এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবাত্মার নাম।

বিড়লা মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে তৃতীয় মন্দিরটি মূলতঃ বিড়লাদেরই অর্থানুকূল্যে নির্মিত। সেটি বৌদ্ধদের। বাঙালী কালীমন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের মাঝখানে এই ক্ষুদ্র মন্দিরটির অবস্থিতি ও গঠন কারুর দৃষ্টি এড়াবার নয়। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান তথাগতের ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি। পীতবসন ভিক্ষু আছেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে একজন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কবির স্মৃতিচিহ্নরূপে একটি বকুল বৃক্ষ রোপন করেছিলেন মন্দিরাঙ্গনে। রবি-বকুল বৃক্ষ রোপনানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন বাঙালী ঐতিহাসিক। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। ভারত সরকারের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষক, কিপার অব ইম্পিরিয়েল রেকর্ডস।

সেন মহাশয় এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাসে তাঁর গবেষণার মূল্য ঐতিহাসিক মণ্ডলীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। স্ফীত বেতনের সরকারী চাকুরীতে অনায়াস জীবন যাপন করেও যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাহিত্যচর্চা করেন এবং অক্সফোর্ডের ডিগ্রী পাওয়ার পরেও যে স্বল্পতর ঐতিহাসিক বাংলায় ইতিহাস রচনা করেন, বঙ্গবাণীর সে সেবকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সেন বিশিষ্ট। এঁর পৈতৃকবাস বরিশাল জেলায়। বাচন ভঙ্গীতে তার আভাস পাওয়া যায়।

রিডিং রোডের একপাশে মন্দির, অন্যদিকে কোয়ার্টার। গভর্নমেণ্টের কেরানী ও অনুরূপ কর্মচারীদের বাসস্থান। লম্বা একটানা ব্যারাক, কোনটার ইংরেজী L অক্ষরের মতো একপ্রান্ত প্রসারিত, কোনটার বা E 'র মতো আকৃতি, শুধু মাঝখানের বাড়ীটুকু বাদ। সামনে খানিকটা মাঠ। মন্দির ও কোয়ার্টার,—সুন্দর এবং কুৎসিতের এত নিকট অবস্থিতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর নয় কোনোখানে। এক একটা ব্যারাকে ত্রিশ, চল্লিশটি পরিবারের বাসব্যবস্থা। অল্প বেতনের কর্মচারীদের জন্য সুলভ সরকারী আয়োজন। এ-পাড়াটা নয়া দিল্লীর ইস্ট য়েণ্ড।

দেখতে ভালো না হলেও থাকতে মন্দ নয় এই কোয়ার্টারগুলি। বিশেষ করে সুলভতা বিচার করলে অভিযোগ করার উপায় থাকে না। বেতনের এক দশমাংশ ভাড়া। মাসের শেষে আপিস থেকেই কেটে নেয় নিয়মিত। সেক্রেটারিয়েটের কেরানীদের সর্বনিম্ন বেতন ষাট টাকা। সুতরাং ছ'টাকা ভাড়ায় বাড়ি। দু'খানা শোবার ঘর, একখানা রান্নার, একটি ভাঁড়ার। ভিতরে একটু উঠান, বাইরে ছোট বারান্দা। জলের কল আছে, বাথরুম আছে, আছে ইলেকট্রিক আলো এবং—চমকে উঠো না যেন,—আছে বড় একটি সিলিং ফ্যান। বাড়িতে রোদ আসে, বাতাস আসে এবং ধূলিরও বাধা নেই। কলকাতা শহরে এমন ভাড়ায় এমন বাড়ি কোটিকে গুটিক মিলে না।

শুধু বাড়ি নয়। ফার্নিচারও। বিবাহ সভায় সালঙ্কারা কন্যার মতো গভর্নমেণ্টের বাড়িও আসবাবপত্রসহ পাওয়া যায়। সেন্ট্রাল পি. ডব্লিউ. ডি'র ফার্নিচার। দু'টাকা মাসিক ভাড়ায় পাওয়া যায় দু'খানা তক্তাপোশ, একটি আলমারি, একটি টেবিল ও তিনখানা চেয়ার।

এক একটা ব্যারাক ও তার সামনে খোলা মাঠটুকু নিয়ে এক একটা 'স্কোয়ার'।

অধিকাংশই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের নামের দ্বারা গৌরবান্বিত। ক্লাইভ স্কোয়ার আছে সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের নামে যিনি পলাশীর আম্রকাননে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। যিনি আশী টাকা বাৎসরিক বেতনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কেরানীরূপে ভারতবর্ষে এসে দেশে ফিরেছিলেন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনশালীরূপে। ১৭৪৪ সালে মাদ্রাজে আগত খ্যাতিহীন, বিত্তহীন রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬০ সালের ৯ই মে যখন সেনা নায়ক ক্লাইভ রূপে প্রত্যাবর্তন করলেন ইংলণ্ডে, জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন পোর্টসমাউথ বন্দরে, তখন ইংলণ্ডের এ্যানুয়েল রেজিস্ট্রারে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য ছিল,—"এই কর্নেলের কাছে নগদ টাকা আছে প্রায় দু' কোটি, তাঁর স্ত্রীর গহনার বাক্সে মণিমুক্তা আছে দু' লাখ টাকার। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডে তাঁর চাইতে অধিকতর অর্থ নেই আর কারো কাছে।"

স্কোয়ার আছে লর্ড ডালহৌসীর নামে, যিনি একে একে পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ যোগ করলেন ভারত সাম্রাজ্যে, জোর করে দখল করলেন পেশোয়াদের সাতারা, কেড়ে নিলেন ঝাঁসী, নাগপুর, নিজামের বেরার, নবাব ওয়াজেদ আলী শা'র কাছ থেকে অযোধ্যা।

স্কোয়ার আছে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নামে, যিনি কাশীনরেশ চেৎসিংহের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন বহু লক্ষ মুদ্রা, অযোধ্যায় বেগমদের পীড়ন করে অর্থ ও মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন ন্যূনাধিক দেড় কোটি টাকার। যার কুশাসন ও কুকার্যের সুদীর্ঘ তালিকা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিচারসভায় অভূতপূর্ব বাগ্মিতায় উদ্ঘাটিত করেছিলেন এড্মুণ্ড বার্ক। সে অপকীর্তির রোমহর্ষক বর্ণনা শুনে পার্লামেণ্টকক্ষে দর্শকের গ্যালারীতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন একাধিক ইংরেজ রমণী।

আর আছে সিপাহী যুদ্ধের ছোট বড় মাঝারি ইংরেজ সেনাপতিদের নাম। হেভলক্ স্কোয়ার, আউটরাম স্কোয়ার, উইলসন স্কোয়ার, নিকল্সন্ স্কোয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। স্কোয়ার নেই শুধু মেজর জেনারেল হিউয়েটের নামে যিনি ১৮৫৭ সালের ৯ই মে মীরাট সেনানিবাসে ৮৫ জন ভারতীয় সিপাহীকে হাতে পায়ে লোহার শক্ত বেড়ী পরিয়ে সমস্ত সৈন্যদলের সামনে লাঞ্ছিত করেছিলেন। সেদিন নিরুপায় ভারতীয় সিপাহীরা দাঁড়িয়ে দেখেছিল তাদের সঙ্গীদের এই অবমাননা। তাদের মুখে ছিল না প্রতিবাদ, কিন্তু চোখে ছিল আগুন। সে আগুন সহজে নেভেনি।

পরদিন রবিবার। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসন্ন রজনীর ঈষৎ অন্ধকার নামল মীরাটের ছাউনিতে। ব্রিটিশ সৈন্যেরা তৈরী হয়েছে চার্চ-প্যারেডের জন্য। ভারতীয় সৈন্যরা করছে কী? বোধ হয় বিশ্রাম। এমন সময় অকস্মাৎ আওয়াজ এল,—

গুড়ুম!

পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরেছে বৃটিশ সেনানায়কদের ঠিক ললাটে। বন্দুকের ঘোড়া টিপছে ক্লিক্, ক্লিক্, ক্লিক্। আকাশ, বাতাস, প্রাচীর ও প্রান্তর কাঁপিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে গুড়ুম! গুড়ুম!! গুড়ুম!!!

উত্তর ভারতে সিপাহী যুদ্ধের সেই হলো প্রারম্ভ।

নেতৃত্ববিহীন অসংঘবদ্ধ পরিচালনা, পরিকল্পনাবিহীন পদ্ধতি, বিভিন্ন অংশে যোগাযোগশূন্যতা এবং কেন্দ্রীয় নির্দেশের অভাবে ব্যর্থ হলেও একথা আজ স্বীকার করতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার ও স্বরাষ্ট্র গঠনে ভারতীয়দের সেই প্রথম উদ্যোগ।

মীরাটের সিপাহীরা ঘোড়া ছুটিয়ে পরদিন প্রভাতে এসে পৌঁছল দিল্লীতে। বাদশাহ বাহাদুর শাহ তখন দিল্লীর মসনদে। বাবরের বিক্রম, আকবরের ব্যক্তিত্ব বা আওরঙ্গজেবের রণকুশলতার লেশ ছিল না এই বৃদ্ধ মুঘল সম্রাটের চরিত্রে। সিপাহীদের শৌর্য, শক্তি ও যুদ্ধোপকরণ কাজে লাগাবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। জনসাধারণের সংগ্রামোন্মুখ ব্রিটিশ-বিদ্বেষকে সফল পরিণতি দান করতে পারলেন না তিনি।

দিল্লীর পরিধি সাত মাইল। অধিবাসীরা উত্তেজিত। ইংরেজের শিবিরে শিক্ষিত ও ইংরেজেরই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চল্লিশ হাজার রণনিপুণ সিপাহী তার পাহারা। নগর প্রাচীরের উপরে চৌদ্দটি বৃহদাকার কামান। দুর্গাভ্যন্তরে বৃহত্তম বারুদখানা। তা ছাড়া আছে আরও ষাটটি ছোট ছোট কামান। আছে বহু সুদক্ষ গোলন্দাজ; —বেশীর ভাগই দু'দিন পূর্বে ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদলভুক্ত। তারা য়ুরোপীয় যুদ্ধরীতিতে সুশিক্ষিত, সুনিপুণ এবং সুশৃংখলাবদ্ধ। দিল্লী দুর্গকে সুরক্ষিত করেছে ভারতীয় এঞ্জিনিয়রেরা যারা আধুনিকতম এঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান লাভ করেছে ইংরেজের সেনাবাহিনীতে। দিল্লী অধিকারের ক্ষীণতম আশার কারণ ছিল না 'রীজে' সমবেত ব্রিটিশবাহিনীর মনে। লেশমাত্র যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা ছিল না দুর্গপতনের।

কিন্তু তবুও সিপাহীরা হারল। দিল্লী দখল করল ইংরেজ। ভারতে মুশ্লিম রাজত্বের ঘটল সমাপ্তি। শতবর্ষ পূর্বে নির্মিত সম্রাট সাজাহানের লাল কেল্লার শীর্ষে উত্তোলিত হলো ব্রিটিশ পতাকা।

নগরপ্রান্তে 'রীজের' ইংরেজ-শিবিরে সৈন্য সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজারের সামান্য কিছু বেশী। এরা সবই য়ুরোপীয় নয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছিল ভারতীয় সেপাই। আড়াই হাজার সৈন্য—বলা বাহুল্য, তারাও ভারতীয়—পাঠিয়েছিলেন ইংরেজানুরাগী দেশীয় রাজন্যবর্গ। তাঁদের জন্য আজ একুশ, এগারো বা পাঁচ সাত করে তোপধ্বনির বিধি আছে।

কর্নাল থেকে গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডে ব্রিটিশবাহিনী এসে শিবির স্থাপন করল 'রীজে', যেখানে এখন দিল্লী য়ুনিভার্সিটি। বর্তমান সবজীমণ্ডীতে ঘটেছে দীর্ঘকালব্যাপী অনেক খণ্ড যুদ্ধ। ইংরেজ সৈন্যদের সেই অস্থায়ী আবাস ভূমিতে পরে রচিত হয়েছে পুরাতন ভাইসরিগ্যাল লজ। সেখানে বসে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রির বা ইকনমিক্সের নোট টোকে। তারই অনতিদূরবর্তী একটি ভবনে উনিশ শ চব্বিশ সালে তিন সপ্তাহের অনশন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী,—দিল্লীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদকল্পে। প্রথম সর্বদল মিলনের প্রচেষ্টায় সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন পণ্ডিত মালবীয়জি।

ইংরেজ জানতো, অনতিবিলম্বে দিল্লী অধিকার করতে না পারলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হবে চিরতরে। তাই সর্বস্ব পণ করল তারা। জিতি তো বাদশাহ, হারি তো ফকির। ব্রিগেডিয়ার আর্কডেল উইলসন তখন ব্রিটিশ শিবিরের অধিনায়ক। তিনি জয় সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন না।

গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা অতীত, শরতের প্রথমার্ধও বিগতপ্রায়। অর্ধেকের উপর ইংরেজ সৈন্য জ্বর, উদরাময় ও অন্যান্য ব্যাধিতে রুগ্ন। পাঞ্জাব থেকে সেনাপতি লরেন্স ক্রমাগত উৎকণ্ঠিত পত্র পাঠাচ্ছেন,—আর কতদিন? দিল্লী বিজয়ের আর বিলম্ব

কত ? সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র পাঞ্জাবেই সিপাহীরা তখনও আছে অনুগত, আম্বালার সেনানিবাসে দেখা দেয়নি বিক্ষোভ। কিন্তু আর বেশী দিন শান্তি রক্ষা কঠিন হবে না। দিল্লী, দিল্লী, দিল্লীর উপরেই নির্ভর করছে ভারতবর্ষে জন্ কোম্পানীর ভাগ্য।

অবশেষে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ফিরোজপুর থেকে হস্তিপৃষ্ঠে বাহিত প্রচুর গোলা বারুদ ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র এসে পৌঁছল 'রীজে'র ছাউনীতে। ব্রিটিশ-সেনানায়কদের প্রাণে ফিরে এল ভরসা, মনে এল সাহস। সেনাপতি উইলসনকে অতিক্রম করে যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করল জন্ নিকলসন।

চৌদ্দই সেপ্টেম্বর। রাত্রি প্রায় নিঃশেষিত, যদিও আলোর রেখা দেখা দেয়নি আকাশে। ইংরেজবাহিনী আক্রমণ করল দিল্লী দুর্গ। পূর্ববর্তী ছয় দিন দিবারাত্রি ব্যাপী গোলাবর্ষণের দ্বারা নগর প্রাচীর বিধবস্ত করা হয়েছে ধীরে ধীরে,—মূল আক্রমণের মুখবন্ধরূপে। কাশ্মীরী গেটের দিকে খণ্ড খণ্ড দলে হানা দিল ইংরেজের সৈন্য। দুই পক্ষের কামান গর্জনে দুরু দুরু কম্পিত হলো দূর দূরান্তের গৃহগবাক্ষ, তাদের অগ্নিবর্ষণের রক্তিম আভায় সীমন্তিনীর সিঁথির মতো রঞ্জিত হলো প্রভাতের বিস্তীর্ণ আকাশ।

এই মরণপণ যুদ্ধ চলল প্রহরের পর প্রহর। অবশেষে বিকট শব্দে কাশ্মীরী গেটের রুদ্ধদ্বার বিধবস্ত হয়ে পড়ল ধূলায়।

এঞ্জিনিয়র বিভাগের ক্ষুদ্র একটি দল সরীসৃপের মতো বেয়ে উঠেছে প্রাচীরে। বিস্ফোরকে অগ্নি সংযোগের দ্বারা বিচূর্ণ করেছে সুদৃঢ় কাশ্মীরী গেট। তাদের অমানুষিক সাহসের ফলেই জয়লাভ সম্ভব হলো ইংরেজের। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন, এই দলের মধ্যে আটজন ছিল ভারতীয়।

সেই ভগ্নদ্বার পথে জয়দৃপ্ত ব্রিটিশবাহিনী প্রবেশ করল ভীমবেগে। বিপক্ষকে অক্রমণ করল দ্বিগুণ তেজে। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেনাপতি নিকলসন পরিচালনা করছিলেন সেই সৈন্যদল। জনৈক সিপাহী নিশানা করল তাঁকে। মুহূর্তে আর্তনাদ করে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল নিকলসন। গুলী লেগেছিল তার কপালে।

পরাজিত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ পলায়ন করলেন দুর্গ থেকে। আত্মগোপন করলেন দিল্লী প্রাসাদের চার মাইল দক্ষিণে হুমায়ুনের সমাধি সৌধে। সেখানে এক মুসলমান ফকিরের নিলেন আশ্রয়। জনশ্রুতি এই যে, সেই ফকিরই তাঁকে ধরিয়ে দিলেন ইংরেজের গুপ্তচর বিভাগের এক তরুণ কর্মচারী হডসনের হাতে।

হামা আজ দস্তে
গয়েঁর নালা কুনান্দ্,
শাদী, আজ দস্তে
খেশ্‌তান ফরিয়াদ্।

নিজের হাতই যখন নিজের গালে চড় বসিয়ে দেয়, তখন, হে শাদী, অপরের হাতে মার খাওয়া নিয়ে আর খেদ করে লাভ কী!

বন্দী সম্রাটকে হড্‌সন্ পালকী করে নিয়ে এল দিল্লীতে। সেখানে বিচার হলো তাঁর। দণ্ড হলো নির্বাসন। ব্রহ্মদেশে। সেখানে পাঁচ বছর পরে বন্দীদশায় জীবনান্ত ঘটল তাঁর। হতভাগ্য বাহাদুর শাহ,—ভারতের শেষ মুস্লিম সম্রাট!

ঠিক যেখানে বাহাদুর শাহ ধৃত হন, হুমায়ুন'স টুম্বেই পরদিন হডসন গ্রেপ্তার

করল আর তিনটি পলাতক। বাহাদুর শাহের দুই পুত্র ও এক পৌত্র। তাঁরা স্বেচ্ছায়ই ধরা দিয়েছিলেন। তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁদেরও বিচার হবে বাহাদুর শাহের মতো।

হডসন তাঁদের একটি ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে এল দিল্লীতে। দিল্লী গেটের কাছে এসে হডসন থামাল সে গাড়ী। বন্দুক নিয়ে নিজ হাতে পর পর গুলী করল বন্দীদের ঠিক বুকের মাঝখানে। রাজরক্ত ঝর ঝর ধারায় গড়িয়ে পড়ল দিল্লীর ধূলি-ধূসর পথে। মৃতদেহ নিয়ে চাঁদনী চকের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকাশ্য প্রদর্শনী রূপে রাখা হলো তিন দিন। সম্রাটবংশধরদের বিকৃত মৃতদেহ দেখে শিউরে উঠল, পথচারীর দল, বারংবার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মার্জনা করল নিঃশব্দে।

সাত

সাধ্বী স্ত্রী, পিতৃভক্ত পুত্র, ভ্রাতৃবৎসল অনুজ এবং প্রভুপ্রাণ সেবকের দৃষ্টান্ত আছে আমাদের পুরাণ ইতিহাসে একাধিক। জনকতনয়া সীতা, দশরথাত্মজ রামচন্দ্র, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং রামানুচর হনুমানের কাহিনী জানে এদেশের আপামর সাধারণ। কিন্তু পত্নী-অনুগত স্বামীর উদাহরণ জানতে চাও তো সর্বাগ্রে দেখে আসা প্রয়োজন ন'মাসিমার বান্ধবী ইন্দুমতী রায়ের বর প্রিয়নাথবাবুকে। ইন্দুমতীচরণ-চারণ-চক্রবর্তী শ্রীপ্রিয়নাথ রায়।

প্রাগবৈবাহিক জীবনের পরিচয়লিপিতে ইন্দুমতী ছিলেন দাসগুপ্তা। গোখলেতে পড়েছেন ইংরাজী, সঙ্গীত সম্মিলনীতে শিখেছেন সেতার। ফুল শিলভসের ব্লাউজ গায়ে দিয়ে মাঘোৎসবের দিনে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় করেছেন গান—প্রভু, তুমি আমাদের পিতা। তাঁর এক দাদা রেলের অফিসার, অন্য ভাই ব্যারিষ্টার।

ইন্দুমতীর বাবার সিন্দুকে রূপা ছিল প্রচুর, কিন্তু নিজের দেহে রূপ ছিল না একটুকুও। ফলে কয়েক বছর আই. সি. এস, বিলাত ফেরত, ডেপুটি প্রভৃতির জন্য অযথা অপেক্ষার পর অবশেষে যৌবনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে এক শুভ মাঘে মাসি শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ কন্ঠলগ্না হলেন প্রিয়নাথবাবুর। বিয়ের পরে কনের বদল হলো পদবী, বরের বৃদ্ধি হলো পদ। এ্যাসিস্ট্যাণ্ট থেকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। পয় আছে বটে আমাদের ইন্দুমতীর।

প্রিয়নাথবাবু তাঁর স্ত্রীর নাথ তো নিশ্চয়ই, বোধ করি প্রিয়ও হবেন। হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার পক্ষে—। থাক সে কথা। আমি তো আর তাকে জামাই করছি নে।

মহাদেও রোডে প্রিয়নাথবাবুর বাড়িটি 'বি' টাইপ কোয়ার্টার। নয়া দিল্লীতে বাজারে ডিম থেকে শুরু করে বসত বাড়ি পর্যন্ত সবই গ্রেড করা। এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। হীরার বিচার ঔজ্জ্বল্যে, মসলিনের বিচার সূক্ষ্মতায়। সরকারী কর্মচারীর মূল্য নিরূপিত হয় বেতনে। পি. ডাব্লিউ. ডি'র খাতায় বেতন অনুযায়ী ভাগ করা আছে বাড়ি। পাঁচ শ' থেকে ছ' শ' টাকা মাহিনার কর্মচারীর জন্য 'এ' টাইপ কোয়ার্টার, চার শ' থেকে পাঁচ শ' ওয়ালারা পায় 'বি'। ছ' শ'র উপরে মাইনে যাদের

তারা পায় বাংলো। তারও শ্রেণী বিভাগ আছে। শুধু গঠন বা ব্যবস্থায় নয়, অবস্থানেও। ঠিকানা শুনেই বলে দেওয়া যায় লোকটার বেতনের পরিমাণ। হেস্টিংস রোডের বাসিন্দা পায় তিন থেকে চার হাজার, তোগলক রোডে তার নীচে। এক হাজারের বেশী না পেলে বাংলো মেলে না রাইসিনা রোডে।

নম্বর মিলিয়ে সন্ধান করলেম বাড়ির। বারান্দার পাশের ঘরে আধময়লা গেঞ্জি গায়ে একটি ভৃত্য ইলেকট্রিক ইস্ত্রি দিয়ে একখানা চকোলেট রং-এর বেনারসী শাড়ির পরিচর্যায় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করলেম, "এইটে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি ?"

"হ্যাঁ, মিস্টার রায়ের বাড়ি।"

গলার স্বরে বিরক্তি এবং কপালে কুঞ্চিত রেখার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল বাবু সম্বোধনটা শ্রোতার পক্ষে শ্রবণসুখকর নয়। সুতরাং ভ্রম সংশোধন করতে হলো।

"মিস্টার রায়কে একটু খবর দিতে পার ?"

"আমিই মিস্টার রায়।"

গড সেভ দি কিং ! মিসেস ইন্দুমতী রায়ের স্বামী যে সকাল আটটার সময় শাড়ি ইস্ত্রি করবেন তা' কল্পনা করব কেমন করে ? কিন্তু এখন তো আর ফিরবার উপায় নেই। ন' মাসিমার সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যক্ত করতে হলো, দিতে হলো সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়। মিস্টার রায় অন্দর থেকে যথারীতি নির্দেশ লাভ করে ড্রয়িং-রুমে নিয়ে বসালেন। 'উনি' চান করছেন, আসতে বিলম্ব হবে না আশ্বাস দিলেন।

ড্রয়িং-রুমটির মেঝেতে সতরঞ্জি পাতা, তার উপরে ছোট মির্জাপুরী কার্পেট। টিপাই-এর উপরে পুষ্পহীন জাপানী কাঁচের ফুলদানী। এক কোণে একখানা ভাঁজকরা কেম্বিসের ইজিচেয়ার। মাথার কাছটা উপবেশনকারীদের তৈলশিক্ত শিরের অজস্র চিহ্নের দ্বারা মলিন। দেয়ালে কাঁচ দিয়ে বাঁধানো খান দুই সূচীশিল্পের নমুনা। এই সিবন কারুকর্মের শিল্পীর পরিচয় সম্পর্কে দর্শকের মনে পাছে কিছুমাত্র সংশয় ঘটে সেজন্য বড় বড় হরফে এক কোণে লেখা আছে 'ইন্দু'। একটাতে একটা ঝুরি, তাতে কয়েকটি গোলাপ ফুল। আর একটাতে একটা বিচিত্র বর্ণের কুকুর। লাল, নীল, সবুজ, হলদে রং-এর যদৃচ্ছ এবং অকুণ্ঠ ব্যবহার ; 'ভিবজিওর' বললেই হয়। কুকুরটির মাথার উপরে ইংরেজী অক্ষরে লেখা,—গড ইজ গুড। বোঝা গেল গৃহস্বামিনী ধর্মশীলা। কিন্তু সেটা প্রমাণের জন্য তো সারমেয়র প্রয়োজন ছিল না। বোধ করি, লেখার ভুল। ডগ ইজ গুড হবে।

প্রিয়নাথবাবুর সঙ্গে খানিক আলাপ করা গেল। আলাপ অর্থে তিনি বক্তা, আমি শ্রোতা প্রায় সবটাই 'উনি' প্রসঙ্গ। উনি আবার বিছানায় এক পেয়ালা গরম চা না পেলে উঠতে পারেন না। উনি রোজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুরকে চাল ডাল মেপে দেন। বাজারের খাবার উনি বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেন না। নয়াদিল্লী বঙ্গ মহিলা সমিতির যা কিছু তা তো সব উনিই করেন। লেডী মিত্র তো উনি ছাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইন্দুমতী রায়ের প্রবেশ। মিঃ রায়ের উত্থান। এটা ইংরেজী রীতি।

গৃহস্বামিনী রায় আসন পরিগ্রহণ করলেন। প্রথমে গৃহে স্থানাভাবের বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন। তবে ছ'মাস পরেই গুরুদ্বোয়ারা রোডে বাংলো পাওয়ার আশা আছে। এ-বাড়িতে ঘরদোর ইচ্ছেমতো সাজাতে পারেননি। তবুও তো সিমলা

থেকে যে আসবাবপত্র এনেছেন তার সব এখনও প্যাকিং খোলা হয়নি (সিমলা থেকে এসেছেন এই পাঁচমাস হলো)। ফি বছর দিল্লী-সিমলা করেন। গ্রীষ্মকালে দিল্লীতে এই প্রথম। এবার গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার শৈল-বিহার বন্ধ। নতুন কমাণ্ডার-ইন-চীফ নাকি বলেছেন, সিমলা গেলে যুদ্ধ জয়ে বিঘ্ন ঘটবে। শোন একবার যত অনাসৃষ্টির কথা! আরও বেশী গরম পড়লে কিন্তু তিনি সিমলা না গিয়ে পারবেন না, তা' বাপু, তোমরা যাই বল না কেন।

বেবী—অর্থাৎ ন' মাসিমা এখন আছে কোথায়? তার মেয়ের বিয়ে কত দূর? ছেলে পড়ে কোন ক্লাশে? তাঁর নিজের চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস কম। অবসরও পান না। কত ঝামেলা! এই তো আজ চারটায় আছে এক পার্টি। হ্যাঁগা শাড়িটা ইস্তিরি করে রেখেছে তো? প্রিয়নাথবাবুর প্রতি।

হাতের ঘড়ির পানে তাকিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেম।

এখনই উঠবে? হ্যাঁ, বেলা হয়েছে বটে। আছ ক'দিন? দিল্লী থেকে যাবে কোথায়? বিলেতে কী হলো? যুদ্ধ না থামলে তো আর যেতে পারছ না। বমিং-এর সময় লণ্ডনে ছিলে বুঝি? সেখানকার অবস্থা কি রকম? বাজারে ড্রিন স্যাম্পু পাওয়া যায়? ট্যাঙ্গি লিপস্টিক? এখানে তো ছাই কিচ্ছু মিলে না! আচ্ছা, একটু চা টাও তো খেলে না। ওর আবার আপিসের বেলা হচ্ছে, আচ্ছা আর একদিন এসে খেয়ে যেও কিন্তু।

আরও একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার ফরমাশ ছিল। ঠিকানা জানা ছিল না। প্রিয়নাথবাবু, থুড়ি, মিস্টার রায়কে জিজ্ঞাসা করলেম,—"ভি. আর. ভেঙ্কটশরণের বাড়িটা কোথায় জানেন? কোন্ ডিপার্টমেন্টের যেন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী?"

"প্রচণ্ড বিস্ফোরণ" বলে একটা কথা বাংলা পত্রিকায় আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। সেটা ঠিক কি রকম জানা ছিল না। প্রিয়নাথ রায়ের অবস্থা দেখে কিছুটা অনুমান করতে পারলেম।

"এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী! ভেঙ্কটশরণ বলেছে বুঝি? চাল, কেবল চাল। চাল দিতে দিতেই গেল মাদ্রাজীটা। জানে, আপনি নতুন লোক, ধরতে পারবেন না। এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, হুঃ। রিটায়ার করার দু'-এক বছর আগে যে হতে পারে সে তো ভাগ্যবান। এখন যুদ্ধের বাজার। তাই সেকেণ্ড ডিভিশন ক্লার্কেরা পর্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হচ্ছে। নইলে মশাই, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হতেই যে চুলে পাক ধরে। আমি যেবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হলেম, উডহেড সাহেব,—সার জন উডহেড, পরে বাংলা-দেশের গভর্নর অবধি উঠল,—ডেপুটি সেক্রেটারী। ডেকে বললেন, "রয়, তোমার মতো এমন কাজের লোক—।"

অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেম। অনিচ্ছাক্রমে এবং নিজের অজ্ঞাতেও যে অপর লোকের মনস্তাপের কারণ হতে হয়, তারই দৃষ্টান্ত।

ভেঙ্কটশরণের গৃহ আছে, গৃহিণী নেই। থাকলে বিপদ ছিল। তিনি প্রাচীন-পন্থী হলে তাঁকে গলায় দড়ি দিতে হতো, আধুনিকা হলে প্রথমে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে পলায়ন ও পরে বাংলা সিনেমায় নায়িকা। মাতাল বর নিয়ে ঘর করা যায়, কলহ করা যায় অন্যানুরাগী স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু উদাসীন ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য নেই জগতে। প্রেম ভালো, বিদ্বেষ দুঃখের, কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক ইণ্ডিফারেন্সে—

যে কাছেও টানে না—দূরেও ঠেলে না—শুধু ভুলে থাকে।

ভক্তেরা বলেন, ধ্যান, জ্ঞান নিদিধ্যাসন সমস্তই ভগবানে উদ্দিষ্ট না হলে ঈশ্বর লাভ ঘটে না। বরদারাজলু ভেঙ্কটশরণ ভগবান প্রাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব নন। কিন্তু ভক্তের ঐকান্তিকতা নিয়েই আরাধনা করছেন সেক্রেটারিয়েটের। আপিস, আপিস, আর আপিস। কাজ, কাজ আর কাজ।

সকালে সাড়ে ন'টায় সবে মাত্র ফরাস যখন ঘর ঝাঁট দিয়ে গেছে তখন এসে বসেন টেবিলে। অপরাহ্ন গড়িয়ে যায় সন্ধ্যার আঁধারে, ঊর্ধ্ব ও অধস্তন কর্মচারীরা চলে যায় নিজ নিজ বাসায়, সহকর্মীরা একে একে করে প্রস্থান। একা ভেঙ্কটশরণ কাজ করে যান অনন্যমনা। বাড়ি ফিরেন কখন রাত আটটায়, কখনও বা তারও পরে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত ঐ একই ধারা। ছুটি নেই, ক্যাসুয়েল লীভ নেই। রবিবারে দুপুরে অনেক দিন চলে আসেন আপিসে। ফাইল নিয়ে লেখেন নোট, ফ্লাগ দিয়ে দাগ দেন, "ফ্রেশ রিসিট" অথবা "পি. ইউ. সি.—পেপার আণ্ডার কনসিডারেশন।" বন্ধু বান্ধবেরা ঠাট্টা করে বলে, ভেঙ্কট, কেবল খেটেই গেলে, জীবনটা ভোগ করবে কখন ?

ভেঙ্কটশরণ হাসেন আর ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়েন। বোধ হয় মনে মনে বলেন, কী আহাম্মক! হোয়াট্‌ে ফুল-অ! ভোগ? হুঃ, থার্ড ডিভিশন ক্লার্ক থেকে সেকেণ্ড, সেকেণ্ড থেকে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট থেকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট থেকে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী। অনেকটা পাল্লা। ভোগের জন্য জীবন তো আছেই পড়ে। চাই প্রমোশন, চাই উন্নতি। চাকুরি রে তুহু মম শ্যাম সমান।

ভেঙ্কটশরণের এক অনুজ ছিলেন বিলাতে। আই. সি. এস. মানসে। সেখানেই পরিচয়। ভাই-এর অধ্যবসায় লক্ষ্য করেছি তাঁরও চরিত্রে। আশা করি, একদা সিভিল লিস্টের পাতায় নাম ছাপা হবে সগৌরবে।

ভেঙ্কটশরণের স্বজাতিয়েরা নয়াদিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারত সরকারের দপ্তর গোড়াতে ছিল কলকাতায়। লালদীঘির কাছে যে বাড়িতে এখন বাংলার লাট থাকেন, সেখানে বসতি ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে লর্ড হার্ডিঞ্জের। তখন সেক্রেটারিয়েটে বাঙালী ছিল বহু। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লীতে। তখন থেকে তাদের সংখ্যা হয়েছে হ্রাস, অতঃপর পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটি নানা জাতি এসেছে ধীরে ধীরে। দখল করেছে চাকরির মসনদ। সে অভিযানে মাদ্রাজীরা সর্বাগ্রে। তারা খাটে বেশি, কথা কয় কম, ফাঁকি দেয় কদাচিৎ।

নয়াদিল্লীতে মাদ্রাজীদের ক্লাব আছে, সংঘ আছে, স্কুল আছে। বোর্ডিংহাউসও আছে একাধিক। সেখানে স্কুলের ডেস্কের মতো ছোট ছোট টেবিল। তার উপরে কদলীপত্রে আহার। চার আনায় মিলে স্বাথম, কুটু, সম্বর ও আপ্পালম। একজন তামিল বা অন্ধ্র দেশীয়ের নিয়মিত খাদ্য। কোনোদিন ওর সঙ্গে পাওয়া যায় তৈয়র-পত্‌চাত্তি অর্থাৎ নারকেলের কঁাচ সহযোগে দৈ। সেদিন তো রীতিমতো ভুরিভোজন।

শুধু অশনে নয়, বসনেও যথেষ্ট মিতাচারী দাক্ষিণাত্যের লোক। একখানা চাদর দ্বিখণ্ডিত করে হয় পরিধেয়, একটি সাধারণ ফতুয়া গাত্রাবরণ। কাঁধে একটি তোয়ালে, পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডেল। ব্যস্। আপিস ছাড়া সর্বত্র স্বচ্ছন্দচিত্তে চলাফেরা করে এই বেশে। আর যাই হোক, পোষাক নিয়ে শোক করে না মাদ্রাজী কোনদিন।

তাদের মেয়েদেরও সজ্জা বাহুল্যবর্জিত। ভূষণ পরিমিত। অবশ্য সংখ্যায়। মূল্যে নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত মাদ্রাজী গৃহিণীরও কানে আছে হীরার ফুল। তার দাম শুনে অনেক বাঙালী স্বামী চোখে সর্ষে ফুল দেখবেন। বেশীর ভাগ মাদ্রাজী তরুণীদের রূপ নেই, কিন্তু রুচি আছে। তাদের গৃহদ্বার সকালে সন্ধ্যায় আলিম্পনের দ্বারা সুদৃশ্য, তাদের কবরীবন্ধন পুষ্পস্তবকে সজ্জিত। সঙ্গীতে দক্ষতা আছে প্রায় সবারই।

সদ্য পরিচিত একজন পদস্থ মাদ্রাজীর গৃহে আমন্ত্রণ ছিল ডিনারের। ভদ্রলোক দু'হাজার টাকা মাইনে পান। অথচ আহারের আয়োজন দেখে রসনার বদলে চক্ষু জলসিক্ত হওয়ার উপক্রম। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পারদর্শিতা আছে বীণা বাদনে। অপূর্ব সুর সৃষ্টি করলেন তারযন্ত্রে। জঠর যদিবা রইল অভুক্ত শ্রবণ হলো মধু-তৃপ্ত। স্বচ্ছন্দ চিত্তে ক্ষমা করা গেল তাঁর ভোজন-সভার ব্যয়কুণ্ঠ আয়োজন।

মাদ্রাজীদের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের তফাৎ এইখানে। আচার এবং আচরণে পাঞ্জাবীরা শুধু মডার্ন নয়, আলট্রা মডার্ন। যুবক, বৃদ্ধ সবাই মিলে করছে ঊর্ধ্বশ্বাসে বিলাতীর নকল। শুধু ছেলেরা হলে ক্ষতি ছিল না। মেয়েরাও।

রেস, ক্লাব ও কার্নিভাল—অতি আধুনিকতার এই তিন তীর্থক্ষেত্রে পাঞ্জাবী মহিলারাই প্রধান পাণ্ডা! তাঁরা চার রাউণ্ড শেরী সাবাড় করতে পারেন হাসতে হাসতে। রজনীর শেষ প্রহর পর্যন্ত ফক্সট্রট নাচতে পারেন অক্লান্ত চরণে। তাঁদের দেহে শোভার চাইতে সম্ভার অধিক। তাঁরা বিয়ের আদিতে তন্বী, অন্তে বিপুলা। তাঁদের বর্ণ গৌর, কিন্তু আনন লালিত্যহীন। চাকর-চাকরাণীদের শাসনকার্যে স্বহস্তে উত্তম-মধ্যম প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না এতটুকুও। দেহে কিম্বা মনে পাঞ্জাবিনীর নাইকো কোমলতা।

ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ভাবধারার প্রথম উন্মেষ ঘটল বাংলা দেশে। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতাকে প্রথম বরণ করল বাঙালী। সে-যুগের বাঙালীর প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর, প্রতিভা ছিল প্রখর। ইংরেজের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে সে গলাধঃকরণ করল না, করল গ্রহণ। আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জারক রসে পরিপাক করে তাকে সে আত্মসাৎ করল। পশ্চিমের চিন্তাধারাকে সে ধার করল না, ধারণ করল। তাই বাঙালীর মধ্যে সম্ভব হলো মাইকেল মধুসূদন, বিবেকানন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাশ। সাহিত্যে শিল্পে ও ললিতকলায় বাংলাদেশ সূচনা করল সমৃদ্ধিযুক্ত নবযুগের, আনল দেশাত্মবোধের অভূতপূর্ব প্রেরণা। যৌবনকে দিল অভয়মন্ত্র, নারীকে দিল আত্মচেতনা। সেদিন সর্বভারতীয় অধিনায়িকার আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন বঙ্গজননী।

য়ুরোপের সংস্পর্শে সর্বশেষে এসেছে পাঞ্জাব। বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে লর্ড ডালহৌসী দখল করেছিলেন পাঞ্জাব। কিন্তু য়ুরোপকে পাঞ্জাব অন্তরের মধ্যে পায়নি, শুধু বাইরে থেকে করেছে অনুবর্তন। য়ুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে অনুসরণ করেনি, অনুকরণ করেছে। সে ভারতবর্ষকে দেয়নি কাব্য, দেয়নি সঙ্গীত, দেয়নি বিজ্ঞান। দিতে পারেনি দেশসেবার আদর্শ। আধুনিক ভারতবর্ষে তার দান একদল পি. ডব্লিউ. ডি'র এঞ্জিনীয়র, সৈন্যদলের সুবেদার এবং আই. এম. এসের ডাক্তার। একমাত্র লাজপৎ রায় ছাড়া পাঞ্জাবের আর কেউ হয়নি আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি।

•

কলকাতার লালদীঘির জল সাদা এবং গোলদীঘির আকার চতুষ্কোণ। কিন্তু এখানকার গোলমার্কেট সার্থকনামা। সেটা গোলই বটে। চারটি রাস্তার সংগম স্থলে বৃত্তাকার দ্বীপের মতো এ-বাজারটি। দোতলা বাড়ি। উপরে দরজীর দোকান, নীচে শাকসব্জী, মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি। পৃথক পৃথক কক্ষ। ইংরেজীতে লেখা আছে বিজ্ঞপ্তি—কোন্‌টাতে মাছ, কোনটাতে বা মাংস। প্রবেশপথগুলিতে সূক্ষ্ম তারের জাল-আঁটা দরজা। স্প্রীং দেওয়া আছে, যাতে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। মাছের ঘরটিতে উঁচু সিমেন্টের বেদীতে রাখা হয় মাছ তার উপর দিয়ে গেছে জলের কলের সছিদ্র পাইপ। ছিদ্রপথে অবিরাম বিন্দু বিন্দু করে ঝরছে জল। আপনি ধুইয়ে নিচ্ছে বেদীটি। আইসচেস্টের ভিতরে থাকে মাছ। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মাছির উপদ্রব নেই, কর্দমাক্ত জল সিঞ্চনে পঙ্কিল হওয়ার আশঙ্কা নেই ক্রেতাদের বসন। মার্কেটের দু'ধারে মনোহারী দোকান, মুদী ও ময়রা ইত্যাদি। বাঙালীর দোকান আছে কয়েকটি, তার মধ্যে একটিতে মিলে দৈ, সন্দেশ ও অন্যান্য বাঙালীর খাবার।

গোল মার্কেটের পথে আছে লেডি হার্ডিঞ্জ কলেজ, ভারতবর্ষে পুরুষের সম্পর্কশূন্য একমাত্র মহিলা মেডিকেল কলেজ। বিদ্যার্থিনীদের মধ্যে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান আছে, মাদ্রাজী আছে, মারাঠী আছে, আসামী আছে। বাঙালী নেই একটিও। পাঞ্জাবী এক অধ্যাপক বন্ধুর শ্যালিকা পড়ে ফোর্থ ইয়ারে। সুদর্শনা। বাংলার বাইরে কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে সুন্দরীর সাক্ষাৎ মিলে। রূপের অভাবটাই সেখানকার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কারণ নয়। পড়াশুনাটা নয় বিয়ের আগের স্টপ্‌ গ্যাপ্‌।

মেয়েটি মেধাবী, ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন পরীক্ষায়। বললেন, মেডিসিনের চাইতে সার্জারীতে আগ্রহ বেশী। পাশ করে হবেন সার্জেন। সর্বনাশ!

প্রাচীনারা হাতে ধরতেন সম্মার্জনী। ঘরের মেঝে থেকে অবাধ্য স্বামীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত সর্বত্র তার অপক্ষপাত ব্যবহারের দ্বারা সংসারযাত্রাকে তাঁরা নিরঙ্কুশ রাখতেন। আধুনিকাদের হস্তে শোভে ভ্যানিটি ব্যাগ। তার গর্ভে নিহিত প্রসাধন সামগ্রী নিজের স্বামীর হৃদয়ে ত্রাস এবং পরের স্বামীর হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। অতি আধুনিকারা যদি ধরেন ফরসেপস তবে বেচারী পুরুষ জাতিকে আত্মরক্ষা সমিতি স্থাপন করতে হবে অচিরে!

রসবোধ আছে তরুণীর। কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

লেডী হার্ডিঞ্জে বাঙালী ছাত্রী না থাকলেও অধ্যাপিকা আছেন একজন। মহিলার এক ভাই আই. সি. এস, এক ভাই আই. এম. এস্‌, দু' ভাই একাউণ্টস সার্ভিসে উচ্চপদস্থ অফিসার। এক বোন শিল্পী। গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'জার্নেল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল রিসার্চ'এর চিত্রসম্পাদিকা। অন্য ভাই বোনেরা সকলেই কৃতী। তিনি নিজে ডব্লিউ. এম. এস. অর্থাৎ আই, এম, এসেরই মহিলা সংস্করণের অন্তর্ভুক্তা। মাইনে পান অনেক, ডাক্তারী করে আয় করেন যথেষ্ট, ভদ্র ব্যবহার, অমায়িক ভাষণ, সহৃদয় আচরণ। লেডী-ডাক্তারী গন্ধ নেই কোনখানে। কলেজের সংলগ্ন সরকারী কোয়ার্টার। সেখানে গৃহসজ্জায় গৃহকর্ত্রীর সরুচির পরিচয় পরিস্ফুট।

নয়াদিল্লীতে মহিলা ডাক্তার আছেন একাধিক। যুক্তপ্রদেশের আছেন জন দুই। লেডী হার্ডিঞ্জের যিনি প্রিন্সিপাল তিনি দক্ষিণ দেশীয়। একটি আছেন পাঞ্জাবী। এর জনক ধরমবীর পাঞ্জাবে সুপরিচিত, জননী য়ুরোপীয়। তাঁরা উভয়েই জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদ। মহিলা বিয়ে করেছেন একটি বাঙালী। এরা দুজনেই ডাক্তার। স্বামী স্ত্রী দুজনেই রাজনীতিক বা স্কুল মাস্টার হওয়ার চাইতে ভালো। পলিটিক্যাল ইকনমির মতো দাম্পত্যেও ডিভিশন অব লেবার আছে। সেখানে স্ত্রীর অংশ কথা বলার, স্বামীর অংশ কথা শোনার। দুজনেই বক্তা হলে গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য রক্ষায় নিদারুণ বিঘ্ন ঘটে।

কনট প্লেসকে বলা যায় দিল্লীর চৌরঙ্গী। সাহেবী এবং সাহেবী ধরনের দোকান পসার সেখানে। সুট বানাবার দর্জী, ফটো তোলার স্টুডিও, প্রভিসনসের স্টোর, চুলে ঢেউ খেলাবার বিউটিপার্লার, লাঞ্চ খাওয়ার হোটেল, সিনেমা দেখবার ছবিঘর,—সবই এই কনট প্লেসে। শুধু চৌরঙ্গী নয়, ক্লাইভ স্ট্রীটও। ব্যাঙ্ক ও আপিসপাড়াও এইটেই। বার্ড কোম্পানীর পেটেণ্ট স্টোন, মার্টিনের টাইলস, ডালমিয়ার সিমেণ্ট কিনতে হলে আসতে হবে কনট প্লেসেরই আশেপাশে।

কনট প্লেসের নামকরণ হয়েছে রাজা পঞ্চম জর্জের পিতৃব্য পরলোকগত ডিউক অব কনটের নামে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মসের ফলে বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিষদ সৃষ্টি হলে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে ভারতে আসেন তিনি। জালীয়ানওয়ালাবাগের নরঘাতন নিষ্ঠুরতার স্মৃতি তখনও স্পষ্ট জাগ্রত ভারতীয়দের মনে। বৃদ্ধ ডিউকের উদ্বোধন বক্তৃতায় তার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, ছিল আন্তরিকতার সুর,—"দু'পক্ষেই ভুল ত্রুটি ঘটেছে বিস্তর। আজ তার পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা সবাই অতীতের কথা বিস্মৃত হই, পরস্পরকে ক্ষমা করি। ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট।"

কিন্তু ফরগেটনেস তো চলে শুধু সমানে সমানে। শাসক-শাসিতের মধ্যে তার স্থিতি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতোই ক্ষণিকের। মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন করে স্মরণের কারণ ঘটে এক পক্ষের ক্ষমতাগর্বিত আস্ফালন ও অপর পক্ষের নিরুপায় নিষ্ফল আর্তনাদ। জালীয়ানওয়ালাবাগ ভুলতে না ভুলতে আসে হিজলী, তার স্মৃতি শূন্যে মিলাবার আগে ঘটে কাঁথি বা তমলুক।

কনট প্লেসের আকৃতি গোলাকার। বৃত্তের ভিতরের দিকে মুখ করে এক সারি দালান। তার পিছনে আছে অনুরূপ আর এক সারি। তাদের মুখ বাইরের দিকে। সেটার নাম কনট সার্কাস। রোমান পদ্ধতির বিরাটাকার থামের উপরে প্রসারিত বারান্দা। সেখানে অপরাহ্ন বেলায় ভিড় জমে সুবেশ নরনারীর, সওদা করে সৌখীন ক্রেতারা, আলোকোজ্জ্বল শো-কেসে বিচিত্র দ্রব্যের দর্শন পায় কৌতূহলী জনতা।

দালানের পরেই প্রশস্ত রাজপথ। তার ঠিক মাঝখানে সাদা দাগ দিয়ে পার্কিং-এর নির্দেশ, সেখানে থাকবে অপেক্ষমান মোটরকার ও টাঙ্গা। দু'পাশ দিয়ে চলে যানবাহন। রাস্তার ওপারে বিস্তীর্ণ পার্ক। লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা ফুটপাথ থেকে বিচ্ছিন্ন। সেখানে বিশ্রামার্থীদের জন্য আছে বেঞ্চি, ক্রীড়াচঞ্চল শিশুদের জন্য আছে তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গন এবং পুষ্পবিলাসীদের জন্য আছে অজস্র ফুলের আয়োজন।

ঘাস জিনিসটার মূল্য যে কত তা জানা নেই বাংলাদেশে, যেখানে দু'দিন না হাঁটলে পায়ের তলায় গজায় ঘন ঘাসের বন। অপদার্থ ব্যক্তিকে ঘাস খেতে বলে গাল

দেওয়ায় উপায় নেই উত্তর ভারতে। ভাতের চাইতে সেটা অনেক বেশী দুর্ঘট। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ যেখানে এক শ' তেরো ডিগ্রিতে ওঠে এবং সারা বছরে যে-দেশে মাত্র কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, সে-দেশে ঘাস জন্মাতে প্রয়াসের প্রয়োজন। নয়াদিল্লীর কনট প্লেসের প্রত্যেকটি ঘাস হাতে করে বোনা এবং হাতে ধরে বাঁচানো। তার জন্য সরকারী হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে পরিমাণ যত্ন, জল ও অর্থ ব্যয় করা হয়, সে হিসাবটা যে কোনো দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের জ্বালাময়ী প্রবন্ধ রচনার উপাদান হতে পারে।

ফুল সম্পর্কে আমরা ভারতীয়েরা, বিশেষ করে বাঙালীরা যথেষ্ট সচেতন নই। ফুল এবং চাঁদের আলো একমাত্র কলেজ ম্যাগাজিনে কিশোর বয়স্কদের প্রথম পদ্য রচনা ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে বলে তো জানা নেই। আর্টিস্টিক জাতি বলে বাঙালীর মনে যে আত্মাভিমান আছে সে নিয়ে তর্ক চলে কিন্তু তথ্য মিলে না। সাধারণ স্বল্পবিত্ত ইংরেজ পরিবারেও খাওয়ার টেবিলে বা বসার ঘরে সামান্য কিছু ফুলের সন্ধান মিলে নিশ্চিত। অতি সচ্ছল বাঙালীর গৃহে পুষ্পগুচ্ছের চিহ্ন দেখা যায় কদাচিৎ। অর্থের প্রশ্ন নয়, রুচির প্রশ্ন। বেশীর ভাগ বাঙালী পরিবারে ফুলের প্রয়োজন হয় জীবনে মাত্র দু'বার,—ফুলশয্যার রাত্রিতে এবং শবাধার সজ্জায়।

পুরাকালে পরিবারে গৃহদেবতার পূজার রীতি ছিল। সেজন্য প্রয়োজন ছিল গন্ধপুষ্পের। বাড়িতে থাকতো দু'-একটি ফুলের গাছ। আধুনিকতায় গৃহদেবতার স্থান নেই। পূজা যদি করতেই হয়, তবে পাথরের ঠাকুর অপেক্ষা রক্তমাংসের দেবতাদের তুষ্ট করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ফল মিলে হাতে হাতে। তাই এ-যুগে আমাদের ভজন-পূজন হয় আপিসের বড় সাহেব, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের। আমাদের ঠাকুর ঘরের জায়গা দখল করেছে ড্রয়িং-রুম। কিন্তু জবা, দোপাটি ও নাগকেশরের স্থান কার্নেশন, ডালিয়া বা গ্ল্যাডিওলাস এসে পূর্ণ করেনি। সখী-পরিবৃতা আধুনিকা শকুন্তলাকে পুষ্পবীথিকায় তরু আলবালে জল সিঞ্চনরত দেখার সম্ভাবনা মাত্র নেই। তার দর্শনাভিলাষে এ যুগের দুষ্মন্তকে যেতে হবে লাইট হাউস সিনেমায়, নয় তো লেকে। কলকাতায় যে লোক ফুল ঘরে রাখে সে নেহাতই ফুলবাবু।

এ শহরে ফুলের অভাব নেই। পথের দু' পাশে সরকারী বাংলোগুলির বিস্তৃত অঙ্গন পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ। পথচারণে দৃষ্টি মুগ্ধ হয়। রাস্তার চৌমাথায় বৃত্তাকৃতি পার্কগুলিতে আছে ফুলের কেয়ারী। ডাকঘরের গায়ে, হাসপাতালের মাঠে, ফুটে রয়েছে প্রচুর মরসুমী ফুল। কনট প্লেসে আছে 'ক্যানা' ফুলের ঝাড়। শীতের দিনে পুষ্পাভরণের অজস্রতা কল্পনা করা যায় গ্রীষ্মের ভগ্নাবশেষ দেখেই।

নয়াদিল্লীর আকাশে আছে বৈরাগীর দৃষ্টি, বাতাসে আছে নিঃস্বের হতাশ্বাস মাটিতে আছে তপস্বিনীর কাঠিন্য। কিন্তু তার পথপার্শ্বে সযত্নরোপিত তরুশ্রেণী পথচারীর জন্য প্রসারিত করেছে ছত্রচ্ছায়া, তার শ্যামল তৃণাবৃত পার্ক বিছিয়ে দিয়েছে হরিৎ অঞ্চল, তার বহু বিচিত্র কুসুমের দল রচনা করেছে বর্ণাঢ্য ইন্দ্রজাল। প্রণয়ী যুগলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আবেষ্টন আছে নয়াদিল্লীতে। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকারে তার জনবিরল, ধ্বনিবিরহিত গন্ধ-আমোদিত পথে পাশাপাশি চলতে

গিয়ে সদ্যবিবাহিত তরুণ-তরুণীর হৃদয় হয় উদ্বেল, কণ্ঠ হয় ক্ষীণ, চুপি চুপি বলতে অভিলাষ হয় অত্যন্ত তুচ্ছ কোনো কথা, যার না আছে অর্থ, না আছে সঙ্গতি, না আছে প্রয়োজন। এবং সেই স্তব্ধ সায়াহ্নে একজনের ঝুমকা-দোলানো কানের অত নিকটে আর একজনের মুখ আনতে গেলে তা' দু'-একবার লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়াও একেবারে বিচিত্র নয়।

আট

সকালবেলা ঘুম ভাঙলো একটি মেয়ের চেঁচানিতে। শুধু আজ নয়, প্রত্যহই ভাঙ্গে। অবশ্য আমি বলি চেঁচানি। মেয়ের মা বলেন গান। মেয়েটি গান শিখছে।

পৃথিবীতে সঙ্গীত কে কখন সৃষ্টি করেছেন জানিনে। কিন্তু এতকাল এইটুকু বিশ্বাস ছিল, যিনিই করুন, তাঁর মনে কোনো নিষ্ঠুর অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু সে ধারণা বজায় রাখা ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটির গলায় সুরের লেশ মাত্র নেই, অথচ জোর আছে অসুরের। সেটা আরও সাংঘাতিক। ভোর পাঁচটা থেকে সাতটা,—এই পাকা দু'টি ঘণ্টা সে প্রত্যহ সঙ্গীতাভ্যাস করে। সপ্ত সুরের সঙ্গে কুস্তি করে বললেই ঠিক হয়। আশেপাশের প্রতিবেশীরা যে এখনও নন্-ভায়োলেণ্ট আছে সেটা গান্ধীজির শিক্ষায় নয়, একান্ত নিরুপায় হয়েই। সভ্যতার অনেক দণ্ড আছে। তার মধ্যে এও একটা।

য়ুরোপ আমাদের অনেকগুলি মন্দ জিনিষ দিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কোন্‌টা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাক্তারেরা বলেন সিফিলিস, গুরুজনেরা বলেন ফ্রি-লভ এবং গান্ধীজি বলেন কলকারখানা। আমার মনে হয় ভারতবর্ষে য়ুরোপের সবচেয়ে ক্ষতিকর আমদানি হারমোনিয়ম। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর নিদারুণ অত্যাচারের এমন দ্বিতীয় যন্ত্র নেই। আশ্চর্য নয় যে, পণ্ডিত জওহরলাল বলেছেন, জনসভায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করার আগে কেউ যখন হারমোনিয়ম বাজিয়ে উদ্বোধন সঙ্গীত শুরু করে তখনই তাঁর অদম্য অভিলাষ হয়, জনতার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ বাদ্যযন্ত্রটাকে পদাঘাতের দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করেন।

জড় পদার্থের একটা সুবিধা আছে। তার সহনশীলতা অপরিসীম। সে বিদ্রোহ করে না। দিনের পর দিন দু'ঘণ্টা বেসুরো চীৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আওয়াজ বের করা একমাত্র হারমোনিয়মের পক্ষেই সম্ভব। গত দশদিন ধরে সেই এক সুরে— 'বঁধু, তুমি যে চলে গেলে, ফিরে তো নাহি এলে'। বঁধু লোকটা যে কে, ঠিক জানিনে। যেই হোক, বেচারীর অবস্থা কল্পনা করতে পারি। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ থাকলে হাতজোড় করে বলতেম,—বাছা, চলে যে গেছে, সে নেহাত প্রাণের দায়েই গেছে। এবং তোমার ঐ গান না থামলে সে আর ফিরছে না এও নিশ্চয়। প্রেম যত গভীরই হোক প্রাণের মায়া, অর্থাৎ কানের মায়ার চাইতে সে বড় নয়।

মেয়েটির অপরাধ নেই। তার মাকে দোষ দেওয়া বৃথা। তিনি জানেন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। পাত্রপক্ষ কনে দেখতে এলে গানের পরীক্ষা আছেই। সুতরাং

তার জন্য মেয়েকে তৈয়ার করা আবশ্যক। তাই কিনতে হয় হারমোনিয়ম, রাখতে হয় গানের মাস্টার, মেয়েকে প্রাণান্তকর কসরৎ করতে হয় কণ্ঠস্থলীর।

এদেশে সর্বগুণান্বিতা হবার দাবী মেয়েদের উপরে। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে হতে হবে বিদুষী, কলাবতী, সুধীরা ও গৃহকর্মনিপুণা। যে মেয়ে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এস. সি. পাশ করেছে তাকেও কার্পেটে ফুল তোলা শিখতে হয়, বড়ির ফোড়ন দিয়ে মোচার ঘণ্ট রাঁধতে জানতে হয় এবং সম্ভবপর বরের বন্ধুদের সামনে কনে বাছনির সময় মহাত্মা গান্ধীর একটি অতি পরিচিত ফটোর ভঙ্গিতে মাদুরে বসে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরতে হয়—'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে' ইত্যাদি।

বিবাহের দরবারে পুরুষের কাছে প্রত্যাশা সামান্য। ডাক্তার বরের মাসিক আয়ের খোঁজ নিয়েই মেয়ের মায়েরা খুশি থাকেন, তার ক্রীড়া-দক্ষতা, অভিনয় পারদর্শিতা কিম্বা বক্তৃতা শক্তি নিয়ে মাথা ঘামান না। ছেলেরা করবে শুধু একটা। হয় লেখাপড়া, নয় ফুটবল, নয় তো ইনকেলাব জিন্দাবাদ। মেয়েদের বিচার কোনো একটা মাত্র কৃতিত্বে নয়; সব কিছু মিলিয়ে। তাদের দাম প্রথমতঃ রূপে, তারপর তাদের বিদ্যায়, তাদের সঙ্গীতে, তাদের নৃত্যে, তাদের সূচীশিল্পে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের পিতৃকুলের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের পরিমাপে।

পুরাকালে রাজকন্যারা নিজেরা পতি নির্বাচন করতেন। পুরুষের হতো পরীক্ষা। বীর্যবত্তার পরীক্ষা। পুরুষকে তখন স্বয়ম্বর সভায় নারীর বরমাল্যের যোগ্য হওয়ার সাধানা করতে হতো। একালে মেয়েরা সহজলভ্যা। তাদের জন্য হরধনু ভাঙতে হয় না, প্রতিবিম্ব দেখে মৎস্যচক্র বিদ্ধ করতে হয় না। তাদের লাভ করতে বাঁধা মাইনের একটা চাকুরি হলেই যথেষ্ট। একালে রাজপুত্র, কোটালপুত্রদের কাঁচবরণ কন্যার খোঁজে ঘর ছেড়ে বিদেশে বেরোতে হয় না। দুধসাগরের জলের নীচে যে রূপার কৌটায় কালো ভোমরার মধ্যে আছে রাক্ষসের প্রাণ তার সন্ধান করতে হয় না। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে পাতালপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে হয় না। সরকারী দপ্তরখানার অফিসারের তকমা এঁটে তারা বীরদর্পে প্রজাপতি ঋষিকে দুয়ারে হাঁক দিয়ে বলেন—লে আও নিপুণিকা, চতুরিকা মালবিকার দল। তোমার রেণুকা সেন, মাধুরী রায়, ডলি দত্ত বা অরুন্ধতী চ্যাটার্জীদের। একালের কেশবতী রাজকন্যারা নব্বই ভরি সোনা আর তিনপ্রস্থ ফার্নিচারের খেয়া নৌকা চেপে আপনি এসে উত্তীর্ণ হন বাসরঘরের ঘাটে। পণের টাকায় কারেন্সী নোটের মালা বরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন, যদিদং হৃদয়ং তবতদিদং হৃদয়ং মম।

আমার কর্ণপটহ-বিদীর্ণকারিণী সঙ্গীত-অভিলাষিণীকে চোখে দেখি নি। শুনেছি একেবারে রূপহীনা নন। লেখাপড়ায়ও ভালো। তা' হোক। কিন্তু গান তাকে শিখতেই হবে। আমরা হতভাগ্য প্রতিবেশী,—আমাদের ললাটে দুঃখ আছে; খণ্ডাবে কে?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে আর একবার নিদ্রার উদ্যোগ করলেম। বৃথা। এবার গান নয়, কার্ড। দর্শনপ্রার্থী এক ভদ্রলোক। কার্ডের উপরে ছাপা—পি. সি. সমাদ্দার, বি. এ. ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার। ভদ্রলোক আজ সকালে আসবেন কথা ছিল বটে। কিন্তু সকালে মানে যে সাড়ে ছটা তা ভাবতে পারিনি।

এই যে, নমস্কার। ঘুমুচ্ছিলেন না কি? বড় অন্যায় হয়ে গেছে তা হলে। আমি? আমি মশাই ঠিক পাঁচটায় উঠে খানিকটা হেঁটে আসি। বারখাম্বা ধরে' ফিরোজ শা রোড, উইণ্ডসর প্লেস, কুইনসওয়ে হয়ে বাড়ি মাইল দুই হবে। আছি ভালো মশাই! ডিসপেপ্সিয়াটা অনেকটা চাপা আছে। চা? আচ্ছা দিন এক কাপ, একবার অবশ্য হয়ে গেছে। আপনার বুঝি এখনও হয়নি। সাতটার আগে বিছানা ছাড়েন না? খাসা আছেন মশাই। দশটা-ছ'টা আপিস করতে হয় না, কারো তোয়াক্কা নেই। হাই সার্কেলে মুভ করেন। হ্যাঁ, ভালো কথা, জিজ্ঞাসা করেছিলেন নাকি নেহরুকে ঐ ডিয়ারনেস এলাউন্সের কথাটা।

নেহরু মানে, বি. কে. নেহরু। ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। ভদ্রলোক নিজে আই. সি. এস. এবং স্ত্রী বিদেশিনী, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি দুজনারই সত্যিকার টান আছে।

ত্রুটি স্বীকার করতে হলো। স্মরণ ছিল না। কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে হাল ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, আজ একটু মনে রাখবেন। শুনেছি তো সাড়ে সতেরো পারসেণ্ট করার কথা হয়েছে। কিন্তু কত মাইনে অবধি এলউন্সটা দেবে সেইটেই আসল কথা। পাঁচ শ' টাকার উপরে মাইনে হলে দেবে না বলে কেউ কেউ বলছে। দেখুন তো একবার অন্যায়টা। কেন, আমাদের অপরাধটা কী? জিনিসপত্রের দাম তো আর শুধু পাঁচ শ'র নীচেওয়ালাদের জন্যেই বাড়েনি। দুধের দাম টাকায় ছ' সেরের জায়গায় এক সের নিতে হচ্ছে তাকেও আমাকেও। বলুন সত্যি কি না? তবে কেন ডিয়ারনেস এলাউন্সের বেলায় আমরা বাদ পড়ব? এসব ইনজাস্টিসের জন্যই তো মশাই গবর্নমেন্টের কাজে ঘেন্না ধরে যায়। গান্ধী মহারাজ কি আর অমনি শয়তানী গবর্নমেণ্ট বলেন?

গান্ধী ভক্তকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে হলো যে, গান্ধীজি পাঁচ শ' টাকার বেশী কারোর মাইনেই রাখতে রাজী নন।

না, না, সেটা ঠিক নয় মশাই। তিনি মহাত্মা, তার কথা আলাদা। ঋষিতুল্য লোক। একটু ছাগলের দুধ পেলেই হলো। আর পাঁচজনের তো তা নয়। এই ধরুন না আমারই কথা। আপনি তো ঘরের লোকের মতো, আপনাকে বলতে আর কী? আট শ' টাকা পাই। ইনকাম ট্যাক্স, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কেটে নিয়ে হাতে আসে সাত শ' তেরো টাকা পাঁচ আনা। ফি মাসেই শেষের দিকে টানাটানি হয়। কোনটা না করলে হয়? গাড়ি আছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, ছেলেকে বিলেতে পাঠাতে হবে। পাঁচ শ' টাকার সীমা কিছু কাজের কথা নয়। স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বাড়াতে হবে, তা না হলে ভারতবর্ষের উন্নতি নেই। দেখুন না বিলেতে, এমেরিকায়। হ্যাঁ, সাহেবগুলিকে তাড়িয়ে দিন না। ওরা করে কী? শুধু দস্তখত। যা কিছু তো আমরাই লিখে পড়ে দিই। কিন্তু পাঁচশ'র উপরে যদি মাইনে না থাকে, তবে চাপরাশীর মাইনে যে মাসে আট আনায় দাঁড়াবে! দাঁড়াবে না? বরং এখনকার চাইতে আরও বাড়বে? অবাক করলেন মশাই? কী জানি; আপনাদের কংগ্রেসীদের কী বিচার-বুদ্ধি আপনারাই জানেন।

কংগ্রেসীদের বিচার-বুদ্ধি ব্যাখ্যা করার মতো ধৈর্য বা সময় কোনোটাই ছিল না। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ক্রীপস্ আলোচনার কথা তুললেম। দেখা গেল তাতেও

আগ্রহের একেবারে অভাব নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু হবে মনে হচ্ছে কি? হলে বাঁচা যায় মশাই। ইংরেজ ব্যাটাদের আচ্ছা শিক্ষা হয়। ছিল বটে আগের দিনে সব দিলদরিয়া সাহেব। যথার্থ মা-বাপের মতো। আমি তখন সবে সেক্রেটারিয়েটে ঢুকেছি। আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন মহাতপ বাবু। মহাতপ ঘোষ, খড়দায় বাড়ি। বুড়ো হয়েছেন, বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সার্ভিস বুকে লেখা আটচল্লিশ। পেন্সনের আরও সাত বছর বাকী। চোখে একেবারেই দেখতে পান না, লিখতে হাত কাঁপে। একদিন ফাইলে টাইপকরা লেখার উপরেই দস্তখত করে বসে আছেন। আমরা ভয়ে সারা। আজ আর রক্ষে নেই। মারে,—সার অ্যালেকজাণ্ডার মারে—সাহেব ছিলেন আমাদের সেক্রেটারী। ডেকে নিয়ে বললেন, মহাটপ, ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে? না করে থাকে তো ক্ষতি নেই। কাল নিয়ে এসো ভর্তি করে দেবো। তুমি এবার রিটায়ার কর। অনেক খেটেছ এখন ডিসার্ভ ওয়েলআর্নড রেস্ট। আর এখন মশাই আমার মেজ শ্যালক কলকাতা য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট। দু'বছরের চেষ্টায় ঢোকাতে পারছি নে।

শুধু মেজ শ্যালকের চাকরি প্রাপ্তিতে ব্যর্থ নয়। নিজের প্রমোশন সম্পর্কেও অভিযোগ ছিল।

স্বরাজ না হলে আর চাকরি করে সুখ নেই মশাই। ইংরেজ ব্যাটাদের কাছে এখন মুসলমানেরা হচ্ছে বড় পিয়ারের। তাদেরই পোয়া বারো। কাজ জানুক আর নাই জানুক, মাথায় ফেজ থাকলেই হলো। পেটে বোমা মারলে এক কথা শুদ্ধ ইংরেজী বেরোয় না এমন সব লোক অফিসার হয়ে এসে বসেছে। খান্ বলে' আমাদের এক নতুন কণ্ট্রোলার এসেছে। আকাট মুর্খ। সেদিন এক ফাইলে রেফারেন্স লিখতে দুটো r দিয়ে বসে আছে। গত মাসে দু'বছরের জুনিয়র একজন মুসলমান আমাদের চার জনকে ডিঙিয়ে ডেপুটি চীফ হয়ে গেল। এসব অবিচার কি আর চিরকাল সইবে? ইংরেজদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তবে হ্যাঁ, এও বলি, হবে নাই বা কেন? মুসলমানদের ফেলো-ফিলিং আছে। চাকরি নিয়ে, প্রমোশন নিয়ে তাদের লীডারেরা সব সময় লড়ছে। পান থেকে চুন খসেছে কি, অমনি এসেম্বলীতে পাঁচজন মুসলমান মেম্বার পাঁচটা প্রশ্ন করবে, উইল দি অনারেবল মেম্বার বি প্লিজড টু স্টেট। একটা মুসলমান চাপরাশীকে কিছু বলেছেন তো মিনিস্টারেরা কৈফিয়ত তলব করবে। আর আমাদের হিন্দুরা? সব কংগ্রেসী। তারা কেবল উচ্চাঙ্গের কথা বলে বলেই গেলেন। স্বরাজ, স্বাধীনতা; কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। আরে চাকরি-বাকরিগুলি সবই যদি অন্যের হাতে গেল তবে স্বরাজ নিয়ে কি ধুয়ে খাবো? আমি পষ্ট কথা বলবো মশাই, আমাদের কংগ্রেসের কর্তারা প্রাকটিক্যাল পলিটিক্স একেবারেই বোঝেন না তাই জীবন কাটাচ্ছেন শুধু জেলখানায়।

ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে লাভ নেই, তর্ক করা নিরর্থক। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের অতি পরিচিত আবাহাওয়ায় মানুষ। চাকরিকে জানেন জীবনের অনিবার্য অবলম্বন, গবর্নমেণ্ট পোস্টকে আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য। তাঁর ধ্যান, ধারণা, চিন্তা ও স্বপ্ন সমস্তই এই চাকরিকে কেন্দ্র করে। ক্যারেক্টার রোল নিয়ে তার আরম্ভ, পেন্সন নিয়ে তার শেষ! এবং এই আদি অন্তের মাঝখানে প্রমোশন দিয়ে তার বিস্তার।

আপিসের বেলা হচ্ছিল। সমাদ্দারবাবু গাত্রোত্থান করলেন। আচ্ছা এখন,

তাহলে উঠি। আপিস আছে। আজ আবার এ মাসের এরিয়ার স্টেটমেণ্টটা পাঠাতে হবে। বিকেলের দিকে আর একদিন আসব। বিকেলে বাড়ি থাকেন না? তাহলে সকালেই আসব। আচ্ছা, চলি এখন। ঐ ডিয়ারনেস এলাউয়েন্সের কথাটা কিন্তু আজ একবার কাইণ্ডলি—।

বিকালের দিকে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। নয়াদিল্লীর প্রেস ক্লাব টি পার্টি দিচ্ছেন সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে। ক্রীপস্‌ চা, লাঞ্চ ও ডিনারের বহু নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র প্রেস ক্লাব ছাড়া আর কারো আমন্ত্রণই তিনি গ্রহণ করেননি। বললেন, তাঁর প্রতি ভারতীয় সাংবাদিকদের সহৃদয় ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই চা চক্রে তিনি যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

সেক্রেটারিয়েটের সাউথ ব্লকের প্রাঙ্গণে চা পার্টির আয়োজন। স্বদেশী ও বিদেশীয় সাংবাদিকদের নিয়ে নিমন্ত্রিত প্রায় শ'দেড়েক। কয়েকজন মহিলাও আছেন অবশ্য তাঁরা সবাই বিদেশিনী।

প্রেস ক্লাবের সভাপতি বাঙালী। ঊষানাথ সেন। ভারতে সাংবাদিকদের গুরুস্থানীয় ও এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় কে. সি. রায়ের সহকর্মী ছিলেন। বর্তমানে এসোসিয়েটেড প্রেসের অন্যতম কর্ণধার, দিল্লী আপিসের কর্ম-সচিব। বয়স ষাটের উপরে, শরীর সুগঠিত। বিরলকেশ, তীক্ষ্মনাসা উজ্জ্বল দৃষ্টি। কথাবার্তা, চালচলন ও বেশভূষায় প্রখর ব্যক্তিত্বের চিহ্ন আছে। ভদ্রলোক অবিবাহিত। নয়াদিল্লীতে কোনো দিন চিরকুমার সভা বসলে তিনিই হবেন তার সর্ব-জনসম্মত পার্মানেণ্ট প্রেসিডেণ্ট।

টি-পার্টির পরে সাংবাদিক সম্মেলন। নয়াদিল্লীর সরকারী ও বেসরকারী ইতিহাসে এইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রেস কনফারেন্স। সাউথ ব্লকের কমিটি রুমে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এই কনফারেন্সে ক্রীপস তাঁর পরিকল্পনা সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বিভিন্ন সাংবাদিকের শতাধিক প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গী, তাঁর ক্ষিপ্রতা, তাঁর অক্লান্ত উদ্যম উপস্থিত সমুদয় সাংবাদিকদের প্রশংসা অর্জন করল। তাঁর রসবোধও আছে। মাঝখানে একবার হঠাৎ বললেন, সবুর। তারপর গায়ের কোটটা খুলে রেখে আস্তিন গুটিয়ে বললেন, এবার আসুন! বিপুল হাস্যরোলে ধ্বনিত হয়ে উঠল কনফারেন্স।

সার স্ট্যাফোর্ড বিলাতের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবীদের অন্যতম। আইনব্যবসায়ী মহলে তাঁর বার্ষিক উপার্জনের পরিমাণ বহু লোকেরই ঈর্ষাজড়িত বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। এই সাংবাদিক বৈঠকে যুক্তিতর্কে ব্যারিস্টার ক্রীপসের অসামান্য দক্ষতা নতুন করে প্রমাণিত হলো।

কিন্তু মানুষ মাত্রেরই ধৈর্যের সীমা আছে। সে-কথাটা অত্যন্ত অপরিহার্য-ভাবেই ক্রীপস্‌ও সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। জনৈক সাংবাদিকের এক অভদ্র প্রশ্নে অবশেষে কঠিন স্বরে বললেন,—ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ধৈর্য অসাধারণ, কিন্তু তারও শেষ আছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কোন অভদ্র ইঙ্গিত আমি বরদাস্ত করতে রাজী নই।

ভারতীয় সাংবাদিকদের, বিশেষ করে রিপোর্টারদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে,

কৃতিত্বও কম নয়। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রবোধ নেই। তাঁরা যে রাজনীতিক নন একথাটা তাঁরা কদাচিৎ স্মরণে রাখেন। প্রেস না হলে পলিটিক্স চলে না, কিন্তু পলিটিক্স না হলেও প্রেস চলে। যথা—হরিজন। এদেশের সাংবাদিকেরা শুধু প্রথম শ্রেণীর রিপোর্টার হয়েই খুশি থাকতে চান না, প্রথম শ্রেণীর পলিটিসিয়ানও হতে চান। তাই অনেক সময়েই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। তাঁদের অপরাধ নেই। স্পেশিয়েলাইজেশনে এদেশে বিশ্বাস নেই। এখানে যে ডাক্তার জ্বরের চিকিৎসা করেন, তিনি ফোঁড়াও কাটেন এবং দরকার হলে দাঁতও তোলেন।

ক্রীপস্ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কিনা সে সম্পর্কে সাংবাদিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গেল। প্রস্তাবটির সমস্ত গুরুত্বই ভবিষ্যতে। জনশ্রুতি এই যে, গান্ধীজি ক্রীপসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন a post-dated cheque অতি উৎসাহী কোনো কোনো সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে নিজেদের ভাষ্য যোগ করলেন, on a crashing bank. মুখে মুখে এই প্রক্ষিপ্ত অংশটিও গান্ধীজির মূল উক্তি বলেই চলতে লাগল। ইচ্ছাকৃত কিম্বা অনবধানতায় সত্যবিকৃতির এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে।

সেদিন সন্ধ্যায় দুই বন্ধু নিয়ে গেলেন এক ক্লাবে।

নয়াদিল্লীর সবচেয়ে নামকরা ক্লাব আই. ডি. জি। ইম্পিরিয়েল দিল্লী জিমখানা। ক্লাব বর্ণাশ্রমে দ্বিজোত্তম। প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শুধু ব্যয়বাহুল্যের দ্বারা নয়, লিখিত অনুশাসনের দ্বারা। এ্যাডমিশন ফি ও মাসিক চাঁদা দুই-ই গুরুভার। তাছাড়া আই. সি. এস., আই. পি., অডিট একাউণ্টস ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর চাকরে ছাড়া সরকারী লোক আর কারও পক্ষেই আই. ডি. জি-র সদস্য হওয়ার উপায় নেই। বে-সরকারী ডাক্তার, জার্নেলিস্ট, ব্যারিস্টরদের পক্ষে ঠিক এরকম বাধা না থাকলেও নতুন সদস্য গ্রহণের সময় ক্লাব কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন যাতে একমাত্র তাঁরাই মেম্বার হন আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক মর্যাদা যাদের শীর্ষস্থানীয়, ইংরেজীতে যাকে বলে এ-ওয়ান। ক্লাবের কৌলীন্য যাতে কলুষিত না হয় সেজন্য সজাগ দৃষ্টি আছে কর্তৃপক্ষের।

ক্লাবের টেনিস লন আছে, সুইমিং পুল আছে, ব্যান্ড আছে। মায় নিজস্ব ধোবা পর্যন্ত। নয়াদিল্লীতে এইটি একমাত্র ক্লাব যেখানে শুধু পান, ভোজন ও অবসর বিনোদনের নয়, স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থাও আছে। আই. ডি. জি. কেবলমাত্র খেলা বা আড্ডা দেওয়ার জায়গা নয়, পুরোপুরি ক্লাবই বটে।

দু' নম্বর ক্লাব,—চেমসফোর্ড। সেক্রেটারিয়েটের কাছাকাছি রাইসিনা ও কুইন ভিক্টোরিয়া রোডের সঙ্গমস্থলে এই ক্লাবটি সব চেয়ে সরগরম। প্রথমতঃ এর দক্ষিণা তেমন সাংঘাতিক নয়, দ্বিতীয়তঃ এর অবস্থিতি অনেকটা সুবিধাজনক এবং তৃতীয়তঃ এখানে অভারতীয় অল্প। সদস্য গ্রহণেও অতটা কড়াকড়ি নেই। চেমসফোর্ডের সুইমিং পুলে ফি বছর এখানকার সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রিতে হয় নাচ। শীতের দিনে ঘরের ভিতরে, গ্রীষ্মকালে বাইরে। বাইরে অবশ্য কাঠের ফ্লোর নয়, শান বাঁধানো। বাগবাজারের রসগোল্লার মতো চেমসফোর্ড ক্লাবের পকোড়া—অর্থাৎ ফুলুরিরও নাম আছে।

মহিলাদের এখানে পৃথক চাঁদা দিতে হয় না। স্বামীর গরবে গরবিনীরা স্বচ্ছন্দে

এসে বসেন পুরুষ বন্ধুদের তাসের টেবিলে। সুদক্ষ পার্টনার পেলে কেবলই ডামি হন। না পেলে তিন রঙের তিনখানা অনার্স কার্ড সম্বল করে মিহি সুরে ডাকেন,—টু নো-ট্রাম্পস্। দেনার সুদের মতো হারের হার বাড়ে হু হু করে। খেলার শেষে খাতায় সই করে আসেন নিঃশঙ্কে। মাসের শেষে স্বামী বেচারা কম্পিত হৃদয়ে মুখ বুজে চেক লিখে দেন আর বোধ করি মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করেন।

জাতিধর্মনির্বিশেষে বেশীর ভাগ ভারতীয় অফিসারই চেমসফোর্ডের সদস্য। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ,—কোনো দেশীয়ই বাদ নেই। কিন্তু উপস্থিতির দিক দিয়ে পাঞ্জাবীরাই প্রধান। বিশেষ করে শিখ। তাঁরা বিকালে এসে তিন সেট টেনিস খেলেন, সন্ধ্যায় পাঁচ রাবার ব্রিজ। তিন পেগ হুইস্কি ও চার কোর্সের ডিনার খেয়ে তাঁরা যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তার আগেই ইংরেজী ক্যালেন্ডারে তারিখের পরিবর্তন ঘটে। তাঁদের গৃহিণীরাও পিছনে পড়ে থাকবার পাত্রী নন। ক্লাবে পাঞ্জাবী দম্পতিদের দেখলে সহধর্মিণী কথাটার মানে বুঝতে কষ্ট হয় না।

বন্ধুদের ক্লাবটি শহরের অপর প্রান্তে। এর চাঁদা সামান্য, সভ্য সংখ্যাও বেশী নয়। বাঙালী আছে, মাদ্রাজী আছে, আসামী আছে এবং আছে আরও অন্যান্য প্রদেশের লোক। এটিও ছেলে এবং মেয়েদের সম্মিলিত ক্লাব। মেয়েদের মধ্যে অনেকে খ্রীস্টিয় সমাজের।

ক্লাবের রেজিস্টারে যাই থাক, ঘরে মেয়েদের সংখ্যাই যেন বেশী। প্রায় পনেরো আনাই কুমারী। গায়ের রং কালো, নখের রং লাল এবং গালের রং ছাই-ছাই। বলা বাহুল্য শেষের দুটো ভগবান প্রদত্ত নয়। তার পেছনে বিলাতী প্রসাধন কোম্পানীর অনেকখানি হাত আছে। বিচিত্র বসন, বিচিত্রতর ভূষণ। একটি মহিলা পরেছেন গোলাপী রং-এর একটি সায়ার উপরে একখানা মশারীর নেট, তাতে সাটিনের পাড় বসানো। আর একজনের লেস-বসানো ব্লাউজে সুতার ব্যবহারে এত কঠোর মিতব্যয়িতা যে, তার দিকে চোখ তুলে তাকালে কান আপনিই লাল হয়ে ওঠে।

বয়স বেশীর ভাগেই ত্রিশের ঊর্ধ্বে। দেহে কারো বা ইউক্লিডের সরল রেখা, কেউ বা অঙ্ক শাস্ত্রের ইলিপস্। আমাদের মেয়েদের ভূগোলে নাতিশীতোষ্ণের স্থান নেই,—হয় উত্তর মেরু, নয়তো দক্ষিণ। কেউ করেন মাস্টারী, কেউ নার্স, কেউ বা স্টেনোগ্রাফার।

ক্লাবে ব্যাডমিন্টন আছে, ক্যারম আছে, পিং পং আছে। কিন্তু খেলার চাইতে ঢং এবং কথার চাইতে ন্যাকামির পরিমাণ বেশী। একটি পঁয়ত্রিশ বছরের বিপুলা মহিলা কোনো এক সাহায্য অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী ও আচরণ দেখে বারংবার ইচ্ছা হচ্ছিল, আলাপ করে বলি, ভদ্রে আপনার নিশ্চয়ই ধারণা যে, আপনার ষোলো বছর এখনও পার হয়নি। কিন্তু সেটা যে কুড়ি বছর আগেই কেটে গেছে সে কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার।

জানি, এদের উপরে রাগ করে লাভ নেই। ভগবান এদের রূপ দেননি, ভাগ্য দেয়নি বিত্ত। এদের পিতৃকুল আভিজাত্যের খ্যাতিতে গৌরবান্বিত নয়। বয়স ঊর্ধ্বগামী, যৌবন অপগতপ্রায়। এদিকে ঠিকুজি মিলিয়ে অভিভাবকদের পাত্র স্থির করার দিন প্রায় কেটে গেছে। স্কুলে ছাত্রীকে জিরাণ্ডিয়েল ইন্‌ফিনিটিভ মুখস্থ

কারিয়ে দেহে ও মনে নেমেছে ক্লান্তি, রাত জেগে অনাত্মীয় অপরিচিত রোগীকে থার্মোমিটার আর আইসব্যাগ দেওয়ার কাজে ধরেছে বিরক্তি, আপিসে "উইথ রেফারেন্স টু ইওর লেটার নম্বর" টাইপ করে করে জীবনে এসেছে বিতৃষ্ণা।

প্রিয় ও পরিজন নিয়ে নীড় রচনার চিরন্তন মোহ আছে নারীর রক্তে। একখানি ছোট গৃহ একজন প্রেমাসক্ত স্বামী ও একটি দুটি সুস্থ সবল শিশু—এই কল্পনা সে যুগযুগান্ত ধরে পেয়ে আসছে মায়ের কাছ থেকে, মাতামহীর কাছ থেকে, জগতের আদি মানবী আদমপত্নী ইভের কাছ থেকে। সে কল্পনা সত্য হতে পারল না, সে কামনা সার্থক হলো না। অতৃপ্ত বাসনার সহস্র নাগিনী জাগায়ে জর্জর বক্ষে সে বৃথাই প্রতীক্ষা করেছে এই দীর্ঘকাল। তার দেহে একদিন রূপ না থাকলেও স্বাস্থ্য ছিল। কিন্তু আজ তার শ্রী গিয়েছে ঘুচে, স্বাভাবিক কমনীয়তা হয়েছে দূর এবং নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ যে লজ্জা তা' হয়েছে লুপ্ত। অবশেষে বঞ্চিত হৃদয়ের অপরিসীম বেদনাকে ঢাকতে সে প্রাণপণে প্রয়াস করছে নানাভাবে। কেউ করছে মহিলা সমিতি, কেউ করছে রেডিওতে বক্তৃতা, আর কেউ বা রুজ, পাউডার ও লিপিস্টিক মেখে পুরুষের সঙ্গে করছে নির্জলা ফ্লার্ট।

ক্লাবের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে কলেজের ছাত্র আছে, সেক্রেটারিয়টের কর্মচারী আছে, বীমার দালাল আছে, ডাক্তার আছে। প্রায় সবাই তরুণ। বিবাহিত সদস্যেরা বেশীর ভাগ খ্রীস্টান এবং কুমার সভ্যেরা বেশীর ভাগ হিন্দু। কারণ সুস্পষ্ট।

পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাবধারা আমাদের দেশে এনেছে নূতন আবেষ্টন। তার ফলে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের কর্মে এবং চিন্তায়। আমাদের আহার, বিহার, বসন, ভূষণ বদল হয়েছে। বদল হয়েছে রীতি, নীতি ও ধ্যান-ধারণা। এতকাল নারীকে আমরা শুধু মাত্র পুরুষের আত্মীয় রূপেই দেখেছি। সে আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি, পিসি, দিদি, বৌদি কিম্বা শ্যালিকা। কিন্তু জননী, জায়া এবং অনুজা ছাড়াও নারীর যে আরও একটি অভিনব পরিচয় আছে, সে সম্পর্কে আমরা বর্তমানে সচেতন হয়েছি। তার নাম সখী।

প্রাণী জগতের মতো মনোজগতেরও বিবর্তন আছে। তার ফলে বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা নীতির মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। নারীর মূল্যেরও যুগে যুগে তারতম্য ঘটেছে।

একদা সমাজে মায়ের স্থান ছিল সর্বপ্রধান। সেদিন পরিবার পরিচালনা থেকে বংশ-পরিচয় এবং উত্তরাধিকার নির্ণীত হতো মাতার নির্দেশ, সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক দিয়ে। ক্রমে এই ম্যাট্রিয়ার্কাল ফেমিলী বিলুপ্ত হলো। রাজমাতার চাইতে রাজরাণীর মর্যাদা হলো অধিক। সাধারণ পরিবারেরও পরিধি পরিমিত হলো। সংসারে কর্ত্রী হলেন জননী নয় গৃহিণী। ছেলেরা মায়ের কোল ছেড়ে বউ-এর আঁচলে আত্মসমর্পণ করল।

বলা বাহুল্য, এই হস্তান্তরের ফলে মায়েরা খুশি হলেন না। কেউ কেউ অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফল হলো না। হার হলো তাঁদেরই। শুধু বউকাঁটকী শাশুড়ী আখ্যা পেয়ে নাটক, নভেলে তাঁরা নিন্দিত হলেন। যাঁরা বুদ্ধিমতী, তাঁরা কালের লিখন পাঠ করলেন দেয়ালে, মেনে নিলেন অবধারিত বিধি। নিঃশব্দে,—কিন্তু স্বচ্ছন্দ চিত্তে নয়। জগতের সমস্ত বিক্ষুব্ধ মাতৃকুলের অনুক্ত অভিযোগ

আজও জেগে আছে বধূশাসিত আধুনিক গৃহের বিরুদ্ধে। য়ুরোপ ও এমেরিকার সমাজে পত্নীকর্তৃত্ব পুরোপুরি স্বীকৃত। বিবাহের পর ছেলের সংসারে তার মায়ের স্থান নেই, কিম্বা থাকলেও সে স্থান উল্লেখযোগ্য নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের লুপ্ত অকার চিহ্নের মতো তাঁর অস্তিত্ব আছে, গুরুত্ব নেই।

কিন্তু স্ত্রী বলতে যেদিন ভাবী সন্তানের গর্ভধারিণী বা গৃহকর্ত্রী মাত্র বুঝতেম, সেদিনও বিগত। স্ত্রীর মধ্যে চাই সচিব সখীমিথ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। কিন্তু একজনের কাছে এতখানি প্রত্যাশা করা শুধু কালিদাসের কাব্যেই শোভা পায়, বাস্তবক্ষেত্রে নয়।

এ যুগের পুরুষের কাছে ঘরের চাইতে বাইরের ডাক বেশী। সে দশটা পাঁচটায় আপিসে যায়, কারখানায় খাটে, শেয়ার মার্কেটে ঘোরে। সেখান থেকে টেনিস, রেস কিংবা মিটিং। রাত্রিতে ক্লাব অথবা সিনেমা। এর মধ্যে গৃহের স্থান নেই, গৃহিণীরও আবশ্যকতা নেই। আগে সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করতে হতো। যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-পার্বণে প্রয়োজন ছিল ভার্যার। কিন্তু ধর্ম এখন শুধু ইলেকশনে ভোটসংগ্রহ ছাড়া ভারতবর্ষেও বড় একটা কাজে লাগে না। তাই এ-যুগে সহধর্মিণীর চাইতে সহকর্মিণীকে নিয়ে বেশী রোমান্স লেখা হয়।

পুরুষের জীবনে আজ গৃহ ও গৃহিণীর প্রয়োজন সামান্যই। তার খাওয়ার জন্য আছে রেস্তোরাঁ, শোয়ার জন্য হোটেল, রোগে পরিচর্যার জন্য হাসপাতাল ও নার্স। সন্তান সন্ততিদের লালনপালন ও শিক্ষার জন্য স্ত্রীর যে অপরিহার্যতা ছিল, বোর্ডিং-স্কুল ও চিলড্রেনস্ হোমের উদ্ভব হয়ে তারও সমাধা হয়েছে। তাই স্ত্রীর প্রভাব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে ঠেকেছে এসে সাহচর্যে। সে পত্নীর চাইতে বেশীটা বান্ধবী। সে কর্ত্রীও নয়, ধাত্রীও নয়,—সে সহচরী।

নারীর পক্ষেও স্বামীর সম্পর্ক এখন পূর্বের ন্যায় ব্যাপক নয়। একদিন স্বামীর প্রয়োজন মুখ্যতঃ ছিল ভরণ, পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু এ-যুগের স্ত্রীরা একান্তভাবে স্বামী-উপজীবিনী নয়। দরকার হলে তারা আপিসে খেটে টাকা আনতে পারে।

তাই স্বামীর গুরুত্ব এখন প্রধানতঃ কর্তারূপে নয়, বন্ধুরূপে।

ভারতবর্ষও এই নব ভাবধারার বন্যাকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি। ঢেউ এসে লেগেছে তার সমাজের উপকূলে। আমাদেরও পরিবার ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকায় হচ্ছে, আত্মীয় পরিজনের সম্বন্ধ সংকীর্ণ হচ্ছে। গ্রাম্য সভ্যতার ভিত বিধ্বস্ত, কলকারখানাকে কেন্দ্র করে নগর-নগরীর বিস্তৃতি ঘটেছে ধীরে ধীরে। তার সঙ্গে নূতন সভ্যতা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন জীবন-ধর্মের উদ্ভব অপরিহার্য।

এদেশেও পুরুষের জীবনে এবার আবির্ভূত হয়েছে সখী ; নারীর জীবনে সখা। সেটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক করতে পারো, মনু পরাশর উদ্ধৃত করে মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখতে পারো। কিন্তু তাকে ঠেকাতে পারবে না।

স্ত্রী-পুরুষের জীবনে সখাসখীর যে উপলব্ধি, তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সমাজকর্তারা একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু পতিকে পরম গুরু এবং পত্নীকে সেবিকা বানিয়ে দাম্পত্যে তাঁরা সখীত্বের অবকাশ রাখতে পারেননি। ট্রান্সফারড্ এপিথেটের মতো সেটা পুরুষের পক্ষে বৌদি এবং স্ত্রীর পক্ষে দেবরের

উপর ন্যস্ত করেছিলেন। সংসারে এর চাইতে মধুরতর সম্পর্ক আমার জানা নেই।

সীতার সাথী ছিলেন লক্ষ্মণ, তাঁর অপর আর কোনো বন্ধুর প্রয়োজন ছিল না। বুড়ো হ'লেও ঋষি বাল্মীকি সে-কথা জানতেন। পাঞ্চালীর পাঁচ পাঁচটা স্বামী থাকতেও একটি দেবরের অভাব ঘোচেনি। তাই বেদব্যাসকে আনতে হলো,—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি দ্রৌপদীর সখা,—সংকটে শরণ্য, সম্পদে স্মরণীয়।

এযুগে জীবনযাত্রার উপচার বহুবিধ এবং ব্যয়সাধ্য। যে লোক দু'শ' টাকা পায় তার পক্ষে বউ কাছে রাখাই কঠিন, বৌদি দূরে থাক। মেয়েরাও জানেন, পণের টাকা ও সোনার হার না হলে বরই জুটবে না অনেকের, দেবর তো পরের কথা। তাই আধুনিকারা ঘা খেয়ে মন দিয়ে মেনেছেন যে, বেশী আশা করে ফল নেই। একটি নির্ভরযোগ্য সহৃদয় বন্ধু পেলেই ভাগ্য। আধুনিকেরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন যে, অনেক লোভে লাভ নেই, তার চেয়ে বরং চাই শুধু একটি বান্ধবী। প্রিয়বান্ধবী।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু পরিবারে অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত নয়। সাধারণ মুসলমান পরিবারেও নয়। সেখানে বান্ধবীর স্বীকৃতি মাত্র নেই। সেখানে পুরুষের জীবনে প্রথমে যে অনাত্মীয়া নারীর সান্নিধ্য ঘটে, তিনি নিজের স্ত্রী। তাই ক্লাবে পার্টিতে বিলাতফেরত ও বড় ড্রইংরুমে তরুণের দল আসে। কাউকে ডাকে ললিতাদি, আর কাউকে বলে বীণাবউদি, কাউকে বা শুধু পদবীর আগে 'মিস' বা 'মিসেস' জুড়ে দিয়ে সম্বোধন করে—মিস গুপ্ত, মিস আয়েঙ্গার বা মিসেস সোনেরা জাহীর।

নয়

তিরিশে মার্চ সন্ধ্যায় ফিরোজশাহ-কোটলায় মুনলাইট-পিকনিকের যিনি আয়োজন করেছিলেন, আইডিয়্যাল হোস্টেস বলে নয়াদিল্লীর সোসাইটিতে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। মহিলা সুন্দরী, পরিহাসপটু এবং প্রিয়ভাষিণী। বন্ধুসমাগমে আনন্দ লাভ ও আনন্দ দান করার দুর্লভ ক্ষমতা আছে তাঁর।

ফিরোজশাহ-কোটলা দিল্লীর পঞ্চম নগরীর ধ্বংসাবশেষ। ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বিরাজের সময়ে দিল্লী নগরী ছিল বর্তমান কুতুবের নিকটস্থ মেহরৌলীতে। পুরাতত্ত্ব বিভাগ কিছু কাল পূর্বে এই রাজধানীর নগর প্রাচীর মৃত্তিকাগর্ভ থেকে আংশিক উদ্ধার করেছেন। জনপ্রবাদ এই যে, নিজ প্রিয়তমা কন্যার যমুনা দর্শনাভিলাষ পূরণার্থে পৃথ্বিরাজই তৈরী করেছিলেন কুতুব মিনার। প্রত্যহ অপরাহ্ন বেলায় প্রসাধন সমাপনান্তে রাজনন্দিনী আরোহণ করতেন তার শীর্ষে, অবলোকন করতেন দূরবর্তী যমুনার জলধারা। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এ কাহিনী বিশ্বাস করেন না। তাঁদের অভিমত, পাঠান সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেক নির্মাণ শুরু এবং আলতামাস শেষ করেন জগতের সুউচ্চ বিজয়স্তম্ভ এই মিনার।

দ্বিতীয় দিল্লী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী। তাঁর রাজত্বকালে দুর্ধর্ষ মুঘল দস্যুদল ভারতবর্ষ আক্রমণ করল, হত্যা ও লুণ্ঠনের দ্বারা বহু নগরনগরী বিধ্বস্ত করে উপনীত হলো দিল্লীতে। দিল্লীর সমতল ভূমিতে তাদের

প্রতিরোধ করা সহজ ছিল না। সম্রাট পশ্চাদপসরণ করলেন কুতুবে। মুঘলেরা দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে আমীর ওমরাহদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করল এবং সাধারণ কৃষকদের শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত করল। অবশেষে দিল্লীর অসহনীয় গ্রীষ্মের প্রখরতায় ক্লান্ত ও রোগাক্রান্ত হয়ে দস্যুদল দিল্লী পরিত্যাগ করল। আলাউদ্দিন এই দস্যুদলের পুনরাক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে নির্মাণ করলেন সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত নব নগরী, নাম দিলেন সিরি। এই নগরীতে সুলতান নির্মাণ করেছিলেন নিজের জন্য এক মহার্ঘ প্রাসাদ, তার স্তম্ভ সংখ্যা ছিল এক সহস্র। আজ সে প্রাসাদের চিহ্ন মাত্র নেই।

আলাউদ্দিন খিলজী ছিলেন অসমসাহসিক যোদ্ধা। রাজ্য-জয়ের নেশা ছিল তাঁর রক্তে। তিনি রাজপুতদের পরাজিত করে চিতোর অধিকার করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুশ্লিম অধিকারও প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি। সেই বিজয় গৌরবকে চিরস্মরণীয় করতে নির্মাণ শুরু করলেন দ্বিতীয় কুতুব। প্রথম কুতুবের পাশেই। প্রথম কুতুবের চাইতে এর আকার হবে দ্বিগুণ,—এই অভিলাষ ছিল সুলতানের মনে। কিন্তু আরব্ধ কাজ শেষ করার মতো আয়ুর মিয়াদ ছিল না তাঁর। অর্ধসমাপ্ত এই নব পরিকল্পিত কুতুবের চিহ্ন আজও দর্শকজনের কৌতূহল উদ্রেক করে। বর্তমান সিরির স্মারক আছে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় এবং কিছুটা বিরাট নগর প্রাচীরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে।

ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান ফিরোজশাহ তোগলক। রাজার নামে রাজধানীর পরিচয় মুশ্লিম রাজত্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব নয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতের মুশ্লিম নৃপতিদের মধ্যে ফিরোজশাহ তোগলক ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর তিনি প্রবল প্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালনা করেছেন। দিল্লীর মুশ্লিম বাদশাহদের মধ্যে একমাত্র আওরঙ্গজেব ব্যতীত আর সবার চাইতেই তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পরে তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখনই তাঁর বয়স ষাটের ঊর্ধ্বে।

ইতিহাসে মহম্মদ বিন্ তোগলকের নাম অব্যবস্থিতচিত্ত ও অপরিণামদর্শী নৃপতির উদাহরণ রূপে কুখ্যাত। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর চরিত্রে বহু রাজোচিত সদ্‌গুণেরও সমাবেশ ঘটেছিল। মহম্মদ বহু ভাষাবিদ, কবি, গণিতজ্ঞ এবং সুদক্ষ লিপিকার ছিলেন। সাহসী যোদ্ধা এবং সহৃদয় দাতা বলেও তাঁর সুনাম আছে। আবার নিষ্ঠুরতার জন্য নিন্দারও অভাব নেই। প্রসিদ্ধ আরবী পর্যটক ইবন বতুতার আত্মচরিতে সম্রাট মহম্মদের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু যথার্থ বর্ণনা আছে।

"দান করা এবং হত্যা করা এই দুই ব্যাপারেই রাজা মহম্মদ তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। যে পথ দিয়ে তিনি যান সে পথে কোনো না কোনো অতি দরিদ্রকে তিনি ধনী বানিয়ে যান, কোনো না কোনো জীবিত ব্যক্তিকে তিনি পরলোকে পাঠিয়ে দেন। একাধারে তাঁর মহানুভবতার ও নিষ্ঠুরতার শত শত গল্প লোকের মুখে মুখে ফিরছে।"

ইবন বতুতা নিজে মহম্মদের অধীনে কয়েক বছর দিল্লীর কাজী অর্থাৎ প্রধান বিচারক ছিলেন।

মহম্মদের নানা উদ্ভাবনী বুদ্ধি ছিল, কিন্তু সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বহু বিষয়ে পরীক্ষা করায় তাঁর ঝোঁক ছিল। বেশীর ভাগ পরীক্ষারই মারাত্মক পরিণতি ঘটেছে। উত্তর ভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে একাধিকবার রাজধানী স্থানান্তরিত করা, দিল্লী এবং দৌলতাবাদের মধ্যে রাজধানীর সমুদয় অধিবাসীর গমন ও প্রত্যাগমন, রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্র মুদ্রার প্রচলন, চীন জয়ের প্রয়াস ইত্যাদি মহম্মদের সর্বনাশা উদ্যোগের একাধিক কাহিনী স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বাল্যকালে আমরা পড়েছি।

জীবনের শেষভাগে মহম্মদ আপন সেনাবাহিনী নিয়ে বর্তমান করাচীর নিকটবর্তী থাট্টায় এক দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। একদিন প্রভাতে সেখানে এক ধীবর সিন্ধুনদে হঠাৎ এক অদ্ভুত মৎস্য শিকার করেছিল। সে মৎস্য রাজসমীপে উপস্থিত করা হলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত আকৃতির এই মৎস্য মানুষের রসনার পক্ষে সুস্বাদু কিনা সে পরীক্ষার বাসনা জাগল মহম্মদের মনে। পাত্রমিত্রের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে সে মৎস্য সম্রাট আহার করলেন। ইহলোকে সেই তাঁর শেষ পরীক্ষা। সেদিনই জীবনান্ত ঘটল তাঁর।

মহম্মদের প্রতিভা ছিল, শক্তি ছিল। সে-সময়ে আলাউদ্দিন খিলিজীর রাজধানী সিরি ও প্রাচীন মেহরোলীর মাঝখানে দিল্লীর বিত্তশালী ব্যক্তিদের বহু প্রাসাদ ও প্রমোদোদ্যান গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু যথোচিত রক্ষাব্যবস্থার অভাবে মুঘল দস্যুদের আক্রমণ সম্ভাবনা থেকে সেগুলি মুক্ত ছিল না। মহম্মদ তাঁর নিজ প্রাসাদ রচনা করলেন সেখানে। দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিলেন সিরি থেকে মেহরোলী। নব নগরীর নামকরণ করলেন 'জাহানপন্না'—বাংলা ভাষায় যার মানে হলো জগতের আশ্রয়। প্রাসাদের সংলগ্ন ভূমিতে বৃহৎ এক হ্রদ খনন করেছিলেন পানীয় জলের সংস্থানে। কুতুবের অদূরবর্তী বর্তমান খিরকী গ্রামে আজও চোখে পড়ে এই প্রাচীরের অবশিষ্টাংশ। তার গায়ে হ্রদে জল প্রবেশ-ব্যবস্থার চিহ্ন আছে পরিস্ফুট।

বর্তমান কুতুব রোডের নিকটে সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে মহম্মদের স্নানাগার, তাঁর জেনানা ও তাঁর বিখ্যাত মঞ্চ, যেখানে বসে প্রত্যহ তিনি তাঁর সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করতেন। আলাউদ্দিনের সহস্রস্তম্ভ কক্ষের অনুরূপ মহম্মদও একটি বিরাট কক্ষ নির্মাণ করেছিলেন, যার কিছু কিছু চিহ্ন আজও কৌতূহলী দর্শকদের বিস্মিত করে।

মহম্মদের মৃত্যুর পরে ফিরোজশাহ তোগলক সম্রাট হলেন। মহম্মদের তিনি আত্মীয় এবং সেনানায়ক ছিলেন। সিন্ধু থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি ফিরে এলেন দিল্লীতে। রাজ্যের গঠনকার্যে মনোনিবেশ করলেন অবিলম্বে। অনেকেই বোধ হয় জানে না যে, ফিরোজশাহই ভারতের সর্বপ্রথম নরপতি যাঁর ধমনীতে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত এক হয়ে মিশে ছিল। তাঁর জননী ছিলেন রাজপুতানী।

দুই বিভিন্ন ধর্মের সম্মিলিত প্রভাব তাঁর চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। বিদ্বান ও ধর্মপরায়ণ বলে তিনি খ্যাত ছিলেন এবং প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তাঁর আন্তরিক স্পৃহা ছিল। মুশ্লিম যুগের প্রথম কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন ফিরোজশাহ। অধুনা ওয়েস্টার্ন যমুনা ক্যানেল নামে খ্যাত খালটি তিনিই খনন করেন। কর্নালের নিকটস্থ যমুনার মূল ধারা থেকে উৎসারিত হয়ে এর এক শাখা

এসেছে দিল্লীতে, অপর শাখা গেছে হিসারে। ফিরোজশাহের আমলে এই খালের পরিধি বিস্তৃততর ছিল। সম্রাট সাজাহানের আদেশে তৎকালীন পূর্তবিভাগের অধ্যক্ষ আলী মর্দান খাঁ এই খালের সংস্কার সাধন করেন। এখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সম্রাট সাজাহানের রক্তেও হিন্দু প্রভাব ছিল। তাঁর জননী যোধপুরী বেগমও রাজপুতানী ছিলেন। আহম্মদশাহ আব্দালী কর্তৃক দিল্লী অবরোধ কালে এ খালটি দ্বিতীয়বার বিনষ্ট হয় এবং পরবর্তী যুগে ইংরজ শাসকগণের চেষ্টায় তার পুনঃ সংস্কার ঘটে।

সৌধ নির্মাণে ফিরোজশাহের গভীর অনুরাগ ছিল। এদিক দিয়েও সম্রাট সাজাহানের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল ছিল। কুতুব মিনারের ঊর্ধ্বতন যে দুটি তলা শ্বেত পাথরে গড়া তা ফিরোজশাহেরই কীর্তি। ভূমিকম্পে কুতুবের যে ক্ষতি ঘটেছিল তারও সংস্কার তিনিই করেছিলেন। দিল্লীর হিন্দুরাও হাসপাতালের সংলগ্ন 'রীজে' এখনও তাঁর নির্মিত মৃগয়াগৃহের ভগ্নাবশেষ বর্তমান।

সিরি, বিজয়মণ্ডল ও কুতবে তিন তিনটি নগরী থাকা সত্ত্বেও ফিরোজশাহ যমুনার ধারে আর একটি নূতন নগরের পত্তন করলেন। একেবারে যমুনার ঠিক গায়ে নির্মাণ করলেন রাজপুরী ফিরোজশাহ-কোটলা। আজ তোরণপথে ঢুকলেই বাঁ দিকে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত অঙ্গন। একদা সেখানে ছিল ফিরোজশাহের দরবার গৃহ। আজ আমাদের পিকনিক পার্টির আসর বসল সেখানে।

দলটি ক্ষুদ্র নয়। ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রায় জন বারো। কিন্তু অধিনায়িকা আহার্য যা এনেছেন, তা দিয়ে অনায়াসে তার ডবল লোকের উদর পূর্তি করা যেতে পারে।

পিকনিকে সব চেয়ে যিনি মনোযোগের যোগ্য, তিনি মিস্টার খোশলা। বহুল পরিচিত ব্যক্তি। বিশেষ করে মহিলা মহলে। মেয়েরা এগ্‌জিবিশন করেছেন, তার দরজায় ভলান্টিয়ারী করেছেন কে? মিস্টার খোশলা। মহিলা সমিতি দামোদর বন্যার সাহায্য ভাণ্ডারে টাকা তুলেছেন। মেয়েদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা আদায় করেছেন কে? মিস্টার খোশলা। চাঁদনী চক থেকে মিসেস মুখার্জীর উল কিনে আনছেন, মিসেস স্বামীনাথনের জন্য পাঁচ দোকান ঘুরে পণ্ডস্ ক্রীম যোগাড় করছেন। সমস্তই মিস্টার খোশলা। নয়াদিল্লীতে মেয়েরা আছেন অথচ মিস্টার খোশলা নেই, এমন কোনো সভা, সমিতি, পার্টি, পিকনিক কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

সাধারণ পাঞ্জাবীর তুলনায় বেঁটে, দোহারা চেহারা। মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা। নির্বাক যুগের চিত্রাভিনেতা ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্-এর অনুকরণে দীর্ঘ জুলপি গালের মধ্যপথ পর্যন্ত প্রসারিত। হিটলারের মতো গোঁপের কায়দা। পরিধানে ব্রাউন রং-এর কর্ডরয়ের প্যান্ট, পায়ের গোড়ালির কাছটা সরু। প্যান্টের পিছনে হিপ্-পকেট। তাতে মনোগ্রাম-করা লম্বা রূপার সিগারেট কেস যার গর্ভে প্রায় পঞ্চাশটা সিগারেট রাখা চলে। গায়ে গ্যাবার্ডিনের কোট। প্রায় আজানুলম্বিত। নীচের পকেট দুটি ঈদের চাঁদের আকৃতিতে কাটা। সিল্কের সার্ট। টক্‌টকে লাল রং-এর টাই, তাতে নীল রং-এর লতাপাতার ছাপ। মাথায় একটি সবুজ ফেল্টের টুপি, নীচের দিকে নামিয়ে পরেন। পায়ে কখনও কম্বিনেশন সু, কখনও বা

বাক্‌লস আঁটা সুয়েডের জুতা। দিনের বেলায় চোখে এক জোড়া মোটা শেলের ফ্রেমযুক্ত সানগ্লাশ। রোদ থাক আর নাই থাক। মেয়েদের হাতে রিস্টওয়াচের মতো মিস্টার খোশ্‌লার গগলসও প্রয়োজনের জন্য নয়, শোভার জন্য।

মিস্টার খোশ্‌লার প্রকৃত পেশা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে তিনি কন্‌ট্রাক্টর, কেউ বলে তিনি দু' তিনটে বীমা কোম্পানীর এজেন্ট, আর কেউ বা এমন কিছু বলে যার ইংরেজী তর্জমা করলে কথাটা দাঁড়ায়,—স্রেফ লোফার। তিনি নিজে কার্ডে নামের পিছনে লেখেন একটি শব্দ যা দিয়ে নলিনীরঞ্জন সরকার থেকে শুরু করে বাবুগঞ্জের হাটে কাটা-কাপড়ের ব্যবসাদার পতিতপাবন সাহাকে পর্যন্ত বুঝানো যায়। মার্চেন্ট। কিন্তু কাজ তাঁর যাই হোক, ব্যস্ততার অভাব নেই। এই দারুণ পেট্রোল রেশনিং-এর দিনেও সারাদিনই দেখা যায় তিনি তাঁর বেবী অস্টিন নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটছেন শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। পথে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে এক মিনিট কথা বলেই বলেন "আচ্ছা ভাই, এখন বড্ড ব্যস্ত। আবার দেখা হবে, শ্যাল সি ইউ এগেন।"

পিক্‌নিকে খোশ্‌লা বিপুল উদ্যমে মেয়েদের আহার্য পরিবেশন করলেন। স্যান্ডউইচের প্লেট নিয়ে ছুটতে গিয়ে প্রায় আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। সন্দেশের থালা নিয়ে হন্তদন্ত হলেন, কোনো মহিলাকে "প্লিজ" কোনো মহিলাকে বা "ফর মাই সেক", বলে দুটো বেশী পেস্ট্রী খাওয়ালেন। একটি তরুণী অন্য কার কাছে এক গ্লাশ জল চাইছিলেন। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মিস্টার খোশ্‌লা। তাঁর কানে যেতেই "জল, জল, মিস উপাধ্যায়ের জন্য জল" বলে এমন উতলা হয়ে জলের অন্বেষণে ছুটতে লাগলেন যে, মনে হলো, হাতের কাছে অন্য কোথাও না পেলে তিনি বুঝিবা তৎক্ষণাৎ ভগীরথের ন্যায় গঙ্গা আনয়নের জন্য কৈলাসে ছুটবেন!

শ্রীমতী সুব্বা রাও প্রস্তাব করলেন চারিদিকে ঘুরে দেখবার। দেখার মধ্যে যা আছে তা ফিরোজশাহ নির্মিত একটি মসজিদ। সুলতান পাত্রমিত্র নিয়ে জুম্মার দিনে প্রার্থনা করতে আসতেন। অনুমান করা অন্যায় নয় যে, সেদিন এই মসজিদের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। যদিও আজ ভগ্নদশা দেখে তার বিগত সৌষ্ঠব বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু তার গঠন—পারিপাট্য লক্ষ্য করার মতো। ইংরেজীতে যাকে বলে 'প্রোপোরশন',—ফিরোজশাহ-কোটলার মসজিদ ও অন্যান্য প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষে তা বিশেষভাবে বর্তমান।

ফিরোজশাহের আমলে সর্ব প্রথম ভারতীয় স্থাপত্যে হিন্দু ও মুশ্লিম পদ্ধতির সিন্‌থেসিস ঘটেছিল। প্রাগ্‌মুশ্লিম যুগের উত্তর ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। অতি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরে এখনও তার চিহ্ন আছে। বর্তমানে জৈন পদ্ধতি নামে অভিহিত এ স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ হয় রাজপুতনার মাউন্ট আবু পর্বতোপরি বিখ্যাত মন্দিরটি।

সেদিনের হিন্দু স্থাপত্যে আর্চ—অর্ধবৃত্তাকার গঠন—ছিল না। তার বৈশিষ্ট্য ছিল চতুষ্কোণ স্তম্ভে। এই স্তম্ভগুলি কারুকার্যখচিত! কোনোটাতে দেবদেবীর মূর্তি, কোনোটাতে পুষ্পসজ্জা, কোনোটাতে বা ঘণ্টা কিম্বা গাছ। প্রস্তরে গঠিত এই স্তম্ভগুলির অলঙ্করণের মধ্যে মিলত সেদিনকার স্থপতিদের মণ্ডন-চাতুর্যের পরিচয়। সেকালের স্থাপত্যে গম্বুজেরও অস্তিত্ব ছিল না। চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপরে সমান্তরাল

প্রস্তরখন্ড একটির পর একটি সাজিয়ে দু'দিক থেকে ক্রমশঃ মিলিয়ে আনা হতো মাঝখানে। দ্বার, গবাক্ষ ও প্রবেশপথের উপরাংশে আর্চের পরিবর্তে এই গঠন অনেকটা থাক-কাটা সিঁড়ির মতো দেখায়। আর্চের ভারবহন ক্ষমতা অধিক এবং তার ব্যবহার য়ুরোপ ও মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল।

এই স্থাপত্যের প্রথম পরিবর্তন ঘটল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। দাশ বংশের কুতুবুদ্দিন আইবেক দিল্লীতে এসে প্রথম তৈরী করতে চাইলেন একটি মসজিদ যেখানে বসে তিনি আল্লার কাছে পাঠাতে পারবেন প্রচুরতর অর্থ প্রবলতর প্রতাপ এবং প্রভূততম শান্তি কামনা করে প্রাত্যহিক আবেদন। বলা বাহুল্য তাঁর নিজ জন্মস্থান আফগানিস্থানে যে-ধরণের মসজিদের সঙ্গে তিনি আশৈশব পরিচিত তারই অনুরূপ ভজনালয় নির্মাণ করা ছিল তাঁর বাসনা। সে-মসজিদ পয়েণ্টেড আর্চের, অনেকটা গণিত শাস্ত্রের দ্বিতীয় বন্ধনীচিহ্নের মতো খিলানের উপর তৈরী।

রোমানরা ব্যবহার করতো বৃত্তাকার আর্চ। আরবীয়েরা পছন্দ করতো পয়েণ্টেড আর্চ। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পয়েণ্টেড আর্চ সম্বলিত স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন হলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত ইরাকের অন্তর্গত সামাররার মসজিদটি। হিন্দু স্থপতিদের জানা ছিল না তার নির্মাণ কৌশল। কাবুল কান্দাহার থেকে মুস্লিম কারিগর আনাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং দিল্লীর প্রথম মসজিদে স্থাপত্যের যে নিদর্শন রইল সেটা হিন্দু ও মুস্লিম স্থাপত্যের সম্মেলন নয়, গোঁজামিলন। কুতুব মিনার সংলগ্ন মসজিদে আজও তার প্রমাণ আছে। সে মসজিদের বারান্দায় ও দ্বারপথে অর্ধবৃত্তাকার গঠন সত্যিকার খিলানের উপর নয়। তাতে 'কী-স্টোন' নেই।

মুস্লিম স্থাপত্যে দেবদেবীর মূর্তি বা পুষ্প ও বৃক্ষলতা উৎকীর্ণ করার রীতি ছিল না। কোরাণের বচন উদ্ধৃত হতো মসজিদের প্রাচীরের গায়ে ও আর্চের উপরে। আরবী লিপি ও কোরাণের রচনা সম্পর্কে কুতুবুদ্দিনের মসজিদ নির্মাণরত ভারতীয় রাজমিস্ত্রীদের জ্ঞান ছিল সামান্যই। তাই কৃত্রিম আর্চের উপরে তারা বৃক্ষ অঙ্কন করে তার আশেপাশে আরবী বচন উৎকীর্ণ করার প্রয়াস করেছে কোনো মতে। হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্ন মসজিদের সংলগ্ন মণ্ডপে আরও অধিকতর প্রকট। তার স্তম্ভগুলি নিঃসন্দেহে কোনো হিন্দু মন্দির থেকে আহৃত। সেকালের মুস্লিম নরপতিরা লুণ্ঠনকে লজ্জার বিষয় মনে করতেন না। বরং অপহৃত দ্রব্যের প্রকাশ্য ব্যবহারের দ্বারা তাঁরা বিজয়স্তম্ভ রচনা করে আপন অপকীর্তির সাক্ষ্য রাখতেন পরবর্তীকালের জন্য।

সুলতান আলতামাস কুতুবুদ্দিন রচিত মসজিদের বিস্তার সাধনে উদ্যোগী হয়ে গজনী থেকে আনলেন মুস্লিম স্থপতি ও কারিগর। তারা জ্যামিতিক পদ্ধতির মুস্লিম অলঙ্করণ প্রচলন করল ভারতবর্ষে। খিলজী যুগে অধিক সংখ্যক মুস্লিম রাজমিস্ত্রী এল আফগান থেকে। তারা প্রবর্তন করল চতুষ্কোণ স্তম্ভের পরিবর্তে 'কী-স্টোন'-যুক্ত সত্যিকার আর্চ, সমতল ছাদের বদলে গুম্বুজ, চলতি ভাষায় যাকে বলে শিকারা, এবং ঘণ্টা, পুষ্প, বৃক্ষ ইত্যাদির বদলে জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সজ্জা। ভারতে পুরোপুরি মুস্লিম স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা হলো। কুতুব সংলগ্ন আলাই দরওয়াজা ও নিজামুদ্দিনের জামাতখানা মসজিদ সেকালের হিন্দু প্রভাববর্জিত একান্তভাবে মুস্লিম স্থাপত্যের নিদর্শন।

তোগলক রাজত্বে, বিশেষ করে ফিরোজশাহের নির্মিত প্রসাদ, দুর্গ ও অন্যান্য

অট্টালিকায় হিন্দু স্থাপত্যের পুনর্ব্যবহার দেখা গেল। সে যুগের স্থাপত্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো অলঙ্কার ও বাহুল্যবর্জিত গঠন। সাধারণ পাথর ও চুন সুরকির আস্তর দিয়ে তা তৈরী,—খিলজী আমলে ও পরবর্তী মুঘল যুগে ব্যবহৃত লাল বা শ্বেত পাথরের চিহ্ন বড় নেই। বোধ হয় মুঘল দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ও দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রভৃতিতে ফিরোজশাহের পূর্ববর্তী রাজকোষ শূন্য হয়ে এসেছিল, ব্যয়বহুল প্রস্তর ব্যবহার আর সম্ভব ছিল না। মহম্মদ তোগলক কর্তৃক বারংবার দিল্লীর অধিবাসীদের স্থানান্তরিত করার ফলে পাথরের কাজে দক্ষ রাজমিস্ত্রীর অভাব ঘটাও বিচিত্র নয়।

ফিরোজশাহের সৌধাবলীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, চতুষ্কোণ স্তম্ভের ব্যবহার, দ্বারপথে ও বারান্দায় আর্চের বদলে হিন্দু পদ্ধতির গঠন এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম উৎকীর্ণ প্রাচীর-সজ্জা। ফিরোজশাহ নির্মিত হাউজ খসের পরবর্তী অংশগুলিতে আছে এর প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মসজিদের গায়ে যে অট্টালিকার উপর অশোক স্তম্ভটি আছে তার আরোহণপথ খুব কঠিন নয়। সিঁড়ির ধাপগুলি কিছুটা উঁচু সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সঙ্গী নারীবাহন মিস্টার খোশলা থাকতে মেয়েদের চিন্তার কারণ নেই। প্রত্যেকটি মহিলা নিরাপদে উপরে না ওঠা পর্যন্ত তিনি নীচে দাঁড়িয়ে তদারক করলেন। বেশী পরিচিতাদের হাতে ধরে উঠতে সাহায্য করলেন এবং সদ্য পরিচিতাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "মে আই —।"

অশোক স্তম্ভটি প্রাসাদের যে অংশে স্থাপিত সেটা ফিরোজশাহের অন্দরমহলের অন্তর্ভুক্ত বলে কথিত। স্তম্ভটি প্রস্তর নির্মিত। আম্বালার নিকটবর্তী এক গ্রামে সম্রাট অশোক কর্তৃক এই স্তম্ভটি স্থাপিত হয়েছিল খৃস্টজন্মের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে। একদা মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে তা' ফিরোজশাহের চোখে পড়ল। পুরাকীর্তিতে ফিরোজশাহের গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। সেখান থেকে স্তম্ভটি তুলে নিয়ে এলেন তিনি দিল্লীতে, তাঁর রাজধানী ফিরোজশাহ-কোটলায়।

বিয়াল্লিশ চাকার গাড়িতে চাপিয়ে শত শত মজুর টেনে এনেছিল এই স্তম্ভটিকে। স্তম্ভটির শীর্ষে একটি স্বর্ণ নির্মিত আচ্ছাদন ছিল। পরবর্তী যুগে জাঠ দস্যুরা দিল্লী লুণ্ঠনকালে তা' আত্মসাৎ করেছে। বহুবর্ষ পরে স্তম্ভের গায়ে পালি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে। অহিংসা ও সর্বজীবে দয়াপ্রদর্শনের অনুরোধ জানিয়ে ভগবান বুদ্ধের অনুগামী সম্রাট অশোক সমগ্র ভারতবর্ষে যে বহুশত অনুশাসন প্রচার করেছিলেন, এই স্তম্ভে তারই একটি সাক্ষ্য রয়েছে।

অশোক স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে দেখা যায় অদূরবর্তী যমুনার জলস্রোত। ফিরোজশাহের আমলে যমুনার ধারা কোটলার পাদদেশ স্পর্শ করত সে কথা বুঝতে আজও কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

নীচে নেমে সদলবলে বসা গেল খোলা মাঠের মধ্যে। পাশে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। স্থানীয় লোকেরা বলে, বাউলী। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে সুলতান অবগাহন করতেন এর জলে, বিশ্রাম করতেন এর তীরবর্তী পাষাণ-বেদিকায়।

কে একজন বললেন, "তাস সাথে থাকলে একহাত খেলা যেত।"

আমাদের অধিনায়িকা অমনি তাঁর তোরঙ্গ থেকে বার করলেন দু'প্যাকেট সুদৃশ্য ঝক্-ঝকে তাস, নম্বর লেখার ছাপানো প্যাড ও পেন্সিল।

সবাই জয়ধ্বনি করে বলল—"একেই বলে দূরদৃষ্টি। সকল কালের সকল রকম দরকারের কথা যিনি আগে থাকতে ভেবে রাখেন, তাঁরই নাম অনাগতবিধাতা।"

ডাক্তার অধিকারী আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। আর্মিতে লেফটেনেণ্ট কর্নেল। অত্যন্ত রসিক লোক। মাথার পাকা চুল দিয়ে মনের কাঁচা ভাবকে ঢেকে রেখেছেন। মাইল দশেক দূরবর্তী ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে এসেছেন পিক্‌নিকে যোগ দিতে। কণ্ট্রাক্টব্রিজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। খুশি হয়ে বললেন, "ক্রীপস্‌ আলোচনা চলছে। স্বরাজ হলে আমরা ওঁকেই প্রেসিডেণ্ট করব। স্বাধীন ভারতে প্রথম মহিলা প্রেসিডেণ্ট, মিসেস বিজয়া ব্যানার্জী। বিজয়া ব্যানার্জী কী—"

সবাই মিলিত কণ্ঠে উচ্চ ধ্বনি করলেন "জয়।"

বাধা দিয়ে বললেম, "কর্নেল, প্রেসিডেণ্ট বললেই মনে হয় পলিতকেশ, বিগতযৌবনা বৃদ্ধা। তার চাইতে বলুন মহারাণী।"

কর্নেল তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলেন; "ঠিক বলেছ ভায়া। মহারাণীই ভালো। দিল্লীর দ্বিতীয় মহিলা সম্রাজ্ঞী। সুলতানা রিজিয়ার পরে সুলতানা বিজয়া। জয় মহারাণী বিজয়া কী জয়। বন্দে মতারম, আল্লা হো আকবর, হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে।"

ভাবী সুলতানা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "একসঙ্গে তিনটাই বলেন নাকি আপনি?"

"নিশ্চয়। গান্ধী মহারাজ, জনাব জিন্না ও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে খুশি রাখতে হয়। যখন যাঁর হাতে ক্ষমতা আমি তাঁরই দলে আছি। অবস্থা অনুযায়ী যার যত তাড়াতাড়ি মত বদলায় ইংরেজীতে তাকেই তো বলে তত প্রগ্রেসিভ।"

মিস্টার জুবেরী সদ্য আই. সি. এস. হয়েছেন। বিলেতে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে কিছুকাল পড়েছিলেন। সোশ্যালিজমে এখনও ভক্তি আছে। বললেন, "মহারাণী তো মনার্কিজম। ডেমোক্রেসির যুগে তা' চলবে না।"

কর্নেল বললেন, "খুব চলবে। ঘরে ঘরে মনার্কিজম চলছে, আর ঘরের বাইরে গভর্নমেণ্টে চলবে না? ভায়া হে, তোমার বয়স অল্প, শিখতে এখনও ঢের বাকী। ডেমোক্রেসি বস্তুটা আছে শুধু হ্যারল্ড ল্যাস্কির বইতে। আমাদের মিস্টার ব্যানার্জীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তাঁর বাড়িতে তাঁর জানলার পর্দা নীল হবে কি সবুজ হবে, সকালে সুক্তো রান্না হবে কি ছেঁচ্‌কি রান্না হবে—এসব সিদ্ধান্ত ব্যানার্জীর ভোট নিয়ে ঠিক হয়, না মহারাণীর হুকুমে চলে? বিয়ে করলে নিজেই বুঝতে পারবে যে, হার মেজেস্টিস্‌ গভর্নমেণ্টে আর যাই থাক, লীডার অব দি অপোজিশন নেই।"

প্রবল উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো সভায়।

লজ্জাজড়িত আত্মপ্রসাদে মহিলার গৌর গণ্ডদ্বয় রক্তিম হয়ে উঠল। প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর কথা নয়। আসুন এবার খেলা যাক।"

হাত জোড় করে বললেম, "মাপ করবেন ও বিদ্যে আমার একেবারে জানা নেই।"

"বলেন কী? আচ্ছা তা হলে খেলা থাক। গান করুন।"

"কী সর্বনাশ! তার চাইতে বরং কুতুব মিনারের উপর থেকে লাফিয়ে পড়তে বলুন। না হয় আপনার খাতিরে তাই চেষ্টা করে দেখব। গান করলে অবশ্য লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছাটা হবে আপনাদের।"

ব্যানার্জী বললেন, "তবে আবৃত্তি শোনান, রবি ঠাকুরের কবিতা।"

জবাবে বললেম, "ছোটবেলায় সংস্কৃত শব্দরূপ আর বড় হয়ে জুরিস্প্রুডেন্সের ধারা মুখস্থ করে' করে' কবিতা মনে রাখবার আর সময় পেলেম কখন ?"

মিসেস বললেন, "আচ্ছা, তা হলে গল্প বলুন।"

ডাক্তার অধিকারী অ্যামেণ্ডমেণ্ট যোগ করলেন,—"প্রেমের গল্প।"

হেসে বললেম, "কর্নেল, প্রেমের হলে সেটা যে গল্পই হবে, সত্যি হবে না, সে তো জানা কথা। কিন্তু সে গল্পও আমার জানা নেই। চান তো ভূতের গল্প বলতে পারি। জানেন, এই বাউলীর ধারে ঠিক আপনার ডাইনে মিসেস মিত্র যেখানটায় বসেছেন, সেখানে রাজরক্তের দাগ আছে? সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরকে এখানে হত্যা করা হয়।"

"ও মাগো!"—বলে তিং করে লাফ দিয়ে সরে' একেবারে দলের মাঝখানটিতে এসে বসলেন মিসেস মিত্র। বার বার নিজ শাড়ির দিকে পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন, সত্যিই রক্তের দু' একটি ছিঁটে ফোঁটা তাঁর বসনে লেগেছে কিনা সেই আশঙ্কায়। সবাই খানিকটা হেসে নিল। কিন্তু অন্যান্য মহিলারাও যে একটু চঞ্চল না হলেন তা নয়।

মিস্টার খোশলা মিসেস মিত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। বার বার বলতে লাগলেন এমন ভাবে মেয়েদের ভয় দেখানো মোটেই উচিত হয়নি। হঠাৎ ভয় পেয়ে শক্ লাগলে সাংঘাতিক ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধিনায়িকা দমবার পাত্রী নন। বললেন, "বেশ, বলুন ভূতের গল্প। সত্যি ভূতের হওয়া চাই কিন্তু। বানানো নয়।"

"মিসেস ব্যানার্জী, ভূত চিরকালই বানানো হয়ে থাকে। ভূতের গল্পের তো কথাই নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাও আমি জানি নে।"

মহিলা সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "না না, আপনি কেবলই ফাঁকি দিচ্ছেন। তাস খেলা নয়, গান নয়, গল্পও নয়। একটা কিছু করুন।"

কর্নেল বললেন, "তাই তো হে, তোমার কেস খারাপ হচ্ছে। তুমি যদি কোনো কিছুই না পার তবে মহারাণীর গভর্নমেণ্টে তোমার জায়গা হবে না।"

মহিলা বললেন, "সত্যি তো। আপনাকে নিয়ে করব কী? গান গাইতে জানেন না যে, বৈতালিক হবেন? পদ্য কইতে পারবেন না যে, সভাপণ্ডিতের চাকরি দেব। গল্প বলতে পারেন না যে, বয়স্য করব। এমন অকর্মা লোক আপনি, হবেন কী?"

যুক্তকরে বললেম, "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।"

বিপুল হাস্যরোল।

আরোগ্য সম্ভাবনাহীন রোগীর অত্যাসন্ন মৃত্যু নিশ্চিত জানার পরেও যে প্রফেসন্যাল নির্লিপ্ততা নিয়ে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে যান, ক্রীপস্ আলোচনা সম্পর্কেও বর্তমানে আমাদের সেই মনোভাব উপস্থিত। এর ব্যর্থতা সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে সমবেত জার্নালিস্টদের মনে এখন আর সংশয় নেই। প্রশ্ন এখন শেষ মুহূর্তে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবার নয়, প্রশ্ন করে আলোচনার অসাফল্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে।

অথচ মাত্র সপ্তাহ দুই পূর্বেও ক্রীপস্-দৌত্যের এই পরিণতি আশংকা করার কারণ ছিল না। বরং এই রাজনৈতিক আলোচনা দ্বারা শীঘ্রই ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে একটা সম্মানজনক মীমাংসার ফলে ভারতে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশাই বেশীর ভাগ লোকে পোষণ করেছে।

উনিশ শ একচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান বৃটেন ও এমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রথম দিনেই পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হলো। তিন দিন পরে বৃটিশ নৌবহরের অন্যতম গর্ব ও নির্ভর প্রিন্স-অব-ওয়েলস ও রিপালস্ জাপানী বোমার আঘাতে প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে সলিল সমাধি লাভ করল। দেখতে দেখতে হংকং ও মালয় জাপানীরা কেড়ে নিল। ষোলই ফেব্রুয়ারী সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘাঁটি—যা দুর্ভেদ্য বলে সবার ধারণা ছিল—সিঙ্গাপুরের পতন ঘটল।

দুই শত বৎসরের বৃটিশ শাসনকালে এই প্রথম জল এবং স্থলপথে ভারতবর্ষ শত্রু আক্রমণের সম্মুখীন। কর্তৃপক্ষের মনে উদ্বেগ, সাধারণের মনে ভীতি এবং সহজ-বিশ্বাসপ্রবণ অজ্ঞজনের অসংবদ্ধ রসনায় নানাবিধ ত্রাসজনক রটনার সৃষ্টি হলো।

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাউস অব কমন্সে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করলেন—ওয়ার ক্যাবিনেট সর্বসম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্পর্কে একটি ন্যায়সঙ্গত ও চূড়ান্ত সমাধান—জাস্ট অ্যাণ্ড ফাইন্যাল সলিউশন—স্থির করেছেন এবং লর্ড প্রিভিসীল সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ নিজে ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মতি সংগ্রহের জন্য মন্ত্রীসভার প্রস্তাবটি নিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পুনঃ পুনঃ উপেক্ষিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী ভারতের দাবি। বারংবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব। মাসখানেক পূর্বে মার্শাল চিয়াং কাইসেক ও মাদাম এসেছিলেন ভারতবর্ষে। তাঁরা প্রকাশ্য বিবৃতিতে ব্রিটেনকে ভারতীয়দের হাতে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতায় প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের অনুরোধ করেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তার পরেই সুস্পষ্ট ভাষায় চার্চিলের উক্তির প্রতিবাদ করে বললেন, অ্যাটলাণ্টিক চার্টার সমগ্র পৃথিবীর জন্য, কেউ তা থেকে বঞ্চিত হবে না। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী এভাট সেখানকার পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতা দাবিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করে বললেন, সে দাবির প্রতি অস্ট্রেলিয়ানদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

ভারতবর্ষে জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার প্রতি সম্মিলিত জাতিগুলির ক্রমবর্ধমান অনুকূল মনোভাব ও প্রকাশ্য উক্তি দ্বারা ব্রিটেনের রক্ষণশীল কর্তৃপক্ষ বিব্রত

হচ্ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চাইতেও গুরুতর কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায়। সে কারণ সহৃদয়তার নয়, অনুরোধ উপরোধ বা উপদেশজাত নয়। কারণ কঠোর বাস্তব ঘটনা পরম্পরার। আটই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হলো, ব্রহ্মে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটল। ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত ও ইংরেজের অনুকূল করার প্রয়োজনীয়তা ইতিপূর্বে এমন আর কখনও অনুভূত হয়নি। এগারই মার্চ চার্চিল ক্রীপস্ মিশনের কথা ঘোষণা করলেন।

তবুও একথা মানতেই হবে যে, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। এদেশের সংবাদপত্র ও জনসাধারণ ব্রিটিশ ওয়ার ক্যাবিনেটের এই নব প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করল। বোধ হয় এতদিনে সত্য সত্যই ব্রিটেন ভারতীয় সমস্যার সত্যিকার সমাধানে উৎসুক। ক্ষমতা হস্তান্তরে স্বীকৃত।

ভারতে এই অনুকূল মনোভাবের পশ্চাতে ছিল মন্ত্রিসভার ভারপ্রাপ্ত আলোচনাকারী ব্যক্তিটির প্রতি ভারতবর্ষের আস্থা। সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতবর্ষ বর্তমান শতাব্দীর মুষ্টিমেয় ভারতহিতৈষী ইংরেজের মধ্যে অন্যতম জ্ঞান করে থাকে। ক্রীপস্ ইতিপূর্বে দু'বার ভারতবর্ষে এসেছেন। কংগ্রেস নীতি ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর তিনি একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। একাধিকবার ভারতে ইংরেজ শাসনের ত্বরিত সমাপ্তি কামনা করে তিনি লেখনী চালনা করেছেন। বেশী দিনের কথা নয়, য়ুরোপে যুদ্ধ ঘোষণার সাত সপ্তাহ পরে হাউস অব কমন্সে দাঁড়িয়ে গভীর প্রত্যয়ব্যঞ্জক স্বরে ক্রীপস্ বলেছেন, "কংগ্রেসের নয়, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ভারতীয়দের ন্যায়সংগত স্বাধীনতার দাবি আজও অপূর্ণ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক কলহের কথাটা একটা ছুতা মাত্র!"

সেই ক্রীপসের আপোষ আলোচনা নিরর্থক হতে চলল! মতভেদের বর্তমান কারণ দেশরক্ষার প্রশ্ন! ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রস্তাবানুসারে দেশরক্ষার ভার থাকবে একান্তভাবে প্রধান সেনাপতির হাতে। কংগ্রেসের দাবি, দেশরক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর। সে দায়িত্ব পালনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা সঞ্চার প্রয়োজন তা একমাত্র ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের পক্ষেই সম্ভব, বিদেশী কমাণ্ডার-ইন-চীফের নয়।

যুদ্ধ পরিচালনার প্রত্যক্ষ ভার কংগ্রেস প্রধান সেনাপতির উপরে ন্যস্ত করতে রাজী ছিলেন। সে ব্যাপারে তাঁকে সর্বাধিক স্বাধীনতা দানে কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেশরক্ষার মূল দায়িত্ব ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের হাতে না থাকলে স্বাধিকার লাভের অর্থ থাকে না। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়ে দেশের অন্যান্য সমস্যা ও ব্যবস্থা দেশরক্ষার বৃহত্তর প্রশ্নের দ্বারাই বহুলাংশে প্রভাবান্বিত। সত্যিকার দায়িত্ব ও স্বাধীনতা লাভের পরিমাপ দেশরক্ষার নিরবচ্ছিন্ন অধিকারের দ্বারাই নিরূপিত হয়।

এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা ক্রীপসের সাধ্য ছিল না। তাই তিনি বিকল্প প্রস্তাব করলেন, প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ সচিবরূপে সমর পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবেন এবং দেশরক্ষা সচিব আখ্যা নিয়ে একজন জনপ্রতিনিধি দেশরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন।

ভালো কথা। কিন্তু এ দুজনের কর্মবিভাগ হবে কী ভাবে? ক্রীপস্ প্রস্তাবিত নব দেশরক্ষা সচিবের করণীয় কর্মের একটি তালিকা দিলেন। সে তালিকায় আছে,

(১) পেট্রোল সরবরাহ ; (২) স্টেশনারী অর্থাৎ কাগজ, পেন্সিল, নিব, কালী, কলম কেনা, রাখার ভার, ফর্ম ছাপান ; (৩) ক্যান্টিন পরিচালনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাম্ভীর্য রক্ষা করে এই তালিকাটি পাঠ করা কঠিন। এদেশের অন্তঃপুরে পানের ভিতরে লংকার কুচি, লুচির মধ্যে ন্যাকড়া ও সরবতে চিনির বদলে নুন মেশানো প্রভৃতি কতকগুলি জামাই-ঠকানো প্রাচীন মেয়েলী কৌতুকের কথা শোনা আছে। কিন্তু চাল্লিশ কোটি নরনারীর ভাগ্য নিয়ে দুই দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যেখানে চরম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলেছে, সেখানে এই পিঁড়ির নীচে সুপুরি রেখে আছাড় খাওয়ানো রসিকতা নিশ্চয়ই কেউ প্রত্যাশা করে না।

অপরাহ্নে ইম্পিরিয়্যাল হোটেলে এক সাংবাদিক বন্ধুর চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। বন্ধুটি কংগ্রেসের সমর্থক নন, গান্ধীজিকে তিনি সাংসারিক বুদ্ধিহীন স্বপ্নবিলাসী-আনপ্রাকটিক্যাল আইডিয়েলিস্ট—মনে করেন। ভারতীয় নন। এমেরিকানও নন,—ইংরেজ। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন, "ব্রিটেনের কোন শত্রু এই তালিকাটি রচনা করে ক্রীপসের হাতে দিয়েছে ? জাপানীদের টাকা খাচ্ছে এমন কোনো ফিফথ কলামিস্ট নয় তো ?"

অসম্ভব নয়।

বন্ধুটি রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বললেন, "পেট্রোল, স্টেশনারী, ক্যান্টিন ! খ্যাংরা কাঠি ও দাঁতের খড়কে নয় কেন—হোয়াই নট ব্রুমস্টিকস অ্যান্ড টুথপিকস ?"

ভারতবর্ষের প্রথম দেশরক্ষা সচিব হবেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, এই কথা গত এক সপ্তাহ ধরে নানাভাবে আমরা আলোচনা করেছি। একবার কল্পনা করে দেখা যাক জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে পণ্ডিত নেহরু তাঁর অনবদ্য ভাষায় বেতারে আবেদন করছেন, তার সঙ্গে পড়ে শোনাচ্ছেন কর্মের তালিকা— "পেট্রোল, পেন্সিল, নিব, আলপিন—।" পৃথিবীতে সব জিনিসেরই নাকি মাত্রা আছে। নেই কি শুধু নির্বুদ্ধিতার ? পরিহাসের ?

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এই,—যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটেনের। সে দায়িত্ব শুধু ভারতের অগণিত জনসাধারণের প্রতি নয়, সে দায়িত্ব মিত্র জাতিসঙ্ঘের প্রতি, যাঁদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ব্রিটেন যুদ্ধ করছে চক্রশক্তির বিরুদ্ধে। সে দায়িত্ব তাঁরা পরিত্যাগ করতে পারেন না।

দেশরক্ষার প্রশ্নটি ভারতবর্ষের পক্ষে নানা দিক দিয়ে জটিল। ইংরেজীতে ন্যাশন্যাল আর্মি বলতে যা বুঝায় ভারতবর্ষের তেমন কোনো সেনাবাহিনী নেই। ভারতে সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছে পেশাদার সিপাহীদল থেকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই সিপাহীদের সংগ্রহ করা হতো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। একের পর এক করে কোম্পানী নগর, প্রদেশ ও রাজ্য দখল করেছে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করেছে সিপাহীদল, বেতনের আকর্ষণে।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে কোম্পানীর হাত থেকে রাজ্য শাসনের ভার নিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সেনাবাহিনীও সাম্রাজ্ঞীর অধীন হলো। শুরু হলো পরিবর্তন। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে দেশীয় সৈন্যদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করলেন ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ। প্রতি দুটি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করলেন এক ব্রিটিশ বাহিনী, যাতে কোনোদিন কোনো কারণে

ভারতীয় বাহিনী বিরুদ্ধভাবাপন্ন হলে অবিলম্বে দমন করা চলে তাদের। সিপাহী বিদ্রোহের আগে ছয়টি ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একটি মাত্র ব্রিটিশ বাহিনী থাকতো। গোলন্দাজ বাহিনীতে একটিও ভারতীয় নেওয়া হয়নি উনিশ শ পঁয়ত্রিশ সাল পর্যন্ত। এই যুদ্ধের আগে পর্যন্ত অফিসার র‍্যাঙ্কে ভারতীয় যাঁরা ছিলেন তাঁদের আঙুলে গোনা যায় এবং যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ মেজরের উপরে ওঠেননি। সামরিক বিচারে বোধ করি তখন পর্যন্ত ভারতীয়দের মেজরিটি প্রাপ্তি ঘটেনি।

সবচেয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হলো সৈন্যদলের লোক নির্বাচনে। 'সামরিক' ও 'অসামরিক' জাতি, এই কৃত্রিম শ্রেণী বিভাগের দ্বারা ভারতীয় বাহিনী থেকে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রায় সব দেশের লোককে সযত্নে দূরে রাখা হয়েছে। অথচ ইতিহাসে যাঁদের কিছুমাত্র দখল আছে তাঁরাই জানেন ভারতে ইংরেজের রাজ্য বিস্তারের এক প্রধান অংশ সম্ভব হয়েছিল বর্তমানে, 'অসামরিক' জাতি বলে উপেক্ষিত বাংলা ও মাদ্রাজের সিপাহী সান্ত্রীদেরই বাহুবলে। বর্তমানে অত্যন্ত সহজবোধ্য কারণে যে সকল ইংরেজ রাজনীতিক মুসলমানদের সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় গদগদ এবং ইংরেজের অবর্তমানে ভারতে গৃহ যুদ্ধ ঘটলে হিন্দুদের অসহায়ত্ব নিয়ে যাঁরা প্রায় অশ্রু-বর্ষণ করেন, সেই ভারতবন্ধুদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, ইংরেজের রাজ্য বিস্তারের কালে যারা শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি বলে স্বীকৃত ছিল এবং যাদের কাছে ইংরেজ সর্বাধিক প্রতিরোধ পেয়েছে, তারা মারাঠা ও শিখ। এদের প্রথমটির ধর্মমত অবিমিশ্রিত হিন্দু, দ্বিতীয়টিও হিন্দু ধর্মেরই সংস্কারোত্তর রূপ। একটিও ইসলাম নয়।

পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের প্রতি সেনা বিভাগের এই পক্ষপাতিত্বের কারণ কী? কেউ বলেন, উত্তর ভারতের লোকেরা সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ও দৈহিক গঠনে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের চাইতে উন্নত। কিন্তু সেটাই সামরিক জাতি বলে চিহ্নিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। গুর্খাদের তাহলে কোনকালেই খাকী পরতে হত না। বিশেষ করে সৈন্যদের কৃতিত্ব যে-যুগে তাদের দৈহিক সামর্থ্যের উপরেই নির্ভর করতো, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই তার সমাপ্তি ঘটেছে।

কোনো বিশেষ অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা এই যে, তার ফলে একটা নতুন জাতিপ্রথা সৃষ্টি করা চলে। সামরিক বৃত্তি অনেকাংশে পারিবারিক হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষানুক্রমে পিতামহ থেকে পিতা এবং পিতা থেকে পুত্রে সেই বৃত্তি প্রসারিত হয় এবং একই বাহিনীতে বংশপরম্পরা চাকুরির দ্বারা বাহিনীর প্রতি একটা কায়েমী স্বার্থবোধ জাগে। নিজেকে তারা সে বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত অংশবিশেষ বলেই জ্ঞান করে। ঠিক যেমন করে কলকাতার বড় বড় বিলাতী কোম্পানীগুলির ক্যাশিয়ার, বড়বাবু বা বেনিয়ানরা। বিদেশী শাসকের পক্ষে শাসনযন্ত্রের প্রতি শাসিতের এই মমত্ববোধ সৃষ্টির সার্থকতা সামান্য নয়।

তার চাইতেও বড় কারণ আছে। সে কারণ রাজনৈতিক। স্বীকার করতেই হবে যে, কিছুকাল পূর্বেও ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত ছিল রাজনৈতিক চেতনাহীন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাব ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণ অস্ত্র ধরেনি। আধুনিক কালেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাবে জাতীয় জাগরণের চিহ্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। গদর দল ও কোমাগাটামারুকে নিয়ে

যারা পাঞ্জাবের দেশপ্রাণতার প্রশস্তি রচনা করেন, তাঁদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সে পাঞ্জাবীরা বিদেশে গিয়েই দেশাত্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, দেশে থাকতে নয়। সাধারণ পাঞ্জাবী সচ্ছল জীবনযাত্রা, মোটা মাইনে, অজস্র আহার ও দামী পোষাক পেলেই খুশি থাকে, দেশ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। ভগৎ সিং-এরা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র।

ভারতীয় সেনা বিভাগে বাঙালীরাই সব চেয়ে বেশী অবাঞ্ছিত। আর্মির মনুসংহিতায় তারা হরিজন। আশ্চর্য নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ থেকে শুরু করে তারাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিবাদ করেছে অবিরত, সংগ্রাম করে আসছে অমিত তেজে। ভারতের আধুনিক জাতীয় জাগরণের প্রথম উন্মেষ ঘটেছে এইখানে। জাতীয় যজ্ঞে এখানে মায়েরা আহুতি দিয়েছে পুত্র, মেয়েরা দিয়েছে প্রেরণা, ছেলেরা দিয়েছে প্রাণ। এদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে কার্জন করেছে বঙ্গ-ভঙ্গ, হার্ডিঞ্জ স্থানান্তরিত করেছে রাজধানী, ম্যাকডোন্যাল্ড কায়েম করেছে কমিউন্যাল এওয়ার্ড। সর্বনাশ! এদের সেনাদলে নিলে রক্ষা আছে? এইখানে স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছিল বাংলাদেশেরই এক ছাউনিতে। ব্যারাকপুরে।

'সামরিক জাতির' প্রতি এই পক্ষপাত ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই। অভাব অভিযোগের ফলে পাছে তাদের ব্রিটিশ-অনুরক্তি হ্রাস পায় সেজন্য ব্রিটিশ শাসকেরা এই 'সামরিক জাতির' পার্থিব কল্যাণ সাধনে অনেকটা তৎপর হয়েছেন, সে কথাও সত্য। সেনা বিভাগের বেতনের হার ও পেন্সন সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীর পক্ষে যথেষ্ট লোভনীয়। তা ছাড়া বার্ধক্যে অবসর গ্রহণকালে অনেকে জায়গীরও পেয়েছে।

পাঞ্জাব সেনাবিভাগের সৈন্য ও অশ্ব যোগায়, তাই পাঞ্জাব সর্বদাই কর্তৃপক্ষের অধিকতর সস্নেহ মনোযোগ লাভ করে এসেছে। কৃষির উন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নয়ন-পরিকল্পনা পাঞ্জাবে হয়েছে বেশী। সমবায় আন্দোলন ও কৃষিবিদ্যার গবেষণা শুরু হয়েছে সেখানে এবং ভারতে ব্রিটিশ যুগের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও ব্যয়বহুল কৃত্রিম সেচকার্যের নিদর্শন আছে পাঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে। সেখানে বেশীর ভাগ চাষীরই ক্ষেতে ধান, গোয়ালে গরু এবং ঘরে আর্মির মেডেল আছে। সেখানে সাহেবকে বলে হুজুর, দারোগাকে বলে ধর্মাবতার, গভর্নমেন্টকে বলে সরকার বাহাদুর। সেখানে স্বরাজের গরজ থাকবে কার?

কিন্তু বন্যা যখন আসে, তখন তাকে বালির বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যায় ক'দিন? সমুদ্র যদি ক্যানুটের আদেশ মেনেই চলতো তবে আর ভাবনা ছিল কী? সমস্ত প্রতিষেধক ও সাবধানতা ব্যর্থ করে দেশাত্মবোধের ধারা এগিয়ে এসেছে ধীরে ধীরে। ভারতবর্ষের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—কোথাও কোনো প্রান্তে তার আর বাধা রইল না। পশ্চিম সীমান্তে খান আব্দুল গফ্ফুর খান এই ভাবগঙ্গার ভগীরথ।

এই বহু অনুগৃহীত অঞ্চলের রাজনীতির সম্পর্কবর্জিত সরল অধিবাসীদেরও তাদের স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এখন আর আগের মতো নিরাপদ নয়। বোধ হয় অনেকেই জানেন না যে, উনিশ শ ত্রিশ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কালে একদল হিন্দু গাড়োয়াল সৈন্য পেশোয়ারে মুস্লিম স্বেচ্ছাসেবকদের

উপরে গুলীবর্ষণে অস্বীকৃত হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল। সে সংবাদ এদেশের খবরের কাগজে প্রকাশ পায়নি, অর্থাৎ প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি।

সম্প্রদায়ের দিক দিয়ে উনিশ শ একচল্লিশ সাল পর্যন্ত এই সেনাদলের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ ছিল মুসলমান, তেইশ ভাগ শিখ ও বিয়াল্লিশ ভাগ হিন্দু। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ হিসাব থেকেও হিন্দুদের বিরুদ্ধে বহুপ্রচারিত সামরিক অযোগ্যতার অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

খুব সামান্য হলেও ভারতবর্ষের সামরিক নীতির প্রথম পরিবর্তন ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর। একান্তভাবে য়ুরোপীয় অফিসার পরিচালিত বাহিনীর সামান্য অংশ ভারতীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতীয়েরা সেনাবিভাগে কিংস কমিশন প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হয় এবং ভারতীয় সেনানায়কদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দেরাদুনে ভারতীয় স্যান্ডহার্স্ট-এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

বর্তমান যুদ্ধে এই ভারতীয়করণ দ্রুত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয়দের প্রতি মমত্ববোধে নয়। ইংরেজের নিজ প্রয়োজনের তাগিদে। অসামরিক জাতি বলে সেনাবিভাগে ইতিপূর্বে যাদের প্রবেশের সম্ভাবনা মাত্র ছিল না, তারাও এখন অফিসার হতে পারে। অবশ্য এই বাধা অপসারণের ফলে সেনাবিভাগে বাঙালীর সংখ্যা এখনও খুব উল্লেখযোগ্য বলে আমার বিশ্বাস নেই, যদিও বিমানবহরে তাদের সংখ্যা তেমন হতাশাজনক নয়। সুদক্ষ বৈমানিকরূপে কয়েক জন বাঙালী তরুণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেছেন।

এতকাল ভারতবর্ষে দেশরক্ষার ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। কমান্ডার-ইন-চীফের সবগুলি কামানের মুখ ছিল আফ্রিদিদের দিকে। একচক্ষু হরিণের মতো পার্ল হারবার বিধ্বস্ত হওয়ার পরে সেনাপতিরা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলেন, বিপদ ঠিক সে দিক থেকেই উপস্থিত যে দিকে তার সম্ভাবনা তাঁরা কল্পনাও করেননি।

যুদ্ধশাস্ত্র মতে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন নৌবহর। তা নেই। জলপথ সবটাই শত্রুর দখলে। ব্রিটিশ ও ভারতীয় যে পেশাদার সেনাবাহিনী ভারতে বর্তমান, তা আধুনিক যুদ্ধযন্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত নয় এবং তাদের ঘাঁটিগুলি সম্ভাবিত রণক্ষেত্র থেকে বহু শত যোজন দূরে দেশের অপর প্রান্তে।

এই আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার উপায় কী, এ প্রশ্ন সামরিক কর্তৃপক্ষের মনে উদিত হয়েছে কিনা জানার উপায় নেই। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রহীন যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞতাশূন্য জনসাধারণের মনে এ জিজ্ঞাসা জেগেছে। অবশেষে একজন এই প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ করলেন। তাঁর নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

পঞ্চাশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন জওহরলাল। কাশ্মীরী পণ্ডিতের বংশধর তিনি। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ রাজকাউল ছিলেন প্রখ্যাতনামা পার্শি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, প্রপিতামহ লক্ষ্মীনারায়ণ নেহরু ছিলেন মুঘল দরবারে নামকরা ব্যবহারজীবী। এডভোকেট জনকের সন্তান জওহরলাল নিজেও মসিজীবীরূপেই কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। দেশরক্ষার আয়োজনে তিনিই সর্বপ্রথম পরিকল্পনা করলেন সর্বসাধারণের অসিচালনার। জনগণের কথা যিনি ভাবেন তাঁকেই তো আমরা বলি জনগণ-মন-অধিনায়ক।

অস্ত্র ? চাই বৈকি। অবশ্যই চাই। পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্যের অস্ত্র যোগাতে দেশে নতুন কলকারখানা স্থাপন ও পুরাতন কলকারখানার বিস্তার প্রয়োজন। সেটা সময়সাপেক্ষ। শত্রু তো তার জন্য অপেক্ষা করবে না। পণ্ডিতজী অত্যন্ত নিকটে থেকে গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন স্পেন ও চীনের গণবাহিনীর যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধরীতি। স্পেনে চাষী মজুরদের সমিতি থেকেই গড়ে উঠেছিল সেনাবাহিনী। তার মধ্যে থেকেই উদ্ভব হয়েছে একাধিক সেনাপতির যারা প্রথম জীবনে কেউ চালিয়েছে লাঙ্গল, কেউ বুনেছে তাঁত। চীন থেকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার লোক আনার পরিকল্পনা করলেন জওহরলাল।

গতিশীলতা ইংরেজীতে যাকে বলে মোবিলিটি, সেই হলো এই বাহিনীর সর্বাপেক্ষা সুবিধা। রাইফেলের অভাবে হাত বোমা দিয়ে এর কাজ চলে। সর্বত্র এদের সহযোগিতার জন্য গ্রামবাসীরা হতো ব্যগ্র। ক্ষুধায় অন্ন এবং বিপদে আশ্রয় জোগাতো তারা। দেশপ্রাণতার প্রেরণায় এই বাহিনীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকতো। য়ুরোপীয় পরিচালনায় বেতনভুক সৈন্যদলের মতো তারা আদেশ পালনের যন্ত্রমাত্র হতো না!

জনশ্রুতি এই যে, কোনো কোনো ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষও এই পরিকল্পনা শ্রদ্ধার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিলাত থেকে মেজর টম উইনট্রিংহ্যাম্ ভারতবর্ষে এসে এই সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন এমন প্রস্তাবও শোনা গেছে। উইনট্রিংহ্যাম্ স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় গণতান্ত্রিক দলের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরুর পরিকল্পনা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রীতির চোখে দেখবেন এ আশা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা যাই হোন মানবচরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। তাঁদের জানা উচিত ছিল, ব্রিটিশ প্রস্তাবে সৈন্যসামন্ত বা অস্ত্রশস্ত্রের কথা থাকে না। থাকে পেট্রোল, স্টেশনারী ও ক্যাণ্টিন্। রুল্ ব্রিটেনিয়া, ব্রিটেনিয়া রুল্‌স দি ওয়েভ্‌স্।

ইম্পিরিয়্যাল হোটেল থেকে ফিরছি স্বস্থানে। গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখি হঠাৎ ব্রেক কষে সশব্দে একটি গাড়ী দাঁড়াল একেবারে ঠিক সামনে। গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আরোহীটি বললেন, "তাই তো, আমাদের বোঁচ্‌কা যে ! এখানে কী করছিস ? আয় উঠে আয়।"

বোঁচ্‌কা আমার পিতৃ বা মাতৃদত্ত নাম নয়। পারিবারিক সম্বোধনও নয়। কিশোর বয়সে সহপাঠীদের দ্বারা আবিষ্কৃত উত্যক্ত করার একটি অভিধা মাত্র। লাটিমের অধিকার, আমসত্ত্বের অংশ ও বিস্কুটের বণ্টন নিয়ে মতভেদজনিত কলহের পরিণামে বিক্ষুব্ধ পক্ষ ঐ শব্দটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিদ্বারা আমার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করত এবং বহুল পরিমাণে সফলকাম হতো। মনে আছে, অনেকদিন খেলার মাঠে বা ক্লাশে ঐ নামটা শুনে ক্রোধে ও অপমানে প্রচুর অশ্রুপাত করেছি।

নামটা একেবারে আকস্মিক নয়। তার পশ্চাতে কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে।

প্রথমে যেদিন বৃন্দাবন পণ্ডিতের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ, সে দিন দিদিমা একখানা শান্তিপুরী জাড়িপাড় ধুতি ও সিল্কের জামা পরিয়ে দিয়েছিলেন। পোষাকটা গুরুগৃহগামী ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থীর চাইতে সদ্য বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে আগত জামাতা বাবাজীর পক্ষেই অধিকতর উপযোগী ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপদ দেখা দিল

বস্ত্রটি নিয়েই। প্রথমতঃ তার অবস্থান যথাস্থানে রাখা রীতিমতো আয়াসসাধ্য ব্যাপার, তার উপরে সযত্নে কুঞ্চিত লম্ববান কোঁচার প্রান্তভাগ মাধ্যাকর্ষণের ফলে কেবলই নিম্নাভিমুখি হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়। এক হাতে শ্লেট ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ-পরিচয়, অপরহাতে ধৃত শিথিলবন্ধন বসনের প্রান্তভাগ। কোনোরকমে তালপাকানো অঞ্চলভাগ, দেখতে পোঁটলা আকৃতি।

গোঁসাইদের বাড়ির সিধু ছিল পাঠশালার সর্বাপেক্ষা বখা ছেলে। বয়সে অন্য ছাত্রদের চাইতে অনেক বড়। লেখাপড়ায় বৃহস্পতি। বার দুই ধরে এক ক্লাশেই আছে। এরই মধ্যে বিড়ি ধরেছে। কাছে এসে অত্যন্ত নিরীহের মতো প্রশ্ন করল, "হাতে বোঁচকাটি কিসের বাপু, মুড়কির না বাতাসার ?"

ক্লাশ সুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। সেই থেকে শুরু হলো বোঁচকা। খাতা নিয়ে, পেন্সিল নিয়ে ঝগড়া হলেই বলে, বোঁচ্কা। সিধুকে কত সাধ্য সাধনা করেছি। এন্তার মার্বেল, রাশি রাশি জলছবি ঘুষ দিয়েছি। আর যেন কোনদিন না বলে। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জিনিষগুলি পকেটে পুরে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, "ক্ষেপেছিস ? আর বলি কখনো বোঁচ্কা ? তোর ঐ লাল পেন্সিলটা কিন্তু আমায় দিতে হবে।"

কিশোর বালকের পক্ষে সেদিন ঐ লাল পেন্সিলটা দান করা কর্ণের কবচকুণ্ডল দানের চাইতে কোনো অংশে কম কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতেও স্বীকৃত হয়েছি। অত্যন্ত অনুনয় করে বলেছি, "দেখ ভাই। অন্য ছেলেরা যেন আর না বলে, বারণ করে দিয়ো।"

সিধু পেন্সিলটার ডগায় জিভের লালা লাগিয়ে কাগজে মোটা অক্ষরে নিজের নাম লিখতে লিখতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করল, "হুঃ, বলুক দেখি সাহস আছে কোন্ শা—"

সিধুর বিবাহের নিকট বা সুদূর কোনো সম্ভাবনাই তখন ছিল না। কিন্তু তার সম্ভবপর পত্নীর কাল্পনিক সহোদরের উল্লেখ না করে কোনো একটা বাক্য সমাপ্ত এবং আরম্ভ করা তার পক্ষে কঠিন। ঐ বয়সেই ভাষায় তার এমন শব্দসম্ভার যা এবয়সেও উচ্চারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি দান ও তা পালনের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন নিয়ে সিধুর কোনো চিন্তা ছিল না। এ বিষয়ে তার রেকর্ড প্রায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমতুল্য। পরের দিনই ক্লাশে পণ্ডিত মহাশয়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও পিছনের বেঞ্চি থেকে পরিচিত কণ্ঠের চাপা স্বরে আওয়াজ এল, বোঁচ্—অমনি চারিদিক থেকে অন্য ছাত্রেরা শ্লেটের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করলো—হিঃ হিঃ হুঃ হুঃ, ফিক্।

কাছে এসে দেখি সিধুই বটে। যদিও চেনা খুব সহজ নয়। পরনে লাইট গ্রে রং-এর শার্কস্কিনের মহার্ঘ স্যুট, পায়ে দামী বিলাতী জুতো যার চক্‌মক করা পালিশে প্রায় মুখ দেখা যায়। দুই হাতে গোটা চারেক আংটি, পকেটে পার্কার ফিফ্‌টি ওয়ান কলম ও পেন্সিলের সেট, যা একমাত্র এমেরিকান সেনানায়কদের কাছে ছাড়া এদেশে এখনও আর কেউ দেখেনি বললেই হয়। এই কি সেই সিধু যে পাঁচ বছর আগে পটলডাঙার পাইস হোটেলের নীচের তলায় এক টাকা বারো আনা ভাড়ায় আর দু'জন লোকের সঙ্গে একটা অন্ধকার কুঠুরিতে থাকতো ? কোন তেলের কলের বিল কালেক্টর ছিল, মাইনে আঠারো টাকা। চিবুকের নীচে কালো বড় আঁচিলটা

না থাকলে সিধু বলে বিশ্বাস করাই কঠিন হতো।

"তুই এখানে কেন? বিলাত থেকে ফিরলি কবে? বিয়ে থা করেছিস তো?" এক সঙ্গে তিনটা প্রশ্ন করল সিধু।

"সে-সব পরে হবে, তোমার খবর কি বল দেখি?"

"আমার খবর ভালো। মিলিটারি কনট্রাক্ট করছি। হাতে দু'পয়সা আসছে রে।" সে-কথা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন ছিল না।

তার কাহিনী যা শোনা গেল, সংক্ষেপে তা এই ঃ—তেলের কলের সেই চাকরি ছেড়ে সে অনেক কিছু করেছে। সাবানের ক্যানভাসারি, এক টাকার ইনসিওরেন্সের দালালী, মায় কাগজের প্যাকেটে চানাচুর বিক্রি পর্যন্ত। কোনোটাতেই কিছু হয় না। মাসের মধ্যে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোটে না অনেকদিন, এমন অবস্থা। হঠাৎ বাধলো যুদ্ধ। এরোড্রোম তৈরী করে এমন এক কনট্রাক্টরের অধীনে কুলি-তদারকের কাজ নিয়ে চলে গেল আসামের কোন জঙ্গলে। সেখানেই কপাল ফিরল। কিছু হাতে নিয়ে এসে বসল কলকাতায়। প্রথমে ছোট-খাটো জিনিস সাপ্লাই, পরে বড় বড় কনট্রাক্ট। এখন দিল্লীতে এসেছে ডিপার্টমেন্টের কোন এক বড় সাহেবকে ধরতে।

পুরানো দিল্লীর সুইস হোটেলে তার আস্তানা। সেখানে এসে গাড়ি থেকে নেমে নিয়ে গেল তার ঘরে। জিজ্ঞাসা করল, "থাকিস কোথায়? কুইনসওয়ে? আচ্ছা গাড়ি তোকে নামিয়ে দেবে সেখানে। এই দেখো ড্রাইভার, আভি ঠাহরো। এ সাবকো কুইনসওয়ে ছোড়নে পড়েগা।" কুলির তদারক করে হিন্দীটা রপ্ত করেছে সিধু মন্দ নয়।

বাধা দিয়ে বললেম, "না না, আমার জন্য ভাবনা নেই। আমি বাস নেবো এখান থেকে।"

"ক্ষ্যাপা নাকি? বাসে যা ঝাঁকুনি আর যা ভিড়! ভদ্রলোকের ওঠা দায়। গাড়ি থাকতে সে দুর্ভোগ কেন? ভাড়া তো তাকে পুরো দিনের জন্যই দিচ্ছি।"

এতক্ষণে বুঝলেম, গাড়িটা ট্যাক্সি এবং সমস্ত দিনের জন্যই ভাড়া করা হয়েছে। নয়াদিল্লীর ট্যাক্সিতে মিটার নেই, তার নম্বরও 'টি' দিয়ে আরম্ভ নয়। না জানলে বুঝবার সাধ্য নেই যে, ভাড়াটে গাড়ি। কিন্তু বিস্ময়ের অন্ত পাইনে। ঝাঁকুনি আর ভিড়ের জন্য সিধুর ন্যায় ভদ্রব্যক্তির বাসে ওঠা দায়। মনে আছে, পটলডাঙ্গা থেকে দুপুর রোদে পায়ে হেঁটে একদিন টালিগঞ্জে দেখা করতে এসেছিল এই সিধু। সে খুব বেশী দিনের কথা নয়।

বয়কে হুইস্কি হুকুম করল সিধু। নিষেধ করলেম। হেসে বলল, "ভাবছিস বুঝি 'সোলান' কিম্বা 'মারি'? ওসব দেশী মাল ছোঁবে এমন শর্মা নয় সিধুচন্দ্র। চেখেই দেখ না। খাস স্কচ। খাসা। বাবা খাবো তো খাঁটি জিনিষ খাবো, নয়তো নয়।"

"সে জন্য নয়। কিন্তু স্কচ পাও কোথায়? বাজারে তো শুনেছি—।"

"হ্যাঁ, সাদা বাজারে নেই, কিন্তু কালো বাজারে অভাব কী? ভাইরে, সবই টাকার মামলা। ঝনঝনে ফেলো, জিনিস দেবে না কোন শা—"

স্বচক্ষে দেখলাম কথায় এবং কাজে তফাত করে না সিধু। তিন বোতল সোডা কিনে এনে একটা পাঁচ টাকার নোটের অবশিষ্ট ফেরত দিচ্ছিল বেয়ারা। "ঠিক হ্যায়,

লে যাও” বলে’ অত্যন্ত নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে সমস্তটাই বকশিস করল তাকে। লোকটা আভূমিপ্রণত সেলাম করে প্রস্থান করল।

সিধু তার বর্তমান দিল্লী আগমনের কারণ ব্যক্ত করল। কলকাতায় ছোট সাহেব নাকি তার নামে লাগিয়েছে অনেক কিছু। এখান থেকে তাই তার ফ্যাক্টরী দেখতে যাবে কোনো একজন অফিসার। সুতরাং একটু ভাবনায় ফেলেছে।

ভাবনাটা কিসের ঠিক বুঝতে পারলেম না। দেখে আসুক না ফ্যাক্টরী, ক্ষতিটা কিসের ?

সিধু বিরক্ত হয়ে বললো, “আরে ফ্যাক্টরী থাকলে তো দেখবে ? ফ্যাক্টরীই নেই যে।”

“ফ্যাক্টরী নেই, তবে মাল যোগাচ্ছ কেমন করে ?”

“তুই এখনও সেই বোঁচকাই আছিস। বিলাত ঘুরেও বুদ্ধি খুলল না এতটুকু! আরে মাল যোগাবার জন্যে ফ্যাক্টরী থাকার দরকার কী ? অন্য লোকের ফ্যাক্টরী নেই ? সেখান থেকে তৈরী করিয়ে নিজের লেবেলে চালাতে আটকাবে কোন শা—? ছাপাখানার কিছুটা খরচ আছে! খানকয়েক চালান ফরম, লেটার হেড, রাবার স্ট্যাম্প, ব্যস। অর্ডার কি ফ্যাক্টরী দেখে হয় ? অর্ডার তো হয়” বলে’ মুখে চোখে এমন একটা ইঙ্গিত করল যে, তার অর্থ কিছুটা স্পষ্ট ও কিছুটা ঝাপসা হয়ে আমার কাছে একটা প্রহেলিকা সৃষ্টি হলো!

জিজ্ঞাসা করলেম, “মাল যোগাচ্ছ এত দিন, এর মধ্যে তোমার ফ্যাক্টরী আছে কি নেই সে-খোঁজ হয়নি ?”

“হবে না কেন ? তিন চার বার ইন্সপেকশন হয়ে ভালো রিপোর্ট চলে গেছে। এবারও কি যেত না ? শা—ছোট সায়েব ব্যাটার খাই বেড়েছে এত যে, আর মিটাতে পারছি নে। তাই না এ-ঝামেলা। যাক, পরোয়া করি নে। জানতে পারব সবই।”

“কেমন করে ?”

“কেন, আপিসের কেরানীরাই খবর দেবে। দেবে না ? আরে ভাই দেবে কি আর অমনি ? সংসারে বিনিপয়সায় পরহিতার্থে আর কাজ করে কোন শা—? আশী টাকার কেরানী, একসঙ্গে পাঁচ শ’ টাকা দেখেছে এর আগে ? খবর তো খবর, দরকার হলে ফাইলকে ফাইল গাপ করিয়ে দেওয়ার দাওয়াই পর্যন্ত জানি। এই যে মধুবাবু, আসুন আসুন। কী খবর ? আচ্ছা এক মিনিট বোস ভাই, এঁর সঙ্গে একটু প্রাইভেট,—চলুন মধুবাবু বারান্দায়।” সদ্য আগত আগন্তুককে নিয়ে বাইরে গেল সিধু।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে ফিরে এসে বলল,—“মোটা হাতে কিছু ঢালতে হবে দেখছি। যাক পরে পুষিয়ে নেবো।”

বিস্মিত হওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। শুধু জিজ্ঞাসা করলেম, “আচ্ছা এসব কি শেষ পর্যন্ত চাপা থাকে ? ডিপার্টমেন্টের অন্য লোকেরা কি জানতে পারে না ?”

“কেমন করে জানবে ? এই যে এসেছিলেন ভদ্রলোক, খবর দিয়ে গেলেন কোন সায়েব যাচ্ছে এখান থেকে তদন্ত করতে, কবে যাচ্ছে ইত্যাদি। আপিসে যখন যাবো তখন উনি কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন, না কিছু ? এমন ভাব দেখাবেন যে, জীবনে

এর আগে কখনও আমাকে চোখেও দেখেননি। ব্যাস, তা হলেই হলো। 'সব কাজেরই সিস্টেম আছে তো ?"

একজন বেয়ারা গোটা দুই বিরাট প্যাকেট নিয়ে এসে বলল, "ফেল্পস্ কোম্পানি পাঠিয়েছে।" সিধু বললে, "ঠিক হ্যায়। কাল দোকানে সওদা করেছি কিছু। তাই পাঠিয়েছে। দেখ তো জিনিসগুলি। তোরা মডার্ন টেস্টের লোক, আপ-টু-ডেট ফ্যাশানের খবর রাখিস। হ্যাঁ, সার্ট। এক ডজন। ছাব্বিশ টাকা পনেরো আনা করে একটা। ওদের সেই পনেরো আনার কায়দা জানিস তো? পুরা সাতাশ টাকা লিখবে না কিছুতেই। রুমাল! হ্যাঁ, পিরামিড। ডজন সত্তর টাকা। পাওয়া যে যাচ্ছে এই ঢের, সত্তর হলেই কী, আশী হলেই কী? এটাকে কী বলে রে? দেখছি আজকাল এমেরিকান সাহেবেরা পরে খুব। ডার্কিন? ডার্কিন নয়? তবে কী? জার্কিন? বর্গীয় জ-য়ে আকার তো? দোকানে তো আর জিনিষের নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি নে। ভাববে কী? কিনলেম তো, কখন পরবো সে পরে দেখা যাবে। দাম বেশী নয়। দু'শ' আশী টাকা। চামরাটা ভালো কোয়ালিটির।" বিল দেখলাম আরও খুঁটি-নাটি অনেক কিছু মিলিয়ে সাত শ' টাকার উপরে। সায়েব তার ওয়ালেট খুলে দু'খানা পাঁচ শ' টাকার নোট বেয়ারার হাতে দিল দাম চুকিয়ে দিতে।

চুপ করে স্মরণ করতে চেষ্টা করলেম, এর আগে ঠিক কখন সিধুর গায়ে তালিহীন জামা দেখেছি।

প্রচুর আদর আপ্যায়ন করল সিধু। বাল্যবন্ধুর প্রতি তার এই সহৃদয়তা দেখে মুগ্ধ হওয়া উচিত। তার চালচলন দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আমাকে দশ বছর মাইনে-করা কর্মচারী করে রাখার মতো অর্থ আছে তার ব্যাঙ্কে। কিন্তু কর্মচারীর বদলে অংশীদার করতে চাইল। বললে, "আরে ব্যারিস্টার হবি যখন হবি। এখন খবরের কাগজে রিপোর্ট লিখে আর ক'টাকা আসবে? তার চেয়ে আমার সঙ্গে জুটে যা, নেহাত মন্দ হবে না। আমারও সুবিধে হবে, চিঠিপত্র লেখা, সায়েব সুবোর সঙ্গে কথাবার্তা বলা তো আমার আসে না।"

হেসে বললেম, "তার দরকার কী? তুমি যা বলছো তাতে কনট্রাক্ট পেতে ওসবের যে কিছু দরকার আছে তা তো মনে হয় না। তোমার হয়ে তোমার টাকাই কথাবার্তা কইবে।"

"নেহাত মিথ্যে বলিসনি। যে-পুজোর যে-বিধি তা না হলে কিছুই হয় না। তবে হ্যাঁ, ইংরেজী বলতে কইতে পারে, লিখতে পারে এমন লোক থাকলে আরও সুবিধে। তোকে পেলে আমি এখন যা পাচ্ছি তার ডবল আয় করতে পারি। বলেছিলাম নিত্যানন্দকে। মনে নেই তাকে? সেই যে পুরুত ঠাকুরের ছেলে নিতাই রে। পাঠশালায় একদিন তার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছিলেম। আর কথা কইতে পারে না। কেবলই হাত দিয়ে ইশারা করে জবাব দেয়। শেষে পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে পৈতে ধার করে কথা বলল। নালিশের ফলে শাস্তি পেলাম দু'ঘণ্টা দুই কানে ধরে বেঞ্চির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা। সেই নিত্যানন্দ এখন ডেপুটি হয়েছে। মাঝে ক'দিন সাপ্লাইর কাজে ছিল। রাস্তা বাতলে দিলেম, কী করলে দু'পয়সা হবে। বলে কিনা, 'সিধু, ছেলেবেলায় ইস্কুলে অনেক অকাজ কুকাজ করেছিস, বড় হয়ে এখন আর করিস

নে।' শোন কথা একবার! টাকা উপায় করতে আমি করছি ঠিকাদারী, তুই করছিস চাকরি। যাতে দু'পয়সা উপরি আসে তার চেষ্টা করব, তাতে কুকাজটা কোন্‌খানে? হরিনাম জপতে তুইও আসিসনি, আমিও বসিনি।"

যাক, তবু ভালো। সংসারে তাহলে দু'একটা লোক এখনও আছে যারা ব্যাংকের পাশ বইর উপরে দৃষ্টি রাখাটাই জীবনের চরম মোক্ষ মনে করে না।

সিধু বলল, "হ্যাঁ লাভটা কি হচ্ছে? ওর সঙ্গে কাজ করতো আর এক অফিসার, সে লেক রোডে বাড়ি কিনেছে দু'খানা, গাড়ি কিনেছে। তার বউ-এর গায়ে হীরার গয়না। আর আমাদের নিত্যানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে বসে আছেন। বাদুড়-ঝোলা হয়ে ট্রামে চেপে আপিসে যায়, ওয়াছেল মোল্লার সুট পরে। আহাম্মক এক নম্বরের।"

তাতে আর সন্দেহ কি!

জিজ্ঞাসা করলেম, "আচ্ছা ভাই, যুদ্ধের বাজারে কি অনেস্টি বলতে কোথাও কিছু আর অবশিষ্ট নেই?"

"অনেস্টি? তার মানে সততা? ভায়া হে, ওসব ভালো ভালো কথা যা আমরা ছেলেবেলায় কপিবুকে লিখেছি—না, লিখেছি বলা ঠিক নয়; আমি তো লেখাপড়ার ধার ধারতেম না, কেবল মাস্টারের বেতই খেয়েছি—তোরা লিখেছিস, ওসব ছাপার বইতে থাকে,—ছেলেবেলায় মুখস্থ করতে মন্দ লাগে না। কিন্তু সংসারে ওসব ফালতু। এই বুকে হাত দিয়ে বলছি বোঁচ্‌কা, জানবি, এমন কোন লোকই নেই যাকে কেনা যায় না। দামের কম বেশী নিয়ে কথা। কেরানীবাবুকে দিতে হয় দশ, বড়বাবুকে পঁচিশ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পঞ্চাশ, ইন্সপেক্টরকে এক শ'। যত বেশী মাইনের অফিসার, তত বেশী তাঁর দক্ষিণা। টাকায় না হয় এমন কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়তো সোজাসুজি টাকাটা নিতে ভয় পায়। তাদের বেলায় বিলাতী হলে পাঠাবে এক কেস্ 'হোয়াইট লেবেল, দেশী হলে মেয়ের বিয়েতে দেবে বেনারসী শাড়ি।"

সিধুচন্দ্রের ওখানে ডিনার খেয়ে তারই ভাড়া করা ট্যাক্সি চেপে বাড়ি ফিরলেম অনেক রাত্রে। অনেকগুলি সিগারেট ভরে দিয়েছিল আমার সিগারেট কেসে। 'ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট'। শাদা আর কালো। শাদা বাজারে তার দর্শন এখন দুর্লভ! কিন্তু কালো বাজারে অভাব কী? দেশে অভাব কী সিধুচন্দ্রের?

এগারো

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, রাজদর্শনে পুণ্যলাভ। অমাত্যদর্শনেও পুণ্য আছে কিনা জানিনে। বোধ হয় আছে। নইলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের বাড়িতে প্রত্যহ ভিড় জমে কেন। ভিড় জনতার নয়, আই. সি. এস-এর।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের সুদৃশ্য বাংলোর সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ অঙ্গনে অপরাহ্নে গৃহস্বামী বসেন বিশ্রম্ভালাপে। হাতের কাছে ছোট টিপাইর উপরে টেলীফোন, সুদীর্ঘ তারের সাহায্যে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কক্ষে প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে সুইচ আছে। কে কথা বলেন এবং কি কথা বলেন তার গুরুত্ব

বিচার করে সেক্রেটারী সুইচের দ্বারা মনিবের টেলিফোনের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করেন। খান দশ বারো চেয়ার। বেতের। সবুজ রংয়ের ভালস্পার এনামেলে স্প্রে-পেইন্ট করা। বাগানে কাঠের চেয়ার ব্যবহার আভিজাত্যের চিহ্ন নয়। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহ সমন্বিত সৌরমণ্ডলের ন্যায় আই. সি. এস-পরিবৃত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরের সান্ধ্য সভাতল। অমাত্যের প্রাত্যহিক আসর। সে আসর গুণিজনের নয়, ধনীজনের।

পরিধানে শাদা শার্টিন জিনের ট্রাউজার্স ও হাতকাটা হাফসার্ট। টাই নেই, কোটও না। নয়াদিল্লীতে গ্রীষ্মকালে ঐটেই রীতি। আপিস থেকে ডিনার পর্যন্ত ঐ পোষাকই সর্বজনগ্রাহ্য। যাঁরা বয়সে তরুণ, তাঁরা সার্টের বদলে পরেন স্পোর্ট সার্ট। সেটা আরও বেশী স্মার্ট। মোজাহীন চরণে শাদা কাবুলী চপ্পল। আর্মিতে খাকীর মতো সিভিলিয়নদেরও য়ুনিফর্ম আছে। সে য়ুনিফর্ম লিখিত অনুশাসনের নয়, অলিখিত ফ্যাশনের। ঠিক যেমন বিয়ের বরযাত্রীদের গিলে-কোঁচানো ধুতি আর সোনার বোতামওয়ালা পাঞ্জাবি। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বাঙালী, সিন্ধী,—সব আই. সি. এস-এরই এক বেশ, এক ভাষা। বলা বাহুল্য, দুটোর একটাও তাদের স্বজাতীয় নয়।

যে-বন্ধুকে কাণ্ডারী করে এই সভার্ণবে প্রবেশ করা গেল তিনি গভর্নমেন্টের একজন পদস্থ অফিসার। প্রৌঢ়, অপত্নীক এবং অত্যন্ত সদাশয়। বহুপরিচিত ব্যক্তি। এমন গৃহ অল্প যেখানে তাঁর গতি নেই, এমন গৃহিণী অল্পতর যার ডিনার পার্টিতে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই।

পুরুষ মাত্রেরই বউ না থাকলে বাতিক থাকে। কারো তাস, কারো থিয়েটার, কারো দেশোদ্ধার, আর কারো বা সাহিত্য কিংবা স্বামীজি। এ-ভদ্রলোকের বাতিক পোষাকের। সবচেয়ে ভালো পোষাকের সাহেব—বেস্ট ড্রেসড্ ম্যান—বলে নয়াদিল্লীতে তাঁর পরিচিতি। গল্প আছে যে চার দিনের জন্য একবার হঠাৎ তাঁকে ট্যুরে যেতে হয়। তাড়াতাড়িতে জামাকাপড় বেশী সঙ্গে নেওয়ার অবকাশ না পাওয়াতে মাত্র দুটো ওয়ার্ড্রোব ট্রাংক ও একটা সুটকেশ নিয়েই নাকি তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়। সেগুলির গর্ভে শুধু গোটা পনেরো সুট, দেড় ডজন সার্ট, দশটা টাই ও কুড়িখানা রুমাল ছিল। ভাঁজভাঙা সার্ট বা ক্রীজহীন প্যান্ট পরতে দেখেনি তাঁকে কেউ কোনোদিন। সকালবেলা গয়লা, খবরের কাগজওয়ালার মতই তাঁর বাড়িতে প্রত্যহ নিয়মিত ধোবা আসে বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, স্লিপিং ও জামা কাপড় প্রেস করে দিতে। বন্ধুরা ঠাট্টা করে পরামর্শ দেন, আপিসে একটা ইলেকট্রিক আয়রন রাখতে—বড় সাহেবের ঘরে ঢুকবার আগে একবার তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা ইস্ত্রি করে নিতে পারবেন।

জামাকাপড়ের প্রতি ভদ্রলোকের মনোযোগ আছে, কিন্তু আসক্তি নেই। সুদৃশ্য টাই, মনোরম মাফ্‌লার অকাতরে দান করেন আপন বন্ধুদের। গৃহে সর্বদা আতিথ্যের অকৃপণ আয়োজন। এমন অমায়িক প্রকৃতির লোক বেশী চোখে পড়ে না।

ইনি হচ্ছেন সেই স্বল্প সংখ্যক ভারতীয়দের অন্যতম যাঁদের সাহেব সম্পর্কে কোন দুর্বলতা নেই। একবার বম্বের পথে মাঝ রাত্রিতে এক স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠছিলেন। প্রথম শ্রেণীর কামরায় এক সাহেব দরজা-জানালা বন্ধ করে নিদ্রা দিচ্ছিলেন।

হাঁকাহাঁকিতে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে দ্বার খুলে দেখলেন কালা আদমী। 'ভাগো' বলে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করলেন। কিন্তু এ কালা আদমীটি অন্য জাতের। সাহেব দেখেই পশ্চাদপসরণের পাত্র নন। স্টেশন মাস্টার এসে অন্য গাড়ীতে তাঁর জায়গা করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। সাহেব তো গোটা কামরাটা রিজার্ভ করেনি, সুতরাং ঐ কামরাতেই তাঁর যাওয়া চাই।

এতে সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। একটা নেটিভের স্পর্ধা দেখ একবার। না হয় টাকা আছে, ফার্স্ট ক্লাশের টিকিটই কিনেছে। কিন্তু তা বলে একেবারে একজন খাস বিলাতী সাহেবের সঙ্গে এক কামরায়! মাই গড্, ইন্ডিয়ার হলো কী? সেই আধ ন্যাংটো নেংটি ইঁদুর গ্যান্ডীটা কি দিল্লীতে ভাইসরয় হয়েছে? উইলিংডন কি নেই? সাহেব তাঁর চাবুক হাতে নিয়ে গাড়ির দরজা রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখছ চাবুক?"

ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে রিভলবার বের করে বললেন, "দেখছ পিস্তল?"

সাহেব মিনিটখানেক হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর পানে, তার পরে আস্তে আস্তে দোর খুলে দিয়ে নিজের বার্থে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এ-জাতের লোকদেরই সাহেবেরা পুলিশের কর্তা হয়ে লাঠিপেটা করেন, হাকিম হয়ে পাঠান জেলে, কিন্তু মনে মনে করেন গভীর শ্রদ্ধা। এঁদেরই জন্য বিদেশে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে পারা যায় অকুণ্ঠিত চিত্তে।

আর্মির এক কর্নেল কিছুকাল এই ভদ্রলোকের উপরওয়ালা ছিলেন। পাঞ্জাবী হাবিলদার ও সিপাহীদের ধমকিয়ে তিনি চুল পাকিয়েছেন। জানেন ভারতীয়দের দিয়ে কাজ করাবার ঐ একমাত্র উপায়। সে-উপায় প্রয়োগ করলেন একদিন এঁর উপরে। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধীর ও শান্ত স্বরে বললেন, "কর্নেল, একজন অফিসারের সঙ্গে কথা বলার রীতি এটা নয়। মনে রেখো, তুমি চোখ রাঙালে আমিও পাল্টে চোখ রাঙাতে পারি—ইফ্ ইউ সাউট লাইক দ্যাট, আই ক্যান সাউট ব্যাক্ টু।"

শুনেছি এই কর্নেলই পরে এঁকে নিজের বাড়িতে ডিনার খাইয়েছেন বহুদিন। অসুখ হলে নিজে বাড়ি এসে আরোগ্য কামনা জানিয়েছেন এবং রিটায়ার করার কালে প্রমোশন সুপারিশ করেছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়!

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সান্ধ্য সভায় আলোচনার মধ্যপথে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেম আমরা দুজনে। বন্ধুর সহায়তায় যথারীতি পরিচিত হলেম গৃহস্বামী ও উপস্থিত পারিষদবর্গের সঙ্গে। সুদৃশ্য গ্লাশে সুস্বাদু পানীয় পরিবেশন করল উর্দি পরিহিত বেয়ারা। রুপার সিগারেট বাক্স থেকে সিগারেট। গৃহস্বামী নিজে বিরামহীন ধূমপায়ী, ইংরেজীতে যাকে বলে চেইন-স্মোকার। একটা নিঃশেষ হতেই বাক্স থেকে আর একটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে চাপেন। কে আগে তাতে দেশলাই জেবলে অগ্নি সংযোগ করতে পারেন, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি।

বিলাতপ্রত্যাগতদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে এ দেশে। তার উপর বিলাতী সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে তো কথাই নেই। মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য মহোদয় অমায়িক আচরণ ও অজস্র ধন্যবাদের দ্বারা প্রচুর আপ্যায়ন করলেন।

খণ্ডিত আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে বোঝা গেল, বিষয়টি নয়াদিল্লীর

গ্রীষ্মাধিক্য ঘটিত। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় ভারত গভর্নমেন্টেরও বার্ষিক শৈলযাত্রা আছে। এপ্রিলের গোড়াতে দপ্তর স্থানান্তরিত হয় সিমলা পাহাড়ে। শরৎকালে উল্টো রথে প্রত্যাবৃত্ত হয় দিল্লীতে। বছরে দু'বার করে সিমলার কার্ট রোড আর নয়াদিল্লীর পাহাড়গঞ্জের পথে গরুর গাড়ী বোঝাই বাক্স পেটরা লটবহরের মিছিল দেখা যায়। এই প্রথম শৈলবিহার স্থগিত হয়েছে সরকারী হুকুমে।

নবনিযুক্ত অস্থায়ী সেনাপতি জেনারেল মোলস্‌ওয়ার্থ দাবি করেছেন, এবার সিমলা যাওয়া চলবে না। গরমে জাপানীদের সঙ্গে সৈন্যরা বর্মার বনে জঙ্গলে লড়তে পারে, আর সেক্রেটারিয়েটের সিভিলিয়ন সাহেবরা একটু গরমও সইতে পারবেন না? এত বাবুয়ানায় যুদ্ধ জেতা যায় না।

আর্মির প্রয়োজনের উপরে কথা নেই। সুতরাং সেইটেই শিরোধার্য করতে হয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছুক চিত্তে। সেক্রেটারী সায়েবেরা বিচলিত—উঃ বাবা মার্চের শেষে যা গরম, মে-জুনে না জানি কতই বেশী হবে!

ডেপুটী সেক্রেটারীরা বেশীর ভাগই ভারতীয়। কাজেই তারা এক ধাপ উপরে উঠে বলেন, "বেশী? মে-জুন মাসে মেডিক্যাল লীভ নিয়ে পালাতে হবে।"

তাঁদের স্ত্রীরা আরও সাংঘাতিক। স্বামীরা আপিসে চলে গেলে দুপুর বেলা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করলেন, "শুনেছ ভাই, নূতন কামাণ্ডার-ইন-চীফের কীর্তি? গরমে নাকি এবার দিল্লী থাকতে হবে। মাই গুড্‌নেস্‌। তার চেয়ে চল আমরা মেয়েরাই না হয় সিমলাতে গিয়ে মেস করে থাকি, ওরা থাকুন দিল্লীতে গরমে সেদ্ধ হয়ে মরতে!"

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর জিজ্ঞাসা করলেন, "গরম কি এখানে খুব বেশী হয়?"

একজন অমনি বললেন, "ভয়ানক! থাকতেই পারবেন না এখানে।"

আর একজন বললেন, "গরমে গায়ে ফোস্কার মতো হয় অনেকের।"

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, "এপ্রিল থেকেই তো লু চলবে।" 'লু' মানে গরম হাওয়ার ঝড়।

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর বললেন, "তা দেখুন, সেক্রেটারিয়েটের ঘরগুলি সবই এয়ার-কণ্ডিসণ্ড। দুপুরবেলা সেখানেই থাকব। এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে বোধ হয়।"

চতুর্থ জন, যিনি এতক্ষণ কিছু বলার সুবিধা না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বললেন, "তা নিশ্চয়ই যাবে। গরমে কি আর দিল্লীতে লোক থাকে না?"

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর রাত্রিতে তো লু বইবে না।"

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন, "যা বলেছেন সার, রাত্রিগুলি সব সময়েই ঠাণ্ডা থাকে। তা ছাড়া এইচ. এমদের বাংলোতে একটা করে ঘর এয়ার কণ্ডিসণ্ড করে দেওয়া হবে। এমন কিছু কষ্ট হবে না।"

'এইচ. এম' মানে—অনারেবল মেম্বর বা মিনিস্টার। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের ঐ সংক্ষিপ্ত নামেই উল্লেখ করা হয় সরকারী মহলে।

প্রথম বক্তা, যিনি গরমের আতিশয্য নিয়ে এতক্ষণ বাগবিস্তার করছিলেন, অত্যন্ত

ক্ষুণ্ণ হলেন। চতুর্থ ব্যক্তির কথাগুলি তাঁরই বলা উচিত ছিল। না বলতে পারায় মনে তীব্র অনুশোচনা ঘটল। চতুর্থ ব্যক্তি বলেছেন বলে, তাঁর উপরে রীতিমতো ক্রুদ্ধ হলেন। মনে মনে বললেন, কেবল খোশামুদি! এইচ. এম. যেই বলেছেন, গরম এক রকম করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে, অমনি একেবারে প্রমাণ করার চেষ্টা যেন গরমটা কিছুই নয়! হামবাগ কোথাকার! নিশ্চয় জানি! এইচ. এম. দিল্লী থাকা অপছন্দ করলে উনি তখন উল্টো সুর গাইতেন! লোকটা যে একেবারে মোসাহেব প্রকৃতির এবং তিনি নিজে যে কোনো কালেই এমন নির্লজ্জ চাটুকারিতা করতে পারতেন না, এ বিষয়ে মনে মনে নিজেকে আশ্বাস দিয়ে অনেকটা আরাম বোধ করলেন।

গরম থেকে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এইচ. এম. শুরু করলেন সরকারী কাজকর্মের কথা। কাউন্সিলের কাহিনী। কী ভাবে ইংরেজ সহকর্মীদের ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিহত হয়, তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টির ফলে কোথায় কখন গভর্নমেন্টে দেশের স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তারই সালংকার বর্ণনা।

দেখা গেল, এবিষয়ে শ্রোতাদের কাছে অধিক বলার প্রয়োজন ছিল না। তিনি না বলতেই তাঁরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। এইচ. এম. না থাকলে অভাগিনী ভারতমাতার যে কী দারুণ দুর্গতি ঘটতো সে কথা কল্পনা করে দু'-একজন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। প্রায় অশ্রু-বরিষণের উদ্যোগ।

কান টানলেই মাথা আসে। দেশের কথা তুলতেই কংগ্রেস। এইচ. এম. কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিষ্ফলা নীতির তীব্র নিন্দা করে বললেন, "শুধু জেলে গেলেই দেশ স্বাধীন হয় না।" কী করে হয় তা স্পষ্টতঃ না বললেও সংশয়ের অবকাশ রইল না যে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরদের প্রচেষ্টা দ্বারাই তা হয়। এবিষয়েও পারিষদ দলের মধ্যে বিন্দুমাত্র মতদ্বৈধ নেই।

এইচ. এম. বললেন তিনি এত ভাবনা চিন্তার ধার ধারেন না, মুহূর্তে মন স্থির করেন। অমনি অনুমোদন শুনলেন, "সার, ভাবনা চিন্তা দেশে অনেক হয়েছে, এখন ঝাঁপিয়ে পড়াই দরকার।"

এইচ. এম. সংশোধন করলেন, "অবশ্য আগে ভাগে না ভেবেচিন্তে হঠাৎ একটা কিছু করে বসাও আবার ঠিক নয়!"

"তাতে আর সন্দেহ কী সার, না ভেবে কাজ করার নাম তো হঠকারিতা," একই ব্যক্তি বলেন অম্লান বদনে।

পরবর্তী সপ্তাহে এক ডিনারের নিমন্ত্রণ স্বীকারান্তে এইচ. এমকে বিদায়-সম্ভাষণ পূর্বক নিষ্ক্রান্ত হলেম পথে। সঙ্গী ভদ্রলোক জানালেন তাঁর এক বন্ধু নাকি চমৎকার চাটুচাতুর্যপরায়ণ এই পারিষদদলের নব নামকরণ করেছেন 'হেঁহেঁ সংঘ'। নামটা সার্থক সন্দেহ নেই।

আসল কথাটা বোঝা কঠিন নয়। এঁরা আই. সি. এস। দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে স্বর্গোদ্ভূত চাকুরে-হেভেন্‌বর্ন সার্ভিস। সিজার পত্নীর সতীত্বের মতো এদের যোগ্যতা প্রশ্নের অতীত। ভবিষ্যৎ অবারিত এবং ক্ষমতা সীমাহীন। এরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। তাই আজ যিনি বিহারের অখ্যাত মহকুমার এ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর, কাল তিনি করাচী পোর্টট্রাস্টের চেয়ারম্যান, পরশু তিনি কনট্রোলার অব

ব্রডকাস্টিং, পরদিন ডিরেক্টার-জেনারেল অব আর্কিওলজি এবং তার পরের পরদিন গভর্নমেণ্টের এ্যাগ্রিকালচারেল কমিশনার। তাঁরা জানেন, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরকে খুশি রাখতে পারলে পদোন্নতি দ্রুত হয়। তাই কেউ সস্ত্রীক এসে এইচ. এমকে নিয়ে যান সিনেমায়, কেউ নিমন্ত্রণ করেন ডিনারে, কেউ সকালে বিকালে হাজিরা দিয়ে প্রত্যেক কথায় করেন হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ। 'হেঁ হেঁ সংঘের' সদস্য হতে চাঁদা দিতে হয় না, শুধু যথাস্থানে হাজিরা দিতে হয়।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অপূর্ব সৃষ্টি। এর মোট সংখ্যা এগারো শ'র কাছাকাছি, তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক ভারতীয়। পরাধীন জাতির মধ্যে থেকেই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক সংগ্রহ করার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই সার্ভিস। স্ফীত বেতন এবং লোভনীয় পেন্সনের আকর্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আকৃষ্ট করেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট। তরুণ সম্প্রদায়ের সর্বোত্তম নিদর্শন বেছে নিয়ে নিয়োজিত করেন শাসনকার্যে, যে-শাসন দেশের দাসত্বকে করে দৃঢ়মূল; দারিদ্র্যকে করে ক্রমবর্ধমান এবং জাতীয় আন্দোলনকে করে বিঘ্নসঙ্কুল।

অসাধারণ মোহ আছে ইংরেজী বর্ণমালার তিনটি অক্ষরে। I. C. S. নামের পিছনে তাদের অবস্থিতি দ্বারা সাহেব হলে বোঝায় যে, লোকটা পাবলিক স্কুলের ছাত্র, অক্সফোর্ড কিংবা কেম্ব্রিজের পাশ এবং কঠিন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। একটি ভারতীয় ভাষা শিখেছে, ওভারসিজ এলাউয়েন্স পায়, চাকরি শুরু করেছে এ্যাসিস্টেণ্ট কালেক্টর রূপে এবং শেষ করবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর বা প্রাদেশিক গভর্নর হয়ে। পাঁচ শ' টাকায় আরম্ভ, ছয় কিংবা আট হাজারে শেষ। ষাট বছর বয়সে এক হাজার পাউণ্ড পেন্সন নিয়ে ইংলণ্ড বা রিভেয়ারাতে বাড়ি, নিশ্চিন্ত অবসর এবং ভারতবর্ষের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা।

ভারতীয় হলে বোঝাবে,—উচ্চ বংশ, কলেজে ভালো ফল, পুলিশের সন্দেহাতীত, স্বদেশীর স্পর্শলেশশূন্য নিষ্কলঙ্ক ছাত্রজীবন, বিলাতের প্রতি ভক্তি এবং চাকরিতে বিচার বিভাগের বদলে এক্সিকিউটিভ বিভাগে কায়েমীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। এদের জন্যই বারোয়ারি পূজার মণ্ডপে চেয়ারের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব, মাসিক পত্রিকায় অপাঠ্য গল্প রচনার সুযোগ এবং অনূঢ়া বয়স্থা কন্যার উদ্বিগ্না জননীর আকুলি বিকুলি।

চলতি কথায় এঁদের বলা হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কাঠামো। স্টীলফ্রেম। এঁদের মধ্যে এমন দু'চার জন লোক ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁরা পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় ও কর্মশক্তিতে যে কোনো ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান গ্রহণের অধিকারী। তাঁরা ঋগ্বেদের অনুবাদ করেছেন, ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতি আলোচনা করেছেন, ভারতবর্ষের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেছেন, সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা—ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের গোড়াপত্তন করেছেন। জাতীয়তাবাদের গুরু সুরেন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ এবং বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র এই সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বা হতে হতে ছিটকে পড়েছিলেন।

কিন্তু ব্যতিক্রমের দ্বারাই তো নিয়মের প্রমাণ হয়। বেশীর ভাগ আই. সি. এস-ই নিতান্ত সাধারণ, ইংরেজীতে যাকে বলে মিডিওকর। তাঁরা লেখার মধ্যে লেখেন

ফাইল, পড়ার মধ্যে পড়েন গেজেট এবং আলোচনা করেন ফার্লো, প্রমোশন বা রিটায়ারমেণ্ট। অন্তিমে নিজের জন্য নাইটহুড, স্ত্রীর জন্য বুইক গাড়ি ও ছেলের জন্য ইম্পিরিয়াল সার্ভিস তাঁদের চরম উচ্চাভিলাষ।

ইংরেজীতে বলে, কামানের চাইতে সোনার দাম কম। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিতদের অসন্তোষ ঠেকিয়ে রাখবার অমোঘ অস্ত্র, তাঁদের শাসনযন্ত্রের অঙ্গীভূত করা। সে-তথ্য জানা আছে ইংরেজের। এগারো শ' আই. সি. এসের জন্য ভারতের রাজস্ব থেকে খরচ হয় বছরে আড়াই কোটি টাকা। প্রতি আড়াই লক্ষ ভারতীয়ের মাথার উপরে আছে একজন আই. সি. এস. প্রতি ৮৬৮ বর্গ মাইল এলাকার আধিপত্যে। প্রচুর অর্থ, প্রভূত প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক পরিবেশের ফলে একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হন তাঁরা। দেশের দায় বিমুক্ত, দশের থেকে বিযুক্ত। আই. সি. এস. একটা পেশা নয়, আই. সি. এস. একটা জাত। হোলি রোম্যান এম্পায়ার যেমন না ছিল হোলি, না ছিল রোম্যান এবং বলা না যায় এম্পায়ার; ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস তেমনি ইণ্ডিয়ান নয়, সিভিল তো নয়ই এবং সার্ভিসের বাষ্প মাত্র নেই তাতে।

বারো

সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ দিল্লী পরিত্যাগ করলেন।

আগের দিন সন্ধ্যায় দিল্লী বেতার-কেন্দ্র থেকে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে এক বেতার-বক্তৃতায় তিনি ক্রীপস-দৌত্যের ব্যর্থতা ও কারণ বর্ণনা করলেন। বেতার-বক্তারূপে একমাত্র লণ্ডন টাইমসের ভূতপূর্ব সম্পাদক উইকহ্যাম স্টীড ছাড়া সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বোধহয় ক্রীপসের জুড়ি নেই। অপূর্ব তাঁর বাচনভঙ্গী, অসাধারণ তাঁর কণ্ঠ। পরিতাপের কথা, সে দক্ষতা তিনি প্রয়োগ করলেন ভারতবর্ষের, বিশেষ করে কংগ্রেসের অযথা অপবাদকীর্তনে। ইচ্ছাকৃত সত্যগোপন বা সত্যের বিকৃতি সাধন, ভিত্তিহীন অভিযোগ, পরস্পর-বিরোধী উক্তি এবং কুযুক্তির দিক দিয়ে তাঁর এ বেতার বক্তৃতাটি রাজনৈতিক অপভাষণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে ইতিহাসে।

সমগ্র বক্তৃতাটি এক ক্ষমতাগর্বিত ব্যক্তির আহত অভিমান ও দুর্বলের প্রতি অবজ্ঞার অভিব্যক্তি। আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তি ধনী আত্মীয়ের কৃপামিশ্রিত মুষ্টিভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলে দাতার মনে যে ক্রোধের সঞ্চার হয়, সার স্ট্যাফোর্ডের কণ্ঠে তারই পরিচয় ছিল।

ক্রীপস্ বললেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে প্রবল মতবিরোধ বর্তমান, একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থ ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তার একটা সমাধান করতে চেয়েছিলেন। শ্রোতারা বিস্ময়ে চক্ষু মার্জনা করে ভাবল, এডলফ্ হিটলারের বক্তৃতা শুনছি না তো? তিনিও তো বলেন, তিনি চিরকাল শান্তি চেয়েছিলেন!

চাকরির বণ্টন, পৃথক নির্বাচন, রাজনৈতিক সুবিধাদান প্রভৃতি একাধিক উপায়ে এদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেছেন এবং মতবিরোধকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন যাঁরা, তাঁরাই নাকি মধ্যস্থতা করতে চান। পরিহাস আর কাকে বলে?

ক্রীপস্ বললেন, যুক্তিশীল ব্যক্তিরাই স্বীকার করবেন যে, যুদ্ধের এ দুঃসময়ে

নূতন শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব নয়। যেন ভারতীয় নেতৃবর্গ এ-কথা স্বীকার করেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন শুধু প্রকৃত ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি সাময়িক জাতীয় গভর্নমেণ্ট, যুদ্ধের এ দুঃসময়ে যার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সে-গভর্নমেণ্ট গঠিত হবে, সে-গভর্নমেণ্টকে একটি স্বাধীন দেশের মন্ত্রিসভার সমমর্যাদা দান করা হবে এবং অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী বড়লাট একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার ন্যায় এ গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে বাধ্য থাকবেন, নিজ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা তাকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না—এই ছিল জননেতাদের দাবি। নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কোন কথাই ছিল না।

কংগ্রেসের প্রতি ক্রোধটাই সবচেয়ে বেশী। বললেন, জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনের দাবি দ্বারা কংগ্রেস সকল ক্ষমতা আত্মসাতের প্রয়াসী, দেশের ডিক্টেটর হওয়ার বাসনা সংখ্যাগরিষ্ঠদল কংগ্রেসের। অথচ এগারোই এপ্রিল তারিখের লেখা চিঠিতে মৌলানা আজাদ ক্রীপস্‌কে লিখেছিলেন, কংগ্রেস দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনে ইচ্ছুক। এ ধারণার উপরে ভিত্তি করেই সমস্ত আলাপ আলোচনা চলছে। জাতীয় গভর্নমেণ্টের সদস্য সংখ্যা, বিভিন্ন দলের অংশ ইত্যাদি প্রশ্ন পরে নিশ্চয়ই আলোচিত হতো। কংগ্রেস নিজে ক্ষমতা লাভের জন্য ব্যাকুল নয়, কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত হোক, এই তার দাবি।

দেশরক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে দেওয়ার আপত্তি সম্পর্কে ক্রীপস্‌ বললেন, ভারতবর্ষ রক্ষার দায়িত্ব ব্রিটেনের এবং মিত্রশক্তি এমেরিকার প্রতি ব্রিটেনের যে-কর্তব্য তা পরিহার করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতির কর্তৃত্বে কারও হস্তক্ষেপ যুদ্ধজয়ের অনুকূল নয়। কংগ্রেস সভাপতি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, প্রধান সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের কোনো অভিপ্রায় ছিল না কংগ্রেসের। বরং সমরমন্ত্রী হিসাবে তাঁর হাতে আরও অধিকতর কর্তৃত্ব অর্পণে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দেশরক্ষার চরম দায়িত্ব থাকবে দেশেরই একজন প্রতিনিধির হস্তে। তা না হলে স্বাধীনতার কোনো অর্থ থাকে না।

জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকআর্থারের হাতে। তা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার দেশরক্ষা সচিব অস্ট্রেলিয়ানই; মার্কিন বা ইংরেজ নয়,—এ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন কেউ কেউ। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যুক্তিকে শ্রদ্ধা করেন এমন নজীর নেই।

সবচেয়ে হাস্যকর উক্তি করলেন সার স্ট্যাফোর্ড জাতীয় গভর্নমেণ্টের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে। তিনি বললেন, "কংগ্রেস এমন একটি জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করতে চায়, যার উপরে বড়লাটের বা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। একবার ভেবে দেখা যাক তার মানে কী। অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভারতের গভর্নমেণ্ট এমন কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হবে, যাঁরা কোনো আইনসভা বা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়ী নন, যাঁদের কেউ কখনও নাড়াতে পারবে না।" কী সাংঘাতিক কথা। সত্যি তো। এ তো কোনো মতেই হতে দিতে পারা যায় না। আইনসভা, নির্বাচকমণ্ডলী এবং জনসাধারণের কাছে দায়ী ও পরিবর্তনযোগ্য গভর্নমেণ্টের একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম নমুনা তো আছে আমাদের বর্তমান বেন্থল-ম্যাক্সওয়েল-নুন-ওসমান-

রামস্বামী পরিবৃত পরম করুণাময় লর্ড লিনলিথগোর গভর্নমেণ্টে !

বেতার-বক্তৃতার উপসংহারে ক্রীপস্ জাপানের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিরোধ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অনেক উদ্দীপনাময়ী উক্তি করলেন—"ঝুঁকি নিতে হবে, নতুন পরীক্ষা করতে হবে, পুরাতন মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে হবে" এমনি সব ভালো ভালো কথা।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারিস্টার বলে সার স্ট্যাফোর্ডের খ্যাতি আছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এ-সকল উক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও অসংগতি তাঁর মতো ব্যবহারজীবীর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। "ঝুঁকি নিতে হবে।" ঠিক কথা। তবে সেটা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে নয়,—নিতে হবে পদানত নিপীড়িত ভারতীয় জনসাধারণকে। "নতুন পরীক্ষা করতে হবে।" অথচ ভারতবর্ষে বহাল থাকবে সেই সনাতন স্বৈরশাসন। "পুরাতন মনোভাবের উর্ধ্বে উঠতে হবে।" শুধু ভারত সম্পর্কে নয়! এই হলো ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক ভারতবন্ধু সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ কথিত সুসমাচার !!

বিলাতের ন্যাশনাল গভর্নমেণ্টের অনুরূপ অস্থায়ী যুদ্ধকালীন গভর্নমেণ্ট গঠিত হবে, এই ভিত্তিতেই মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহেরু ক্রীপস্‌প্রস্তাবের আলোচনা করেছেন। পরে দেখা গেল, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলেরই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছুতেই রাজী নন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। কখনও কোনো আলোচনায় ক্রীপস্ যে ন্যাশন্যাল গভর্নমেণ্টের আভাসমাত্র দিয়েছেন এমন কথাও স্বীকার করলেন না তিনি। অথচ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পুনর্গঠন বা তাতে যোগ দেওয়া-না-দেওয়া নিয়ে তিন সপ্তাহ আলোচনা করবেন মৌলানা আজাদ বা পণ্ডিত জওহরলাল, একথা একমাত্র উন্মাদ বা বিশেষ অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া নিশ্চয়ই আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি জোরের সঙ্গে বললেন, ক্রীপস্ ক্যাবিনেট গভর্নমেণ্টের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ক্রীপস্ তা বেমালুম অস্বীকার করলেন। যদিও সাংবাদিকদের মধ্যে যাঁরা ২৩শে মার্চের প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই সাক্ষ্য দেবেন যে, সেখানেও ক্রীপস্ এই ন্যাশন্যাল গভর্নমেণ্টের কথাই বলেছিলেন।

কংগ্রেস নেতৃবর্গ একটি অতি মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁরা ক্রীপস্ আলোচনার কোনো লিখিত ও অবিসংবাদিত দলিল রাখেননি। বিলাতে ব্যবসায়ীদের দেখেছি, কোনো বিশেষ লেনদেন বা চুক্তি সম্পর্কে দুই ব্যক্তির মধ্যে আলোচনার একটি পরস্পর অনুমোদিত লিখিত বিবরণ থাকে। আলোচনার পরে একজন আলোচনার সমুদয় বিবরণ একটি পত্রে লিপিবদ্ধ করে অন্যজনের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি হয় ঐ পত্রে বর্ণিত বিবরণ যথার্থ বলে অনুমোদন করেন, নয় তো ভ্রমনির্দেশ করেন। এ ব্যবস্থায় দুই পক্ষের মৌখিক আলোচনায় কোনো সময় একে অন্যের উক্তি বা মনোভাবকে ভুল বুঝলে অবিলম্বে তার সংশোধন হয়। চল্লিশ কোটি নরনারীর ভাগ্য নিয়ে যেখানে আলোচনা চলছে, সেখানে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ এরূপ কোনো সাবধানতা অবলম্বন করেননি—এ শুধু আশ্চর্য নয়, বালকোচিত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় সেদিনকার আলোচনার সারমর্ম একটি পত্রে গ্রথিত করে তাতে ক্রীপসের অনুমোদন-স্বাক্ষর রাখলে পরে পরস্পরের প্রতি এই অসত্য ভাষণের

দোষারোপ করার অবকাশ ঘটত না।

মৌলানা আজাদ তাঁর শেষ দীর্ঘ চিঠিতে বলেছেন, দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস ও ক্রীপসের মধ্যে আলোচনা যতই এগিয়ে চলেছে, ব্রিটিশ মনোভাবের ততই ক্রমিক অবনতি ঘটেছে। এ মন্তব্য অহেতুক নয়। ব্রিটিশ প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আগমন ও ভারত পরিত্যাগের মধ্যে ক্রীপসের চরিত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে।

ক্রীপসের এই ব্যর্থতার এবং পরিবর্তনের কারণ কী, তা নিয়ে বহু অনুমান, বহু সংশয়, বহু গবেষণার অবকাশ আছে। ব্যর্থতার সমুদয় দায়িত্ব ক্রীপসের নয়।

লর্ড লিনলিথগো ক্রীপস্-দৌত্যের সাফল্য কামনা করেননি, একথা অনুমান করা কঠিন নয়। যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে একাধিকবার ভারতীয় জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহের তিনি ভার নিয়েছিলেন। ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং তার দ্বারা যা সম্ভব হয়নি, অন্য কোনো ব্যক্তির প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে একজন শ্রমিকদলের সদস্য দ্বারা তা সম্ভব হবে এটা তার পক্ষে রুচিকর নয়। ব্যক্তিগত মতবাদে লর্ড লিনলিথগো যে একজন কন্সাভের্টিভ ডাইহার্ড সে-কথা অবিদিত নয় কারো কাছে।

জঙ্গীলাট আর্চিবল্ড ওয়েভেল একজন ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন কি না তাও জানার উপায় নেই। ওয়েভেল বর্তমানে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তার সমরনৈপুণ্যের উপরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অবিচলিত আস্থা। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে তার সামরিক ব্যাপারে ওয়েভেলের অনুমোদিত কোনো ব্যবস্থায় সম্মত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সাধারণের ধারণা এই যে, লণ্ডন থেকে টেলিফোনযোগে সার স্ট্যাফোর্ডকে সতর্ক করে দেওয়া হয়, তিনি যেন ওয়ার ক্যাবিনেটের লিখিত প্রস্তাবের বাইরে আর এক পাও না যান। ভারতবর্ষ সম্পর্কে চার্চিল ও এমারির মনোভাব এতই সুপরিচিত যে, এ অনুমান একেবারে অমূলক মনে হয় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগনে ক্রীপস্ ছিলেন একান্ত নিষ্প্রভ। শ্রমিকদলের সঙ্গেও সে সময়ে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। উনিশ শ উনচল্লিশ সালের শেষভাগে তিনি ভারতবর্ষে এলেন। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করলেন, বিভিন্ন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেন, পণ্ডিত জওহরলালের অতিথিরূপে পুংখানুপুংখরূপ অনুসন্ধান করলেন এ দেশের জাতীয় আন্দোলন ও তার ধারা সম্পর্কে।

ভারতবর্ষ থেকে ক্রীপস্ গেলেন চীনে। চীন থেকে রাশিয়া হয়ে ইংলণ্ডে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, চেম্বারলেন গভর্নমেন্টের তখন পতন ঘটেছে। প্রধান মন্ত্রীরূপে চার্চিল গঠন করেছেন নতুন কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট। রাশিয়া ও ব্রিটেনের বৈদেশিক সম্পর্ক সে সময় মধুর নয়, অথচ একমাত্র রাশিয়ার সঙ্গে মিতালীর দ্বারাই তখন য়ুরোপে হিটলারের প্রতিরোধ সম্ভব। কে ভার নেবে রাশিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে মৈত্রীসাধনের? ক্রীপসের নাম কে প্রস্তাব করেছিলেন তা জানার উপায় নেই। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন পরিত্যাগ করে রাজনীতিক্ষেত্রে বিস্মৃতপ্রায় ক্রীপস্ অকস্মাৎ একদিন প্রবেশ করলেন দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বোধ হয় বললেন, মস্কো পছন্দ কর তুমি, সেখানে ব্রিটিশ রাজদূত হয়ে যাও। ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই। এখনই রওনা হও। ফর্

গড্‌স্‌ সেক্‌।

ক্রীপস্‌ রাশিয়ায় গেলেন এবং অসাধ্যসাধন করলেন। ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে তিনি হৃদ্যতার সৃষ্টি করলেন, যা ইতিপূর্বে প্রায় অসম্ভব বলে গণ্য হয়েছে। মস্কো ও কুইবাইসেভে নিজ কর্তব্য সমাধান করে উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালে যখন ইংলণ্ডে ফিরলেন ক্রীপস্‌ তখন তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দু-ই অপরিসীম। চার্চিল তাঁকে আপন মন্ত্রিমণ্ডলে গ্রহণ করলেন।

ভারতীয় সমস্যার তিনি একটা সন্তোষজনক মীমাংসাসাধনে সক্ষম হবেন, এ বিশ্বাস ক্রীপসের ছিল। ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাব যে ভারতীয় জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম, একথা কি তিনি বোঝেননি? তা হলে তার বহু-বিজ্ঞাপিত তীক্ষ্ন বুদ্ধি সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, গান্ধীজি প্রথম সাক্ষাতের দিনে ক্রীপস্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই প্রস্তাব নিয়ে তুমি ভারতবর্ষে এলে কেন?" উপদেশ দিয়েছিলেন, "এর বেশী আর কিছু যদি তোমার দেবার ক্ষমতা না থাকে, তবে ফিরতি বিমানে দেশে ফিরে যেতে পার।"

ক্রীপস্‌ নিশ্চয়ই জানতেন ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাবগুলি যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর আশা ছিল, ভারতীয় জননেতাদের সঙ্গে তাঁর যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য বর্তমান, তারই সহায়তায় তিনি তাঁদের সম্মতিলাভ করবেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবর্গ শিশু নন; ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগের প্রশ্নকে তাঁরা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে দেননি।

বোধ হয় ক্রীপসের আশা ছিল, অকুস্থলে অবস্থানকারী—ম্যান অন্‌ দি স্পট—হিসাবে তিনি প্রস্তাবগুলির কিছু কিছু সম্প্রসারণের ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারবেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে। চার্চিল তাঁকে নিরাশ করলেন। দু'দিক দিয়েই তিনি বিফল-মনোরথ হলেন।

নিজের মতবাদে অবিচলিত ও সততায় একনিষ্ঠ ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, ভারতীয়দের দাবী ন্যায়সঙ্গত। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মনোভাব আপোষের অনুকূল নয়, তাঁদের আন্তরিকতা সন্দেহজনক। ক্রীপস্‌ তা করলেন না। তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সমর্থন করে কংগ্রেসের প্রতি কটূক্তি করলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই চরম সংকটকালে ক্রীপস্‌ ন্যায়-নীতি অপেক্ষা মন্ত্রিসভার নিজ সহকর্মী ও প্রধানের প্রতি আনুগত্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। ব্রিটিশজাতির প্রয়োজনে তিনি অপভাষণের আশ্রয় নিলেন। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সমাজতন্ত্রী সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ আত্মহত্যা করলেন।

চার্চিল জয়লাভ করলেন। শুধু ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার প্রচেষ্টায় নয়, নিজ সম্ভবপর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ধ্বংস সাধনেও পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করলেন তিনি।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্বে সুখী ছিল না। বিভিন্ন রণাঙ্গনে একটির পর একটি করে পরাজয় পার্লামেণ্টের সদস্যদের বিচলিত করে তুলেছিল। তাঁরা তীব্র ভাষায় চার্চিল গভর্নমেণ্টের অক্ষমতার আলোচনা করেন। কিন্তু চার্চিলকে অপসারিত করেন না। তার কারণ চার্চিলের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্থা নয়। একান্ত নিরুপায় তাঁরা, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই ইংলণ্ডে।

রাশিয়ায় অভাবিতপূর্ব সাফল্য ক্রীপস্‌কে যে সম্মান ও খ্যাতি দিয়েছিল, তাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তার প্রতি। কেউ কেউ বলতে শুরু করল, ইংলণ্ডের ভাবী প্রধানমন্ত্রী সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌। ভারতীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে পারলে ক্রীপসের যোগ্যতায় ব্রিটিশ সর্বসাধারণের আস্থা গভীর হতো, চার্চিলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজনীতিতে ক্রীপসের প্রভাব হতো অনন্য-সাধারণ। ওয়ার ক্যাবিনেটের এক শূন্যগর্ভ প্রস্তাব দিয়ে চার্চিল ক্রীপস্‌কে ভারতে পাঠালেন, কারণ তিনি নিশ্চিত জানতেন গান্ধীজি, আজাদ ও নেহরু কখনও গ্রহণ করবেন না এ প্রস্তাব।

ক্রীপস্‌ ব্যর্থকাম হলেন। চার্চিলের প্রধান মন্ত্রীত্ব নির্বিঘ্ন হলো। রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপসারণের একাধিক উপায় আছে। স্ট্যালিন তাদের হত্যা করেন বন্দুকের গুলিতে, চার্চিল তাদের নিঃশেষ করেন কূটনৈতিক চালে। সোস্যালিস্ট ক্রীপস্‌ ইম্পিরিয়ালিস্ট টোরিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ রাজনীতিতে নিজ হাতে নিজ মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষর করলেন নিজেরই অজ্ঞাতসারে।

রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল এক বন্ধুগৃহে। ভদ্রলোক কলকাতার এক নামজাদা সাহেব কোম্পানীর কভেনান্টেড সার্ভিসের লোক, শ্বেতাঙ্গ পরিচালক-গোষ্ঠীতে একমাত্র বাঙালী অফিসার। প্রচুর বেতন, প্রভূত প্রতাপ। যুদ্ধের প্রয়োজনে গভর্নমেণ্ট সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে নিয়ে এসেছেন আরও বেশী পারিশ্রমিক দিয়ে। নিজের কোম্পানীতে 'লিয়েন' আছে। যুদ্ধ শেষ হলে সেখানে ফিরে গিয়ে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হবেন পূর্বগৌরবে।

নিমন্ত্রিতের সংখ্যা জন দশেক। একমাত্র আমিই একক। বাকি সবাই যুগলে ;—মিস্টার এণ্ড মিসেস। ডিনার ন'টায়, কিন্তু নিমন্ত্রিতেরা সাড়ে সাতটার মধ্যে সবাই উপস্থিত। ড্রয়িং-রুম তাঁদের হাস্য, পরিহাস ও আনন্দকলরবে মুখরিত হয়ে উঠল।

আমাদের প্রাচীন ভোজসভাগুলির সঙ্গে এই ডিনার পার্টিগুলির প্রভেদটা সুস্পষ্ট। তফাতটা শুধু আসন পেতে আহার ও ছুরি কাঁটায় খাওয়ার মধ্যে নয়। আমাদের ভোজন আয়োজনগুলি মূলতঃ সামাজিক ক্রিয়া কর্ম সম্পর্কিত। মেয়ের বিয়ে, ছেলের উপনয়ন, নাতনীর ভাত কিম্বা ব্রত, পার্বণ উপলক্ষ করে আমাদের নিমন্ত্রণ। তাতে লোক ডাকতে হয় আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতার সূত্র ধরে, হৃদ্যতার বিচার করে নয়। সুতরাং সংখ্যা হয় অপরিমিত। ছাদের উপর সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নীচে এক সঙ্গে আসন পড়ে সত্তর কিম্বা আশী। মেয়েদের জন্য শয়নগৃহে খাট-পালঙ্ক বের করে খাবার জায়গা। এতেও একেবারে সমাধা হয় না সমুদয় নিমন্ত্রিতের আহার। বাড়ির সিকি মাইল দূর থেকে টের পাওয়া যায় কলকোলাহল।

ইংরেজী ডিনারের বিশেষ কোনো উপলক্ষের দরকার নেই। নেই কোন নির্দিষ্ট দিন। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ডাকার অলংঘনীয় দায় নেই গৃহকর্তার। গৃহকর্ত্রী বলাই ঠিক,—কারণ নিমন্ত্রণ করেন গৃহিণীরা।

এক টেবিলে বসে খাওয়ার রীতি স্বভাবতঃই নিমন্ত্রিতের সংখ্যাকে পরিমিত রাখে। বেশীর ভাগই ছ'জন ; ঊর্ধ্বে বারো। তাও গৃহকর্তা ও গৃহিণীকে নিয়ে। বাড়ির

গৃহিণী এখানে ভাঁড়ারে ময়দা মাখানো নিয়ে ব্যস্ত নন, ড্রইং রুমে আর পাঁচজন নিমন্ত্রিতার ন্যায় আলাপ-আলোচনায় তাঁরও যোগ আছে। তাঁর বসন হলুদের চিহ্নদ্বারা লাঞ্ছিত নয়, আনন উনানের আঁচে বিশীর্ণ নয় এবং দেহ পরিবেশনজনিত ক্লান্তিতে পীড়িত নয়। তিনিও সুবেশা, সুসজ্জিতা। তিনি সমুদয় অভ্যাগতদের আহারান্তে অপরাহ্ন বেলায় সর্বশেষে আহারে বসেন না, তাঁদের সঙ্গেই আহার্য গ্রহণ করেন। গৃহকর্তা কোমরে গামছা জড়িয়ে জলের জাগ বা নুনের হাঁড়ি হাতে ছুটোছুটি না করেও অতিথিদের আদর আপ্যায়নের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাঁদের সঙ্গে বসেই আহার করেন।

খাওয়াটাই ইংরেজী ডিনারের মূল কথা নয়। সেটা বন্ধুজনের একত্র মিলনের একটা উপলক্ষ মাত্র। তাই আহারের আয়োজন পরিমিত। সুক্ত থেকে অম্বল পর্যন্ত দশটা তরকারি এবং দরবেশ থেকে রাবড়ি পর্যন্ত পাঁচটা মিষ্টান্নের আয়োজন না হলে সেখানে কেউ ছি ছি করে না। পান্তুয়া গেলার কৃতিত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা নেই ইংরেজী ডিনারে। আমাদের আধুনিক সমাজের ইঙ্গ-বঙ্গের ত্রুটি অন্বেষণে যাঁদের কখনও ক্লান্তি নেই, এই একটি ব্যাপারে অন্ততঃ তাঁরা যেন আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকেন।

আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা মজলিসী ধরণের লোক। আসর জমাবার দক্ষতা আছে তাঁর। এককালে শিকারে সখ ছিল। বিহারের জঙ্গলে সম্বর শিকারের গল্প করলেন, আসামের অরণ্যে নেকড়ে।

শুধু গল্প নয়, তাসের ম্যাজিক জানেন অনেক রকম। চোখ বুজে প্যাকেটের মধ্য থেকে চিড়িতনের গোলাম বের করে দিয়ে বিস্মিত করলেন সবাইকে, হরতনের নওলাকে হাত ঘুরিয়ে নিমিষের মধ্যে বানিয়ে দিলেন গোলাম এবং এক মহিলার শাড়ির ভাঁজ থেকে ইস্কাবনের সাহেব বের করে তাঁর কাছে কপট তাড়না এবং আর সবার কাছে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ লাভ করলেন। গল্প গুজব ও হাস্য পরিহাসের মাঝে মাঝে শীতল পানীয় এবং কক্‌টেল গ্লাশে টোমাটোর রস পরিবেশন করল বেয়ারা।

আহারের ব্যবস্থা পাশের কক্ষে। বুফে ডিনার। একটা টেবিলের উপরে বিভিন্ন পাত্রে সাজানো সমুদয় আহার্য। রোস্ট, স্যালাড, চপ্, আবার তার সঙ্গেই পরোটা বিরিয়ানী, পটলের দোলমা। পুডিং আছে, রসগোল্লাও আছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইঙ্গ-বঙ্গের ছাপ থাকে আমাদের অশনে, বসনে, চিন্তায় ও কর্মে। হাতে দশগাছা জলতরঙ্গ চুড়ির সঙ্গেই আমাদের মেয়েরা পরেন রিস্টওয়াচ ; কোঁচানো ধুতির উপরেই ছেলেরা পরেন ডবল কাফের সার্ট।

সাইডবোর্ডে স্তরে স্তরে একদিকে সাজানো আছে প্লেট, অন্য দিকে চামচে, কাঁটা এবং ছুরি। সবাই প্লেট নিয়ে স্বহস্তে নিজ নিজ অভিরুচি মতো আহার্য তুলে নেন। ছেলেরা বেশীর ভাগ টেবিলের চার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খান। মেয়েরা কেউ বা বসেন চেয়ারে, কেউ বা ছেলেদের অনুসরণে দাঁড়িয়েই। গৃহকর্ত্রী খেতে খেতেই তদারক করেন অতিথিদের। বলেন, "এ কী ভাই, মিলি তুমি কিছু খাচ্ছ না যে ? মিস্টার সেন, আর একটা চপ নিন। মিসেস দেশাই রোস্ট নিয়েছেন তো ?"

মিসেস সাহার নাম শোনা ছিল ইতিপূর্বে, চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল এই ভোজসভায়। অতিশয় ক্ষীণাঙ্গী, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় যথেষ্ট

ফর্সা কিন্তু পাউডার-আধিক্যের দ্বারা গণ্ডের স্বাভাবিক বর্ণকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছেন যে, কাগজের মতো সাদা মুখ দেখে মনে হয় বুঝি বা কোনো কঠিন অসুখের পর ভাওয়ালী বা মদনপল্লী স্যানিটোরিয়াম থেকে সদ্য উঠে এসেছেন! পরিধানে সাদা ধবধবে শিফনের অতি মহার্ঘ শাড়ি; প্রায় কাঁচের মতো স্বচ্ছ। তার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর ঈষৎ হাল্কা রং-এর অন্তর্বাস। শাড়িতে পাড় থাকাটা আজকাল যথেষ্ট মডার্ন নয়। ঘটি-হাতা ব্লাউজের মধ্যে থেকে লম্বমান বিশীর্ণ বাহুদ্বয়। 'ভি' আকৃতি সম্মুখ ভাগে মর্মান্তিকরূপে উদ্ঘাটিত গ্রীবার দুই পার্শ্ববর্তী উদ্ধত দুটি কন্ঠা! গলায় মুক্তার একটি মালা। কানে সর্পাকৃতি ক্ষুদ্র মুক্তা গেঁথে গেঁথে একজোড়া দুল, প্রায় কাঁধ অবধি ঝোলানো। বাম হাতের দীর্ঘ সরু অনামিকায় তারই সংগে ম্যাচ-করা মুক্তাবসানো মস্ত একটি আংটি। সবুজ, নীল, মেরুন, ভায়োলেট প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের শাড়িপরিহিতাদের মধ্যে মহিলা আপন বেশভূষায় সম্পূর্ণ বিশিষ্টা। যেন শীতের দিনে বর্ণাঢ্য মরসুমী ফুলের বাগানে রজনীগন্ধার উন্নত বৃন্তটি।

মহিলা টেবিল-স্পুনের আধ চামচ বিরিয়ানী নিয়েছিলেন, তাই যেন শেষ করতে পারেন না! হোস্টেস একটু রোস্ট তুলে দিতে যাচ্ছিলেন তাঁর প্লেটে। "পারবো না ভাই, পারবো না, দিয়ো না, প্লীজ" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। অনেক সাধ্য সাধনার পর একটা চপ নিলেন এবং ম্যানিকিউর করা দুই আঙ্গুল দিয়ে অতি সন্তর্পণে তার সিকি ভাগ ভেঙে খেলেন। কেবলই বলেন, "ভয়ানক পেট ভরে গেছে। আর পারছিনে।"

একটা ঝালের চচ্চড়ি ছিল টেবিলে, তাই একটু নিলেন মিসেস সাহা। এটাই চলতি। মিস্টার সাহা বাধা দিয়ে বললেন, "খেয়ো না, এত ঝাল খেলে অসুখ করে মরবে।" এতেও নতুনত্ব নেই। স্বামীরা লংকা খেতে বারণ করেন এবং স্ত্রীরা তা অগ্রাহ্য করে বেশী করে লংকা খান, এইটে প্রমাণ করাই হলো আধুনিকাদের আহার সম্পর্কিত আধুনিকতম ফ্যাশান।

ভোজনপর্বের শেষে মহিলাদের প্রতি অনুরোধ হলো গানের। কেউ গাইলেন। কেউ "অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি" বলে এড়িয়ে গেলেন। গৃহকর্ত্রী মোটামুটি রকম গাইতে পারেন এবং তাঁকে অনেক সাধ্য সাধনা না করলেও চলে। একটি গুজরাটি মহিলা তাঁর স্বদেশীয় সংগীত শোনালেন। তার মধ্যে একটি ভক্ত কবি নরসিংহ মেহতার রচনা। তাঁর রচিত "বৈষ্ণব জনতো তেঁনে কহি" বলে একটি গান এককালে গান্ধীজির প্রিয়রূপে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

মিসেস সাহার সদাশয়তা আছে। অনেক রাত্রিতে ডিনার পার্টি ভাঙলো। নিজ মোটরে পৌঁছে দিতে চাইলেন আমাকে আমার আবাসে। মিস্টার সাহাকে বললেন, "বীরেন, মিনি সাহেবকে নামিয়ে দিতে হবে কুইনসওয়েতে।"

অতি-আধুনিকারা স্বামীকে নাম ধরেই ডাকেন। ওটা ইংরেজীর নকল। আমি সনাতনী নই। স্বামীর নাম করতে নেই, এ অনুশাসনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু ইংরেজী জন্, আর্থার, সিরিলের কায়দায় আমাদের স্ত্রীরাও আমাদের সুধীর, বিকাশ বা উপেন বলে ডাকতে শুরু করলে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠারও কোনো কারণ দেখি না।

মানুষের নামের যদি কেবলমাত্র সনাক্তকরণ ছাড়া আর কোনো প্রয়োজন না থাকত, তবে নামের বদলে সংখ্যা ব্যবহারের দ্বারাই তা অনায়াসে চলতে পারত। তা হলে মেয়ের জন্ম মাত্রেই মেয়ের মা তার নামনির্বাচন নিয়ে ভাবনায় পড়তেন না। নিত্য নতুন নামকরণের অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি আসত না।

জড় বস্তুর পক্ষে নাম একটা অভিধা মাত্র। গোলাপকে ঘেঁটু আখ্যা দিলে তার গন্ধের তারতম্য ঘটে না, একথা সেক্সপীয়রের মতো অন্য পাঁচজনেও জানে; যদিও একথা ঠিক যে, কাব্যের সীমানা থেকে শুধু ঐ নামের জন্যেই তার চির নির্বাসনের সম্ভাবনা ঘটে।

কিন্তু মানুষের পরিচয় তো কেবল কোনো বিশেষ একটি সত্তার দ্বারা নয়। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তার বিভিন্ন রূপ। তাকে প্রকাশ করার জন্য তার বিভিন্ন নাম। আপিসে কেরানীবাবুর কাছে যিনি মিস্টার মুখার্জী, পাড়ায় বন্ধুদের কাছে তিনি বিনোদবাবু, বাল্যের সহপাঠীদের কাছে বিন্দে, বাড়িতে মায়ের কাছে খোকন এবং কোনো বিশেষ একটি মাত্র লোকের কাছে তিনি 'ওগো' কিংবা 'শুনছো' নয়তো শুধু মাত্র 'এই'। সেগুলি তো কেবলমাত্র নাম নয়,—সেগুলি নির্দেশ। সংজ্ঞা নয়, সংকেত। সেই বিশেষ ব্যক্তিটির কাছে সেগুলি বিশেষ অর্থ বহন করে, বিশেষ কানের ভিতরে বিশেষ সুর। এবং অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন, এই ছোট্ট দুই অক্ষরের সংকেতের দ্বারাই যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।

তেরো

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধ হয় এমন কতকগুলি দুর্বল মুহূর্ত আসে যখন সে মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয় দ্বারা বেশী চালিত হয়। সে মুহূর্তগুলি অতর্কিতে দমকা হাওয়ার মতো এসে অতিসাবধানী লোকদের স্থৈর্যের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তখন সংযমী যোগী পুরুষেরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, হিসেবী মহাজনেরা গরমিল করেন জমাখরচের খাতায় এবং স্বভাবতঃ চাপা প্রকৃতির স্থিতধী ব্যক্তিরা বিচলিতচিত্তে মনের কথা ব্যক্ত করেন অন্য লোকের কাছে। এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে আধারকারের পূর্ব ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলো একান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে। ক্লান্ত সমাহিত নয়ন এবং নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের অন্তরালবর্তী রহস্য শোনা গেল তারই নিজ বর্ণনায়।

অপরাহ্ন বেলায় ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি প্রত্যাশা করেছিলেম গ্রীষ্মপীড়িত হতভাগ্যের দল। বৃষ্টি এল না, এল আঁধি। ধূলির ঝড়। না দেখলে কল্পনা করা শক্ত এর রূপ। বাংলাদেশে কোনোকালে দেখা যায় না এ জিনিস। আকাশ-ভুবন আঁধার করে প্রবল বেগে কোথা থেকে আসে এত বিপুল ধূলিরাশি তা ধারণাতীত। মেঘের চাইতে ঘন তার আচ্ছাদন সূর্যকে আবৃত করে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বালতে হয় দিনের বেলায়। দোর জানালা নিশ্ছিদ্ররূপে বন্ধ করলেও কিছু ধুলো প্রবেশ করে নাকে, মুখে, চোখে, এমন কি বাক্স পেটরার মধ্যস্থিত জামা-কাপড়ে। বৃষ্টির ফোঁটা মাত্র নেই; শুধু শুষ্ক ধূলির ঝড়। কিন্তু এই আঁধির ফলেই উত্তাপ হ্রাস পায় অভাবনীয় ভাবে, ধরণী হয় শীতল। উত্তর ভারতের এক বিস্ময়কর প্রাকৃতিক

বৈশিষ্ট্য এই আঁধি।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসেছি দুজনে মুখোমুখি। 'শোঁ-শোঁ' শব্দে বাইরে বইছে আঁধির ঝড়ো হাওয়া, আলোড়িত হচ্ছে ধূলির পাহাড়। ধীরে ধীরে অনুচ্চ কন্ঠে বিবৃত করলেন আধারকার আপন জীবন-ইতিহাস।

আধারকারের কুলগত পেশা যুদ্ধ। তাঁর পূর্বপুরুষেরা লড়েছে মুঘলের সঙ্গে, লড়েছে যশোবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রপিতামহ বিষ্ণুদত্ত পেশোয়া বাজিরাওয়ের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। আসাইর যুদ্ধে পেশোয়ার দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে শত্রু নিপাত করেছেন অমিতবিক্রমে। নিহত হয়েছেন বুকে গুলির আঘাতে। আধারকার বালক বয়সে দেখেছেন তাঁর রুধিরাক্ত লৌহবর্ম, পরিবারের সযত্নে রক্ষিত গৌরবময় উত্তরাধিকার। বীরের রক্ত আছে তাঁর ধমনীতে।

পরিবারে বিত্ত ছিল প্রচুর, বীর্য ছিল বিখ্যাত, কিন্তু বিদ্যা ছিল না আধুনিক। আধারকার পিতার একমাত্র সন্তান, শিক্ষা লাভ করেন পুণার এক ইংরেজী স্কুলে। এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজ থেকে পাশ করে গেলেন ম্যাঞ্চেস্টারে। বয়ন-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ হয়ে যখন ফিরলেন স্বদেশে, য়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ তখন ক্ষান্ত হয়েছে। বম্বেতে স্থাপন করলেন এক কাপড়ের কল, অসুরের মতো খাটতে লাগলেন তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে।

বছর পাঁচেক পরের কথা। এক সন্ধ্যায় এক বন্ধুর আগমন সম্ভাবনায় এসেছেন দাদর স্টেশনে। বন্ধু এলেন না। ফিরে আসছেন এমন সময় কানে এল এক নারীকন্ঠ। সে তো কন্ঠ নয়, সে সুর। ভাষা বুঝলেন না, পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে এক তরুণী, সঙ্গে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। সামনে সুটকেশ, হোল্ডঅল, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি মালপত্র। উভয়ের মুখে উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট। বম্বেতে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব চলেছে সাংঘাতিক। স্টেশনের ভিতরে কুলির অভাব, বাইরে যানবাহনের। সন্ধ্যার পরে ঘরের বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়।

আধারকার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি বম্বেতে এই প্রথম এলেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, আমার এক আত্মীয় থাকেন এখানে। তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলেম স্টেশনে হাজির থাকতে। আসেননি দেখছি। বোধহয় টেলিগ্রাম পাননি।"

"পেলেও আসা কঠিন। শহরে দাঙ্গা বেধেছে, খুন-খারাপি চলছে বেপরোয়া। আপনারা কোথায় উঠবেন?"

"তাই তো ভাবছি। কাছাকাছি কোনো হোটেলের সন্ধান দিতে পারেন?"

"তা পারি। কিন্তু জায়গা পাবেন না সেখানে। বেশীর ভাগ হোটেলের চাকর, বেয়ারা, রাঁধুনি পালিয়েছে প্রাণের ভয়ে; সেখানে বাসিন্দা যারা আছে, তাদের অন্নজলের অভাব, নতুন লোক নেয় না আর।"

"তবে তো বড়ই মুস্কিল" বলে ভদ্রলোক সঙ্গিনীর দিকে তাকালেন। ভয়ার্ত ভাব সঞ্চারিত হলো তরুণীর মুখমণ্ডলে। স্টেশনে ওয়েটিং রুমে চেষ্টা করে ফল হলো না। সব আগে ভাগেই দখল হয়ে আছে দূরগামী যাত্রীতে। পরম অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন মহিলা তাঁর স্বামীর দিকে।

আধারকার প্রস্তাব করলেন, "যদি আপত্তি না থাকে, চলুন আমার ফ্ল্যাটে। কাল প্রাতে খোঁজ করা যাবে আপনাদের আত্মীয়ের। আমার সঙ্গে গাড়ী আছে।"

ভদ্রলোক তাকালেন স্ত্রীর পানে। তিনি একটু সঙ্কুচিত হয়ে ইংরাজীতে বললেন স্বামীকে, যদিও উক্তির লক্ষ্য যে আধারকার তাতে সন্দেহ রইল না। "রাত্রিবেলা হঠাৎ বিনা খবরে আমরা গিয়ে উঠলে ওঁর স্ত্রীকে খুব বিব্রত করা হবে।"

আবার সেই সুর। বোধ করি, এ সুর ছিল ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনীর, যা দিয়ে তিনি রাজপুত যুবককে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যুদ্ধে প্রাণ দিতে, হয় তো ছিল হেলেন অব ট্রয়ের, যাঁর জন্য সহস্র রণতরী ভেসেছিল সাগরে!

আধারকার বললেন, "এক রাত্রির জন্য নিরুপায় অতিথিদের গৃহে আতিথ্য দিলে স্ত্রীকে বিব্রত করা হয় কিনা জানি নে, হয়তো হয়। কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত হোন আমার স্ত্রী মোটেই বিব্রত হবেন না, কারণ আমার স্ত্রী নেই।"

"স্ত্রী নেই? ওঃ, তা হলে—"বলতে বলতে থেমে গেলেন ভদ্রমহিলা।

আধারকার বললেন, "তা হলে কী?"

"আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা কোনোরকম করে রাতটা প্ল্যাটফরমেই কাটিয়ে দেবো।"

"ওঃ, ব্যাচিলরের বাড়িতে অতিথি হওয়াটা সামাজিকতায় বাধে বুঝি? মনে ছিল না। বেশ, প্ল্যাটফরমেই থাকবেন। ভয় নেই। গোয়ানিজ কুলীগুলি দেখছিনে বটে এখন, তবে আছে কাছাকাছিই। জড়োয়া গয়না আছে গায়ে, সুটকেশগুলির ভিতরেই বা না কোন শ' কয়েক টাকার জিনিষপত্র হবে। আশা করি, তাদের আসতে বিলম্ব হবে না। কাল মৃতদেহ সনাক্ত করার দরকার হলে খবর দেবেন। আচ্ছা, চলি, গুড নাইট" বলে দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হলেন আধারকার। স্বরে তার অপমানিতের ক্ষোভ এবং উষ্মা।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই আবার দেখা গেল আধারকারকে ফিরে আসতে। বললেন, "দেখুন, একটা উপায় মাথায় এল। আমার ফ্ল্যাটেই চলুন। আপনাদের পোঁছে দিয়ে আমি কাছাকাছি আমার কেরানীর বাড়িতে গিয়ে বরং শোব। তা হলে বাড়ির দোষ থাকবে না ব্যাচিলরত্বের। ভিতর থেকে আগল এঁটে দেবেন ভালো করে, আর যাই হোক, প্ল্যাটফরমের চাইতে আশা করি সেটা নিরাপদ হবে!"

গোয়ানিজ কুলীর নামে মহিলাটির মনে যথেষ্ট ভয় ধরেছে। স্বামীটিরও প্ল্যাটফরমে রাত কাটানোর কল্পনাটা খুব প্রীতিপ্রদ মনে হচ্ছিল না। সুতরাং আধারকারের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কুলীর সন্ধান পাওয়া গেল না। আধারকার নিজে দু'হাতে অবলীলাক্রমে দুটো বড় সুটকেশ বয়ে নিয়ে গেলেন গাড়িতে।

ছোট ফ্ল্যাট। একটি মাত্র শয়নকক্ষ। আহারাদির পর আধারকার প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মহিলাটি পরিষ্কার ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকী, কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমার কেরানীর বাড়িতে?"

"কেরানীর বাড়িতে? সে কতদূর?"

"মাইল পাঁচেক হবে।"

"এত রাত্রিতে সেখানে? কোনো বিশেষ দরকার আছে কী?"

"দরকার রাত্রিটা কাটানো।"

"কেন এ-বাড়ি দোষ করল কী?"

আধারকার এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, "দোষ নয়, মানে আপনাদের অসুবিধে—"

বাধা দিয়ে মহিলাটি অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, "আমাদের অসুবিধার কথা আপনাকে কে বলেছে? আর যদি হয়ই অসুবিধা; আপনি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন, আর আপনাকেই এই দাঙ্গা হাঙ্গামার রাত্রিতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে নিজেদের সুবিধা করব, আমাদের এতখানি জংলী ঠাওরালেন কেন? তার চেয়ে বলুন, আমরা আবার সেই স্টেশনের প্ল্যাটফরমেই ফিরে যাচ্ছি।"

স্বামী ভদ্রলোকও জোর দিয়ে বললেন, "ক্ষেপেছেন মশাই, এই রাত্রিতে যাবেন বাইরে।"

কিন্তু আর একদফা তর্ক দেখা দিল শয়ন-ব্যবস্থা নিয়ে। একটি মাত্র খাট। আধারকার চান সেটি দখল করবেন অতিথিরা, তিনি ড্রয়িং-রুমের মেজেতে ঘুমাবেন। অতিথিদের ইচ্ছা ঠিক তার বিপরীত। কিন্তু এবারেও মহিলাই জয়লাভ করলেন।

নিজের ঘরে শুতে যেতে যেতে আধারকার বললেন, "এ ভারি অন্যায় হলো। মনে মনে নিশ্চয় ভাবছেন, লোকটা সুবিধের নয়। নিজে আরাম করে খাটে নিদ্রা দিচ্ছে, আর অতিথিদের ভূমিশয্যা।"

মৃদু হাস্যে মহিলাটি বললেন, "লোকটি আপনি সুবিধের নন, তা টের পেয়েছি! অত্যন্ত ঝগড়াটে।"

"ঝগড়াটে? বাঃ ঝগড়া করলেম কখন?"

"করলেন না? সেই যে প্ল্যাটফরমে কী বলেছি, তা নিয়ে কত কথা শোনালেন, কেরানীর বাড়ি শুতে যেতে চাইলেন! যান, আর কথা নয়। রাত হয়েছে। এখন, লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে পড়ুন গে।"

পরদিন আধারকারের ঘুম ভাঙলো অনেক বিলম্বে ভৃত্যের ডাকাডাকিতে। ঘড়িতে তখন প্রায় আটটা। তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করে এসে দেখেন, টেবিলে প্রাতরাশ প্রস্তুত। সুপ্রভাত জ্ঞাপন করতে মহিলাটি হেসে বললেন, "কাল রাত্তিরে শুতে যাবার সময় বললেন, আমাদের ভূমিশয্যার কথা মনে করে খাটে শুয়ে ভালো ঘুম হবে না আপনার। কনশেন্স খোঁচা মারবে! এই আপনার ঘুম না হওয়ার নমুনা? কনশেন্সের খোঁচা নিয়েই বেলা আটটা?"

আধারকার লজ্জিত হয়ে বললেন, "দেখতে পাচ্ছি, আমি ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা কনশেন্সটাও ঘুমে বেহুঁশ হয়েছিল।"

উচ্চ হাস্য উত্থিত হলো টেবিলে। স্বামী ও গৃহস্বামীর অট্টহাস্যের সঙ্গে মিশল নারীকণ্ঠের কলধ্বনি। মহিলা বললেন, "তাই নাকের ডাকে পাশের ঘরে চোখের দু'পাতা এক করা দায়!"

"নাকের ডাক? নাক ডাকে নাকি আমার? কই, আমি তো টের পাইনি কখনও।"

"ঐতো মজা। যখন টের পাওয়ার অবস্থা হয়, নাক তখন আর ডাকে না।" আবার সেই পুরুষ ও নারীকণ্ঠের সম্মিলিত হাস্যোচ্ছ্বাস।

সন্ধ্যার কিছু আগে অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তাঁদের আত্মীয়ের গৃহে। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন তাঁদের ওখানে একদিন অবকাশমতো আসবার। আধারকার প্রস্তুত ছিলেন তখনই তাঁদের সঙ্গে গাড়িতে চেপে বসতে, শুধু সেটা নিতান্ত অশোভন হবে বলেই মনকে নিরস্ত করলেন।

তাঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আধারকার এসে বসলেন বারান্দায়। পড়তে চেষ্টা করলেন অন্যদিনের মতো এক ইংরেজী প্রেমের উপন্যাস। এগুতে পারলেন না বেশী দূর। মন বার বার উন্মনা হতে লাগলো। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা বিলিয়র্ড খেলতে যান জিমখানা ক্লাবে। সেদিন কিছুমাত্র উৎসাহ রইল না তাঁর।

সুনন্দা ব্যানার্জীরা দিন দশেক রইলেন বম্বেতে। প্রত্যহ অপরাহ্নে আপিস থেকে আধারকার সোজা এসে হাজির হতেন ব্যানার্জীর আত্মীয়গৃহে। দল বেঁধে যেতেন কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন এপোলো বন্দর, কোনোদিন মহালক্ষ্মী মন্দির, কোনোদিন বা এলিফেন্টার কেভস্।

বম্বে ত্যাগ করে স্বস্থান লাহোরে প্রত্যাবর্তন করলেন ব্যানার্জী দম্পতি। আধারকার রইলেন বম্বেতে, ফিরে গেলেন আপন রূপহীন রসহীন, বৈচিত্র্যবর্জিত জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মধ্যে। প্রভাত আর আনে না কোনো প্রত্যাশা, সন্ধ্যায় ঘটে না কোনো প্রার্থিত সান্নিধ্য, রাত্রিতে থাকে না পরবর্তী দিবসের প্রগাঢ় প্রতীক্ষা। সুনন্দাবিরহিত নগরীর কুত্রাপি নেই কোনো আকর্ষণ, কোনোখানে নেই মধু, নেই স্বাদ।

কিন্তু বিচ্ছেদ মানেই নয় ছেদ, যতির অর্থ নয় ইতি। অদর্শনের সান্ত্বনা থাকে পত্রে, বাচনের বিকল্প লেখনে। লাহোর পৌঁছে সুনন্দা ব্যানার্জী লিখলেন,—

"মিস্টার আধারকার, নিরুপায় নিশীথে অপরিচিত আগন্তুকদের আপনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। আতিথ্য দিয়েছিলেন অকৃপণ ঔদার্যে,—সে জন্য ধন্যবাদ। আপনার সৌজন্য স্মরণে রাখব চিরকাল।"

জবাবে আধারকার লিখলেন,—

"এক রাত্রির অবস্থিতির দ্বারা ব্যাচিলরের গৃহকে আপনি দিয়েছেন সম্মান, গৃহস্বামীকে দিয়েছেন দুর্জয় মর্যাদা। কৃতজ্ঞতা তো জানাব আমি। সৌজন্যের প্রকাশ কর্মে, সেটা সহজসাধ্য; প্রীতির প্রবেশ মর্মে, তা দুরূহলভ্য। মিসেস্ ব্যানার্জী, আপনার অনুগ্রহ বচনাতীত।"

ত্বরিত উত্তর এল পত্রের। "দেখছি, আপনার কুশলতা শুধু আতিথেয়তায় নয়, পত্ররচনায়ও বটে। মশাই, আপনি তো চারুদত্ত নন, আপনি চারুবাক।"

এমনি করে চিঠি লেখালেখির খেলা চলে দুই পক্ষে। সে-চিঠিতে উক্তের চাইতে অনুক্তের ভাগ বেশী; শব্দের চাইতে অর্থের।

অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটলো আধারকারের জীবনে। তাঁর জীবনের প্রারম্ভ থেকে এ পর্যন্ত কেটেছে পুঁথিপত্র আর কলকারখানা নিয়ে। পরীক্ষায় পাশ আর অর্থার্জন। সোনার কাঠি ছোঁয়ানো রূপকথার রাজকন্যার মতো অকস্মাৎ জেগে উঠে আজ নিজেকে তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন। অধীত বিদ্যার শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মধ্যে নয়, নয় অর্জিত অর্থের বিরাট সঞ্চয়স্থলীতে। আবিষ্কার করলেন আপন উপবাসী হৃদয়ের অন্তহীন শূন্যতার মধ্যে।

কর্মহীন সন্ধ্যায় নির্জন গৃহকোণে ভাবতে ভালো লাগে যে স্মৃতি, সে সুনন্দার ! সুষুপ্ত রাত্রির তিমিরস্তব্ধ প্রহরে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনে পড়ে যে-প্রসঙ্গ, সে সুনন্দার। প্রভাতে প্রথম জাগরণে স্মরণে আসে যে-মুখ, সে সুনন্দার। এ কী বিস্ময়, এ কী রহস্য, আনন্দ-বেদনা-বিজড়িত এ কী অনির্বচনীয় অনুভূতি !

নিজের হৃদয় যতই উদ্‌ঘাটিত হয় নিজের কাছে, লজ্জিত হন, অনুতপ্ত হন আধারকার। শাসন করেন দুর্বল চিত্ত। পাছে কোনোদিন কোনো অসাবধান মুহূর্তে সুনন্দার কাছে ইঙ্গিতমাত্রে প্রকাশ পায় মনোভাব, সে দুর্ভাবনায় শঙ্কিত হন।

"তোমাকে আর একটু জিন অ্যাণ্ড লাইম দেবে, মিনি সাহেব ?" হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন আধারকার।

গ্লাসে তখনও অর্ধেকের বেশী ছিল। তুলে ধরে বললেম, "অলমতি বিস্তরেণ।"

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আধারকার বললেন, "আমাকে নিশ্চয়ই একটা ভিলেন মনে হচ্ছে।"

জবাবে বললেম, "আপনি আপনার কাহিনী শেষ করুন। আমি রিপোর্টার, রিফর্মার নই। মিনি-সংহিতায় বিধান নেই কোনো প্রায়শ্চিত্তের।"

স্বল্প বিরতির পর খণ্ডিত আখ্যানের অনুবৃত্তি শুরু করলেন আধারকার।

মাস তিনেক পরে মিলসংক্রান্ত প্রয়োজনে আসতে হলো লাহোরে। বলা বাহুল্য, অতিথি হলেন ব্যানার্জী-ভবনে।

অতিথিকে ভারতীয়েরা সেবা করেন পুণ্যকামনায়, তাকে যত্ন করেন ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু অতিথিকে আপন করা যায় একমাত্র হৃদ্যতার জোরে। সে হৃদ্যতার প্রাচুর্য ছিল সুনন্দার। লাহোরে আধারকারের কাজ সমাপ্ত হলো তিন দিনে। কিন্তু বিনা কাজের গ্রন্থিমোচন করে একাধিকবার ব্যর্থ রিজার্ভ ও ক্যান্সেলেশনের পরে বম্বেতে প্রত্যাবৃত্ত হলেন তিন-চারে বারো দিন কাটিয়ে। কিন্তু যে-আধারকার বম্বে থেকে গিয়েছিলেন এবং যে-আধারকার লাহোর থেকে ফিরলেন তাঁরা এক ব্যক্তি নন। ইতিমধ্যে তাঁর জন্মান্তর ঘটেছে।

লাহোরে সেদিন অপরাহ্ন বেলায় গিয়েছিলেন এক পরিচিত বন্ধু সন্দর্শনে, শহর থেকে অনেকটা দূরে। আশা ছিল সন্ধ্যার পূর্বেই প্রত্যাবর্তনের। কিন্তু এড়াতে পারলেন না অনুরোধ, নৈশভোজন সমাধা করতে হলো সেখানে। ফেরার পথে নামল বৃষ্টি। তার উপরে বাহন হলো বিকল। টাঙ্গার অশ্ব ও আসন দুই-ই প্রাচীনত্বে সমান, চলতে চলতে একটি চাকা স্থানচ্যুত হয়ে ভেঙে পড়ল অকস্মাৎ; আরোহী সবলে নিক্ষিপ্ত হলেন কর্দমাক্ত পথে। উত্তর ভারতে শীতকালের বর্ষণ বর্ষার প্রবল বারিপাতকেও হার মানায়। জনহীন পথপ্রান্তে সিক্ত হলেন দীর্ঘকাল, ব্যানার্জীগৃহে যখন এসে পেঁছিলেন রাত তখন প্রায় চারটা।

মৃদু আঘাত করতেই দ্বার খুলে দিলেন যিনি তিনি স্বয়ং সুনন্দা।

"কোথায় ছিলে এই ঝড় বাদলার মধ্যে ? সারা রাত ধরে উৎকণ্ঠায় মরছি" বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হলো বাষ্পে। ঝর ঝর ধারায় অবাধ্য অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দুই গণ্ডে। আত্মসংবরণ করতে ত্বরিত অন্তর্হিতা হলেন পাশের কক্ষে।

দোর খোলার শব্দে গৃহস্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। তিনি দোতলার সিঁড়ি

বেয়ে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার! কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আমরা ভেবে ভেবে মরি, বিদেশ বিভুঁই এই দুর্যোগের রাত্রিতে কোথায় কী হয়। সুনন্দা তো এক মিনিটের জন্য বিছানায় যায়নি, কেবল বারান্দায় এদিক ওদিক করেছে। একটু শব্দ হলেই টাঙ্গা এল ভেবে নীচে যায়।"

আধারকার বাহনবিভ্রাট বিবৃত করলেন সবিস্তারে, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন নিজ বিলম্বের জন্য। সুনন্দা বেরিয়ে এসে গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন, "ভিজে জামা-কাপড়গুলি ছাড়া হবে কি? টাঙ্গার চাকা ক'ইঞ্চি ভেঙ্গেছে, ঘোড়া ক'গজ লাফিয়েছে সে সব কাহিনী কাল সকালে ব্যাখ্যান করলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। মাথা থেকে এখনও জল ঝরছে, নিউমোনিয়া না বাধালে বোধ হয় বাহাদুরিটা পুরা হবে না।"

বোঝা গেল, শাসনকর্ত্রী নেপথ্যেই ছিলেন, টাঙ্গা দুর্ঘটনার বিবরণ শুনেছেন স্বকর্ণে।

আপন শয়নকক্ষে এসে নিদ্রার চেষ্টা করলেন আধারকার। ঘুম এল না। মুদ্রিত কমল-কলিকার পার্শ্বে গুঞ্জনরত লুব্ধ ভ্রমরের মতো মন বারংবার কেবলই প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল একটি কক্ষপথে। অতিথির বিলম্বে গৃহকর্ত্রীর এই ব্যাকুল উৎকণ্ঠা, বিনিদ্র নয়নে এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা, সকোপন অভিমান-জড়িত এই শাসন এবং সর্বোপরি এই অশ্রুধারা প্লাবিত আননের মধ্য দিয়ে নারীহৃদয়ের কোন গোপন রহস্য আজ অকস্মাৎ উদ্‌ঘাটিত হলো? শয্যা ত্যাগ করে আধারকার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

রাত্রি বিগতপ্রায়। তারকাহীন নভস্তল মেঘমালায় আবৃত এবং দিগন্তবর্তী তরুশ্রেণী বিলীয়মান রজনীর ঈষৎ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আসন্ন প্রভাতের প্রতীক্ষারত ধরণীর এই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধারকার যেন আজ তাঁর জীবন-দেবতার প্রসন্ন কল্যাণ করস্পর্শ প্রথম অনুভব করলেন ললাটে। দুই হাত যুক্ত করে প্রণাম করলেন কাকে তা তিনি নিজেই জানেন না। শুধু "আমি ধন্য, আমি ধন্য" এই বাক্য তাঁর উদ্বেল অন্তরের অন্তস্তল থেকে উত্থিত একটি মহান সঙ্গীতের মতো দ্যুলোক, ভূলোক পরিব্যাপ্ত করে বিশ্বলোকের বীণাতন্ত্রীতে অনাহত রাগিণীতে ধ্বনিত হতে লাগল।

আধারকার থাকেন বম্বেতে সুনন্দা থাকেন লাহোরে। প্রায় এক হাজার মাইলের ব্যবধান। কিন্তু যোজনা গণনা করে নয় দূরত্ব, নৈকট্যের নির্দেশ হৃদয়ে। হৃদয়ের সে অদৃশ্য যোগাযোগের নিবিড় বন্ধনে বহুদূরবর্তী এই দুটি নরনারী পরস্পরের কাছে রইলেন নিকটতম।

সুনন্দা একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল, "চারু, ইংরেজীতে কথা কয়ে সুখ নেই। আমি যদি মারাঠি বলতে পারতেম তবে বেশ হতো!"

আধারকার বললেন, "পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসতে পারে, মহম্মদ যাবে পর্বতসকাশে।"

অসাধ্য সাধন করলেন আধারকার। ছ'মাসে শিখলেন বাংলা, বৎসরকালে কণ্ঠস্থ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য, দু'বছরে সাঙ্গ করলেন পঠনযোগ্য সমুদয় বাংলা সাহিত্য।

আধারকারের পরিজনেরা পরলোকগত। এক বোন স্বামী-পুত্র নিয়ে আছে

কঙ্কনে। তার সঙ্গেও যোগাযোগ সুদৃঢ় নয়। এতকাল বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিলেন আধারকার। কর্মে, চিন্তায়, জীবনযাপনে ছিলেন স্বাধীন। এবার সে-স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনের ধারা হলো বদল। বম্বে থেকে চিঠি লেখেন লাহোরে, "নন্দা, বাড়ির বেয়ারাটা ছুটি চাইছে তিন মাসের আগাম মাইনে সমেত, দেবো কিনা লিখো।" কিম্বা লেখেন, "মালবার হিলসে ওয়ালকেশ্বর রোডে একটা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে সস্তায়। কিনব কি।"

নিজের ভালো-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত ভাবনার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন এক দূরবর্তিনী নিঃসম্পর্কীয়া অভিভাবিকার হস্তে, কিছুদিন মাত্র আগেও যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা। আত্মসমর্পণে যে এত সুখ, নির্ভরতায় যে এত প্রশান্তি, তা কখনও জানেননি এর আগে।

চৌদ্দ

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আধারকারকে যেতে হলো বিলাতে। লাহোর থেকে সপত্নীক ব্যানার্জী সাহেব এসে জাহাজে তুলে দিয়ে গেলেন ব্যালার্ড পিয়ারে।

দিন গেল, মাস বিগত, বৎসরও অতীত প্রায়। বিরহ বেদনায় পীড়িত যে-দিনগুলি অন্তহীন মনে হয় প্রথমে, তারও শেষ আছে। আধারকার প্রত্যাবৃত্ত হলেন স্বদেশে। অবিলম্বে গেলেন লাহোরে।

অঘ্রাণের প্রভাত। ট্রেনের কামরায় ঘুম ভেঙে গিয়ে আধারকার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, নির্মেঘ আকাশে সূর্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত। শাল তরুর কোমল শ্যামল পল্লবদল শিশিরার্দ্র বাতাসে মৃদু কম্পিত। টেলিগ্রাফের তারের উপরে উপবিষ্ট একজোড়া খঞ্জনী পক্ষিশাবক ঘন ঘন পুচ্ছ-আন্দোলনরত। অকারণ খুশিতে ভরে উঠল তাঁর মন।

অপরাহ্নে লাহোর স্টেশনে পেঁছে দেখলেন একা ব্যানার্জী সাহেব এসেছেন অভ্যর্থনায়। বাড়ী পৌঁছে বেয়ারার হাতে পেলেন চিঠি। অতি পরিচিত অক্ষরে অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। এক বিশেষ জরুরী কাজে একটি মহিলাকে নিয়ে যেতে হলো এক জায়গায়, চায়ের ব্যবস্থা রইল বেয়ারার কাছে, আধারকার যেন চা খেয়ে নেন। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবেন তিনি।

শুধু চায়ের ব্যবস্থা নয়, স্নানের ঘরে বাথ-টবে ধরা আছে জল, টাওয়েলর‍্যাকে ধবধবে তোয়ালে, সোপ-কেসে আছে আনকোরা সুগন্ধি সাবান। শয়নকক্ষে পরিপাটি বিছানা, খাটের পাশে ছোট টিপাইর উপরে সুদৃশ্য টেবিলল্যাম্প ও খানকয়েক সদ্য প্রকাশিত ইংরেজী উপন্যাস, মায় জয়পুরী ফুলদানীতে সযত্নে বিন্যস্ত আধারকারের প্রিয় শ্বেত করবীগুচ্ছ।

অতিথির পরিচর্যায়, আদরে, আপ্যায়নে লেশমাত্র ত্রুটি নেই কোনোখানে। তবুও কেন যে অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে আধারকার নিজেই তা জানেন না। প্রবাসে কতদিন নিদ্রাহীন রজনীতে কল্পনা করেছেন আজকের এই মুহূর্তটি। কী বলবেন, তা নিয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করেছেন, কত বার। দীর্ঘ বারোমাসের

পুঞ্জীভূত কথার মধ্যে কোনটি বলবেন সর্বাগ্রে, কোন প্রশ্ন, কোন সংবাদ দেবেন ও নেবেন, তাই নিয়ে অবসরক্ষণে ভেবেছেন কতদিন। দেখা হলে যে-কথা ভেবে রেখেছিলেন, তা হয়তো যেতো তলিয়ে, অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য রইত চাপা, হয়তো শুধু উচ্চারণ করতেন ছোট্ট একটি সাধারণ প্রশ্ন “কেমন আছ ;” তার কিছুই হলো না। খচ্ খচ্ করতে লাগল আধারকারের মন। হেমন্তের দিনটি যে অপরিসীম আনন্দের অর্ঘ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল, সে আনন্দ নিয়ে যেন শেষ হলো না।

আধারকার সাতদিন রইলেন লাহোরে। সুনন্দার সেবা, যত্নে ও আতিথেয়তায় রন্ধ্র মাত্র রইল না কোথাও, কিন্তু তবুও যেন আগেকার সে সুর বাজল না আধারকারের মর্মে, রস সঞ্চারিত হলো না অতিথির মনে। কোথায় রইল ফাঁক, কোনখানে ঘটল ব্যত্যয়, তার নিশানা পাওয়া গেল না। শুধু ব্যথা জেগে রইলো হৃদয়ের নিভৃততম গহ্বরে। যে-অভাব চোখে দেখা যায় না অথচ বুকে বোঝা যায়, তার বেদনা দূর করার উপায় কী ?

সুনন্দা কি বদলেছে ? কই বোঝা তো যায় না। কিন্তু মন বলে, কী যেন নেই। অতি সামান্য বিষয় কাঁটার মতো বিঁধে আধারকারের মনে, কুশের অঙ্কুর সম ক্ষুদ্র, দৃষ্টিঅগোচর, তবু তীক্ষ্নতম। কিন্তু সেগুলি এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, তা নিয়ে নালিশ করতে গেলে হাস্যকর ঠেকে। আধারকারের কোটের যে একটা বোতাম ছিঁড়েছে তা যদি একদিন সুনন্দার চোখে না পড়ে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। একটা মস্ত সংসারের সমস্ত পরিচালনভার যে-গৃহিণীর মাথায়, তার পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক নয়। এটা যুক্তির কথা। কিন্তু মানুষের মন তো ইন্ডাক্‌টিভ লজিকের পাঠ্য কেতাব নয়। সে ফস্ করে পাল্টা প্রশ্ন করে বসে, কই, আগে তো এমন চোখে না পড়তে দেখিনি কখনও।

লাহোর ত্যাগের দিন আধারকার বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেলেন ব্যানার্জীদের এক বন্ধু-পরিবারে। সে-গৃহে আধারকারের সম্প্রীতি জন্মেছিল সুনন্দাদেরই বন্ধুতাসূত্রে। গৃহস্বামীর কন্যা বললেন, “আজই যাচ্ছেন কী রকম ? এলেন তো এই সে দিন !”

“সে-দিন আর কোথায়, দিন দশেক তো প্রায় হলো !”

“দশ দিন ? কক্ষনো নয়, আমি বলছি অনেক কম। সাত দিন। আচ্ছা বাজী রাখুন ? আপনি এসেছেন গেল শনিবারে, সেই যেদিন সুনন্দাদি, রাণু মাসিমা, আমরা সব সিনেমায় গেলাম।”

“সিনেমায় গেলে ?”

“হ্যাঁ, রাণু মাসিমা এসেছিলেন এখানে বেড়াতে! তিনি সেণ্ট এনড্রুজে সুনন্দাদির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তেন তো ? তিনি ধরলেন সিনেমায় যেতে হবে। টিকিট কেনা হয়ে গেছে পরে খবর এল আপনি আসছেন ঐ দিনই বিকালে। সুনন্দাদি তাই যেতে চাইছিলেন না, কিন্তু রাণু মাসিমা চলে যাবেন পরদিন সকালে। কাজেই শেষটায় অনেক বলাতে রাজী হলেন। কই আপনি শুনছেন না তো, কী ভাবছেন ? বাজী হেরেছেন কিন্তু।”

আধারকারের মুখে-চোখে যে বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট হলো, তাকে বাজীতে হেরে যাওয়ার শোক মাত্র বলে গণ্য করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি ফিরে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন

করলেন না একটুকুও।

আধারকারকে ট্রেনে তুলে দিতে সে-দিন সন্ধ্যায় যথারীতি স্টেশনে এসেছিলেন স্বামী স্ত্রী। ওয়েটিং রুমের একান্তে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে আজ সারাদিন এত আনমনা দেখাচ্ছে কেন? কী এত ভাবছো বলো তো?"

আধারকার চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করে বললেন, "কই, না, তো!"

ট্রেন ছাড়ল। প্ল্যাটফরমের উপর রুমাল সঞ্চালনরত বান্ধব-বান্ধবীদের মূর্তি দূর হতে দূরতর, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের লাল আলোটা ধীরে ধীরে চলে গেল দৃষ্টির অন্তরালে।

বার্থে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে আধারকার ভাবতে লাগলেন সেই একই কথা যা আজ সকাল বেলা থেকে কিছুতে তাড়াতে পারছেন না মন থেকে। কেমন করে সম্ভব হলো তার আগমন দিনে সুনন্দার পক্ষে বান্ধবীসঙ্গ? প্রিয়সান্নিধ্যের চাইতে বড় হলো সিনেমা? টিকিট কেনা ছিল? কত লক্ষ টাকা দাম সে টিকিটের? কথা দেওয়া হয়েছিল বান্ধবীকে? কথা কি ভাঙা যায় না কিছুর জন্যই? কই আধারকার তো কল্পনা করতে পারে না এমন কোনো এনগেজমেণ্ট যা সুনন্দার অভ্যর্থনার জন্য সে অগ্রাহ্য না করতে পারে অবহেলে। এক বছর পরে সুনন্দা যদি আসত লণ্ডন থেকে পুণায়, কিম্বা ধরো লাহোর থেকে বম্বেতে, আধারকার কি তার নিকটতম বন্ধুর অনুরোধ এড়াত না, মাথাধরা বা শরীর খারাপের কল্পিত অজুহাত দেখিয়ে? প্রিয়জনের জন্যে মিথ্যাভাষণেও কি নেই সুখ?

বেশ তো, না হয় ধরে নেওয়া গেল, বাল্যবন্ধুর কাছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সম্ভব ছিল না। আগেভাগে টিকিট কেনা ছিল, যেতে হয়েছে সিনেমায়। এতে দোষ কিছুই নেই। কিন্তু তার জন্য গোপনীয়তার আবশ্যক ছিল না, ছিল না জরুরী কাজের দোহাই দিয়ে এই মিথ্যা ছলনার!

বম্বেতে মন বসল না কাজে, তিষ্ঠিতে পারলেন না দীর্ঘকাল। আবার গেলেন লাহোরে। কিন্তু খণ্ডিত লয় খেয়াল গানের মতো কিছুতে পৌঁছতে পারলেন না আর সমে, বেতালা বেসুরো বাজতে লাগল জীবনের রাগিণী। ভারকেন্দ্র থেকে যেন চ্যুত হয়ে পড়ল এই দুটি অনাত্মীয় নরনারীর তিন বছর ধরে দিনে দিনে গড়া হৃদয়সৌধ। ফিরে গেলেন বম্বেতে। এমনি করে বারংবার যাওয়া আসা করলেন বম্বে থেকে লাহোরে, লাহোর থেকে বম্বে।

অবশেষে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতরূপে এই অস্থির ব্যাকুলতার একদিন ঘটল অবসান।

আধারকার আবার লাহোরে। সংশয় বেদনায় বিচলিত। অথচ প্রকাশ্য অভিযোগের নেই উপলক্ষ। কারণ সুনন্দার প্রতি আধারকারের দাবি তো অধিকারের নয়, অনুভূতির। দাবি হৃদয়ের। সে হৃদয় যুক্তি-জ্ঞানহীন শিশুর মতো বারংবার কেবলই অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দুপুরে আপিসের কাজে বের হওয়ার কালে সে-দিন সুনন্দা কাছে এসে দাঁড়ালেন না, আগের মতো এগিয়ে দিলেন না রুমাল, ফাউন্টেন পেন, হাতের ঘড়ি ও পকেটের পার্স। ঝি বললে, "মেমসাব রসুইমে আলু বনাতী হৈঁ।" পরদিন সন্ধ্যাবেলা আপিস প্রত্যাগত আধারকার কাউকে প্রতীক্ষমানা দেখলেন না দোতলার বারান্দায়। শুনলেন ধোবার কাপড় মিলিয়ে নিতে ব্যস্ত আছেন মেমসাব।

রাগ করার কিছুই নেই এতে। কিন্তু অভিমানাহত মন বলে, কই ইতিপূর্বে

কখনও তো ঘটেনি এমন দুর্ঘটনা। আধারকারের নির্গমন-আগমনক্ষণে কোনো দিন দেখা যায়নি রন্ধনশালায় আলু কর্তনের প্রতি গৃহিণীর এই অপ্রতিরোধনীয় অনুরাগ এবং রজকের অপহরণপ্রবণতার বিরুদ্ধে মেম সাহেবের এই সতর্ক পাহারা।

ব্যানার্জীর আপিসে কাজের চাপ ছিল বেশী, প্রত্যাগমনে ঘটবে বিলম্ব। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আধারকার প্রস্তাব করলেন, "চল বেড়িয়ে আসি সাহাদারা গার্ডেনস্।"

সুনন্দা বললেন, "না।"

তবু পীড়াপীড়ি করলেন আধারকার।

"কেন, চল না।"

"না, একা তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে কী বলবে?"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন আধারকার। সুদূর অতীতের কথা নয়, স্মৃতিকে করতে হবে না মন্থন। এই তো বিলেত যাওয়ার আগেও কতদিন দুজনে গেছেন সালিমার বাগে, সিনেমায়, জুহুর সমুদ্রতীরে, বম্বের রেস্তোরাঁয়। সুনন্দা নিজে উদ্যোগ করে নিয়ে গেছেন অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দর্শনে, ব্যানার্জী রয়েছেন লাহোরে। সে-দিন কোথায় ছিল লোকেরা, কোথায় ছিল তাদের মন্তব্যের প্রতি সহচারিণীর এই অসাধারণ শ্রদ্ধা?

লোকে দেখলে কী বলবে? হায়রে এ প্রশ্ন যে আধারকারই আগে তুলেছিলেন একদিন অতীতে!

বম্বেতে সেবার শীতের শেষে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হলো মহামারীরূপে। আধারকারের গায়ে বেরুল গুটিকা। কী জানি কেমন করে খবর পেঁছিল লাহোরে। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সুনন্দা এসে হাজির হলেন আধারকারের ফ্ল্যাটে। আধারকার বিস্মিত হয়ে বললেন, "তুমি?"

শঙ্কা, স্নেহ ও অভিমান জড়িত কণ্ঠের উত্তর শুনলেন, "তা ছাড়া আর দুর্ভোগ আছে কার? ক'দিন হয়েছে?"

"দিন চারেক, কিন্তু আমি তো খবর দেবো না বলেই ঠিক করেছিলেম।"

"তা করবে না? তা না হলে আর আমাকে ভাবিয়ে মারবে কেমন করে?"

আধারকার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, "এই ছোঁয়াচে রোগ, এর মধ্যে আসবার মন্ত্রণা দিল কে তোমাকে?"

ক্রুদ্ধ হয়ে সুনন্দা বললেন, "দেখ, আমাকে রাগিও না বলছি। মন্ত্রণা দিয়েছে কে? মন্ত্রণা দিয়েছে আমার অদৃষ্ট।" খানিক থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, "চাকর বাকর হতভাগাগুলো গেছে কোন চুলোয়?"

"বাবুর্চি আর বেয়ারাটা পালিয়েছে ভয়ে। মাদ্রাজী ড্রাইভারটা আছে। সে-ই ওষুধপত্র আনে।"

"খাসা ব্যবস্থা, শুধু খবরের কাগজে 'শোক সংবাদ' ছাপাটুকুই যা বাকী," বলে সুনন্দা গেলেন ড্রাইভারের সন্ধানে। তাকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে মালপত্র আনলেন উপরে। ঘরদোর করলেন আবর্জনামুক্ত, ধূলিহীন। বিছানা ঝেড়ে মুছে নতুন করে রচনা করলেন, স্বহস্তে রোগীর পথ্য তৈরী করলেন পরম নৈপুণ্যে।

আধারকার জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যানার্জীকে দেখছি না যে?"

"তিনি তো আসেননি।"

"আসেননি ? তুমি এসেছ কার সঙ্গে ?"

"কারো সঙ্গে নয়, একা।"

"মানে ?"

"মানে আবার কী ? উনি গেছেন ট্যুরে ; ফিরতে দেরী হবে দিন পাঁচেক। তোমার লাহোরের এজেণ্টের সঙ্গে পরশু সকালে দেখা হয়েছিল এক দোকানে। তার কাছে খবর পেলেম অসুখের। বাড়িতে তালা এঁটে দুপুর সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরেছি ছুটতে ছুটতে। ওঁকে টেলীগ্রাম করে দিয়ে এসেছি এখানে রওনা হতে।"

বিস্ময়ে অভিভূত আধারকার বললেন, "ব্যানার্জী রাগ করবেন না ?"

"হয় তো করবেন।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আধারকার বললেন, "লোকেই বা বলবে কী ? ব্যানার্জী ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না কেন ? একা চলে এলে কেন ?

বিরক্ত কণ্ঠে সুনন্দা বললেন, "এসেছি আমার ইচ্ছে। লোকের ভাবনা ভেবে তোমার মাথা গরম করতে হবে না। তুমি চুপ করে ঘুমাও তো এখন।" বলে শয্যাপার্শ্বের চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যে আলো বেশী ছিল না, রোগীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য টেবিল-ল্যাম্পের একটা দিক খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা। পশ্চাৎ থেকে সুনন্দার মুখের অংশমাত্র দেখা যায়। কিছুক্ষণ পূর্বে সুনন্দা স্নান করেছেন। আর্দ্র কুন্তলদল পিঠের উপর অযত্নবিস্রস্ত। পরিধানে দেশী তাঁতের একটি শাড়ি। বামস্কন্ধের উপর তার অবিন্যস্ত বঙ্কিম অঞ্চলপ্রান্তের অন্তরাল থেকে নিটোল সুকুমার বাহুটি অনবদ্য ভঙ্গীতে লম্বিত। উন্নত গ্রীবার নিকটে সূক্ষ্ম একটি স্বর্ণহারের একটুখানিমাত্র আভাস। মৃদু দীপালোকিত কক্ষে বাতায়নবর্তিনীর এই মৌন মূর্তিটি রোগশয্যাশায়িত আধারকারের কাছে একটি পরম নিশ্চিত আশ্বাসের মতো প্রতীয়মান হলো। দুজনের কেউ আর কোনো কথা বললেন না। শুধু উভয়ের উদ্বেল হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগ সমাজ-সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও কলঙ্কের ঊর্ধ্বে দেবমন্দিরের পবিত্র হোমাগ্নির মতো যেন জ্বলতে লাগল একটি অনির্বাণ অদৃশ্য শিখায়।

পরের দিন ব্যানার্জীও এসে পৌঁছলেন। আধারকারের বসন্ত আসল নয়, চিকেন। কিন্তু রোগমুক্ত হতেই সুনন্দা জোর করে নিয়ে গেলেন লাহোরে এবং পক্ষাধিককাল পূর্বে আধারকার ছাড়া পেলেন না বম্বেতে ফিরতে।

সে-দিনের সুনন্দার দৃষ্টি ছিল না বাইরে, গ্রাহ্য ছিল না লোকাপবাদের, মন ছিল ইতরজনের নিন্দা-প্রশংসার অতীত। সংসারে ছিল না আসক্তি, গৃহকর্মে ছিল না আকর্ষণ, স্বামীতে ছিল না মনোযোগ। কতদিন আধারকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সুনন্দাকে, "এই, ব্যানার্জী এসেছে আপিস থেকে। যাও, দেখগে তার কী চাই।"

সুনন্দা বলেছেন, "আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে। তোমাকে আর গিন্নীপনা শেখাতে হবে না। তুমি ব্যানার্জীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কি না ?"

সেদিনের সুনন্দা নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ। সে শুধু প্রণয়িনী। সে তো সুনন্দা ব্যানার্জী নয়, সে সুনন্দা প্রিয়দর্শিনী।

সুনন্দারা হিন্দু নয়, খ্রীস্টান। বহু বর্ষ পূর্বে তাঁর পিতামহ এসে স্থায়ী আবাস গড়েছিলেন লাহোরে। সুনন্দা মানুষ হয়েছেন য়ুরোপীয় আবেষ্টনে, বিদ্যাভ্যাস

করেছেন শ্বেতাঙ্গদের কনভেণ্টে, পরিণীতা হয়েছেন খ্রীষ্টীয় প্রথায়। তাঁদের সমাজে তরুণীরা অবগুণ্ঠনবতী নয়, স্ত্রীরা নন অন্তঃপুরিকা। পুরুষের অবাধ সাহচর্য সেখানে নিন্দনীয় নয়, বাইরে বন্ধুসঙ্গ নয় নিষিদ্ধ। এমন কি বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহেও সামাজিক অন্তরায় ছিল না সুনন্দার।

কঠোর তিক্ত সত্য হৃদয়ঙ্গম করলেন আধারকার। মোহভঙ্গ হয়েছে সুনন্দার। সুধার পাত্র হয়েছে রিক্ত। মন্থন করলে আর উঠবে না মধু, উঠবে হলাহল।

সে-দিন অপরাহ্ণে বাড়ি ফিরবার উৎসাহ ছিল না আধারকারের। টেলীফোন করে জানিয়ে দিলেন ফিরতে বিলম্ব হবে তাঁর। বহুক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে অবশেষে উপস্থিত হলেন ম্যালের পাশে সিনেমা হলের সম্মুখে। কী যেন কী খেয়াল হলো, টিকিট কিনে প্রবেশ করলেন ভিতরে। ছবি তখন শুরু হয়ে গেছে। অন্ধকার ঘরে টিকিটচেকার বসিয়া দিয়ে গেল একটি আসনে। নির্বাক চিত্র। কিড়্ড়ড় শব্দে প্রজেক্টারের আওয়াজ শোনা যায় স্পষ্ট। দর্শকদের আলাপ, আলোচনা, মন্তব্যেরও বাধা থাকে না।

হঠাৎ নিজের নাম কানে আসতে চমকে উঠলেন আধারকার। সামনের সারিতে কারা বসেছেন অন্ধকারে তা দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু তাঁরা যে পুরুষ নন সে বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। আধারকার উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন।

"যাই বলিস ভাই, এডমায়ারার-এর সংখ্যা আর বাড়াসনে। আধারকার বেচারা তো মরেছে তোর হাতে, আর কেন ?"—চাপা কণ্ঠে বললেন একটি মহিলা।

উত্তর হলো, "হ্যাঁ, বলেছে এসে তোর কানে কানে !"

আধারকার আসন থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন মাটিতে। ভুল করার সাধ্য কি ও কণ্ঠ ? এ কণ্ঠ যে তাঁর জীবন ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। প্রথম শুনেছিলেন তিন বছর পূর্বে দাদার স্টেশনে।

সখীদ্বয়ের পরিহাস পরিবাদ চলতে লাগল মৃদুকণ্ঠে, কিন্তু আধারকারের শ্রুতির অগোচর রইল না এক বর্ণও।

প্রশ্নকর্ত্রী বললেন, "কানে কানে বলতে হবে কেন ? আমাদের কী চোখ নেই ? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আর কোনো আশা নেই লোকটার।"

"ইস্, বড় যে দরদ দেখছি। ওগো করুণাময়ি, তবে তুমিই ত্রাণ কর না কেন তাকে !"

"বলিস কী ! সইতে পারবি ? তা হলে যে তোর মুখচন্দ্রমা অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে যাবে, বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে আমার !"

"একটুও না। দিব্যি করে বলছি, আমার তাতে কী আসে যায় ? বরং ছাড়া পেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।" কণ্ঠ পরিহাসতরল নয় এবার !

প্রশ্নকর্ত্রী নিজেও বোধহয় কিছুটা বিস্মিত হলেন। কৌতুক পরিহার করে বললেন, "কেন ভাই, আধারকারকে তো বেশ ভালো লোক মনে হয়। ভদ্র, শিক্ষিত, বিত্তশালী অথচ স্নব নয়,—বেশ সিম্পল।"

"সিম্পল নয়, সিম্পল্টন। কাণ্ডজ্ঞান নেই এতটুকু। সব জিনিষই অত্যন্ত সীরিয়সলি নেবে। কবে কখন fun করে কী বলেছি, কী করেছি, সেটাকেই মনে করে বসেছে, আমি ওর প্রেমে পড়েছি। ইডিয়ট ! সত্যি বলছি তোকে, আমি ক্রমশঃ যেন

টায়ার্ড হয়ে উঠছি।"

হঠাৎ ছবির স্পুল ছিঁড়ে গিয়ে ছবি হলো বন্ধ, আলো জ্বলে উঠল প্রেক্ষাগৃহের। সে আলোতে দেখা গেল আলাপ আলোচনারতা বান্ধবীদ্বয়কে অদূরবর্তী আসনে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জোড়া-দেওয়া ফিল্ম শুরু হলো আবার অডিটোরিয়মের বাতি দেওয়া হলো নিভিয়ে।

ছবির আখ্যান-ভাগ এক তরুণী শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রণয়কাহিনী। তাঁর দরিদ্র প্রেমাস্পদ চলে যাচ্ছেন দূরদেশে জীবিকার প্রয়োজনে। সন্ধ্যাবেলায় পরিজনের অলক্ষিতে উদ্যান-বাটিকায় তরুণী সাক্ষাৎ করলেন তাঁর সঙ্গে। পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে সঙ্গিনী হতে চাইলেন দয়িতের। কিন্তু তরুণ চায় না ধনিকন্যাকে দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আনতে। বলে, আমাকে ভুলে যেও। মনে করো,—এক সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতরূপে দুজনে দেখা হয়েছিল এক পান্থশালায়, রাত্রি প্রভাতে যাত্রীরা চলে গেছে নিজ নিজ বিভিন্ন পথে। আর দেখা হবে না কোনো দিন।

শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রেম গভীর। ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন তাঁর কাছে তুচ্ছ, দৃষ্টি নেই মণি মুক্তা বিলাসোপকরণ বা ঐশ্বর্যসম্ভারে। যাঁকে প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তাঁর বিহনে প্রাণ ধারণ করবেন কেমন করে? হে নিষ্ঠুর, যদি ফেলে যাও এ অভাগিনীকে, পায়ে দলে যাও কোমল হৃদয় তবে জেনো মৃত্যু তার অবধারিত।

দর্শকগণ রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় সম্মুখের পর্দায় নিবদ্ধদৃষ্টি।

প্রণয়ব্যাকুলা রমণীর এই আত্মসমর্পণে কী করবে তরুণ নায়ক? প্রচুর পাউডার-প্রলিপ্ত নায়িকার গণ্ডদেশে ঠাস্ করে একটি সবল চপেটাঘাত করলে আধারকার সব চেয়ে খুশি হতেন। কিন্তু তা কেমন করে হবে? ছবিতে দেখা গেল, আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ, মাধবীলতায় ফুটেছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, পরস্পরের চঞ্চুতাড়না দ্বারা প্রণয় নিবেদন করছে তরুশাখে উপবিষ্ট ক্রৌঞ্চমিথুন এবং উদ্যানের সরোবরে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম হঠাৎ দু'দিক থেকে ভাসতে ভাসতে এসে মিলল একসঙ্গে। ভারতীয় সিনেমার এই চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিককে ছায়াচিত্রের নায়কেরা চিরকাল যা করে থাকে তাই করল তরুণ। বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করল নায়িকাকে। দুজনে হাত ধরাধরি করে রওনা হলো। কোথায়, তা অবশ্য একমাত্র চিত্রপরিচালকই জানেন! বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দের সঘন করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল প্রেক্ষাগার। শেষ হলো নাটিকার।

সকলের অলক্ষিতে আধারকার নিষ্ক্রান্ত হলেন প্রেক্ষাগৃহ থেকে। মনে মনে বললেন, একমাত্র নাটকের মধ্যেই সম্ভব এই অবাস্তব কাহিনীর অবতারণা। সেখানে তো সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের মুখোমুখি হওয়ার দায় নেই। তাই তার কল্পিত নায়িকার পক্ষে কোনো অসম্ভব আচরণ বা কোনো অস্বাভাবিক উক্তি করতেই বাধা নেই। তা শুনে আমরা বিমুগ্ধ দর্শকরাও 'এঙ্কোর,' 'এঙ্কোর' বলে চেঁচিয়ে উঠি। আমরা তো জানি নে শ্রেষ্ঠিকন্যার যে-প্রণয়নিবেদন দৃশ্য দেখে আমাদের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে তার ষোলো আনাই স্টেজ-ম্যানেজ্‌ড্, ষোলো আনাই ফান। সমস্তটাই ফাঁকি। হতভাগ্য নায়ক সে-তথ্য জানতে পারে দু'দিন পরে। কিন্তু সে তো দর্শকের দেখার উপায় নেই। রচিত কাব্যের বহির্দেশে, অভিনীত নাটকের নেপথ্যে সে থাকে চিরকাল লোকলোচনের অন্তরালে। নাটকের যেখানে শেষ, জীবনের সেখানেই তো শুরু!

সেই রাত্রেই লাহোর পরিত্যাগ করলেন আধারকার।

রাত বারোটায় ট্রেন। খোয়া-বাঁধানো পথের উপর দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে টাঙ্গা। এপথে কতবার আসা-যাওয়া করেছেন আধারকার। কিন্তু আজকের এই যাত্রা তো অন্য আর বারের মত নয়। তখন যাওয়ার মধ্যে থাকতো অদূরবর্তী পুনরাগমনের আশ্বাস, থাকতো পুনর্মিলনের সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা। আজ সে-আশা রইল না এতটুকুও। যে গৃহদ্বার এইমাত্র অতিক্রম করলেন, যে পথ রাখলেন পশ্চাতে, কদাচ তা পুনশ্চারণের আর সম্ভাবনা রইল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়, বোমার আঘাতে আহতের একটি বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে অদূরে, অথচ তার সংজ্ঞা হয়নি বিলুপ্ত। এ্যাম্বুল্যান্স-বাহিত সে আহত স্পষ্ট দেখতে পায়, ফেলে রেখে যাচ্ছে সে আপন খণ্ডিত বাহু। আধারকার অনুভব করলেন সেই অনুভূতি। আপন চোখে দেখতে পেলেন পশ্চাতে ফেলে রেখে যাচ্ছেন—বাহু নয়, শতধাবিদীর্ণ হৃদয়।

ফানুই বটে! স্নেহ নয়, প্রীতি নয়, শোভা-গন্ধ বিমণ্ডিত হৃদয়াবেগের বাষ্প-মাত্র নয়, শুধু কৌতুক। নিষ্ফল প্রণয়ের উপশম আছে করুণায়, কিন্তু উপহসিতের নেই সান্ত্বনা। তার লজ্জা দুঃসহ।

এই হৃদয়হীন নারীর ছলনাকেই সত্য কল্পনা করে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন আধারকার,—একথা ভেবে নিজের উপরেই গভীর বিতৃষ্ণা জন্মাল তার। কতদিন প্রমত্ত প্রগল্‌ভতায় হৃদয়ের কত দুর্বলতা ব্যক্ত করেছেন তাঁর কাছে, কত স্বপ্ন গড়েছেন তাঁকে কেন্দ্র করে, সে-সব স্মরণ করে বারংবার নিজেকে ধিক্কার দিলেন আধারকার।

গভীর বেদনা ও অপরিসীম লজ্জা নিয়ে আধারকার ফিরে চললেন স্বস্থানে। অনন্ত আকাশে লক্ষ কোটি যোজন দূরের যে তারকা শ্রেণী অনিমেষ নয়নে এই বিপুলা ধরিত্রীর পানে তাকিয়ে আছে, তারা সাক্ষী রইল আর একটি সকরুণ কাহিনীর। যুগযুগান্ত ধরে এমন কতশত অশ্রুসজল বেদনাবিধুর নাট্য অভিনীত হয়েছে তাদের পলকহীন নয়নের অকম্পিত দৃষ্টির সম্মুখে। কত খেলা গেছে ভেঙে, কত ফুল ঝরেছে ধুলায়, কত বাঁশরী হয়েছে নীরব।

এই স্বল্পপরিসর জীবনের প্রায় সমুদয় অংশ আধারকার কাটিয়েছেন একা। এই তো সে-দিন পর্যন্ত চাকর বেয়ারা মাত্র সম্বল ফ্ল্যাটে আপনাকে নিয়ে আপনি ছিলেন মগ্ন। আজও আবার সেই নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করলেন। অথচ এ দুয়ের মধ্যে কি অপরিসীম প্রভেদ। আকাশ আজ নিঃশেষে শূন্য, বাতাস আজ নিরর্থক, এই জনাকীর্ণ পৃথিবীর সমাজ ও সংসারের যাবতীয় কর্ম বিস্বাদ ও ক্লান্তিকর।

নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখলেন আধারকার। একটা বিরাট মরুভূমির মতো সর্বত্র উষর। কোনোখানে নেই একটু ছায়া, একটু শ্যামলিমা, একটু আলোক আঁধার বিজড়িত স্নিগ্ধতার চিহ্ন লেশ।

আধারকার মূর্খই বটে। কাঁচকে ভেবেছিলেন হীরা, সদ্য টাকশাল থেকে নির্গত উজ্জ্বল তাম্রখণ্ডকে ভ্রম করেছিলেন গিনি বলে। গান্ধীজির একটা লেখা চোখে পড়ল, আধুনিকাদের সম্পর্কে। তারা নাকি প্রত্যেকেই নিজেকে ভাবে একটি জুলিয়েট, এক সঙ্গে আধ ডজন রোমিওর প্রণয়িনী। আধারকারের মনে হয়, এতদিনে যেন অর্থ

পেলেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না একেবারে। আবার সংশয় জাগে চিত্তে। একাধিক রোমিওর জন্য কি দুর্যোগের রাত্রিতে উৎকণ্ঠায় বিনিদ্র রজনী যাপন করা যায়? সম্ভব হয় তাদের অসুখের সংবাদে স্বামী সংসার ফেলে একাকী একহাজার মাইল ছুটে যাওয়া!

বম্বেতে ফিরে মাস কয়েক বিপুল উদ্যমে চেষ্টা করলেন আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে কর্মের মধ্যে। মিলের কাজে খাটতে লাগলেন সকাল থেকে সন্ধ্যা। ভুলতে প্রয়াস করলেন বিগত তিন বৎসরের স্বল্পায়ু স্বপ্নলোক। করতে চাইলেন নতুন করে জীবনারম্ভ। কিন্তু মন তো শিশুদের আঁক কষার শ্লেট নয় যে, ইচ্ছা মতো পেন্সিলের আঁচড় মুছে নতুন করে সংখ্যাপাত করা যাবে। নিজের সঙ্গে দিনের পর দিন অবিরাম যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হলেন আধারকার। তারপর জলের দামে একদিন হঠাৎ মিল দিলেন বিক্রি করে। অন্তর্হিত হলেন বম্বে থেকে।

গেলেন মালয়া, রবারের বাগানে হলেন ম্যানেজার। ভালো লাগল না বেশী দিন। গেলেন সিলোনে এক কফি কোম্পানীর কর্তারূপে, টিকতে পারলেন না দু'বছর। বুয়েনস্ এয়ার্সে কাজ করলেন মদের কারখানায়; সেখানেও বিরক্তি ধরল। পরিব্রাজক হয়ে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করলেন, দেশ দেশান্তর। নানকিং, ক্যানবারা, টরোন্টো, ওয়াশিংটন, লাইপৎসিগ, ব্রাসেলস্। তবু ভুলিল না চিত্ত।

নিউ ক্যাসেলের এক ইংরেজ কোম্পানী থেকে এককালে নিজের মিলের জন্য আধারকার কিনেছিলেন কিছু সাজ-সরঞ্জাম। তাদের ভারতীয় শাখার ম্যানেজাররূপে অবশেষে আধারকার এলেন দিল্লীতে। এখানে আছেন আজ প্রায় এগারো বছর। যে-মিল তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন কুড়ি বছর আগে, তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজ কোটিপতি। সেখানে এক ডজন কর্মচারী আছে যারা আধারকারের চেয়ে বেশী-মাইনে পায়।

বছরের পর বছর হয়েছে গত। জীবনের আজ অপরাহ্ন বেলায় এসে পৌঁছেছেন আধারকার। দেহে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে বার্ধক্যের আক্রমণ-আভাস। হৃদয়াবেগের যে-তীব্রতা যৌবনের লক্ষণ, আজ তা স্তিমিততেজ।

যে-সুনন্দাকে আধারকার ভালোবেসেছিলেন, সে তো শুধু ঐ রক্ত মাংসের মানুষটি নয়। প্রেম আপন গভীরতায় নিজের মধ্যে একটি মোহাবেশ রচনা করে। সেই মোহের দ্বারা যাঁকে ভালোবাসি তাঁকে আমরা নিজের মনে মনে মনোমত করে গঠন করি। যে সৌন্দর্য তাঁর নেই, সে সৌন্দর্য তাঁতে আরোপ করি। যে-গুণ তাঁর অভাব, সে-গুণ তাঁর কল্পনা করি। সে তো বিধাতার সৃষ্ট কোনো ব্যক্তি নয়, সে আমাদের নিজ মানসোদ্ভূত এক নূতন সৃষ্টি। তাই কুরূপা নারীর জন্য রূপবান, বিত্তবান তরুণেরা যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে, অপর লোকেরা অবাক হয়ে ভাবে, "আছে কী ঐ মেয়েতে, কী দেখে ভুলল?" যা আছে সে তো ঐ মেয়েতে নয়,—যে ভুলেছে তার বিমুগ্ধ মনের সৃজনধর্মী কল্পনায়। আছে তার প্রণয়াঞ্জনলিপ্ত নয়নের দৃষ্টিতে। সে যে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছে তাহার রচনা।

আধারকারের দৃষ্টি থেকে সে-অঞ্জন আজ বিলুপ্ত, মন থেকে সে-মোহাবেশ অপসৃত। একদিন জগতের সমস্ত কবিকুলের কল্পলোক থেকে আহৃত যে-সৌন্দর্য,

যে-সুষমা, যে-বর্ণসম্ভার দ্বারা সুনন্দাকে তিনি রচনা করেছিলেন তিলে তিলে, আজ তার লেশমাত্র নেই। প্রবঞ্চিত আধারকারের কাছে সুনন্দা আজ একজন অতি সামান্য রমণী মাত্র। কোনোখানে তার এতটুকু অনির্বচনীয়তা, এতটুকু বিশেষত্ব অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য মানুষের মন! আজও ক্ষতের মূল রয়েছে গভীরে যদিও চিহ্ন গেছে মিলিয়ে। অসাবধান মুহূর্তে ছোঁয়া লাগলে আজও কেন টন টন করে ব্যাথায়? কেন নিঃশেষ হয় না স্মৃতি?

আধারকারের কাহিনী শেষ হলো।

বাক্যহীন নিস্তব্ধতায় বসে রইলেম খানিকক্ষণ।

"হুজুর, ট্যাঙ্গা ল্যানে পড়েগা?"

চমকে চেয়ে দেখি আধারকারের ভৃত্য। কখন আধারকার উঠে চলে গেছেন, নিঃশব্দে, টের পাইনি একটুও। আপন জীবনের নিগূঢ় গোপন কাহিনী ব্যক্ত করেছেন আজ এক অতি অল্প দিনের পরিচিত অসমবয়সী বন্ধুর কাছে। যখন বলে গেছেন, তখন অবগাহন করেছেন স্মৃতির ধারায়। কাহিনী সাঙ্গ হতেই সে-মোহজাল ছিন্ন হয়েছে, নেমে এসেছেন বাস্তবের প্রত্যক্ষ ভূমিতে। সঙ্কোচ দেখা দিয়েছে সেই মুহূর্তে, যেই হয়েছে চোখোচোখি। তাই অদৃশ্য হয়েছেন নিঃশব্দে। সুতরাং বিদায় নেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হলেম। ভৃত্যকে টাঙ্গা আনতে করলেম বারণ। পদব্রজে নিষ্ক্রান্ত হলেম পথে।

শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে মেঘশূন্য আকাশে, তার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে দু'পাশের বাংলোগুলির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। পথ জনশূন্য, ধ্বনিবিরল। কাছাকাছি কোথায় যেন হাসনুহানার ঝাড়ে ফুটছে ফুল। তার তীব্র মদির সুবাসে বাতাস হয়েছে উতলা আকুল, রজনী হয়েছে গন্ধবিহ্বল।

চলতে চলতে ভাবছিলেম আধারকারের কথা। কানে বাজতে লাগল সকরুণ স্বীকারোক্তি, "মিস্টার সাহেব, আমি ইডিয়টই বটে! পরিহাসকে মনে করেছি প্রেম; খেলাকে ভেবেছি সত্য। কিন্তু আমি তো একা নই। জগতে আমার মতো মূর্খরাই তো জীবনকে করেছে বিচিত্র; সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত। যুগে যুগে এই নির্বোধ হতভাগ্যের দল ভুল করেছে, ভালোবেসেছে, তারপর সারা জীবনভোর কেঁদেছে। হৃদয়নিংড়ানো অশ্রুধারায় সংসারকে করেছে রসঘন, পৃথিবীকে করেছে কমনীয়। এদের ভুল, ত্রুটি, বুদ্ধিহীনতা নিয়ে কবি রচনা করেছেন কাব্য, সাধক বেঁধেছেন গান, শিল্পী অঙ্কন করেছেন চিত্র, ভাস্কর পাষাণ-খণ্ডে উৎকীর্ণ করেছেন অপূর্ব সুষমা। জগতে বুদ্ধিমানেরা করবে চাকরি, বিবাহ, ব্যাঙ্কে জমাবে টাকা, স্যাকরার দোকানে গড়াবে গহনা; স্ত্রী,পুত্র, স্বামী, কন্যা নিয়ে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করবে স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছলতায়। তবু আমরা মেধাহীনের দল একথা কোনো দিন মানবো না যে, সংসারে যে বঞ্চনা করল, হৃদয় নিয়ে করল ব্যঙ্গ, দুঃখ বলে দিল পিটুলী,—তারই হলো জিত, আর ঠকল কেবল সে, যে উপহাসের পরিবর্তে দিল প্রেম।"

অতি দুর্বল সান্ত্বনা। বুদ্ধি দিয়ে, রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে বলা সহজ —"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা।" কিন্তু জীবন তো মানুষের সম্পর্ক বিবর্জিত একটা নিছক তর্ক মাত্র নয়। শুধু কথা গেঁথে গেঁথে ছন্দ রচনা করা যায়, জীবন ধারণ করা যায় না।

আধারকার হচ্ছেন সেই শ্রেণীর পুরুষ, যাঁরা কিছুই হাতে রাখতে জানেন না। এঁদের কপালে দুঃখ অনিবার্য। পলিটিক্সের মতো মানুষের জীবনও হচ্ছে এ্যাড্‌জাস্টমেণ্ট আর কম্প্রমাইজ। এ দারুণ ইনফ্লেশনের বাজারেও সংসারে শুধু হৃদয়ের দাম খুব বেশী নয়।

সুনন্দার পক্ষে সম্ভব ছিল না আধারকারের গতিতে তাল রেখে চলা। সে নারী। প্রেম তার পক্ষে একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র। আবিষ্কার নয়, যেমন পুরুষের কাছে। মেয়েরা স্বভাবতঃ সাবধানী, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর বাঁধে। ছেলেরা স্বভাবতঃই বেপরোয়া, তাই প্রেমে পড়ে তারা ঘর ভাঙে। প্রেম মেয়েদের কাছে একটা প্রয়োজন, সেটা আটপৌরে শাড়ীর মতো নিতান্তই সাধারণ ; তাতে না আছে উল্লাস, না আছে বিস্ময়, না আছে উচ্ছলতা। ছেলেদের পক্ষে প্রেম জীবনের দুর্লভ বিলাস, গরীবের ঘরে বেনারসী শাড়ির মতো ঐশ্বর্যময়, যে পায় সে অনেক দাম দিয়েই পায়। তাই প্রেমে পড়ে একমাত্র পুরুষেরাই করতে পারে দুরূহ ত্যাগ এবং দুঃসাধ্যসাধন।

আধারকার নিজেই একদিন বলেছিলেন, "মিন সাহেব, জগতে যুগে যুগে কিং এডওয়ার্ডেরাই করেছে মিসেস সিম্পসনের জন্য রাজ্য বর্জন, প্রিন্সেস এলিজাবেথেরা করেনি কোনো জন, স্মিথ বা ম্যাকেঞ্জির জন্য সামান্যতম ত্যাগ। বিবাহিতা নারীকে ভালোবেসে সর্বদেশে সর্বকালে আজীবন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে একাধিক পুরুষ ; পরের স্বামীর প্রেমে পড়ে কোনোদিন কোনো নারী রয়নি চিরকুমারী।"

কোমলহৃদয় বলে আমার খ্যাতি নেই। কিন্তু আধারকারের জন্য সত্যিকার বেদনা বোধ করলেম হৃদয়ে। সুনন্দা ব্যানার্জী আজ কোথায় আছেন জানি নে। অনুমান করছি, এতদিনে তাঁর যৌবন হয়েছে গত, দেহ বিগতশ্রী, দৃষ্টি বিদ্যুৎহীন এবং কপোলের রেখাগুলি প্রচুর প্রসাধনপ্রলেপের দ্বারাও আজ আর কোনো মতেই গোপনসাধ্য নয়। কোনো দিন কোনো অবকাশ মুহূর্তে বহু বর্ষ আগেকার এক মারাঠি ব্রাহ্মণের চরম নির্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করে ক্ষণেকের জন্যও তাঁর মন উন্মনা হয় কিনা, সে কথা আজ জানার উপায় নেই। অথচ তাঁরই জন্য আধারকার দিলেন চরম মূল্য। নিজেকে বঞ্চিত করলেন সাফল্য থেকে, খ্যাতি থেকে, ঐহিকের সর্ববিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে ! সব চেয়ে বড় কথা, নিজেকে বঞ্চিত করলেন সম্ভবপর উত্তরপুরুষ থেকে, বংশের ধারাকে করলেন বিলুপ্ত।

কোনো দিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কুশল কামনা করে তুলসীমঞ্চে কেউ জ্বালবে না দীপ, কোন নারী সীমন্তে ধরবে না তাঁর কল্যাণ-কামনায় সিন্দুরচিহ্ন, প্রবাসে অদর্শনবেদনায় কোনো চিত্ত হবে না উদাস উতল। রোগশয্যায় ললাটে ঘটবে না কারও উদ্বেগকাতর হস্তের সুখস্পর্শ, কোনো কপোল থেকে গড়িয়ে পড়বে না নয়নের উদ্বেল অশ্রুবিন্দু। সংসার থেকে যেদিন হবেন অপসৃত, কোনো পীড়িত হৃদয়ে বাজবে না এতটুকু ব্যাথা, কোনো মনে রইবে না ক্ষীণতম স্মৃতি।

প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা। কিন্তু প্রবঞ্চিতকে দেয় কী ? তাকে দেয় দাহ। যে আগুনে আলো দেয় না অথচ দহন করে, সেই দীপ্তিহীন অগ্নির নির্দয় দাহনে পলে পলে দগ্ধ হলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন হতভাগ্য চারুদত্ত আধারকার।

জনান্তিক

উৎসর্গ

তা'কে,

"যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি"

বারোই নভেম্বর ঃ উনিশ শ' বাহান্ন ঃ কলকাতা

আজ রাকতা য়ে কলম হেচ্‌ দিগার পঙনা-সাবাদ।
এক জররা আজ উঁচে হাসৎ আকিজ্‌ন না সাবাদ।
হার হিলা কে দর্‌ ত সাউয়ার আকনে আইয়েজ
কর্‌ দেম ও লেক বা কাজা দর্‌ না গিরিস্ত।

—ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ

The little finger writes, and having writ
Moves on ; nor all thy piety nor wit
Shall lure it back to cancel half a line
Nor all thy tears wash out a word of it.

—ফিট্‌জিরাল্‌ড কৃত ইংরেজী অনুবাদ

পারস্যদেশীয় উপকথায় একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। গল্পের নায়ক,— বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন ও বিত্তহীন এক রাখাল বালক সমুদ্রের বেলাভূমিতে ক্রীড়াচ্ছলে শুক্তি আহরণ করতো প্রতিদিন। জানতো না, তার মধ্যে ছিল লক্ষ হীরা মাণিক। সে মাণিক যার ঘরে আসে, তাকে রাজা করে ; যার ঘর ছাড়ে, সে হয় ফকির।

অপুত্রক অধিপতির মৃত্যুর পরে রাজ্যের বৃদ্ধ উজীর বের হলেন ভাবী সুলতানের সন্ধানে। বহুদিনব্যাপী ব্যর্থ অন্বেষণের পর হতাশ হয়ে এক দিন শপথ করলেন, পরদিন জুম্মার নামাজের শেষে যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে, তাকেই রাজপদে মনোনীত করবেন।

নামাজের পরে মসজিদের বাইরে এসে উজীর দেখতে পেলেন দ্বারের পাশে মীনারের ছায়ায় এক রাখাল বালক নিদ্রামগ্ন। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। ঘোড়ায় চড়িয়ে উজীর নিয়ে এলেন তাকে রাজধানীতে। রাখাল বালককে বসিয়ে দিলেন বাদশাহের তক্তে। শাহজাদীর সঙ্গে ঘটল তার পরিণয়।

নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ অসামন্যতা লাভের এমন বিস্ময়কর ঘটনা শুধুমাত্র রূপকথার ভাণ্ডারেই নিবদ্ধ নয়। সত্যকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ইতিহাসেও এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রীতিপ্রদ বলেই সে অভিজ্ঞতা দীর্ঘকাল আমাদের স্মরণে থাকে না। সে আমাদের আপন সৌভাগ্যের অনুকূল, তাই তাকে আমরা আপন যোগ্যতার অবধারিত পুরস্কার রূপেই গণ্য করি, প্রসন্ন ভাগ্যদেবতার অকারণ পক্ষপাত বলে স্বীকার করিনে।

আমি লেখক নই। গ্রন্থ রচনার কোন উচ্চাভিলাষ কোনকালে আমার কল্পনায় ছিল না। অথচ সম্প্রতি গ্রন্থকাররূপে আমার পরিচিতি ঘটেছে। এটা একান্তই আকস্মিক। পাঠকজনের যে প্রসন্ন প্রশ্রয় লেখকজীবনের চরম পুরস্কাররূপে চিরকাল স্বীকৃত, সেই অভাবনীয় অনুগ্রহের দ্বারা যদি ধন্য হয়ে থাকি, তবে তাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

কর্মের প্রয়োজনে আমি দিল্লী এসেছিলেম। সে অনেকদিন আগেকার কথা। বয়স তখন অল্প, কৌতূহল প্রচুর এবং মনের স্বাভাবিক রসগ্রাহিতা পরিণত বুদ্ধি ও পরিপক্ক অভিজ্ঞতার অন্তরালে তখনও পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার অবকাশ পায়নি। জীবনের যে-অধ্যায়ে হৃদয় সহজে উদ্বেল, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও রসনা মুখর হয়, যৌবনের সেই প্রারম্ভকালে আর্যাবর্তের এই মহানগরীতে আমার প্রথম পদার্পণ। আমার পক্ষে সেটা অবশ্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা।

সর্বদেশেই কাব্য ও উপকথার মধ্য দিয়ে কয়েকটি স্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের খ্যাতি তাদের আপন মাহাত্ম্যে নয়, সাহিত্যিকের রচনানৈপুণ্যে। হারুন-অল্-রসিদের রাজধানী বোগদাদের সঙ্গে সত্যিকার ভুগোলের সম্পর্ক সামান্য। তার যথার্থ পরিচয় আছে একমাত্র শেহরজাদী-কথিত একাধিক সহস্র রজনীর কাহিনীতে। যে-উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-অলিন্দে একদা মৃগলোচনা জনপদবধূরা প্রবাসী প্রিয়জনের প্রতীক্ষারতা ছিলেন, তার আসল ঠিকানা সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপে মিলে না। শুধু স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

কাব্যলোকের মহিমামণ্ডিত এই নগরমালার মধ্যে দিল্লীর স্থান নেই। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত অভিশপ্ত যক্ষের বিরহ-বেদনা বহন করে আষাঢ়স্য প্রথম দিবস যে-পূর্বমেঘ যক্ষপ্রিয়ার কাছে উপনীত হয়েছিল, তার পরিক্রমণপথে দিল্লীর আকাশ ছিল কি না, সে কথা কালিদাস বলেননি। ইঙ্গ-বঙ্গ-অধ্যুষিত অতি আধুনিক দার্জিলিংকেও রবীন্দ্রনাথ কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলোক থেকে গল্পের স্বপ্নলোকে উন্নীত করেছেন, কিন্তু দিল্লীপথের ধূলি ছাড়া মহানগরীর আর কিছুই তাঁর রচনায় স্থান পায়নি, যদিও বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁ'র পুত্রীকে জনশূন্য ক্যালকাটা রোড অপেক্ষা আজমিরী গেটের পাশে খুব বেমানান দেখাত বলে মনে হয় না।

তবুও দিল্লীর গৌরব তার নিজস্ব। সে তো একটি মাত্র নগরী নয়, বহু নগরীর ধ্বংস ও বিকাশ। একটি রাজার রাজধানী নয়, বহু রাজত্বের শ্মশান ও সূতিকা। বিচিত্র সভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম, বহুবিধ জাতির সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এইখানে। যুগ-যুগান্ত ধরে যে-তিনটি স্থান ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ধারণ, খ্যাতি বহন ও পরিচিতি প্রসারণ করেছে, তার মধ্যে বারাণসীর পরিচিতি প্রজ্ঞায়, বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধি ভক্তিতে, দিল্লীর গুরুত্ব ইতিহাসে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও দিল্লীর ইতিবৃত্ত অনেকাংশে সমার্থক।

ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ অনেক। কাব্যের আবেদন মানুষের মনে। তার নায়ক-নায়িকার বিচরণস্থল আমরা কল্পনায় অনুভব করি। চোখ বুজে তাকে ভাবা যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্য থাকে মাটিতে। তার ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ। চোখ মেলে তাকে দেখা যায়। দিল্লীর প্রাচীর ও প্রান্তরে, দুর্গপ্রাকার ও প্রাসাদ-অঙ্গনে, সমাধিক্ষেত্র ও সৌধমালায় অসংখ্য দর্শনীয় আছে।

কিন্তু দর্শনের যে রস, সে শুধু নয়ননিবদ্ধ নয়, মননসাপেক্ষ। চক্ষু দ্বারা দেখি—একথা বাল্যকালে বিদ্যারম্ভের প্রথম পর্বে পাঠ্যপুস্তকে আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু চোখ চাইলেই যে দেখা যায় না, এ তথ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ জেনেছি। যে-দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগ নেই, সে তো দেখা নয়,—তাকানো। দেখার সঙ্গে আনন্দের যোগ সাধন করতে সঙ্গীর প্রয়োজন। ভোগের বেলায় সংখ্যাধিক্যের ফলে বস্তুর হ্রাস ঘটে। একের পাতে যা পরিপূর্ণ এক, দুইয়ের পাতে তা বিভক্ত অর্ধেক। উপভোগের বেলায় বহু দ্বারা রসের ঘটে বৃদ্ধি। এই জন্যই স্টেথেস্কোপ হাতে রোগী দেখতে যাই একা, উড়নী গায়ে বিয়ের কনে দেখতে যাই সবান্ধবে।

দিল্লীতে আমি দেখেছি অনেক, শুনেছি প্রচুর এবং জেনেছিও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সমস্তই একক। যাঁর সঙ্গে দেখলে দেখার বস্তু দর্শনীয় হয়ে ওঠে, তিনি ছিলেন অন্যত্র। তাঁকে নিয়ে দিল্লী পরিভ্রমণ সেদিন সম্ভব ছিল না। তবুও আমার চোখ দিয়েই তাঁকে দেখাব, আমার মনে এই অভিলাষ ছিল। সে কাজটা সহজ নয়।

পুরাকালে হংসদূতের দ্বারা দূর-দূরান্তরে বার্তা প্রেরণের রীতি ছিল। কিন্তু এ যুগের নলরাজেরা জানেন, বার্তাবাহী রাজহংস দময়ন্তীর উদ্যানে পৌঁছতে পারবে না, মধ্যপথেই কোন সুনিপুণ পাচকের হস্তে সুপক্ক ব্যঞ্জনে ভোজনরসিকগণের রসনাতৃপ্তির সহায়ক হবে। বর্তমানের মরালগামিনীরা মরালকে বাতিল করেছেন। তাঁরা এখন উর্দিপরা সরকারী ডাক-হরকরার উপর নির্ভর করেন। সুতরাং আমার দেখাকে আমি রূপান্তরিত করলেম পত্রে। তার সংখ্যা অনেক এবং স্ফীতি ভীতিজনক।

চিঠি জিনিষটা স্বভাবতঃই দ্বিবচনের ব্যাপার। তাকে বহু বচনের ব্যবহারে আনলে ব্যাকরণদুষ্টি ঘটে। চিঠি চাঁদনী রাতে দুটিমাত্র প্রাণীর গঙ্গা-বিহরণের ছোট্ট পানসিটি। কুসুমগঞ্জের হাটের পথে বহুজনের নদী পারাপারের জন্য পাঁচ মাল্লার খেয়া নৌকা নয়।

দিল্লীর রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নীচে আমার বিস্তীর্ণ অবকাশক্ষেত্রে যে প্রচুর পত্রশস্য জন্মলাভ করেছিল, সেগুলি একটিমাত্র গৃহিণীর ভাঁড়ারে মরাই ভরে' রইবে, এই ছিল কামনা। কোন দিন কোন কারণে সরকারী সিভিল সাপ্লাইর গুদামে সেগুলি সর্বসাধারণের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করবে, এমন আশঙ্কা ছিল না। পত্রগুলি যাঁকে লেখা, তাঁর কোমল করযুগলের মধ্যে কৈবল্য লাভ করলেই তাদের মোক্ষ। তারা যে ভবিষ্যতে কম্পোজিটারের স্থূল হস্তাবলেপনের দ্বারা সর্বাঙ্গ ছাপাখানার মসীলিপ্ত হয়ে সাহিত্যের বিচারশালায় লেখকের দুষ্কৃতির অকাট্য সাক্ষ্যরূপে দেখা দেবে, তা কল্পনাও করি নি।

মুদ্রণের দ্বারা পত্রের জাতিভ্রংশ ঘটে। যেমন সিনেমাকরণের দ্বারা উপন্যাসের। পত্রের রস লজ্জানম্র নববধূর অনুচ্চ কন্ঠে গীত সঙ্গীতের মতো, নির্জন শয়নকক্ষে একমাত্র স্বামীর কাছেই তার প্রকাশ। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে জনাকীর্ণ জলসার আসরে তাকে টেনে আনলে তারও দুর্গতি, অন্যেরও দুর্ভোগ। কারণ, বঁধূর কানে যা কলস্বর বহুর কানে তা কলরব।

অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত পত্রের অভাব নেই, যদিও সিনেমায় বেশীর ভাগ যুদ্ধ-চিত্রই যেমন প্রচ্ছন্ন প্রোপাগান্ডা, সাহিত্যের অধিকাংশ পত্র-সঙ্কলনও তেমনি ছদ্মবেশী প্রবন্ধসংগ্রহ। পত্র-সাহিত্য নামে সাহিত্যের একটা বিভাগ আছে। সাধারণতঃ দুটি কারণে তার উদ্ভব। প্রথমটা তথ্যমূলক, দ্বিতীয়টা সাহিত্যিক।

কবি বা সাহিত্যিকদের লেখা পত্রে লেখকের দু'টি বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পায়। কাব্যজীবনের বহির্দেশে প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর নিছক মানুষরূপে যে একটা সত্তা বর্তমান, এক শ্রেণীর পত্রে তারই পরিচয় থাকে। সেখানে পত্রলেখক পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী স্ত্রী বা বন্ধু প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা পরিচিত, সাহিত্য-প্রতিভার দ্বারা নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রগুলি পত্ররচয়িতার আত্মপ্রকাশের অন্যতম উপকরণ। পত্ররচনা সেখানে একটা রীতি, ইংরাজীতে যাকে বলে ফর্ম। সেখানে যাকে লেখা হয় সে গৌণ, যা লেখা হয় সেটাই মুখ্য। এই ফর্ম অবলম্বন করে সার্থক কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—রোমানফের গল্প। তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, যথা—লেটারস টু দি শেরিফ অব ব্রিস্টল। নব শিক্ষার্থিনীর জন্য সংক্ষেপে পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে; প্রমাণ—লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু এ ডটার। উপভোগ্য কবিতা রচিত হয়েছে, উদাহরণ—শিলংএর চিঠি।

প্রথম শ্রেণীর পত্র প্রকাশের কালে প্রকাশকের একটি চোখ থাকে জীবনীকারের দিকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পশ্চাতে থাকে সৃষ্টির প্রেরণা। 'ভাই ছুটি' বলে যার আরম্ভ আর ছিন্নপত্র—এ দু-এর রস যে আলাদা জাতের এবং গুরুত্ব যে পৃথক কারণে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

মুদ্রিত পত্রের আরও একটি শ্রেণী আছে। সেখানে লেখকের উদ্দেশ্যটা এতই

সুস্পষ্ট যে, তাকে কেউ পত্র বলেই জ্ঞান করে না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 'খোলা চিঠি'র গোলা বর্ষণকে পাঠকেরা কূটনৈতিক কুস্তির প্যাঁচরূপেই গণ্য করে চিঠি বলে ভুল করে না।

দিল্লীতে লেখা পত্রগুলি মূলতঃ চিঠিই ছিল। কিন্তু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের কালে সংকলয়িতা বাংলা চলচ্চিত্রের সেন্সার বোর্ডের উপযোগী অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে তার মধ্য থেকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গসমূহ, এমন কি তার ইঙ্গিত পর্যন্ত অসামান্য নিপুণতায় নিশ্চিহ্ন করেছেন। তাঁকে দোষ দিতে চাইনে। প্রত্যেক পত্রের মধ্যেই লেখক ও প্রাপকের সাংসারিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে স্নেহ, প্রীতি, রাগ, অনুরাগ প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন থাকে, সর্বসাধারণের সমক্ষে তার উদঘাটন বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে পরিণামে উভয়েরই বিব্রত বোধ করার সম্ভাবনা। তবুও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থাকারে গ্রথিত আমার পত্রগুলি কারও কাছে যদি প্রবন্ধসমষ্টি বা অন্য আর কিছু মনে হয়ে থাকে, তবে তার জন্য একমাত্র সংকলয়িতার কাঁচিকেই দায়ী করতে হয়। ডাক্তারেরা জানেন, অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আংশিক বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী।

কী কারণে পত্রাধিকারিণী চিঠিগুলিকে তাঁর নিজস্ব অন্তঃপুরের গোপনীয়তা থেকে টেনে এনে বহির্জগতে লোক-লোচনের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তা আমার জানা নেই। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে নিশ্চয়ই এর একটি বুদ্ধি-বিভ্রান্তকারী ব্যাখ্যা আছে। তাতেও আমার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয়, মেয়েদের স্বভাবের মধ্যেই একটা স্বাভাবিক প্রচারপ্রবণতা আছে।

সংসারে পুরুষের পরিচয় কীর্তিতে, সেটা স্বয়ং-প্রকাশ। নারীর গৌরব অধিকৃতির, সেটা প্রচারের অপেক্ষা রাখে। স্থায়ী আমানতে গচ্ছিত টাকার পরিমাপ প্রচুর, এই তথ্যটুকু জেনেই পুরুষ সন্তুষ্ট ; ব্যাঙ্কের পাশ-বই পকেটে নিয়ে বেড়ানো সে প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু অর্থের অস্তিত্বটাই নারীর কাছে যথেষ্ট নয়। তার প্রমাণটা যথোচিত পরিমাণে পরিস্ফুট না হলে তার তৃপ্তি নেই। তাই জড়োয়া গহনা সিন্দুকে থাকলেই মেয়েরা খুশী নয়, নিজের সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্যের বিজ্ঞপ্তি বহন করে, আপন ধনসম্ভারের প্রচারকার্যে তাদের দুর্জয় আসক্তি।

জানি, আমার পত্রগুলির প্রতি আমি অযথা মহার্ঘ্যতা আরোপ করছি, এই অভিযোগ উঠতে পারে। কিন্তু দ্রব্যের মূল্য তো শুধুমাত্র তার অন্তর্নিহিত গুণাগুণের দ্বারা নির্ণীত হয় না। এক খণ্ড ব্যবহৃত ডাকটিকিটের দাম আমার কাছে কানাকড়িও নয়। অথচ ডাকটিকিট সঞ্চয় যাঁর বাতিক, তিনি তার জন্য প্রয়োজন হলে হাজার টাকা দিতেও কার্পণ্য করেন না। সুতরাং সেদিনের পত্রগুলি অন্ততঃ পত্রাধিকারিণীর কাছে একেবারে মূল্যহীন ছিল না, এ বিশ্বাস যদি পত্রলেখকের মনে কখনও দেখা দিয়ে থাকে, তবে আশা করি, তা অবিনয়ের অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

কিন্তু মূল্য এক কথা, প্রচার আর। পত্র-প্রকাশের সঙ্গে আত্মপ্রকাশে আমার প্রবল আপত্তি ছিল। প্রশ্ন করলে, নিশ্চিতরূপে হেতু নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, মানুষের সকল কাজের পিছনেই একাধিক হেতুর সমষ্টি থাকে, শুধু একটিমাত্র হেতু থাকে না, যদিও নিজের অভিরুচি, সুযোগ ও সুবিধানুযায়ী ঐ বহুবিধ কারণের

মধ্যে বিশেষ একটিকেই আমরা একমাত্র কারণ বলে প্রমাণ করতে চাই। যে-সকল কারণে আত্মগোপনের প্রয়াস করেছিলাম, তার প্রধানতম বর্তমানে অর্থহীন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অন্য অনেক পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা, অন্তরায় ও অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে তারও অবসান ঘটেছে। সবিস্তারে আজ তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষে শাসন ব্যবস্থার স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় প্রবল প্রতিহিংসাপরায়ণতার সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁদের পক্ষে তার পরিপূর্ণ অর্থবোধ নিশ্চয়ই কঠিন নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল নিছক ভয়সঞ্জাত। মুদ্রণ সম্পর্কে আমার মনে একটা সাংঘাতিক শংকা আছে, স্বয়ংবর-সভার রাজকন্যার মতো একমাত্র যোগ্যতমকেই ছাপার অক্ষর সসম্মানে বাসরঘরের ভিতর নিয়ে যায়, নিষ্করুণ নির্মমতায় বাকী আর সবাইকে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতরূপে দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে রাখে। সেই ব্যর্থকাম উপহসিতদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে আমার উৎসাহ ছিল না।

তর্কবাগীশদের ঔৎসুক্য ঐখানেই নিবৃত্ত হয় না। তাঁরা ঘাড় নেড়ে সংশয়ের স্বরে বলেন,—তা যেন হলো ; কিন্তু ঐ মৃত্যু-সংবাদ রটনাটা কেন ?

জবাবে আমি বলি, সেটা রটনা নয় ; ঘটনা। সেদিনের পত্রলেখকের যে নিঃশেষে মৃত্যু ঘটেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। দেহটা বেঁচে থাকার নিদর্শন নয়, মিশরের মমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর দৈহিক মৃত্যুর পূর্বেই যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে, ইতিহাসে তারও নজীর আছে। রামজে ম্যাক্‌ডোন্যালডের সত্যিকার মৃত্যু কি তাঁর দেহাবসানের অনেক আগেই ঘটেনি ?

দিল্লীতে নবাগত যাযাবরকে অদ্যকার লেখকের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। ঠিক যেমন বিবাহোত্তর পত্নীর মধ্যে পূর্বরাগের প্রিয়াকে দেখতে চাওয়া বিড়ম্বনা। সেদিনকার রচনার সঙ্গে আজকের লেখা যদি কোন পাঠক তুলনা করেন, তবে তিনিই আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করবেন।

অনিচ্ছাকৃত শত্রুতার স্বাদ অবশ্য একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়। মিত্রজনের মনোযোগও যে কোন কোন ক্ষেত্রে কতখানি অপ্রীতিকর হয়ে উঠতে পারে, তা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। আত্মবিলুপ্তির জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেম। তাতে লাভ হয় নি। পরিচয় গোপন রয়নি। ফলে, চায়ের নিমন্ত্রণে গেলে যথারীতি পরিচয় আদানপ্রদানের পরে অকস্মাৎ প্রশ্ন শুনতে হয়,—"ওঃ, আপনিই তো সেই—?" আত্মীয়-বাড়িতে বিবাহ-সভায় সদ্যপরিচিতা অতিথিরা বইর নায়ক-নায়িকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলেন, "আচ্ছা সত্যি কি—" বন্ধুদের আড্ডায় উৎসাহী সাহিত্য-সমালোচকেরা পুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের অলংকারশাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা দাবী করেন।

বন্ধুদের উদ্বেগ এর চাইতেও মারাত্মক। তাঁরা শুধু প্রশংসা করেই নিরস্ত নন। উপদেশদানেও সমান উৎসাহী। পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত ও অপরিচিতের দল যখন-তখন বাড়ি বয়ে এসে অযাচিত পরামর্শ দেন। কেউ বলেন, এবার একখানা বড় উপন্যাস লিখুন। কেউ বা বলেন, উপন্যাস নয়,—ছোট গল্প। তাতেই আমার হাত খুলবে। আর এক দলের বিশ্বাস, প্রবন্ধ রচনাই আমার ক্ষেত্র। অধিকতর হিতাকাঙ্ক্ষীর দল বিষয়-নির্বাচনের ক্লেশ পর্যন্ত নিজেরাই স্বীকার করেন। তাঁরা কেউ বলেন

দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে, কেউ বা বলেন, দিল্লী আর নয়, এবার কলকাতার উপরে একটা বই। হু হু করে কাটবে। সংসারে ডাক্তারের সংখ্যা অগণিত, সে কথা আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে উপলব্ধি করেছি। মাথা ধরেছে—একথা বলা মাত্র প্রত্যেক পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকেই একটা ওষুধের বা প্রক্রিয়ার নির্দেশ কে না পেয়েছি? সম্প্রতি আবিষ্কার করলেম, এ জগতে সাহিত্যরসিকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

শুধু উপদেশেই শেষ নয়। অনুরোধ এবং অনুযোগও আছে। সদ্যঃপ্রসূত মাসিকপত্রের তরুণ সম্পাদক আসেন লেখার বায়না নিয়ে। রিক্তহস্তে ফিরে যাওয়ার কালে মনে মনে গাল দিয়ে যান, লোকটা পয়লা নম্বরের স্নব। পুরাতান পুস্তক-ব্যবসায়ী আসেন নতুন বইর দাবী নিয়ে। বিফল-মনোরথ হয়ে সন্দেহ করেন, নিশ্চয়ই অপর কেউ বেশী পারসেন্ট কবুল করেছে। নূতন প্রকাশক অনুরূপ ব্যর্থতায় বিরক্তির সঙ্গে সিদ্ধান্ত করেন, এ লেখকের অর্থগৃধ্নুতা মেটানো তাঁর শক্তির বাইরে।

অর্থে আসক্তি নেই যোগী-ঋষির। আমি তাঁদের দলে নই। কিন্তু অর্থের কারণে গ্রন্থরচনা করেন অর্থ-বই লেখকেরা। আমি সে গোষ্ঠীরও বাইরে। নোট লেখা আমার কর্ম নয়। আসল কথা এই যে, আমার লেখার পশ্চাতে কোন প্রেরণা নেই।

আমি সাহিত্যিক নই। কল্পনাশক্তির যে-প্রাচুর্য কথাসাহিত্যিকের সর্বপ্রধান অবলম্বন, আমার মধ্যে তার বাষ্পমাত্র নেই। নিজেকে অসাহিত্যিক প্রমাণের আগ্রহে শরৎচন্দ্র বলেছেন, আকাশের পানে তাকিয়ে তাঁর চোখে ব্যথা ধরে গেলেও, কারও নিবিড় কুন্তলদাম দূরে থাক, একগাছা চুলের আভাস পর্যন্ত কখনও তাঁর চোখে পড়ে নি। শরৎচন্দ্রের খেয়াল হয়নি যে, ঐ বিনয়োক্তি লিপিবদ্ধ করার কালে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে এটা নিতান্তই স্বীকারোক্তি। প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের পানে তাকালে কারো কমল-আননের কথা আমার মনে জাগে না। পদ্মমধুর কথা স্মরণ করে প্রলুব্ধ রসনা জলাসক্ত হ'য়ে ওঠে।

আমি সাংবাদিক। সাংবাদিকেরা চেষ্টা করলে সাহিত্যসমালোচক বা প্রবন্ধকার হতে পারেন, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর কথাসাহিত্যিক হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। উইনস্টন চার্চিলের গদ্য রচনার স্টাইল যতই মনোহর হোক না কেন, গ্রেট এক্সপেক্টেশান্স তাঁর কাছে দুরাশা, গ্রেট কনটেম্পরারীস নিয়েই তাঁর কারবার। সংবাদ-সাহিত্য নামক একটা বস্তু, সম্প্রতি এদেশেও দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যের পংক্তিতে তার আসন আজও পাকা হয়নি। সেটা বড় জোর,—আর্ট ইন্ ইন্ডাস্ট্রী।

এর কারণ সুস্পষ্ট। রস-সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যা ঘটেছে, তার চাইতে যা ঘটতে পারে তাই নিয়ে তার কারবার। সে-সাহিত্যের জন্মস্থান সাহিত্যিকের মনে। সংবাদ-সাহিত্য একান্তভাবে বাস্তব-সর্বস্ব। যা ঘটেনি তা তার এলাকার বাইরে। সে-সাহিত্যের সূচনা হয় সাংবাদিকের দেখায়। কথা-সাহিত্য র‍্যাফেলের চিত্র। সংবাদ-সাহিত্য সেসিল বিটনের ফটোগ্রাফ। সাহিত্যিক রচনা করেন আপন মনের প্রকাশব্যাকুলতায়। কেউ পড়বে, কি, পড়বে না, সে-চিন্তা

তাঁর পক্ষে অবান্তর। সাংবাদিক রিপোর্ট লেখেন জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে, তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে সহস্র সহস্র পাঠক।

আমার চোখের সামনেও একটি ব্যক্তি আছেন। তাঁর নাম বলা নিষেধ। দিল্লীর পত্রগুলি তাঁকেই লিখিত। আজ যা লিখছি, তাও তাঁরই জন্যে। আমার কাছে তিনি অধিক প্রত্যাশা করেন না। তিনি জানেন, আমি দ্রষ্টা নই, দর্শক। আমি গল্প বানাতে পারিনে, গল্প শোনাতে পারি। বলা বাহুল্য, আমার লেখা তাঁর ভালোই লাগে। প্রশংসা যা করেন, তাতে আর যাই থাক, অপ্রমত্ত সমালোচকের নিরপেক্ষ বিচারশক্তির প্রমাণ থাকে না। নিশ্চিন্ত জানি, তিনি আমার জীবনী রচনার ভার নিলে আক্ষেপের কারণ ঘটাবে না।

অবশ্য মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কোনো লোকই সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয়। মৌলিক হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে মানুষ মাত্রেই এক, অনুভূতির যোগসূত্রে অল্পবিস্তর একের সঙ্গে বহুর সাদৃশ্য আছে। সুতরাং হয় তো একজনের কাছে যা রুচিকর, পাঁচ জনের কাছে তা একেবারে বিস্বাদ নয়। বিচিত্র নয় যে, আমার লেখাও সেই একটি লোকের সঙ্গে অন্য আরও দু'-এক জন পাঠকের ভালো লাগবে। অবশ্য ভালো লাগার মাত্রা নিয়ে তারতম্য ঘটা অস্বাভাবিক নয়। মায়ের স্নেহে আর মাসির আদরে তফাৎ তো অবধারিত।

লেখার ইতিহাসটা কিন্তু নিতান্তই সাধারণ। বাংলাদেশের প্রত্যেক পুরুষকেই কোন এক বিশেষ বয়সে ঘটকের আক্রমণ সইতে হয়। তাদের কেমন করে ঠেকাতে হয়, অভ্যাসের দ্বারা সে বিদ্যা আমার আয়ত্ত। শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ এবং অনুরাগী পাঠকদের কি করে রুখতে হয়, সে কৌশল আমার জানা নেই। একমাত্র তাঁদের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণায়ই এক দিন এক বন্ধুর সহায়তায় আমি এই বিরাট নগরীর প্রান্তভাগে এক ক্লাবে যোগদান করলেম।

ক্লাব বস্তুটা এদেশে প্রাচীন বানপ্রস্থের আধুনিক এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তফাৎ শুধু এই যে, এর জন্য পঞ্চাশোর্ধ্ব অবধি অপেক্ষা করতে হয় না। ক্লান্ত, মর্মাহত, তৃপ্তিহীন, লক্ষ্যহীন অভিজাত নরনারীর এটা আত্মবিস্মৃতির অবলম্বন ইংরেজীতে যাকে বলে এস্কেপ। তাই বেশীর ভাগ ক্লাবেই বিপত্নীক অফিসার, স্বামীপরিত্যক্তা রমণী, বিগতযৌবনা কুমারী, রূপহীনা তরুণী এবং অবিবাহিত প্রৌঢ় ব্যক্তিরা আসর জাঁকান। এদের জীবনে সুষমা নেই, অথচ আসক্তি আছে। তাই জীবনকে অপচয় করে এরা জীবনকে ভরাতে চেষ্টা করেন। রেসকোর্সে পর-পর উইন-এ হেরে -যাওয়া জুয়াড়ী যেমন সমস্ত ক্ষতি একবারে পূরণের আশায় প্লেসে দ্বিগুণ বাজী রাখে।

এই ক্লাবটিতেও সে-ধরণের নরনারীর অভাব ছিল না। আর ছিল বিলাত-প্রত্যাগত তরুণ ব্যারিস্টার, নতুন বিত্তশালী ব্যবসায়ী, সদ্য আলোকপ্রাপ্ত মারোয়াড়ী-নন্দন ইত্যাদি। এই ক্লাবেই আমার পরিচয় ঘটলো মিসেস মলী সেনের সঙ্গে।

প্রাণী-জগতের মতো নাম-জগতেও যে বিবর্তন আছে, মলী সেন তার জীবন্ত সাক্ষ্য। তাঁর মাতামহ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবিরাজ। ভৈষজ্যশাস্ত্রে তাঁর যেমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, সংস্কৃত কাব্যেও তেমনি প্রগাঢ় অনুরাগ। দৌহিত্রীর জন্মমাত্রই মাতামহ নামকরণ করলেন, স্রগ্ধামালিনী। কিন্তু এত দীর্ঘ নাম বাণভট্টের কাদম্বরীতে যদি বা শোভা পায়, বিংশ শতাব্দীর গৃহস্থ পরিবারে চলে না। অচিরেই সকলের

অলক্ষিতে নামের প্রথমার্ধ বিস্মৃতির গর্ভে অন্তর্হিত হলো। রইলো শুধু বনমালিনী। সেটা সম্বোধনে সহজ এবং শ্রবণেও মধুর।

মেয়ের জ্যাঠামশায় অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলেজের ছাত্র ছিলেন। কার্লাইলের লেখা এখনও অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর পরম ভক্ত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যৌবনে উপনিষদের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন। দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁর শুচিবাই প্রায় হিন্দু বিধবার আচার-পরায়ণতার কাছাকাছি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ ছাড়া অন্য কোন বাংলা বই অন্দরমহলে দেখলে তিনি আতঙ্কিত হতেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর নামে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের গন্ধ আবিষ্কার করে আঁতকে উঠলেন। নাম পালটে করলেন মালিনা।

পরবর্তী সংশোধনের ভার কন্যা স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফিজ দাখিল করার কালে ফরমে ইংরেজী ধরনে নাম লিখলেন—মলোনী। উত্তরকালে বন্ধু ও ভক্তজনের অন্তরঙ্গ সম্ভাষণে তার সর্বশেষ রূপান্তর ঘটিয়ে সোসাইটিতে আবির্ভূতা হলেন মিসেস মলী সেন। এখানে বলে দেওয়া আবশ্যক যে, বাংলা সাহিত্য-জগতে শেষের কবিতার অমিত রে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি।

মলী সেন হচ্ছেন সেই জাতীয় মেয়ে—না, থাক, সে কাহিনী বর্ণনা না করাই ভালো। তাঁর জীবন-আলেখ্য তাঁর আপন উক্তি, আচরণ ও কর্মের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হোক্ জনসমক্ষে, বহু-চরিত্র-সম্বলিত ঘটনা-বহুল সুদীর্ঘ ছায়াচিত্রের মতো। আমার জবানিতে তার ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। সবাক চিত্রের তো কমেন্টারী প্রয়োজন হয় না।

অনাবৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত ও বন্যা নিতান্তই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। এদের উপদ্রব আকস্মিক, ফলাফল অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আগমন অনিশ্চিত নয় বাংলা দেশে। দোল, দুর্গোৎসবের ন্যায় এগুলিও বাৎসরিক। কখনও বাঁকুড়ায়, কখনও বাখরগঞ্জে, কখনও বা তিস্তা দামোদরে। দৈনিক সংবাদপত্রের সচিত্র বিবরণীর মধ্য দিয়ে তাদের বহু ধ্বংসসাধনের সকরুণ কাহিনী দেশ দেশান্তরে পরিচিত।

দৈব দুর্বিপাকে ক্ষতি ঘটে বহুর। সে-ক্ষতি অতি বিস্তৃত। বর্ষার প্লাবনে অকস্মাৎ জলমগ্ন হয় গ্রামের পর গ্রাম, বিনষ্ট হয় স্বল্পবিত্ত জনগণের সমস্ত সম্বল, শস্যনাশে সর্বস্বান্ত হয় ঋণভারজর্জরিত দরিদ্র কৃষককুল। কারো ধন যায়। কারো বা জন। শোকভারাক্রান্ত অসহায় নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠের কাতর অভিযোগ ও ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস নির্মম ভাগ্যদেবতার রুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে চরম নিষ্ফলতায় পুঞ্জীভূত হতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের শেষে মাস, বৎসরান্তে বৎসর। সেই সর্বব্যাপী দুঃখের তিমিরে শুধু স্বল্প সংখ্যক সেবা-ব্রতী আপন পরিমিত শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী আর্তত্রাণের আয়োজন দ্বারা কোনক্রমে জ্বালিয়ে রাখেন মানব করুণার ক্ষীণ দীপশিখা, মর্ত্যলোকে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

কিন্তু সুযোগও আসে কারো কারো। বন্যার্তদের দুঃখে সুচতুর দেশ-হিতৈষীরা সভা সমিতিতে সঘন করতালির মধ্যে প্রচুর অশ্রুপাত ও প্রচুরতর বাগবিস্তারের দ্বারা খবরের কাগজে নাম ও এসেম্বলীতে আসন পাকা করার ব্যবস্থা করেন। চলমান ট্রামে বাসে পেশাদার চাঁদা-প্রার্থীর দল যাত্রীদের সামনে চাঁদার বাক্স এগিয়ে ধরে বারম্বার এবং লাল শালুর কাপড়ে সাদা অক্ষরে ঘোষিত একাধিক সংকটত্রাণ সমিতির সদস্যবৃন্দ হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে ডি. এল. রায়ের একটি অতিপরিচিত সুরে গাঁথা সংগীত সহযোগে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহে নির্গত হয়।

দুর্গতেরা, অর্থাৎ তাদের নামটা, আরও একটা বিশেষ কাজে লাগে। অভিজাত সম্প্রদায়ের সৌখীন নাট্যাভিনয়ের সেটা বিশেষ সহায়ক। ধনিগৃহের অফুরন্ত অবসরক্লান্ত সন্তানবিহীনা প্রৌঢ়া রমণী বা আলোকপ্রাপ্তা নব্য তরুণীদের উৎসাহে অধুনা অধিকাংশ নাচের আসর, ভ্যারাইটি শো বা অভিনয়-আয়োজন হয়। কলেজে প্রক্সি দেওয়া তরুণ ছাত্র, ব্রীফহীন ব্যারিস্টার, পিতৃবিয়োগে হঠাৎ হাতে টাকা-পাওয়া জমিদার-নন্দন ও নারীসান্নিধ্য-ব্যাকুল আর্ট-ভক্ত বেকার যুবকদের দল তার কর্মকর্তা। গেরুয়া বস্ত্রের আবরণে ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় জনহিতৈষণার তিলক ললাটে নিয়ে এদের এই নাট্যপ্রচেষ্টাগুলি ব্যক্তিগত প্রমোদানুষ্ঠানের অকিঞ্চিৎকরতা-মুক্ত হয়ে সৎকার্যের সনন্দ লাভ করে। উদ্যোক্তারা তাই দুর্ভিক্ষ বা বন্যার শরণ নেন। অভাবে কোন বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান, মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষা এমন কি হাতের কাছে সন্তোষজনক আর কিছুই না পাওয়া গেলে সর্বশেষে কন্যাদায়গ্রস্তের উপকারার্থেও অভিনয় এবং টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। বেশীর ভাগ মন্ত্রীদের দেশসেবার মতো এ-সকল সাহায্য-রজনীর সাহায্যটাও লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে সম্প্রতি মিসেস মলী সেন যে নাটকাভিনয়ের প্রয়াস করেছেন আশা করি তার সার্থকতা নিয়ে

অনর্থক গবেষণায় কেউ সময় নষ্ট করবেন না।

অভিনয়টা নিউ এম্পায়ারে হলেই ঠিক মানাত। সাধারণতঃ তাই হয়। কিন্তু অধুনা সিনেমার চাপে একমাত্র সকালবেলা ছাড়া সেখানে হল খালি পাওয়ার জো নেই। সময়টা এ ধরনের অনুষ্ঠানের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। সপ্তাহে একমাত্র রবিবার ছাড়া সে সময়ে অবকাশ আছে কার? আর রবিবারেই বা সকালে স্কুল-কলেজের ছাত্র ও কিছু সংখ্যক আপিস আদালতের কেরানীবাবু ব্যতীত অভিনয় দেখতে আসবে কে? তাদের মধ্যে এক টাকা দামের উপরে টিকেট কিনবে ক'জন? তার চাইতেও বড় কথা,—সোসাইটির সেরা নর-নারীরাই যদি না দেখল, তবে অভিনয় করে সুখ কোথায়? মলী সেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "সকালবেলা থিয়েটার করতে পারব না। সে যেন রাত সাতটায় চায়ের নিমন্ত্রণ কিম্বা জানুয়ারী মাসে ফুটবল ম্যাচ। রিডিক্লাস।"

এখানে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, মে-জুন মাসে ফুটবলের মাঠে পশ্চিম দিকের মেম্বারস্ গ্যালারীতে সাদা ফ্রেমের সান্ গ্লাস চোখে আঁটা রঙিন ম্যাকিন্টস হাতে মলী সেনকে প্রত্যহই দেখতে পাওয়া যায়, যদিও সেখানে তার এই নিয়মিত উপস্থিতি কতটা নিছক ক্রীড়ানুরাগপ্রণোদিত আর কতটাই বা ফ্যাশানের তাগিদে তা নিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের মধ্যেও মতদ্বৈধ আছে। এমন কি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি আড়ালে এমনও বলে থাকেন, "ও তো দেখতে যায় না, দেখাতে যায়।"

অসম্ভব নয়। আপনাকে উদ্ঘাটিত করার প্রেরণা আছে বিশ্ব-প্রকৃতিতে আছে মানব-চরিত্রে। তাই বীজ আপনাকে অঙ্কুরিত করে বৃক্ষে, তরুলতা বিকশিত হয় ফুলে-ফলে, মানুষ পরিব্যক্ত হয় স্বীয় আচার-আচরণে। নিজেকে ব্যক্ত করার এই স্বাভাবিক ব্যাকুলতা যখন সহজ ও সুসমঞ্জস হয় তখন তাকে বলি আত্মপ্রকাশ। আতিশয্যের দ্বারা সে যখন কলুষিত হয়, তখন তাকে বলা হয় আত্মপ্রচার। বিকৃত বলেই সেটা ধিক্কৃত।

ইংরেজ কবি বলেছেন, এ জগতটা নাট্যশালা; মানুষ মাত্রই সেখানে জীবননাট্যের কুশীলব। মলী সেন বিলাতী কনভেন্টের ছাত্রী ছিলেন, সিনিয়র কেম্ব্রিজের বেড়া ডিঙিয়ে সেখানে কলেজে প্রবেশের পথ মেলে। তাই যে বয়সে বাঙ্গালী ছেলেরা নেসফিল্ডের ব্যাকরণ মুখস্থ করে, সে বয়সে তিনি ইংরেজী নাটক পড়েছেন। তাঁর কাছে ঐ কাব্যোক্তি অবিদিত নয়।

কিন্তু তাতে মন ওঠে না। সুবৃহৎ পৃথিবীর বিশাল নাট্যমঞ্চে কোটি কোটি অভিনেতা অভিনেত্রীর ক্লান্তিবিহীন অভিনয়-পর্বের মধ্যে একটি মাত্র মলী সেনের পার্ট কতটুকু? নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চরাচর বিস্তৃত সেটের মধ্যে সে তো শুধু একজন 'এক্সট্রা'; সে তো 'স্টার' নয়। জনতার কোন ভূমিকা নেই, তাদের অভিনয় নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর অঙ্গীভূত। কোথায় যে তার প্রস্তাবনা আর কোনখানেই বা যবনিকা পতন তা সকলের অলক্ষিত। নায়িকার জন্য চাই নির্দিষ্ট নাটক—তার পরিধি পরিমিত এবং আরম্ভ ও সমাপ্তি দুই-ই সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ফুটবল সম্পর্কে যাই হোক না কেন, নাটকে দেখাবার প্রশ্নটাই প্রধান। সে-কথা মলী সেনের জানা আছে। তার জন্য আবশ্যক যথোচিত মঞ্চ ও প্রেক্ষাগার।

উত্তর কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় ভাড়া পাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু তার কৌলীন্য

নেই। সেখানে কাস্টমস্ বা পুলিসের ক্লাবের সদস্যদের মেবার পতন বা বঙ্গে বর্গী অভিনয় চলে, যাতে মিহি সুরের পুরুষেরা নকল চুল মাথায় চাপিয়ে শাহজাদী সাজে। সেখানে অভিজাতদের অভিনয় সম্ভব নয়। স্থান-মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে তো? গুলু ওস্তাগরের গলিতে কি বাড়ি তুলবেন স্যার ধীরেন মুখার্জী? মির্জাপুরের হোটেলে হবে চীফ মিনিস্টারের ডিনার?

তার চাইতে বাড়িতে স্টেজ বেঁধে অভিনয় করা বরং ভালো। তাতে সাহেবপাড়ার থিয়েটার হলের ডিগনিটি না থাকলেও, ডিস্টিংশান আছে। দামী জর্জেটের অভাবে মোটা খদ্দরের শাড়ীর মতো। অন্য লোকের কথা কী, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একাধিক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

মলী সেনদের বাড়িটা অতিশয় প্রাচীন। চক মিলানো গড়ন। মাঝখানে বৃহৎ উঁচু দালান। চণ্ডীমণ্ডপ। সেকালে দুর্গাপুজো হতো মহাসমারোহে। সামনে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। সেখানে বসে সমবেত জনতা ভক্তিভরে শ্রবণ করত মহাষ্টমীর দিনে পুজামণ্ডপে কুলপুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডী পাঠ। প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমার রাত্রে যাত্রাভিনয় হতো। রাই উন্মাদিনী পালায় অধিকারী অঘোর সামন্ত নিজে আসরে বসে বৃন্দাদূতীকে ঝাঁপ তালে গানের খেই ধরিয়ে দিতেন—"গোকুল ত্যজি শ্যাম রায়, তুমি এলে মথুরায়, শ্রীরাধিকার প্রাণ যায়, তোমার বিহনে এ-এ-এ।" প্রাঙ্গণের তিন দিকে ঘেরা দালানের দোতালার বারান্দায় চিকের আড়ালে বসে মহিলারা বিরহিণী রাধার দুখে ঘন ঘন চোখ মুছতেন। সে দীর্ঘদিন আগেকার কথা।

মলী সেনের শ্বশুর বৈকুণ্ঠনাথের কুখ্যাতি ছিল অর্থগৃধ্নুতার। পাড়ার ফুটবলের ক্লাবে চাঁদাবঞ্চিত ক্রুদ্ধ যুবকের দল তাঁর নামের ঈষৎ পরিবর্তন করে নব নামকরণ করেছিল ব্যয়কুণ্ঠ সেন। তিনি প্রথমে পুজো-পার্বণের রাজসিক অংশ কাট-ছাঁট করে নেহাৎ অবর্জনীয় শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটুকু বজায় রাখলেন। যাত্রা হলো বন্ধ, কথকতা গেল উঠে, কাঙালী-বিদায় পেল লোপ।

পুজারও আয়ু বেশী দিন রইল না। সে-বার নবমীর দিনে বলীর পশু আটকে গেল খড়্গে। শ্রীধর মাস্টার এ বাড়িতে খাঁড়া ধরছেন এই বাইশ বছর; এক কোপে মোষ নামিয়েছেন কতবার। তাঁর হাতে এমন দুর্ঘটনা এই প্রথম। তিনি হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে, কপালের ঘাম মুছে, প্রতিমার পানে হাত জোড় করে বললেন, "মা করুণাময়ী, রোষ করিসনে। দেখিস, কর্তার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। ভালোয় ভালোয় বছর পার হোক, আসছে বছর জোড়া মোষ মানত রইল তোর পায়ে।"

হায়, একসঙ্গে একাধিক মহিষের রুধিরপানের এমন লোভনীয় সম্ভাবনার প্রতিও মায়ের কিছুমাত্র আসক্তি দেখা গেল না। করুণাময়ীর করুণা রইল সম্পূর্ণই অপ্রকাশ। মাস খানেকের মধ্যে টাইফয়েডের ব্যাপক আক্রমণে মারা গেল পর পর বৈকুণ্ঠের বড় দুই ছেলে। একুশ দিন যমে ডাক্তারে টানাটানির পর কোন মতে বেঁচে গেল অবশিষ্ট পুত্র শিবনাথ,—পটলডাঙ্গার পুরাতন সেন পরিবারের একমাত্র বংশধর। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সঙ্গে বলিবিভ্রাটে রুষ্টা ভবানীর প্রকৃত সম্পর্ক কতখানি, সে কথা তিনিই জানেন। কিন্তু শোকে মুহ্যমান বৈকুণ্ঠনাথ রাগ করে বললেন, "এ বাড়িতে আর ভগবতীর পাট নেই, এবার থেকে পুজো বন্ধ।"

তার পর থেকে গৃহে আর পাতা হয়নি দেবীর আসন, স্থাপনা হয়নি অর্চনার

ঘট। পূজার দালান ব্যবহৃত হয়েছে বৈকুণ্ঠের ব্যবসায়ের গুদামঘর হিসাবে। পড়তি বাজারে মাল কিনে তিনি সেখানে মজুদ করেছেন উঠ্‌তি বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এক পাশে জড়ো-করা জীর্ণ তক্তাপোশ, বাণ্ডিল বাঁধা পুরোনো আমলে বৃহৎ ভোজের দিনে ব্যবহৃত কুশাসনের স্তূপ, ডালা-ভাঙ্গা টীনের বাক্স, দেয়ালে কলি ফেরাবার পাটের মোটা তুলিসমেত চুণের কেনেস্তারা এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য বহু পরিত্যক্ত অব্যবহার্য উপকরণ।

সে-সমস্ত দূর করে আজ ক'দিন ধরে থিয়েটারের স্টেজ তৈরী হচ্ছে। ঠেলাগাড়ী বোঝাই আসছে শাল কাঠের তক্তা, বস্তা বোঝাই রঙ্গিন কাপড়, ইলেকট্রিকের তার, বিভিন্ন বর্ণের আলো ও নানাবিধ সাজ-সরঞ্জাম। হাতুড়ি পেরেকের ঠকাঠক্ শব্দে দালানের কার্নিশে অতি পুরাতন বাসিন্দা মালিকহীন পারাবতের দল সচকিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত চিত্তে ইতস্ততঃ পলায়নরত।

যাঁর উপরে রঙ্গমঞ্চ তৈরীর ভার তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন, এ বাড়ির সদর দালানটা স্টেজের পক্ষে খুবই উপযোগী। মনে হয় যিনি বাড়ি তুলেছিলেন তিনি যেন এই অভিনয়ের কথা ভেবেই এমন উঁচু মণ্ডপ ও সামনে প্রেক্ষাগারের উপযোগী প্রাঙ্গণ পরিকল্পনা করেছিলেন।

শুনে মলী সেন খুশী হলেন। সেকেলে ধরনের এই অতি পুরাতন কক্ষগুলিও যে কোনো দিন কোনো উপলক্ষ্যে কাজে লাগতে পারে একথা এই প্রথম তাঁর মনে হলো!

এ বাড়িটার প্রতি মলী সেনের তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। পনের বৎসর পূর্বে বৈশাখের এক উৎসব মুখরিত সন্ধ্যায় বধূবেশে তিনি এই গৃহে প্রথম পদার্পণ করেন। প্রচলিত পঞ্জিকার শুভদিন-নির্ঘণ্টের তালিকা অনুসারে সে-দিনটা অবশ্যই মঙ্গলদায়ক ছিল। কিন্তু পাঁজির নিদান ও ভাগ্যের বিধান যে অনেক ক্ষেত্রেই হাতে হাত দিয়ে চলে না সদ্যবিবাহিত দম্পতির পরবর্তী জীবনে তারই দুঃখজনক প্রমাণ রইল। সে কাহিনী যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে আজ তার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্য স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথেষ্ট নয়। সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভালো। বরং বাড়ির প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক।

মলী সেনের বিয়ের বছর পাঁচেক পরে এক ক্রিসমাসের রাত্রিতে ফারপোর ড্যান্স তাঁকে বাড়ি রেখে আসতে যাচ্ছিলেন সুধাংশু। ডক্টর সুধাংশু মিটার। তিনি চিকিৎসকই বটেন, তবে দেহের নয়, দাঁতের। শিবনাথের অনুজ। অতি দূর সম্পর্কীয়। আত্মীয়তায় মলী সেনের দেবর। হৃদ্যতায় কী তা এক কথায় প্রকাশ করা কঠিন। ইংরেজীতে ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড বলে একটা কথা আছে। তার বাংলা তর্জমা ঠিক জানিনে। জানলে ব্যাখ্যা করা সহজ হতো। গাড়ীতে উঠে সুধাংশু বললো, "বউদি তোমাদের এই মান্ধাতার আমলের বালাখানাটা ছাড়বে কবে?" ঠিক বুঝতে না পেরে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের কথা বলছ?"

"আর কিসের? তোমাদের এই পটলডাঙ্গার রাজমহলটির। আজকের দিনেও যে কোন ডিসেন্ট রুচির ভদ্রমহিলা এই ঘিঞ্জী পুরানো নোংরা গলির মধ্যে বাস করতে পারে এ আমার ধারণায়ই আসে না। ভাড়াটে বাড়িতে থাকে এমন সাধারণ চাকরে, উকীল, প্রফেসারের স্ত্রীরাও তো আজকাল উত্তর কলকাতায় থাকতে চায় না। চৌরঙ্গী পাড়ায় থাকা সবার সাধ্য নয়, তবুও তারা অন্ততঃ লেক রোড কিম্বা সাদার্ন

এভেনিউতে বাড়ি খোঁজে।"

মলী সেন ক্ষীণ স্বরে বললেন, "পুরানো আমলের বাড়ি—" সুধাংশু বাধা দিয়ে বললো, "দোহাই তোমার, বউদি, ওটাকে বাড়ি বলো না। সিন্দুক বলতে চাও বলো, এমন কি গৌরবে দুর্গ বললেও আপত্তি করব না। কিন্তু বাড়ি—কখনই নয়, নেভার।"

এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। মলী সেন নিজে কতদিন সদ্যপরিচিত বন্ধু-বান্ধবকে ঠিকানা দিতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছেন। লাউডন স্ট্রীট, মার্লিন পার্কের ড্রয়িং রুমে বসে রামধন মিস্ত্রী লেনের নাম উচ্চারণ করতে হলে স্বভাবতঃই লজ্জায় অধোবদন হতে হয়।

"তোমার কথা সত্যি। আমি নিজেও যে এই দ্বাপর যুগের বাড়িটাতে একেবারে আনন্দে গদ গদ হয়ে আছি, তা ভেবো না। কিন্তু সাহেবী পাড়ায় বাড়ি পাচ্ছি কী করে?" বললেন মলী সেন।

"অন্য আর দশজনে যেমন করে পায়। হয় ভাড়ায়, নয় কিনে। এ দুটোর একটাও না হলে তৃতীয় পন্থা আছে, সেটা সব চেয়ে ভালো—নিজেরা তৈরী করে।" জবাব দিল সুধাংশু।

"বাড়ি তৈরী করা কি চারটিখানি কথা? তার কত ঝামেলা।"

"টাকা ঝম ঝমালে ঝামেলা থাকে না। শিবুদা একবার মুখের কথাটি বের করুন দেখি, সাতদিনে তোমাদের বাড়ির জায়গা কিনে সাত মাসে বাড়ি তুলিয়ে দিতে পারি কিনা দেখো।"

শিবুদার অনুমতি সময়সাপেক্ষ। দেবর আর ভ্রাতৃজায়া মিলে পরামর্শ করলেন দিন দুই, গাড়ি চেপে দালালের মারফতে এখানে ওখানে জায়গা দেখলেন দিন দশেক।

এখন চৌরঙ্গীর আর সেই পুরাতন আভিজাত্য নেই। পাট কোম্পানীর সাহেব, বিলাতী ডিগ্রীওয়ালা স্ত্রীরোগের ডাক্তার ও রেডিওলজিস্টরা সে অঞ্চলে ফ্ল্যাট নিয়ে তার কুলীনত্ব অনেকখানি ঘুচিয়েছে। ময়রা স্ট্রীট বা উড স্ট্রীট এখন আর ফ্যাশান নয়। এখানকার খাঁটি অভিজাত পল্লী—আলিপুর।

পোর্টল্যান্ড পার্কে জমি পছন্দ হলো মলী সেনের। ব্যালার্ডি টমসন-ম্যাথুসকে দিয়ে প্ল্যান করানো হলো বাড়ির। সর্বাধুনিক এমেরিকান রীতির স্ট্রীমলাইনড ডিজাইন। স্পেন্সলার থেকে আসবে বাড়ির লিফট্, ফিলিপস্ থেকে ফ্লুরেসেন্ট বাতি এবং স্যাঙ্কস্ থেকে স্যানিটারী ফিটিংস। বার্ডস্ করবে ফ্লোর, ল্যাজারাস দেবে ফার্ণিচার। বসার ঘরে দেয়ালে ছবির ডিজাইন করবেন যামিনী রায়। বাকী রইল শুধু গৃহকর্তাকে বলা। টাকার প্রয়োজনে।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ করার অভ্যাস আছে শিবনাথের। দিবাভাগে ক্রেতা-বিক্রেতার আনাগোনায় ও অন্যান্য কাজের তাড়ায় কোন কিছুতে নিরবচ্ছিন্নরূপে মন দেওয়ার উপায় থাকে না। নিশীথে নিজকক্ষের নিভৃত আবেষ্টনে ধীর চিত্তে হিসাবপত্র পরীক্ষার সুযোগ মেলে। সে-দিন তাতে বাধা পড়ল। মলী সেন এসে বললেন, "একটা দরকারী কথা আছে।"

তা না বললেও চলতো। দরকার না থাকলে সন্ধ্যাকালে মলী সেন সিনেমায় বা ক্লাবে না গিয়ে বাড়ি থাকবেন কেন? দরকারটা যে শিবনাথের নয়, তাও অনুমান করতে কষ্ট হয়নি। লেজারের পাতা থেকে মুখ তুলে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে শিবনাথ

জিজ্ঞাসা করলেন "কী ব্যাপার ?"

ব্যাপার,—নতুন বাড়ি।

মলী সেন চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। এ বাড়ি পরিত্যাগের সংকল্প, সাহেবী পাড়ায় নতুন গৃহ নির্মাণের আভিজাত্য, তার জন্য স্থান অন্বেষণ, জমি নির্বাচন, নক্সা তৈয়ার ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। টেবিলের উপরে প্ল্যান খুলে সযত্নে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, কোনখানে হবে শয়নকক্ষ, কোথায় হবে অতিথির ঘর, কত বড় হবে ড্রয়িং রুম, কত দূরে থাকবে গ্যারেজ ও ভৃত্যদের বাস ব্যবস্থা ইত্যাদি। বলতে বলতে উৎসাহে, উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন মলী সেন।

শিবনাথ সমুদয় প্রস্তাব অখণ্ড মনোযোগে শুনলেন, সযত্নে প্ল্যানটি দেখলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "নতুন বাড়ি কার জন্য ?"

হায়, অদৃষ্ট! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠান্তে অবশেষে প্রশ্ন করে কি না "সীতা কার পিতা!"

এর পরে সংযম রক্ষা করা অন্য যে কোন মহিলার পক্ষেই শক্ত হতো। কিন্তু মলী সেন আজ স্থির করেছিলেন কিছুতেই ধৈর্যচ্যুত হবেন না। গম্ভীর স্বরে উত্তর করলেন, "আমার—মানে, আমাদের জন্য।"

শিবনাথ সংক্ষেপে বললেন, "তোমার জন্য যদি হয়, করতে পার। আমাদের জন্য যদি হয়, তবে প্রয়োজন।"

"তার মানে ?"

"খুব সহজে। আমি তো এখানেই বেশ আছি।"

"কিন্তু আমি যে এখানে সুখী নই, তা জান ?"

"জানি। কিন্তু সুখ কি আছে রাজমিস্ত্রীদের ঝুলিতে ? নতুন বাড়িতে গেলেই কি সমস্ত দুঃখ দূর হবে ?"

"না, হবে না। তবে নিজের পছন্দ মতো একটা বাড়িতে বাস করছি, অন্তত সেটুকু তো জানব।"

"বেশ তো তুমি নতুন বাড়িতে থাকতে চাও, থেকো। আমি বাধা দেব না।"

ধৈর্যের বাঁধ বুঝি আর থাকে না। বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করে অবজ্ঞা-মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন মলী সেন, "বাধা দিতে চাইলেই যেন বাধা দিতে পারতে। তুমি জানো আমি কারো বাধাই মানিনে, তোমার তো নয়ই।"

শিবনাথ নিরুত্তরে আপন খাতাপত্র টেনে নিয়ে পুনরায় হিসাব পরীক্ষা কার্যে মনোনিবেশের উদ্যোগ করলেন।

এ ভঙ্গিটুকু মলী সেনের অজানা নয়। বিতর্কের মধ্যপথে অকস্মাৎ এরূপ মৌনতার দ্বারা অপ্রীতিকর বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি ঘটান শিবনাথের একটি পরিচিত পুরাতন কৌশল।

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গের একটা চূড়ান্ত পরিণতি না ঘটিয়ে মলী সেন আলোচনা বন্ধ করতে প্রস্তুত নন। তাই তিনি উদ্গত ক্রোধ দমন করে যথাসম্ভব শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার আপত্তি কি কারণে ? জায়গাটা কি পছন্দ নয় ?"

খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি শিবনাথ উত্তর দিলেন—"এর চেয়ে ভালো জায়গা কলকাতায় খুব বেশী পাওয়া যাবে, মনে হয় না।"

"তবে ?"

শিবনাথ নিরুত্তরে পেন্সিল চালনা করতে লাগলেন ডেবিট-ক্রেডিটের অংকে।

উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় প্রশ্ন করলেন মলী সেন, "বাড়ির প্ল্যানটা ভালো নয় ?"

"প্ল্যানে তো কোন দোষ দেখছিনে, ডিজাইনটি চমৎকার, ড্রয়িংও নিখুঁত।"

"তা হলে ?"

"বলেছি তো, তুমি নিজে থাকতে চাও তো বাড়ি শুরু করে দাও। কনট্রাক্ট দেওয়ার আগে এস্টিমেটটা একবার আমাদের দোকানের এঞ্জিনীয়রকে দেখিয়ে নিও, কোনো ভুল-চুক থাকবে না।"

"দেখ, এ বাড়ি তৈরী তোমার ইচ্ছা নয়, সে কথা অত ঘুরিয়ে বলার দরকার কি ? সোজাসুজি বলার সাহস নেই কেন ?"

শিবনাথ উত্তর দিলেন না, আপন মনে হিসাব পরীক্ষায় ব্যাপৃত রইলেন। সাহসের কথাটা না তোলাই ভালো ছিল। সে কথা মলী সেনও মনে মনে জানেন। যদিও মুখে স্বীকার করেন না। কথা উঠলে বলেন, "একে সাহস বলে না, বলে গোয়ার্তুমি, পিগ্‌হেডেডনেস্‌।"

মিনিট দুই অপেক্ষান্তে মলী সেন আপন অভিযোগের পরিশিষ্ট হিসাবে বললেন, "স্বামী স্ত্রী দু'জন আলাদা বাড়িতে থাকলে আর পাঁচজনে যে তার কি ব্যাখ্যা করে তা তুমি বোঝ না এমন নয়। তুমি থাকবে পটলডাঙ্গার বাড়িতে আর আমি থাকব পোর্টল্যাণ্ড পার্কে—লোকনিন্দায় তা হলে কান পাতা যাবে কোথাও ?"

টাকা আনা পাই'র অংকে লাল পেন্সিলের টিক্‌ দিতে দিতে প্রায় স্বগতোক্তির মতো অনুচ্চ কণ্ঠে শিবনাথ বললেন, "লোকনিন্দার কথা ভেবেই কি আমরা সব সময়ে সব কাজ করি ?"

"'আমরা' মানে আমি তো ? না করিনে। যে-নিন্দা অকারণ, যে-নিন্দার পেছনে থাকে অক্ষমের ক্ষোভ আর বঞ্চিতের ঈর্ষা, তাকে আমি কেয়ার করিনে। আমি ক্লাবে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খেলি বা রেসে যাই বলে তোমার যে সকল মাসি, পিসি, দিদি-দিদিমার দল দু'বেলা আমার অখ্যাতি না করে জল স্পর্শ করেন না, তাঁদের আমি বরাবর অগ্রাহ্য করব। কিন্তু আমি একা একটা ভিন্ন বাড়িতে বাস করলে কেউ যদি অপ্রিয় কিছু বলে, তাকে দোষ দেব না।"

"অর্থাৎ যিনি আসামী তিনিই বিচারক হয়ে রায় লিখবেন। আদালতে—"

অসহিষ্ণু স্বরে বাধা দিয়ে মলী সেন বললেন, "তোমার ও-সব আইন আদালতের ব্যাখ্যান রাখ। তুমি যে ল'ক্লাশে কিছুদিন পড়েছিলে তা অত ঘটা করে প্রমাণ না করলেও চলবে। তা নিয়ে কিছু কম কাণ্ড হয়নি যে, পুরানো বলেই সে-কাহিনী আমি আজ ভুলে যাব। তুমি কষ্ট করে শুধু এইটুকু বল যে, এই পুরানো অন্ধকার কুঠরি ছেড়ে তুমি নতুন বাড়িতে বাস করতে রাজী আছ কি না ?"

"কষ্ট করে নয়, স্পষ্ট করেই বলছি,—এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস আমার ইচ্ছা নয়।"

কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস, ভঙ্গিতে চরম সিদ্ধান্তের লক্ষণ।

মলী সেন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, "তা হবে কেন ? জমির

বায়না দেওয়া হয়েছে, মালিক কাল আসবে পুরো টাকা নিতে, পরশু সেল-ডিড্ রেজেস্ট্রি হবে ! এখন তাকে বলতে হবে, জমি কেনা হবে না, কেন না আমার স্বামীকে না জানিয়ে এতদূর এগিয়েছিলেম। এখন দেখছি, তাঁর মত নেই। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার। আমাকে জব্দ করার এত বড় সুযোগ কি তুমি হাতে পেয়ে ছাড়তে পার ? তোমাকে কি আমি পনের বছরেও চিনিনি ?"

শিবনাথ এবার খাতা বন্ধ করে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, "সেটাই সত্যি, মলী, এই পনের বছরে তুমি আমাকে এতটুকুও চেনোনি, চিনতে চাওনি। কিন্তু সে কথা থাক। তুমি যে জমির বায়না করেছ তা তো এতক্ষণ আমাকে বলোনি। আমি এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস করব না। তোমার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করার অভিপ্রায়ে নয়। এই বাড়ি আমার পিতামহের নিজের হাতে গড়া। এ বাড়িতে আমার মা একদিন লাল চেলী পরে সিঁথিমৌর মাথায় বউ হয়ে এসেছিলেন। দেহান্তে এই বাড়ি থেকেই তাঁকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্মশানে। এই বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন আমার কত প্রিয় পরিজন, এই বাড়ির প্রতি ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে আমার ভাইদের স্পর্শ, বোনেদের চিহ্ন, বাবার স্মৃতি। কিন্তু কথা যখন দেওয়া হয়েছে, জমি নিশ্চয়ই কেনা হবে।"

মলী সেন বললেন, "থাক, তোমাকে দয়া করতে হবে না। আমার নিজের গয়না বিক্রি করলে অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশ টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সে টাকা দিয়ে আপাতত জমির দাম আমি দিতে পারব। তোমার কাছে জীবিত স্ত্রীর অনুরোধের চাইতে যখন মৃত পিতামহের স্মৃতিই বেশী মূল্যবান—"

শিবনাথ বাধা দিয়ে বললেন,—"মূল্য কম বেশী নিয়ে কথা নয়, মলী ; সেন্টিমেন্টের কথা। সেটা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। এ বাড়ি আমাদের পয়মন্ত। এ বাড়ি তৈরীর পরেই নানাভাবে ঠাকুর্দা মশায়ের সৌভাগ্য বেড়েছে, এ বাড়িতে থেকে বাবা ব্যবসায়ে আশাতীত উন্নতি করেছেন।"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মলী সেন মন্তব্য করলেন, "আধুনিক কালেও যে কোন পুরুষমানুষের এমন কুসংস্কার, সুপারস্টিশন থাকতে পারে তা জানা ছিল না। বসত বাড়ির উপরে ব্যবসায়ে সাফল্য নির্ভর করে একথা যে বিশ্বাস করে তার পাড়াগাঁয়ে থাকা উচিত ছিল।"

"বোধ হয় তাই। কিন্তু সুপারস্টিশন তো কেবল পুরুষেরই মনোপলি নয়। বাড়ির সামনের রাস্তাটার নামের উপরই যে বাড়ির ভিতরের মানুষগুলির দাম নির্ভর করে, সে তো মেয়েরাই বিশ্বাস করে এবং এই আধুনিক কালেই।"

রোষে মলী সেনের সর্বাঙ্গ দগ্ধ হতে লাগল। কিন্তু মুখে যথোচিত কঠোর অথচ যোগ্য প্রত্যুত্তর যোগাল না। কোনো কথা না বলে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন শিবনাথের কক্ষ থেকে।

তারপরে ক্রমান্বয়ে সপ্তাহখানেক ধরে একাধিকবার চেষ্টা করেছেন। পর্যায়ক্রমে যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ, অনুনয়, অনুযোগ, তিরস্কার ও অশ্রুধারা প্রয়োগ করেছেন মলী সেন। শিবনাথ অবিচল। তাঁর ঐ এক কথা, "আমরা এ বাড়ি ছাড়লে লক্ষ্মীও আমাদের ছাড়বে।"

পরাজিত হয়ে অবশেষে হাল ছেড়েছেন মলী সেন।

সে জমি কেনা হয়েছে। পরিবর্তিত প্ল্যানে সেখানে বৃহৎ চারতলা বাড়ি উঠেছে সে-বছরই। তাতে বারোটা ফ্ল্যাট। বাংলা গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী, পোর্ট ট্রাস্টের বড় সাহেব, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্ট প্রভৃতি ক্লাইভ স্ট্রীটের রথী-মহারথীরা সেগুলিতে বাস করেন। প্রতি মাসের পহেলা তারিখে শিবনাথের কারেন্ট একাউন্টে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা ভাড়া জমা হয়।

তিক্ত স্মৃতি মনে রেখে লাভ নেই, আছে মনস্তাপ। মলী সেন তা জানেন। কিন্তু বিস্মরণ তো মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। নতুন জুতার ফোস্কা যেমন প্রতি পদক্ষেপেই পথচারীকে পায়ের ক্ষতস্থানের কথা বেদনার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে, তেমনি পটলডাঙ্গার সেই পুরাতন বাড়িতে বিতৃষ্ণ অবস্থিতি ক্ষণে ক্ষণে মলী সেনের মনে আনে সেদিনকার সেই পরাভবের অপমান। তার বেদনা গভীর। জ্বালা দুঃসহ।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নাটককে বলে দৃশ্যকাব্য। বাংলা থিয়েটার যাঁরা দেখেন, তাঁরা জানেন, বাংলা নাটকে কাব্য আছে সামান্যই, দৃশ্য আছে যথেষ্ট। সেগুলি সব সুদৃশ্য হলে ক্ষোভ ছিল না।

অভিনয়ে দৃশ্যপট ব্যবহারের প্রবল বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর নাটক সবই কাব্যপ্রধান। কবিতা ছিল তাঁর জীবন-ধর্ম। যা লিখেছেন তা-ই হয়েছে কাব্য। এমন কি শিশুশিক্ষার সহজ পাঠেও তার প্রকাশ। বলা যায় না, হয়তো তিনি শুভংকরের ধারাপাত নূতন করে লিখলে তাতেও কাব্যের স্বাদ পাওয়া যেত।

কবির বিশ্বাস, অভিনয় ব্যাপারটা গতিশীল। দৃশ্যপটগুলো স্থাণু। জীবন্ত মানুষের আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যলীলার সম্মিলিত সচল অভিব্যক্তির পথে সেগুলি অচল বিঘ্নস্তূপ। সযত্নে পরিত্যজ্য। অভিনয়ের পরিপূর্ণ উপভোগ দর্শকের কল্পনার উপরে দাবী রাখে। চিত্রিত পট ও নির্মিত দৃশ্য তার সেই কল্পনাশক্তিকে পদে পদে ব্যাহত করে।

মলী সেন কবি নন। নিজেকে ইণ্টেলেকচুয়্যাল বলেও কোনো দাবি করেন না। কিন্তু সহজাত বুদ্ধি, ইংরেজীতে যাকে বলে কমনসেন্স, সেটা তীক্ষ্ন। লোকচরিত্রে গভীর জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু নিজ গোষ্ঠীর মানুষগুলিকে ভালো করেই চেনেন। জানেন, এদের পুরুষেরা বড় চাকরি করে, মোটা মাইনে পায়। মেয়েরা দামী গাড়ি চড়ে, ভারি গয়না গড়ায়। আর যাই করুক, এরা জেমস্ জয়েস পড়ে না। থার্ড প্রোগ্রামের নাম শুনলে থার্ড ডিগ্রির কথা ভেবে আঁতকে উঠতে পারে। এদের জন্যে চাই অন্য ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথেরই লেখা উদ্ধৃত করে মলী সেন বললেন, "সংসারে বেশীর ভাগ লোকই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন পা-ঝাড়া দিয়ে; পিতামহের চারটে মুখ আছে শুধু বড় বড় কথা বলার জন্য। তাদের জন্য গাছে জল দেওয়ার দৃশ্যে শকুন্তলার হাতে শুধু জলের ঝারি দিলেই যথেষ্ট নয়, ডালপালা সুদ্ধ গাছের গুঁড়িটাকেই স্টেজের উপর খাড়া করা চাই।"

কথাটা মিথ্যা নয়। আমাদের দর্শকেরা সিনেমা দেখতে গিয়ে চায় গান, নাটক দেখতে গিয়ে ম্যাজিক। তাই সিনেমার কুন্দনন্দিনী যদি বিষ খেতে খেতে একখানা

করুণরসাত্মক গান না ধরে, তবে সে শুধু নিজেই মরে না, সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রযোজককেও মারে। প্রাণে নয়, ধনে। থিয়েটারের ইন্দ্র যদি দর্শকদের চোখের সামনে রথে চেপে স্টেজ থেকে শূন্যে না মিলিয়ে যায়, তবে অচিরে প্রেক্ষাগৃহটি শূন্য হওয়ার আশঙ্কা।

আজকের অভিনয়ে স্টেজে গাছের গুঁড়ি খাড়া করার ভার যিনি নিয়েছেন, ইংরেজী অক্ষরে তার নামের উচ্চারণ 'রয়'। আসলে অবশ্য গাছের গুঁড়ি নয়,—সমুদ্রে ভাসমান প্রমোদ-তরণী। কারণ অভিনয়ের পালাটি অভিজ্ঞানশকুন্তলম নয়,—স্বপনকুহেলী। এতে তরু-আলবালে বারিসিঞ্চনরতা সখিপরিবৃতা শকুন্তলার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না ; দেখা যাবে জ্যোৎস্না-রজনীতে সমুদ্রবক্ষে বীণাবাদিনী রাজকন্যা মঞ্জুশ্রীকে।

ম্যাসাচুসেট থেকে ডিগ্রি ও ওয়েস্টিং হাউস থেকে ট্রেনিং নিয়ে মিস্টার এন. সি. রয়, অর্থাৎ শ্রীমান নিখিলচন্দ্র রায় বর্তমানে স্থানীয় এক নামজাদা এমেরিকান কোম্পানীর রেসিডেন্ট ডিরেক্টার। কিন্তু সোসাইটিতে এঞ্জিনীয়র বলে তাঁর পরিচয়টা সত্য হলেও আংশিক মাত্র। এ যেন ইংলন্ডের রাজনীতিতে উইনস্টন চার্চিলের পরিচয় দিতে বলা,—লীডার অব দি কনসারভেটিভ পার্টি।

নিখিল রায়ের স্কন্ধ মোটেই বৃষের ন্যায় নয়, তাঁর ভুজদ্বয়কেও ঠিক শালপ্রাংশু বলা চলে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে তাঁকে দিব্যকান্তি বলা কঠিন। তবুও গণ্ডে কয়েকটি বসন্তের গুটিচিহ্ন বাদ দিলে বাঙ্গালী হিসেবে মোটামুটি তিনি সুপুরুষ, একথা একমাত্র স্বভাব-নিন্দুক ব্যতীত আর সবাই স্বীকার করে। টেনিসে সুমন্ত মিশ্র বা দিলীপ বোসের পরেই তাঁর র‍্যাঙ্কিং হবে এমন সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে দু'তিন বারই তিনি সেমিফাইন্যাল অবধি উঠেছেন। ক্লাব টুর্নামেন্টে কাপ পেয়েছেন একাধিক। বিলিয়র্ডে অনায়াসে তিনি নব্বই-এর কাছাকাছি ব্রেক করতে পারেন।

তাঁর জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত প্রমাণ এই যে, একাদিক্রমে তিন বছর তিনি ক্লাবের সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও সদস্যদের মধ্যে কেউ পদত্যাগ করে নতুন ক্লাব গড়ার উদ্যোগ করেনি।

নিখিলের চরিত্রে আর একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি একজন সুদক্ষ অভিনেতা। স্বপনকুহেলীর নায়িকা সিংহল রাজকুমারী মঞ্জুশ্রীর ভূমিকায় মলী সেন। নায়ক তাঁরই প্রণয়মুগ্ধ বিদেশী রাজকুমার ইন্দ্রজিতের অংশে—নিখিল রায়—বন্ধু বান্ধবীরা ঠাট্টা করে বলেন,—"গ্রিয়ার গার্সন অ্যাণ্ড ওয়ালটার পিজন। একেবারে স্টার কাস্ট।"

অভিনয় নিখিলের নেশা, এঞ্জিনীয়রিং তাঁর পেশা। দুটোতেই তাঁর পারদর্শিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ দিতে বদ্ধপরিকর নিখিল আলোর মালায় ছেয়ে দিয়েছেন অভিনয়-মঞ্চ। মানবদেহে শিরা-উপশিরার মতো অসংখ্য দীর্ঘ বৈদ্যুতিক তার যোজনা করেছেন স্টেজের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। বৃহদাকার আর্ক ল্যাম্পগুলি ঝুলছে উপর থেকে। বিভিন্ন সুইচ নিয়ন্ত্রণে সেগুলির বিচ্ছুরিত আলোক-বন্যায় প্লাবিত অভিনয়-মঞ্চে কখনও দেখা যাবে রৌদ্রোজ্জ্বল দিবা দ্বিপ্রহর, কখনও আভাস দেবে অস্তগামী সূর্যকিরণে রক্তিম আসন্ন সন্ধ্যার, কখনও বা সৃষ্টি করবে শুক্লা রজনীর মৃদুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোক। প্রয়োজন মতো সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে গভীর অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া

যাবে সমগ্র মণ্ডপীঠ।

অভিনয়ের সর্বশেষ অংকে আছে, সবেগে আন্দোলিত রাজপুত্রের তরণী ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ভেসে যাচ্ছে কূল থেকে অকূলে, চোখের সমুখ থেকে দৃষ্টির অন্তরালে। প্লাইউড, কাডবোর্ড ও টিনশিট্ দিয়ে তৈরী হয়েছে ময়ূরপংখী নৌকা। তার তলদেশে গোলাকার ক্যাস্টর আঁটা। অদৃশ্য দড়ির সাহায্যে দুলে দুলে চলবে কৃত্রিম জলের উপর কৃত্রিম তরণী—সত্যিকার জলযাত্রার ভঙ্গিতে। সমুদ্রের ঢেউ, তার গর্জন, তরণীর আন্দোলন ও গতি সমস্তই সৃষ্টি করা হবে বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায়। তার জন্য স্টেজের নীচে বসানো হয়েছে বিভিন্ন অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ছোট বড় গুটি কয়েক মোটর এবং একটি কনভার্টার। আনা হয়েছে নানা আকৃতির রেল, নানা মাপের রোলার, ছোট বড় কপিকল, দাঁতওয়ালা চাকা, সরু-মোটা শিকল, লোহার স্প্রিং, কাঠের হাতল ইত্যাদি অগণিত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম।

একটার পর একটা সুইচ টিপে শেষবারের মতো সমস্ত বৈদ্যুতিক কৌশলগুলি পরীক্ষা করে দেখছিলেন এবং দেখাচ্ছিলেন নিখিল। উৎসাহের আতিশয্যে ক্ষীপ্র তাঁর ভঙ্গি, আত্মতৃপ্তির অভিব্যক্তি তাঁর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে।

নিজের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নে আত্মপ্রসাদ লাভ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নিখিলের বর্তমান উৎসাহ ও আনন্দের কারণ কেবল মাত্র নিজস্ব এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধির প্রশংসনীয় পরিচয় নয়। যাঁকে দেখাচ্ছেন সেই বিশেষ ব্যক্তিটির উপস্থিতি এবং আগ্রহও নিখিলের মনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মলী সেন প্রত্যেকটি আলোক নিয়ন্ত্রণের কৌশল এমন গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন যে, তাতে যে কোনো বিশেষজ্ঞের মনেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে জাগে। মাঝে মাঝে একটি দুটি প্রশ্নের দ্বারা মলী সেন ব্যাখ্যাকারীর সেই উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে তুলছিলেন। স্বল্পপরিসর স্থানে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সুইচ, গিয়ার, লিভার ও গ্যাজেটগুলি টিপে, টেনে, খুলে বা বন্ধ করে দেখাতে গিয়ে উৎসাহে উদ্দীপ্ত নিখিলের হাত মাঝে মাঝে অতর্কিতে মলী সেনের হাতের আঙ্গুল বা বাহুর একাংশ স্পর্শ করছিল।

সমস্ত বোঝানো ও দেখানো শেষ হয়ে গেলে মলী সেন বিস্ময় ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

ক্ষণেক অপেক্ষা করে নিখিল প্রশ্ন করলেন, "কেমন হয়েছে বলুন মিসেস সেন।"

মলী সেন কিছু না বলে শুধু একবার নিখিলের পানে তাকালেন। বলার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর চোখের উজ্জ্বল চাহনি, তাঁর আননে আনন্দের আভা, তাঁর অধরে পরিতৃপ্তির ঈষৎ হাস্যরেখা যে কোনো উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চাইতে মুখরতর। নিখিলের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিপূর্ণ পুরস্কার।

পুনরায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ভাবছেন?"

স্মিত হাস্যে মলী সেন উত্তর করলেন, "কিছু না।"

"কিছু না কী রকম? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, চুপ করে ভাবছেন।"

"চুপ করে আছি তা দেখতে পাচ্ছেন বটে; কিন্তু ভাবছি দেখছেন কেমন করে?"

"বাঃ রে, চুপ করে আছেন বলেই মনে হচ্ছে ভাবছেন। নইলে ভাবনা কি আর চোখে দেখা যায়?"

"যায় না বুঝি? যাক, বাঁচালেন। ভাগ্যিস পুরুষ মানুষদের দৃষ্টিশক্তিটা খাটো। আমরা মেয়েরা কিন্তু আপনাদের ভাব এবং ভাবনা দু'ই দেখতে পাই। কী হাসছেন যে বড়? বিশ্বাস হচ্ছে না? এঞ্জিনীয়ার মানুষ, হাতে কলমে পরীক্ষা না করে কিছুই মানতে চান না। আচ্ছা, আপনি এখন কী ভাবছেন বলব? শুনতে চান? থাক, থাক, আপনাকে অমন রাঙা হয়ে উঠতে হবে না। ভয় নেই। আমি বলছি না।"

হেমন্তে সুপক্ক ধান্যের সুরম্য ক্ষেত্রের উপরে হঠাৎ এক ঝলক স্বর্ণাভ রৌদ্রের মতো মলী সেনের মুখে চোখে একটি নিঃশব্দ কৌতুকোজ্জ্বল হাস্যোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল।

বিব্রত নিখিল কী করবেন, কী বলবেন ভেবে না পেয়ে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অকারণেই তাঁর ললাটে স্বেদবিন্দু সঞ্চারিত হতে থাকল।

বৈদ্যুতিক তার বা সুইচ ইত্যাদির সংস্পর্শে পাছে কারো কোনো বিপদ না ঘটে সেজন্য সুইচ বোর্ডটি স্বভাবতঃই স্টেজের এমন একটি অংশে রাখা হয় যেখানে একমাত্র অভিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো উপস্থিতি বা যাতায়াতের সম্ভাবনা নেই। যেহেতু এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ব্যবহৃত বিদ্যুৎ অপেক্ষা উচ্চতর শক্তির বিদ্যুৎ এবং মোটর, ট্রান্সফর্মার ও নানাবিধ জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ, সেজন্য নিখিল অধিকতর সতর্কতায় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। স্টেজের নিভৃত কোণে কিছুটা উঁচুতে পৃথক একটি সুদৃঢ় মঞ্চ তৈরী করে তার উপরে সুইচ বোর্ড ও কনট্রোল গিয়ারগুলি বসিয়েছেন, যাতে অসতর্ক কেউ সেখান দিয়ে যাতায়াতের সময় হাত বাড়িয়েও তার সংস্পর্শে না আসে। মঞ্চটির চারদিক টিউবের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ওঠা নামার জন্য আছে ক্ষুদ্রকায় একটি কাঠের সিঁড়ি। সেই রেলিংএর উপর দেহের ভার ঈষৎ ন্যস্ত করে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন মলী সেন।

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিখিলের সংকট লক্ষ্য করে অত্যন্ত সহজ ভাবে বললেন, "কী ভাবছিলেম, শুনবেন? ভাবছিলেম, আপনার এই পরিশ্রম এই পরিকল্পনা এত সাজ-সরঞ্জাম, এই সার্থক কারুকলার যোগ্য হবে কী আমাদের অভিনয়?"

হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত বোধ করলেন নিখিল। নিজের অলক্ষিতেই বুঝি সুইচ বোর্ডের কাছ থেকে সরে মলী সেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "মিসেস সেন, আপনাদের অভিনয়এর যোগ্য কি অযোগ্য জানিনে। সে কথা আমি কখনও ভাবি নি। আমার সামনে ছিল শুধু একটি লক্ষ্য। সে আপনি। আমি যা কিছু করতে চেয়েছি, যা কিছু করেছি সবই আপনার পছন্দমত হবে, আপনি খুশি হবেন, এই মনে করে।"

কথাগুলি যেমন করে বলা হলো, তেমন করে বলার কল্পনামাত্র ছিল না নিখিলের মনে। তাঁর নিজের কাছেই সেগুলি ছাপার অক্ষরে কেতাবী বক্তৃতার মতো মনে হলো। গলার স্বরটাও নিজের কানেই অতিমাত্রায় নাটকীয় শোনাল। অথচ জ্যামুক্ত তীরের মতো সদ্য উক্ত বাক্যগুলিকেও আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কোনো মতেই। ছিঃ ছিঃ! মিসেস সেন কী জানি কী ভাবলেন। অনুশোচনা হলো নিখিলের।

মিসেস সেন সত্যি কী ভাবলেন, তা বোঝার উপায় ছিল না। বাইরে অপরাহ্ণ

বেলার রৌদ্রালোক ম্লান হয়ে এসেছে। ভিতরে স্টেজের নির্জন অংশের এই অপরিসর মঞ্চটিতে আলোর প্রবেশপথ স্বভাবতঃই সংকীর্ণ। সেই ক্ষীণ আলোক এখন ক্ষীণতর হয়েছে। নিরন্তর পার্শ্ববর্তিনীর মুখমণ্ডলে তাঁর মনোভাবের যদি কোন ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েও থাকে, আসন্ন সন্ধ্যার এই স্বল্পালোকিত মুহূর্তে তা কোনক্রমেই আর দৃষ্টিগোচর নয়। তাই আপন প্রগলভতার অসামান্য মূঢ়তা স্মরণ করে লজ্জা ও অনুতাপে কেবল ক্লিষ্ট হতে থাকলেন নিখিল রায়।

"জানেন, আপনার সঙ্গে আমি আর কথা বলছিনে ?"

কিছুটা অভিমান, কিছুটা ব্যথা এবং কিছুটা বা অনুযোগের সুর মেশানো ছিল মলী সেনের কণ্ঠে।

অপরিসীম বিস্ময়ে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "মানে ?"

"মানে, আমি ভীষণ রাগ করেছি।"

নিখিলের শংকা তা হলে অহেতুক নয়। নিজের নির্বুদ্ধিতার নিদারুণ প্রতিফল প্রত্যক্ষ করে নিখিল মনে মনে নিজেকে বারংবার ধিক্কার দিলেন। কেন বলতে গেলেন ঐ কথাগুলি ? ক্রুদ্ধ অভিভাবকের সম্মুখে অপরাধী বালকের মতো অসহায় নিখিল আপন স্পর্ধিত আচরণের সমুচিত দণ্ড লাভের আশংকায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে মনে মনে যেন মুহূর্ত গণনা করতে লাগলেন।

"আপনি আমার কোনো কথা রাখেন না ; আপনার সঙ্গে আড়ি।" কপট কলহের ভঙ্গিতে বললেন মলী সেন।

না, এ তো ঠিক শাস্তি বিধানের ধারা নয় ! কণ্ঠে তো উদ্যত রোষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না ! নিশ্চিত হতে না পেরে সংশয়ের স্বরে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কথা রাখিনে ? কই, আমি তো মনে করতে পারিনে কবে আপনার কোন কথা অগ্রাহ্য করেছি।"

"করেন নি ? আজ দুপুরে খেতে এসেছিলেন ? এতবার অনুরোধ করে লোক পাঠালেম, কান দিয়েছেন তাতে ?"

আঃ ! কী আশ্বাস্তি !! দূর দিগন্তে যাকে অগ্নিশিখা বলে ভয় হয়েছিল, দেখা গেল, সেটা প্রত্যূষের অরুণ রঙে রঙ্গিন লঘু মেঘখণ্ড মাত্র। নিখিল আপন স্বাভাবিক স্থৈর্য ফিরে পেয়ে সহজ কণ্ঠে বললেন, "ওঃ, এই ? আমি ভাবছিলেম, কী জানি সাংঘাতিক কিছু বা।"

"এটা সাংঘাতিক নয় বুঝি ?"

"না, একবেলা ভাত না খাওয়াটা আমাদের মতো মুটে মিস্ত্রীদের পক্ষে কিছুই নয়। পাওয়ার হাউসে—"

মলী সেন হাস্যচপল কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন, "থাক থাক। অত বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন নেই। আপনি যে আপিসের বড় সাহেব, সে আমরা সবাই জানি।"

নিখিল সহাস্যে বললেন, "হাঁ, বড় সাহেব বটে, তবে শুধু পাখার নীচে বসে দস্তখৎকারী নই। দরকার হলেই আস্তিন গুটিয়ে হাতুড়ি, রেঞ্চ ধরতে পারি। পাওয়ার হাউসে ব্রেকডাউন হলে কতদিন সকাল থেকে রাত অবধি একটানা কাজ করতে হয়। আর্দালী চাপরাশীরা বুদ্ধি করে কখনও দু এক টুকরো রুটি বা দু একটা সিদ্ধ ডিম যোগাড় করে আনে। কখনও বা স্রেফ চা আর সিগারেট।

কতবার এমন হয়েছে। আজ তো আপনার কেনা কেক, সন্দেশ, আপেল, নাসপাতিতে রীতিমতো ভূরি ভোজন বলা চলে।"

মলী সেন যুক্ত দুই কর প্রণামের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "মানছি, আপনারা সব ঋষিতুল্য লোক। বশিষ্ঠ জামদগ্নির লেটেস্ট এডিশন। ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেন। আপনারা শুধু ধোঁয়া নিয়েই বাঁচতে পারেন। আমরা মর্ত্যলোকের ক্ষুদ্র জীব, পা দুটি ধুলো কাদার মাটিতে। আমাদের যে বস্তু না হলে চলে না।"

"বেশ তো, মর্ত্যলোকের মর জীবেরা মর্তমানের কাঁদি নিয়ে বসে থাক না। আমরা কি আপত্তি করেছি?"

অনুপ্রাসযুক্ত উত্তরটা খুব সুচতুর হয়েছে ভেবে মনে মনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন নিখিল।

"না করেন নি। কিন্তু তবুও আপনাদের কথা ভেবেই কলা গিলতে গেলেও গলায় আটকে ধরে তাদের, সে খবর রাখেন? জানেন, আমাকে আপনি আজ সারা দিন না খাইয়ে রেখেছেন?" নিখিলের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন মলী সেন।

গভীর বিস্ময়ে নিখিল বললেন, "আমি না খাইয়ে—মানে—আপনি—আপনি আজ খান নি দুপুর বেলা? সে কী? কেন?"

ঈষৎ হাস্য করে মলী সেন বললেন, "যোগী ঋষিদের নিয়ে বিপদই তো ঐ। মুনিঠাকুর, আপনাদের তৃতীয় নয়নটা আছে কপালের কোনখানে বলতে পারেন? জানলে সুবিধে হতো। আমাদের এত ভুগতে হতো না।"

এ সব কথার সম্পূর্ণ অর্থগ্রহণ নিখিলের সাধ্য নয়। কিন্তু একথা বুঝতে কষ্ট হলো না যে, মলী সেনের এই স্বেচ্ছাকৃত অনাহারের পশ্চাতে তাঁর নিজের সম্পর্ক আছে এবং সে-সম্পর্ক কেবলমাত্র পাকযন্ত্রের নয়, হৃদ্‌যন্ত্রেরও বটে।

অনুতপ্ত কন্ঠে নিখিল বললেন, "কি করি বলুন, তখন এখানে নিজে দাঁড়িয়ে না করালে কিছুতেই মিস্ত্রীরা সন্ধ্যের আগে এসব শেষ করতে পারত না। অভিনয়ের সময় স্টেজে আলোই জ্বলত না। জানেন তো, ফাঁকি দিতে পারলে আমাদের লোকগুলি কুটোটিও নড়াতে চায় না। তা' ছাড়া এ-সব ব্যবস্থা জটিলও কম নয়। হাতে ধরে দেখিয়ে না দিলে ওদের পক্ষে করাও অসম্ভব। কিন্তু আমার জন্য আপনি কেন না খেয়ে বসে রইলেন? অন্যায়, ভারি অন্যায় আপনার।"

"বসে আর রইলেম কোথায়? টেবিলে দু'জনের খাবার সাজিয়ে নিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠালেম। আপনি এলেন না। অপেক্ষা করে বেলা গড়িয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা একটা থেকে দুটোয়, দুটো থেকে আড়াইটার কোঠায় পৌঁছল। প্লেট ধরে সমস্ত খাবার-দাবার দিয়ে দিলেম চাকর-বেয়ারাদের।"

আসলে কথাটা সত্য নয়। না খেয়ে থাকেন নি মলী সেন। বরং সর্ষেবাটা আর কাঁচা লংকা দিয়ে রাঁধা ঝালের মাছ দু'বার চেয়ে নিয়েছেন।

নিখিলের খাওয়ার আয়োজন তিনি যথেষ্টই করেছিলেন। টেবিলে অপেক্ষাও নেহাৎ অল্প করেন নি। অবশেষে নিখিল আসবেন না নিশ্চিত জেনে বুদ্ধিমতী মেয়ে মাত্রেরই যা করা উচিত, তিনি তা-ই করেছেন।

মলী সেনের বিশ্বাস, এসব ক্ষেত্রে এমন সামান্য একটু অতিরঞ্জনে দোষের কিছুই নেই।

হৃদয়ের ব্যাপারে মলী সেন নিজেকে মনে করেন একজন খাঁটি আর্টিস্ট। তিনি বলেন, "ঘটনার সত্য আর আর্টের সত্য এক নয়। যা ঘটেছে তার চাইতে যা ঘটলে ঠিক হয় তার উপরেই আর্টিস্টের পক্ষপাত। নীতিবাগীশেরা যাই কেন না বলুন,—সত্যম্ শিবম্ হতে পারে, কিন্তু সুন্দরম্ নয়। প্রয়োজন মতো একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে না দেখালে সত্য চিরকাল শুষ্কং কাষ্ঠং হয়ে থাকে, কোনোকালেই নীরস তরুবর হয় না।"

বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন করে, "যথা?"

"যথা, পুলিশ কোর্টের রিপোর্টে থাকে সত্যিকার ঘটনা। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে আছে সত্যিকার আর্ট। যেমন পত্রিকার পাতার ফটোগ্রাফে পাই অবিকৃত সত্য, শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবিতে দেখি উপভোগ্য আর্ট।"

শুনে ক্লাবে, পার্টিতে তাঁর ভক্তমণ্ডলী সপ্রশংস বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে মন্তব্য করেন,—"মাই গশ্! হাউ ক্লেভার!"

নিখিল ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। কিলো-ওয়াট বোঝেন, এম্পিয়র জানেন, ভোল্টেজ চেনেন। আর্টের সরু গলিঘুঁজিতে তাঁর গতায়াত নেই। তিনি সহজ সরল বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝলেন, এই অতিথিপরায়ণা কোমলহৃদয়া মহিলাটি আজ তাঁরই জন্য সারাদিন অভুক্ত। অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সহৃদয় কণ্ঠে বললেন, "কেন বলুন তো অনর্থক না খেয়ে কষ্ট পেলেন?"

মলী সেন বললেন, "দেখছি, এঞ্জিনীয়র সাহেবের নোট বইতে সবই আছে; শুধু লেখা নেই—পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়?"

কিন্তু এ কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কী, আলোচ্য প্রসঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কোনখানে, তা নিখিলের কাছে স্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "রাগ করে আজ ভেবেছিলেম, থাকুন না আপনি উপোস করে। আমার ভারি বয়েই গেল তাতে। প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, একমাত্র অভিনয়ের ব্যাপার ছাড়া আপনার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রাখব না। কিন্তু প্রতিজ্ঞার মুস্কিলই এই যে, সেটা না ভাঙ্গা পর্যন্ত মনে আর স্বস্তি থাকে না।"

নিখিল কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে মলী সেন বলতে লাগলেন, "জানেন মিস্টার রয়, ভগবান লোকটা বড় একচোখো রেফারী। জীবনের খেলায় পুরুষেরা কেবলই ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গোল করে, আর মেয়েরা কেবলই পড়ে গিয়ে গিয়ে গোল হারে। তিনি হুইসিল হাতে নির্বিকার চেয়ে দেখেন,—বোধ হয় উপভোগই করেন,—ফাউল দেন না। গ্যালারী থেকে জুতো আর ইঁটপাটকেল ছুঁড়ে মারবার আশঙ্কা নেই কি না।"

মলী সেনের কণ্ঠের সূক্ষ্ম আবেদন যেন সহস্র সহস্র অদৃশ্য তরঙ্গে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সেই কাতর ব্যাকুলতা তাঁর তন্বী দেহটিকে ঘিরে এক গম্ভীর অথচ বেদনাবিধুর ভাবাবেগের নিস্তব্ধ আবেষ্টন রচনা করল।

হঠাৎ দুই পদক্ষেপে সুইচ বোর্ডটার কাছে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জেলে দিলেন নিখিল। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে অকস্মাৎ সজোরে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলার মতো নিজেকে তিনি যেন—সবল আঘাতের দ্বারা মোহাবিষ্ট স্বপ্নরাজ্য থেকে আত্মচৈতন্যের বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনলেন।

আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চের ঠিক নীচে কার যেন দ্রুত পদধ্বনি ও গুরু পতন-শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠে "কে ওখানে ?" বলে হাঁক দিলেন নিখিল।

দু'জনেই রেলিংএর উপর দিয়ে ঝুঁকে নীচে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। সেখান থেকে মেজের উপরে শুধু শাড়ির একটি প্রান্ত ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

নিখিল দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। মলী সেনও তাঁর অনুগমন করলেন।

"এ কী ! এ যে নীরজা ! তুমি এখানে ? এমন করে শুয়ে ?"—বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে নিখিল তাকালেন।

কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার পূর্বেই সেখানে ঝড়ের বেগে উপস্থিত হলেন ব্যস্ত-সমস্ত সিদ্ধনাথ। কোনো দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে বললেন, "এই যে মিসেস সেন, আপনি এখানে ! আপনাকে না খুঁজেছি হেন স্থান নেই। আর একটু দেরী হলেই খবরের কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন ছাপতে হতো, হাঃ হাঃ হাঃ (অট্টহাস্য)। উঃ, কম করে বার দশেক না কোন আপনার দোতলার বারান্দা আর গ্রীনরুমে ছুটেছি। হাঁটুতে ব্যথা ধরে গেছে। একটু বাতের ধাত আছে কি না। এটা পৈতৃক, ঠাকুর্দা মশায়েরও ছিল। মেজ শ্যালক আয়ুর্বেদ কলেজের প্রফেসর। ব্যবস্থা দিলেন,—পুরানো ঘি গরম করে সকাল-সন্ধ্যা মালিশের। গিন্নীকে বললেম, শালা না হলে আর এমন ঠাট্টা কেউ করে ? ঘি নতুনই মেলে না, তার আবার পুরানো। দাদাকে বলো, এখন থেকে দালদা মালিশের ব্যবস্থা দিতে, নইলে রোগী জুটবে না। হাঃ হাঃ হাঃ।"

সিদ্ধনাথ এক নিঃশ্বাসে কথা বলেন। দম ফুরিয়ে নিজে না থামা পর্যন্ত তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা বৃথা। তাঁর অট্টহাস্য শেষ হলে, মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী সিদ্ধনাথবাবু ? আমাকে খুঁজছিলেন কেন ?"

"খুঁজছিলেম কেন ? অভিনয় শুরু হওয়ার আর ঘণ্টা তিন-চার মাত্র বাকী। এদিকে অপর্ণার মা বলে পাঠিয়েছে,—অপর্ণার অসুখ। সে আজ পার্ট করতে পারবে না। ডোবালে দেখছি।"

"কী সর্বনাশ ! অপর্ণার যে প্রথম দৃশ্যেই পার্ট। এখন উপায় ?" উদ্বেগে মলী সেনের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

সিদ্ধনাথ বললেন, "না, না, আপনি উতলা হবেন না। মনে উদ্বেগ থাকলে আপনার পার্ট নষ্ট হবে। আপনি এ-সব ভাববেন না। অপর্ণার ভার আমি নিচ্ছি।" চারপাশে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্তর্পণে বললেন, "অসুখ না হাতি ! আসল ব্যাপার, কমপ্লিমেণ্টারী। চারখানা করে সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেওয়া হয়েছে তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য। অপর্ণার মায়ের আরও চারখানা চাই। তাই নিয়ে ঝগড়া।"

তাঁর বাচনভঙ্গি দেখে মনে হয়, যেন অতি মারাত্মক এক গুপ্ত সামরিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত করলেন।

মলী সেনকে আশ্বাস দিলেন, "সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আপনাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু এদিকে ভাড়া-করা চেয়ারগুলো যে এখনও এসে পৌঁছল না। যারা

টিকিট কিনেছে তারা বসবে কোথায় ? ডোবালে দেখছি !"

মলী সেন পুনরায় উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "অ্যাঁ, এখনও চেয়ার আসে নি ? তা'হলে কী হবে ?"

"আহা, আপনি চঞ্চল হচ্ছেন কেন ? আমি সব ব্যবস্থা করছি। আপনি স্থির হয়ে নিজের পার্টের কথা ভাবুন তো। আপনি উতলা হবেন না।"

যেরূপ ব্যস্ততার সঙ্গে এসেছিলেন ঠিক সেরূপ ব্যস্ততায়ই প্রস্থান করলেন সিদ্ধনাথ।

মলী সেন নিখিলকে বললেন, "যাই, একটু গরম কফির চেষ্টা করিগে। তা নইলে স্টেজ-ফ্রাইটএ ধরবে। আপনি ওয়াশ্ চান তো উপরের বাথরুমে চলে যান। নতুন সাবান, তোয়ালে সমস্ত ঠিক করা আছে। বেশী দেরী করবেন না যেন, আমি ড্রেসিং রুমে পেয়ালা নিয়ে বসে থাকব কিন্তু।"

ইতিমধ্যে নীরজা উঠে দাঁড়িয়ে নিজ বসন সুবিন্যস্ত করেছেন। নিখিল দেখলেন, মলী সেনের প্রস্থানপথে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন নীরজা। নিখিল দৃষ্টিবিশারদ, কবি কিংবা সাহিত্যিক নন। সে নেত্র শূন্যগর্ভ কি অগ্নিগর্ভ, তা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

নীরজা কৈফিয়তের সুরে বললেন, "আমার কানের একটা ইয়ারিং কোথায় হারিয়ে গেছে। তাই খুঁজে দেখছিলেম এখানটায়। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়েছি।"

নিখিল বললেন, "এই অন্ধকারে খুঁজলে পাওয়া যায় কখনও ? দাঁড়াও আমি একটা টর্চ নিয়ে আসছি।"

নীরজা বাধা দিয়ে বললেন, "না, মিছে পরিশ্রম করবেন না। নিশ্চয়ই এখানে নয়, অন্য কোথায় হারিয়েছি।" বলে প্রস্থানোদ্যম করলেন।

নিখিল পিছন থেকে এগিয়ে এসে নীরজার বাম বাহু লক্ষ্য করে বললেন, "এ কী, এত রক্ত কিসের ? পড়ে গিয়ে কোথাও কেটে যায় নি তো ?"

আপন দক্ষিণ হস্তে নীরজার বাহুটি নিখিল তুলে ধরলেন। "ইস, অনেকটা কেটেছে যে ! এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা ব্যাণ্ডেজ করা চাই।" বললেন নিখিল।

নীরজা সজোরে নিখিলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "কিছু দরকার নেই। ও কিছু নয়, সামান্য কাটা। ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেললেই হবে। আপনি যান।"

"দরকার নেই মানে ? এ সব ধুলো-বালির মধ্যে সেপ্টিক্ হতে কতক্ষণ ? চলো আমার সঙ্গে মিসেস সেনের কাছে। তাঁর কাছে নিশ্চয়ই ডেটল পাওয়া যাবে।" বলে পুনরায় নীরজার বাহুটি হাতে তুলে নিলেন।

"আমার কিছু হয় নি, মিষ্টার রয়। আপনি কেন অনর্থক এই নিয়ে ফাস্ করছেন ? আপনার পায়ে পড়ি। আপনি যান। আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

নীরজার কণ্ঠের কঠোর তিক্ততা নিখিলকে আঘাত করল। বিস্মিতও করল। নিঃশব্দে নীরজার বাহুটি নিজের হাত থেকে মুক্ত করে দিলেন।

নীরজা নিখিলের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে সতেজ পদক্ষেপে স্টেজের অপর প্রান্তের দ্বারোদ্দেশে রওনা হলেন।

সামনে তাকিয়ে চলতে চলতে—এ কী ? হঠাৎ আলোগুলি কি সব নিস্তেজ হয়ে

এল ? চোখে ঝাপসা দেখায় কেন ? বুকের পাশে জামার কাছটা ভিজে ঠেকছে যেন ! জলবিন্দু ঝরল কোত্থেকে ? দুই হাত নিজের চক্ষে স্থাপন করলেন নীরজা। তাই তো, চোখে জল কেন ? নিজের কাছেই নিজে আবিষ্কার করলেন নীরজা, তিনি কাঁদছেন। শ্রাবণ দিনের মেঘকজ্জ্বল আকাশ থেকে বারিবর্ষণের মতো শ্যামাঙ্গী নীরজার ঘনকৃষ্ণ দুই নয়ন থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তাঁর কপোলে, কণ্ঠে, বক্ষে ও বসনে। অবিরাম বেগে। অজস্রধারায়।

নিখিলের বৈদ্যুতিক কলাকৌশল ও আলোকসম্পাতের সঙ্গে সঙ্গীতি রেখে মঞ্চের দৃশ্যসজ্জার ব্যবস্থা করছেন বীরেশ্বর বোস—প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী। জলের রং ও তৈলচিত্র দুটোতেই তাঁর সমান খ্যাতি। রূপ সৃষ্টি ও ব্যবহারিক শিল্প—দুটোতেই তাঁর সমান পারদর্শিতা। একাধিক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের শিল্প-নির্দেশক। তা ছাড়া শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত বিজ্ঞাপন কোম্পানীতে স্ফীত বেতনে নিযুক্ত স্থায়ী কমার্শিয়েল আর্টিস্ট।

টেবিলের উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা রং-এর টিউব। ফুলদানীর মধ্যে দীর্ঘবৃন্তযুক্ত পুষ্পগুচ্ছের মতো একটি চিনেমাটির ঘটে দাঁড় করানো গোটা পাঁচেক তুলি। বাম হস্তের মুষ্টিতে ধৃত আরও গোটা তিনেক। বিভিন্ন রং ব্যবহারের জন্য। যখন যে রংটি প্রয়োজন সে-তুলিটি বাম হাত থেকে ডান হাতের আঙুলে তুলে নেন। একটানা সুরে শীষ দিতে দিতে একটি মাটির ঘটের গায়ে রেখার পরে রেখা, রং এর পরে রং যোজনা করছিলেন বীরেশ্বর। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবেরা জানেন, এটাই বীরেশ্বরের গভীর মনোনিবেশের লক্ষণ। তখন তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে নেই।

কিন্তু ব্যাঘাত ঘটল।

একটি প্রৌঢ়া মহিলা এসে প্রশ্ন করলেন, "এই যে বীরেশ্বর, শুনলেম কাল সন্ধ্যে থেকে না কি কেবল সিনই আঁকছ !"

মহিলার শ্বশ্রূকুলে পোষাকী ও পিতৃকুলে আট-পৌরে নাম কিছু একটা অবশ্যই ছিল এবং আছে। সে বোধ হয় একমাত্র তিনি ছাড়া আজ আর কেউ মনেও আনতে পারে না। ঘরে বাইরে সর্বত্র বর্তমানে তাঁর এক ও অনন্য পরিচিতি—"মান্নামাসি।"

বীরেশ্বর মুখ তুলে বললেন, "হ্যাঁ, মান্নামাসি। প্রথম অঙ্কের সুন্দর সেটটা হঠাৎ ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেল। সেটা ফের নতুন করে আঁকতে হলো।"

"সারা রাত জেগে বসে ছবি আঁকলে ? ধন্যি তোমার ধৈর্য আর উৎসাহ।"

"অন্য উপায় ছিল না, মিসেস সেন বেচারী এমন মুষড়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া তৎক্ষণাৎ নতুন করে আঁকতে না বসলে আজ এতক্ষণে শেষও হতো না।"

একটু বক্র হেসে মান্নামাসি বললেন, "ওঃ তাই নাকি ? সত্যি তো মিসেস সেনকে মুষড়ে পড়তে দেখলে তোমরা ছেলেরা কি আর স্থির থাকতে পার ? দেখ বীরেশ্বর, তোমার মা আমার দিদির পিসশ্বাশুড়ী হতেন, তোমাকেও এই এতটুকু কাল থেকে দেখে আসছি ; আমাদের নেহাৎ আপনার জনই মনে করি, তাই বলছি। নাটক করছো কর। কিন্তু ঐ মিসেস সেনটির কাছ থেকে সাবধান।"

মান্নামাসির মন্তব্যের তাৎপর্য বীরেশ্বরের কাছে অজ্ঞাত। তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই মান্নামাসি বললেন, "সেই যে ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি কামাক্ষ্যায় না কি

পুরুষ মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখে, এও যেন তাই। ওর কাছ থেকে একটু দূরে দূরেই থেকো।”

“আপনি কী বলছেন?”

“ঠিকই বলছি। কানেও তুলো দিই নি, চোখেও ঠুলি পরি নি! জানি সবই। নাম করবো না, কিন্তু যারা ডুবেছে তাদেরও দেখেছি, যারা ডুবতে বসেছে তাদের দেখছি। কিন্তু তাদের যেমন-তেমন। তোমার যে ঘরে স্ত্রী পুত্র আছে। তুমি বেশী কাছে ঘেঁষো না যেন।”

উত্তরে বীরেশ্বর কিছু বলার পূর্বেই বেয়ারা এসে সংবাদ দিল, “হুজুর, টেলীফোন।”

“কার, আমার?” বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

“জী, হুজুর আপকে ঘরসে টেলীফোন আয়া হৈ।”

“ঘরসে টেলীফোন!” অর্থাৎ সুবালা। বীরেশ্বরের স্ত্রী।

বীরেশ্বর শঙ্কিত হলেন। শঙ্কা অহেতুক নয়। কাল বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন বেলা সাড়ে চারটায়। বলে এসেছিলেন, ফিরতে একটু রাত হতে পারে। আজ সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। চব্বিশ ঘণ্টার কাছাকাছি। এখনও বাড়ি যাওয়া হয় নি। নিজের অপরাধের গুরুত্বে বীরেশ্বর নিজের কাছেই সঙ্কোচ বোধ করলেন।

সংসারে কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে বিপদ এই যে, অপরের কর্মদক্ষতার উপরে তাদের আস্থা কম। সমস্তটাই স্বহস্তে সমাধা না করতে পারলে তাদের মন খুশি হয় না। ক্লাবের দুটি সদস্যা—মিনতি ও ডলী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা আছে। দৃশ্যপট চিত্রণে বীরেশ্বরের সহযোগিতা করতে তাঁরা দুজনেই উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু কোনো কিছুই সম্পূর্ণরূপে তাঁদের হস্তে ন্যস্ত করার মতো নির্ভরতা নেই বীরেশ্বরের। তিনি কখনও বা মিনতির হাত থেকে তুলি কেড়ে নিয়ে আঁকতে বসেন ফুলের মঞ্জরী, কখনও বা ডলীকে সরিয়ে দিয়ে উইংসে লাগাতে শুরু করেন সবুজ রংএর ওয়াশ্। ফলে পরিশ্রমের পরিমাপ বিভক্ত হয়ে লঘু হওয়ার অবকাশ পায় না পুঞ্জীভূত হয়ে কেবলি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

স্টেজের বহির্দেশে যবনিকার দুই পার্শ্বে ঘন কৃষ্ণ মখমলের উপরে কোনারকের সূর্যমন্দিরের রথচক্রের অনুকরণে রুপালী জরির দুটি চক্র রচনার পরিকল্পনা বীরেশ্বরের। চক্র দুটির কেন্দ্র থেকে দুলিয়ে দেওয়া হবে তুষারশুভ্র একজোড়া চাঁদমালা। নীচে থাকবে দুটি আম্রপল্লববাহী পূর্ণকুম্ভ। শুভকর্মের চিরপরিচিত শাস্ত্রসম্মত মাঙ্গলিক। সেই মঙ্গলঘট দুটি আলিম্পনের ভঙ্গিতে সযত্নে সুচিত্রিত করছিল ডলী।

বীরেশ্বর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

“মিস দত্ত, আপনার হাতে কী? মঙ্গলঘট? না, না, এ লাইনটা অত সরু নয়। আচ্ছা, দিন আমাকে, দেখিয়ে দিচ্ছি।” বলে নিজেই তুলি নিয়ে বসে পড়লেন। দেখিয়ে দিতে বসলেও সেটা একেবারে শেষ না করে যে উঠবেন না সে কথা সবারই জানা আছে।

টেলীফোনের দিকে যেতে যেতে আপন মনে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আপন বিবেক গ্লানিমুক্ত করার প্রয়াসী হলেন বীরেশ্বর। কাল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় তিনি কিছু ভাবেন নি যে, রাত্রিতে বাড়ি ফিরতেই পারবেন না। কী করে ভাববেন? সমুদ্র-

সৈকতের দৃশ্যপটটি যে কর্মকর্তাদের অনবধানতায় অমন ভাবে ছিঁড়ে নষ্ট হবে, তা কি কেউ আগে কল্পনা করেছিল ? সেখানা যে নতুন করে আঁকতে হবে তা কি তিনি জানতে পেরেছিলেন ? হাত গুনতে তো আর জানেন না। হুঃ, কাল রাত্রিতে তক্ষুণি আঁকা শুরু না করলে আজ অভিনয়ের আগে তা শেষ হতো কি না ! মিনতি, ডলী হাজার হোক ছেলেমানুষ, তাদের ভরসায় কি সেটা ফেলে রাখা চলে ?

হ্যাঁ, সুবালাকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কাল রাত্রিতে ব্যস্ততার মধ্যে সেটা ভুল হয়ে গিয়েছে। অন্যায়ই হয়েছে। কিন্তু আজ সকালে কী একবার চেষ্টা করেন নি ? দশ মিনিটের চেষ্টায় টেলীফোনের যে রং নাম্বার পেয়েছেন সে কি তাঁর দোষ ? কে না জানে যে, কলকাতার টেলীফোনে পনর মিনিটের আগে একটা লাইন পাওয়া যায় না ! পাওয়া গেলেও ভুল নম্বর। রিসিভার তুলেই একেবারে যে ঠিক লাইনটি পায় সে তো নিশ্চিন্ত মনে সেণ্টলেজারের টিকিট কিনলেও পারে !

"হ্যালো, কে, সুবালা ? হ্যাঁ, আমি কথা বলছি। দেখ, কাল রাত্তিরে এখানে"—বীরেশ্বর গৃহে প্রত্যাগমনের বিঘ্ন সবিস্তারে বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন।

সুবালা বাধা দিয়ে বললেন, "প্রিমিয়র কোম্পানী থেকে লোক এসেছিল। বললে, তাদের ডিজাইনটা কাল চাই-ই।"

"কাল ? আচ্ছা, ওটা তো প্রায় হয়েই আছে। একটা শুধু ফিনিশ্ দিয়ে দেওয়া বাকী। দশ মিনিটের কাজ। আমি তোমাকে কাল রাত্তিরে খবর—"

"আর নিউ বুক কোম্পানী ফোন করেছিল। তাদের ওখানে আজ কিম্বা কালের মধ্যে যেতে বলেছে, খুব জরুরী।"

"কাল যাব'খন। আজ সকালে তোমাকে—হ্যালো, হ্যালো,"—ঐ যাঃ, বোধহয় লাইন কেটে দিয়েছে। "হ্যালো মিস্, হ্যালো, হ্যালো"—বীরেশ্বর টেলীফোনটা ফ্লাশ্ করতে শুরু করলেন। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।

বৃথা চেষ্টা। আজকাল কি আর টেলীফোনে কথা বলার জো আছে কারো সঙ্গে ? গভীর বিরক্তির সঙ্গে বীরেশ্বর রিসিভারটা রেখে দিলেন।

মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন বীরেশ্বর। কাল বিকেল থেকে আজ এতক্ষণ পর্যন্ত গৃহে অনুপস্থিতির অপরাধে সুবালা যদি বিক্ষোভ প্রকাশ করতেন, এমন কি কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করতেন তবে যেন বীরেশ্বর আশ্বস্ত হতেন। তা' হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের অন্ততঃ একটা প্রয়াস করা যেতো। সুবালা সে প্রসঙ্গ অবতারণার অবকাশ মাত্র দিলেন না।

এই সুবালার রীতি !

দুধের ঘনত্ব বৃদ্ধি দ্বারা তার পরিমাণে ঘটে হ্রাস। নামেরও সংকোচন হয় অনুরাগের আধিক্যে। হৃদ্যতা ও স্নেহাধিক্যের ফলেই বিনোদ বিনুতে এবং শ্রীলতা লতায় পরিণত হয়।

যে-মেয়েটির উপরে মলী সেনের সজ্জাকক্ষের সমুদয় ব্যবস্থাপনার ভার, তার নামটিও স্নেহানুরক্তগণের নিকট সম্ভাষণে সুধীরা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে হয়েছে,

—ধীরা।

সম্পর্কে ধীরা মলী সেনের ভাগিনেয়ী। শিবনাথের এক মামাতো বোনের মেয়ে। গত বৎসর বেথুন থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। তাকে ফর্সা বলা কঠিন, দেহ-সৌষ্ঠবেও নিখুঁত নয়। কিন্তু মুখে বুদ্ধিদীপ্ত এমন একটি স্নিগ্ধ লাবণ্যের আভাস আছে যা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপ না থেকেও রমণী যে রমণীয়া হতে পারে ধীরা তারই দৃষ্টান্ত।

মেয়েটি মলী সেনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। স্কুলে নীচের ক্লাসের ছাত্রদের প্রায় প্রত্যেকেরই একজন আদর্শ হিরো থাকে। কারো বিদ্যাসাগর, কারো নেতাজী, কারো বা ফুটবলার কিম্বা সিনেমা স্টার। ধীরার আছে মলী সেন। তার কলেজের সহপাঠিনী থেকে শুরু করে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে মলী মামীর রূপ, গুণ, বিদ্যা ও বুদ্ধির বিস্তারিত বিবরণ অন্ততঃ বার পাঁচেক শোনে নি।

অনুরাগ ও অনুসরণের বিচারে ধীরা প্রায় ভক্তের পর্যায়ে পড়ে। বৃহৎ বিষয়ের সঙ্গে ক্ষুদ্রের তুলনা যদি ক্ষমার্হ হয় তবে বলা যেতে পারে,—বুদ্ধদেবের যেমন আনন্দ, মহাত্মা গান্ধীর যেমন বিনোবা ভাবে, মলী সেনের তেমনি ধীরা। মলী সেনের সাজসজ্জা, রুচি, মতামত এমন কি কথা বলা থেকে শুরু করে চলার ভঙ্গীটি পর্যন্ত ধীরা অনুকরণ করে থাকে। কোনো কাজে গভীর মনোনিবেশকালে গলার সূক্ষ্ম স্বর্ণহারটি দুই ওষ্ঠাধরের মধ্যে চেপে ধরার অভ্যাস আছে মলী সেনের। মাতুলানীর এই মুদ্রাদোষটি পর্যন্ত ভাগিনেয়ীর চরিত্রে সযত্ন চেষ্টা দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রীতিটা উভয়তঃ। মলী সেনও ধীরাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। শনিবারে কলেজের শেষে প্রায়ই নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখেন। সোমবারে গাড়ী দিয়ে আবার কলেজে পৌঁছে দেন। দু' একটা পার্টি, পিক্‌নিকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যান। জামা, জুতা, সেণ্ট প্রভৃতি উপহার দেন যখন তখন।

কতবার শাড়ি কিনতে গেছেন মার্কেটে। নিজের জন্য। সঙ্গে ছিল ধীরা। সে বলেছে "এই শাড়িটা চমৎকার, এটা কেনো মলী মামী।"

মলী সেন জিজ্ঞাসা করেছেন, "এটা তোর কাছে ভালো লাগছে ? আচ্ছা বেশ তোর জন্য নিচ্ছি।"

ধীরা অপ্রতিভ হয়ে বলেছে, "না, না আমার জন্য নয় ; তোমার জন্য কিনতে বলছি।"

"আচ্ছা আপাততঃ তোর জন্যই কিনছি, আমাকে না হয় দু' একদিন ধার দিস পরতে।"

ধীরা মনের চাঞ্চল্য যথাসাধ্য দমন করে বলেছে "বা রে, তোমাকে যে-শাড়িতে মানায়, আমার গায়ে তা কেমন দেখাবে ?"

"খুব খাশা দেখাবে। নে, বাড়ি গিয়ে আবার মাকে যেন দেখাসনে। সে আমাকে কষে বকুনি দেবে।"

সেটা মোটেই সত্য নয়। বকুনি ধীরার মা দেন না। ধীরার বাবা দু' একবার মৃদু স্বরে আপত্তি করেছেন স্ত্রীর কাছে। "বৌঠান বড় মানুষ, টাকার ছড়াছড়ি। কিন্তু আমাদের কি এতটা নেওয়া ঠিক ? পূজা-পার্বণে ভালোবেসে দু' একটা উপহার দেন, সে এক কথা ; আর ফি মাসেই শাড়ি দিচ্ছেন, জামা দিচ্ছেন সে অন্য ব্যাপার।

শিবুদা'ই বা কী ভাবছেন কে জানে ?"

মেয়ের মা সে কথায় কান দেননি। তিনি মেয়েমানুষ, সাংসারিক বুদ্ধি স্বভাবতঃই প্রখর। ধীরাকে মলী সেন স্নেহ করেন, সে তো লাভেরই কথা। এই তো আরো কত মেয়ে কলেজে পড়ে। তাদের মায়েরা দুঃখ করে বলে, খরচের আর পার নেই, মেয়ের জামা-কাপড়ের নিত্য নতুন ফ্যাশানের দায়ে প্রাণ যাওয়ার দাখিল। ধীরার জন্য আজ পর্যন্ত তাঁকে কখনও ভাবতে হয়েছে ? নতুন উপহারের কথা ছেড়েই দাও। মলী সেনের নিজের ব্যবহৃত শাড়িই কী ধীরাকে তিনি কম দিয়েছেন ? ফী মাসেই নতুন শাড়ি কেনা মলী সেনের একটা সখ যেমন ফি সপ্তাহে সিনেমায় যাওয়া অবিবাহিত পুরুষের। অথচ একটা শাড়ি বারকয়েক পরিধানের পরেই আর আকর্ষণ থাকে না তার প্রতি। ধীরাকে দিয়ে দেন। ধীরা না থাকলে নিশ্চয়ই অন্য কাউকে দিতেন। আলমারী বোঝাই করে আর কতদিন রাখতে পারতেন ? তা' ছাড়া ধীরার বিয়ের কথাটাও তো একবার ভাবতে হবে। টাকা লাগবে না তখন ? মামীর করুণা অক্ষুণ্ণ থাকলে সে সময়েও অনেক সুরাহার সম্ভাবনা।

অকাট্য যুক্তি।

বাবার মুখ বন্ধ হয়।

মামীর সজ্জাবিন্যাসের ভার যে ধীরা সানন্দে এবং সাগ্রহেই গ্রহণ করেছে, সে কথা উল্লেখ না করলেও চলে।

এ বাড়ীতে কক্ষের অভাব নেই। ঠাকুর দালানে যেখানে স্টেজ তৈরী হয়েছে তার পিছনে ও দু'পাশে একটা করে মাঝারি ধরনের কুঠরি। সেগুলি অভিনেতা অভিনেত্রীদের সজ্জাকক্ষরূপে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। বাঁ দিকের ঘরটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মহিলাদের প্রসাধন ও সজ্জাপর্ব অধিকতর ব্যাপক এবং সময়সাপেক্ষ। উপচার উপকরণও অনেক। সুতরাং সেটি তাঁরা দখল করবেন। বিপরীত দিকের কক্ষটি পুরুষ অভিনেতাদের পোষাক পরিবর্তনের স্থান।

পূর্ববর্তী অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতায় মলী সেন জানেন, এ-সব সৌখীন অভিনয়ে স্টেজে অনাবশ্যকরূপে ভীড় জমে। রঙ্গাবতরণকারিণীদের চাইতে নেপথ্যচারিণীর সংখ্যা বেশী হয়। অভিনেত্রীদের আত্মীয়া ও সখীদের উপস্থিতিতে বেশ পরিবর্তনের স্থানগুলি জনাকীর্ণ থাকে। ফলে সবারই পক্ষে নিশ্চিন্ত নিভৃতে আপন অঙ্গরাগে মন দেওয়া কঠিন হয়। দুরূহ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে অভিনেতা অভিনেত্রীদের পক্ষে যে একটি উত্তেজনাহীন শান্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে, তারও আর কিছুমাত্র সুযোগ মেলে না। তাই মলী সেন এবার নিজের জন্য পৃথক একটি কক্ষ নির্দিষ্ট রেখেছেন।

ধীরা মলী সেনের বেশবিন্যাসের সমুদয় উপকরণ একে একে সজ্জা-কক্ষটির যথাস্থানে সাজিয়ে রাখছিল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে দ্বারের পানে তার দৃষ্টিক্ষেপ ও হাত ঘড়িটার প্রতি তাকানো থেকে একথা অনুমান করা কঠিন নয় যে, সে কোনো এক জনের আগমন প্রত্যাশায় আছে।

"কী করছ ?" বলে একটি তরুণ প্রবেশ করল কক্ষে।

ধীরার কাছ থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

"খুব ব্যস্ত না কি ?" পুনরায় প্রশ্ন করল আগন্তুক। কিন্তু উপস্থিত অপর

ব্যক্তিটি সেই দণ্ডে ড্রেসিং টেবিলের প্রসাধন সামগ্রীগুলি নিয়ে এমনই ব্যাপৃত হয়ে পড়ল যে, মনে হয় পাউডারের কেস বা নেইল পলিশের শিশিটা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ নেই তার। এমন কি, প্রশ্নগুলি যে সে শুনতে পেয়েছে, তারও কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তার আচরণে।

যুবকটি মৃদু হেসে কৌতুকের স্বরে বলল, "চিনতে পারছ কি? আমার নাম শ্রীসমীরচন্দ্র গুপ্ত। পিতা মৃত অধরচন্দ্র গুপ্ত, নিবাস লাহোর, হাং সাং-১৭ নম্বর মহেশ মিত্র লেন, পোস্ট আপিস বিডন স্ট্রীট, থানা—"

অত্যন্ত নীরসকণ্ঠে ধীরা উত্তর করল, "চিনতে পারলেই বা চেনার দরকার কী?"

সমীর অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, "আমার অনেকটা দেরী হয়ে গিয়েছে। এখানে যে পাঁচটার সময় আসতে হবে সেকথা ভুলেই গিয়েছিলেম। রাগ করো না লক্ষ্মীটি।"

এ কৈফিয়তে ক্রোধ শান্ত হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। ভুলতে পারাটাই যে সবচেয়ে বেশী অমার্জনীয় অপরাধ। তীব্র অভিমানে ধীরার হৃদয় পীড়িত হলো। সমীরের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে অত্যন্ত ঔদাসকণ্ঠে বলল, "না, রাগ কিসের?"

সমীর কাছে এসে ধীরার হাত ধরে বলল, "আমার অন্যায় হয়েছে, মাপ করো।"

ধীরা সজোরে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, "আঃ, ছাড়ো বলছি। কেউ দেখলে কী ভাববে? উঃ, লাগছে। ছাড়ো, ছাড়ো।"

সমীর ধীরার হাতখানা আপন মুষ্টি থেকে মুক্ত করে দিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি লেগেছে কি?"

"না, লাগবে কেন? আমার হাতটা তোমার স্প্রিং-ডাম্বেল কি না যে, গায়ের জোরে চাপবে। যা ষণ্ডামর্কের মত এক একটা আঙ্গুল তোমার।"

"সত্যি, আমি একটা জন্তু।"

সমীরের মুখে অনুতাপের ছায়া দেখে মুহূর্তে ধীরার অভিমান দূর হলো। হেসে বলল, "ইস্, বিনয় করা হচ্ছে দেখছি। জন্তু নয় তো কী? জন্তুর চাইতেও বেশী। জন্তুদের বন্ধু নন্তু-বাবু। তা দেখুন নন্তু-বাবু ফের যদি কখনও এমন দেরী হয়, তবে জন্মের মতো আড়ি হবে কিন্তু।"

সন্ধি হয়ে গেল। শীতের কুয়াশান্তে শিশিরার্দ্র ঘাসের উপরে মৃদুতাপ সূর্যালোকের মতো প্রীতিরসে ছেয়ে গেল দুটি প্রথম প্রণয়মুগ্ধ তরুণ-তরুণীর সুনিবিড় সান্নিধ্য, তাদের কপট কলহ-কাকলি-মুখর নিভৃত সাক্ষাৎ।

ধীরা বলল, "আর পাঁচ মিনিট আগে এলেই মলী মামীকে দেখতে পেতে।"

সমীর ঠাট্টা করে বলল, "তোমার মলী মামী কি কুতুবমীনার, না, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, যে দেখতে আসতে হবে?"

"আহা, অত ঠাট্টা করতে হবে না। সত্যি বলছি, মলী মামীর সঙ্গে একবার আলাপ করলে দেখবে, যা বলেছি এক বর্ণও বেশী নয়।"

"কিন্তু আলাপ করেও তোমার মতো যদি অষ্টপ্রহর তাঁর নাম না জপ করতে পারি, তবে শেষে রাগ করো না যেন।"

ধীরা রেগে বলল, "হয়েছে, হয়েছে। আমি না হয় মলী মামীর নাম জপ করি। আর তুমি? ডন ব্র্যাডম্যান, লেন হাটন্ আরও ঐ রকম কি সব বিলাতী দেবতাদের নামে যে ঘুমের ঘোরেও চেঁচিয়ে ওঠ, সে বুঝি আর আমি জানিনে? একবার

দেখই না মলী মামীকে, মুণ্ডু ঘুরে যাবে।"

সমীর কপট গাম্ভীর্যে দু'হাত দিয়ে নিজের মাথাটাকে এদিকে ওদিকে নাড়া দিয়ে বলল, "মাথাটা বেশ শক্ত বসে আছে কাঁধের ওপরে। 'বেশী ঘুরতে পাবে না।"

সমীরের ভঙ্গি দেখে ধীরা কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, "জানো, মান্নামাসি বলেন, মলী মামীকে দেখলে পুরুষ মানুষের নাকি কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আসলে মান্নামাসি মলী মামীকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। আড়ালে গাল দিয়ে বলেন,—ছেলেধরা। তাঁর মেয়ের সঙ্গে যে দু'-একটি ছেলের বিয়ের কথা হয়েছে তাদের—, এই রে! নাম করতে না করতেই, এদিকে আসছেন। চল, চল ওদিকে পালাই। আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবেন না।"

মলী সেন শিবনাথকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তিনি এসে প্রশ্ন করলেন, "আমাকে কী দরকার?"

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যোগ্য প্রশ্নই বটে!

কিন্তু মলী সেন সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে সহজ কণ্ঠেই বললেন, "দৈনিক বিশ্ববার্তার ফটোগ্রাফার আসবে এক্ষুণি। একটা ফটো নিতে চায়।"

"ফটো? কার, আমার?"

"হ্যাঁ, তোমার এবং আমার।"

ব্যাপারটা শিবনাথের কাছে কিছুমাত্র স্পষ্ট হলো না।

বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে স্ত্রীর পানে তাকাতেই মলী সেন ব্যাখ্যা করলেন, "বিশ্ববার্তা আমাদের এই সাহায্য রজনীর খবর খুব ফলাও করে ছাপছে। কাল অভিনয়ের রিভিউর সঙ্গে ছাপবার জন্য অভিনেতা, অভিনেত্রী ও উদ্যোক্তাদের কয়েকখানা ছবি নিতে চায়। তাদের নিজেদের ফটোগ্রাফার আসবে এক্ষুণি।"

মলী সেনের উদ্যোগে এই নাট্যানুষ্ঠানের প্রতি বিশ্ববার্তার এই বিশেষ মনোযোগের অবশ্য একটু সবিশেষ হেতু আছে।

বিশ্ববার্তার সম্পাদককে আমন্ত্রণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে। প্রতি সপ্তাহেই তিনি শহর ও শহরতলীর একাধিক সভাসমিতির হয় সভাপতিত্ব নয় তো উদ্বোধন করে থাকেন। ছাত্রদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী, বৃদ্ধদের বৈষ্ণব সম্মেলন, তরুণদের সাহিত্য সভা, হ্যানিম্যান স্মৃতি বার্ষিকী, পঞ্জিকা সংস্কার বা নিখিল বঙ্গ সংগীত সমিতির অধিবেশন প্রভৃতি সর্বত্র তাঁর সমান গতিবিধি। প্রত্যেকটিতে তাঁর সমান ওজস্বিনী বক্তৃতা। সভার উদ্যোক্তারা খুবই খুশি হয়। সারগর্ভ ভাষণের জন্য নয়, প্রচারসাফল্যের জন্য। পরদিন সম্পাদকের নিজ কাগজে ডবল কলাম হেডিংএ বক্তৃতার সঙ্গে সভার যে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়, সেটা যথাস্থানে ছাপা হলে কলাম ইঞ্চি দরে স্থূল অঙ্কের বিল মেটাতে হতো।

অবশ্য এই উদ্বোধনের ব্যাপারটা কেন্দ্র করেই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর মতবিরোধের উদ্ভব হয়েছিল।

বিপদ এই যে, সংবাদপত্র জগতে বিশ্ববার্তার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে এবং তার সম্পাদকেরও অনুরাগী লোকের অভাব নেই। ফলে সভাপতির আসন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিরোধীদলের মুখপাত্র বলল, "বিশ্ববার্তার সম্পাদককে ডাকা ভুল হয়েছে।"

অপরপক্ষ তা মানতে রাজী নয়। তাদের জবাব,—"ভুল যে নয় তা বুঝতে পারবে অভিনয়ের পরদিন বিশ্ববার্তা দেখলে।"

"সে সঙ্গে 'নবীন ভারতটা'ও দেখব তো? বিশ্ববার্তা যেমন ফলাও করে বিবরণ ছাপবে, নবীন ভারত তেমনি তার নামটুকুও উল্লেখ করবে না।"

"কেন? তাদের রিপোর্টারকে কম্প্লিমেন্টারী টিকিট দিই নি?"

"ওঃ, তা হলে আর কি? একেবারে নবীন ভারতের মাথা কিনে বসে আছ। রিপোর্টারদের ডেকে কী হয়? তাদের রিপোর্ট তো হবে চার পাঁচ লাইন। কাগজের এক কোণে স্থানীয় সংবাদ বা আবহাওয়া খবরের নিচে ছাপা হবে। কারও চোখেও পড়বে না।"

"তা হলে আর কি করা যাবে? নবীন ভারতে না হয় না-ই বেরুবে।"

"না-ই বেরুবে? নবীন ভারতের সার্কুলেশান জান?"

বিশ্ববার্তার বন্ধু ব্যাঙ্গস্বরে বলল, "সার্কুলেশান যাই হোক, পাঠক কারা? নবীন ভারত তো বেশী কেনে শুনেছি দোকানীরা। পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশী, পরের দিন প্যাকেট বাঁধার কাজে লাগে।"

"আর তোমার বিশ্ববার্তার বিক্রি বুঝি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে? নবীন ভারতের সম্পাদককেই আমাদের অনুষ্ঠানে ডাকা উচিত ছিল এ কথা আমি হাজার বার বলব, তাতে মিসেস সেন খুশি হোন আর নাই হোন।"—বলে নবীন ভারত-সেবক মলী সেনের পানে তাকাল।

মলী সেন বললেন, "আমি একটুও অখুশি হই নি, সতীশ বাবু। আমাদের এ সব ব্যাপারে যত বেশী পত্রিকার সহায়তা পাওয়া যায় ততই ভালো! পাবলিকের কাজে পাবলিকের সহানুভূতি না পেলে চলবে কেন? আর প্রেস পাবলিসিটি না হলে কি আজকাল লোকের সমর্থন মেলে? বিশ্ববার্তার সম্পাদককে ডাকা হয়েছে। নবীন ভারতের সম্পাদককেও ডাকলে ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি নেই। কিন্তু অসুবিধা আছে।"

সম্পাদকেরা তো একজন সাধারণ শ্রোতা বা দর্শক হিসাবে সভা সমিতিতে আসতে পারেন না। বিশেষতঃ এক সম্পাদক যে সভায় বিশেষ একটি অনুষ্ঠান সম্পাদনের মার্যাদা নিয়ে আসছেন তাতে অপর সম্পাদকের নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি কল্পনা করাও অসম্ভব। অথচ একই সভার দু'জন উদ্বোধনকর্তাও সম্ভব নয়। গৌরবে বহুবচন ব্যাকরণে আছে বটে, জীবিত ব্যক্তির বেলায় তো তা হওয়ার উপায় নেই।

মলী সেনই মীমাংসা করলেন সমস্যার। পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী বিশ্ববার্তার সম্পাদক করবেন উদ্বোধন। নবীন ভারতের সম্পাদককেও আমন্ত্রণ করা হলো। তিনি হবেন প্রধান অতিথি—গেস্ট ইন চীফ।

এ সকল নেপথ্য-তথ্য শিবনাথের জানা ছিল না। ফটো তোলার প্রস্তাবে বিস্মিত

হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ফটোর কী প্রয়োজন? তোমাদের অভিনয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?"

"নেই তা জানি। কিন্তু সম্পর্ক রাখলে দোষ কী?"

"দুর্গতদের দোহাই দিয়ে আনন্দ করায় আমার রুচি নেই।" বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই শিবনাথের কণ্ঠে কিছুটা উত্তাপের আভাস ছিল।

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "দুর্গতদের দোহাই না দিয়ে শুধু আমোদের জন্যই নাটক করলে তুমি তাতে খুশি হয়ে যোগ দিতে? দেখ, আমার কোনো ব্যাপারেই তোমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, তোমার কোনো কাজেও আমার কোনো উৎসাহ নেই—এ তো দু'জনের কারোরই জানতে বাকী নেই। আজ নূতন করে তা নিয়ে তর্ক করা পন্ডশ্রম। এই অভিনয় আয়োজনে তোমার যোগ নেই, এতে আমি দুঃখিত নই। অনুমান করছি, মনোবেদনায় তোমারও বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে না। কিন্তু ফটো তোলাতেই বা এত আপত্তি কিসের? কাল কাগজে তোমার ও আমার ছবি এক সঙ্গে ছাপা হলেই কেউ কিছু মানহানির মামলা দায়ের করবে না।"

"না তা করবে না, কিন্তু—"

শিবনাথের বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই ফটোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন সুরেন লাহিড়ী। সাহিত্যিক। অন্ততঃ তিনি নিজে তাই মনে করেন। করাটা বোধ করি খুব অন্যায়ও নয়। বাংলা দেশে এমন সাপ্তাহিক, মাসিক, পূজা সংখ্যা ও বিশেষ সংখ্যা কমই আছে যাতে সুরেন লাহিড়ীর কবিতা, প্রবন্ধ বা গল্প প্রকাশিত না হয়। এখানে চুপি চুপি বলে দেওয়া প্রয়োজন যে লাহিড়ী একটা নামজাদা ব্যাংক-এর পাবলিসিটি অফিসার অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বিতরণের কর্তা।

সামাজিক মার্যাদা বা অর্থ-গৌরবে লাহিড়ী মশায় ঠিক মলী সেনদের গোষ্ঠীতে নন। শুধু সাহিত্যিক পরিচয়েই তিনি সেখানে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। এই সাহায্য রজনীর প্রচার-সচিবের কাজ তিনি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দেই গ্রহণ করেছেন। বললেন, "এই যে আপনারা প্রস্তুত হয়েই আছেন। ইনিই বিশ্ববার্তার ফটোগ্রাফার। নিন মশাই, আপনার যে ক'খানা ফটো দরকার তুলে নিন।"

শিবনাথ যথাসাধ্য স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু সুরেনবাবু, আমার ছবি আবার কেন? আপনাদের অভিনয়ের পাত্রপাত্রীদের—"

"সে তো নেওয়া হবেই। আগে আপনাদেরটা হয়ে যাক। আপনারা হলেন জয়েণ্ট প্রডিউসরস। কাগজে আজকের এনাউন্সমেন্টটা দেখেননি বুঝি! প্রথম লাইনেই বড় বড় অক্ষরে লেখা, মিস্টার শিবনাথ এ্যান্ড মিসেস মলী সেন প্রেজেন্ট বেংগলী রোমান্টিক মিউজিক্যাল—'স্বপন কুহেলী'। হুঃ, আমার পাবলিসিটির স্টাইলই আলাদা। একেবারে বিলাতী কায়দা।" আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন সুরেন লাহিড়ী।

শিবনাথের হাতে একখানা সংবাদপত্র দিয়ে বললেন, "দেখুন একবার পড়ে, আজকের বিশ্ববার্তা কি লিখেছে।"

পত্রিকার পৃষ্ঠে লাহিড়ী কর্তৃক সযত্নে লাল পেন্সিলে চিহ্নিত অংশটুকুর উপরে শিবনাথ দ্রুত দৃষ্টি চালনা করলেন।

মলী সেনদের অভিনয় প্রচেষ্টার সুদীর্ঘ এককলম ব্যাপী সাধুবাদ। প্রথমে দুর্গতদের সাহায্যার্থে সম্ভ্রান্ত নরনারীর এই উদ্যম যে দেশের পক্ষে কতখানি আশা ও আশ্বাসের লক্ষণ সে সম্পর্কে বিস্তর বাগবিস্তার করে বিশ্ববার্তার নিজস্ব সংবাদদাতা বিশেষ ভাবে মলী সেনের গুণ কীর্তন করেছেন। বেশীর ভাগ ধনীগৃহের কর্মহীনা গৃহিণীদের মতো অলস বিলাস ব্যসনে সময় অতিবাহিত না করে জনকল্যাণ ও আর্তের সহায়তায় এগিয়ে এসে তিনি সমাজের সম্মুখে যে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা যেন অন্য মহিলারাও অনুসরণ করেন।

কিন্তু প্রশংসা একমাত্র মিসেস সেনেরই প্রাপ্য নয়। কারণ যদিও আজ সন্ধ্যায় অভিনয়ের কোনো ভূমিকায় মিস্টার সেনকে পাদপ্রদীপের সম্মুখে দেখা যাবে না, তবুও সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছেন যে, স্ত্রীর এই জনহিতকর উদ্যোগে মিস্টার সেনের উৎসাহ ও সহযোগিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের সর্ববিধ ব্যবস্থায় মিস্টার সেনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিপুল অর্থব্যয়ের উল্লেখ করে উপসংহারে তিনি লিখেছেন,

—"কলিকাতার শিল্প ও বাণিজ্য জগতের যাঁহারা সংবাদ রাখেন তাঁহারা সকলেই সেন ও দত্ত পরিবারের ব্যবসায়িক সম্মেলন, শিল্প জগতে বাঙালীর অতুল কীর্তি মেসার্স ডাট্ এ্যান্ড সেন (১৯৩০) লিমিটেডের অসাধারণ সাফল্যের কথা অবগত আছেন। এই দুই সম্ভ্রান্ত বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ যে সমাজের পক্ষেও কতখানি মঙ্গলজনক হইয়াছে তাহা বর্তমানে মিস্টার শিবনাথ সেন ও তাঁহার পত্নী মিসেস মলী সেন (ভূতপূর্ব দত্ত) তাঁহাদের সম্মিলিত বহু পরহিতজনক কর্মের মধ্য দিয়াই প্রমাণিত করিতেছেন। হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর প্রাচীন মহান আদর্শ এদেশ হইতে লুপ্ত হইতেছে বলিয়া যে-সকল মূঢ় সনাতনীরা সর্বদা আর্তনাদ করিয়া থাকেন তাঁহারা এই শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী সেন দম্পতিকে দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গর্বভরে লাহিড়ী বললেন, "পড়লেন সবটা? কী রকম? হুঃ, আমি যখন একবার পাবলিসিটির চার্জ নিয়েছি তখন, ও কী, আপনার মুখ চোখ এমন লাল হয়ে উঠল কেন, মিস্টার সেন? এতে লজ্জা পাবার কী আছে? চলুন বারান্দায়। এবার ফটোটা শেষ করে ফেলা যাক।"

অভিনয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের নিজস্ব মোটর নেই তাঁদের বাড়ি থেকে মেয়েদের গাড়ি পাঠিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছেন মলী সেন। বুকের কাছে সিল্কের রিবন আঁটা স্বেচ্ছাসেবিকারা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অভিনেতা, অভিনেত্রী ও উদ্যোক্তাদের কাছে থেকে প্রয়োজনীয় ঠিকানা নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করছিলেন।

বীরেশ্বর নিজ বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম লিখিয়ে দিলেন। কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত বোধ করলেন না। সুবালা নিজে উদ্যোগী হয়ে আসবে কি? সম্ভাবনা খুবই কম। কম কেন, একেবারে নেইই বলা যেতে পারে। বীরেশ্বরের সম্পর্কিত কোনো অভিনয়, প্রদর্শনী বা শিল্পানুষ্ঠানে আজ পর্যন্ত কোনো দিন সুবালাকে যোগ দিতে দেখা যায় নি।

বড়দিনের সময়ে বীরেশ্বরের চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে পরিচিত অপরিচিত নরনারীর ভীড় হয়েছে মিউজিয়মে। দৈনিক সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছেন চিত্র-সমালোচকেরা। প্রসিদ্ধ রসজ্ঞের দল সুখ্যাতি করেছেন প্রকাশ্য সভায়। একমাত্র নিস্পৃহ, নিরুৎসুক রয়েছেন সুবালা। শিল্পীর নিজের স্ত্রী। বন্ধু-বান্ধবের দল আগ্রহ ভরে নিয়ে যেতে চেয়েছে সঙ্গে করে। অসুস্থতা বা অন্য কোনো অপরিহার্য গৃহকর্মের অজুহাতে সুবালা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁদের নিমন্ত্রণ।

সেবার ফাইন আর্টস সোসাইটির এগজিবিশানে প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপালের স্বর্ণপদক পেলেন বীরেশ্বর। বিশেষভাবে আহূত সভায় সহরের শ্রেষ্ঠ গুণী, জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতি ও সঘন করতালির মধ্যে সে পদক গলায় পরিয়ে দিলেন প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী মহোদয়। স্বামীর এই সম্মান-সভায় সুবালাকে অনেক করে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সভার উদ্যোক্তাগণ। এমন কি, সোসাইটির সভানেত্রী লেডী সুধা ব্যানার্জী স্বয়ং পত্র দ্বারা বীরেশ্বরকে অনুরোধ করেছিলেন সস্ত্রীক উপস্থিত হতে।

নির্দিষ্ট দিনে সভাস্থলে বীরেশ্বরকে আসতে হলো একক। সেদিন সকাল বেলায়ই কী এক অপরিহার্য কারণে সুবালার শ্রীরামপুরে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটল। ছোট ভাই-এর বাড়ীতে। সেখান থেকে ফিরতে ট্রেন ফেল করলেন।

সুবালা যেন এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা। বীরেশ্বরের কাছে। গৃহকর্ম, সেবা, যত্ন ও পরিচর্যায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কৃতিত্ব রন্ধ্রহীন। যথাকালে হাতের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিষটি বীরেশ্বর পেয়ে আসছেন সর্বদা। ঘড়ির কাঁটার মতো নিঃশব্দ নিয়মে স্বামীর আহার, নিদ্রা, পোষাক, পরিচ্ছদ, আরাম, আয়েশের ব্যবস্থা করেন সুবালা অনলস ঐকান্তিকতায়।

আপিসের বরাদ্দ কাজের চাপে দিনের বেলায় নিজের কাজ করার সময় থাকে না বীরেশ্বরের। অথচ ব্যক্তিগত চিত্রাঙ্কনে অর্থাগম হয় প্রচুর। তাই প্রায় প্রত্যহই অনেক রাত অবধি জেগে বীরেশ্বর ছবি আঁকেন। সে-সময়ে এক পেয়ালা গরম কফি পেলে তিনি খুশি হন। ছাত্রাবস্থায় বরোদায় এই অভ্যাসের শুরু। কথাচ্ছলে বীরেশ্বর একদিন তার উল্লেখ করেছিলেন। তারপর থেকে ইজেলের পাশে একটি ছোট টিপাইতে নিয়মিত তার ব্যবস্থা হয়ে আসছে আজ সাত বছর। পেয়ালা, পিরিচ, ফ্লাস্কভর্তি গরম কফি, দুধ, চিনি। একদিনের জন্যও ব্যতিক্রম হয় নি।

রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট অস্ফুট অর্ধোক্তি করার অভ্যাস আছে বীরেশ্বরের। কে যেন সুবালাকে বলেছে, হাত বুকের উপরে চেপে রেখে ঘুমোলে দুঃস্বপ্ন থেকে এমন হয়। পুত্র নিয়ে সুবালা ঘুমোন এক ঘরে। বীরেশ্বরের শয্যা পৃথক কক্ষে। কিন্তু প্রতি রাত্রিতে অন্ততঃ একবার সুবালা এসে মশারি তুলে দেখে যান নিদ্রিত স্বামীর বাহু দুটি যাতে তাঁর বক্ষের উপরে ন্যস্ত না রয়। বীরেশ্বরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভবপর সর্বপ্রকার আয়োজনের প্রতি সুবালার অপলক দৃষ্টি।

তবুও উভয়ের পরিপূর্ণ যোগ নেই জীবনে। কোথায় যেন গ্রন্থি হয়েছে শিথিল, মর্মে রয়েছে শূন্যতা। বীরেশ্বর অনুভূতি দিয়ে তার আভাস পান অন্তরে কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তার নিশানা খুঁজে পান না।

অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হলে সুবালা স্বামীর সঙ্গে যাবেন নিশ্চিত।

পূজার ছুটিতে শিলং বেড়াতে গেলে বীরেশ্বরকে যেতে হয় একা। প্রতি বৎসরই কোনো না কোনো প্রতিবন্ধক দেখা দেয় সুবালার পক্ষে। পরিপাটিভাবে বীরেশ্বরের বাক্স গুছিয়ে দিতে দিতে বলেন আসছে বারে তিনি যাবেন। সেই প্রতিশ্রুত আগামী বৎসর আসে, যায়, বিলীন হয় বিগত বৎসরের বিস্মৃত অতীতে। স্বামীর সঙ্গে সুবালার দার্জিলিং, পুরী কিম্বা মধুপুর ভ্রমণ আর কিছুতেই হয়ে ওঠে না। যথাকালে যথারীতি বিশেষ কোনো অসুবিধা দেখা দেয় প্রায় অবধারিত রূপে। ছেলের এগজামীন, বোনের বিয়ে নয় তো বাড়ির অব্যবস্থা কিম্বা অন্য আর কিছু।

অভিনয়মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগারে যাতায়াতের সংকীর্ণ গলি-পথটায় নিখিলের সঙ্গে মান্নামাসির প্রায় মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, সংসারে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর লোককে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে হয়। যথা,—গরীব আত্মীয়, বীমার দালাল ও সার্বজনীন পূজার সেক্রেটারী। মান্নামাসি এর কোনটিই নন। তবুও নিখিল তাঁকে দেখলেই শঙ্কিত হন। চাণক্যশ্লোক নিখিলের ভালো পড়া নেই। কিন্তু মনে হয়, মান্নামাসিকে তিনি শৃঙ্গীনামের পর্যায়েই গণ্য করেন এবং শুধু শত নয়, প্রায় সহস্র হস্ত দূরে রাখতে চেষ্টা করেন।

এত কাছাকাছিতে না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অকস্মাৎ পিছন ফিরে প্রস্থানোদ্যোগ ততোধিক দৃষ্টিকটু। কী করবেন ভেবে স্থির করার পূর্বেই মুখে চোখে সৌজন্যের বন্যা বইয়ে দিয়ে মান্নামাসি বললেন, "এই যে, মিস্টার রয়, থিয়েটারের ব্যবস্থা নিয়ে কী পরিশ্রমটাই না করতে হচ্ছে আপনাকে! গৌরী বলে, 'মা, মিস্টার রয় শেষকালে একটা অসুখ বিসুখ না বাধিয়ে বসেন, আমার তো সে-ই ভয়'। মিথ্যে নয়—"

নিরুপায় নিখিল বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি মেয়েদের ড্রেসিংরুম থেকে আসছেন? সেখানে নীরজা আছে কি?"

"দেখি নি তো। তা'কে কী দরকার?"

"বেচারা হঠাৎ আছাড় খেয়ে হাত কেটে ফেলেছে। এই মাত্র স্টেজ ম্যানেজার বললেন, তাঁর কাছে ফার্স্ট-এইডের বাক্স আছে। ব্যাণ্ডেজ যদি বা না হয়, অন্ততঃ একটু আইওডিন দিয়ে দিলেও কাজ হতো। তাই তাঁকে খুঁজছিলেম।"

মান্নামাসি আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বললেন, "আচ্ছা, আমি দেখছি, নীরজা কোথায় আছে। কিন্তু এদিকে আমি যে যাচ্ছিলেম আপনারই সন্ধানে। গৌরী সেই কখন থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

গৌরী মান্নামাসির মেয়ে। বিবাহযোগ্যা।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "তাই নাকি? কেন বলুন তো?"

"তা তো বলেনি কিছু। তবে মনে হচ্ছে চা খাওয়ার জন্য।"

"সেজন্য আমাকে কেন?"

"তা জানেন না বুঝি? তা হলে খুলেই বলছি, মিস্টার রয়। অনেক বেলায় এখানকার রিহার্সেল থেকে বাড়ি ফিরে গেল। আমি বললেম, চান করে খেয়েদেয়ে

একটু ঘুমিয়ে নিতে, নইলে রাত্তিরে ক্লান্তি লাগবে, গানের গলা খুলবে না। ওমা, খানিক বাদে দেখি, মেয়ে রান্নাঘরে বসে শিঙ্গাড়া ভাজছে। কেন? না, মিস্টার রয়ের জন্য ফ্লাস্কে চা আর টিফিন বাস্কেটে খাবার নিয়ে যেতে হবে। থিয়েটারের বাড়িতে যা হৈ-হট্টগোলের ব্যাপার। সেখানে সময় মতো চা জুটবে কি না কে জানে।"

মান্নামাসিকে নিখিল এতদিনে অনেকটাই জেনেছেন। তাঁর এ ধরনের হৃদয়গ্রাহী রচনাশক্তির সঙ্গেও নিখিলের পরিচয় এই প্রথম নয়। তাই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করে শুধু সাধারণ ভদ্রতার ভঙ্গিতে বললেন, "মিসেস পাকড়াশী—"

বাধা দিয়ে অত্যন্ত আত্মীয়তার সুরে মান্নামাসি বললেন, "না, না, ঐ 'মিসেস পাকড়াশী'টা আপনাকে ছাড়তে হবে, মিস্টার রয়। ঐ দেখ, আমিই বা বলছি কাকে? তুমি তো নিজের পেটের ছেলের মতো, তোমাকে 'আপনি' বলা কি আমারই ভালো দেখায়? তা দেখ, নিখিল, তোমাদের ঐ সাহেবী কায়দায় মিস্টার মিসেসগুলো, আপিসে, ক্লাবেই বলো। আপনা-আপনির মধ্যে ও-সব কেন? এই তো সেদিন গৌরীও বলছিল, 'মা, মিস্টার রয় যে আমাকে সর্বক্ষণ মিস পাকড়াশী বলেন, আমার বড় সংকোচ লাগে। মনে হয় যেন ট্রেনের দু'জন পেসেঞ্জার, গাড়ির কামরায় আলাপ। যে যার স্টেশনে নেমে গেলেই শেষ।' না, বাপু, তুমি এখন থেকে আমাকে মান্নামাসিই বলো।"

"তা না হয় বলব। কিন্তু আমি বলছিলেম, মিস পাকড়াশী যে আমার জন্য এতখানি কষ্ট করছেন, সেজন্য তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবেন। কিন্তু আমার চা-এর দরকার নেই।" বলে নিখিল প্রস্থানোদ্যম করলেন।

মান্নামাসি ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, "সে তা'হলে তোমাকে নিজে এসে বলতে হবে, নিখিল। আমার বলায় হবে না।"

মরু-যুদ্ধে জার্মান সেনাপতির মতো প্রতিপক্ষের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশে আঘাত হানলেন মান্নামাসি। কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট গাম্ভীর্য আরোপ করে বলতে লাগলেন, "তুমি তো জান না, নিখিল, ঠিক সময়ে চা-এর পেয়ালাটি হাতে না পেলে গৌরী একেবারে নেতিয়ে পড়ে। মেয়ের আমার ঐ রোগ। নিজেই স্বীকার করে। বলে, 'দু'দিন ভাত না খেয়ে থাকতে বল, রাজী আছি। কিন্তু চা না পেলে বাঁচব না।' সেই গৌরী কিনা এই সন্ধ্যে অবধি চা না খেয়ে আছে।"

মান্নামাসি নিখিলের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু নিখিলের জন্য আপন কন্যার এই কৃচ্ছ্রসাধনের সকরুণ কাহিনী উপস্থিত শ্রোতার মনে অনুতাপের দাবানল সৃষ্টি করেছে এমন কোনো চিহ্ন সেখানে দেখা গেল না।

নিখিল পূর্ববৎ ভদ্রতায় শুধু বললেন, "আমি দুঃখিত।"

জেনারেল রোমেল রণকৌশল পরিবর্তন করলেন। শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "আমি সেই কখন থেকে বলছি, গৌরী, তুই চা-টা খেয়ে নে। মিস্টার রয়ের জন্য মিছে বসে থেকে মাথা ধরাসনে। তিনি হয়তো অন্য কোথাও চা খাচ্ছেন। তা মেয়ে কি শোনে। বলে 'না, মা, অমন কথাটি বলো না। মিস্টার রয়ের নাম করে এনেছি, তিনি না খেলে বরং বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে সব নর্দমায় ফেলে দেব।"

বৃথা। খোঁচাটা নিখিল যে শুধু অম্লানবদনে পরিপাক করলেন তাই নয়,

অধিকন্তু অকপট স্বীকৃতি দ্বারা কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকুকে আরও সুস্পষ্ট করে তুললেন। বললেন, "আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন মান্নামাসি। সাড়ে তিনটা বাজতে বাজতেই মিসেস সেন আমাকে চা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চা আর নয়। এখন এক পেয়ালা কফি চাই। সে-ও মিসেস সেন তৈরী করেছেন, বলে গেছেন। এখন তাঁর ওখানেই যাচ্ছি। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।"

ক্রোধে মান্নামাসির দুই কর্ণ তপ্ত, ললাট কুঞ্চিত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ত্বরান্বিত হয়ে উঠল। ক্ষোভে ও অপমানের জ্বালায় তিনি প্রথমে উত্তেজিত ও পরে ম্রিয়মান হয়ে গেলেন।

ছিঃ, ছিঃ, কী লজ্জা! এমন প্রকাশ্য অবজ্ঞা ও সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের কলঙ্ক তিনি আর কত কাল বহন করবেন? শুধু তো নিখিলই নয়। ইতিপূর্বে আরও কয়েকটি সম্ভবপর পাত্রের কাছেও তো তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

মান্নামাসি আর যাই হোন, একেবারে নির্বোধ নন। যোগ্য জামাতা সংগ্রহের ব্যগ্রতায় মেয়ের নাম করে তিনি যে-সকল কাহিনী রচনা করেন, শ্রোতাদের কাছে সেগুলি যে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না সে কথা তিনি নিজেও মনে মনে বোঝেন। কিন্তু উপায়ান্তর ভেবে পান না। তিনি ভুলে যান যে, এ যুগে যারা নিজেই নিজের পত্নী নির্বাচন করে তারা রূপকথার রাজপুত্রের মতো ভাটের মুখে গুণপনা শুনে রাজকন্যার গলায় মালা দেবে এমন সম্ভাবনা নেই। জনেন না যে, কোর্টশিপের মার্কেটই হচ্ছে একমাত্র বাজার যেখানে মিডলম্যান নেই। সে স্বয়ং কন্যার মা হলেও নয়!

কিন্তু এই ছেলেগুলিই বা কী? চোখ কান বলে কি কিছু নেই এদের? মান্নামাসি ভাবেন। এত পড়াশুনা করেও এক একটা যেন আস্ত হস্তীমূর্খ। কাণ্ডজ্ঞান বিন্দুমাত্রও নেই। এই যে নিখিল,—মস্ত এঞ্জিনীয়র, বিলাতী ডিগ্রী, বড় চাকরি। অথচ একটা অপদার্থ ফ্লার্ট মেয়েমানুষ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। তার হুঁশ আছে একটু! হুঃ, মিসেস সেনের কাছে কফি খেতে যাচ্ছেন! বলতে লজ্জা হল না একটু! পুরুষ জাতটা এমনি নির্লজ্জ বেহায়াই বটে! তাদের সংস্রব পুরোপুরি বর্জন করাই বিধেয়।

কিন্তু তার কি উপায় আছে? পুরুষকে বাদ দিলে আর যাই হোক, মেয়ের তো বর জোটে না। ভাবনা তো ঐখানে এবং সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, সে ভাবনাটা একা মান্নামাসিরই। আর কারো নয়। দুর্ভাবনাভারে বহু বিনিদ্র রজনীতে কন্যার নিশ্চিন্ত নিদ্রালস দেহের পানে তাকিয়ে তিনি সখেদে বাংলা প্রচলিত প্রবাদ-বিশেষ স্মরণ করেছেন। হায়, হতভাগা মেয়েটার যদি একটু নিজের হিতাহিত বোধ থাকতো! এই তো দত্তদের বিভা, নিজেই নিজের বিয়ে ঠিক করল। প্রীতি রায়, বেথুনে গৌরীর দু'ক্লাশ নীচে পড়তো; দেখতেও এমন কিছু আহা-মরি নয়। অথচ কেমন খাসা বরটি বাগাল!

আর গৌরী? কচি খুকিটি তো নয়—লোকের কাছে যতই কেন কমিয়ে বলে থাকেন, তিনি নিজে তো জানেন মেয়ের বয়স কত—একটু যদি তার নিজের উদ্যোগ থাকতো। না দেখাবে সে কোনো আগ্রহ, না করবে তেমন খাতির আপ্যায়ন; ছেলেরা কাছে ঘেঁষবে কী ভরসায়? তারা সন্ধ্যেবেলায় সিনেমা দেখতে বললে মেয়ে বলে

মাথা ধরে। বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে মেয়ে জবাব দেয়, ভালো লাগে না। তিনি নিজে চেষ্টা করে যে দু'একটি প্রার্থনীয় পাত্রকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন, তারা দু'চার দিন পরেই হতাশ হয়ে সরে পড়েছে। বোকা, নিরেট বোকা। হবে না কেন? যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে। ঠিক বাপের ধারা পেয়েছে।

রাগে ও বিরক্তিতে মান্নামাসির সর্বাঙ্গে যেন আগুনের জ্বালা ধরল।

কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। বাপের সঙ্গে গৌরীর মিল আছে অনেকখানি। সেটা মান্নামাসির পক্ষে রুচিকর নয়।

বাপ পরলোকে। বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে মান্নামাসির মনস্তাপের অবধি ছিল না। মৃত্যুর পরেও তাঁর স্মৃতি মনে সুখোদ্রেক করে না। বিবাহিত জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতার জন্য মান্নামাসি তার স্বামীকে কোনোকালে ক্ষমা করেননি। কোনোকালে ক্ষমা করবেনও না।

রূপার জোরে কুরূপা মেয়ে পার হওয়ার চির প্রচলিত পন্থায় মান্নামাসিও নিশ্চয়ই ধনবান পতি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তা হয় নি।

এ জগতে নিঃসম্বল দারিদ্রের আছে মহত্ত্ব, অমিতব্যয়ী ধনীর আছে ঔদার্য। ব্যয়কুণ্ঠ বিত্তবানের নেই কোনোটাই। সংসারে কৃপণ বড়লোকেরাই সব চেয়ে ভয়াবহ। মান্নামাসির বাবার কাছেও মেয়ের মায়ার চাইতে টাকার মায়া ছিল বেশী। অনেক দিন অপেক্ষার পর কন্যার যৌবন যখন উত্তীর্ণপ্রায়, খুঁজে পেতে তিনি সব চেয়ে সস্তায় যে পাত্র সংগ্রহ করলেন তাঁর না ছিল কাঞ্চন না ছিল কৌলীন্য।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ছাত্রজীবনে কৃতিত্বে সকলের শীর্ষস্থানে থেকে কর্মজীবনে বিফলতার গভীর তলদেশে গড়িয়ে পড়ে। জীবনের আকাশে তারা ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যাতারার মতো। রজনীর প্রথম প্রহরে সর্বাধিক ঔজ্জ্বল্যে দেখা দিয়ে মধ্য প্রহরে নিষ্প্রভতায় অগণিত তারকারণ্যে অলক্ষ্যে হারিয়ে যায়। মান্নামাসির স্বামী গৌরমোহন সেই জাতের।

ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় গৌরমোহন কখনও দ্বিতীয় হননি। ভবিষ্যতে তিনি জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আশু মুখুজ্যে, ব্রজেন শীল এমনই অসাধারণ কিছু একটা হবেন—এ সম্বন্ধে ছাত্রাবস্থায় তাঁর বন্ধুবান্ধব, মাস্টার, অধ্যাপক সবাই একমত ছিলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, শুভানুধ্যায়ীদের সকল ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি হলেন হাইকোর্টের—না, জজ নয়, একজন সাধারণ উকীল।

আসল কথা, গৌরমোহনের পাণ্ডিত্য যতখানি, সাংসারিক বুদ্ধি ততখানি নয়। তিনি অতি মাত্রায় লাজুক ও মুখচোরা গোছের লোক। কলেজের পরীক্ষার খাতায় কঠিন আইনের প্রশ্নের গবেষণাপূর্ণ জবাব লিখে যে পরীক্ষকদের চমৎকৃত করেছে, সামান্য একটা জামিনের আর্জি পেশ করতে সে যে কথা খুঁজে পায় না অথবা অসংলগ্ন উক্তি করে, তার দৃষ্টান্ত তিনি। হায়, ওকালতিতে তিনি রাসবিহারী ঘোষ হবেন বলে যারা শেষ আশা রেখেছিল, গৌরমোহন তাদেরও নিরাশ করলেন।

সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত পেলেন মান্নামাসি। ভবিষ্যতে বিপুল সাফল্যের দ্বারা স্বামী সকলের ঈর্ষা উৎপাদন করবেন, এই কল্পনা নিয়ে বিয়ের সময় মান্নামাসি তার শ্বশুরালয়ের ধনহীনতাকে খুব হৃষ্টচিত্তে না হলেও যা হোক এক রকম মেনে নিয়েছিলেন। সে সফলতার আশু লক্ষণ তো কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর নয়।

তবুও নিজের উদগ্র উচ্চাভিলাষের জোরে তিনি নিজেকে দমতে দিলেন না। স্বামীকেও না। বললেন, "দেশী উকীলদের কেউ পোছে না। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে এস.। পসার জমতে দেরী হবে না।"

গৌরমোহন ততদিনে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েছেন। বুঝেছেন, বাক্‌পটু না হলে আইন ব্যবসায় চলে না। উকীল থাকতে যার হাতে মামলা আসে না, ব্যারিস্টার হলেই তার দরজায় মক্কেলের কিউ জমে যাবে এমন সম্ভাবনা কোথায় ?

স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলেন "তার চাইতে বরং, বাগেরহাট কলেজে একজন ফিলজফীর লেকচারারের কাজ খালি আছে—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—"

দুই চক্ষে অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করে মান্নামাসি বললেন, "ছ্যা, শেষকালে নেতানো গুরুমশায় ? সেও আবার কলকাতার নয়, অজ পাড়াগাঁয়ে। তা তোমার আর এর চাইতে কত বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষা হবে ! ও-সব কল্পনা ছাড়ো। যা বলছি শোনো। ব্যারিস্টারীর চেষ্টা দেখ।"

অসহায় গৌরমোহন অবশেষে খরচের প্রশ্ন তুললেন। জানেন একমাত্র অর্থঘটিত যুক্তিই স্ত্রীর কাছে অকাট্য। তিনি শ্বশুরেরই তো মেয়ে !

ফল হলো না। মান্নামাসি গৌরমোহনের আপত্তি সত্ত্বেও বসত বাড়িটা বাঁধা রেখে হাজার কয়েক টাকা যোগাড় করলেন। কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে শাশুড়ীও কিছু টাকা ধার বলে দিলেন। বলা বাহুল্য, নিজের স্বামীকে লুকিয়ে।

বিলাতে গৌরমোহন যথারীতি লীঙ্কনস্ ইন থেকে পরীক্ষায় সব ক'টি পেপারে প্রথম হলেন, প্রাচীন ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের বিবর্তন সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ থিসিস লিখে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট পেলেন এবং অতঃপর দেশে ফিরে এসে ব্রীফহীন ব্যারিস্টারদের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীর শোভা বর্ধন করতে লাগলেন।

দুঃখে ও হতাশায় মান্নামাসির অসন্তোষের আর সীমা রইল না। পরিচিত বন্ধু বান্ধবীদের সুখ ও ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করে নিজগৃহের অসচ্ছলতা তাঁর কাছে ক্রমশঃ অধিকতর অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল।

দাশ সাহেবের কেমন ঝকঝকে দামী জ্যাগুয়ার। গৌরমোহনের একটা ছোট অস্টিনও হয় না কেন ? রিচি রোডের সুহাসিনীর যেমন রেডিওগ্রাম ও রেফ্রিজারেটার, টেলীফোন, বাবুর্চী, বেয়ারা, মান্নামাসির তেমন কিছুই নেই। এর চেয়ে ঘোরতর অবিচার ভগবানের রাজ্যে আর কী হতে পারে ? অথচ গুণে, বুদ্ধিতে মান্নামাসির চাইতে তার যোগ্যতা এমন কীই বা বেশী। শুধুমাত্র গৌরমোহনের হাতে পড়েই তাঁর এ দুরবস্থা, একথা মনে করে স্বামীর প্রতি মান্নামাসির অশ্রদ্ধা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল।

তাঁর বর্তমান দুর্ভাগ্যের পশ্চাতে মান্নামাসি শুধু গৌরমোহনের অক্ষমতাই নয়, দুরভিসন্ধিও আবিষ্কার করলেন। গৌরমোহন যে নিজের ভবিষ্যৎ অসাফল্যের কথা আগের ভাগে জেনে শুনেই মান্নামাসিকে বিয়ে করে ঠকিয়েছেন, সে সন্দেহ ক্রমশঃই তাঁর মনে দৃঢ়মূল হলো। গৌরমোহনের সঙ্গে বিয়ে না হলে তিনি যে অপর কোনো ধনশালীর ঘরের গৃহিণী হতেন, সে বিষয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কেন,

ঝামাপুকুরের মৈত্রদের বাড়িতে বিয়ের কথা হয় নি তার? সান্ন্যাল এটর্নী'র বড় ছেলে দেখতে আসে নি তাঁকে? সেখানে বিয়ে হলে যে আজ তিনি সোনার ইট গেঁথে গলায় পরতে পারতেন। সে খবর রাখে কেউ?

না। অন্ততঃ গৌরমোহন রাখেন না। আর রাখলেই বা কী? এ সকল উক্তির প্রত্যুক্তি অবশ্যই আছে। সোনার ইট গেঁথে সত্যি গলায় পরা যায় কিনা এবং পরা গেলেও সাধারণ বিছে হারের চেয়ে তাতে বেশী সুন্দরী দেখায় কিনা, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। তবে ইতিমধ্যে এটুকু বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান গৌরমোহনের হয়েছে যে, স্ত্রীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ অপেক্ষা নিরুত্তর থাকাটাই অধিকতর নিরাপদ।

কিন্তু মৌনব্রতই যে সংসারে নিশ্চিত পরিত্রাণের পথ নয়, সে কথাও গৌরমোহন ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করেন। হয়তো তিনি পড়ার ঘরে একাগ্রচিত্তে নূতন কোনো পুস্তকে মনোনিবেশ করেছেন এমন সময় অকস্মাৎ সেখানে মান্নামাসির আবির্ভাব ঘটল। অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "গৌরীর স্কুলের বাস বন্ধ করে দাও।"

গৌরমোহন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা'হলে সে স্কুলে যাবে কেমন করে?"

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনলেন,—"পায়ে হেঁটে।"

গৌরমোহন বুঝলেন, এটা রাগের কথা।

অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে বললেন, "বাসের তো ভাড়া মাত্র দশ টাকা। সে ক'টা টাকা বাঁচিয়ে আর—"

"বটে? দশটা টাকা তোমার গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়? মাসের শেষে ক' হাজার টাকা এনে হাতে দাও শুনি? কী করে সংসার চলে খবর রাখ তার?" ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়লেন মান্নামাসি।

আবার একদিন হয়তো এসে বললেন, "গৌরীর স্কুলে যাওয়ার শাড়ি নেই। যাও, বাজার থেকে কয়েকটা জামা কাপড় নিয়ে এস দিকিন।"

সিল্ক, জর্জেট, ঢাকাই, বিষ্ণুপুরী ইত্যাদির এমন এক ফর্দ দিলেন মান্নামাসি যা স্কুলে যাওয়ার তো কথাই নেই, ফুলশয্যার তত্ত্বের পক্ষেও বেশী মনে হতে পারে।

গৌরমোহন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত কিসের জন্য?"

"এটুকুতেই তোমার চোখ কপালে উঠল? আমার বাপের বাড়িতে ছেলেবেলায় কখনও যে এক জামা পরে দু'দিন স্কুলে যাই নি, তা জান? বেশ তো, মেয়েকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দাও; কাপড়, জামা কিছুই কিনতে হবে না।" বলে মান্নামাসি সবেগে প্রস্থান করলেন।

কন্যাকে কেন্দ্র করে এই কলহের পিছনে একটু বিশেষ কারণ আছে। মান্নামাসি জানেন, মেয়ের প্রতি গৌরমোহনের স্নেহ সাধারণের চাইতে অনেকটা বেশী। চতুর শাশুড়ীরা যেমন ঝিকে ভর্ৎসনা করে বউকে শেখান, তেমনি তিনিও গৌরীকে উপলক্ষ্য করে তার বাপকে জব্দ করে থাকেন। এমন কি, গৌরমোহন স্ত্রীর সাক্ষাতে কন্যাকে যথেষ্ট আদর করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন। মান্নামাসি দেখতে পেলেই মন্তব্য করেন, "থাক্, থাক্, হয়েছে তো ভারি একটা মেয়ে। বিয়ে দিতে জিভ বেরিয়ে যাবে। হতো যদি ছেলে, তবুও না হয় বুঝতেম!"

তিনি যে পুত্রসন্তান প্রসব না করে কন্যা জন্ম দিয়েছেন তার সমুদয় অপরাধও

একমাত্র গৌরমোহনেরই, এ সম্পর্কে মান্নামাসির মনে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

মাঝে মাঝে স্বামীর চরিত্রে উদ্যোগের অভাব তিনি আপন কৌশল ও আয়োজনের দ্বারা পরিপূরণের চেষ্টা করেন।

যে-সব এটর্নী ইচ্ছা করলেই গৌরমোহনকে ব্রীফ দিতে পারেন, মান্নামাসি বেছে বেছে তাঁদের ডিনার খাওয়ান। সিনীয়র ব্যারিস্টারদের বাড়ি বয়ে এসে কারো সঙ্গে সম্পর্ক পাতান কাকাবাবু। কারো স্ত্রীকে ডাকেন দিদি, কারো বা নাতনীর জন্মদিনে 'বিধবা-কল্যাণ সমিতি' থেকে উলের জাম্পার কিনে এনে নিজের হাতে বোনা বলে চালিয়ে দেন প্রেজেন্ট।

কিন্তু পৈতৃক কৃপণ স্বভাব কাটিয়ে উঠতে না পারার ফলে নিমন্ত্রিতেরা বাড়ি ফিরে খাদ্যের পরিমাণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে করেন কৌতুক। উপহারের স্বল্পমূল্যতা নিয়ে গিন্নীর আড়ালে করেন নিন্দা। গৌরমোহনের চেম্বার মক্কেল অভাবে শূন্য থাকে পূর্ববৎ।

অবশেষে আর্থিক গৌরবের অভাব রাজনৈতিক খ্যাতি দ্বারা পূরণের মানস করলেন মান্নামাসি। স্বামীকে বললেন, কর্পোরেশনের নির্বাচনে দাঁড়াতে। মেয়রের না হোক, অন্ততঃ কাউন্সিলরের স্ত্রী হলেই বা কম কী?

গৌরমোহন প্রমাদ গণনা করে বললেন, "সর্বনাশ! আমাকে লোকে ভোট দেবে কেন?"

স্ত্রী বললেন, "কেন দেবে না? ঐ রামদুলাল বটব্যালের চাইতে তুমি কোন অংশে খাটো? সে তো আকাট মূর্খ, পাঁড় মাতাল। চোরাই মালের ব্যবসা করে। সে যদি ইলেকশানে দাঁড়াতে পারে, তুমি পারবে না কেন?"

"তার কত টাকা আছে সে খবর রাখো?"

"থাকুক টাকা, তুমি তো ভোটদাতাদের ঘরে মেয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছ না যে তারা তোমার টাকার খোঁজ নেবে। তারা ভোট দেবে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দেখে।"

যুক্তি নির্ভুল। কিন্তু যুক্তি দিয়ে যদি নির্বাচনে জেতা যেতো, তবে আর ভাবনা ছিল কী? বাস্তবিক, একমাত্র কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া লজিক যে সংসারে আর কোনো কাজে লাগে এমন প্রমাণ নেই।

গৌরমোহন আপত্তি করলেন, "ইলেকশানে কত লোকজন চাই, তা জানো? লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্যানভাস করা, মিটিং করা, এ-সব করবে কে?"

"সে-সব আমি ঠিক করে রেখেছি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তারা সবাই বলেছে, তোমার মতো বিদ্বান প্রার্থী দাঁড়ালে ইলেকশান জেতা কিছুই নয়। তারা সবাই তোমার ভলান্টিয়ার হবে, হ্যান্ডবিল বিলোবে, পোস্টার আঁটবে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

গৌরমোহন বুঝলেন, স্ত্রী ইতিমধ্যেই অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন।

সাধারণতঃ কোনো ব্যাপারেই তিনি স্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণে সাহস করেন না। কিন্তু এবারে তাঁকে সহজে রাজী করা গেল না। তিনি কেবলই বলেন, "আমি জেলেও যাইনি, কোনো দলেও নেই। আমাকে চেনে কে? জানে কে? ভোট দেবে কে?"

মান্নামাসি সহজে নিরস্ত হওয়ার পাত্রী নন। তিনি গৌরমোহনকে ভীতু, বুদ্ধিহীন, নিষ্কর্মা ইত্যাদি আরও যে সকল বাছা বাছা শব্দে তিরস্কার করলেন

তার অধিকাংশই মুদ্রণের যোগ্য নয়। অহর্নিশ এরূপ নিষ্ঠুর তাড়নার ফলে দিন চার পাঁচ পরে অবশেষে বিধ্বস্ত গৌরমোহন আত্মসমর্পণ করলেন। নমিনেশান পেপার দস্তখত করে ভোটযুদ্ধে নামলেন।

গৌরমোহনের বিদ্যার খ্যাতি তখনও কিছুসংখ্যক লোকের মনে ছিল। গোড়াতে অনেকেই তাঁর প্রতি অনুকূল মনোভাবও দেখালেন। কিন্তু ভোটের দিন এগিয়ে আসতেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর তৎপরতাও বৃদ্ধি পেল। সে রাতারাতি খদ্দর পরে গভর্নমেন্টকে এলোপাতাড়ি গাল দিতে শুরু করল। পাড়ার ইউথ ক্লাবে লিখে দিল এক হাজার টাকার চেক, কনসার্ট পার্টিকে খাওয়াল ভোজ এবং মহিলা সমিতিতে দান করল দু'ডজন চরকা ও তিনখানা কলের তাঁত।

অবিলম্বে গৌরমোহনের সমর্থকদের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। ছেলেদের মধ্যে যারা কয়েক দিন আগে মাত্র গৌরমোহনের হয়ে কাজ করেছে, তারাই এখন লালকালিতে ছাপা পোস্টার কাঁধে নিয়ে প্রবীণ দেশসেবী ও পরদুঃখকাতর রামদুলাল বটব্যালকে ভোট দিয়ে জাতির মর্যাদা এবং করদাতাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার অনুরোধ জানাতে লাগল। টিনের চোঙা মুখে কালও যারা 'ভোট ফর্ গৌরমোহন' বলে চেঁচিয়েছে আজ তারা 'রামদুলালকী জয়' চীৎকারে পল্লী কাঁপিয়ে তুলল।

পত্নীর তাগাদায় গৌরমোহন নিজে পাড়ায় যে-সকল ভদ্রমহোদয়ের সঙ্গে দেখা করে ভোট প্রার্থনা করলেন, তাঁরাও প্রসন্ন হলেন না। এ কী রকম ভোটপ্রার্থী? এ তো প্রায় কথাই বলে না। না, লোকটা যথেষ্ট বিনয়ী নয়। রামদুলাল মদ খায় বটে, কিন্তু অমন অমায়িক লোক আর হয় না। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সর্বনাশের যেটুকু বাকী ছিল তাও মান্নামাসির অতিকৃপণতায় পূর্ণ হলো। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের জলযোগের আয়োজনে যথেষ্ট হাতটানের পরিচয় দিলেন। রামদুলালের লোকেরা যখন দু'বেলা লুচি তরকারী ও দরবেশ খাচ্ছে, তখন দু'খানা থিন এরারুট বিস্কুট ও এক পেয়ালা চা খাইয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে রাখতে চাইলে চলবে কেন? তা ছাড়া, ভোট ক্যানভাসের জন্য দিন-চুক্তিতে যে তিনখানা ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছে, তাদের গতিবিধি সম্পর্কে তিনি এমন কড়া হিসাব নিতে শুরু করলেন যে, সেগুলি চেপে বন্ধুবান্ধবসহ সেচ্ছাসেবকেরা যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা ও পরেশনাথের মন্দির বেড়িয়ে আসবে তার আর জো রইল না। আশ্চর্য নয় যে, অতঃপর বিরক্ত চিত্তে ভলান্টিয়ারেরা প্রায় সবাই সরে পড়ল।

ভোটের দিন গৌরমোহনের ক্যাম্পে সরবৎ ও পান সিগারেট খেয়ে ভোটদাতারা রামদুলালকে ভোট দিয়ে এল। গৌরমোহনের জামানতের টাকাটা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হলো।

অতঃপর মান্নামাসির আর দয়া মায়া রইল না। উঠতে বসতে তিনি স্বামীকে গঞ্জনা দিতে লাগলেন। গৌরমোহন কোনো বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই তিনি তাঁকে থামিয়ে দেন, 'ঢের হয়েছে, তোমার আর ফোঁড়ন কাটতে হবে না। তোমার যা যোগ্যতা সে তো দেখাই গিয়েছে।"

মান্নামাসির আগ্রহাতিশয্যে তিনি যে একান্ত অনিচ্ছায়ই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন সে কথা মান্নামাসিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাহস গৌরমোহনের ছিল না। তিনি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন যে, নির্বাচনে পরাজয়ের সমুদয় দোষ একমাত্র তাঁরই।

নির্বাচনের ধকলে গৌরমোহনের শরীর ভেঙ্গে পড়ল।

গৌরী এসে বলল, "মা, বাবার মাথার যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন, একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

নির্বাচনের ব্যয়ের প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় সংসারের ছিদ্রযুক্ত জীর্ণ আর্থিক তরণীটা তখন প্রায় কাৎ হয়ে পড়েছে। মান্নামাসির মেজজা গোড়া থেকেই বিগড়ে ছিলেন। শ্লেষ করে বললেন, "হ্যাঁ, ডাকতে হবে বৈকি! এ কি আর আমাদের মতো মুখ্যু লোকের মাথা যে একটা এ্যাস্পিরিনের বড়ি গিলে শুয়ে থাকব? এ হলো পি-আর-এস, পি-এইচ-ডির মাথা। সে মাথাধরা কি ডাক্তার না ডাকলে সারে? যাও, বিধান রায় কিম্বা নলিনী সেনকে কল্ দাওগে।"

ডাক্তার অবশ্য দু'দিন পরে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তখন না ডাকলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। ডাক্তার দেখে যাওয়ার ঘণ্টা পাঁচেক পরেই ম্যানিনজাইটিসে জীবনে ব্যর্থকাম, অক্ষম ও অযোগ্য স্বামী গৌরমোহনের জীবনান্ত ঘটল।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস! তাঁর মৃত্যুর পরদিন সকালে ক্যালকাটা গেজেটে দেখা গেল, গৌরমোহনকে গভর্নমেন্ট এক ট্রাইবুন্যালের জজ নিযুক্ত করেছেন!

মান্নামাসির হৃদয়ে অনুতাপের বদলে ক্ষোভ দেখা দিল। মরার ব্যাপারেও গৌরমোহন কিছুমাত্র বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারলেন না। লোকটা এমন অপদার্থই বটে।

অতীত স্মৃতি সিনেমার ছবির মতো মান্নামাসির মনের পর্দায় দেখা দিয়ে পুরাতন বেদনাকে আর একবার নাড়া দিয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি প্রেক্ষাগারের দিকে ফিরে চললেন। যেতে যেতে ভাবলেন,—জীবনের কোনো সাধ, কোনো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়নি। এখন মেয়েটাকে একটি কৃতী পাত্রের হাতে দিতে পারলে হয়তো অতীতে স্বামী গৌরবের অভাব ভবিষ্যতে জামাতাগর্বের দ্বারা কিছুটা পূরণ হতে পারে। কিন্তু তারই বা সম্ভাবনা কোথায়?

"মান্নামাসি যে, কেমন আছেন?"

মান্নামাসি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে সত্যসিন্ধু। বললেন, "ভালো আছি বাবা, তুমি কেমন? অনেক দিন দেখি নি যে?"

সত্যসিন্ধু সে কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কৈ, মুখ দেখে তো খুব ভালো মনে হচ্ছে না। অসুখ-বিসুখ করেনি তো?"

মান্নামাসি উত্তর করলেন, "না অসুখ নয়, তবে মনটা তেমন ভালো নেই।"

"বুঝেছি, মেয়ের বিয়ে তো? তার জন্য অত ভাবনা কেন?"

ম্লান হেসে মান্নামাসি উত্তর দিলেন, "মেয়ের মা তো হওনি?"

সত্যসিন্ধু মৃদু হেসে বললেন, "না, সেটা ইচ্ছে থাকলেও আর হওয়া সম্ভব নয়।" তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, "মান্নামাসি, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি। সংসারে সব কাজেই ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। ডিমকে ভেঙ্গে ফেললেই তো তা থেকে তাড়াতাড়ি বাচ্চা বেরোয় না। তাতে অনেকদিন ধরে তা দিতে হয়।"

একটু চিন্তা করে মান্নামাসি বললেন, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক। সংসারে যখন যা হওয়ার, ঠিক তখনই তা হবে, তার আগে নয়। আমি উতলা হয়ে কী করব?"

একটু হেসে যোগ করলেন, "ঐ যে তোমাদের ইংরেজী প্রবাদ আছে, তাই মনে হয়,— মান্নামাসি প্রপোজেস্—"

"মলী সেন ডিসপোজেস্। এই তো ? আপনি চমকে উঠবেন না। হ্যাঁ, সমস্তটা না জানলেও আমি অনেকটাই অনুমান করতে পারি। আমার কথা শুনুন, মিসেস সেনকে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী জানি। আপনি অনর্থক ভয় পাবেন না। এমন অনেক লোককে দেখেছি যারা নিজেরা মাছ খায় না কিন্তু ছিপ ফেলে মাছ ধরতে ভালোবাসে। তারা আমিষাশীদের পক্ষে ভয়ের পাত্র নয়, কৌতুকের পাত্র।"

মান্নামাসি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এমন সময় যাঁর সম্পর্কে আলোচনা সে-ব্যক্তিটিই সশরীরে হাজির হলেন সেখানে। স্বয়ং মলী সেন। বললেন, "মান্নামাসি, তুমি যদি ড্রেসিং-রুমে বসে ছোট ছোট মেয়েগুলির চুলটা একটু বেঁধে দাও তো বড় উপকার হয়।"

সম্মত হয়ে মান্নামাসি প্রস্থান করতেই মলী সেন সত্যসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী, বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ ?"

সত্য জবাব দিলেন, "শুনেছি ছায়াকে তার পিছনে ছুটে ধরা যায় না, বরং পিছন ফিরে উল্টো দিকে চলতে থাকলেই নাকি সে পিছু নেয়।"

মলী সেন বললেন, "হেঁয়ালী রাখ। বল, এতদিন কোথায় ছিলে ?"

"কোথায় আবার, এখানেই।"

"মিছে কথা, তবে দেখি নি কেন ?"

"দেখা তো শুধু দেখার বস্তুর উপর নির্ভর করে না। আকাশে তারা সারাক্ষণই থাকে। দিনের আলো না নিভলে কি তা চোখে দেখা যায় ?"

বেশ তো, আমার চোখ না হয় সূর্যকিরণে ঝলসে আছে, তুমি একদিনও আসনি কেন ?"

আমি টাইম-লিমিট মানি। রিটায়ারমেন্টের পরেও যে রি-এমপ্লয়মেন্ট চায় সে অশ্রদ্ধেয়, শুধু গভর্নমেন্টের দপ্তরে নয়, জীবনের কারবারেও।"

মলী সেন খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা সিন্ধু আমরা কি পরস্পর বন্ধু হয়ে থাকতে পারিনে ?"

"না। স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাস করিনে। সেটা হয় বাড়তে বাড়তে অনুরাগের কোঠায় পৌঁছয়, নয় তো কমতে কমতে পরিচয়ের পর্যায়ে নামে। অনাত্মীয় নরনারীর মধ্যে মাত্র দুটি সম্পর্ক সম্ভব। হয় ভদ্রতার, নয় তো প্রেমের।"

মলী সেন বললেন, "আমি যা নই তা ভেবে তুমি একদিন আনন্দ পেয়েছিলে। তাতে আমার হাত ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন যদি তোমার জ্ঞান হয়ে থাকে যে, তুমি যা ভেবেছ আমি তা নই, সে কি আমার অপরাধ ?"

সত্য বললেন, "কিছুমাত্র নয়। আমি তো তোমাকে কখনও দোষী করিনি। নোট ডবল করার কাহিনী জান তো ? একদল লোক আছে যারা একশ' টাকার নোট দু'শ টাকা হবে আশা করে যখন দেখে নোট নিয়ে লোকটা উধাও, তখন তাকে গাল দিয়ে বলে, জোচ্চোর। তাদের একবারও মনে হয় না যে, নোট ডবল করা সম্ভব একথা যারা বিশ্বাস করে মূর্খতাটা তাদেরই। আমি জানি, ধিক্কারের পাত্র যদি কেউ থাকে, তবে সে তারা নিজে।"

মলী সেন আহত হলেন।

কিন্তু প্রতিঘাত না করে বললেন, "আমার হাত থেকে তুমি গভীর দুঃখ পেয়েছ তা জানি, সিন্ধু।"

সত্য বললেন, "দেখ মলী, ভগবান সব জিনিষেরই একটা শেষ দিয়েছেন। তাঁর নিয়মে মানুষের জীবন-কালেরও একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। দুঃখ যত গভীরই হোক দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই একদিন তারও সমাপ্তি ঘটে। তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করতে নেই।"

"আমি যে তোমার জন্য সত্যি সত্যিই ভাবি, সে কথা হয়তো আজ আর তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমিও যে ব্যথা পাই, আর যাই হোক, আমারও যে হৃদয় আছে, এ-কথা কি তোমার একবারও মনে হয় না?"

সত্য করজোড়ে বললেন, "দোহাই তোমার। এ-সব গভীর কথা আমাকে শুনিও না। আমি ডাক্তার মানুষ। স্টেথিস্কোপ দিয়ে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে অভ্যস্ত। হৃদয়ের খবর রাখিনে। গ্রে'স এনাটমিতে তার উল্লেখ নেই।"

মলী সেন কিছুক্ষণ নীরব থেকে বেদনাভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "একদিন ভাবতেম, আমরা দু'জনে দু'জনকে এত গভীরভাবে জানি যে, মুখ ফুটে না বললেও একজনের কথা আর একজন বুঝতে পারে। সে ভুল ভেঙ্গেছে। তাই ঠিক করেছিলেম, তোমাকে সবটাই স্পষ্ট ভাষায় জানাব। এখন দেখছি, বৃথা। যে বুঝবে না বলেই পণ করে বসেছে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। বুঝেছি, আমাকে তুমি কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবে না।"

সত্য ব্যস্ত হয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, "ক্ষমার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমাকেও তুমি ভুল বুঝো না। গোলাপ তুলতে গেলে ফুলও জোটে, কাঁটাও ফোটে। কিন্তু ফুলের সৌরভ ভুলে গিয়ে যারা শুধু কাঁটার আঘাতটাই চিরকাল মনে জীইয়ে রাখে আমি তাদের দলে নেই। কথাগুলি বোধ হয় অনেকটা কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। তা শোনাক। কিন্তু এর এক বিন্দুও মিথ্যে নয়। পরের দোষ মনে করে রাখায় সুখ নেই, একথা আমি পুঁথি থেকে নয়,—নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি। অতীতের যে দিনগুলি সরস, যে কথাগুলি মধুর এবং যে মুহূর্তগুলি সুধায় পরিপূর্ণ, আমি সেগুলিই মনে রাখব; ব্যর্থতার, পরিতাপের বা তিক্ততার গুলি নয়। যথার্থ বলছি, একাউণ্টেসী আমার পেশা নয়। জীবনের ট্রায়েল ব্যালেন্স কষা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। না, মিসেস মলী সেন, কী পাই নি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।"

পূর্ব-পরিত্যক্ত আসনে ফিরে এসে বীরেশ্বর অর্ধ-সমাপ্ত ঘটচিত্রণ সম্পূর্ণ করতে লাগলেন। তুলি তুলে নিলেন হাতে। রক্তাভ গৈরিক বর্ণের মৃৎ-কুম্ভটির গায়ে চিক্কণ শ্বেত রেখায় দুগ্ধ-ধবল একটি শৃঙ্খলতা এঁকে দিলেন ধীরে ধীরে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বহু বর্ষ আগে তাঁকে দিয়ে সুবালা ঠিক এমনি একটি শৃঙ্খলতার নক্সা আঁকিয়ে নিয়েছিলেন বালিশের ওয়াড়ে। সোনালী সিল্কের সুতায় তার উপরে স্বহস্তে রচনা করেছিলেন সুশ্রী সূচীশিল্প।

কলেজ-হোস্টেলের অপরিপাটি শয্যায় উপাধানগাত্রে এই সীবনসৌকুমার্য বহুজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে সহপাঠীদের মধ্যে প্রচুর কৌতুক পরিহাসের কারণ হয়েছিল।

বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর থেকে ক্ষীণ জল ধারার মতো বয়ে আসে সুদূর অতীতের উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত দিনগুলির একটু-আধটু আভা। বৈশাখের অরণ্য-প্রান্তে বিগত বসন্তের দ্রুত বিলীয়মান মৃদু পুষ্পবাসের মতো।

বীরেশ্বরের বিয়ে হয়েছে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। ফুলশয্যার পরদিন দুপুরবেলা নববধূসহ শ্বশুরালয় থেকে গৃহে প্রত্যাগমন করছিলেন। বিদায়ের ক্ষণে মেয়ে যত কাঁদে মেয়ের বাপ তার চেয়ে বেশী। নতুন জামাতাকে জড়িয়ে ধরে বার বার করে বললেন, "সুবি আমার মা-মরা মেয়ে, বড্ড চাপা। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলবে না। ও মুখ দেখে তোমাকে বুঝতে হবে ওর কখন কি চাই।"

বীরেশ্বর তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। মনে মনে হেসে ভেবেছিলেন, সে আর এমন শক্ত কী?

বোধ হয়, শক্ত হতোও না। কিন্তু বিপর্যয় ঘটল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার হাত ছিল বীরেশ্বরের। পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসকালে শ্লেটে দিবানিদ্রারত পণ্ডিত মশায়ের প্রতিকৃতি অংকনের দ্বারা সহপাঠীদের কৌতুক ও অধ্যাপকের ক্রোধ উদ্রেক করেছেন অনেক দিন। বাল্যকালের নানাবিধ বায়ুরোগ উপশমের বহুপরীক্ষিত চিকিৎসা—প্রচুর তিরস্কার ও প্রচুরতর কর্ণমর্দন—হলো নিষ্ফল। গুরুজনের মুষ্টিযোগ ব্যর্থ করে চিত্ররোগ অনড় হয়ে রইল বীরেশ্বরের প্রকৃতিতে।

অগ্নিদাহের সঙ্গে চিরকাল যুক্ত হয় বায়ুবেগ; উচ্ছৃংখল ধনীনন্দনের সঙ্গে বন্ধু। বীরেশ্বরের সঙ্গে যোগ দিলেন তার এক আত্মীয়া। কলেজের ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন তাদের বাড়ি। বীরেশ্বরের অংকনচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে মুখে দিলেন উৎসাহ, হাতে দিলেন উপহার,—ছবি আঁকার এক প্রস্ত রং এবং এক গুচ্ছ তুলি।

অতঃপর বীরেশ্বরকে সংযত রাখা আর কোনো মতেই সম্ভব হলো না। স্কুলের খাতা, অঙ্কের বই, মায় সংসারে ধোবার হিসাব ও দাদামশায়ের জমাখরচের জাবেদা বিভিন্ন রেখায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল। ঘরের দেয়াল, আলমারীর কপাট, এমন কি, গৃহপালিত মার্জারশাবকগুলি পর্যন্ত বিচিত্র রংএর প্রলেপন থেকে রক্ষা পেলো না।

ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে বীরেশ্বর এলেন কলেজে। কলকাতায়। হোস্টেলের অন্য ছেলেরা যখন গ্রেটা গার্বো ও চার্লস বোয়ের-এর জীবনী মুখস্থ করে কিম্বা ফুটবলের মাঠে রেফারীর কর্ণে কটূক্তি ও মস্তকে বিনামা বর্ষণে ব্যস্ত, বীরেশ্বর তখন নিজ কক্ষে আপন মনে তুলি দিয়ে ছবি এঁকেছেন নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগে দিনের পর দিন।

তারই কিছু সংখ্যক একত্র করে এক সহাধ্যায়ী কলেজের উৎসবসভায় আয়োজন করল এক ক্ষুদ্র প্রদর্শনীর। কে জানত যে, তারই মধ্যে লুক্কায়িত ছিল একটি দাম্পত্য প্রেমের ভবিষ্যৎ সমাধি? গেব্রিলো প্রিনজিপ কি কখনও কল্পনা করেছিল যে সেরাজেভোয় তারই নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলিতে অংকুরিত ছিল ভার্দুনের লোকক্ষয়, কাইজারের পতন ও ভার্সাই সন্ধি?

স্থানীয় মার্কিন কনসাল জেনারেল এসেছিলেন উৎসবে। তিনি বীরেশ্বরের ছবি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর চেষ্টায় এক এমেরিকান সংস্কৃতি সমিতি বীরেশ্বরকে দিতে চাইলেন একটি বৃত্তি। ভারতবর্ষের যে কোনো সরকারানুমোদিত চিত্রবিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার সুবিধার্থে।

ঐখানেই বিপদের সূত্রপাত।

ছয় শত ডলার। তখনকার দিনের মুদ্রামানে পাঁচ হাজার টাকারও কম। তিন বৎসরের জন্য। উল্লসিত বীরেশ্বর আত্মহারা হয়ে বললেন, তিনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে শুরু করবেন অনন্যচিত্তে শিল্পসাধনা। কলেজ ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হবেন আর্ট স্কুলে।

শুনে বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, "মাথা খারাপ!"

অভিভাবকেরা ক্ষাপ্পা হয়ে গর্জন করলেন, "হতচ্ছাড়া কোথাকার; ছবি এঁকে হবে কী? তাতে পেট চলে কারো?"

কিন্তু বীরেশ্বরকে তখন পটের নেশায় পেয়েছে, পেটের কথা ভাববার অবকাশ নেই।

বীরেশ্বরের বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন। অনেক কাল রেলের স্টেশন মাস্টার। রেলের বর্তমান অনেক বড় সাহেবকে তিনি ছোট সাহেব-কাল থেকে জানেন। তাঁরাও অনেকে তাঁকে নাম ধরেই ডাকেন। সুতরাং আশা ছিল, কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে পুত্রকে অন্ততঃ শ'দেড়েক টাকা বেতনে সিগনেলাররূপে ভর্তি করে যেতে পারবেন। ব্যস্। মন দিয়ে খাটলে আস্তে আস্তে প্রমোশন পেয়ে সেও কি আর একদিন এ-রকম মাস্টার-বাবু হবে না? কথায় বলে, বাপকা বেটা—।

কিন্তু বাপের বুদ্ধির সঙ্গে বেটার বুদ্ধি এ-যুগে খুব বেশী যে মেলে এমন প্রমাণ নেই। অন্ততঃ এ-ক্ষেত্রে মিলল না।

বীরেশ্বর তখন শিল্প-জীবনের কল্পনায় বিভোর। পুরোপুরি স্বপ্নরাজ্যে পদচারণা করছেন। সেখানে তিনি র‍্যাফেল ও লিওনার্ড দা ভিঞ্চির উত্তরসাধক, বটিচেলী ও পল্ গগার সগোত্র, অবনী ঠাকুর ও নন্দলালের সতীর্থ। রূপার বোতাম-আঁটা সাদা সাদা জিনের কোট গায়ে টুলে বসে দিনের পর দিন ফাইভ আপ আর সিক্সটিন ডাউনের লাইন ক্লিয়ার দিচ্ছেন—নিজের জীবনে এমন দুর্ঘটনার কথা ভাবলেও তিনি শিউরে ওঠেন।

ভাবী মাইকেল এঞ্জেলো মনে মনে বলেন, "হুঁ। শরৎচন্দ্র যদি রেঙ্গুনের একাউন্টস আপিসে কেরানীগিরি করে দেহপাত করতেন কিম্বা সমারসেট মম্ যদি সেণ্ট টমাস হাসপাতালে রোগীর নাড়ী টিপে জীবন কাটাতেন, তবে পৃথিবীতে দুর্গতির আর সীমা থাকতো কি?"

সুবালা তখন পিত্রালয়ে। সদ্যপ্রসূত পুত্রের জননী। বীরেশ্বরের কলেজ পরিত্যাগ ও চিত্রবিদ্যাভ্যাসের সংকল্প তাঁর কানেও এসে পৌঁছেছে। জনশ্রুতিতে তিনি বিশ্বাস করেন নি। এর মূলে কিছুমাত্র সত্য থাকলে পত্রযোগে বীরেশ্বর সর্বাগ্রে জানাতেন তাঁকেই—পত্নীপ্রাণের এই সহজাত বিশ্বাসের দৃঢ়তায় সুবালা পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন।

হঠাৎ এক দিন সংবাদ এল। দুঃসংবাদ বলাই ঠিক। সমস্ত শুভানুধ্যায়ীর

সদুপদেশ অগ্রাহ্য করে বীরেশ্বর নিজের কলেজের পাঠ্যপুস্তক সহপাঠীদের বিলিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন বরোদায়। সেখানকার কলাভবনে শুরু হয়েছে শিল্পের সাধনা।

বর্ষীয়সী হিতাকাঙ্ক্ষিণীর দল সুবালাকে অনেক পরামর্শ দিলেন। কেউ বললেন, চিঠি লেখ। কেউ বললেন, টেলিগ্রাফ। কেউ বা উপদেশ দিলেন, একেবারে বরোদায় সশরীরে উপস্থিতির। এমন কি, তাঁর শ্বশুরেরও ইচ্ছা ছিল পুত্রবধূ কঠোর তিরস্কারের দ্বারা বীরেশ্বরকে এই অপরিণামদর্শিতা থেকে নিরস্ত করুন। সে সমস্ত অগ্রাহ্য করে সুবালা স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

সকাতর অনুরোধ, সক্রোধ ভর্ৎসনা, সখেদ অশ্রুপাত দূরে থাকুক, কখনও পত্রে বা বাচনিক আলোচনায় এ প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করলেন না বীরেশ্বরের কাছে।

জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনে সুবালার কথা যদি বীরেশ্বরের মনে না পড়ে থাকে তবে তিনি কি উপযাচিকা হয়ে তাঁকে তা স্মরণ করাতে যাবেন? ছিঃ। যে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি আপন স্ত্রী এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন মর্মান্তিকরূপে উদাসীন হতে পারে সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে।

দুঃসহ দুঃখের সুতীব্র বেদনায় আপনার চতুর্দিকে অপরিসীম ঔদাসীন্যের এক দুর্লংঘ্য প্রাচীর রচনা করলেন সুবালা। আপন অভিমানের যে দুর্ভেদ্য দুর্গে নিজেকে তিনি অলক্ষ্যে অপসারিত করলেন তার প্রবেশদ্বার বীরেশ্বরের কাছে রুদ্ধ হয় গেল নিঃশব্দে। নিশ্চিতরূপে। চিরকালের জন্য।

শিল্পশিক্ষার মধ্যপথে বীরেশ্বরের ভগ্নহৃদয় পিতা লোকান্তরিত হলেন।

সুবালার দাদারা দু'জনেই কৃতী এবং সহোদরার প্রতি গভীর স্নেহপরায়ণ। তাঁদের আগ্রহ ছিল সপুত্র সুবালাকে নিজেদের সংসারে সমাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করা। সুবালা সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে ভর্তি হলেন ট্রেনিং কলেজে। বি-টি পাশ করে এক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কর্ম সংগ্রহ করলেন সম্পূর্ণ আপন প্রচেষ্টায়।

আর্ট স্কুলে শিক্ষা সমাপনান্তে দীর্ঘ দিন বীরেশ্বরের অর্থাগমের পন্থা প্রশস্ত ছিল না। এদেশে চিত্রকরেরা যতটা নাম পায়, ততটা ইনাম পায় না। বক্তৃতা ও প্রবন্ধে তাঁদের সুখ্যাতি থাকে অজস্র। কিন্তু সে কেবলি শব্দ, তার পিছনে অর্থ নেই। ক্বচিৎ কদাচিৎ মাসিক পত্রে দু'একখানা ছবি মুদ্রণের দ্বারা যে উপার্জন হয় সেটা উচ্চারণ করতে বিনা রঙেই চিত্রকরের কর্ণদ্বয় রক্তিম হয়ে ওঠে।

বীরেশ্বরের জীবনেও সে অধ্যায় গিয়েছে। সেই অসচ্ছলতার দিনে আপন উপার্জনের দ্বারা সংসারযাত্রাকে সুবালাই সচল রেখেছিলেন। বীরেশ্বর কখনও জানতেও পারেন নি কী ভাবে সংগৃহীত হয়েছে তাঁর নিজের ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ, পুত্রের সেন্ট জেভিয়ার্সে অধ্যয়নের ব্যয়, কেমন করে ঘটেছে প্রাত্যহিক আহার্যের নিয়মিত আয়োজন, কোথা থেকে এসেছে রোগীর পথ্য, চিকিৎসকের দক্ষিণা এবং প্রয়োজন হলে বায়ু-পরিবর্তনের সমুদয় অর্থ।

ধীরে ধীরে বীরেশ্বরের ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। আজ তাঁর মাসিক উপার্জন অনেক বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিস্টারের পক্ষেও ঈর্ষার যোগ্য। অথচ সুবালার আচরণে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। আজও তিনি তেমনি নির্বাক নৈপুণ্যে সংসার পরিচালনা করেন। দশটা বাজতে না বাজতে নিয়মিত বেঁটে ছাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে

ট্রামে চেপে স্কুলে যাত্রা করেন। পাঁচটায় ক্লান্ত দেহে ফিরে এসে ব্যবস্থা করেন বৈকালিক চা-পর্বের।

সচ্ছলতার দিনেও এই অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধনা থেকে সুবলাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নি। বীরেশ্বর মাঝে মাঝে চেস্টা করেছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা দ্বারা সুবালা সে-আলোচনা এড়িয়ে গিয়েছেন সুকৌশলে।

বেশী পীড়াপীড়ি করার সাহস হয় না। সংসারের অন্য আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিল নেই সুবালার, একথা বীরেশ্বর পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা জেনেছেন। নিজের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থায় সবাই খুশি হয়, এটা প্রচলিত ধারণা। কিন্তু সুবালার সামান্য সহায়তার চেস্টা করতে গিয়ে দেখেছেন, শুধু বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছেন। আশ্চর্য!

সেবার পুজার সময় একদিন মার্কেটে বীরেশ্বরের দেখা হয়ে গেল তাঁর এক দূর সম্পর্কিত ভাগিনী ও ভাগিনীপতির সঙ্গে। তাঁরা দুজনে পুজার সওদা করছিলেন! ভাগিনী প্রশ্ন করল, "বউদির জন্য এবার কি শাড়ি কিনলে, বীরেশ্বরদা?"

বীরেশ্বর জবাব দিলেন, "বউদির শাড়ি? সে আমি কিনব কেন?"

"বাঃ, তুমি কিনবে না তো কিনবে কে?"

"কেন, তোর বউদি। আমাদের সবার জামা কাপড় তো সে-ই কেনে।"

বিস্মিত কণ্ঠে বোন বলে, "তোমাদের জামা কাপড় তিনি কিনতে পারেন। তা বলে তাঁর নিজেরটাও কি তিনি কিনবেন? আর যদি বা কেনেনও তা হলে আর তোমার দিতে নেই নাকি? তুমি কি কখনও বউদিকে কিছু কিনে দাও না?"

"না তো। টাকা পয়সা তো সবই তার কাছে থাকে। তার যখন যা দরকার তা সে-ই কিনে নেয়। আমি তো মাসের শেষে পুরো মাইনেটা তার হাতে তুলে দিয়েই খালাস।" বলে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন বীরেশ্বর।

"এই তোমার বুদ্ধি? এমন না হলে আর আর্টিস্ট!" সহাস্যে মন্তব্য করলেন ভাগিনীপতি।

একখানা বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি নির্বাচন করে ভাগিনী বীরেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন, "নাও, এই শাড়িটা নিয়ে যাও বউদির জন্য। ফিকে নীলের উপর ঘন নীল আর সোনালী জরির আঁচল, ফর্সা রঙে বউদিকে খাশা মানাবে। তেষট্টি টাকা দাম আজকালকার হিসেবে খুব বেশী নয়। আচ্ছা, তোমার কাছে টাকা না থাকে তো, আমি দিচ্ছি। পরে পাঠিয়ে দিও, তা হলেই হবে।"

কিন্তু যাঁর জন্যে শাড়ি তাঁর আচরণ একান্ত হতবুদ্ধিকর। খুশি হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে সুবালা বলে উঠলেন, "শাড়ি কার জন্য?"

"তোমার।"

"আমার? আমার জন্য শাড়ি তোমাকে কে আনতে বলেছে?"

সত্য গোপন করে বীরেশ্বর বললেন, "কেউ বলে নি। আমি নিজেই কিনেছি। ব্লু রঙটা তোমাকে খুব চমৎকার—"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুবালা বাধা দিয়ে বললেন, "কেন, কেন তুমি শাড়ি কিনতে গেলে আমার জন্যে?"

অপ্রস্তুত বীরেশ্বর শাড়ির প্যাকেটটা স্ত্রীর হাতে দিতে দিতে থেমে গেলেন।

ইতস্ততঃ করে বললেন, "কিছু অন্যায় হয়েছে কি? আমি তো ঠিক বুঝতে পারি

নি। রাণী আর ওর বর সীতেশের সঙ্গে দোকানে দেখা হয়েছিল। তারা বললে—তোমার কি পছন্দ—"

"অন্যায়, খুব অন্যায়। কোনো দিন যেন তুমি আর—" বলতে বলতে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল সুবালার দুই নেত্র থেকে কপোলে, বক্ষে।

তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন কক্ষান্তরে।

প্রত্যাখ্যাত শাড়ির প্যাকেটটার পানে তাকিয়ে হতবাক বীরেশ্বর দাঁড়িয়ে রইলেন একা। ইতিপূর্বে সুবালার চক্ষে জল দেখেন নি তিনি কখনও। সুতরাং তার মনোবেদনার পরিমাণ অনুমান করতে পারলেন। কিন্তু হেতু খুঁজে পেলেন না। সংসারে অন্য লোকের স্ত্রীরা শাড়ির জন্য বায়না ধরে, শুনেছেন। শাড়ি উপহার দিলে আহত হয়ে অশ্রুপাত করে কোন রমণী?

বীরেশ্বর শিল্পী। কল্পনাপ্রবণ তাঁর মন। অনেক দিন রাত্রিতে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। শয্যা ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী কক্ষে এসে দেখেছেন,—স্ত্রী গভীর নিদ্রামগ্ন। ক্ষীণ সুঠাম দেহটি উৎসব অবসানে কন্ঠচ্যুত পুষ্পমালিকার মতো পালঙ্কের একপ্রান্তে অনায়াসে বিন্যস্ত। কপোলে কবরীবিশ্লিষ্ট বিমুক্ত কুন্তলদলের গুটি কয় শীর্ণ গুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারে বক্ষস্থল নিয়মিত তালে মৃদু আন্দোলিত।

নিদ্রিতা পত্নীর অবগুন্ঠনহীন মুখের পানে তাকিয়ে বীরেশ্বর ভেবেছেন, সুবালা যেন বাতায়নপথে দৃষ্ট কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের পুষ্পিত শাখার অন্তরালে সদ্যোত্থিত ঐ অষ্টমীর চাঁদের মতো। দেখে মনে হয়, হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায় বুঝি বা। কিন্তু আসলে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে। কাছে থেকে দূর রচনা করছে সে। সে যেন ভাদ্রাদিনে খরস্রোতা তটিনীর তরঙ্গশীর্ষে প্রভাত-সূর্যের কম্পিত আলোক শিখাটি। দেখা যায়, ছোঁয়া যায়; কিন্তু ধরা যায় না।

সিদ্ধনাথকে ভগবান একজোড়া পা দিয়েছেন। পাখা দেন নি। তাই গতি দ্বারা তিনি সৃষ্টিকর্তার সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেন। তাঁর অকস্মাৎ আগমন ও নির্গমন মাটিতে হেঁটে চলার চাইতে আকাশে উড়ে যাওয়ার সঙ্গেই বেশীটা মিলে।

দ্রুত প্রবেশ ও দ্রুততর ভাষণের দ্বারা মিনিট পাঁচ ছয় ব্যাপী সিদ্ধনাথ যে-উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, তার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, অভিনয় শুরু হওয়ার সময় এগিয়ে আসছে অথচ অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাজসজ্জার এখনও অনেক বাকী।

অভিনয়ে প্রধান ভূমিকা মলী সেনের। প্রথম দৃশ্যে যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পার্ট। তিনি সলজ্জে স্বীকার করলেন, ত্রুটিটা তাঁরও। আশ্বাস দিলেন, তাঁর প্রস্তুত হতে বিলম্ব হবে না।

নিজের নির্দিষ্ট প্রসাধন কক্ষটিতে প্রবেশ করে মলী সেন খুশি হলেন।

অতি পরিপাটি ব্যবস্থা। ড্রেসিং টেবলের উপরে নিপুণভাবে সাজানো ভেসেলীন, পেইণ্ট, গ্রীজ, পাউডার, গ্লিসারীন, সফ্‌ট টিসু, প্যানকেক, ম্যাসকারা, আইব্রো পেন্সিল ইত্যাদি মেক-আপের নানাবিধ সরঞ্জাম। কেশবিন্যাসের চিরুণী, ব্রাস, ফিতা ট্যাসল। আলনায় অভিনয়ের বিভিন্ন অঙ্কে বা গর্ভাঙ্কে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন

ধরনের জামা কাপড় পৃথকভাবে ভাঁজ করা। রাজকন্যা মঞ্জুশ্রী ঠিক কোন দৃশ্যে কোন বস্ত্র এবং অঙ্গাবরণটি পরিধান করবেন, সুস্পষ্টাক্ষরে লেখা ছোট কাগজের লেবেল দিয়ে তা চিহ্নিত। ছোট টেবিলটার উপরে অলঙ্কারগুলি থাকে থাকে অনুরূপ সুবিন্যস্ত। এক কোণে একটি ইজিচেয়ার, বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যকালীন অবসর ক্ষণে ক্লান্ত মলী সেন যাতে দেহ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন।

অন্য সময়ে অব্যবহৃত এ ঘরটাতে পাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। গরমে ঘামে মুখের মেক-আপ গলে নষ্ট হওয়ার আশংকা। তাই জানালার ভেতর দিয়ে তার গলিয়ে দূরবর্তী প্লাগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ছোট একটি টেবিল ফ্যান। অন্য কোণে স্পিরিট স্টোভে ফুটছে ছোট কেটলিতে গরম জল। টিপাইর উপরে ফ্লাস্কে ভরা গরম দুধ, নাকে দেওয়ার মিস্টল, গলার জন্য স্প্রে, অডিকলোনের বোতল, থ্রোট পেস্টিলস্ কামলোজ-এর ট্যবলেট ও এ্যাস্পিরিনের শিশি ইত্যাদি স্নায়ু ও কণ্ঠ সতেজ রাখার অতি পরিচিত বিবিধ ডাক্তারী আয়োজন।

মনে মনে ধীরার নিপুণ ব্যবস্থার যথেষ্ট সুখ্যাতি করে প্রসন্ন চিত্তে মলী সেন অভিনয়ের জন্য সজ্জাবিন্যাসে ব্যাপৃত হলেন। বাঁ হাতের ঘড়িটা খুলে রাখলেন ড্রেসিং টেবিলের উপরে। ডান হাতের চুড়ি ক'গাছা, গলার মফচেন ও কানের দুল দুটি রেখে দিলেন টেবিলের দেরাজে। একটা ড্রেসিং গাউন জড়ালেন গায়ে। কপালের ঠিক উপর থেকে একখানা তোয়ালে জড়িয়ে মাথার চুলগুলি ঢেকে দিলেন এমনভাবে যাতে মেক-আপের পেইণ্ট বা পাউডারের ছোপ না লাগে। ডান হাতের তর্জনী দ্বারা শ্বেত চীনেমাটির জারটা থেকে অনেকখানি ক্রীম তুলে নিয়ে দু'হাতে মাখতে সুরু করলেন কণ্ঠে ও কপোলে।

আগন্তুকের ছায়া পড়ল সম্মুখের দর্পণে।

"কে, ধীরা ? ইস্ একেবারে পরীর মতো সেজেছিস যে ! দেখে মাথা খারাপ হবে যে ছেলেদের।" বললেন মলী সেন।

প্রশংসায় প্রীত ধীরা বলল, "যাও !"

"সত্যি বলছি, শাড়িটা খাসা। আমারই পরতে লোভ হচ্ছে। মা দিয়েছেন বুঝি ?"

"তুমি বেশ লোক যা হোক ! মা দিতে যাবেন কেন ? তুমিই তো কিনে দিয়েছ। দেখে চিনতে পারছ না ?"

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নূতন শাড়ি কেনা অভ্যাস যাঁর, তাঁর পক্ষে সব শাড়ি মনে রাখা সম্ভব নয়। মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কিনে দিয়েছি ? কৈ মনে পড়ছে না তো !"

"মা গো, কী ভুলো মন তোমার ! গেল পুজোর আগের পুজোয় তুমি আর আমি এগজিবিশানে যাই নি ? মনে নেই, সেই যে হঠাৎ সুধাংশু মামাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ? তুমি দুটো শাড়ি কিনে একটা দিলে সুধাংশু মামার বউকে, আর একটা আমাকে !"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। সে কি এই শাড়িটে ? তখন তো এত সুন্দর মনে হয় নি। তুই পরেছিস বলেই বোধ হয় এখন এত ভালো দেখাচ্ছে।"

ধীরা সলজ্জ হাসি হেসে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা সুধাংশু মামা আজ আসবেন না থিয়েটার দেখতে ?"

"কী জানি, হয়তো আসতেও পারেন।"

"তিনি অনেকদিন আসেন নি কিন্তু, না মলী মামী ?" মন্তব্য করল ধীরা।

মলী সেন সে-প্রশ্নটা এড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর কি সুধাংশু মামার জন্য মন কেমন করছে না কি ?"

"না, মন কেমন করবে কেন ? তবে তিনি এলে বেশ হতো। তিনি এর মধ্যে থাকলে থিয়েটার নিশ্চয় আরও অনেক ভালো হতো।"

সে-কথা মলী সেনের অজানা ছিল না। গান, বাজনা, অভিনয়, চড়ুইভাতি সব কিছুই সুধাংশুর উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মলী সেন চুপ করে রইলেন। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। ধীরাকে যাই কেন না বলুন, তিনি নিজে নিশ্চিত জানেন, সুধাংশু আজ আসবে না। শুধু আজ নয়, আর বোধ হয় কোন দিনই সে আসবে না। এ-সব উৎসব-আয়োজনের সঙ্গে চিরদিনের মতোই সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে তার। অথচ এমন একদিন ছিল—।

থাক, সে কথা স্মরণ না করাই ভালো। যে যায় সে এমন করেই যায় ! ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে কুড়োতে যাবেন না মলী সেন। যা ফুরায়েছে তাকে ফুরোতে দেওয়ার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন। কবিগুরুর কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ক্ষণিকা'ই তাঁর সর্বাধিক প্রিয়।

মলী সেনের চিন্তায় বাধা পড়ল।

"মলী মামী, একজন লোকের সঙ্গে একবার কথা বলবে ?"

অকস্মাৎ এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ধীরা যে, স্পষ্টই বোঝা গেল, কথাটা নিয়ে মনে মনে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরে হঠাৎ কোন রকমে সে মুখ থেকে বের করেছে।

মুখে ক্রীম মাখতে মাখতে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সে ?"

"আমার একজন বন্ধু মানে—ইয়ে—একটি চেনা ছেলে।"

মলী সেন পিছন ফিরে ধীরার পানে তাকালেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "বন্ধু ?"

অত্যন্ত বিব্রতভাবে মাটির দিকে চোখ রেখে ধীরা বলল, "না, ঠিক বন্ধু নয়, মানে, আমার সঙ্গে পড়ে একটি মেয়ে, তারই দাদা।"

মলী সেন ঈষৎ হাস্য করে সকৌতুক কণ্ঠে বললেন, "বটে ! হাঁউ মাঁউ খাঁউ, রোমান্সের গন্ধ পাঁউ। বন্ধু নয়, বন্ধুর দাদা ! ব্যাপারটা খুলে বল দিকিন, শুনি।"

"বাঃ রে, খুলে বলার আবার কী আছে এর মধ্যে ?"

"কিছুই নেই ? উহুঃ, এ যে মনে হচ্ছে, ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।"

এ যুগের মামীরা ভাগিনেয়ীদের সঙ্গেও পরিহাস করতে ছাড়েন না। বিশেষতঃ হৃদ্যতাটা যদি প্রগাঢ় হয়।

"তুমি ও রকম দুষ্টুমি করলে আমি চলে যাব কিন্তু।"

ধীরা প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মলী সেন সহাস্যে বললেন, "আরে শোন, শোন, কোথায় যাচ্ছিস ? আমাকে সবটা বললে লাভই হবে। যুদ্ধে এবং প্রেমে 'এ্যালাই' থাকা ভালো। জানিস তো, তোর মা আমার কথা কেমন মানেন ? আমার সুপারিশ আঁচলে বেঁধে, চাই কি, একেবারে নির্বিঘ্নে বাসরঘর অবধি পোঁছতে পারবি।"

"যাঃ।" ধীরা লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে উঠল।

মলী সেন সস্নেহে ধীরাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "যাঃ কি রে ? দেখি, দেখি, মুখ তোল। ও মা তাই তো, ধীরা আমাদের সে ধীরা আর নাই তো ! সত্যি, বেশ বড় হয়ে উঠেছিস যে। ঠাট্টা নয়। আমাকে কিছু লুকোসনে।"

কিছুটা ধীরার সলজ্জ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বীকৃতিতে, কিছুটা বা মলী সেনের সহৃদয় জিজ্ঞাসায় বিষয়টা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হলো। সমীর লাহোরে মেডিকেল কলেজে পড়ে। ধীরার সহপাঠিনী তার মাসতুতো বোন। তাদের বাড়ীতেই ধীরার সঙ্গে প্রথম দেখা।

দেখতে ? ছাই, হাত-পাগুলি চোয়াড়ের মতো। একটা আস্ত গুণ্ডা বললেই হয়। পদ্য লেখা ? রামচন্দ্র ! দু'লাইন বাংলায় চিঠি লিখতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। শুধু খেলা নিয়ে পাগল। কলেজ কামাই করে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার কমেন্ট্রী শুনবে রেডিওতে। সিনেমা ? না, সিনেমায় তারা যায় নি কখনও। হ্যাঁ, দু'দিন বেড়াতে গিয়েছে বটে। বিকেলে, গঙ্গার ধারে।

মলী সেন পরিহাসতরল কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, "এ্যাঁ, দু'জনে লুকিয়ে নদীর ধারে ? একেবারে ধীরা-সমীরে যমুনারই তীরে—?" তার পর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, "আমাদের অভিনয় দেখতে এসেছে বুঝি ? যা, ডেকে নিয়ে আয়। আগে দেখি, রোমিও মশাই আমাদের জুলিয়েট ঠাকরুণের যোগ্য কি না।"

ছেলেটি সত্যি সুদর্শন। দীর্ঘ, সুঠাম গড়ন, সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, মুখে বুদ্ধির আভা। ঘরে দ্বিতীয় চেয়ার ছিল না ; জামা কাপড়ের ওয়াড্রোব-ট্রাংকটার উপরে বসতে দিয়ে মলী সেন আলাপ করতে লাগলেন।

ধীরা মলী সেনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। তার কল্যাণ মলী সেনের বিশেষ কাম্য। তিনি কথাচ্ছলে অতি নিপুণতার সঙ্গে সমীরের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন। তার পড়াশুনা, খেলাধুলা ও ভবিষ্যৎসম্পর্কে অনেক উৎসাহ দিলেন।

সমীর বিদায় নিতে চাইলে ধীরাকে বললেন, "কিছু খেতে-টেতে দিয়েছিস ওকে ? সে কী রে ? এই বুঝি তোর হসপিট্যালিটি ? এক্ষুণি উপরে আমার বসার ঘরে নিয়ে যা। ফ্রীজে আইসক্রীম আছে। না না, তোমাকে অত লজ্জা করতে হবে না। খেতে পারবে না বৈ কি ? খুব পারবে। জানো তো, সুশীল ও সুবোধ বালক যাহা পায় তাহা খায়।" মলী সেন কৌতুকোচ্ছল সস্নেহ দৃষ্টিতে সমীরের দিকে তাকালেন।

বোঝা গেল, পাত্রটি পছন্দ হয়েছে মলী মামীর।

সজ্জাকক্ষ থেকে বেরিয়ে দোতালার ড্রয়িং রুমে বসে মলী সেনের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সমীর। বাস্তবিক অনেক কিছু জানা শোনা আছে ধীরার মামীমার। ঠিক বলেছেন, আজকাল জেনারেল প্র্যাকটিশনারদের পসার নেই। লোকে ভাবে, জ্যাক অব অল ট্রেড। স্পেশিয়েলিস্ট না হলে রোগীরা ডাকে না। হ্যাঁ, বিলাতে গিয়ে সে গাইনেকলজি অ্যাণ্ড অবস্টেট্রিক্‌সে স্পেশিয়েলিস্টই হবে।

ভারি চমৎকার কথা বলতে পারেন কিন্তু মলী মামী। নিখুঁত এ্যাকসেন্ট, বিলেতী মেমসাহেবদের মতো। সাধারণ কলেজে পড়া বাঙালী মেয়েদের মতো হিস্‌টরিক্যাল বলেন নি একবারও ; সেকেণ্ড সিলেবল-এ জোর দিয়ে বলেছেন, হিস্‌ট্রিক্যাল। ধীরা লক্ষ্য করেছে কী ?

আর ক্রিকেটেরই বা কত খবর রাখেন ! বললেন, এদেশে পেস্‌ বোলারের অভাব।

সে যদি ভালো সুইং করাতে শেখে, তবে হয়তো বছর কয়েক পরে টেস্ট ম্যাচে চান্স পেতেও পারে। সত্যি তো, এ কথাটা তো সমীর কখনো ভাবে নি!

ফটোগ্রাফিতেও মলী মামীর যথেষ্ট উৎসাহ আছে! আশ্চর্য! লাইকার নাম করতেই কেমন বলে দিলেন, ওতে প্রত্যেকটি ছবি এনলার্জ না করালে সুখ নেই; বড্ড বেশী খরচ। তার চাইতে রোলীকর্ড বা রোলীফ্লেক্স ভালো। সমীরের এ্যালবামটা দেখতে চেয়েছেন। কালই তাঁকে সেটা এনে দেখালে—।

হঠাৎ খেয়াল হলো সমীরের, সে একাই কথা বলে যাচ্ছে। শ্রোত্রীটির কাছ থেকে কোনো সমর্থনসূচক সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো!

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মলী মামী নিজেও ফটো তোলেন বুঝি?"

"জানিনে।"

ধীরার কণ্ঠের নিস্পৃহতায় সমীরের বিস্ময় বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সে সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন না করে আইসক্রীমের প্লেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "প্লেট একটা কেন? তুমি খাবে না?"

"না।"

"সে কি হয়? তুমি না খেলে আমিও খাচ্ছিনে। আইসক্রীম তো তুমি খুব পছন্দ—"

অসহিষ্ণু স্বরে বাধা দিয়ে ধীরা বলল, "আঃ কেন মিছে বকাচ্ছ? তোমার খেতে হয় খাও, না হয়, বাইরে ফেলে দাও।"

ধীরার এই অহেতুক উষ্মায় হতবাক সমীর মিনিট খানেক তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। সে ভেবেই পেল না, হঠাৎ কোথায়, কখন এবং কী তার অপরাধ ঘটেছে!

সমীর প্রেক্ষাগারে ফিরে গেলে ধীরা চুপ করে ড্রয়িং রুমেই বসে রইল। তীব্র অসন্তোষ ও ক্রোধে তার মন দগ্ধ হতে লাগল। কিন্তু কেন এই বিরক্তি, কার উপরে এই রাগ, তার কোনো হদিস খুঁজে পেলে না।

সমীরের দোষ কী? সে তো কথা উঠলেই ঠাট্টা করেছে। ধীরা নিজেই তো তাকে এক রকম জোর করে মলী সেনের কাছে নিয়ে গেছে। সমীর মলী সেনের প্রশংসা করেছে? তাতে রাগ করার কি আছে? মামীর প্রশংসা সে নিজে যতখানি করে, এত আর করে কে? এর আগে সমীর কি তাকে মলী মামীর পাবলিসিটি অফিসার বলে কম পরিহাস করেছে? ধীরা কোন সংগত কারণ ভেবে পায় না।

তার রূঢ়তায় আহত সমীরের মুখে সুস্পষ্ট বেদনার ছায়া ও ভীত অপরাধীর মতো ঘর থেকে তার নিঃশব্দ প্রস্থান স্মরণ করে ধীরার বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকল। অথচ তার প্রতি উদ্যত অভিমানকেও কোন মতেই সে মন থেকে তাড়াতে পারল না।

মলী মামী তাকে কত গভীর স্নেহ করেন, তা সে জানে। সমীরকে তিনি অবজ্ঞা করলে ধীরা নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হতো! তিনি যে সমীরকে যথেষ্ট সমাদর করেছেন তাতেও সে প্রসন্ন হতে পারল না। তার মনে অযথা অভিযোগ খচখচ করতে লাগল। নিজের হৃদয়ের এই দুই বিপরীত ভাবধারার কঠিন ঘাত প্রতিঘাতে সে কণ্টকারণ্যে মৃগশিশুর ন্যায় অবিরত ক্ষত বিক্ষত হতে থাকল।

অন্ধকার রাত্রির নির্জন গ্রাম্য পথে একক যাত্রীর মনে অজ্ঞাত আশংকার মতো কি

যেন এক অনিশ্চিত অমঙ্গলের ছায়া আচ্ছন্ন করল ধীরার মন। কিছুতেই সে ভেবে পেল না, কেন যে ঝড়ের রাতে উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের মতো তার বুকের কাছে দুর্নিবার কান্নার ঢেউ ক্ষণে ক্ষণে কেবলি উদ্বেল হয়ে উঠছে।

"কী হে বীরেশ্বর, তুলি হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছ যে? কার ধ্যান করছ? কলালক্ষ্মীর, না, গৃহলক্ষ্মীর?" বলে সিদ্ধনাথ সহাস্যে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরেশ্বর চমকে উঠে পুনরায় অংকনকার্যে মনোনিবিশের উদ্যোগ করলেন। বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঈষৎ চাপ দিয়ে টিউব থেকে তুলির উপরে রং মাখিয়ে নিতে নিতে সলজ্জে উত্তর দিলেন, "দাদা, এ বয়সে কি আর কোনো লক্ষ্মী বর দেবেন যে, ধ্যান করব?"

"ঠিক বলেছ ভায়া। আমাদের বয়সে লক্ষ্মী সরস্বতীকে ডেকে আর কাজ নেই। তার চেয়ে বরং নন্দী মামাকে ভজনা করা ভালো। খুশি হয়ে যদি দু'চার হন্দর সিদ্ধি পাঠিয়ে দেন তো এই কন্ট্রোলের দিনে ব্লাক মার্কেট করে কিছু গুছিয়ে নিতে পারি। হাঃ হাঃ হাঃ।" সিদ্ধনাথের অট্টহাস্য প্রায় সিকি মাইল দূর থেকে শোনা যায়।

বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায় সিধুদা'? আমাদের পাবলিসিটি অফিসার লাহিড়ী যে চারদিকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।"

"ওঃ, তাই নাকি? আর বল কেন ভাই, গিন্নী সেই থিয়েটারের নাম শোনা ইস্তক আজ একমাস ধরে রোজ দু'বেলা শাসাচ্ছেন, তিনি অভিনয় দেখতে আসবেনই। যত বলি, আমার দু'লাইনের পার্ট, প্রায় মৃত সৈনিকের ভূমিকা বললেই চলে। সে আর দেখে কি হবে? তত তাঁর জেদ বাড়ে। মনে মনে বোধ হয় ঠাউরেছেন যে, নিশ্চয়ই রাজপুত্র-টুত্র সেজে এই বৃদ্ধ বয়সে কোনো সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে প্রেম করব, তাই তাঁকে দেখতে দিতে চাইনে। হোঃ হোঃ হোঃ" বলে আর একদফা উচ্চ হাস্য করলেন সিদ্ধনাথ।

তুলির রেখার উপরে দৃষ্টিরেখে অংকনরত বীরেশ্বর বললেন, "বেশ তো, আসুন না।"

"তুমি তো ভায়া বলেই খালাস। এদিকে আমাকে যে এখানকার ব্যবস্থা ফেলে রেখে ছুটতে হয়েছে বাড়িতে। এত করে বললাম, পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এসো। না, আমাকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসা চাই। বলেন, অন্য কোনো সাধারণ সিনেমা, থিয়েটারে আর কাউকে নিয়ে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে আমার বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপার, আমার সঙ্গে না এলে নাকি তাঁর সম্মানের হানি ঘটে! কী আর করি? হুজুরাণীর হুকুম তো না মেনে রক্ষে নেই।" বলে সিদ্ধনাথ অসহায় কাতরতার ভঙ্গি করলেন।

কিন্তু এই কপট অভিযোগের অন্তরালে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতির যে সুনিশ্চিত প্রমাণ তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হলো সেটা বীরেশ্বরের মতো অমনোযোগী মানুষের পর্যন্ত দৃষ্টি এড়ায় না।

"তোমার শ্রীমতী আসছেন কখন?" সিদ্ধনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

বীরেশ্বর সংশয়ের স্বরে বললেন, "কী জানি, আসবেন কি না—"

"আসবেন কি না কী হে ? বলেন নি তোমায় কিছু ? অবাক করলে। দেখছি, ছবিতে যত রাজ্যের সুন্দরীর মুখ এঁকে এঁকেই গেলে, নিজের স্ত্রীর মুখের পানে তাকাবার বুঝি আর সময় পেলে না ? ওহে, বুড়োমানুষের কথাটা মনে রেখো. বাড়ির গিন্নীটি সবার আগে। ও-সব বান্ধবী-টান্ধবী হচ্ছে বিলাতী ডিনার সুট। ফিটফাট, ধোপ দুরস্ত। সন্ধেবেলা পরে ক্লাবে, পার্টিতে যেতে মন্দ নয়। স্ত্রী হলো আমাদের সেকেলের দোলাই। কাট, ছাট, ইস্তিরির জৌলুস নেই বটে, কিন্তু এমন কাজের জিনিষ আর নেই ভাই। গ্রীষ্মে কাঁধে চাপালে, শীতে গায়ে জড়ালে, রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় বাঁধলে।" বলে নিজের রসিকতায় নিজেই উৎফুল্ল হয়ে আর একপ্রস্ত অট্টহাস্য করলেন সিদ্ধনাথ।

বীরেশ্বরকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য আরোপ করে উপদেশ দিলেন সিদ্ধনাথ "না হে, যা বলছি শোন। এক্ষুণি বাড়ি চলে যাও, বউমাকে নিয়ে এস। বুঝেছি, একটু মনান্তর হয়েছে আর কি। সে কিছু নয়। এক সঙ্গে ঘর করতে গেলে অমন হয়েই থাকে। এই আমারই দেখ না, গিন্নীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি তো এক রকম লেগেই আছে। তা বলে একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের চলে কি ? এক দণ্ডও না। শাস্ত্রকারেরা তো বলেই গেছেন,—অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে—কী হে পুরো কথাটা ?"

সিদ্ধনাথ ব্যস্ত মানুষ। বেশীক্ষণ এক স্থানে স্থির হয়ে থাকা তাঁর স্বভাবে নেই। ইতস্ততঃ ছুটোছুটি না করলে তাঁর মনে স্বস্তি থাকে না। "যাই দেখিগে এদিকে অর্কেস্ট্রার দল ঠিকমতো এসে পৌঁছেছে কি না। মিসেস সেন যা উতলা মানুষ। হয়তো বা এরই মধ্যে গাড়ি নিয়ে ছুটেছেন তাদের তল্লাসে।" বলে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বীরেশ্বরের হলো কী ? তাঁর হাতের তুলি চলতে চায় না কেন ? মালতীর পদশব্দে তাঁর খেয়াল হলো, প্রায় মিনিট দশেক তিনি তুলি রেখে দিয়ে নিঃশব্দে নিষ্ক্রিয় বসে আছেন। আত্মস্থ হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাই তো, বাড়ি গিয়ে নিজে সুবলাকে নিয়ে এলে হয়। কী আশ্চর্য, এ-কথাটা তো এর আগে খেয়াল হয় নি।

অসমাপ্ত অঙ্কনকার্যের ভার মালতীর হস্তে ন্যস্ত করে তিনি চললেন মলী সেনের সন্ধানে।

বেশী দূর যেতে হলো না।

মলী সেন বুঝি বীরেশ্বরের খোঁজেই আসছিলেন। বীরেশ্বর বললেন, "মিসেস সেন, আমাকে একবার বাড়ি যেতে—"

বাক্য সমাপ্ত করার অবকাশ পেলেন না। মলী সেনের মুখের পানে তাকিয়ে অর্ধ পথেই থেমে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী মিসেস সেন ? কী হয়েছে ?"

"এই দেখুন কাণ্ড" বলে মলী সেন বীরেশ্বরের দিকে একটি পুস্তিকা এগিয়ে দিলেন। অভিনয়ের প্রোগ্রাম।

অভিজাতগণের অভিনয়োৎসব অভিনয়ের পরিচয় পুস্তিকা—প্রোগ্রামটি—একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। অবশ্য তাতে অভিনয় সংক্রান্ত তথ্য অতি সামান্যই থাকে। এক পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন, কোনোটা জড়োয়া গহনার, কোনোটা

বিলাতী প্রসাধন দ্রব্যের, কোনোটা বা সিগারেট বা চা বিক্রেতার। অপর পৃষ্ঠায় প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পনির্দেশক ইত্যাদির নাম। পৃষ্ঠান্তরে অভিনয়ের কোনো বিশেষ দু'একটি দৃশ্যের আগের ভাগে তোলা ফটোগ্রাফ এবং নায়ক-নায়িকাদের ছবি।

এ ধরনের অভিনয় যাঁরা হামেশাই দেখেন, তাঁরা জানেন, প্রোগ্রামে মুদ্রিত বেশীর ভাগ মহিলার ফটোগ্রাফস্থ তন্বীদেহের সঙ্গে তাঁদের বর্তমান মেদবহুল বপুর মিল অতি সামান্যই থাকে। সেটা আশ্চর্য নয়। কারণ সেগুলি অন্ততঃ সাত-আট বৎসর আগে তোলা ফটোগ্রাফ। প্রোগ্রামে মুদ্রণের জন্যই সযত্নে নির্বাচিত। আসলে সেগুলি—মা যাহা ছিলেন : মা যাহা হইয়াছেন নয়।

মুদ্রণ পারিপাট্যে ও গঠন সৌষ্ঠবে এ-সব ক্ষেত্রে অভিনয়ের চাইতে অভিনয়ের প্রোগ্রামটিই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষক হয়; আধুনিক ইভিনিং পার্টিতে অধিকাংশ মেয়ের রূপের চাইতে পোষাকের মতো।

এই অভিনয়েরও একটি মনোহারিণী পরিচয় পুস্তিকা রচনার জন্য মলী সেনের ব্যগ্রতার অবধি ছিল না। বহু দিন বীরেশ্বরের সঙ্গে তার পরিকল্পনা, আকৃতি ও মুদ্রণ সম্পর্কে বহু জল্পনা কল্পনা করেছেন। মলী সেনের আশা ছিল, বহুবর্ণে চিত্রিত ক্রিসমাস্ কার্ডের মতো এক টাকা মূল্যের এই সুদৃশ্য প্রোগ্রামটিও অভিনয়ান্তে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য দর্শকজনের ড্রয়িং রুমে মেণ্টেলপীসের শোভা বর্ধন করবে। হায়, তার পরিণতি দেখে মলী সেনের প্রায় দুঃখে কান্না পাওয়ার উপক্রম। ক্রোধে বীরেশ্বরের বাকরোধ।

বহু ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত অতি পুরাতন আংশিক ভগ্ন টাইপে মুদ্রিত, মফঃস্বল আদালতের নীলাম ইস্তাহারের মতো অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন। অভিনেতা, অভিনেত্রীগণের ছবিগুলি বিকৃত ও মসীলিপ্ত। অতি নিকট আত্মীয়গণের পক্ষেও এই ছবি থেকে ছবির পাত্রপাত্রীদের সনাক্তকরণ দুঃসাধ্য। কাণ্ডই বটে। প্রায় লংকাকাণ্ড বললেই হয়।

ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বীরেশ্বর বললেন, "প্রেসের ম্যানেজারকে ধরে চাবকানো দরকার। এ তো সিলেকশান—আসল আর্ট পেপারই নয়। ইমিটেশান। এই কাগজে আর্ট প্লেট ছাপা চলে!"

মলী সেন এ-সব টেকনিক্যাল ব্যাপার সামান্যই বোঝেন। তিনি মিনতি করে বললেন, "এ প্রোগ্রাম তো কারো হাতে দিতে পারব না। যা হয় একটা উপায় করুন, বীরেশ্বরবাবু।"

বীরেশ্বর বললেন, "সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাকে যে এখন একবার বাড়ি যেতে হচ্ছে মিসেস্ সেন।"

"বাড়ি এখন থাক, বীরেশ্বরবাবু, আপনি একবার না হয় প্রেসেই গিয়ে দেখুন, যদি কিছু করা যায়।"

"প্রেসে অন্য কাউকে পাঠালে হয় না? সুবালাকে—মানে আমার স্ত্রীকে একবার—"

বাধা দিয়ে কাতর কণ্ঠে মলী সেন বললেন, "অন্য আর কাউকে দিয়েই এ-কাজ হবে না। দোহাই আপনার বীরেশ্বরবাবু। এক্ষুণি একবার গাড়িটা নিয়ে যান, এই প্রোগ্রাম নিয়ে কাউকে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। আর দেরী করবেন না। প্লিজ।"

ঊর্ধ্বশ্বাসে বীরেশ্বরকে ছুটতে হলো ছাপাখানার উদ্দেশে।

নিশ্চিত মনে বেশ-বিন্যাসের সুযোগ যেন আর কিছুতেই মিলবে না মলী সেনের। তার প্রসাধন কক্ষের দ্বারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

মুখে ফাউন্ডেশান লোশান লেপনে ব্যস্ত মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ?"

বাইরে থেকে যে নাম উচ্চারিত হলো, তা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া না গেলেও বোঝা গেল, নারীকণ্ঠ।

মলী সেন ভিতরে আসতে বললেন।

দোর ঠেলে প্রবেশ করলেন নীরজা।

"এ কী, তুমি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছ ? সাজতে হবে না ? ওঃ তাই তো, তোমার তো পার্ট একেবারে চতুর্থ অঙ্কে। তেমন তাড়া নেই।" বললেন মলী সেন।

নীরজা নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু চাই কি ?"

"না।"

যদিও বিনা প্রয়োজনে মলী সেনের প্রসাধন কক্ষে নীরজার প্রবেশ কিছু একটা অভাবনীয় অঘটন নয়, তবু মলী সেনের মনে হলো, উত্তরটা যথার্থ নয়।

নীরজা সমীরের পরিত্যক্ত আসন ওয়াড্রোব-ট্রাঙ্কটার উপরেই চেপে বসলেন। খানিক চুপ করে থেকে আবার বললেন, "মলীদি তোমাকে একটা কথা বলব। রাগ করবে না, বল ?"

মলী সেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীরজার পানে তাকালেন। কিন্তু নীরজা মলী সেনের দৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্বাক বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর আর্তকণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমাকে তুমি মেরে ফেলো না মলীদি।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "মানে ?"

চকিতে আসন থেকে উঠে এসে নীরজা নতজানু হয়ে মলী সেনের হাত দুটি চেপে ধরলেন। বললেন, "মিস্টার রয়কে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না, দোহাই তোমার, তাঁকে তুমি ছেড়ে দাও।"

সকাতর প্রার্থনার ভারে কণ্ঠ তাঁর করুণ, দুর্দমনীয় আবেগে দেহ তাঁর কম্পিত। মলী সেনের কোলের মধ্যে মাথা রেখে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বারংবার বলতে লাগলেন, "দয়া কর, আমাকে দয়া কর, মলীদি।"

স্বভাবতঃ শান্তস্বভাব নীরজার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে অভিভূত মলী সেনের যেন আর বাকশক্তি রইল না। কঠিন আঘাতে হতচেতন ব্যক্তির মতো তিনি নিশ্চল নিস্তব্ধ বসে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে নীরজা আত্মসংবরণ করে উঠে দাঁড়ালেন। আপন অঞ্চলে অশ্রুসিক্ত দুই চক্ষু মার্জনা করে নিজের আসনে ফিরে গেলেন। ম্লান হেসে বললেন, "আমাকে নিশ্চয় পাগল ভাবছ। অন্যায় নয়। উম্মাদ না হলে এমন অসম্ভবের পানে আমি হাত বাড়াব কেন ? কিন্তু আমার সব কথাও আজ তোমাকে শুনতে হবে।"

চিত্রার্পিতের মতো নির্জীব মলী সেন বহু আয়াসে শক্তি সঞ্চয় করে উচ্চারণ

করলেন, "বেশ, বল।"

নীরজা বিদুষী নয়। কথোপকথনেও তার তেমন দক্ষতা নেই। কিন্তু জগতে সত্য মাত্রেরই একটি অনাড়ম্বর অথচ অপ্রতিরোধনীয় আবেদন আছে। অতি অকিঞ্চিৎকর কাহিনীও তার প্রভাবে হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। নীরজার মুখে নিরলঙ্কার বর্ণনায় সত্যের সেই ঋজু, সহজ রূপটি তার সামান্য জীবন কাহিনীকেও একটি কমনীয় মাধুর্য দান করল।

কন্যা জন্মের পূর্বেই নীরজার পিতা লোকান্তরিত হন। তিন বছর বয়সে মাও মারা গেলেন। মামার বাড়িতে মানুষ নীরজা জ্ঞান হওয়া মাত্রই শুনেছে, সে দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, তার বিয়ে হওয়া দায়।

আশংকাটা মিথ্যা নয়। তার গায়ের রং মিশ্ কালো, হাত দুটি সরু সরু, কপালটা মস্ত এবং দাঁতগুলি মারাত্মকরূপে অসমান। মামী রাগ করে বলতেন, দিনের বেলায়ও নাকি নীরজাকে দেখে ছোট ছেলেরা আঁতকে উঠতে পারে।

কিন্তু বিয়ের দুর্ভাবনা দেখা দেওয়ার অনেক পূর্বেই মাতুল ও মাতুলানী গ্রামের মড়কে মরলোক থেকে পরলোকে পাড়ি দিলেন। একদল খৃস্টান মিশনারী এসেছিল ঔষধপত্র নিয়ে মহামারী নিবারণে। তাঁদের মধ্যে এক সন্তানহীনা মহিলা নীরজাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। তাঁরই অনুগ্রহে নীরজা ম্যাট্রিক পাশ করলেন। ততদিনে নীরজার বুদ্ধি হয়েছে। বুঝেছেন, রূপহীনা মেয়েদের কপালে বর নিয়ে ঘর করার সম্ভাবনা অল্প। তাদের খেটে খেতে হয়।

কিন্তু চাকরীর বাজারেও স্টেনোগ্রাফার নির্বাচনে অফিসারেরা স্পিডের সঙ্গে চান অন্ততঃ চলনসই চেহারা। শিক্ষয়িত্রী নিয়োগেও স্কুল-কমিটি এম. এ. বি. টি-র মুখ না দেখে ভর্তি করেন না। স্ত্রী জাতীয় পেশার মধ্যে বাকী থাকে নার্সিং। দু'বছর ট্রেনিং নিয়ে নীরজা নার্স হলেন।

বসন্ত দিনের পুষ্পবনে যখন প্রজাপতির মেলা বসে, তখন পথের ধারে নাম-গোত্রহীন অনাদৃত ফুলের চার পাশেও নাকি ভ্রমরের আনাগোনা ঘটে। আশ্চর্য নয়। শ্রীহীনা নীরজার দুয়ারেও একদিন ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি প্রসারিত হলো।

লোকটা হাসপাতালেরই একজন তরুণ ডাক্তার। তাঁর স্তুতি শুনে নীরজার প্রথম জ্ঞান হলো,—তিনিও নারী; যুগযুগান্ত হতে পুরুষের আরাধনার ধন। ভুলে গেলেন, তিনি কুদর্শনা। মনে হলো, অনুরাগের চন্দনতিলক ললাটে ধারণ করে জগতের সমস্ত কবিজনের কল্পলোক-বিহারিণী তিলোত্তমা, হেলেন ও ক্লিওপেট্রাদের রাজ্যে এই সামান্য নীরজারও একটি অসামান্য পরিচয় আছে।

তারপর একদিন পূজা হলো সাঙ্গ। পূজারী হলেন নিখোঁজ। স্বর্গলোকচ্যুত দেবী তাঁর মাটির মূর্তিতে ফিরে এসে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়লেন ধূপহীন, দীপহীন, ক্ষান্তস্তব, স্তব্ধপাঠ, পরিত্যক্ত মন্দিরের শোকাবহ দীনতার মধ্যে। সেই কলঙ্কিত পরাভবের দুরপনেয় লজ্জায় নিজের কুরূপ নিজের কাছে দ্বিগুণিত কদর্যতায় আবার নতুন করে প্রকট হলো।

অশ্রুমোচন করে নতুন হাসপাতালে কর্ম সন্ধান করলেন নীরজা। সেখানেই একদিন এ্যাম্বুলেন্স বহন করে আনল বসন্ত রোগাক্রান্ত মরণোন্মুখ নিখিলকে। তার আরোগ্যের আশা মাত্র ছিল না কারো মনে।

এ-রোগে চিকিৎসাসুযোগ সামন্য। পরিচর্যাই প্রধান। প্রত্যহ শত শত পীড়িত লোক নিয়ে যাদের কারবার, তাদের কাছে কোন বিশেষ লোকের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ প্রত্যাশা করা বৃথা। হাপাতালে একজন নতুন রোগী আর একটি নতুন 'কেস' মাত্র। আর কিছু নয়। কেন যে এ-রোগীটির প্রতি নীরজার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো, তা আজও তার কাছে অজ্ঞাত। ভয়াবহ ছোঁয়াচে ব্যাধির সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে প্রাণপাত পরিশ্রম ও পরিচর্যা দ্বারা নীরজা নিরাময় করে তুললেন নিখিলকে।

সে-ঋণ নিখিল জীবনে ভোলেন নি।

আরোগ্যান্তে নার্সদের পুরস্কার দেওয়ার রীতি নতুন নয়। সত্যি সত্যি প্রাণদান করেছেন যিনি, কৃতজ্ঞ নিখিল তাঁকে স্ফীত অংকের চেক লিখে দিলেন। নীরজা সে টাকা মাথায় ঠেকিয়ে সযত্নে বাক্সে তুলে রাখলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, কোনো দুর্দিনে এর একটি কপর্দকও স্পর্শ করবেন না।

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে চৈত্রের খর রৌদ্রে বিশুষ্ক জলাশয়ের কোন প্রান্তে যে কলমীলতার মূল সংগোপনে লুকিয়ে থাকে, তা কেউ জানে না। নবীন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণেই সেই অদৃশ্য লতার নব পত্রোদ্গম ঘটে। নীরজার হৃদয়েরও যে ভাবাবেগ একদা প্রবঞ্চনার অগ্নিদাহে নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়েছে বলে তার ধারণা ছিল, অলক্ষিত জলসিঞ্চনে কখন যে তার আবার নতুন অঙ্কুর দেখা দিয়েছে, সে-সন-তারিখ তাঁর নিজেরও জানা নেই।

রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ানের সঙ্গে ঝগড়া করে হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিতে হলো নীরজাকে।

খবর পেয়ে নিখিল এসে প্রস্তাব করলেন, তার অসুস্থ পিসিমাকে প্রত্যহ নিয়মিত দেখা শোনা করার। নীরজা বুঝলেন, পিসিমা উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য, যতদিন তার অন্যত্র স্থায়ী কর্মসংস্থান না ঘটে ততদিন পরোক্ষে অর্থসাহায্য।

এ পক্ষেও টাকাটা গৌণ, মুখ্য নিখিলের সান্নিধ্য। মাইনে একবেলার, কিন্তু নীরজা দুবেলাই নিখিলের বাড়ি আসতে লাগলেন।

পিসিমার পরিচর্যার প্রয়োজন সামান্য ছিল। দেখা গেল, রোগীর চাইতে সুস্থ লোকের প্রতিই নার্সের দৃষ্টিটা যেন বেশী প্রখর। নিখিল দেখেন, আজকাল তার আহার্যে নিত্য নতুন ব্যঞ্জন, রুমালে মনোরম সূচীশিল্প, আলমারীতে হাতে বোনা সুদৃশ্য পুলোভার।

এক বন্ধু ডাক্তার নতুন ক্লিনিক খুলেছিলেন। নিখিল সুপারিশ চিঠি দিয়ে নীরজাকে পাঠালেন তাঁর কাছে। নীরজা রাস্তায় চিঠিখানা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ডাস্টবিনে। পরদিন এসে নিখিলকে বললেন, ডাক্তার আগেই অন্য নার্স নিযুক্ত করেছেন। চাকরি খালি নেই আর।

ভক্তিমতী গৃহিণীরা পাথরের ঠাকুর পুজো করেন পরম নিষ্ঠায়। নানা উপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরেন তাঁর সামনে। ঠাকুর প্রসন্ন হন কিনা, কে জানে? নীরজার মনেও সংশয় জাগে। তাঁর অর্ঘ্য কি সমস্তই বৃথা?

অবশেষে পাষাণেও চাঞ্চল্য দেখা গেল। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে সহস্র যোজন দূরবর্তী ভূখণ্ডের মৃদুতম কম্পনটুকু পর্যন্ত রেখাপাত করে। তার চাইতেও বহুগুণ স্পর্শকাতর তন্ত্রী আছে মানুষের হৃদয়ে। দৃষ্টির অগোচর

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের সামান্য আভাসটুকু পর্যন্ত ধরা পড়ে তাতে। নীরজা আবিষ্কার করলেন, ক্লাবের প্রতি সম্প্রতি নিখিলের মনোযোগটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সভয়ে অনুমান করলেন, আকর্ষণটা কেবলমাত্র তাস বা টেনিস বলের মতো নির্জীব বস্তুর প্রতি নয়।

নিখিলের সহায়তায় ক্লাবে ভর্তি হওয়া নীরজার পক্ষে কঠিন নয়। সেখানে প্রথম পদার্পণেই বুঝতে পারলেন, কোথায় আছে নিখিলের আনন্দের উৎস, কার হাতে আছে নীরজার মৃত্যুবাণ। অনুরক্ত নারীর চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। তার দৃষ্টি দূরবীক্ষণের মতো সন্ধানী, অণুবীক্ষণের মতো তীক্ষ্ম।

নীরজার আত্মকাহিনী সমাপ্ত হলে মলী সেন কয়েক মিনিট অধোমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আশা করো, মিস্টার রয় তোমাকে বিয়ে করবেন।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত নীরজা উত্তর দিলেন, "না। আমি জানি, সে কোনো দিন সম্ভব নয়।"

"তিনি তোমাকে ভালোবাসেন ?"

"জানিনে।"

"মিথ্যে কথা। পুরুষের ভালোবাসা টের পায় না এমন মেয়ে জগতে নেই। তুমি ভালো করেই জান, তোমার প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই।" দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মলী সেন।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে নীরজা বললেন, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক।"

"তবে ?"

সত্যি তো, তবে ? এই তবের কোনো জবাবই নেই নীরজার। কী কামনা করেন তিনি ? কিসের প্রত্যাশা তাঁর ? কেন এই ঈর্ষাভারাক্রান্ত হৃদয়ের নিরন্তর আকুলি-বিকুলি ?

নীরজা বললেন, "মলীদি, যুক্তি দিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। সত্যি বলছি তোমাকে, এতদিন ভাবতেম আমার মনে ঝাপসা কিছুই নেই। জানতেম, মিস্টার রয় চিরকাল একলা থাকবেন না। একদিন তাঁর ঘরে সত্যিকার গৃহকর্ত্রী আসবে ; মাইনে-করা নার্সের নকল গৃহিণীপনার আর প্রয়োজন থাকবে না। সে দিন দুঃখ করব না। যথার্থ অধিকারীর হাতে আমার গায়ে-পড়া দায়িত্বভার তুলে দিয়ে সহজ-ভাবেই আমি বিদায় নেব। কিন্তু সম্প্রতি বুঝেছি, সে সমস্তই ভ্রান্তি। বুঝেছি নিজের মনকেও মানুষ সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারে না।"

মলী সেন মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গিতে বললেন, "সে-জন্যই আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন।"

নীরজার কানে এ কথা আদৌ প্রবেশ করল কি না সন্দেহ। তিনি আপন বক্তব্যেরই অনুবৃত্তি করে বলতে লাগলেন, "কতদিন কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি যে, যতটুকু পাওয়া সম্ভব, তার বেশীতে আমার লোভ নেই। বাস্তবের প্রথম আঘাতেই সে ভুলের ঘোর ভেঙেছে। যাঁকে আমার হাতে পাইনি, তাঁকে তোমার হাতে হারাবার শংকাতে আজ আমি অস্থির। বুঝেছি, নাটক উপন্যাসের মহীয়সী নায়িকার মতো নিঃস্বার্থ প্রেমের গৌরব ঘোষণা করা আমার সাধ্য নয়। যে বলে, ভালোবেসেই সুখী, প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখিনে, না মলীদি, সে মেয়ে আমি নই।"

মলী সেন এমন সতেজ-সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী চাও?"

"আমি মন দিতে চাই, মন নিতে চাই।"

মলী সেন কিছুটা বিদ্রূপ কিছুটা বা যুদ্ধের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'বটে? কিন্তু মাই ডার্লিং, ভালোবাসা তো ক্রিস্‌মাস্‌ প্রেজেণ্ট নয়। সাণ্টাক্লস তা কারো জন্য বয়ে আনে না। সেটা জয় করার ধন; ভিক্ষে করার নয়।"

"আমি বুঝেছি। কিন্তু তোমার এ চ্যালেঞ্জের কোনো বাহাদুরী নেই, মলীদি! প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলে সমানে সমানে। তুমি আর আমি কি এক? তোমার অসামান্য রূপ, তোমার প্রখর বুদ্ধি, তোমার অগাধ ঐশ্বর্য। তোমার সমস্ত সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছ অতি কুরূপা, কুলহীনা, বিত্তহীনা, নগণ্য এক নারীর বিরুদ্ধে। এ যে মোহনবাগানের সঙ্গে নেবুতলার ম্যাচ্‌। এই জয়ের বড়াই কর তুমি? ধিক!"

মলী সেন ড্রেসিং টেবিলের উপরে ঘড়িটার পানে তাকিয়ে বললেন, "অভিনয় সুরু হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। আমাকে তৈরী হতে হবে, নীরজা। এ প্রসঙ্গ থাক। সেকালে স্বামী নিয়ে ঝগড়া হতো সতীনে সতীনে। কিন্তু একালে সখা নিয়ে কলহ চলে না কারো সঙ্গে। অন্ততঃ নার্সের সঙ্গে তো নয়ই।"

কঠিন অপমানের তীব্র আঘাতে মুহূর্তের জন্য নীরজার সমস্ত দেহ যেন অসাড় হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলেন। দুহাত দিয়ে ওয়াড্রোব-ট্রাংকটার প্রান্ত দুটি সবলে চেপে ধরে কোনমতে যেন নিজেকে পতন থেকে রক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি আমার চেয়েও অযোগ্য, তোমাকে ঈর্ষা করবো না, করুণা করব।"

ধীর, শান্ত, সংযত পদক্ষেপে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন নীরজা। দীনার মত সংকোচে নয়, রাণীর মতো সম্ভ্রমে।

"এ কী, আপনি এখানে?"

প্রশ্ন শুনে শিবনাথ পিছনে তাকিয়ে দেখলেন সত্যাসিন্ধু। একটু হেসে বললেন, "অবাক হচ্ছেন কেন? এখানে কি আমার অনধিকার প্রবেশ?"

সত্যসিন্ধুও পরিহাসতরল কণ্ঠেই বললেন, "তা জানিনে। তবে আপনাকে ঠিক প্রত্যাশা করি নি। রেসকোর্সে কি কেউ পাদ্রীদের দেখবে আশা করে বা স্টক এক্সচেঞ্জে স্বামীজীদের?"

শিবনাথ বললেন, "সে কি কথা? আপনি কি এখনও আজকের বিশ্ববার্তা দেখেন নি? প্রচারসচিব সুরেন লাহিড়ী শুনতে পেলে যে আপনার আর মুখদর্শন করবেন না।"

"বটে? লাহিড়ী তাঁর প্রচার পত্রিকায় আপনাকে আজকের অভিনয়ে প্রধান অভিনেতা বলে উল্লেখ করেছে নাকি?"

"না,—অতখানি জলজ্যান্ত মিথ্যা বোধ হয় তাঁর কলমেও আটকায়। বলেছেন, —প্রয়োগকর্তা।"

"ক্ষুণ্ণ হবেন না। নিয়ম রক্ষার জন্য ওটা দরকার। জানেন তো, আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ পত্রে নিবেদকের নাম দিতে হয় বাড়ির সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির, যদিও হয়তো সরিকী ঝগড়ার ফলে অন্য সময়ে তাঁর সঙ্গে মুখ দেখা-দেখি পর্যন্ত বন্ধ।" সত্যসিন্ধু হাস্য করালন।

শিবনাথও না হেসে পারলেন না। একটু থেমে বললেন, "নাটকে আপনার পার্ট কি, ডাক্তার ঘোষ?"

সত্যসিন্ধু জবাব দিলেন, "একমাত্র বিদূষকের ভূমিকা ছাড়া কিছুতেই আমাকে মানায় না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, আজকাল নায়কেরাই বিদূষকের মত আচরণ করে। তাই আলাদা করে নাটকে ও-পার্টটা আর থাকে না।"

শিবনাথ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে আপনি আমারই দলে, শুধু দর্শক।"

সত্যসিন্ধু আধা পরিহাস ও আধা গাম্ভীর্যের স্বরে বললেন, "দর্শক সে-কথা ঠিক। তবে আপনার সগোত্র বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে।"

"কেন?" বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন শিবনাথ।

"আসলে আপনিও অভিনেতাদেরই দলে। আজকের নাটকের কুশীলবদের সঙ্গে আপনার তফাৎ শুধু এই যে, যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পালা শেষ। আপনার পালা চলছে অহোরাত্র। না, শিবনাথবাবু। আপনার অদৃষ্টকে ঈর্ষা করিনে। গ্রীণ রুমটা স্টেজের সঙ্গেই ভালো। সেটাকে সত্যিকার জীবনে টেনে আনলে দুর্গতির আর সীমা থাকে না। ও কী? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠছেন যে! না, না আমার কথায় অনাবশ্যক গুরুত্ব দেবেন না যেন। ও-সব আমার স্বগতোক্তি মাত্র। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে যে আমরা মণ্ডশিল্পীর স্টেজ সাজানোর ব্যাপারে বড়ই অসুবিধা ঘটাচ্ছি। চলুন ঐ দিকটায়।"

বীরেশ্বর এসে বললেন, "মিসেস সেন, আমি একটু আমার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।"

মলী সেন বললেন, "অভিনয় সুরু হতে আর আধ ঘণ্টাও বাকী নেই। এখন বাড়ি যাচ্ছেন কী রকম?"

"অভিনয়ে আমার যা কাজ তা সবই শেষ হয়েছে।"

"শুধু সিন, সিনারি আঁকা শেষ হলেই আর্ট ডিরেক্টারের কাজ ফুরোয়, ভেবেছেন বুঝি?"

"সেগুলি যাতে ঠিক মতো যথাসময়ে ব্যবহার হয়, তার ব্যবস্থাও করেছি। প্রথম দৃশ্যের জন্য স্টেজ সেট করাই আছে। পরের দুটো দৃশ্যের সাজ সরঞ্জামও জড়ো করা হয়েছে। এখন যবনিকা তুললেই হয়।"

মলী সেন মাথা নেড়ে বললেন, "না হয় না! অপনি নিজে সর্বক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে না থাকলে দেখবেন কোন কিছুই নির্ভুল হবে না।"

এ বিষয়ে অবশ্য বীরেশ্বরের মনেও কিছুটা শংকা ছিল। যদিও তিনি সহকর্মীদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন, তবুও তাঁর ভয়, হয়তো পটোত্তোলনের পরে

দেখা যাবে, কুঞ্জবনের দৃশ্যে রাজপথের চিত্র, অথবা রাজসভার দৃশ্যে জলের প্রস্রবণ। বললেন, "আমি সেই কাল বিকেল থেকে এখানেই আছি। এখন একবার বাড়ি না গেলে—"

"আপনার স্ত্রী ভাববেন যে, হয় হারিয়ে গেছেন, নয়তো ছেলেধরায় ধরেছে!" কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন মলী সেন।

বীরেশ্বর হেসে বললেন, "না, তা ঠিক নয়। তবে স্ত্রীর কারণেই বাড়ি যেতে হচ্ছে সেটা ঠিক।"

"ব্যাপার কী?"

"তাঁকে অভিনয় দেখতে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।"

"সেজন্য আপনার যাওয়ার প্রয়োজন কী? আমি এক্ষুণি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"না, গাড়ি পাঠালে হবে না। আমিই যাব।"

"কেন, বলুন তো?"

একটু ইতস্ততঃ করে বীরেশ্বর বললেন, "সুবালা, মানে আমার স্ত্রী, একটু—ইয়ে—যাকে বলে রিজার্ভড। আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে না আসলে হয়তো আসবেনই না।"

মলী সেন জানেন, মঞ্চসজ্জার সমুদয় আয়োজন একেবারে ত্রুটিলেশহীন না হওয়া পর্যন্ত বীরেশ্বরের ক্ষান্তি নেই। তাঁর দিক থেকে অভিনয়ের সমুদয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না করে তিনি স্টেজ থেকে একদণ্ডও অন্যত্র যাবেন না। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য বীরেশ্বরের অনুপস্থিতিতে মলী সেনের বিশেষ আপত্তি ছিল না। তিনি বীরেশ্বরের অনুরোধে সম্মত হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের স্ত্রীর উল্লেখ মাত্রই মলী সেনের মত পরিবর্তন ঘটল।

সুবালাকে তিনি কখনও দেখেন নি। তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেনও না, তবুও মলী সেনের মনে হলো, এই অজ্ঞাত, অপরিচিত মহিলাটি অন্তরালে থেকে অভ্রভেদী ঔদ্ধত্যে তাঁকে যেন দ্বন্দ্বে আহবান করেছে। বীরেশ্বরের গতিবিধি নিয়েই যেন দু'পক্ষের ক্ষমতার পরীক্ষা। বীরেশ্বরকে এই দণ্ডে বাড়ি যাওয়া থেকে নিবৃত্ত না করতে পারলেই যেন এই টেস্টে মলী সেনের ইনিংস ডিফিট! তিনি শক্ত হয়ে বললেন, "কিন্তু এখন তো আপনার এখান থেকে নড়া সম্ভব নয়, বীরেশ্বরবাবু।"

"আমার বেশী বিলম্ব হবে না। আমি ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি। খুব সম্ভব অভিনয় সুরু হওয়ার আগেই ফিরে আসতে পারব।"

"আমি জানি, পারবেন না। কিন্তু আপনি যখন মন স্থিরই করে ফেলেছেন তখন আর এ নিয়ে তর্ক করে কী ফল?"

বীরেশ্বর সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "একান্ত প্রয়োজন না হলে আমি কখনও, আপনি বিশ্বাস করুন—"

বিরস কণ্ঠে বললেন মলী সেন, "বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এর মধ্যে কী আছে, বীরেশ্বরবাবু? আর এত অনুরোধ উপরোধেরই বা প্রয়োজন কী? আমি স্কুলের হেডমাস্টারও নই, এখানে কেউ আমার মাইনে করা কর্মচারীও নয় যে, আমার অনুমতি

না নিয়ে তারা কোথাও যেতে পারবে না। এই সাহায্য রজনীর উদ্যোগ করেছি আমি। নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ও দর্শকদের কাছে ভালো-মন্দ জবাবদিহির দায়ও আমারই। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য যতটুকু করেছেন, ততটুকু আপনাদের মহত্ত্ব। তার চেয়ে বেশী প্রত্যাশা করাটাই ভুল।"

স্পষ্টই বোঝা গেল, মলী সেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

বিস্ময়ের কিছুই নেই। বেচারী আজ মাসখানেক ধরে এই অভিনয়ের জন্য কী কঠোর পরিশ্রমটাই না করেছে। কোনো কারণে অভিনয় যদি শেষ পর্যন্ত সার্থক না হয়, তবে সমস্ত ব্যর্থতার লজ্জা তো তাঁরই। মঞ্চসজ্জা নিয়ে তাঁর এই উৎকণ্ঠা তো স্বাভাবিক।

বীরেশ্বর হৃদয়ঙ্গম করলেন। অনুতপ্ত হয়ে বললেন "আমার অন্যায় হয়েছে, মিসেস সেন। অভিনয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্টেজ থেকে আমি নড়ছি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অন্ততঃ মঞ্চসজ্জার দিক থেকে অভিনয়ে খুঁত থাকতে দেব না।"

ব্যস্। আউট। একটি ইন্-সুইঙ্গারে সুবালার লেগ স্ট্যাম্প উড়িয়ে দিয়েছেন মলী সেন।

খুশি হলেন। কিন্তু মনোভাব সম্পূর্ণ গোপন করে কিছুটা উদ্বেগের ভঙ্গিতে বললেন, "কিন্তু আপনার স্ত্রী যদি আপনি না গেলে সত্যি না আসেন, তবে তো—"

"আমি একবার তাঁকে টেলীফোন করার চেষ্টা দেখিগে।"

প্রস্থানরত বীরেশ্বরের পানে তাকিয়ে সদ্য জয়লাভের আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন মলী সেন। মৃদুকণ্ঠে একটা গানের কলি গুন্ গুন্ করতে করতে পুনরায় প্রসাধন সুরু করলেন। গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে মনে মনে বললেন, "যে কোনো পুরুষ মানুষকে দিয়ে যা ইচ্ছে করাতে পারি আমি। হ্যাঁ, যা ইচ্ছে তা-ই। তর্জনী সংকেতে যদৃচ্ছা চালনা করতে পারি তা'কে।"

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আপনার অপরূপ দেহলাবণ্যের দিকে তাকিয়ে সগর্বে ভাবলেন মলী সেন, তিনিই সেই অনন্যা নারী, রূপকথার রাজপুত্রেরা যাঁর কমল নয়নের প্রসাদ যাচঞা করে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করেছে দুঃসাধ্য সাধনে। বেদপুরাণের যোগীঋষিরা যুগযুগান্ত ধরে অর্জিত তপস্যার ফল নিমেষে ডালি দিয়েছে যাঁর চরণে। নগণ্য সুবালা! তাঁর জন্য অবজ্ঞামিশ্রিত কারুণ্য বোধ করলেন মলী সেন।

পদশব্দে মলী সেন পিছনে তাকিয়ে দেখলেন,—সত্যসিন্ধু।

অপ্রত্যাশিত। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। মন খুশিতে ভরা ছিল, তারই প্রকাশ ঘটল অভ্যর্থনায়। স্নিগ্ধ হাস্যে সুরের রেশ টেনে বললেন, "কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া?"

সত্য জবাব দিলেন, "ত্রুটি স্বীকার করছি। কিন্তু শঙ্কিত হয়ো না। প্রণয় নিবেদন করতে আসি নি।"

আনন্দের যে-জাল বুনেছিলেন মলী সেন এতক্ষণে নিজের মনে মনে, মুহূর্তে সে খান্ খান্ হয়ে ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

আহত কণ্ঠে বললেন, "তা জানি। কিন্তু যদি আসতেই, তাতেই বা এমন অগৌরব ছিল কী ? রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন। 'সঞ্চয়িতা'খানা আনতে বলব কী ?"

"থাক, দরকার হবে না। স্মৃতিশক্তি সমস্তটাই এখনও লোপ পায় নি। কিন্তু আমি তো উত্তরায়ণ বা শ্যামলীতে বসে পাঁচশ ভল্যুম রচনাবলী লিখতে পারিনে। আমি সাধারণ মানুষ। জীবনদেবতার চাইতে জীবনসঙ্গিনীর প্রতি আমার বেশী লোভ। ভূমার চাইতে ভূমিকে আমি অধিকতর সত্য মনে করি। তাই এ্যাডমায়ারার প্লেটে "অলসো র‍্যান"-এর সংখ্যা বাড়াতে আমার প্রবৃত্তি নেই।"

ম্লান হেসে মলী সেন বললেন, "কোনো কিছুই একেবারে ষোল আনা সঙ্গে না পেলে তোমার মন ওঠে না। মনোভাবের দিক দিয়ে তুমি হচ্ছ একজন ঝানু ক্যাপিট্যালিস্ট। হেনরী ফোর্ড বা জি. আর. ডি. টাটার সগোত্র। আর যাই হোক সিন্ধু, তুমি আধুনিক নও।" কথার শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর কৌতুকে লঘু চপল হয়ে উঠল।

অনুরূপ পরিহাসতরল কণ্ঠে সত্য জবাব দিলেন, "সানন্দে স্বীকার করছি, আমি অনাধুনিক। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রাইভেট ওনারশিপই আমার পছন্দ। হৃদয়াবেগের ন্যাশন্যালাইজেশানে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এ-সব বৃহৎ তত্ত্বকথার আলোচনা আপাততঃ থাক। আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। না, ঘড়ির দিকে তাকাতে হবে না। আমি কয়েক মিনিটের বেশী সময় নেব না। শুধু কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।"

মলী সেন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর পানে তাকালেন।

সত্য এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বললেন, "বিষয়টা আমার পক্ষে একটু সংকোচের, ইংরেজীতে যাকে বলে এম্বেরাসিং। শুনে তুমি যদি অনধিকারচর্চা বলে থামিয়ে দিতে চাও, তা'হলেও আমি অভিযোগ করব না।"

"ভূমিকা তো হলো। এবার বলো।" বললেন মলী সেন।

"প্রশ্নটা মিস্টার ব্যানার্জী—শচীন সম্পর্কে।"

মলী সেন দৃষ্টি নত করে বললেম, "কী জানতে চাও ?"

ঠিক সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সত্য বললেন, "সাধারণতঃ অন্য লোকের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো আমার স্বভাব নয়। চরকা নিজের থাকলে তাতেও তেল দিতেম কি না সন্দেহ, পরেরটা তো দূরের কথা। কিন্তু শচীনের ব্যাপারটার দিকে চোখ বুজে থাকতে পারছিনে। তাঁর মা আমার দূর সম্পর্কে বোন। তাঁকে তুমি কখনও দেখেছ ?"

"না। তবে তাঁকে আজ আমাদের অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ করেছি। হয়তো আসবেন।"

"খুব সম্ভব আসবেন না। সংসারে এসব আনন্দ উৎসবের আসরে কখনও কোথাও তাঁকে দেখেছি, স্মরণ হয় না। শচীন তোমাকে তাঁর কথা কী বলেছে ?"

"বিশেষ কিছু নয়। শুধু এই যে ভগবানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস, আর ছেলের উপরে অসীম স্নেহ।"

"পুত্রস্নেহ কোন মায়ের কম ? কিন্তু এই মহিলা যেন অন্য সকল মায়ের চাইতেও বেশী মা। জীবনে বহু দুঃখ পেয়েছেন তিনি। সে জন্যেই আমার ভয়।"

"কিসের ভয় ?"

"বিধবা বুঝি বা তাঁর সর্বশেষ আশা ও অবলম্বন একমাত্র ছেলের দিক থেকেও ঘা খান।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে মলী সেন বললেন, "অর্থাৎ সাদা কথায়, ভয় আমাকে ?"

সত্যসিন্ধু সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "নিজের অজ্ঞাতেও আমরা অনেক সময়ে অপরের দুঃখের কারণ হই। অনিচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের দৃষ্টান্তও পৃথিবীতে কম নেই। সে-বার আমাদের পাড়ায় দেওয়ালীর রাত্রে দূরবর্তী এক ছাদ থেকে জ্বলন্ত বাজির একটা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে একটা বড় বস্তিকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। কত দরিদ্র হলো গৃহহীন, কত দুঃস্থ হলো সর্বস্বান্ত। অথচ যারা বাজি পোড়াচ্ছিল তাদের মনে তো কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না।"

মলী সেন বললেন, "সিন্ধু তুমি যা বলতে চাও সোজা করেই বল। কোদালকে কোদাল বললে বুঝতেও সহজ, চিনতেও কষ্ট নেই। সাধু ভাষায় খনিত্র নাম দিয়ে তাকে অনাবশ্যক রহস্যময় করে তুলো না।"

সত্য বুঝলেন, তর্কে অবতীর্ণ হচ্ছেন মলী সেন। পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ল। কতদিন কত বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে তাঁদের। প্রখর মলী সেনের বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ তাঁর অনুভূতি, অসাধারণ তাঁর বাকনৈপুণ্য, জোরালো তাঁর যুক্তিজাল। তর্কে তাঁকে সহসা পরাজিত করা কারো পক্ষে সহজ নয়।

নিজেও প্রস্তুত হয়ে বললেন, "বেশ, তাই বলছি। শচীনকে তুমি মুক্তি দাও।"

বটে ! এও তো সেই, "আমাকে দয়া কর মলীদি"রই ঈষৎ পরিবর্তিত ভাষণ—রিভাইজড্ ভার্সন। মেয়েলী অনুনাসিক কান্নারই পুরুষালী পুনরাবৃত্তি ! অসহ্য !

নিজের মনে মনে মলী সেন নীরজার সেই অবজ্ঞাভরে প্রস্থানের অপমানে নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছিলেন। তাই ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। অগ্নিস্রাবী দুই চক্ষু সত্যসিন্ধুর পানে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "মুক্তি ? কার কাছ থেকে ?"

"মিথ্যা থেকে, অলীক স্বপ্নবিলাস থেকে, তার আপন মোহপাশ থেকে।" উত্তর করলেন সত্য।

মলী সেন এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। নম্র স্বরে বললেন, "শচীনকে আমি পছন্দ করি, এ যেমন মিথ্যা নয়, আমাকে তার ভালো লাগে এও তেমনি সত্য। একে অস্বীকার করতে চাও তুমি ?"

"না, চাইনে। কিন্তু সংসারে ভালোলাগা নিয়ে বিপদ বাধে না। কারণ তার তো কোনো দায় নেই। যত গোল ভালোবাসা নিয়ে। তার দাবী যে অফুরন্ত। তোমার কথা ভাবিনে। তুমি চিরকাল দোরকেই ঘর ভেবে আনন্দ পাও। তোমার ভুল ভাঙ্গাবার চেষ্টা বৃথা। দুঃখ হয় শচীনের জন্য।"

খোঁচাটা মলী সেনকে যথেষ্টই বিঁধল। কিন্তু সে নিয়ে কলহ না করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কারণ ?"

"কারণ, সাগর-তরঙ্গ তো ক্যানিউটের আজ্ঞা মেনে চলে না। শচীনের ভালোলাগার স্রোত তো তোমার ভালোলাগার সরু ধরা-বাঁধা খাদ বেয়েই চিরকাল বইবে না। কবে, কখন যে সে ক্ষীণ ধারা হৃদয়ের একূল-ওকূল দু'কূল ছাপানো প্লাবনে ভালোবাসার

বিরাট সমুদ্রে পরিণত হবে. হতভাগ্য তা জানতেও পারবে না। তারপরেই সুরু হবে আশাভঙ্গের পালা।"

"কিন্তু আশা যদি হয় অসম্ভবের তবে মনস্তাপ থেকে তাকে ঠেকাবে কে? শচীন চায় আমাকে বিয়ে করতে।"

"কী বললে?" বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সত্যসিন্ধু। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না।

"হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যাবেলা সে রীতিমতো ফর্ম্যালী প্রপোজ করেছে। পাগল আর কাকে বলে?"

মিনিট কয়েক দুজনেই চুপ করে রইলেন। সত্যসিন্ধু মনে মনে বোধ হয় সমস্ত বিষয়টা পর্যালোচনা করলেন। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অনেকটা অর্ধ-স্বগতোক্তির মতো বললেন, "না, এতটা আমিও ভাবতে পারি নি। ব্যাড্, অফুল ব্যাড্।"

"আমাকে কী করতে বল?"

"শচীনকে বিয়ে করতে বলি না নিশ্চয়। না, পরিহাসের বিষয় বা সময় এটা নয়। কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার কালও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ক্ষতি যা ঘটার তা ঘটেছে।"

মলী সেন আহত হলেন।

কথা বলার ভঙ্গিটা দেখ না একবার! ক্ষতি ছাড়া কারো কোনো ভালো করেন নি যেন তিনি কোনো দিন। শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "মন্দ ছাড়া আমার কাছে তুমি আর কী আশা কর? কিন্তু জান, এই মন্দ মলী সেনের জন্যই তোমাদের শচীন ব্যানার্জী একদিন আন্দামান বা জেলের হাত থেকে বেঁচেছে?"

"সে কী?"

"হ্যাঁ, সে মিশেছিল সন্ত্রাসবাদীদের দলে। বোমা তৈরী করে দেশ স্বাধীন করার মতলবে। সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে আনলে কে? স্বদেশী ডাকাতিতে পুলিশের হাতে যে ধরা পড়ে নি, সে কার অনুগ্রহে? খোঁজ রাখ তার? একবার বরং তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো।"

বিস্মিত সত্য অনুরোধ করলেন, "সবটা খুলে বলো তো, শুনি।"

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই.—

সেবার পুজার ছুটিতে কলকাতা থেকে শিলং যাচ্ছিলেন মলী সেন। স্বামী শিবনাথ সোজা দোকান থেকে ষ্টেশনে এসে ট্রেনে উঠবেন, কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গাড়ী ফেল করলেন। রিজার্ভ করা কম্পার্টমেণ্টে একা শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন মলী সেন। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ ও যাত্রীদের আর্তনাদে জেগে উঠে দেখেন, গাড়ি নিশ্চল, বাইরে অন্ধকার এবং ভিতরে মানুষের অস্পষ্ট ছায়া।

আলোর সুইচ টিপতেই চোখে পড়ল, দরজার কাছে মেঝেতে একটি যুবক। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বার বার পড়ে যাচ্ছে। মলী সেনকে বলল, "আপনি ভয় পাবেন না। আমরা টেররিস্ট। পাশের কামরায় মারোয়াড়ীর সঙ্গে হাজার কুড়ি টাকা আছে খবর পেয়েছিলাম। অন্ধকারে ভুল করে আপনার গাড়িতে উঠে পড়েছি। আমার সঙ্গীরা শিকল টেনে পালিয়েছে। আমি তাড়াতাড়িতে গাড়ির জানালা দিয়ে লাফাতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছি। নড়তে পারছিনে। যাক,

এক্ষুণি লোকজন এসে পড়বে। আশা করি, কাঁধে করেই বয়ে নিয়ে যাবে থানায়। পায়ে হেঁটে আর কষ্ট করতে হবে না।" বলে সে মৃদু হাস্যের চেষ্টা করল।

বিশিষ্ট চেহারার মতো কোনো কোনো মানুষের হাসিরও একটা আলাদা জাত আছে। অন্য আর পাঁচজনের চাইতে তা এতই স্বতন্ত্র যে, একবার দেখলেই তা ব্রোমাইড পেপারের গায়ে ফটোগ্রাফের রেখার মতো মনের ফলকে দাগ কেটে বসে। বিস্ময়ে হতবাক, ভীত, সচকিত মলী সেনও তরুণ বিপ্লবীকে তার হাসি থেকেই চিনলেন।

মনে পড়ল, বছরখানেক আগে এক এগজিবিশনের দরজায় মোটর থেকে নামতেই চাঁদার বাক্স এগিয়ে ধরেছিল একটি যুবক তাঁর সামনে। হাতের ব্যাগ খুলে একটা টাকা দিতে যাচ্ছিলেন। যুবকটি বাধা দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "মাত্র এক টাকা দিচ্ছেন যে ? দশ টাকার নোট বের করুন।"

এ কী রকম চাঁদা সংগ্রহের রীতি রে বাপু ! এ তো প্রার্থনা নয়, এ যে হুকুম !

কৌতুক বোধ করে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি চাঁদা কুড়োতে এসেছেন, না, ইনকাম ট্যাক্স আদায় করতে এসেছেন ?"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সহাস্যে জবাব দিল যুবক, "হ্যাঁ, ট্যাক্স বললেও ক্ষতি নেই। কনশেন্স্‌ট্যাক্স। যাদের শোষণ-করা-পয়সায় বড়মানুষি করে বেড়াচ্ছেন, সেই গরীবদের জন্য মাঝে মাঝে কিছু দেওয়াকে দান ভেবে গর্ব বোধ করবেন না। বরং নিজেদেরই বিবেক শান্ত রাখার একটা সুযোগ পাচ্ছেন মনে করে কৃতজ্ঞ থাকবেন। এ তো ভিক্ষা দিচ্ছেন না ; প্রায়শ্চিত্ত করছেন।"

কথাগুলি শ্রুতিকটু। ভাষাটাও খুব রুচিকর নয়। কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে একজন অজ্ঞাতকুলশীল চাঁদাপ্রার্থীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদে ব্যাপৃত হতে যে-কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলারই সম্মানে বাধে।

কোন কথা না বলে মলী সেন অবজ্ঞার সঙ্গে একখানা নোট ফেলে দিলেন চাঁদার বাক্সে। ফুঃ। এমন কত দশ টাকা কত সময়ে এখানে ওখানে হারিয়ে যায় মলী সেনের।

চাঁদা যে নিল সে ক্রোধে ও বিরক্তিতে আরক্ত মলী সেনের মুখের পানে চেয়ে শুধু একটু হেসে বলল, "ধন্যবাদ।"

সে হাসিতে না ছিল শ্লেষ, না ছিল অনুকম্পা, না ছিল অভিযোগ। সকাল বেলার শিশিরে ধোয়া প্রস্ফুটিত গন্ধরাজের শ্বেত পাপড়ির মতো সে হাসিটি নির্মল। সন্ধ্যাবেলার নির্মেঘ আকাশে প্রথম তারাটির মতো স্নিগ্ধ। মলী সেনের মন থেকে অনেক দিন তা মোছে নি।

ট্রেনের বাইরে রেলের লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত পদধ্বনি শোনা গেল। মুহূর্তে মন স্থির করলেন মলী সেন। ক্ষিপ্রহস্তে শচীনের হাত থেকে একপাশে ছিটকে-পড়া রিভলভারটা গাড়ির জানলা দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে। নিজের বিছানার একটা কম্বল ও বালিশ তুলে নিয়ে দ্বিতীয় শয্যা রচনা করলেন ওদিককার বার্থে। বললেন,—"বাঁচতে চান তো, চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ুন বিছানায়। আমি মলী সেন। মনে রাখবেন, আপনার নাম শিবনাথ। কলকাতায় পটলডাঙ্গায় বাড়ি, বড়বাজারে ব্যবসা। কেউ প্রশ্ন করলে বলবেন, স্ত্রী নিয়ে পূজার ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন শিলংএ। বাকীটা আমি সামলাব।"

কিন্তু উঠতে বললেই যদি ওঠা যেতো, তবে পালাতেই বা বাধা ছিল কি ? নিজ

চরণের অভদ্র আচরণে বিব্রত নকল শিবনাথ কোনোমতে মলী সেনের বাহুতে ভর দিয়ে নির্দিষ্ট বার্থে আশ্রয় নিলেন।

বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসের অসম্ভব কাহিনীর মতো প্রায় অবিশ্বাস্য পরিবেষ্টনে সেই আকস্মিক যোগাযোগ স্মরণ করলে আজও তাঁরা দু'জনেই বিস্মিত বোধ করেন।

হত্যার প্রতি একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে প্রত্যেক নারীরই অন্তরে। তাঁদের কাছে রাজনৈতিক বিশেষণের দ্বারাই হত্যাকাণ্ড কৌলিন্য লাভ করে না। তাই পিস্তলতান্ত্রিক দেশোদ্ধারব্রতের নরঘাতন নিষ্ঠুরতা থেকে শচীনকে নিরস্ত করার নিরন্তর প্রয়াস করেন মলী সেন।

দিনের পর দিন তর্ক করেন, কলহ করেন। করেন অনুরোধ, অনুনয় ও অভিমান। প্রতিনিয়ত ঘর্ষনের দ্বারা নাকি পাথরও ক্ষয় করা যায়, দেশসেবীর প্রতিজ্ঞা কোন ছার? ধীরে ধীরে কোন অদৃশ্য প্রক্রিয়ায় নিজের অলক্ষ্যে তার মত পরিবর্তন ঘটেছে, তা শচীন জানে না। মলী সেন জানেন।

অচিরেই বিপ্লববাদের নভোমন্ডল থেকে খসে পড়ল একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক।

কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে, বস্তুর বিনাশ নেই। আছে রূপান্তর। সেই ক্ষীণদ্যুতি নক্ষত্র নতুন জন্ম নিয়ে নবরূপে দেখা দিল ক্ষুদ্র সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশায় ভরা বিচিত্র জীবনের বিস্তীর্ণ আকাশে শুক্লা চতুর্দশীর রাতে স্নিগ্ধ চন্দ্রমার মতো। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, চাঁদের আলো তার নিজের নয়। কোন সূর্য থেকে আলোক আহরণ করছে শচীন সে তথ্যও কি ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে?

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত শুনলেন সত্যসিন্ধু। বললেন, "তোমার, সাহস, তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তোমার সাফল্যের প্রশংসা করি। কিন্তু শচীনের ভালো করেছ, একথা বলতে পারলে সুখী হতেম। খুনের আসামীকে জেলের চিকিৎসকেরা রোগে ওষুধ দিয়ে বাঁচায়, সুস্থ হলে ফাঁসিতে মরার জন্যে। সে ডাক্তারেরা রোগীর সত্যিকার মিত্র কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"মানে? তুমি কি আশংকা কর—?" মলী সেনের কণ্ঠে উদ্বেগের আভাস।

"করি বললে অত্যুক্তি হবে, করিনে বললেও সত্যভাষণ হবে না। শচীন হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, ইংরেজীতে যাকে বলে ইম্পেচ্যুয়াস। এরা বুদ্ধি দিয়ে বাঁচে না, অনুভূতি দিয়ে বাঁচে। অতীতে তার সমস্ত অস্তিত্বকে জড়িয়ে ছিল উদগ্র স্বাধীনতার স্পৃহা। তাকে সে ছেড়েছে। বর্তমানে তার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিলে তুমি। তাকে তুমি ছেড়েছ। ভবিষ্যতে তার আর অবলম্বন রইল কী? বাকী জীবন সে টিকে থাকবে হয়তো; বেঁচে থাকবে না নিশ্চয়।"

মলী সেন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, "তার কৃতকর্মের সমস্ত দায়িত্ব কি আমার? তার মূর্খতার শাস্তিও কি আমাকেই নিতে হবে? তোমাদের কি এই আইন-কানুন? এ যে দেখছি খাঁটি শিবঠাকুরের আপন দেশ। উঁহু, "প্লিড গিল্টী" বলে মার্সি পিটিশন পেশ করতে পারলেম না। তোমার ওকালতি সত্ত্বেও না।"

"দায়িত্ব তোমার খানিকটা আছে বৈ কি? দিনে দিনে প্রত্যাশা যদি জাগিয়ে থাক, তবে প্রত্যর্থীর প্রার্থনা দেখে আজ রাগ করলেই বা চলবে কেন? কিন্তু মলী, তর্ক করে তো তোমাকে বোঝাতে পারব না। এবার আমি চলি, তোমারও অভিনয়ের জন্য ড্রেস করা দরকার।"

আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "কেন জানিনে, এখনও তোমার ভালো মন্দ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারিনে। বুঝেছি, ক্ষয়রোগের মতো হৃদয়রোগের ব্যাসিলিও বড় মারাত্মক। একবার ধরলে আর কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তোমার কল্যাণ কামনা করি বলেই আমি চাই, শাস্তি তুমি নাও। অন্য কারো হাত থেকে নয়, তোমার নিজের বিবেকের কাছ থেকে। পরের বেদনা আর বাড়িও না।"

সত্যসিন্ধুর কন্ঠের ব্যাকুলতা মলী সেনের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তার শেষ উক্তিটি শোনামাত্রই আবার তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ওঃ, পরের ব্যথার জন্যই যত দুর্ভাবনা! তা'হলে দূর সম্পর্কের বোনের জন্যই আসল দরদ!

উদ্যতরোষ ফণিনীর মতো গ্রীবা উন্নত করে মলী সেন সদর্পে ঘোষণা করলেন,—"জানি তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই আমিও তোমাকে বলছি নীতিকথার সুধাপান করে তৃষ্ণা মেটানো আমার ধাতে নেই। স্বামীর ভালোবাসা পাই নি বলেই সংসারে আর কোনো কিছুতেই আমার অধিকার নেই, এ অনুশাসন আমি মানিনে। আমি জানি, সৃষ্টির আদি থেকে যে নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে আসছে, সে হচ্ছে যোগ্যতমের জয়—সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট। জগতে সর্বত্র যদি প্রতিযোগিতা চলে, তবে শুধু প্রেমের ক্ষেত্রেই তা নিন্দনীয় হবে কেন? আর মাঠে খেলতে নামলে মাঝে মাঝে আঘাত দেওয়া ও আঘাত নেওয়ার আশংকা তো রয়েছেই। তা নিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা নির্বুদ্ধিতা। না, সিন্ধু, কোথায় কোন অনূঢ়া কন্যার বর জোটাতে বিঘ্ন হচ্ছে, কোন কুরূপা নার্সের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের স্বপ্নভঙ্গ ঘটছে, বা কোন বিধবা জননীর দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমি আমার নিজের প্রাপ্য ছাড়ব না!"

গভীর সহানুভূতিপূর্ণ কন্ঠে সত্যসিন্ধু উত্তর করলেন, "সংসারে যা পেতে চাই তাই যে প্রাপ্য নয়, সে কথা জানার দিন তোমার আজও আসে নি। খেলার উপমা দিয়েছ তুমি? কিন্তু ভুলে গিয়েছ যে, তাতেও রুলস্ অব দি গেম বলে একটা কথা আছে। অফসাইড থেকে গোল দেওয়া তো গ্রাহ্য নয়। দোহাই তোমার, মলী, আত্মপ্রতারণা দ্বারা নিজেকে কেবলি নষ্ট করো না। হৃদয় নিয়ে হৃদয়হীনতা দ্বারা নিজের বিড়ম্বিত জীবনের ব্যর্থতাকে আর গভীর করে তুলো না।"

গান সাঙ্গ হলেও থাকে সুরের রেশ। ঝড় থেমে যাওয়ার পরেও কাঁপে নদীর ঢেউ। তর্কেরও সমাপ্তি ঘটে না, বাকরোধ মাত্র। কথা যখন থাকে না মুখে, ব্যথা জেগে রয় বুকে। তাতে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, কাজে মনোনিবেশ অসম্ভব হয়।

ঘড়ির ধাবমান কাঁটার পানে তাকিয়ে মলী সেন শংকিত হলেন। পটোত্তোলনের লগ্ন এগিয়ে আসছে। মিনিটে মিনিটে। দ্রুত প্রসাধন সমাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারে বারে ববিনের সুতো ছিঁড়ে-যাওয়া সেলাইকলের মতো কেবলই থামতে হলো তাঁকে। ক্ষণে ক্ষণে হাত অচল হতে লাগল। আসন্ন অভিনয়ের কথা বিস্মৃত হয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন শচীনের নির্বুদ্ধিতা, নীতিবাগীশ সত্যসিন্ধুর সুনীতি সন্দর্ভ। বিরক্তি বোধ করলেন।

জগতে প্রত্যেক মানুষের বিবেকেই আছে একটি ফুলবেঞ্চ। নিজের বিরুদ্ধে

নিজেরই মামলা চলছে সেখানে অহর্নিশ। তাতে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারা পর্যন্ত মনে শান্তি থাকে না। মলী সেন ভার্সাস মলী সেনের কেসে নিজেই নিজের ব্রীফ নিয়ে মনে মনে সওয়াল সুরু করলেন মলী সেন।

ন্যায়তঃ, স্বভাবতঃ চিরাচরিত নিয়মেই তাঁর যা পাওনা, সংসার কি তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে নি? প্রচণ্ড অন্যায়ের নির্দয় পীড়নে যারা পীড়িত, নিষ্পেষিত, তাদের সামান্য বিচ্যুতির বেলায়ই বুঝি দেখা দেয় যত কাপবুকের বচন? হুঃ, রুলস অব দি গেম। মাই ফুট! অপরিসীম অবজ্ঞায় ওষ্ঠাধর বিকৃত করলেন মলী সেন।

হৃদয় নিয়ে হৃদয়হীনতা! ভাষার গাঁথুনি আছে বটে। কিন্তু এপিগ্রাম দিয়ে তো বাস্তব ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরের ব্যথার কথা ভাবতে হবে তাঁকে। কেন? কিসের জন্য? তাঁর ব্যথার কথা কে বুঝেছে? তাঁর হৃদয়ের খোঁজ রেখেছে কেউ?

মনে পড়ল সুধাংশুকে। মনে পড়ল আট বছর আগেকার একটি চরম শোকাবহ সন্ধ্যা। কালের অনন্ত লিপিতে হৃদয়বিদীর্ণ বেদনার একটি সকরুণ স্বাক্ষর।

সেও ছিল ঠিক এমনি একটা বন্ধু-বান্ধবীর সম্মিলিত উৎসবের উপলক্ষ। মলী সেনের দলের প্রায় জন কুড়ি-পঁচিশ স্ত্রী-পুরুষে মিলে খড়দায় গঙ্গার ধারে এক বাগানে পিকনিকের আয়োজন। প্রত্যুষে মোটরযোগে গমন, সারাদিন অবস্থান, খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা ও গান-বাজনার পরে সন্ধ্যায় কলকাতায় প্রত্যাগমন,—এই ছিল প্ল্যান।

ব্যবস্থা যা কিছু, মলী সেনকেই করতে হয়। তাঁর মত নিখুঁতভাবে সব কিছু করার ক্ষমতা আছে কার? স্থান নির্বাচন করে বাগানের মালিকের অনুমতি সংগ্রহ যেমন করেন তিনি, তেমনই খাওয়ার মেনু তৈরী এবং রান্নার সাজ-সরঞ্জামও যোগাড় করেন তিনিই। কেক কেনা থেকে গাড়িতে পেট্রোল নেওয়া পর্যন্ত সমস্তই তাঁর তদারকে।

প্রশংসনীয় নিপুণতায় পরবর্তী দিনের সমুদয় আয়োজন সমাধা করে সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে আধশোয়াভাবে একটু বিশ্রাম করছিলেন মলী সেন। সুধাংশুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। কাল কোন শাড়িটা পরা যায়, কোন গানটা গাওয়া যায় তার পরামর্শ করবেন। সুধাংশুর রুচি ও বুদ্ধির উপরে মলী সেনের অগাধ বিশ্বাস। তাঁকে না হলে মলী সেনের কোনো কাজই হয় না। কিন্তু সে আজ এত দেরী করছে কেন? দাঁড়াও, আসুক একবার আজ, খুব কষে বকুনি দিতে হবে।

কিন্তু বিলম্ব ক্রোধের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রায় উৎকণ্ঠার কোঠায় না পৌঁছা অবধি সুধাংশুর আর দেখা পাওয়া গেল না। ঘরে ঢুকতেই মলী সেন প্রশ্ন করলেন, "তোমার হয়েছে কী? এমন দুর্ঘট হয়ে উঠেছ কেন? সারাদিন ছিলে কোথায়?"

সুধাংশু জবাব দিলেন, "এখানে, ওখানে, চেম্বারে।"

"বল কী? প্র্যাকটিসে তোমার এত মনোযোগ হলো কবে থেকে? কলকাতা শহরের সমস্ত লোক কি আজকাল দাঁত তোলাতে তোমার চেম্বারেই এসে হাঁ করে বসে থাকে নাকি?"

"না; কিন্তু তাদের জন্য আমাকে তো হাঁ করে বসে থাকতে হয়।"

সুধাংশুর আহত কণ্ঠস্বর মলী সেনকে আঘাত করল।

সুধাংশুর রোগীর সংখ্যা নগণ্য। তাঁর সেই অসাফল্যের প্রতি অতর্কিত ইঙ্গিত ছিল মলী সেনের প্রশ্নে, সে কথা হৃদয়ঙ্গম করে তিনি অনুতপ্ত হলেন। স্নিগ্ধ হাস্যে বললেন, "আমি ঠাট্টা করছিলেম। ও কী, মুখ ভার করে রইলে যে? কী ছেলেমানুষ তুমি! একটুও সেন্স অব হিউমার নেই! আচ্ছা, আমার অপরাধ হয়েছে। মাপ চাইছি। নাও এখন ঐ ইজিচেয়ারটা টেনে বোসো দিকিন। অনেক কথা আছে। দাঁড়াও, বেয়ারাটাকে একটু কফি দিতে বলি। এই বয়, সাবকোবাস্তে—খাবে না? কফিতে তোমার অরুচি? ব্যাপার কী বলো তো?"

সুধাংশু বললেন, "কিছু না।"

মলী সেন মাথা নেড়ে বললেন, "না সুধাংশু, 'কিছু না' বললেই শুনব না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, কোথায় কী একটা ঘটেছে। তুমি যেন কেবলই আলগা হয়ে যাচ্ছ। আমি দেখছি, কালকের পিকনিকে তোমার এতটুকু আগ্রহ নেই। দু'হপ্তা ধরে এর উদ্যোগ আয়োজনে তুমি কখনও মন খুলে যোগ দাও নি।"

সুধাংশু বললেন, "তুমি অনেক খেটেছ। তাড়াতাড়ি শুয়ে ঘুমোও, নইলে কাল ক্লান্ত লাগবে।"

মলী সেন উঠে দাঁড়িয়ে সুধাংশুর পথ রোধ করে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "অমন ভাবে কথা চাপা দিলে চলবে না। না বলে এখান থেকে তুমি এক পা নড়তে পাবে না। আমাকে তুমি ভালো করেই জান। আমাকে চটিও না। এক্ষুণি আমি সবাইকে টেলীফোন করে কালকের পিকনিক বন্ধ করে দেব।"

"তা তুমি পার। কিন্তু সে পাগলামি কর না। বলার মতো বিশেষ কিছুই নেই। শুধু আমার ভালো লাগে না, এই।"

"ভালো লাগে না? কী ভালো লাগে না?"

"এই পিকনিক।"

মলী সেন বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "ভালো লাগে না? এক সময়ে তোমারই তো উৎসাহ ছিল সব চেয়ে বেশী। গত বছর বটানিকসে যাওয়ার উদ্যোগী তো ছিলে তুমিই।"

"ঠিক কথা। গোড়াতে বরং তোমারই আপত্তি ছিল। সে সব আমি ভুলি নি, বউদি। কিন্তু আজ আর আমার এতে মন নেই। শুধু এই পিকনিক নয়, আমাদের ককটেলের পার্টি, গানের জলসা, আমাদের এই সোসাইটি, আমাদের এই জীবন-যাত্রা, কোনো কিছুই আমার ভালো লাগছে না।"

মলী সেন ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, "তোমার ভালো লাগে না, সে-কথা তুমি আমাকে আগে বল নি কেন? আমি কালকের আয়োজন নাকচ করে দিতেম। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কোনোদিন কিছুতে হাত দিয়েছি? তোমার ভালো লাগে না এমন কিছু কখনও করেছি?"

"ঠিক সে কারণেই বলি নি। আমি ভেবেছি, আমার ভালো লাগছে না বলেই তো জিনিষটা মন্দ নয়। তুমি যদি ওতে আনন্দ পাও, তবে ক্ষতি কী? তা ছাড়া, ভেবেছি, ঘরে তুমি ইদানিং খুবই বেশী অশান্তি ভোগ করছ। বাইরে হয় তো তুমি এ-সব নিয়ে কিছুটা ভুলে থাকতে পারবে।"

"এখন বুঝেছি, কেন তোমাকে একদিনও এই পিকনিকের পরামর্শে পাওয়া যায় নি, কেন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলেছ।"

"এড়িয়ে চলেছি—এ-কথা ঠিক নয়। কিছুদিন আমাকে খুব ঘোরাঘুরিও করতে হয়েছে, একেবারেই সময় পাই নি।"

"কেন ?"

"ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়িয়েছি।"

"ফ্ল্যাট ? কার জন্য ?"

"নিজের জন্য।"

"কেন, হোটেল দোষ করল কী ?"

"দোষ কিছু নয়, হোটেলে অনেকগুলো টাকা দিতে হয়।"

"টাকা বাঁচাবার জন্য তুমি হোটেল ছেড়ে ফ্ল্যাটে থাকতে চাইছ ?"

"হ্যাঁ, তা ছাড়া—"

মলী সেন বাধা দিয়ে বললেন, "মিথ্যে কথা, তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ। বল, সত্যি কি না।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধাংশু বললেন, "হ্যাঁ সত্যি, কিন্তু তুমি জানলে কেমন করে ?"

"হোটেলের চাইতে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকা সস্তা, এ-কথা আর যাকেই হোক মেয়েদের কাছে বলতে যেও না। আর আমার জানার কথা বলছ ? আমি যে ইদানিং সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সে খবরই বা তুমি পেলে কেমন করে ? কিন্তু তুমি বিয়ে করবে সে সংবাদ আমার কাছে লুকোতে এত মিথ্যে কাহিনীও বানাতে হলো ! ছিঃ !"

দৃঢ়তার সঙ্গে সুধাংশু বললেন, "মিথ্যে আমি বলি নি। ফ্ল্যাটের নাম শুনলেই তোমরা লাউডন স্ট্রীট বা রাজা সন্তোষ রোডের কথা ভাব। বালীগঞ্জ, কালীঘাট অঞ্চলে অল্প আয়ের গৃহস্থের উপযোগী ফ্ল্যাটও যে আছে, তার খবর রাখ না। আর লুকোবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তুমি পিক্‌নিকের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। ভেবেছিলেম এ ঝামেলা কেটে গেলে তোমাকে বিস্তারিত বলব। তার আর সুযোগ হলো না।"

"তা যাকগে। ভাগ্যবতীটি কে ? আমাদের লুসী মিত্তির নয় তো ?"

"না, আমার দিদির এক বিধবা ননদের মেয়ে। আমার মায়ের মনোনীত পাত্রী।"

"বেশ, বেশ। মস্ত সুখবর। কনগ্র্যাচুলেশানস্‌।" বলে মলী সেন বিলাতী কায়দায় হাত বাড়িয়ে দিলেন সুধাংশুর পানে।

শুভ বিবাহের সংবাদ অবশ্যই সুসংবাদ। কিন্তু মলী সেনের ভাষাটা যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, তাঁর কণ্ঠে যেন সজীবতার তেমন আভাস পাওয়া গেল না। দেবরের বিয়ের সুখবরটা ভ্রাতৃজায়ার মনে যে অপরিমিত সুখের সঞ্চার করেছে এমন নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল না।

সুধাংশু শেকহ্যাণ্ড না করে নিজের দুই হাতের মধ্যে মলী সেনের দক্ষিণ হস্তটি গ্রহণ করলেন। গভীর আন্তরিকতার সুরে বললেন, "বউদি, বিয়েতে তুমি উপস্থিত না থাকলে কিন্তু চলবে না। পাড়াগাঁ বলে যে যেতে চাইবে না—"

"বিয়ে স্থির করা যদি আমাকে বাদ দিয়ে চলতে পারে, তবে শুধু মন্ত্র পড়াটা আমার অনুপস্থিতির জন্যই ঠেকবে না আশা করি।"

মলী সেনের কণ্ঠে শ্লেষ ও উত্তাপ সুধাংশুর মনোযোগ এড়াল না। তিনি

বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "বউদি, তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ? আমার কি কোনো অপরাধ ঘটেছে?"

মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে মলী সেন বললেন, "না, কিছুমাত্র নয়। কে বললে তোমাকে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি? আমি খুশী হয়েছি—সত্যি, ভারি খুশি হয়েছি। বিলিভ মি। ঐ যা, আমার চোখে কী যেন একটা ঢুকেছে, বড্ড জ্বালা করছে। এক মিনিট বস তো, আমি বাথরুম থেকে চোখটা একবার ধুয়ে আসছি।"

মিনিট পাঁচ সাত পরে এসে সহাস্যে বললেন, "তুমি তাহলে কাল আমাদের সঙ্গে পিক্‌নিকে যাচ্ছ না?"

সুধাংশু বললেন, "না, একজন বাড়িওয়ালার সঙ্গে কাল পাকা কথা হবে। সকালেই তার কাছে যেতে হবে।"

সুধাংশু প্রস্থানের উদ্যোগ করতেই মলী সেন বললেন, "ও কী, উঠছ যে? এখনই রসন চৌকী বায়না করতে ছুটবে না কি? এত তাড়া কিসের? বিয়ের লগ্ন তো পার হয়ে যাচ্ছে না। একটু বসই না।"

সুধাংশু পুনরায় আসন গ্রহণ করে বললেন, "আমার কোনো তাড়া নেই। কিন্তু তোমাকে তো কাল খুব সকালেই উঠতে হবে।"

মলী সেন সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, "সুধাংশু, আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিনটি তোমার মনে পড়ে?"

"পড়ে বৈ কি। আমি প্যারিস থেকে দেশে ফিরেছি তার আগের দিন। এ বাড়ির কর্ত্রী তোমার পিসশাশুড়ী আমাকে ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করতেন। পরদিন এসে তাঁকে প্রণাম করতেই বউ দেখতে পাঠিয়ে দিলেন দোতলায়। শিবুদার বাবা অতিশয় গোঁড়া হিন্দু। সন্দেহ ছিল না যে, বউ এনেছেন ভট্টপল্লী থেকেই। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলেম, দেখব, দেড় গজ ঘোমটায় মুখ চোখ ঢাকা সাহা বা মল্লিক কোম্পানীর লেস বসানো জবরজঙ্গ জামা জরিতে মোড়া একটি নির্বাক, নিশ্চল, জড় কাপড়ের পুটুলি। ও মা, তার বদলে কি না তুমি? একেবারে যেন আধুনিক কোনো লেখকের উপন্যাসের পাতা থেকে সদ্য নেমে এসেছে এক কন্যা। স্মার্ট, মডার্ন, প্রিটি।"

"কি ভাবলে?"

"ভাববার আর অবকাশ ছিল কোথায়? তুমি বসে উলের কী যেন একটা বুনছিলে। মুখ তুলে আমার পানে তাকাতেই নমস্কার করে বললেম, "শিবুদার মা আমার মাসি হতেন। বড় ভাই-এর স্ত্রীদের এ পারিবারে বলে, বৌঠান। বড়, মেজ, সেজ ইত্যাদি বিশেষণ যোগ করে তাঁদের সনাক্ত করা হয়। সে-রকম গুরুগম্ভীর প্রাচীন সম্বোধন আপনাকে ঠিক মানাবে না। যদি অনুমতি করেন তবে শুধু বউদি বলেই ডাকব।"

"তার পর?"

"তুমি প্রতি-নমস্কার করে চৌকি এগিয়ে দিয়ে বললে, আমার কথা শোনা আছে তোমার। ভাবলেম, থাকবারই তো কথা। মানুষ থাকে এক জায়গায়, কিন্তু তার খ্যাতি রটনা হয় সর্বত্র। বিশেষতঃ সেটা যদি অখ্যাতি হয়। কুশল বিনিময়ের পরে সহজভাবে বললে, বয়সে না হলেও সম্পর্কে তুমি বড়। তাই যদি আমার আপত্তি না থাকে তো আমার নাম ধরেই ডাকতে চাও। কথায় নেই অনাবশ্যক আড়ষ্টতা,

আচরণে নেই কৃত্রিমতা। সহজ, শোভন, সহৃদয় ব্যবহার। বাঙ্গালী মেয়ে এমন হতে পারে, কল্পনা করি নি এর আগে। মোস্ট প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ !"

প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজই বটে। শুধু সুধাংশুর পক্ষে নয়, মলী সেনেরও। দুই বৎসর ব্যাপী সুখহীন, আশাহীন, নিরানন্দ বিবাহিত জীবনের শ্বাসরোধকারী ক্লিষ্টতার মধ্যে এই প্রথম যেন অনুভব করলেন মৃদু স্নিগ্ধ বাতাসের সুকোমল স্পর্শ। রুদ্ধ গৃহের ঘন অন্ধকারে হঠাৎ মুক্ত ক্ষুদ্র বাতায়নপথে উন্মুক্ত স্বচ্ছ আকাশের ঈষৎ একটুখানি ইসারার মতো যেন মলী সেনের সামনে দেখা দিলেন সুধাংশু। লেডী ইন ডিসট্রেসের উদ্ধারার্থ নাইট এরাণ্ট।

বাঙ্গালী পরিবারে দেবর ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধটি প্রীতি ও পরিহাসের এক অপূর্ব সংমিশ্রণে মধুর। মনোভাবের মিল এই দুটি সমবয়সী নরনারীর সেই স্বভাবতঃ সুন্দর সামাজিক সম্পর্ককে দু'দিনেই হৃদ্যতায় নিবিড় এবং নির্ভরতায় নিকটতর করে তুলল। সরল আলোচনা, অনাবিল কৌতুক, কপট কলহ ও অবিরত মান অভিমানের মধ্য দিয়ে তাঁদের সখ্য দু'জনের জীবনকেই এক অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য দান করল।

যতদিন সংসারের কর্ত্রী শিবনাথের পিসীমা জীবিত ছিলেন, ততদিন মলী সেনের পক্ষে বাড়ির বাইরে চলাফেরার অবাধ সুযোগ ছিল না। তাঁর শাসন ফাঁকি দিতে এই দুই অপরিণত বয়স্ক অপরাধীকে তাই প্রায়ই নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করতে হতো।

একদিন সকাল বেলা সুধাংশু এসে বললেন, "পিসীমা, এবার আর ভাবনা নেই। তোমার বাতের ব্যামো একদিনে আরাম হয়ে যাবে। চৌরঙ্গীতে এক ফরাসী ভৈরবী এসেছেন, বিনি-পয়সায় রাজ্যের সমস্ত রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন। চল, আজ বিকেলেই তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

পিসীমা আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফরাসী ভৈরবী, সে কি রে? ব্যাটাছেলে, না, মেয়েছেলে?"

"মেয়ে। মেম সন্ন্যাসী আর কি! একবার তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরতে পারলে, প্রসন্না হয়ে কমণ্ডুলু থেকে শেম্পেন দান করবেন। দু'ফোঁটা খেলেই আরোগ্য।" বলে মলী সেনের পানে চোখ টিপলেন।

পা জড়িয়ে ধরার প্রস্তাবটা পিসীমার কাছে খুব প্রীতিপ্রদ মনে হলো না। হাজার হোক মেম তো, মেলেচ্ছো। খিরিস্টান। হিন্দু হয়ে তিনি কেমন করে—।

কিন্তু এদিকে বাতের কষ্টটাও তো কম নয়। তাই আসল কথাটা গোপন করে বললেন, "আমি গিয়ে আর কী করব বল? কথা তো বুঝব না। তুই নিজেই আমার হয়ে আম্পেন না কাম্পেন—কি বললি, তাই খানিকটা নিয়ে আসিস।"

সুধাংশু বিস্ময়ের ভান করে বললেন, "ওঃ, তাই তো। তুমি যে ইংরেজি জান না, সে তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভৈরবী তো পুরুষ মানুষের সামনে বেরোন না। মেম হলে কী হয়, মাথায় ইয়া লম্বা জটাজাল। পুরুষ মানুষ কখনও কেউ সামনে এসেছে কি অমনি তা দিয়ে মুখ ঢেকে দেন। না, তোমার বাত তা হলে দেখছি আর সারানো গেল না।"

পিসীমা ব্যাকুল হয়ে বললেন, "না বাবা, এমন সুযোগ হাতে পেয়ে ছাড়তে নেই।" মলী সেনের পানে তাকিয়ে বললেন, "বউমা, তুমি বরং বিকেলে সুধাংশুর

সঙ্গে যাও। আমার নাম করে ওষুধটা নিয়ে এস। একটু ভক্তি করে ভৈরবীর পায়ের ধুলোটা নিও যেন।”

সন্ধ্যায় সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার পথে মলী সেন সুধাংশুকে মনে করিয়ে দেন, পিসীমার জন্যে ভৈরবীর ওষুধ বলে যা হোক কিছু একটা নিতে হবে যে! তাই তো! নিকটবর্তী ডাক্তারখানা থেকে এক টিন ক্রুসেনস্ সল্ট কিনে নেওয়া হয়।

আর একদিন হয়তো বিলেতী ফুটবলের টীম এসেছে কলকাতায়। সুধাংশু দু'খানা টিকিট কিনেছেন যথারীতি।

দুপুর বেলা পিসিমা পুরানো ন্যাকড়া ছিঁড়ে একটা ওল্টানো হাড়ির ওপরে জল দিয়ে প্রদীপের সলতে তৈরী করছিলেন। সুধাংশু এসে বললেন, “পিসীমা, আমার সেজ বোনের ভাসুরঝিকে আজ দেখতে আসবে বাদুড়বাগানে। তোমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। কনে সাজাতে। আবলুসের মতো কালো মেয়ে, ঘসে মেজে চলনসই করে তোলা, যার তার কর্ম নয়।”

প্রচ্ছন্ন প্রশংসায় পিসীমা মনে মনে খুশী হ'য়ে বললেন, “কিন্তু সন্ধ্যে বেলা আমার জপের সময় পার হয়ে যাবে যে। তার চাইতে বউমাকে বরং নিয়ে যা।”

মুখে চোখে গভীর হতাশার চিহ্ন ফুটিয়ে সুধাংশু বললেন, “সে কি আর তোমার মতো পারবে? তবে তুমি যখন বলছ, অগত্যা।”

মলী সেন দরজার আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন। পাছে আর অধিকক্ষণ হাস্য সংবরণ কঠিন হয়ে পড়ে তাই সাবধান পদক্ষেপে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়েন।

গুরুজনদের মৃত্যুর পরে মলী সেন যখন নিজেই সংসারের কর্ত্রীপদে উন্নীত হলেন, তখন আর কোনো কোথাও বাধা রইল না। সপ্তাহে সাত দিনে সাতটা সিনেমা দেখা এবং একই দিনে দুপুরে রেসকোর্স, বিকেলে খেলার মাঠ, সন্ধ্যায় ক্লাব এবং রাত্রে ক্যাবারায় যাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে ভুরি ভুরি।

শুধু আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁদের প্রায় সমস্ত কর্ম, কল্পনা, মন্ত্রণাই দু'জনের সম্মিলিত সত্বাকে কেন্দ্র করে। সুধাংশুর নেশা ডিটেকটিভ উপন্যাসে। তাই মলী সেন নাম জানেন আগাথা ক্রীস্টির সর্বশেষ থ্রীলারের। মলী সেনের প্রিয়,—রবীন্দ্র সঙ্গীত। তাই সুধাংশু খবর রাখেন কনক দাসের আধুনিকতম রেকর্ডের।

তরুণ বয়সের যে সকল বৃহৎ পরিকল্পনা চিরকাল প্ল্যানের আকারেই শূন্যে মিলিয়ে যায়, কোনো দিনই বাস্তবে পরিণত হয় না, সেগুলিতেও দু'জনেরই যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট থাকে। উদয়শঙ্করের নাচ দেখে এসে য়ুরোপে ড্যান্সট্রুপ নিয়ে যাওয়ার যে জল্পনা কল্পনা চলে তাতে ইম্প্রেসারিওর পদ মলী সেনের, ম্যানেজারের পদ সুধাংশুর। এমেরিকার ‘লাইফ’ কাগজের মতো যে বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের প্ল্যান হয়, তাতে সম্পাদিকার নাম মলী সেন, প্রকাশক সুধাংশু।

এমনি করে কেটেছে সুদীর্ঘ সাত বৎসর। সাতটি বছর যেন সাত স্বর্গে রচা ছন্দবন্ধ কাব্যকাহিনীর মতো স্বপ্নময়। সাত লহরে গাঁথা রত্নখচিত চন্দ্রহারের মতো মহার্ঘ্য।

সমাজের যে ঊর্ধ বায়ুস্তরে তাঁদের বিহার, বৃহৎ কারেন্সী নোটের ঘন ঘন পক্ষ সঞ্চালন ব্যতীত সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সুধাংশুর নিজস্ব উপার্জন পরিমিত।

কিন্তু মলী সেনের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সে বিষয়ে তাঁকে সচেতন হতে হয় নি কোনোদিন। জনহোয়াইটের জুতা, অস্টিন রিডের সার্ট, র‍্যাংকিনের সুট ছাড়া সুধাংশুকে কখনও বড় দেখা যায় নি। প্রিয়জনের জন্য ব্যয় করার যে ব্যগ্রতা নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, সুধাংশুকে দিয়ে তা চরিতার্থর সুযোগ পেয়ে আনন্দ লাভ করেছেন মলী সেন। শিবনাথের বিরুদ্ধে মলী সেনের আর যাই কেন না অভিযোগ থাক, সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হয়, স্ত্রীর যদৃচ্ছা টাকা খরচ নিয়ে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন ওঠে নি।

বিগত দিনের সেই স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে খণ্ড খণ্ড বহু সুখের ইতিহাস মলী সেন সুধাংশুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তাঁর আসন্ন বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। তাঁর ভাবী পত্নীকে নিয়ে দু'চারটে প্রচলিত পরিহাসও করলেন সকৌতুকে। তারপর সুধাংশু প্রস্থান করতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শয্যায় উপুড় হয়ে এলিয়ে পড়লেন। বক্ষের সমস্ত শক্তি দ্বারা এতক্ষণ রক্তহীন মুখমণ্ডলে যে বিশুষ্ক হাসির রেখাটি ফুটিয়ে রেখেছিলেন, তা নিমেষে মিলিয়ে গেল। দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর সবলে চেপে উদ্গত কান্নার বেগ রোধ করতে চেষ্টা করলেন।

বাতাসে অক্সিজেন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তার কথা কারো মনেই থাকে না। তার ব্যত্যয় ঘটা মাত্রই শ্বাসযন্ত্রে গোলযোগের ফলে মুহূর্ত মধ্যে সে-অভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। এতকাল সুধাংশুর উপরে মলী সেনের দখল ছিল প্রকৃতির আলো হাওয়ার মতোই স্বতঃসিদ্ধ। তাই তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুমাত্র সজাগ ছিলেন না। এক্ষণে সে-অধিকার ত্যাগের প্রশ্ন দেখা দিতেই সজোরে টান লাগল ঘরে নয়, বাইরে নয়,—একেবারে তাঁর বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের মাঝখানটিতে। সমস্ত জগৎটাকে স্বার্থে ক্রুর ও প্রবঞ্চনায় কুৎসিত মনে হলো।

তবুও একবার স্থির চিত্তে নিরপেক্ষ বিচার করতে চেষ্টা করলেন মলী সেন। হয়তো সুধাংশুর কথাই ঠিক। পুরুষ মানুষ বিরাট মহীরুহের মতো আপন কাণ্ডের উপর আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে চায় সমুন্নত। দড়ি দিয়ে ঝোলানো অর্কিডের মতো পরাশ্রয়ী সৌখিন অস্তিত্ব তার পক্ষে মৃত্যুর অধিক। সে হবে গৃহের প্রধান, নারীর নাথ ও সন্তানের জনক। শুধু পরনারীর সখীত্ব নিয়ে তার সারা জীবন কাটানো চলে না।

দিন কয়েক আগে জরুরী কাজে সুধাংশুকে যেতে হয়েছিল তাঁর দিদির বাড়িতে। মফঃস্বল সহরে। ভগ্নীপতি স্কুল মাস্টার। সামান্য বেতন। তাই দু'বেলা দুটি ছাত্র পড়াতে যান। বোন দুপুরে সাবুর পাঁপড় তৈরী করে বিক্রী করেন কো-অপারেটিভ স্টোরে। উঠনের একপাশে স্বামী যে বেগুন ও পালং শাকের বাগান করেছেন, বিকালে ছোট ঘট থেকে জল সেচন করেন তাতে। সন্ধ্যা বেলা স্বামী যখন হাত মুখ ধুয়ে সামান্য জলযোগের পর শিশু দুটিকে খেলা দেন, স্ত্রী অদূরে মাদুরে বসে কাঁথা সেলাই করেন। দু'জনে সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প করেন।

সুধাংশু তাঁদের দেখে যেন প্রথম জানলেন, জীবনের সত্যিকার তাৎপর্য। বুঝলেন কত অর্থহীন সংসারে তাঁর নিজের বর্তমান অবস্থিতি। স্থির করলেন, আর নয়। তিনি তো হার্লে স্ট্রীটের স্পেশিয়েলিস্ট নন ; সামান্য দাঁতের ডাক্তার। নিজের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের ঊর্ধ্বে বৃহৎ আড়ম্বর বা আকাশচুম্বী কল্পনা তাঁর জন্য নয়। ভাবলেন, তিনি সারাদিন পরিশ্রম করে যা উপার্জন করবেন তা দিয়ে সংসার চালাবে

একটি সাধারণ কর্মপটু, সরল, স্নেহশীলা স্ত্রী! মানুষ করবে একটি দুটি সবল সুস্থ শিশু। কাজ কী তাঁর শার্কস্কীনের জ্যাকেটে? কী হবে তার লুসী মিত্তির, লিলি ঘোষ, এ্যানিটা সেন বা সোসাইটির ডায়না রায়কে নিয়ে?

শুনে মলী সেন চুপ করে রইলেন।

সুধাংশু যখন বললেন, "বউদি, তোমার ভালোবাসার ঋণ আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু আমাকেও তো আমার আপন পূর্ণতা লাভ করতে হবে।"—তখনও মলী সেনের মুখে কথা জোগাল না।

সত্যি তো। মলী সেনের কাছে কতটুকু পাওয়ার আশা আছে সুধাংশুর? তাঁর ভাগ্যবঞ্চিত জীবনের শোকাবহ বিড়ম্বনার সঙ্গে জড়িয়ে নিজের জীবনকে সুধাংশু ব্যর্থ করবে কেন?

এ সমস্তই যুক্তির কথা! তাতে মাথা সাফ হয়, মন শান্ত হয় না। শিলাখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত পার্বত্য নদীর প্রবল জলস্রোতের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ বেদনায় কেবলি নিরন্তর ফুলে ফুলে ওঠে।

বালিশে মুখ ঢেকে আর্তস্বরে মলী সেন বললেন, "আমি একা, আমি শূন্য, আমি নিষ্ফল।" হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য কণ্ঠে ঢেলে দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বার বার ডাকতে লাগলেন, "সুধাংশু, সুধা, সু।"

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল মলী সেনের অন্য মূর্তি।

পিক্‌নিকে তাঁর উৎসাহ, আনন্দ ও উচ্ছ্বাস যেন ক্ষীণমুখ ফোয়ারার জলের মতো ফিনকি দিয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগল চতুর্দিকে। পুকুরে সাঁতার কাটলেন, গাছের শাখায় দোলনা বেঁধে দোল খেলেন, গানের পরে গান গেয়ে সবাইকে মোহিত রাখলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনের কোণে কোথাও কোনোখানে একবিন্দু বেদনার লেশ আছে এমন আভাস পাওয়া গেল না। যেন এক রাত্রে আপনার পূর্ব জীবনকে জীর্ণ পট্টবাসের মতো পরিত্যাগ করে এসেছেন পশ্চাতে।

সেদিন থেকে মলী সেনের নব রূপান্তর। যে ছিল স্থির-জ্যোতি নক্ষত্র, সে হলো তীব্রগতি উল্‌কা। খরবেগে ছুটে চললেন লক্ষ্যহীন, মাত্রাহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। শুধু আলো নিয়ে নয়,—জ্বালা নিয়ে।

মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট বৃহৎ সজ্জাকক্ষটির পাশ দিয়ে বোধ করি বিশেষ কোনো একজনের সন্ধানেই যাচ্ছিলেন নীরজা।

ব্যস্ত পদে মান্নামাসি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "নীরু, গৌরীকে দেখেছ কি এদিকে?"

নীরজা উত্তর করলেন, "কৈ, না তো!"

"হতভাগা মেয়ে গেল কোথায়? নাঃ আমি আর পেরে উঠছিনে।" মান্নামাসির কণ্ঠে বিরক্তি ও হতাশার সংমিশ্রণ।

বিস্ময়াবিষ্ট নীরজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, ব্যাপার কি, মান্নামাসি?"

"আর বলো কেন ভাই। সকাল থেকে পই পই করে মেয়েকে বললেম, স্টেজে নিখিলের সঙ্গে থেকে তাঁর কাজে একটু সাহায্য করতে। কে শোনে সে কথা! মেয়ে কোথায় বসে আছেন তার ঠিকানা নেই। এই মেয়ে নিয়ে আমার হয়েছে

মরণ।"

"না, মান্নামাসি, গৌরীর মতো এমন ভালো মেয়েকে আপনি অমন করে বলবেন না।"

মেয়ের প্রশংসায় মা মনে মনে যথেষ্ট প্রীত হলেন। কিন্তু মুখে প্রতিবাদের ভাব ফুটিয়ে বললেন, "তোমরা তো বল ভালো। নিজের ইষ্ট-অনিষ্ট বোধ যার নেই তার আবার ভালো কী?"

উত্তরে নীরজা কিছু বলার চেষ্টা করতেই তাঁকে বাধা দিয়ে পরিবর্তিত স্বরে বললেন, "বুঝেছি, তুমি কি বলবে। সত্যি কিছু বোকা সে নয়। সে কি আর আমি জানিনে? নিজের মেয়ের কথা নিজে বলতে নেই। নইলে দেখতে, শুনতে, স্বভাবে, বুদ্ধিতে এমন মেয়ে আর ক'টি আছে আমাদের চেনা-জানার মধ্যে? জাঁক করছিনে। কিন্তু শিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েকে সবার প্রশংসার যোগ্য করে গড়ে তোলা যে কতখানি শক্ত ব্যাপার সে যে করেছে সে-ই শুধু জানে।"

নীরজা বিনা প্রতিবাদে মান্নামাসীর কৃতিত্ব স্বীকার করলেন।

খুশী হয়ে মান্নামাসি বললেন, "মেয়ের সব ভালো। কিন্তু বড্ড বেশী লাজুক। আজকালকার ছেলেদের কী ধারা জান তো? গুরুজনেদের ঠিক করা সম্বন্ধে বিয়ে করবে এমন পাত্রই নয়। এরা নিজেরা দেখবে, মিশবে, পছন্দ করবে, তবে তো বিয়ে। অমনি কি আর তাঁদের চোখে পড়া যায়। এখনকার দিনে মেয়েদের কি একটু ফরোয়ার্ড না হলে চলে?"

ফরোয়ার্ড! যাক, ইংরেজী করে কথাটাকে তবু কিছুটা ভদ্র করা হয়েছে। তা না হলে আসলে ব্যাপারটা তো গায়ে-পড়া-ভাব। চলতি বাংলায় যাকে বলে বেহায়াপনা।

নীরজা মনে মনে সঙ্কুচিত হলেন। ছিঃ ছিঃ। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কি তাদের মান-সম্ভ্রম বোধটুকুও থাকতে নেই?

দুঃখও বোধ করলেন। মেয়ের জন্য নয়। মেয়ের মায়ের জন্য। হায়, মান্নামাসি! তিনি তো জানেন না, গৌরীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে কার সঙ্গে! কত শক্তিশালী তার প্রতিপক্ষ! তিনি তো জানেন না যে, এ-কালে যুদ্ধজয় সাহসের দ্বারা হয় না, সামর্থ্যের দ্বারা হয়। বোঝেন না যে, এ-যুগে আর্মির চাইতে আর্মামেন্টের প্রয়োজন বেশী। বেচারা গৌরী। মায়ের তাড়নায় যতই কেন না সে ফরোয়ার্ড হোক, তার সাফল্যের আশা কোথায়? মাজল্ লোডার দিয়ে কি শার্মেন ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াই করা চলে?

আপন মনোভাব গোপন করে কিছুটা পরিহাসের ভঙ্গিতে নীরজা বললেন, "কিন্তু মান্নামাসি, গৌরীকে না দেখতে পেয়ে আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন? এই রাত্রেই তাঁকে ফরোয়ার্ড মার্চ করতে হবে না কি?"

মান্নামাসি হেসে বললেন, "এখন খুব ঠাট্টা করে নিচ্ছ। তা কর। মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনা তো টের পাও নি। বিয়ে-থা হোক, ঘর সংসার কর, তখন বুঝবে বয়স্কা মেয়ে সৎপাত্রে না দিতে পারা পর্যন্ত মায়েদের কেন মুখে ভাত রোচে না, চোখে ঘুম আসে না।"

নীরজা সহানুভূতির সুরে বললেন, "না মান্নামাসি, আপনি মিছে অত ভাববেন না। গৌরীর মত এমন লক্ষ্মীমেয়ের ভালো বর জুটবে না তো জুটবে কার?"

"না মা, সে-ভরসা নিয়ে তো চুপ করে বসে থাকা যায় না। একে তো ছাই পোড়া দেশে সুপাত্রের সংখ্যাই কম, যদি বা একটি ভালো পাত্র পাওয়া গেল, তার পিছনে কী সাংঘাতিক শনির দৃষ্টি তা আমিই জানি। তুমি ছেলেমানুষ, এ-সব বুঝবে না।"

ছেলেমানুষ মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, উপমাটা ঠিক হয়নি। শনি নয়,—রাহু! এ শুধু গ্রাস করতে জানে, পরিপাক করতে নয়। সে গ্রহণ করে না। গ্রহণ ঘটায়। তাতে পৃথিবীতে নামে অন্ধকার। কমল মলিন হয়, কুমুদ বিশীর্ণ।

স্বভাবতঃই অনূঢ়া কন্যার জননীরা পছন্দ করেন না স্বশ্রেণীর বিবাহযোগ্যা অন্য মেয়েদের। যেমন এক মোটর গাড়ীর সেলস্ম্যানেরা সুচক্ষে দেখেন না অন্য কোম্পানীর গাড়ীকে। বয়সের দিক দিয়ে নীরজা গৌরীর চাইতে অল্প কয়েক বছরের মাত্র বড়। সে হিসাবে তাঁকে আপন কন্যার একজন সম্ভবপর প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করা মান্নামাসির পক্ষে অনুচিত হতো না কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা বা দেহসৌষ্ঠব—এ তিনের কোনো দিক দিয়েই নীরজা কোনো দিন মান্নামাসির উদ্বেগের হেতু হননি। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, সম্ভবপর পাত্রদের মনোযোগ থার্মোমিটারে নীরজার স্থান সাড়ে আটানব্বই ডিগ্রীরও অনেক নীচে। তাই নীরজার প্রতি তাঁর মনে কোনো বিরূপতা ছিল না। এমন কি, নিজের মনের সুখ-দুঃখের কথা নীরজার কাছে ব্যক্ত করতেও তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না।

সখেদে মান্নামাসি বললেন, "এ-সব কি আমার কাজ, না, আমার ভাববার কথা? এমন এক লোকের হাতে পড়েছিলেম যে, সারা জীবন কেবল কষ্ট পেয়েই গেলেম। বেঁচে থাকতে কোনো দিন কোনো কাজ তাঁকে দিয়ে হয় নি, মরেও আমার মাথায় দিয়ে গেছেন এই কন্যাদায়ের ভার। সত্যি বলছি মা তোমাকে, বিয়ে হয় নি, তবুও আছ সুখে। মনোমতো হাতে না পড়ার চাইতে চিরজীবন আইবুড়ো থাকা বরং ভালো। তাতে এমন অহর্নিশি দগ্ধে দগ্ধে মরতে হয় না।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রইলেন।

মান্নামাসি মনে মনে পর্যালোচনা করলেন আপন ভগ্ন আশা, তিক্ত স্মৃতি ও ব্যর্থ জীবন।

নীরজা স্মরণ করলেন আপন অপূর্ণ অতীত, অতৃপ্ত বর্তমান ও অনিয়ত ভবিষ্যৎ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মান্নামাসি বললেন, "যাই, দেখিগে মেয়েটা কোথায় গেল।"

স্টেজে আলোকসম্পাত ও সমুদ্রদৃশ্যের বৈদ্যুতিক কৌশলগুলি সম্পর্কে শেষবারের মতো সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে নিখিল অভিনয়ে নিজ বেশ-বিন্যাসের জন্য আপন সজ্জাকক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে নীরজাকে একা দেখতে পেয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার হাতের জ্বালাটা কমেছে, নীরজা? আর রক্ত বেরুচ্ছে না তো?"

নীরজা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "আমি আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলেম। এই নিন।" নিজের হাতের ব্যাগটা থেকে কী একটা ক্ষুদ্র জিনিষ বের করে নিখিলের হাতে দিতে গেলেন।

"কী? শিলভ লিংকস্! একটা কেন? ওঃ, তাই তো, আমার বাঁ আস্তিনে লিংকস্

পরি নি দেখছি। আশ্চর্য, আমার তো খেয়ালই হয় নি। ছিল কোথায় এটা ?”

“যেখানে বরাবর থাকে। আপনি এক হাতে পরেছেন, তাড়াতাড়িতে অন্য হাতে পরতে ভুলে গেছেন।”

“ঠিক। কিন্তু তুমি তো ভোলো নি। সত্যি নীরজা, তোমাকে যত দেখছি তত আমি অবাক হচ্ছি। রোগীর সেবা থেকে অসাবধানী লোকের তদারক পর্যন্ত সব কাজেই তুমি এক্সপার্ট। আমি যে তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ তা কথায় জানাতে—।”

“নার্সের কাজই তো লোকের পরিচর্যা করা। তা ঠিকমতো না করলে আপনি রাখবেন কেন ? এর মধ্যে কৃতজ্ঞতার আছে কী, তা জানাবারই বা প্রয়োজন কোনখানে ?”

রাগ হলো নীরজার। কৃতজ্ঞ ! আহা, কৃতজ্ঞতা কুড়োবার জন্য যেন তাঁর আর ঘুম হচ্ছিল না !

“নার্সের কাজ রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো, আইসব্যাগ দেওয়া, টেম্পারেচার নেওয়া। সুস্থ লোকের জামায় বোতাম বসানো, চাবি খুঁজে দেওয়া, ধোবার কাপড় মিলিয়ে রাখা নার্সের ডিউটির মধ্যে নয় নিশ্চয়ই।” বলে সহাস্যে বাঁ হাতটি এগিয়ে দিলেন নীরজার দিকে।

নীরজা লিংকস্‌টা জামার আস্তিনে পরিয়ে দিতে দিতে মনে মনে ভাবলেন, হুঃ, এমনি অন্ধই বটে ! মুখে বললেন, “সে আর এমন বেশী কী ? পিসিমার শুশ্রূষা করে হাতে অবসর সময় যখন থাকে তখন আপনার দু'একটা বই গুছিয়ে দেওয়া বা ফুলদানীটা সাজিয়ে রাখাকে কিছু কাজ বলে না। আমি না করলে, অন্য কেউ করত ; পড়ে থাকত না।”

“ঠিক জানিনে। হয়তো করত, কিন্তু তোমার মতো নিখুঁত করে কেউ করতে পারত না। আমার এক এক সময়ে মনে হয়, হাসপাতালের নার্স না হয়ে বাড়ীর গিন্নী হলেই যেন তোমাকে মানাত ভালো।”

কাণ্ডজ্ঞানহীন এঞ্জিনীয়র ! কিছুমাত্র বোধ নেই, নিজের অজ্ঞাতে কার কোন সুতীব্র বেদনার তন্ত্রীতে কঠিন আঘাত করছেন তিনি !

কোনো দিকে দৃকপাত মাত্র না করে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেই চললেন, “সত্যি নীরজা, তুমি যার স্ত্রী হবে, সে ভাগ্যবান। কোনোদিন তার এতটুকু অসুবিধা হবে না। কিন্তু এই যে তুমি না চাইতেই হাতের কাছে দরকারী জিনিষটি এগিয়ে ধরছ, তাতে আমার অভ্যাস ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভয় হয়, শেষে যে দিন তুমি চেলী পরে নিজের ঘর করতে যাবে, সে-দিন না আমি একেবারে অচল হয়ে পড়ি।”

কথা সমাপ্ত করে সরলচিত্ত বক্তা হাসতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর শ্রোত্রীটি দুই চক্ষে অগ্নি বর্ষণ করে কঠিন স্বরে বললেন, “মিস্টার রয়, এমন ব্যঙ্গ করার দরকার কী ? আমার আর কোথাও কোনো গতি নেই, আমাকেও আপনার আর পাঁচজন চাকর-দাসীর মতো আপনার এখানেই খেটে খেতে হবে, সে কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তো পরিহাসের প্রয়োজন নেই। কেন আপনি আমাকে এমন অপমান করছেন ?”

বিস্মিত নিখিলের মুখের হাসি নিমেষে অন্তর্হিত হলো। তিনি ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন, “অপমান করেছি ? বল কী, নীরজা ! আমি তো কোনোদিন তোমাকে

চাকর-দাসীদের মতো ভাবি নি।"

"ভেবেছেন। নিশ্চয় ভেবেছেন। ভাবলে দোষও নেই কিছু। চাকর নয়তো কী? আপনি মাইনে দেন, আমি কাজ করি। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের আর অন্য সম্বন্ধ আছে কী?"

"জান, তুমি মাইনের কথা বললে আমি কত দুঃখিত হই? তুমি যে হাসপাতালে আমাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে রেখেছিলে সে কি আমার মাইনের লোভে? টাকা দিয়ে কী আমি আমার সে-ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব? ক'দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, তুমি যেন কেবলই বিরক্ত হচ্ছ। আমি অন্যমনস্ক লোক, কাঠখোট্টা মানুষ। কথাবার্তাও সব সময়ে তোমাদের মতো তেমন গুছিয়ে বলতে পারিনে। তাই হয়তো আমার কোনো আচরণ বা কথায় তোমার মনে হয়েছে যে, আমি বুঝি টাকার মাপে তোমার সেবার হিসাব করছি। বিশ্বাস করো নীরজা, তোমাকে অপমান করার কথা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে। তবুও না জেনে তোমার মনে যে ব্যথা দিয়েছি, তার জন্য মাপ চাইছি। আমাকে ক্ষমা কর।" বলে নিখিল ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

নিখিলের মলিন মুখ, কাতর চাহনি ও শ্লথ গতি নীরজাকে তাঁর আপন অকারণ রূঢ়তার তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন করল। নিখিলের বেদনার্ত কন্ঠের সকরুণ ক্ষমা প্রার্থনা মুহূর্তে তীক্ষ্ণফলক তীরের মতো নীরজার নিজেরই বুকে বিঁধল। তাঁর দুই চোখে অশ্রু সঞ্চারিত হলো। হায়, এমন করে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে আপনি আর কত কাঁদাবে নীরজা, তা সে নিজেই ভেবে পায় না।

মলী সেনের সজ্জাকক্ষে একটি অপরিচিত মহিলার পদার্পণ ঘটল।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে সূর্যাস্তের পরেও যেমন অনেকক্ষণ দিনের আলো বজায় থাকে, তেমনি এই অসাধারণ মহিলার দেহলাবণ্য যৌবনান্তেও তাঁর মুখমন্ডলে এমন একটি কমনীয় দীপ্তি রক্ষা করেছে যে, হঠাৎ দেখলে তাঁকে প্রৌঢ়া মনে করা কঠিন।

বিধবার পরিধানে পরিচ্ছন্ন সাদা থান, গায়ে রাধা-কৃষ্ণের নামাঙ্কিত বৃন্দাবনী সুতী চাদর। খালি পা। কন্ঠে রুদ্রাক্ষের সরু একটি মালা। পুরুষের মতো খাটো করে ছাঁটা মাথার কালো চুলে কোথাও একটু সাদার ছোপ লাগে নি। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সুগঠিত কপালের ঠিক মাঝখানে উলকিতে আঁকা একটি সরু তিলকচিহ্ন। যৌবনে মহিলা যে যথার্থ সুন্দরী ছিলেন, সে-কথা বুঝতে খুব বেশী দৃষ্টিশক্তির দরকার হয় না।

মলী সেন কিউটেক্সের শিশি থেকে তুলির সাহায্যে হাতের সুদৃশ্য অঙ্গুলির সযত্নেবর্ধিত নখগুলির রঞ্জনকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। চোখ তুলে তাকাতেই মহিলা বললেন, "আমি শচীনের মা।"

বলার প্রয়োজন ছিল না। মাতা ও পুত্রের মুখের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য কারুরই দৃষ্টি এড়াবে এমন সম্ভাবনা নেই।

মলী সেন মনে মনে প্রসন্ন হলেন না। কী বিপদ! অভিনয় সুরু হওয়ার আর কতক্ষণই বা বাকী। প্রথম দৃশ্যেই তাঁর পার্ট। অথচ এখন পর্যন্ত সাজসজ্জা শেষ করতে পারলেন না। কেবলই ঘটছে নানা লোকের আনাগোনা। বারংবার ঘটছে

চিত্তবিক্ষেপ।

মনোভাব গোপন করে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন "আমার নাম,—মলী।"

শচীনের মা বললেন, "সে কী আর বলে দিতে হয়? তোমাকে এর আগে চোখে দেখি নি বটে, কিন্তু তোমার বর্ণনা এত শুনেছি যে, মনে মনে তোমার চেহারাটি আঁকা হয়েই ছিল। বোধ হয় হাজার লোকের ভীড়ে দেখলেও দূর থেকেই চিনতে পারতেম। আমার ছেলের মুখে তো অষ্ট প্রহরই তোমার নাম।"

মলী সেন ঈষৎ হেসে বললেন, "আমার দুর্নাম বলুন। একমাত্র নিন্দে করা ছাড়া আর কেউ যে কখনও আমার কথা বলে এমন তো মনে হয় না।"

শচীনের মাও হেসে বললেন, "তা বৈ কি। তুমি ভালো করেই জান, শচীন তোমাকে কতখানি পছন্দ করে। ওর ঐ এক ধারা। যাকে ভালো লাগে না, তার ছায়াও মাড়াবে না। কতদিন আত্মীয়কুটুম্বদের কাছে ঐ নিয়ে কথা শুনেছি। আর যার উপরে ওর টান, তার নাম করতে অজ্ঞান। তোমাকে বলব কী মা, যে-বছর ম্যাট্রিক দেবে,—বেশ বড় হয়েছে—সে বছর স্কুলের কোন ছেলে নাকি বলেছিল, মনোরমা নামটা শুনতে ভালো নয়। তাই নিয়ে ঘুষোঘুষি করে সে ছেলেটির নাক দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে এল। কেন, না, সেটা আমার নাম। ক্ষ্যাপা আর কাকে বলে!" বলে মহিলা হাসতে লাগলেন।

আপন পুত্রের তরুণ বয়সের এই হঠকারিতার কাহিনী জননীর সকৌতুক অথচ সস্নেহ ভাষণে মলী সেনের শ্রবণে একটি অপরূপ মাধুর্য লাভ করল। মহিলার মুখের হাসি ও চোখের দৃষ্টি থেকে ক্ষরিত বাৎসল্যগৌরবের অদৃশ্য ধারা থিয়েটারের গ্রিজ, পেইণ্ট, হীরা, জহরত, টিস্যু, ব্রোকেডে সমাকীর্ণ সংকীর্ণ এই সজ্জাকক্ষটিকে ঘিরে মুহূর্তে যেন স্নিগ্ধ একটি কমনীয় পরিবেশ রচনা করল।

শচীনের মা একটু থেমে বললেন, "আগে ছিলেম আমি, এখন হয়েছ তুমি। প্রশংসা শুনে শুনে আমার তো রীতিমতো হিংসে হওয়ার উপক্রম।" বলে আবার হাসতে লাগলেন।

সে-হাসিতে মলী সেনও যোগ দিলেন। বললেন, "সত্যি, আপনি যে এসেছেন এতে আমি কত যে খুশি হয়েছি। শুনেছি কোথাও কোনো উৎসবে আপনি যান না, তাই—।"

কপট গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে বাধা দিয়ে শচীনের মা বললেন, "তোমাদের নাটক দেখতে এসেছি, ভেবেছ বুঝি? মোটেই না। এসেছি ঝগড়া করতে। আমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে দখল করা—এ কী রকম কথা? যাই, শক্ত করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসিগে। কিন্তু এসে এখন দেখছি, ভালো করি নি। এরই মধ্যে নিজেই তোমার দখলে চলে গিয়েছি। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দেখছি এখন থেকে তোমার নাম কীর্তন করতে হবে।" বলে মৃদু হাস্যে মলী সেনের দিকে তাকালেন। তাঁর ভাষায় ছিল স্নেহ, দৃষ্টিতে ছিল অকপট কল্যাণকামনা।

মলী সেনকে নিরুত্তর দেখে বললেন, "সত্যি মা, আমি কোথাও কখনও যাইনে। আত্মীয় স্বজনদের বিয়ে, পৈতে, ভাতের নিমন্ত্রণেও নয়। এই নিয়ে আমাকে কথাও কম শুনতে হয় না। কিন্তু সে আমি গায়ে মাখিনে। আমার আছে ঠাকুর। তাঁকে

নিয়ে সংসারের এক কোণে পড়ে আছি। আর আছে ঐ পাগলা ছেলে।"

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবানে আপনার খুব ভক্তি বুঝি?"

শচীনের মা উত্তর দিলেন, "শোনো একবার পাগলীর কথা। খুব ভক্তিই যদি থাকবে তা'হলে আর তুচ্ছ সংসারের কথা, ছেলের কথা ভেবে অস্থির হব কেন? তবে চেষ্টা তো করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কী গতি আছে বল?"

"আচ্ছা, ভগবান যা করেন সবই ভালোর জন্য—এ-কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"এর মধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গা নেই মা, এ যে সত্যি। আমি মুখ্যু মানুষ, তোমরা তো কত পড়াশুনা করেছ, তোমরাই বল, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। সে-কথা কেউ বিশ্বাস করুক, না করুক, সূর্য তো বরাবর সেই পূর্ব দিকেই উঠবে। এও তেমনি।"

উত্তরে ও উপমাতে আর যাই থাক, ন্যায়শাস্ত্রের কণা মাত্র নেই। চরিত্রহীনের পশু বোঠাকরুণকে মনে পড়ল মলী সেনের। অর্জুন তীর ছুঁড়ে পাতাল থেকে জল এনেছে, এ-কথা যদি মিথ্যে হয়, তবে পিতামহ ভীষ্ম তাঁর শরশয্যায় তৃষ্ণা মেটালেন কেমন করে! বুঝলেন তর্ক করা বৃথা।

কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, শুনেছি আপনার জীবনে আপনি কিছু দুঃখ কম পান নি। আপনি তো ভগবানে এত নির্ভর করেন, আপনাকে তিনি কেন দুঃখ দিলেন?"

শচীনের মা প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, "ঠাকুর দুঃখ আমাকে অনেক দিয়েছেন সত্যি। কেন দিয়েছেন তা তিনিই জানেন। কিন্তু সে দুঃখ তুচ্ছ করার ক্ষমতা দিয়ে তিনিই তো আবার দুঃখ দূর করেছেন। তিনি যে দুঃখহরণ।"

যুক্তির দিক দিয়ে এ সকল উক্তি মলী সেনের কাছে শুধু অসার নয়, রীতিমত অশ্রদ্ধেয়। অন্য যে-কোনো ব্যক্তির মুখে এ কথা শুনলে মলী সেন অবজ্ঞাভরে বলে উঠতেন—ননসেন্স। কিন্তু শচীনের মায়ের মুখে এই কথাগুলি বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় এমন একটি সতেজ ঋজুতা লাভ করল যে, তাকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে না পারলেও অবজ্ঞা করার রূঢ়তা প্রকাশ করলেন না তিনি।

শচীনের মা বললেন' "মা, তুমি আমার মেয়ের মতো। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই। আমার বাবা ছিলেন গরীব পূজারী বামুন। যেঘরে বিয়ে হলো সেখানে বাবুরা পায়রার বিয়েতে দশ হাজার টাকার বাজি পুড়িয়েছেন, বউদের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে টাকা দিয়ে মুখ দেখেছেন শাশুড়ী। নাতির জন্যে কনে দেখতে রাজাবাহাদুর যে-দিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, আমার তখন তের বছর বয়স। মনে আছে, বাবা বলেছিলেন, এ শুধু মদনমোহনেরই কৃপা। নইলে তাঁর মনোরমার কী এমন কপাল! এ যে স্বপ্নেরও অতীত।"

একটু নীরব থেকে বললেন, "স্বপ্ন ভাঙ্গতেও দেরী হলো না। বিয়ের দু'বছর যেতে না যেতেই স্বামী ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটলেন। মোসাহেব আর মেয়েমানুষ নিয়ে দিনরাত ডুবে রইলেন মদে। শাশুড়ী, ননদের নির্যাতনের সীমা রইল না। দোষ তো আমারই। তাঁদের ছেলেকেই যদি ঘরে বেঁধে না রাখতে পারল তবে বউ-এর রূপ দিয়ে কী হবে? মনে পড়ে, নিজে সারাদিন উপোসী। তবু স্বামীর খাবার

সাজিয়ে মাঝরাত অবধি জেগে বসে রয়েছি। কতদিন মত্ত অবস্থায় তিনি কাঁসি ছুঁড়ে মেরেছেন গায়ে। লক্ষ্য করলে, কপালে দাগ এখনও দু'চারটে দেখতে পাবে হয়তো।”

মলী সেন শিউরে উঠে অর্ধ স্বগতের মতো মন্তব্য করলেন—“ব্রুট্!”

শচীনের মা বললেন, “এ সমস্তই সয়েছিলেম। কিন্তু স্বামী যে দিন সমস্ত মান সম্ভ্রমের মাথা খেয়ে কৈবর্তপাড়া থেকে এক প্রজার একটা নষ্ট মেয়েকে অন্দরমহলে এনে তুললেন, সে-দিন ঠিক করলেম, আর নয়। রাত্রিতে শোবার ঘরে কড়িকাঠের সঙ্গে দাঁড় বেঁধে ঝুলে পড়ব। খোকা তখন বছর তিনেকের। বারুণীর মেলা থেকে কে যেন তাকে খেলনা কিনে দিয়েছিল—একটি মাটির গোপাল। সে-টা দু'হাতে চেপে কোথা থেকে হঠাৎ আমার কোলে উঠে বলল, ‘মামু, থাকুল।’ এক মুহূর্তে রাস্তা দেখতে পেলেম। তাই তো, আমার ঠাকুর! তাঁকে কেন স্মরণ করি নি? আমার বাপের বাড়ির মদনমোহন—তাঁকে কেমন করে এত দিন ভুলে ছিলেম? সে-দিন থেকে ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেম। মা, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না; সেই থেকে আমার আর দুঃখ রইল না। তারপর ষোল বছর শ্বশুর বাড়ি ছিলেম। স্বামী অত্যাচার করেছেন, গুরুজনেরা দিয়েছেন গঞ্জনা, বিধবা পেয়ে সরিকেরা ষড়যন্ত্র করে ঠকিয়ে নিয়েছে বিষয়-আশয়—কোনো কিছুই আমাকে কষ্ট দিতে পারে নি।

মলী সেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “স্বামীর এত অত্যাচার অপমানেও আপনি তাঁকে ছেড়ে আসেন নি?”

“ছেড়ে এলেই নিস্তার কোথায়? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো শুধু ইহকালেই শেষ নয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরেই যে তা চলতে থাকবে।”

মলী সেন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, “তা বলে দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী স্বামীর সমস্ত উপদ্রব সহ্য করে তাঁর কাছে পড়ে থাকতে পারব না আমি, তা সে-সম্পর্ক এক জন্মের হোক, কি এক হাজার জন্মেরই হোক।”

শচীনের মা হেসে বললেন, “ষাট, তোমাকে পারতে হবে কেন? তোমার এমন বর এমন ঘর, এমন সুখের সংসার তোমার মত ভাগ্যবতী আছে ক'জন?”

মলী সেনের মুখে ম্লান ছায়া পড়ল। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য তাড়াতাড়ি বললেন “সমস্ত সংকটেই কি আপনি নিশ্চিন্তে ঈশ্বরে নির্ভর করতে পারেন?”

“পারি বলি কেমন করে? এই ছেলের ব্যাপারেই দেখ না। মাঝে তাকে নিয়ে উদ্বেগের আর সীমা ছিল না। সে গোপনে গোপনে একটা কিছু সাংঘাতিক বিপাকে জড়িয়ে পড়েছে, তা বুঝতে পারছিলেম; অথচ কি করা দরকার তা জানা ছিল না। শেষে একদিন মনে হলো, আমি কেন মিছে ব্যাকুল হচ্ছি। বাসুদেবের যদি এই ইচ্ছে হয় যে, ছেলে আমার জেলে পচবে বা ফাঁসিতে মরবে, তবে আমার সাধ্য কী তাকে বাঁচাই? সেই থেকে মনের অস্থিরতা কমল। কোথা থেকে গোবিন্দ জুটিয়ে দিলেন তোমাকে। না, না, তুমি অমন কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমি সমস্তই জানি। তোমার মত এত বড় উপকার শচীনের আর কেউ করে নি।”

কৃতজ্ঞা জননীর এই অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপনে মলী সেন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। মনে হলো, এই ভক্তিমতী মহিলার সস্নেহ সাধুবাদে তাঁর সত্যিকার অধিকার নেই। প্রতারণার দ্বারা এই প্রশংসা অর্জন করেছেন, এই চিন্তায় নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হলো।

ধীরে ধীরে মলী সেন বললেন, "একদিন হয়তো শুনবেন, আপনার ছেলের একদিক দিয়ে যে সামান্য উপকার করেছি, অন্য দিক দিয়ে তার অনেক বেশী করেছি অপকার।"

"শুনলেও বিশ্বাস করব না। তোমাকে কতক্ষণ বা জেনেছি। তবুও এইটুকু বুঝেছি, ঠাকুর যাকে এমন লক্ষ্মীর মতো রূপ আর সরস্বতীর মতো বুদ্ধি দিয়েছেন, সে ভুল করতে পারে, অন্যায় করতে পারে না।"

"কিন্তু ভুল থেকেও তো লোকের ক্ষতি হয়।"

"তা হয়। কিন্তু মা, ভুল করা না করা তো সব সময়ে মানুষের হাতে নয়। রামপ্রসাদের গান শোন নি—"সকলই যে তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী, তারা তুমি; তোমার কর্ম তুমি করাও মা, লোকে বলে করি আমি।"

শ্রদ্ধায় নম্র ও হৃদ্যতায় গভীর কণ্ঠে মলী সেন বললেন, "আপনাকে দেখে এবার কিন্তু আমার হিংসে হচ্ছে। আপনার মতো এমন সহজ সরল বিশ্বাস যদি থাকত, তবে অনেক সংকট থেকেই বোধ হয় ত্রান পেতেম।"

শচীনের মা সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "মা, তোমার বয়স অল্প। কিন্তু কথা শুনে মনে হয়, যেন অনেক দুঃখের সাগর পার হয়ে এসেছ। জানিনে তোমার কী কষ্ট, কীসের মনস্তাপ। কারণ যা-ই হোক, রাধামাধবকে স্মরণ করো; অশান্তি দূর হবে। বিপদ কেটে যাবে। তিনি যে বিপদভঞ্জন। দীনদয়াল।"

মলী সেন নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। শেষে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, কী বলে আপনার ঠাকুরকে আপনি ডাকেন?"

"তাঁর নাম কি একটা, নাম যে অসংখ্য—

কুব্জা রাখিল নাম পতিতপাবন হরি।
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন বংশীধারী॥
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্ব মুনি নাম রাখে………"

এই সমস্তই মলী সেনের কাছে নতুন। অশ্রুতপূর্ব কাহিনী। অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য।

কিছুক্ষণ পরে শচীনের মা বিদায় নিলেন। কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পূর্বে গভীর স্নেহভরে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা মলী সেনের চিবুক স্পর্শ করে একটি চুম্বন গ্রহণ করলেন।

তাঁর প্রস্থান-পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কেন যেন মলী সেনের মনে পড়ল তাঁর পরলোকগতা মায়ের কথা। মলী সেন তাঁকে দেখেন নি কোনোদিন; প্রসবের পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তবুও বার বারই মলী সেনের মনে হতে লাগল,—তাঁর সেই অকালমৃতা জননী আজ জীবিতা থাকলে তিনি বুঝি বা এই ভগবদ্‌বিশ্বাসী পুণ্যশীলা মহিলার মতোই হতেন। ঠিক এমনই স্নেহশীল। এমনই কল্যাণময়ী।

প্রসাধন শেষে ধীরে ধীরে অভিনয়ের জন্য বেশ পরিবর্তন করলেন মলী সেন। কানে পরলেন কুণ্ডল। কণ্ঠে সরু চেনের বদলে চওড়া হীরার কণ্ঠি। চরণে বাজল

নূপুর, বাহুতে উঠল মনিবলয়। নিতম্বে দুলিয়ে দিলেন মুক্তার ঝালরযুক্ত চুনীপান্নার মনোরম অলঙ্কার। আধুনিকা মিসেস্ সেন বসনে-ভূষণে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হলেন অতীত কালের রাজকন্যা মঞ্জুশ্রীতে। অঙ্গে তাঁর নীলাম্বর, বক্ষে তাঁর রক্তাংশুক, ঘনকৃষ্ণ কবরীবন্ধনে প্রস্ফুটিত শ্বেত করবীগুচ্ছ।

ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলেন, এখনও কিছু সময় আছে। ঈজিচেয়ারটাতে দেহ এলিয়ে দিলেন। অভিনয়ে নিজ ভূমিকাটি উপলব্ধির চেষ্টা করলেন মনে মনে।

কিন্তু মন নিবিষ্ট করা কঠিন হলো। হঠাৎ শোনা গানের ভালোলাগা সুর যেমন পুরোপুরি আয়ত্তে আসে না অথচ কেবলই ঘুরে-ফিরে কানে বাজতে থাকে, শচীনের মায়ের প্রসঙ্গও তেমনি মলী সেনের মনে পড়তে লাগল ক্ষণে ক্ষণে।

দুঃখের অনল এই বঞ্চিতা রমণীকে অঙ্গারের মতো মলিন করে নি, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল করেছে। মন তাঁর বিক্ষোভে তিক্ত নয়, ঔদার্যে প্রশান্ত। বিধবার এই সৌম্য স্নিগ্ধ রূপটি মলী সেনকে একাধারে বিস্মিত ও আকৃষ্ট করল।

হঠাৎ চেয়ে দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে মান্নামাসি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘুমিয়ে পড়েছিলে না কি? তা ঘুমের আর দোষ কী? যা খাটুনিটা যাচ্ছে ক'দিন ধরে! তুমি বলেই পারছ, অন্য আর কেউ হলে—"

মলী সেন লজ্জিত হয়ে বললেন, "না, ঘুমুই নি। বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেম। তা খবর কী মান্নামাসি?"

"খবর বিশেষ কিছু নয়। আসছে বুধবার গৌরীর জন্মদিন। গুটি দুই-তিন বন্ধু বান্ধবকে চা'য়ে ডাকব ভাবছি। নিখিলকে আসতে বলব, তোমার সুবিধে হবে কী?"

মান্নামাসির জিজ্ঞাসায় মলী সেনের প্রতি কোন গূঢ় ইঙ্গিত ছিল কি না তা তিনিই জানেন। অন্য সময়ে মলী সেনও এতে রাগ করতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে মলী সেনের মনের তন্ত্রীগুলি একটি বিশেষ স্বরগ্রামে বাঁধা ছিল। প্রশ্নটা সেখানে যেন অকস্মাৎ মুষ্টিঘাতের মতো বাজল। বললেন, "মিস্টার রয়কে তুমি নিমন্ত্রণ করবে, তার সঙ্গে আমার সুবিধা অসুবিধার সংস্রব কী?"

নীরবে পরাজয় স্বীকার করবেন এমন পাত্রী মান্নামাসিও নন। তিনি শ্লেষের সঙ্গে জবাব দিলেন, "কী জানি ভাই, সে তো আমিও ভাবি। কিন্তু লোকে বলে, আজকাল মিস্টার রয়ের নাকি নিজের মত বলে কিছুই নেই। তাই ভাবলেম—"

মলী সেন বাধা দিয়ে কঠিন স্বরে বললেন, "লোকে কী বলে না বলে, তা আমাকে শোনাবার দরকার নেই। তুমি কাকে নিমন্ত্রণ করবে, সেও তোমার ভাবনা। এ নিয়ে আমি আর কোনো বাদানুবাদ করতে চাইনে, মান্নামাসি।"

"তুমি অন্যায় রাগ করছ, মলী। আমি না হয় চুপ করেই রইলেম। কিন্তু তাই বলে মেজাজ দেখিয়ে তো আর পাঁচজনের মুখে চাপা দিতে পারবে না, ভাই। তাদের তো চোখ-কান দুইই আছে। তা যাকগে, জেনে সুখী হলেম যে, মিস্টার রয়কে অন্য কারো অনুমতি নিয়ে চলতে হয় না।"

একটু অর্থমূলক হাস্য করে মান্নামাসি ড্রেসিং রুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বিরক্তিতে ছেয়ে গেল মলী সেনের মন।

প্রবেশ করল সমীর। মলী সেন তাকে দেখে একটু বিস্মিতই হলেন। জিজ্ঞাসা

করলেন, "কী সমীর, কী চাই ?"

"আপনি আমার অ্যালবামটা দেখতে চেয়েছিলেন, তাই সেটা দিয়ে এসেছি।"

"এরই মধ্যে ? কোথায় ছিল এটা ?"

"হেদোয় আমার মাসির বাড়িতে, যেখানে আমি উঠেছি।"

"সেখান থেকে আনলে কখন ?"

"এক্ষুণি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে গিয়েছিলাম।"

নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা মলী সেনের কাছে দিবালোকের মতো স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিল।

পরিচিত মহলে নিজ ভক্তজনের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অতীতে বহু দিন তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। এই প্রথম যেন আপন অনিন্দ্য দেহশ্রীর জন্য লজ্জা বোধ করলেন। পুরুষের কাছে তাঁর অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণের কদর্যতা এমন পরিপূর্ণ নগ্নতায় এর আগে আর কোনো দিন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় নি। তিনি নতমস্তকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর স্নেহ-কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধীরা কোথায় ? জান না ? আচ্ছা চল, আমি দেখছি।"

স্টেজের গলি-পথটায় প্রেক্ষাগৃহ থেকে ধীরাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? সামনের ঐ সারি দুটো গেস্টদের জন্য। সমীরকে নিয়ে ওখানে বোস গে যা। সমীর, তুমি থিয়েটার শেষ হলে, আমার গাড়িটা নিয়ে ধীরাকে বাড়ি পেঁাছে দিও। ভালো কথা, এ-হপ্তায় কী সিনেমা দেখেছ ? কিছু দেখ নি ? আচ্ছা, তা হলে পরশু ম্যাটিনীতে দু'জনে টারজান দেখতে যেও। আমি টিকিট আনিয়ে রাখব।"

পাশাপাশি দু'খানি আসনে দু'জনে বসল। কিন্তু এই দুটি কিশোর প্রণয়ীর যে সান্নিধ্য ইতিপূর্বে পরস্পরের হৃদয়কে উদ্বেল ও রসনাকে মুখর করেছে আজ তার মধ্যে মাধুর্যের লেশমাত্র সন্ধান পাওয়া গেল না।

ধীরা স্টেজের উপরে নীল ভেলভেটের যবনিকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল। আড়ষ্ট। নিঃশব্দ। অবশেষে অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সমীর প্রশ্ন করল, "শুরু হবে কখন ?"

ধীরা জবাব দিল, "সাতটায়।"

"থিয়েটার ভাঙ্গবে কখন ?"

"জানিনে।"

এ রকম প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আদালতে জেরা করা হয়তো যায়। কথাবার্তা চালানো যায় না। তবুও আবহাওয়াটাকে সহজ করার চেষ্টায় সমীর ঠাট্টা করে বলল, "সখের থিয়েটার দলের শুনেছি সময়ের জ্ঞান থাকে না। তোমাদের নাটকের আরম্ভ সেভেন পি-এম, না, সেভেন এ-এম ?"

অপর পক্ষ থেকে এই পরিহাসের যথোচিত সাড়া পাওয়া গেল না। সে হাতের ঘড়ি দেখে বলল, "আর মিনিট পনর পরে।"

সমীর জিজ্ঞাসা করল, "তোমার হলো কী ? হঠাৎ এমন গম্ভীর কেন ?"

ধীরা তার পানে না তাকিয়ে পূর্ববৎ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, "না, গম্ভীর কিসের ?"

সমীর বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, খামোকা মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে ভালো লাগে তো, থাক না। ভারি আমার বয়েই গেল। সে আর কোনো কথা না বলে হাতের প্রোগ্রামটির পাতা বার বার উল্টে পাল্টে পড়তে লাগল সিগারেটের বিজ্ঞাপন, অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম, কর্মকর্তাদের তালিকা।

নিজের সজ্জাকক্ষে ফিরে এসে মলী সেন যাঁকে দেখতে পেলেন তাঁকে কিছুমাত্র প্রত্যাশা করেন নি। তিনি আর কেউ নন; তাঁরই স্বামী শিবনাথ।

শিবনাথ বললেন, "সিন্দুকের চাবিটা একবার দরকার।"

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একমাত্র প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ব্যতীত বাক্যালাপ খুব সামান্যই ঘটে। দীর্ঘকাল থেকে এই নিয়মেই তাঁরা অভ্যস্ত। তবুও এই মুহূর্তে ঠিক এই কথাটার জন্য যেন মলী সেন প্রস্তুত ছিলেন না। গিরিবালার মতো তারও মনে হলো, হায়, এই উৎসবের সন্ধ্যা, এই উজ্জ্বল দীপালোকিত অপরিসর সজ্জাকক্ষ, এই স্বপ্নময় পরিবেশে যে-কথা প্রথম মনে আসে সে কি সিন্দুকের চাবি! মোহ নয়, সুধা নয়, ক্ষণিক মাধুর্যের সামান্য ইঙ্গিতটুকুও নয়?

আপন বক্ষের উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস সবলে দমন করে নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে চাবির গোছাটা শিবনাথের হাতে দিলেন মলী সেন।

শিবনাথ মিনিট খানেক কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বললেন, "তোমার খান কয়েক গহনা দিতে পার দিন দুই-তিনের জন্য? বিশেষ জরুরী।"

মলী সেন বললেন, "গহনা সমস্তই সেফডিপজিটের লকারে। তার চাবি সিন্দুকের ভিতরেই আছে। খুলে যা দরকার নিতে পার।"

শিবনাথ ব্যাখ্যা করে বললেন,—"আমার কাছে নগদ টাকা সব কুড়িয়ে গুছিয়েও বোধ হয় হাজার খানেকের বেশী হবে না। এই রাত্তিরে আরও সাত হাজার টাকা খালি হাতে যোগাড় করা শক্ত। তাই কয়েকটা গহনা বাঁধা রেখে এখন টাকাটা নিচ্ছি। সোমবারে ব্যাংক খুললেই তোমার গহনা ফিরে পাবে।"

মলী সেন জিজ্ঞাসু নেত্রে শিবনাথের পানে তাকালেন। শিবনাথ বললেন, "টাকাটা নিয়ে আমাকে এখনই রওনা হতে হবে। ছবি তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।"

শিবনাথ প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"আসানসোলে। ছবির কাছ থেকে এইমাত্র খবর নিয়ে লোক এসেছে। দেবেন তাদের আপিসের ক্যাশ ভেঙেছিল, ধরা পড়েছে।"

ক্ষণেক নীরব থেকে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কাল সকালে সেখানে গেলে ক্ষতি কী।"

"ক্ষতি অনেক। আপিসের বড় সাহেবকে অনেক বলে-কয়ে রাজী করানো গেছে, আজ রাত্তিরেই টাকাটা দিয়ে দিলে আর পুলিশে জানাবে না।"

"পুলিশে জানায় তো জানাবে। টাকা চুরি যে করেছে, তার শাস্তি সে পাবে। সেই শাস্তি থেকে তাকে বাঁচানটাই অন্যায়।"

"তোমার বোন নেই। থাকলে জানতে পারতে যে, ভগিনীপতিকে জেলে পাঠানটাই সংসারে সব চেয়ে বড় ন্যায় নয়।"

বোন না থাকলেও সে কথা মলী সেন বোঝেন। ছবিকে তিনি নিজেও স্নেহ করেন। তাই মনে মনে লজ্জিত হলেন। তার আপত্তি তো সাহায্য দানে নয়। তিনি বললেন, "আর মিনিট কয়েক পরেই অভিনয় শুরু হবে, এখন তুমি চলে যাবে, সে কি করে হয়?"

শিবনাথ জবাব দিলেন, "না হওয়ার তো কোনো কারণ দেখছিনে। অভিনয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ যে কোনখানে সে তো আমি ভেবে পাইনে।"

"যোগাযোগ নেই, সে-কথা সত্য। কিন্তু সেটা ঘটা করে প্রচার করারই বা সার্থকতা কী?"

"প্রচার করা যেমন অনাবশ্যক, ভান করাও তেমনি অনুচিত।"

"অত্যন্ত মহৎ মনোভাব, সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও এমনই অদৃষ্টের খেলা যে, গত পনেরটা বছর ধরে অহোরাত্র শুধু ভান করেই কাটাতে হচ্ছে!"

নির্মম, নির্ভেজাল সত্য! শিবনাথ হৃদয়ঙ্গম করলেন। তাইতো, ভান তাঁকেও কম করতে হয় না।

জগতে বহু মনোবেদনারই লাঘব আছে সমবেদনায়। কিন্তু স্বামী বিমুখ বা স্ত্রী অননুরাগিনী প্রাণান্তেও এ দুঃখের প্রকাশ চলে না কারো কাছে। আত্মীয় পরিজনের কাছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে, সমাজের কাছে অসুখী দম্পতিরা তাই নিরন্তর গোপনের প্রয়াস করে তাদের বিড়ম্বিত জীবনের দুঃসহ দুঃখভার। ভান করে,—সুখী, স্বাভাবিক, সম্মিলিত জীবনযাত্রার। শিবনাথও তার ব্যতিক্রম নন।

শিবনাথকে নিরুত্তর দেখে মলী সেন মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "বন্ধুবান্ধব, নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত সব এসেছেন। তোমাকে না দেখতে পেলে তাঁরা কী ভাববেন? তাঁদের প্রশ্নের আমি কী উত্তর দেব? দোহাই তোমার, সবার কাছে এমন ভাবে আমার মাথা হেঁট করে দিও না।"

শিবনাথ স্থির কণ্ঠে বললেন—"ছবির এই বিপদের সময়ে এ সব তুচ্ছ কথা ভাববার নয়।"

মলী সেন দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে বললেন, "আমার সমস্ত কথাই তোমার কাছে তুচ্ছ। আচ্ছা, সামান্য একটা পাখী পুষলে তার প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ থাকে আমার সম্পর্কে তোমার তাও নেই?"

শিবনাথ বললেন, "এতকাল পরে নতুন করে এ সব কথা আলোচনায় আজ আর কোনো ফল আছে কি?"

"না, নেই। তবুও একটা কথা জিজ্ঞেস করছি,—তুমি বিয়ে করেছিলে কেন? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলেম? আমার এতবড় সর্বনাশ তুমি কেন করলে?" ক্ষোভে ও বেদনায় মলী সেনের কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন। দুরূহও বটে। শিবনাথের দিক থেকে কোনো জবাব ছিল না।

কাতর কণ্ঠে শিবনাথ বললেন, "তোমার ক্ষতি করেছি, সে কথা ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস কর মলী, অন্যায় যা করেছি, সে ভুল করে করেছি, না বুঝে করেছি। ইচ্ছে করে নয়।"

"ভুল করেছ জেনে আমার লাভ কী। আমার জীবনটাকে যে এমন করে ব্যর্থ করে দিলে তা কি শুধু 'সরি' বললেই চুকে যায় ভেবেছ ?"

"কোনো দিন তা ভাবি নি। মলী, তোমার দুঃখ অনেক। কিন্তু আমার মনস্তাপ যে তার চাইতে ঢের বেশী। তুমি তবুও নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য আমাকে দোষী করে মনে কিছু সান্ত্বনা পাও। আমি দোষ দেব কাকে ? নিজের জীবনকে বিড়ম্বিত করেছি, তার বেদনা মর্মান্তিক। তোমার জীবনকে নষ্ট করেছি, তার অনুশোচনা দুঃসহ। তুমি বিশ্বাস করবে না, মলী, অনুতাপের পীড়নে দিনে মুখে আমার অন্ন রোচে না, রাত্রিতে চোখে আমার ঘুম আসে না।"

শিবনাথের কণ্ঠের আন্তরিকতা মলী সেনের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি কী বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলেন।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "মলী, আমি মূর্খ, হঠকারিতা করেছি ! কিন্তু তুমিই বা ভুল করতে গেলে কেন ? তোমাদের সমাজে তো মা-বাবার নির্দেশে গৌরীদান হয় না। মেয়ের মত নিয়েই সেখানে পাত্র স্থির হয়। তুমি কেন আপত্তি করলে না ? আমাদের রীতিনীতি, আবহাওয়া, পরিবেষ্টন কোনো কিছুই তো তোমার অনুকূল ছিল না !"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মলী সেন বললেন, "আমার মত না নিয়ে বিয়ে হয় নি, সে-কথা সত্য। বাবার তখন অত্যন্ত সংকট যাচ্ছিল। শেয়ারের বাজারে হঠাৎ অনেক টাকা লোকসানে ঋণে তিনি আকণ্ঠ ডুবে ছিলেন। সে-কথা ঘুণাক্ষরে কাউকে জানতে দেন নি। ঠিক সেই সময়ে তোমার বাবা এই বিয়ের প্রস্তাব করেন। প্রথমে আমার বাবার মত ছিল না। কিন্তু বিয়ে হলে আমার বাবার কারখানা ও ব্যবসাগুলি সমস্ত তোমাদের ব্যবসার সঙ্গে এমালগ্যামেটেড হয়ে রক্ষে পাবে, শেয়ার হোল্ডারদের টাকাটা বাঁচবে, নিজেরও প্রতারক অখ্যাতি রটবে না ভেবে বাবা শেষটায় রাজী হন। কিন্তু আমি সম্মতি না দিলে তিনি কখনও বিয়ে দিতেন না।"

"তুমি সম্মতি দিলে কেন ?"

"বাবা বার বার বলেছিলেন, 'মলী তুই খুশি হয়ে রাজী না হলে এ-বিয়ে আমি দেব না। আমার দেনার কথা, কারখানার কথা তুই ভাবিসনে। তার ব্যবস্থা যা করার আমি করব।' কিন্তু আমার বাবাকে আমি ভালো করেই জানতেম। অত্যন্ত সেনসিটিভ মানুষ। সে-দিনই রাত্তিরে চুপি চুপি তাঁর টেবিলের দেরাজ থেকে রিভলভারটা আমি সরিয়ে এনে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখলেম। মনকে বোঝালেম, ছেলে থাকলে আজ সে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বাবার পিছনে দাঁড়াতো। মেয়ে হয়ে আমি যদি তাঁকে তাঁর বিপদের দিনে উদ্ধার করতে না পারি, তবে ধিক আমাকে।"

শিবনাথ বিস্মিত হলেন। যাকে তিনি চিরকাল আরামপ্রিয়, গভীরতাহীন, লঘুচিত্ত, ফ্যাশানসর্বস্ব তরুণী বলে মনে মনে করুণা করেছেন, সেও যে তার প্রিয়জনের কল্যাণে আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আত্মত্যাগে সক্ষম, সে-কথা কোনো দিন তিনি কল্পনা করেন নি।

মলী সেন বললেন, "তা ছাড়া,—মিথ্যে বলব না, ভেবেছিলেম, তোমার আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে যদি বা নিজেকে খাপ খাইয়ে না নিতে পারি, তোমার কাছ থেকে

কোনো আক্ষেপের কারণ ঘটবে না। লতার মূল যদি মাটি থেকে রস টানতে পারে, তবে রোদের তাপে সে শুকিয়ে মরে না।"

শিবনাথ অর্ধস্বগতের মতো বললেন, "সত্যি, দু'জনেই জীবনকে আমরা কী অসহ্য বিড়ম্বনা করে রেখেছি।"

মলী সেন বললেন, "হ্যাঁ! হোয়াট এ টেরিবল্ মেস্। কিন্তু এমন করে আর কতকাল জীবন কাটাতে হবে, বল।"

"যতকাল জীবনের শেষ না হচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু তো আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। সময় হলে তাকে এড়ানো যেমন চলে না, সময় না হলে তাকে পাওয়াও তেমনি অসম্ভব। একটা সীন্ না করে তো এ-যুগে প্রাণ দেওয়ার উপায় নেই!"

হঠাৎ দুই হাত দিয়ে শিবনাথের হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে মলী সেন বললেন, "এস, আবার নতুন করে আমরা জীবন আরম্ভ করি। যা গিয়েছে, তা গিয়েছে। যা আছে তাই নিয়ে শুরু করি।"

ধীরে ধীরে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে শিবনাথ একটু ম্লান হেসে বললেন, "এ তো পরীক্ষার পড়া নয় যে, সমস্ত বছর ক্লাশ পালিয়ে এগজামীনের আগে সারা রাত জেগে বই মুখস্থ করে পাশ করবে! এরিয়ার মেক-আপের অবকাশ নেই জীবনে। না মলী, স্বভাবে চিন্তায়, দৃষ্টিভঙ্গিতে কোথাও তোমার সঙ্গে আমার এতটুকু মিল নেই। তোমার পথ আর আমার রাস্তা পৃথক, চলার ছন্দ আলাদা। এক ঘরে আমরা বাস করব। এক ঘরে আমরা ঘর করব না। সৃষ্টিকর্তার এই বিধান।"

দুই হাত দিয়ে চক্ষের অশ্রুবিন্দু মার্জনা করে মলী সেন বললেন, "ভগবান লোকটার মতো এমন ধৈর্যশীল আসামী আর দ্বিতীয় নেই। সংসারের সমস্ত দুষ্কৃতির অভিযোগ অনায়াসে তারই মাথায় চাপিয়ে দেওয়া যায়। সে তো প্রতিবাদ করতে পারে না। হায়, পথের কথা তুলে আজ তুমি খোঁটা দিচ্ছ। একবারও তোমার মনে পড়ছে না যে, পথ আমার একদিনে পৃথক হয়ে যায় নি। ভুলে গিয়েছ যে, আমি তো প্রথমে তোমার হাত ধরেই চলতে চেয়েছিলেম। তুমিই হাত সরিয়ে নিয়েছ।"

শিবনাথ বললেন, "আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, মলী, দোষ আমার। কিন্তু আমার কথা কাউকে বলার নয়। সে শুধু অন্তর্যামী জানেন। আমি আমার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি অহর্নিশি। তোমাকে ঠকাবার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

উত্তরে মলী সেন কিছু বলার পূর্বেই ব্যস্তপদে সিদ্ধনাথ প্রবেশ করে বললেন, "মিসেস্ সেন, ডাক্তার সত্যসিন্ধুকে দেখেছেন? এখানে আসেন নি তিনি?"

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তারকে কেন? কী হয়েছে?"

"আর বলেন কেন! মেয়েদের ড্রেসিংরুমে অপর্ণা ফেইণ্ট করেছে। আমাদের কালে তো পতন ও মূর্ছাটা থাকতো পার্টের শেষে। এ যে দেখছি অভিনয়ের আগেই অজ্ঞান। প্রোগ্রেসিভ যুগ কিনা, সব কিছুই এখন আগে আগে হয়। হোঃ হোঃ হোঃ! যাই দেখিগে ডাক্তার আছে কোথায়। ডোবালে দেখছি। না, না, আপনাকে আসতে হবে না। আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আমি ওদিক সামলাচ্ছি।"

সিদ্ধনাথ ডাক্তারের সন্ধানে গেলেন।

শিবনাথ বললেন, "আমি ছোট গাড়ীটা নিয়ে যাচ্ছি। বড় গাড়িটা আর ড্রাইভার

রইল। দরকার হলে দোকানের হিল্‌ম্যানটাও টেলীফোন করলেই তোমাকে পাঠিয়ে দেবে।"

"তুমি আজ রাতটুকুও অপেক্ষা করতে পার না?"

"না, কোনো মতেই না।" বলে শিবনাথ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

মলী সেন ইজিচেয়ারটায় বসে ক্ষোভে ও অপমানে দগ্ধ হতে লাগলেন। যে লোক একটা সামান্য অনুরোধের মর্যাদা রাখে না, তার কাছে ভিক্ষুকের মতো নতুন করে জীবন আরম্ভের কথা তুলেছিলেন তিনি কোন লজ্জায়? ছিঃ ছিঃ, এমন দুর্বলতা তাঁর কেমন করে ঘটল? ধিক তাঁকে! শত ধিক তাঁর অতিপ্রমত্ত প্রগল্‌ভতায়!!

হঠাৎ শচীনের মায়ের উপরে মলী সেনের রাগ হতে লাগল। গিরিধর গোপাল, দীন দয়াল মধুসূদন! রাবিশ্‌। উঠে দাঁড়িয়ে বেয়ারাকে হাঁক দিয়ে বললেন, পুরুষদের ড্রেসিংরুম থেকে অবিলম্বে নিখিলকে ডেকে আনতে।

অস্থির পদক্ষেপে পদচারণ করতে করতে ভাবলেন, ক্ষমা? কিসের ক্ষমা? ঝরণার উৎস শুকিয়ে দিয়ে তার কাছে চায় স্নিগ্ধ জলধারা? বাঁশীর রন্ধ্র বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যাশা করে সুমধুর সুর?

ক্রোধে মলী সেনের কর্ণদ্বয় তপ্ত, নিশ্বাস দ্রুত এবং দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। দুই হাতের মুষ্টি বন্ধ করে দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর চেপে মনে মনে বললেন,—না, কোট চাইলে ক্লোক দান করা তাঁর ধর্ম নয়। ডান গালে চড় খেয়ে বাঁ গাল এগিয়ে দেওয়ার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। ভাগ্যের কাছেও পরাভব মানবেন না কিছুতেই। দীপের আলো যদি না পান, জ্বালাবেন অগ্নির শিখা। হয়তো তাতে পুড়ে মরবেন শুধু নিজেই। ক্ষতি নেই। তিনি হত হবেন, তবু নত হবেন না।

যে-কথা কাউকে বলার নয় বলে শিবনাথ স্ত্রীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেন, সে তাঁর অন্তর্যামী ছাড়া, আরও দু'-এক জন জানে। সে কাহিনীটুকু সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সামান্য নয়।

কলেজে সংস্কৃতের শিক্ষক অঘোর বাচস্পতির কাছে প্রত্যহ পাঠ নিতে যেতেন শিবনাথ। বিপত্নীক বাচস্পতির গৃহে রাশীকৃত জড় পুঁথিপুস্তক ব্যতীত একটি সজীব প্রাণী ছিল। সে তাঁর মেয়ে শৈলবালা। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা মেজেতে মাদুর বিছিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নবীন ছাত্রের কাছে ব্যাখ্যা করতেন কাব্য, ব্যাকরণ বা সাহিত্য। গৃহকর্ম সমাপনান্তে গৃহের অপর প্রান্তে ছুঁচ দিয়ে জীর্ণ জামা-কাপড়ের ছিদ্র সংস্কার করতো শৈলবালা।

পিতলের পিলসুজের উপর জ্বলছে রেড়ীর তেলের প্রদীপ। প্রাচীন কবিগণের রচনার অন্তর্ঘন সাহিত্যরস, সুপণ্ডিত অধ্যাপকের উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি এবং স্বল্পপরিসর গৃহের রহস্যময় মৃদু দীপালোক কিছু দিনের মধ্যেই সীবনরতা তরুণীর এই নিঃশব্দ অথচ নিয়মিত উপস্থিতিকে শিবনাথের চক্ষে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব দান করল। তাঁর ভাবপ্রবণ হৃদয়ের উদ্দীপ্ত কল্পনায় বাদুড়বাগানের অপরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ গলিটি ক্রমে কাব্যে বর্ণিত রেবা, সিপ্রা ও বেত্রবতী-তটবর্তিনী অবন্তী, বিদিশা বা উজ্জয়িনী নগরীর বিশাল রাজপথের মহিমা-মণ্ডিত হয়ে উঠল। এবং সেই গলির

একপ্রান্তে ভাড়াটে বাড়ির ক্ষুদ্র গৃহকোণবাসিনী সামান্য শৈলবালা ধীরে ধীরে সংস্কৃত সাহিত্যের মহীয়সী নায়িকাদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল।

শিবনাথের মনে হলো, ঋষি কণ্বের আশ্রমে এই ছিল সেই তরু-আলবালে জলসিঞ্চনরতা শকুন্তলা, বল্কলবন্ধনেও যাঁর দেহসৌষ্ঠব শৈবালবেষ্টিত কমল-কলিকার ন্যায় রম্য। তিনি কল্পনা করলেন, মহেশের পদপ্রান্তে প্রণতিবিনতা এই সেই পর্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা, অঙ্গে যাঁর অরুণার্করক্তিম বসন, কর্ণে যার চূতপল্লব, অলকে যার নবকর্ণিকার।

বরষার ভরা নদীর মতো শিবনাথের তরুণ হৃদয় শৈলবালার প্রতি গভীর অনুরাগে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

প্রকৃতি বিচারে মানুষকে নাকি সাধারণতঃ দুটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক,—যারা হৃদয়ের দ্বারা চালিত। দুই,—যারা মস্তিষ্কের দ্বারা। কিন্তু সংসারে এই দুই শ্রেণীর বাইরে আরও এক জাতের লোক আছে। তাদের ভাবাবেগ অত্যন্ত প্রখর অথচ বিচারবুদ্ধিও কম সচেতন নয়।

ইতঃ নষ্ট এবং ততঃ ভ্রষ্ট দলের এই হতভাগ্যেরা না উপভোগ করতে পায় দুঃসাহসিকতার স্বল্পায়ু আনন্দ, না খুশি হয় হিসেবী বুদ্ধির সনাতন নিরাপত্তায়। এরা ইমোশানের স্রোতে ভেসে যেতে শঙ্কিত ; অথচ ইণ্টেলেক্‌টের ঘাটে বসে থেকেও তৃপ্ত নয়। অনুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তির নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত মানুষের দলে ছিলেন শিবনাথ। তাঁর অদৃষ্টে দুঃখভোগ অবধারিত।

আর্থিক বা সামাজিক কোনো দিক দিয়েই শিবনাথ ও শৈলবালার দুই পরিবার সমপর্যায়ে নয়। এমন কি, তাদের জাত পর্যন্ত বিভিন্ন। সুতরাং পরিণয়ের মধ্য দিয়ে শিবনাথের প্রেম যে তার চরম ও সার্থক পরিণতি লাভ করবে প্রচলিত সামাজিক রীতিতে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

নিজ হৃদয়াবেগের এই অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতার কথা শিবনাথের অজ্ঞাত ছিল না। অথচ শৈলবালার প্রতি আপন তরুণ হৃদয়ের সুতীব্র আকর্ষণ দমন করাও তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত। এক দিকে যুক্তিহীন হৃদয়াবেগ ও অন্য দিকে সতর্ক বুদ্ধির বিচার বিশ্লেষণ,—নিজ মনের এই দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার পীড়নে শিবনাথ যখন ক্ষত-বিক্ষত, তখন হঠাৎ একদিন জানতে পারলেন, রং শুধু তাঁর একার মনেই লাগে নি। বসন্তের যে যাদুমন্ত্র তরুশাখাকে পল্লবিত করেছে, সে লতার গ্রন্থিতেও মুকুল ফোটাতে ছাড়ে নি।

গৃহে গৃহিণী না থাকায় এত কাল শৈলবালার বাড়ন্ত গড়ন ও বিবাহে বিলম্ব সম্পর্কে পাড়ার আর পাঁচ জন হিতৈষিণী মহিলার গভীর উৎকণ্ঠার কথা বাচস্পতি মশায়ের কানে এসে পৌঁছয় নি। তাই যে-দিন তাঁর এক আত্মীয় পত্রযোগে তাঁকে এ-বিষয়ে বিস্তর তিরস্কার ও প্রচুর উপদেশ বিতরণ করলেন, সে-দিন বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রথম খেয়াল হলো,—তাই তো, মেয়েকে তো পাত্রস্থ করা দরকার। কিন্তু তার উপায়টা জানা না থাকায় প্রথম যার সঙ্গে দেখা সেই শিবনাথকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

চমকিত শিবনাধ বিবর্ণ হয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণ ও অসংলগ্ন উক্তি দ্বারা অনেক চেষ্টায় যা বললেন, তার মোটামুটি ভাবার্থটা এই যে, অতঃপর তাঁর পরিচিত মহলে শৈলবালার যোগ্য পাত্র কেউ আছে কিনা সন্ধান করে দেখবেন।

সে-সন্ধ্যায় চন্দ্রাপীড়ের উপাখ্যান অধ্যাপকের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট প্রাঞ্জল হলো না এবং বাণভট্টের সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্তচিত্ত ছাত্রটি কেবলই হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগল। গৃহকোণে অপর প্রাণীটির নিয়মিত উপস্থিতিতেও সেই প্রথম ব্যত্যয় দেখা গেল।

পাঠশেষে শিবনাথ যখন বাড়ি ফেরেন, প্রত্যহই শৈলবালা প্রদীপ হাতে অন্ধকার সিঁড়িটায় পথ দেখিয়ে দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

শিবনাথ শৈলবালাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমাকে আজ এতক্ষণ দেখি নি যে? এ কী তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কোনো অসুখ-বিসুখ করে নি তো?"

শৈলবালা তার দুই চক্ষু শিবনাথের পানে বিস্ফারিত করে রুদ্ধশ্বাসে বলল, "কেন আপনি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাইছেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?"

বিস্মিত শিবনাথ বললেন, "আমি তোমাকে তাড়াতে চেষ্টা করছি! সে কী! কৈ, আমি তো—"

"করছেন না তো কী! বাবার সঙ্গে এতক্ষণ কিসের পরামর্শ করছিলেন?"

শিবনাথ বললেন, "পরামর্শ কোথায়—ওঃ, সে তোমার বিয়ের কথা যা হচ্ছিল—তা, মানে, তোমার বিয়ে—সে তো ভালোই—এ কী তুমি কাঁদছ?" বলে শিবনাথ ডান হাতের তর্জনী দিয়ে শৈলবালার আনত চিবুকটি তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন।

শৈলবালা এক পা পিছিয়ে আঁচল দিয়ে চক্ষু মার্জনা করে বলল, "আমার ভালো ভেবে আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আপনার যদি আমাকে দেখলেই দুশ্চিন্তা ঘটে, তবে বরং এখানে আর পড়তে আসবেন না।"

শিবনাথ বিস্মিত হলেন। এ তো সংকুচিতা, অপরিণতবুদ্ধি বালিকার উক্তি নয়! শৈলবালার দিকে ভালো করে আর একবার তাকিয়ে দেখলেন, প্রথম যৌবনোন্মেষ তার দেহকে সুঠাম, কপোলকে আরক্তিম ও দৃষ্টিকে ভাবগম্ভীর করেছে।

শিবনাথের কাছে কিছু আর অস্পষ্ট রইল না। তাঁর প্রণয়-বেদনা নিরর্থক হয় নি, রূপকথার সোনার কাঠির মতো তা তাঁর কল্পলোকের রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলেছে,—এ কথা জেনে তাঁর সর্বদেহ অপরিসীম পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু সে-আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। এই নিস্ফল হৃদয়াবেগ তাঁদের উভয়ের—বিশেষ করে শৈলবালার—কল্যাণ করবে না, জীবনকে বিড়ম্বিত করবে, এ চিন্তায় শিবনাথ কেবলই ক্লিষ্ট হতে লাগলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁর বিয়ের কথা উঠল বিখ্যাত দত্তসাহেবের পরিবারে।

শিবনাথের পিতা বৈকুণ্ঠনাথের অর্থ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু মর্যাদা ছিল না আশানুরূপ। মনে মনে এজন্য তাঁর ক্ষোভ ছিল গভীর। তাই বৈবাহিক সম্পর্কের লিফটে চেপে তিনি দ্রুত সম্ভ্রান্ত মহলের উপরতলায় উঠতে উৎসুক ছিলেন। দত্তসাহেব কলকাতার অভিজাতমণ্ডলীর একটি স্তম্ভবিশেষ। কোর্ট সার্কুলারে ঘন ঘন তাঁর নাম ছাপা হয়, দৈনিক কাগজে ইন্টারভিউ। রয়টারের খবরে তাঁর বিলাতে গতিবিধির নিশানা থাকে। বৈকুণ্ঠনাথ পুলকিত হলেন।

পাত্র যিনি, মনের তীব্র অস্বস্তিতে তিনি অস্থির। নিজেকে তাড়াতাড়ি যে-কোনো এক জায়গায় শক্ত করে বেঁধে ফেলার ব্যগ্রতায় শিবনাথ প্রায় চোখ বুজেই সম্মতি

দিলেন।

এ-দেশে যুবকেরা স্ত্রী ঘরে আনে ঠিকুজির নির্দেশে। বৃদ্ধেরা দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করে বন্ধুদের অনুরোধে উপরোধে। শিবনাথ বিয়ে করলেন আত্মরক্ষার্থে।

দু'দিন পরেই জানতে পারলেন, এর চেয়ে মারাত্মক ভুল জীবনে আর কখনও করেন নি।

শিবনাথ ভেবেছিলেন, স্ত্রী এসে অধিকার করলেই অবাধ্য হৃদয় আর নিরর্থক চঞ্চল হওয়ার অবকাশ পাবে না। শৈলবালাকে ভোলা সহজ হবে। মূঢ় জানতেন না যে, বাড়ির মতো হৃদয়েরও ভ্যাকেনট পজেশান না দিলে নতুন লোকের সেখানে প্রবেশ অসাধ্য। শোনেন নি যে, মানুষের মনই হলো একমাত্র স্থান, যেখানে বে-আইনী দখলকারীর বিরুদ্ধেও ইজেক্টমেণ্ট স্যুট চলে না।

শিবনাথ যাকে ভালোবাসলেন, তাকে বিয়ে করতে পারলেন না। যাকে বিয়ে করলেন, তাকে ভালোবাসতে পারলেন না। তাদের দু'জনেরই দুঃখের কারণ হলেন। নিজেও সুখী হলেন না।

শিবনাথের বিয়ের কয়েক মাস পরেই অঘোর বাচস্পতির মৃত্যু ঘটল। শৈলবালা চলে গেল কোথায় দূর-সম্পর্কীয় কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। শিবনাথ তার আর কোনো সংবাদ বা সন্ধান পেলেন না।

কিন্তু কাছে থেকে যে ছিল দৃষ্টির আনন্দ, দূরে গিয়ে সে হলো চিন্তার সুখ। সামনে যে ছিল কামনার পাত্র, আড়ালে সে হলো ধ্যানের ধন। মলী সেনের পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব ছিল না সেই অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা।

সংসারে যে-দুষ্কৃতকারীর নীতিবোধ আছে তার শাস্তি ঘটে দু'দিকে। শিবনাথেরও সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা ছিল তাঁর আপন বিবেক। তিনি না পারেন সাধারণ অত্যাচারী স্বামীদের ন্যায় হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় স্ত্রীর সুখ-দুঃখ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে, না পারেন তাঁর প্রতি নিজ অন্যায় আচরণের লজ্জা এড়াতে। অথচ স্ত্রীর যা প্রাপ্য তা দেওয়াও তাঁর সাধ্যের অতীত। অনুপস্থিত শৈলবালার প্রতি এক কল্পিত অথচ সুদৃঢ় আনুগত্য-বোধের দ্বারা উপস্থিত মলী সেনের প্রতি কর্তব্যে তিনি কেবলই বিচ্যুত হতে থাকেন।

শৈলবালা কোন অজ্ঞাত স্থানে কেমন করে জীবন কাটাচ্ছে সে-চিন্তা শিবনাথের মনকে দিবারাত্র আচ্ছন্ন করে রইল। কখনও তিনি কল্পনা করতেন, সে আত্মীয় পরিজনের সমুদয় অনুরোধ, অনুনয়, তিরস্কার ও লাঞ্ছনা অগ্রাহ্য করে আজও অনূঢ়া জীবন যাপন করছে। নিজ গ্রাসাচ্ছাদানের জন্য কঠোর পরিশ্রমে দেহ তার দুর্বল, স্বাস্থ্য তার নষ্ট। কিন্তু সেই ক্ষীণকায়া নারী তার উদার হৃদয়ের গোপন মণিকোঠায় আজও শিবনাথের মূর্তিকেই সযত্নে রক্ষা করছে। সেখানে তাঁর নিত্য আবাহন, নিত্য স্তবস্তুতি পাঠ। নিজের কল্পনায় শৈলবালার সেই বিশ্বস্ততার পাশে আপন আচরণ তুলনা করে নিজেকে তিনি বারংবার ধিক্কার দেন।

আবার কখনও বা শিবনাথ কল্পনা করেন,—পরের গলগ্রহ-জীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোনো একজনের স্ত্রী হওয়া ছাড়া হয়তো শৈলবালার আর অন্য গতি ছিল না। তাই অনাকাঙ্ক্ষিত পতিগৃহে দুর্ভাগিনীকে দিনের পর দিন অনিচ্ছুক পত্নীত্বের দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। বহু আয়াসে নিজের কঠিন হৃদয়বেদনা গোপন

করে সংসারের আর পাঁচজন গৃহকর্ত্রীর মতো নিয়মিত সাজিয়ে দিতে হচ্ছে আপিসের রান্না, স্কুলের টিফিন, বা রোগীর পথ্য। শৈলবালার বিবাহিত জীবনের সেই দুরূহ ভূমিকা কল্পনা করে শিবনাথের নিজ দুঃখ তুলনায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হতো।

এমনি ভাবে শিবনাথ ও মলী সেন—এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্মৃতি ও কল্পনায় মিশে শৈলবালা এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতের মতো অচল অটল হয়ে রইল। তাকে কেউ অতিক্রম করতে পারল না।

বিবেকের তাড়নায় মাঝে মাঝে মলী সেনের প্রতি মনোনিবেশ করেন শিবনাথ। চেষ্টা করেন তাঁকে নিজ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে। সে প্রয়াস সফল হয় না। সে-দোষ সবটা শিবনাথের নয়, মলী সেনেরও নয়।

জন্মগত সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ফলে যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব শিবনাথ লাভ করেছেন, তার সঙ্গে স্ত্রীর ধ্যান, ধারণা ও আচার-আচরণের মিল নেই। মলী সেন শৈশবে ন্যানি, কৈশোরে মেট্রন ও যৌবনে গভর্নেসের হাতে মানুষ হয়েছেন। পটলডাঙ্গার সেন-পরিবারে তাঁর রীতি-নীতি নিতান্তই সঙ্গতিহীন। যেন ধুতির সঙ্গে টেইলস্, কোর্মা-কারীর সঙ্গে পলতার ঝোল। শিবনাথ ও মলী সেনের অভিভাবকেরা এ-কথাটা ভুলে ছিলেন যে, গরুর গাড়ির সঙ্গে প্যাকার্ড ক্লিপার জুড়ে দিলে আর যাই হোক, আরোহীদের যাত্রাগতি স্বচ্ছন্দ হয় না।

শিবনাথের এক বন্ধু এসে বলল, মায়া-সিনেমায় কি একটা ভালো ছবি হচ্ছে। শিবনাথ আপিস থেকে ফোন করে স্ত্রীকে বললেন, যথাসময়ে তৈরী হয়ে থাকতে।

স্বামীর কাছ থেকে এই সামান্য সহৃদয়তার ইঙ্গিতটুকু মলী সেনের হৃদয়কে স্পর্শ করল। তিনি খুশীতে চঞ্চল হয়ে বললেন, "ওঃ, হাউ নাইস। কিন্তু বাংলা সিনেমায় গিয়ে কি হবে? আটত্রিশ বছরের হাতির মতো মোটা নায়িকা পঞ্চাশ বছরের ভুঁড়িওয়ালা নায়কের সঙ্গে গান গেয়ে প্রেম করবে! সিকেনিং। তার চাইতে চলো এম্পায়ারে।"

শিবনাথের উৎসাহ নিমেষে অন্তর্হিত হলো। ইংরেজী ছবিতে শিবনাথের তেমন রুচি নেই। চোখ বুজে ওষুধের বড়ি গেলার মতো স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন সিনেমায়।

সেখানে দেখা হলো ব্যারিস্টার অশোক নন্দীর সঙ্গে। মলী সেনের পুরানো বন্ধু। ইন্টারভ্যালের সময় সে এসে জিজ্ঞাসা করল, "হাউ এবাউট এ ড্রিঙ্ক?"

মলী সেন যতই এড়াতে চান, সে ততোই নাছোড়বান্দা। শেষটায় অগত্যা রাজী হতে হয়। তিন জন সিনেমার বারে এলে অশোক নন্দী শিবনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হোয়াটস্ ইওর পয়জন?"

বেচারা শিবনাথ এসব বিলাতী রসিকতার অর্থ জানেন না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকেন।

মলী সেন তাড়াতাড়ি বললেন, "আমাদের দু'জনেরই সফট্।"

"ডোন্‌ট বি এ্যাবসার্ড।" বলে অশোক বেয়ারাকে হুকুম করল, নিজের জন্য হুইস্কি অ্যান্ড সোডা। হ্যাঁ, বড়। আর মলী সেনের জন্য শেরী। শিবনাথকে বহু পীড়াপীড়িতেও লেমন স্কোয়াসের উপরে তোলা গেল না।

অশোক শিবনাথের নিম্বুপানি নিয়ে দু'চারটে ঠাট্টার চেষ্টা করল। কিন্তু গম্ভীর শিবনাথ হাইটেনশন ইলেকট্রিক ক্যাবলের মতো প্রবল অন্তর্দাহ নিয়ে বসে রইলেন

নিরুত্তর। এ-সব চপল আলাপ, লঘু কৌতুক ও অপরিচিত রীতি-নীতি তাঁর কাছে অত্যন্ত অসার ও অন্তঃসারহীন চরিত্রের সুস্পষ্ট লক্ষণ মনে হলো। বিশেষ করে, স্ত্রীর এই প্রকাশ্যে মদ্যপান তাঁর মনকে গভীর বিরক্তিতে ভরে দিল।

মলী সেন বুঝলেন, স্বামী খুশি হন নি। কিন্তু কারণ খুঁজে পান না। ড্রিংক সম্পর্কে তাঁর নিজের বিশেষ কোনো আসক্তি নেই। কিন্তু তাঁর একবিন্দু উদরে গেলেই ধর্ম নষ্ট হয়—এমন অনুশাসনও মানেন না। তাঁদের সমাজে উৎসবে, নিমন্ত্রণে মেয়েরা সবাই একটু-আধটু পোর্ট, শেরী বা ভামুর্থ পান করেন, এ তিনি জ্ঞান হওয়া অবধিই দেখে আসছেন। এ নিয়ে এত অনর্থ করার কী আছে? শিবনাথের এত গোঁড়ামিরই বা মানে কী? অশোকের অত অনুরোধের পরেও নিজের জেদ বজায় রাখা তাঁর উচিত হয় নি, এ-কথা কিন্তু তাঁকে মানতেই হবে।

অপরাহ্ন বেলায় স্বামী-স্ত্রীর সান্নিধ্যটুকু যতখানি আনন্দের সম্ভাবনা নিয়ে সুরু হয়েছিল, সন্ধ্যা বেলায় তার চতুর্গুণ তিক্ততায় তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

বাইশে মাঘ শিবনাথের জন্মদিন। দোকানে বেরোবার সময় মলী সেন তাঁকে সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিকেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার অনুরোধ করলেন।

শিবনাথের ভালো লাগল। একজনের জন্মদিনের কথা অন্য আর একজন স্মরণ করে রেখেছে, এ-তথ্যটুকু মনকে খুশী করে। সন্ধ্যায় গৃহে এসে দেখলেন, মস্ত উৎসবের আয়োজন, বিরাট ভোজের ব্যবস্থা, প্রচুর জনসমাগম।

ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে নানা রঙের জাপানী লন্ঠন। টিপায়ের উপর জড় হয়ে আছে নানা জনের লেখা ইংরেজীতে শুভকামনার চিঠি কার্ড ও টেলীগ্রাম। উর্দি-পরিহিত ফারপোর বেয়ারারা পরিবেশন করছে নানাবিধ সুস্বাদু ভোজ্য ও পানীয়। এক কোণের টেবিলে মলী সেনের দেওয়া সুদৃশ্য প্রেজেন্ট। সাহেবী দোকান থেকে কেনা দামী টয়লেট কেস। তাতে সবুজ ফিতায় বাঁধা কার্ডে ইংরেজীতে লেখা,—মেনি হ্যাপি রিটার্নস।

শিবনাথ কিছুমাত্র প্রসন্ন হলেন না। মনে পড়ল আগেকার এমনি একটি জন্মদিনের স্মৃতি। সন্ধ্যাবেলায় মেজেতে কার্পেটের আসন বিছিয়ে শৈলবালা তাঁকে খেতে দিয়েছিল নিজ হাতে প্রস্তুত সাধারণ অন্ন-ব্যঞ্জন। সব শেষে ছোট পাথরের বাটিতে নলেন গুড়ের পায়েস—জন্মদিনের অবর্জনীয় উপাচার। তাঁকে উপহার দিয়েছিল একটি রুমাল। তার এক কোণে রেশমের সুতায় কাজকরা শিবনাথের নামের ইংরেজী আদ্য অক্ষরটি।

সে-দিনের উৎসবে তার উপলক্ষ্য ও উদ্যোক্তা ছাড়া বাইরের তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না। সে-দিনের আহার্য স্নেহের দ্বারা ধন্য এবং উপহার প্রিয়হস্তের চিহ্ন দ্বারা মহার্ঘ ছিল। আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ ও প্রীতিতে পূর্ণ সেই সামান্য অথচ সুষ্ঠু আয়োজনের কাছে আজিকার বহু আড়ম্বরপূর্ণ এই হট্টগোলকে অপব্যয়প্রবণ বিকৃতরুচির উৎকট নিদর্শন মনে হলো। যেন শ্যামলীর পাশে আগরওয়ালা ম্যানসন্। যেন সুরবাহারের কোমল আলাপের কাছে হোটেলের উচ্চরব জ্যাজ ব্যান্ড।

হায়, মলী সেনের কোনো কাজ শিবনাথের রুচিকর হয় না, কোনো সেবায় মিলে না স্বাদ। শিবনাথের কোনো আচরণে মলী সেন পান না সন্তোষ, কোনো কথায় পান না প্রীতির আভাস।

মলী সেন ও শিবনাথের শয্যা পৃথক। স্বামী দোকানের হিসাবপত্রের খাতা পরীক্ষা করে অনেক রাত্রিতে যখন শুতে আসেন, স্ত্রী তখনও একক শয্যায় জেগে প্রতীক্ষা করেন। প্রত্যাশা করেন একটু মধুর আহ্বান, একটু নিবিড় স্পর্শ, একটু সোহাগ-সম্ভাষণ। রাতের পর রাত সে-আশা বিফল হয়। সে নিশিজাগরণ বৃথা যায়।

মলী সেন কল্পনাও করতে পারেন না যে, দুটি পাশাপাশি শয্যার মধ্যবর্তী কয়েক হস্ত পরিমিত ফাঁকের মধ্যে দুস্তর পারাবারের মতো বিরাজ করছে অদৃশ্য শৈলবালার অবিস্মরণীয় স্মৃতি। তাকে শিবনাথ কোনোদিন লঙ্ঘন করতে পারলেন না।

শিবনাথদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে শব নিয়ে যায় শ্মশানে। একদা গভীর নিশীথে শবযাত্রীদের কণ্ঠে বিকট হরিধ্বনি শুনে মলী সেনের ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার গৃহে একা বিছানায় তাঁর ভয় হতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে শিবনাথের শয্যায় এসে শুলেন। নিজের ডান হাত দিয়ে শিবনাথকে বেষ্টন করে ভীতি আপনোদনের চেষ্টা করলেন।

স্ত্রীর স্পর্শে শিবনাথেরও নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। আপন বক্ষের উপর স্ত্রীর সুগোল সুকুমার বাহুখানি তাঁকে সংকুচিত করল। নিজেকে যেন অপরাধী মনে হলো। যন্ত্রচালিতের মতো যেন নিজের অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে মলী সেনের বাহুটি তিনি পাশে নামিয়ে দিলেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো মলী সেন সে-শয্যা পরিত্যাগ করে নিজের বিছানায় ফিরে এলেন। শিবনাথের শয্যায় অংশ গ্রহণের যে অন্য আর একটা অর্থ হতে পারে সে-কথা উপলব্ধি করে লজ্জায় ও ক্ষোভে তিনি মৃত্যুকামনা করলেন। ছিঃ ছিঃ! শিবনাথ তাঁকে কী মনে করলেন! তিনি যে শুধু অন্ধকারে ভয় পেয়েই শিবনাথের পাশে গিয়েছিলেন, সে-কথাটা চেঁচিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করল মলী সেনের।

শিবনাথও অনুতপ্ত হলেন। স্ত্রী যে ভীত সচকিত হয়ে তাঁর শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁর অকারণ রূঢ়তায় অপমানিত ও ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন এই কথা ভেবে শিবনাথের অনুশোচনা হলো। তিনি সুইচ টিপে মাথার কাছের আলোটা জেলে দিলেন। সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কী ভয় করছে? আলোটা কি জেলে রাখব?"

নিজের বালিশে মুখ ঢেকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মলী সেন বলে উঠলেন, "না, না, আমার একটুও ভয় করছে না। তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

আর কী বললেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলেন শিবনাথ। তার পর বোধ হয় নিজের মুখ-ভাব গোপন করার উদ্দেশ্যেই আলোটা নিবিয়ে দিলেন।

পরদিন নিজের শয্যা মলী সেন অপসারিত করলেন পার্শ্ববর্তী কক্ষে।

দিনের পর দিন গেল কেটে। বছরের পর বছর হলো গত। শিবনাথ ও মলী সেনের হৃদয়ে কোনো যোগাযোগ ঘটল না। একজন রইলেন শিলার মতো অসাড়, অন্য জন রইলেন হিমের মতো শীতল। এবং উভয়ের মিলিত সত্তা রইল মরুর মতো ঊষর।

শিবনাথ ধীরে ধীরে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন আপিসের কাজের মধ্যে। মলী সেন আপনাকে ছড়িয়ে দিলেন ক্লাবে, পার্টিতে, পিক্‌নিকে।

দু'জনেই জীবন সম্পর্কে হলেন ভগ্নআশ, স্বপ্নহীন, বীতস্পৃহ।
অহর্নিশ শিবনাথ ভাবেন, মৃত্যুর আর বাকী আছে কত?
মলী সেন ভাবেন, মৃত্যুর আর বাকী আছে কী?

সজ্জাকক্ষের অভ্যন্তরে মলী সেন ও শিবনাথ যখন তাঁদের অভিশপ্ত জীবনের শোকাবহ ব্যর্থতাকে আর একবার নতুন করে উপলব্ধি করছিলেন, রঙ্গমঞ্চের অপর প্রান্তে বীরেশ্বর ও নিখিল তখন মঞ্চসজ্জার বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় রত।

দৃশ্যপট এবং আলোক-সম্পাতের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপরেই নির্ভর করে মঞ্চসজ্জার সৌকুমার্য। তাঁদের কাজের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বীরেশ্বর ও নিখিলকে ঘন ঘন আলাপ ও পরামর্শ করতে হয়।

স্টেজে প্রথম দৃশ্যটি সেট করা হয়ে গেছে। শুধু পটোত্তোলনের অপেক্ষা।

মলী সেনের মতো নিখিলেরও নাটকের সুরুতেই পার্ট। তিনি ইন্দ্রজিতের পোশাক পরে প্রস্তুত। পরবর্তী দৃশ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কী যেন দু-একটা খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলছিলেন বীরেশ্বরের সঙ্গে।

সত্যসিন্ধু এসে বললেন, "রয় সাহেব, ক্ষমা প্রার্থনা করতে এলেম।"

নিখিল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্ষমা প্রার্থনা? আমার কাছে? কী জন্য?"

"অত্যন্ত আগ্রহ সত্ত্বেও আপনাদের অভিনয়ের শেষ অবধি থাকা সম্ভব হবে না। একটা টাইফয়েডের কেস আছে বেহালায়। আমি মিনিট পনর-কুড়ি পরে চলে যাব। ত্রুটি মার্জনা করতে হবে।"

"ত্রুটি কিসের? আমাদের নাটক এমন কিছু নয় যে, সবাইকে শেষ অবধি বসে দেখতেই হবে।"

"কথাটা বড় মিথ্যে নয়: শেষ দৃশ্য অবধি ভালো অভিনয় সখের থিয়েটারে খুব কমই হয়।" বললেন বীরেশ্বর।

নিখিল বললেন, "আমার তো এই প্রথম। আগে কখনও অভিনয় করি নি। বেশ নার্ভাস বোধ করছি। ভয় হচ্ছে, অডিটরিয়াম থেকে হাততালি দিয়ে বসিয়ে না দেয়।"

"তালি বাজানো ছাড়া হাতের আর দু'চারটে মারাত্মক ব্যবহারও আছে যে।" কৌতুকভরে মন্তব্য করলেন বীরেশ্বর।

তিনজনই একসঙ্গে উচ্চ হাস্য করলেন।

সত্যসিন্ধু বললেন, "না, না, মিছে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? মিসেস মলী সেনের প্রডাকশন-এ লরেন্স অলিভিয়র বা শিশির ভাদুড়ীকে দেখার প্রত্যাশা নিয়ে কেউ আসে না। টিকিট যারা কেনে, তারা জানে দুর্গতদের সাহায্যের জন্য অভিনয়, ব্যবসা হিসেবে নয়।"

"কিন্তু নায়িকার পার্টটা কোনো ব্যবসাদারী থিয়েটারের চাইতে খারাপ হবে, এ-কথা ভাববেন না যেন, ডক্টর ঘোষ। রিহার্সেল-এ যতটুকু দেখেছি, মঞ্জুশ্রীর ভূমিকায় মিসেস সেনের চাইতে আর কেউ ভালো করতে পারবে, আমার মনে হয় না।

আশ্চর্য ক্ষমতা। মনে হয়, যেন বিলেতী সিনেমার নামকরা অভিনেত্রীদেরও হার মানাতে পারেন।” দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন নিখিল।

“আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, মিস্টার রয়। অভিনয়ে মিসেস সেনের জুড়ি মেলা ভার।” সত্যসিন্ধু বললেন। তাঁর অধরপ্রান্তে একটুখানি হাসির রেখা দেখা গেল কী? কী জানি! স্পষ্ট বোঝা গেল না।

বীরেশ্বর বললেন, “শুধু অভিনয় নয়, অর্গ্যানাইজিং এবিলিটিও আশ্চর্য। এ-রকম একটা বৃহৎ ব্যাপার, কত তার ঝামেলা, কত তার সমস্যা। সমস্তই একা সামলাচ্ছেন।”

“এই দলাদলির দেশে এতগুলি ছেলেমেয়েকে দিয়ে এক সঙ্গে কিছু করানোটাই কি সহজ কথা? আমি তাঁকে যত জানছি ততই অবাক হচ্ছি। বাস্তবিক, অসাধারণ মহিলা মিসেস সেন।” সশ্রদ্ধ প্রশংসায় মন্তব্য করলেন নিখিল।

“ঠিক কথা, রয় সাহেব। তবে এ বিষয়ে আপনার খুব ওরিজিন্যালিটি আছে ভেবে যেন গর্বিত হবেন না। মিসেস সেন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আরও দু’এক জনের এ-রকম মনে হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত জানলেই জানা যায় যে, আগের জানাটা কত সামান্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখন থাক। অল্প আলোচনায় এমন সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি দ্বারা মিসেস সেনের বিবিধ গুণগ্রামের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার হবে না। এদিককের বিষয়বস্তুকে কি সনেটে লেখা যায়?”

নিখিল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। সত্যসিন্ধু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, “না মিস্টার রয়, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার মতের বিরোধিতা করছিনে। সমর্থনই করছি। কপালে ছাপ নেই বলেই চিনতে পারছেন না যে, আপনি আর আমি একই ট্রেনের যাত্রী, একই পার্টির মেম্বর।” বলে সত্যসিন্ধু হাস্য করলেন। সে-হাসিতে কিছু কৌতুক, কিছু ব্যঙ্গ আর কিছু বুঝি বা অনুকম্পার আভাস ছিল।

নিখিল কী বলবেন, ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলেন। বীরেশ্বরও কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ব্যাকুল আর্তনাদে এই নীরবতা ভঙ্গ করে অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন মান্নামাসি।

“সত্য, আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।”

“কেন, কী হয়েছে?” প্রায় একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন সচকিত সত্যসিন্ধু, বীরেশ্বর ও নিখিল।

মান্নামাসি বললেন, “গৌরী গোপনে বিয়ে করেছে।”

“বিয়ে করেছে? কবে?” জিজ্ঞাসা করলেন সত্যসিন্ধু।

“আজ। ঘণ্টা কয়েক আগে। দুপুর বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আমি ভেবেছি, এসেছে এখানে। তা নয়, গিয়েছে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আপিসে। লুকিয়ে বিয়ে করে এসেছে তিন আইনে।”

“তাই নাকি! তা বেশ তো, এতে সর্বনাশের কি আছে, মান্নামাসি? বরটি কে?”

“এক দোকানী। একে সর্বনাশ বলব না তো বলব কী?”

“দোকানী?”

“হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। শ্যামবাজার না কোথায় যেন খদ্দরের দোকান করে খায়। লবণ তৈরী করে জেলও খেটেছে বার দুই। এ-সমস্তই গৌরীর বাপের কৃত কর্মের

ফল। ছোকরা ল'কলেজে তাঁরই ছাত্র ছিল। আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসত। তিনি খুবে পছন্দ করতেন, বলতেন এমন ভালো ছেলে নাকি আর হয় না। দেশের কাজে নিষ্ঠা দেখলে নাকি সকলেরই শ্রদ্ধা হয়। আমি কখনও আমল দিই নি। ভালো না হাতি। অপদার্থের একশেষ। তা না হলে ফার্স্ট ক্লাশ এম. এ.-ল পাশ করে কেউ কাপড় বেচতে যায় ?"

"গৌরীর সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিনের বুঝি ?"

"হ্যাঁ, তার বাবাই সোহাগ করে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন যে। এক সময়ে তাঁর এমন দুর্বুদ্ধিও হয়েছিল যে, মেয়েকে ঐ হতভাগাটার সঙ্গে মিশে পাড়ায় স্বদেশী করতে পাঠাবেন। গৌরীরও মনে মনে ঐ রকমই খানিকটা ইচ্ছে ছিল বোধ হয়। শেষে শুধু আমার ভয়েই দুজনে সে-মতলব ছেড়েছিল। কিন্তু এর চাইতে সেও যে ছিল ভালো।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি কিছুই জানতেন না ? গৌরী যে এ ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তা কি আগে অনুমান করেন নি ?"

"ঘুণাক্ষরেও না। সে যে এমন আহাম্মুকি করতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি কোনোদিন। একটা সামান্য দোকানীর প্রেমে পড়বে আমার মেয়ে, এ যে ধারণার অতীত। ছিঃ, ছিঃ, লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কেমন করে ?"

গৌরী মেয়েটি অত্যন্ত লাজুক ধরনের। এত নিরীহ ও নির্জীব যে, তার প্রবল প্রতাপান্বিত মায়ের পাশে সে প্রায় কারো চোখেই পড়ে না। ক্যাঙ্গারুমাতা যেমন আপন বুকের কোটরে সন্তান বহন করে ফেরে, মান্নামাসিও তেমনি তাকে সর্বদা নিজ আঁচলের ঢাকায় ঘিরে রেখে চলতেন। সেও যে কোনো একজন মানুষের মনোহরণ করতে পারে, তাকে ভালবেসে, জননীর অসন্তুষ্টি অগ্রাহ্য করে গোপনে বিয়ে করার সাহস সঞ্চয় করতে পারে, সত্যসিন্ধু, এ-কথা কখনও কল্পনা করেন নি।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে মান্নামাসির এত শোকার্ত হওয়ারই বা মানে কী ?

মানেটা মান্নামাসিই বুঝিয়ে দিলেন।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, "তোমরা তো জান সত্য, এই মেয়ের বিয়েই ছিল আমার রাত্রিদিনের ধ্যান, জ্ঞান। কী না করেছি তার একটা ভালো বিয়ের জন্য ? মেম রেখে শিখিয়েছি বিলেতী আদব-কায়দা। ক্লাবে মার্কারের কাছে শিখিয়েছি টেনীস। সোসাইটিতে পার্টিতে নিয়ে বেড়িয়েছি, যাতে বড় ঘরের ছেলেদের সঙ্গে চেনা-জানা হয়। হায়, হায়, এই তার পরিণতি ! শেষকালে আমার জামাই হলো একটা কুল-শীল-হীন দোকানদার ! হতভাগা মেয়ের গলায় দেয়ার কি দড়ি জুটল না ?" চোখ দিয়ে তাঁর জল ঝরতে লাগল।

চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "জীবনে কোনোদিন সুখী হতে পারলেম না। ছেলে-মেয়েরা বাপের স্বভাব পাবে না তো পাবে কার ? বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে মনস্তাপের অবধি ছিল না। মরার পরে তাঁর মেয়েকে নিয়েও দুঃখ পাব চিরকাল। এই আমার বিধিলিপি !"

সহানুভূতির স্বরে সত্যসিন্ধু বললেন, "না, মান্নামাসি, দুঃখ কিসের ? গৌরী তার নিজের মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করেছে ; তাতে ক্ষতি কী ? তাঁকে নিয়ে সে যদি

সুখী হয়, তবে আমাদের খেদ কেন ? আপনি প্রসন্নমনে তাঁদের দু'জনকে গ্রহণ করুন, ভগবানের কাছে তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করুন।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন মান্নামাসি, "কী বললে ? তাদের আশীর্বাদ করব ? কক্ষণও না। আমি অভিসম্পাত করব। তেমন মা আমি নই। আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দিয়ে এত বড় আঘাত যে দিল, তাকে আমি কোনোদিন ক্ষমা করব না।"

এতক্ষণ সত্যসিন্ধুর সঙ্গেই কথা বলছিলেন মান্নামাসি। মনের উত্তেজনায় উপস্থিত অপর ব্যক্তি দুটিকে লক্ষ্যই করেন নি। হঠাৎ নিখিলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মান্নামাসির সমস্ত ক্ষোভ দুর্জয় ক্রোধে পরিণত হলো। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন, "এই যে নিখিল রয়েছে দেখছি এখানে। বলুক সত্যি চেষ্টা করেছিলাম কি না। গোড়াতেই যদি বিয়েটা হয়ে যেতো তবে গৌরী আজ ঐ অপদার্থ দোকানীটার খপ্পরে পড়ত ? না, তখন যে তোমাদের এঞ্জিনীয়র সাহেবের গ্রাহ্যই নেই। কেন, গৌরী কোন অংশে ওর অযোগ্য ? তা গ্রাহ্য হবে কেন ? বুদ্ধিশুদ্ধি কি কিছু আর অবশিষ্ট আছে ওঁর ? সবই যে আর একজনের পায়ে বিসর্জন দিয়ে বসে আছেন। লজ্জা করে না ? সেই যে বলে, কড়ি দিয়ে কিনলেম, দড়ি দিয়ে বাঁধলেম, হাতে দিলেম মাকু। এখন শুধু ভ্যাঁ করাটুকুই বাকী। শুনছি, মিসেস সেনের বন্ধু বলে নাকি আবার জাঁক করেও বেড়ান। ছিঃ, ছিঃ, বলি আজকালকার ছেলেদের কি পত্ব-ষত্ব জ্ঞান নেই ? তোমরা কি ভাতের বদলে ঘাস খাও ?"

রাগে মান্নামাসির যেন আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান রইল না।

হতবাক নিখিল বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মান্নামাসির পানে। তাঁর সেই বিব্রত বিস্রস্ত অবস্থা মান্নামাসির মনে করুণার বদলে প্রতিহিংসার উদ্রেক করল।

"হুঃ, বন্ধু ! তোমার মতো এমন আর ক'ডজন বন্ধু আছে মিসেস সেনের, তার খোঁজ রাখ, গডাচর চন্দ্র ? জান, আর কতজন এর আগে তোমার মতো বন্ধু হয়ে নিজেদের নাক-কান কেটেছে ? সত্যসিন্ধুকেই না হয় একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ।" প্রায় চীৎকার করে বললেন মান্নামাসি।

সত্যসিন্ধু তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, "মান্নামাসি, আপনি তো বোধ হয় এখানে অভিনয় দেখতে আর থাকবেন না ! বাড়ি যেতে চান তো, আমি গাড়ি করে রেখে আসতে পারি।"

সত্যসিন্ধুর কথায় মান্নামাসি নিজের উত্তেজনা সম্পর্কে সচেতন হলেন। তাই তো, তিনি যে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন ! নিজের অসংযত ভাষণের জন্য লজ্জিত বোধ করলেন। একটু চুপ করে থেকে সহজ কণ্ঠে বললেন, "না, তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে। দয়া করে আমাকে শুধু একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দাও।"

"চলুন, আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।" বলে বীরেশ্বর মান্নামাসিকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

কিছুক্ষণ সত্যসিন্ধু ও নিখিল দু'জনেই চুপ করে রইলেন। তারপর অনেকটা যেন আপন মনেই বললেন সত্যসিন্ধু, "বেচারী মান্নামাসি, আশা করেছিলেন যেমন বিরাট আশাভঙ্গে আঘাতও পেয়েছেন তেমনি কঠিন।"

নিখিলের কানে এ মন্তব্য আদৌ পৌঁচেছে কিনা তা বোঝা গেল না। তাঁর

চিন্তাকুল চেহারা থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে, মান্নামাসির অপ্রিয় ভাষণ তাঁকে শুধু আঘাত করে নি, বিচলিতও করেছে।

কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে নিখিল বললেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি —যদি কিছু মনে না করেন—কথাটা—"

"আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনার প্রশ্ন আমি বুঝেছি। দেখুন, মিস্টার রয়, আমি আপনার চাইতে বয়সে বড়, সে-হিসেবে অভিজ্ঞতাও বেশী। আমার কথা শুনুন, সংসারে যার কাছে যতটুকু পাওয়া যায়, তার কাছে ততটুকুর জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকা ভালো। না, না, মিস্টার রয়, এ তর্কের কথা নয়, এ অনুভূতির কথা। পাথরের নুড়িকে শালগ্রাম ভেবে যদি অর্ঘ্য দিয়েই থাকেন তাতেই বা ক্ষোভ কিসের? পূজার আনন্দ তো মূর্তিতে নয়, আনন্দ ভক্তের মনে।"

বীরেশ্বর ফিরে এলেন। বললেন, "মান্নামাসিকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এলাম।"

সত্যসিন্ধু বীরেশ্বরের প্রবেশ বা উক্তি কোনোদিকেই মনঃসংযোগ না করে নিজের কথারই জের টেনে বললেন,—"হয়তো আমার কথাগুলি অনেকটা সারমোনাইজিং-এর মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মিস্টার রয়, এ আমার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা। একদিন আমিও আপনারই মতো মনে মনে দগ্ধ হয়েছি, মানুষের প্রতি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করেছি। কিন্তু আজ আমার মনের স্থৈর্য সম্পূর্ণ ফিরে পেয়েছি। সংসারে কারো সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই আমার।"

নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন করে তা সম্ভব হলো?"

"সংসারে অতি নগণ্য ঘটনা থেকেও যে মাঝে মাঝে কী বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে, তা আমাদের কল্পনার বাইরে। লালাবাবুর গল্প শুনেছেন হয়তো। সেই যে 'বেলা গেল'র কাহিনী। এও অনেকটা সে-রকমই। এত অকিঞ্চিৎকর যে, আমার নিজেরই বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। বলে সত্যসিন্ধু ক্ষণেক নীরব রইলেন। বোধ করি নিজের মনে মনে সমস্ত বিষয়টা একবার পর্যালোচনা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন,—

"মাস ছয়-সাত আগের কথা। এক সন্ধ্যায় চেম্বারে একটি মহিলা এলেন। রোগী এমন কতই আসে। ব্যক্তি হিসাবে কারো সম্পর্কেই ডাক্তারের কোনো ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু এ মহিলাটি অন্য পাঁচজনের চাইতে স্বতন্ত্র। আশ্চর্য বুদ্ধির দীপ্তি তাঁর দৃষ্টিতে, অসাধারণ দৃঢ়তার আভাস তাঁর ভাষণে ও আচরণে। মহিলা বিবাহিতা। স্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে ঈষৎ হেসে বললেন, 'তাতে তো আপনার রোগ নির্ণয়ে কোনো সাহায্য হবে না।'"

বীরেশ্বর বললেন, "আশ্চর্য তো!"

"হ্যাঁ, সে-জন্যই বোধ হয়, একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে চিকিৎসা সুরু করলেম তাঁর। প্রতি দু'হপ্তা অন্তর আসেন তিনি। পুঁথিপত্র ঘেঁটে অনেক যত্নে ব্যবস্থা করি ওষুধের। রোগের উপশম দেখিনে। সন্দেহ হলো, মহিলা, নির্দেশ মতো বিশ্রাম নিচ্ছেন না। জিজ্ঞাসা করতে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, তিনি খেটে খান। আমি আশ্বাস দিলেম, আমাকে ফিজ দিতে হবে না। স্মিত মুখে জবাব দিলেন, 'ডাক্তারকে পয়সা না দিলে ওষুধে উপকার হয় না।' অর্থাৎ বিনীত অথচ সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, কারো কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেওয়ার পাত্রী তিনি নন।

মাস দুই নিয়মিত এলেন। তারপরে তাঁর আর দেখা নেই।"

নিখিল বললেন, "অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন বোধ হয়।"

"না, তা নয়। হঠাৎ আজ সকালে তিনি আবার এসেছিলেন। চেহারা দেখেই বুঝলেম, অসুখ কমে নি, বেড়েছে। যথারীতি পরীক্ষার পর মনোভাব যথাসাধ্য গোপন রেখে স্বাভাবিক স্বরে বললেম, আপনার স্বামী কিম্বা অন্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একবার—।" তিনি বাধা দিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনার যা বলবার আমাকেই বলতে পারেন।' আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে বললেন 'আপনি অনর্থক বিব্রত বোধ করবেন না। আমি জানি আমার কী হয়েছে। আপনি কতদিন মিয়াদ মনে করেন?"

নিখিল মন্তব্য করলেন, "এ্যামেজিং।"

সত্যসিন্ধু বললেন, "প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে বললেম—পুষ্টিকর খাদ্য, পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যা পেলে সারতে—সব চেয়ে ভালো হয় কোনো স্যানাটোরিয়ামে, কশোলী, ধরমপুর কিম্বা—। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়িতে থাকলে অন্য লোকের ছোঁয়াচ লাগার আশঙ্কা আছে খুব?' আমি বললেম, তা আছে। মহিলা প্রতিবারের মতো নিয়মিত ব্যাগ থেকে টাকা বের করে পুরো ফিজের টাকাটা রাখলেন আমার টেবিলে। বললেন, 'আপনি আমার যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' ছোট্ট একটি নমস্কার করে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। জানেন মৃত্যুর এত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, অথচ ভয় বা বিচলনের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই আচরণে।"

বীরেশ্বর জিজাসা করলেন, "তারপর?"

সত্যসিন্ধু বললেন, "অবিবাহিত ডাক্তারের পক্ষে কোনো মহিলা পেশেণ্ট সম্পর্কে অত্যাধিক আগ্রহ প্রকাশটা বিপজ্জনক। তবুও খোঁজখবর নিয়ে যে-সকল বিক্ষিপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করেছি তাদের মধ্যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই। কেউ বলেন, মহিলা কোনো এক মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। আত্মীয় পরিজন কেউ কোথাও নেই। নেই যদি তবে সে-কথা বলতে বাধা কী? আবার কেউ বলেন, মহিলার সবাই আছে, স্বামী একজন আর্টিস্ট। আছে যদি তবে সে কথা গোপন করার প্রয়াস কেন? সত্যি বলছি, মিস্টার রয়, স্বভাবে শান্ত, ব্যবহারে মধুর ও মনোভাবে তেজস্বিনী এই মহিলা আমার কাছে যেন সংকেতহীন এক বিরাট রহস্য।"

নিখিল ও বীরেশ্বর দু'জনেই চুপ করে রইলেন।

সত্যসিন্ধু একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, "আমি ডাক্তার। অহরহঃ চোখের সামনে রোগীকে মরতে দেখতে হয়। তাতে বিচলিত হলে চলে না। কিন্তু মৃত্যুকে এমন প্রত্যক্ষরূপে এর আগে যেন কখনও উপলব্ধি করি নি। বোধ হয়, এই মহিলা তাঁর আপন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন বলেই তাঁর আসন্ন অবধারিত মৃত্যু আমার কাছে ভয়াবহ নির্মমতায় এমন স্পষ্ট হয়ে উঠল। জীবন যে কত ক্ষণিকের এবং মানুষ যে কত অসহায় তা যেন এই প্রথম যথার্থরূপে বুঝতে পারলেম। সে-মুহূর্তেই সংসারের সমস্ত কলহ, বিরোধ, মান, অপমান নিতান্ত তুচ্ছ এবং অর্থহীন মনে হলো। কথাটা শুনতে যতই কেন না অবাক লাগুক মিস্টার রয়, আমার রোগী সুবালার কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে নতুন

জীবনদর্শনের ইংগিত দিয়ে গিয়েছেন।"

"কী নাম বললেন তাঁর?" ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বীরেশ্বর।

"সুবালা। মিসেস সুবালা বোস। কেন, চেনেন নাকি এ-নামের কাউকে?"

বীরেশ্বরের গলার ভিতরে কী একটা স্প্রিং-এর মতো সজোরে চেপে ধরল যেন। বহু আয়াসে সেখান থেকে জড়িত উচ্চারণে এক অক্ষরের যে-শব্দটা নির্গত হলো তা এতোই মৃদু যে, সেটা হ্যাঁ, কিম্বা না, তা ঠিক বোঝা গেল না।

সত্যসিন্ধু বিদায় নিতেই বীরেশ্বর ছুটে গেলেন টেলীফোনের কাছে। একবার নো-রিপ্লাই ও দু'বার ভুল নম্বরের পর লাইনটা পেলেন।

"হ্যালো, কে কথা বলছ? ও নিধু, মাকে একবার ডেকে দে তো। মা নেই? বেরিয়েছেন? কখন? কখন ফিরবেন বলে যান নি? হেঁটে বেরিয়েছেন কী? ট্যাক্সিতে! খোকন সঙ্গে আছে তো? খোকনকে, কী বললি? খোকনকে আগেই সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছেন? হ্যালো, হ্যালো—যাঃ (খট্ খট্ খট্) হ্যালো, হ্যালো মিস—ইয়েস, আই হ্যাভ বিন কাট অফ্। ইয়েস পি-কে, সিক্স-জিরো-নাইন-ডবল থ্রি। হ্যালো, হ্যালো, কে নিধু,—হ্যাঁ আমি। তা কি বলছিলি তুই? ছোট সুটকেশটায় খানকয়েক জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে গেছেন? কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করিস নি কেন? জিজ্ঞেস করেছিলি; বেশ। কী বললেন তিনি? কিছু বলেন নি? কী বলছিস শুনতে পাচ্ছিনে। হ্যাঁ, চাবি; চাবির কী হয়েছে? চাবি তোর কাছে দিয়ে গেছেন? আমাকে দেওয়ার জন্য? হ্যালো, একটু চেঁচিয়ে বল দিকিন। হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। চিঠি? কার চিঠি? আমার? মা লিখে রেখে গিয়েছেন, আমার জন্য? কোথায় সে চিঠি? টেবিলের উপরে রেখেছিস তো শিগগির নিয়ে এসে খুলে পড় দেখি। ওঃ, তুই তো পড়তে জানিস নে। কী মুস্কিল!"

হতবুদ্ধি বীরেশ্বর কী করবেন ভেবে পেলেন না।

ধীরে ধীরে তাঁর স্মরণ হলো, হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে সুবালাকে কেবলই জানালার পাশে ইজিচেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছেন বটে। সে কী তবে—কী জানি। বীরেশ্বর তো ভেবেছেন স্কুলের খাটুনির পরে সুবালা বিশ্রাম করছেন। কিম্বা কিছু ভাবেনই নি। অহর্নিশ যাদের দেখা যায় তাদের চেহারার পরিবর্তন স্বভাবতঃই চোখে পড়ে না। কিন্তু এখন বীরেশ্বরের মনে হতে লাগল, তাই তো, সুবালার চোখে মুখে ইদানীং একটা ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপ পড়েছে যেন।

কিন্তু সুবালা হঠাৎ গেলেন কোথায়?

তার চাইতেও বেশী অবোধ্য বিষয় আছে। কী কারণে সুবালা আপন অসুস্থতার কথা বীরেশ্বরের কাছে এতদিন একবারও উল্লেখ করেন নি? কেন তাঁকে দেন নি আপন দুরারোগ্য ব্যাধির সামান্যতম ইঙ্গিত? কেন নেন নি প্রাত্যহিক শিক্ষকতার অহেতুক পরিশ্রম থেকে অন্ততঃ সাময়িক বিশ্রাম?

মীমাংসাবিহীন দুরূহ সমস্যার মতো সুবালা চিরকাল বীরেশ্বরের কাছে এক দুজ্ঞেয়, দুর্বোধ্য চরিত্র। অভিজ্ঞতার অতীত। পরিচিতির ঊর্ধ্বে।

নিখিল একা বসে ভাবছিলেন মান্নামাসির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও প্রকাশ্য তিরস্কার।

সংসারটা কি আগাগোড়াই ছলনা? মানুষের মুখগুলি কি সব মুখোশ? এতদিন মিসেস সেনের যে আচরণকে তিনি সহজাত সৌজন্য মনে করে শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন, সে তবে শুধু একটা পোজ? যাকে সৌহার্দ্য ভেবে পুলকিত হয়েছেন সে তা'হলে নিছক কর্কেট্রি?

ক্ষোভে ও দুঃখে নিখিলের চোখে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বিবর্ণ মনে হলো। বাস্তবিক, কী নির্বোধ তিনি! মান্নামাসি যে তাকে ভর্ৎসনা করে গেলেন, সে তো অহেতুক নয়। সত্যি, তিনি অবজ্ঞারই পাত্র।

কপট সোহাগ ও কৃত্রিম সখ্যের আবরণে মায়াবিনী সুপরিকল্পিত পন্থায় তাঁকে কেবলই প্রবঞ্চনা করেছে, এই নবলব্ধ ধারণায় মলী সেনের প্রতি নিখিলের মনে প্রবল বিদ্বেষ দেখা দিল। স্থির ও নিরপেক্ষ চিত্তে তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না, মলী সেনের সত্যিকার অপরাধ কোথায় বা কতটুকু। 'আমি প্রতারিত, প্রবঞ্চিত'—শুধু এই কথা মনে করে আহত আত্মাভিমানে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

সত্যসিন্ধু উক্তিগুলি নিখিলের কাছে ছেলেদের কপিবুকের নীতিকথার মতো মনে হলো। হয়তো সত্য, কিন্তু অবাস্তব। জীবনদর্শনের অর্থ কী? তার ইঙ্গিত বলে সত্যসিন্ধুর যে কবিত্ব করে গেলেন তারই বা অস্তিত্ব আছে, কোনখানে?

না, ডাক্তার সাহেব, উপদেশের মলমে মনের ক্ষত শুকায় না।

কিন্তু একান্তে বসে আত্মধিক্কৃতির সময় এখন কোথায়? আজ রাত্রির এই উৎসব-আয়োজনের মধ্যে তার মর্মবেদনার তো অবকাশ নেই। যবনিকার এক প্রান্তে প্রেক্ষাগৃহে প্রতীক্ষাকুল অসংখ্য নরনারী, অপর প্রান্তে এই মনোরম দৃশ্যপট, এই উজ্জ্বল দীপালোক, এই সুমধুর আবহ সঙ্গীত, এই জরি-ঝলমল সাজ-সজ্জার সমারোহ। এই স্বপ্নময় পরিবেশে ইলেকট্রীক্যাল এঞ্জিনীয়ার এন. সি. রয়ের তো কোনো অস্তিত্ব নেই। এই মুহূর্তে তিনি মগধের রাজতনয় ইন্দ্রজিৎ। বিদেশিনী রাজকন্যা মঞ্জুশ্রীর প্রেমের দ্বারে তৃষ্ণার্ত অতিথি।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠল। অভিনয় আরম্ভের পাঁচ মিনিট পূর্বেকার সংকেতধ্বনি।

"ফাইভ মিনিটস টু কার্টেন; টেক পজিশান, এভরিবডি।" দূর থেকে স্টেজ-ম্যানেজারের কণ্ঠে নির্দেশ শোনা গেল।

নিখিল কালবিলম্ব না করে স্টেজে আপন নির্দিষ্ট স্থানে এসে আসন গ্রহণ করলেন।

গ্রীনরুমের অপর অংশে নীরজা চলতে চলতে আপন চিন্তাধারায় এমন গভীর নিমগ্ন ছিলেন যে, দুই গজ দূরে থেকেও সত্যসিন্ধুকে দেখতে পান নি। অবশেষে প্রায় তাঁর ঘাড়ের উপরে পড়তে পড়তে নিজেকে কোনো মতে সামলে নিয়ে বললেন, "মাপ করবেন, আপনাকে ঠিক—"

সত্যসিন্ধু হেসে বললেন, "ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় এমন লোককে ইংরেজীতে বলে স্মনামবুলিস্ট। জেগে থেকেও স্বপ্নচালিত যারা তাদের জন্য অন্ততঃ ডাক্তারী

শাস্ত্রে কোনো সংজ্ঞা আছে বলে জানিনে। নীরজা, ব্যাপারখানা কী?"

নীরজা লজ্জিত হয়ে বললেন, "আপনাকে মোটেই দেখতে পাই নি।"

সত্যসিন্ধু কৌতুকজড়িত কণ্ঠে বললেন, "সংসারে ক্ষীণদৃষ্টি শুধু বৃদ্ধেরাই নন। একটা বিশেষ অবস্থায় তরুণ-তরুণীরাও চোখের অসুখে ভোগেন। তখন বিশেষ কোনো ব্যক্তি ছাড়া আর কারুকে আর চোখেই পড়ে না।''

সত্যসিন্ধুর বলার ভঙ্গিতে নীরজাও হেসে ফেললেন। বললেন, "তাই না কি? বড় বেয়াড়া অসুখ বলতে হবে, ডক্টর ঘোষ।"

"হ্যাঁ, জটিল তো বটেই। চোখে রঙ্গিন চশমা না পরেও রোগী তখন সব কিছুই রঙ্গিন দেখতে সুরু করে।"

"সে তো শুনেছি জনডিসের লক্ষণ। লিভারের দোষ থেকে হয়। তাদের ধরে ধরে এক কোর্স এমিটিন ইনজেকশান দিলে হয় না?" কপট ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন নীরজা।

সত্যসিন্ধু নীরজার রসবোধ ও বাকচাতুর্যে চমৎকৃত হলেন। সহাস্যে জবাব দিলেন, "না সিস্টার, ডায়াগনোসিসে ভুল আছে। এ-অসুখ লিভার থেকে নয়, হার্ট থেকে। কিন্তু ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ায় ওর ওষুধ লেখা নেই।"

পরিহাসের আবরণে সত্যসিন্ধুর মন্তব্যগুলি যে আলোচনাকে ক্রমশঃই বাস্তবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে-কথা হৃদয়ঙ্গম করে নীরজা বিব্রত বোধ করলেন। তাড়তাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনার কাছে একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, ডক্টর ঘোষ। আজ কালের মধ্যেই আপনার চেম্বারে একবার যাব ভাবছিলেম।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রয়োজন আমার কাছে? কারো অসুখ-বিসুখ সংক্রান্ত বোধ হয়?"

নীরজা জবাব দিলেন, "না, প্রয়োজনটা আমারই।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসু নেত্রে নীরজার পানে তাকালেন।

নীরজা কয়েক সেকেন্ড নিজের মনে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "আপনার জানা-শোনা কোনো হাসপাতালে আমার একটা কাজ জুটিয়ে দেন যদি তবে উপকার হয়।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস্টার রয়ের বাড়িতে যে কাজ, সে কি শেষ হয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—তা এক রকম শেষ বললেও হয়।" ইতস্ততঃ করে বললেন নিরজা।

সত্যসিন্ধুর কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হলো না। জিজ্ঞাসা করলেন, "তার অর্থ?"

নীরজা বললেন, "আসলে মিস্টার রয়ের বাড়িতে কাজ সামান্যই। ওঁর পিসিমাকে শুধু একটু দেখাশোনা করা। তিনি অসুস্থ বা নিতান্ত অশক্ত নন। সারা দিনে ঘণ্টা দুই-তিনের বেশী কাজ নেই। নার্স না হয়ে যে-কোনো মেয়েমানুষ হলেই চলে।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস্টার রয় তাই মনে করেন বুঝি?"

"না, তিনি কিছু বলেন নি।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "পিসিমা কি খুব দজ্জাল, বদরাগী লোক?"

"না, না। তিনি মাটির মানুষ। আমাকে প্রায় মেয়ের মতই স্নেহ করেন।" জানালেন নীরজা।

সত্যসিন্ধু কিছুটা সংকোচের সঙ্গে বললেন, "মাইনের কথাটা জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা, তবুও—"

"না, সে-দিক দিয়ে বলার কিছুই নেই। হাসপাতালে চাকরির ডবল টাকা মেলে এখানে।" বললেন নীরজা।

"তবে ?"

"অসুবিধা,—মানে—কেন জানিনে আর ভালো লাগছে না এ-কাজ।" বললেন নীরজা।

"হুঃ, বুঝেছি।" বলে অর্থপূর্ণভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন সত্যসিন্ধু।

সত্যসিন্ধুর হাসি ও মন্তব্যে নীরজা সংকোচ বোধ করলেন। চোখ তুলে সত্যসিন্ধুর পানে তাকাতেও যেন লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। মাটিতে চোখ রেখে বললেন, "বাঃ রে, এর মধ্যে আর বোঝাবুঝির প্রশ্ন আছে কোনখানে ?"

সত্যসিন্ধু পূর্ববৎ সকৌতুক হাস্যে বললেন, "নেই ? কি জানি ! হবেও বা। এ-সব হৃদয়স্য তত্ত্বং। সমস্তই নাকি নিহিতং গুহায়াং। থাক। এর চাইতেও বেশী ব্যাখ্যা করলে হয়তো তুমি লজ্জায় একেবারে মাটিতেই মিশে যাবে।"

নীরজা নতদৃষ্টিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর গায়ের রং অমন কালো না হলে কর্ণমূলে লালের আভা নিশ্চয়ই স্পষ্টতর হতো।

সত্যসিন্ধু বললেন, "ভাবছ, ধরলেম কী করে ? কেন, সেটা এমন শক্ত কী ? যার একটু সামান্য বুদ্ধি আছে, সে-ই অনায়াসে আঁচ করতে পারে। খাটুনি নেই, মাইনে দ্বিগুণ, রোগী নির্ঝঞ্ঝাট। এ-চাকরি যাঁর ভালো লাগে না, বুঝতে হবে তাঁর ভালো লাগার অন্য লক্ষ্য আছে। এবং সে লক্ষ্যে যে অলক্ষ্যে টান পড়েছে, তা তো তরুণ মনিবটির অবস্থা দেখেই অনুমান করা যায়।" অর্থপূর্ণ হাস্য করলেন সত্যসিন্ধু।

হাসি শেষ হলে কণ্ঠে গাম্ভীর্য ও সহানুভূতি মিশিয়ে সত্যসিন্ধু বললেন,— "নীরজা, আমি তোমারও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই বলছি। জেনে রেখো, সুখের উপরে কোনো জবরদস্তি চলে না। সুতরাং যা পাবার নয়, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গেলে মান যায়, প্রাণও ভরে না। বোধ হয় হেঁয়ালীর মতো শোনাচ্ছে। আমার মুস্কিলই ঐখানে। ঠাট্টা করে করে এমনই অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, এখন সিরিয়স কথা বলতে গেলেও লোকে সিরিয়সলী নেয় না। কমিক অ্যাক্টরকে হিরোর পার্ট দিলে যে-দশা ঘটে।"

অতি-প্রয়োগে ব্যর্থ হয় দণ্ড, অতি-পীড়নে ভয়। অনুভূতিও অসার হয় অতিরিক্ত দুঃখভোগে। বলা বাহুল্য, সেটা বেদনার অবসান নয়, বেদনার অভ্যাস। ব্যথার অপসৃতি নয়,—বিস্মৃতি।

আপন নিষ্প্রেম বিবাহিত জীবনের শোকাবহ ব্যর্থতায় ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে মলী সেন তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেও যেন আর সর্বদা সচেতন ছিলেন না। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মাটি যেমন কাঠিন্য লাভ করে, দুঃখের দহনে তিনিও তেমনি কঠোর ঔদাসিন্য অর্জন

করেছিলেন শিবনাথ সম্পর্কে আপন মনোভাব ও আচরণে। উপশমহীন ব্যাধির প্রতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিশ্চেষ্টতার মতো স্বামীর বিমুখতাকেও তিনি তাঁর জাগ্রত অনুভূতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন সযত্নে।

আজ সন্ধ্যায় শিবনাথের সঙ্গে এই নূতন সংঘাত মলী সেনকে কঠিনভাবে আহত করল। অতর্কিত আঘাতে বহু পুরাতন ক্ষতস্থান থেকে পুনরায় রক্তক্ষরণের ন্যায়, দীর্ঘদিন পরে নতুন করে ব্যাথায় ক্লিষ্ট হতে লাগল তাঁর মন।

শিবনাথের প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি মন্তব্য বারংবার পর্যালোচনা করে নির্জন গৃহে ক্রোধে ও বিরক্তিতে দগ্ধ হতে লাগলেন মলী সেন। বিরক্তি নিজেরই প্রতি। আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি যে শিবনাথের কাছে নত হয়েছিলেন, এই কথা মনে করে আপনাকে তিনি আর কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না।

জগতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে আছে দুঃখ। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আছে অসম্মান। সেই আত্মাবমাননার লজ্জা দুস্তর। প্রাণভিক্ষার চাইতেও প্রেমভিক্ষা গ্লানিকর।

প্রত্যাশাহীন মনের যে উদগত ঔদ্ধত্যে এতকাল শিবনাথের অনাদরকে তিনি উপেক্ষা করেছেন, তাতে চিত্তে শান্তি না পেলেও সন্তোষ পেয়েছেন। বিনীত নিবেদন ও কাতর অনুরোধের দ্বারা মলী সেন নিজেকে আজ সেই ন্যূনতম আত্মতুষ্টি থেকেও বিচ্যুত করেছিলেন। নিশ্চিত প্রত্যখ্যানের দ্বারা শিবনাথ শুধু যে মলী সেনের সেই ব্যাকুলতাকেই বিফল করলেন তা নয়, তাঁর দীনতাকেও প্রকট করে দিয়ে গেলেন পরিপূর্ণ নগ্নতায়। কোনোখানে তার আর এতটুকু আড়াল বা আবরণ রইল না। ছিঃ ছিঃ।

তৃষ্ণার্ত গরবিনী তাঁর সমুন্নত মঞ্চ থেকে নেমে এসে বিনম্র অঞ্জলি পেতেছিলেন নদীতে। হায়, সেখানে স্রোত বিশুষ্ক। জল মিলল না। অভাগিনীর দু'হাত ভরে উঠল শুধু পাঁক!

বেয়ারা এসে জানাল নিখিলের পক্ষে এখন আসা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়! মলী সেন বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন "তুমনে ঠিকসে বাতায়া থে?"

বাতিয়েছে বই কি। পরিষ্কারভাবে সে মেম-সাহেবের সেলাম দিয়েছে। কিন্তু সাহেব বলছেন, তাঁর এখন ফুরসৎ নেই।

আশ্চর্য! মলী সেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তার পরেও নিখিলের ফুরসৎ নেই! মলী সেনের বিশ্বাস হয় না। বেয়ারাটা অন্য কাউকে নিখিল বলে ভুল করে নি তো?

বেয়ারা মাথা নেড়ে বলল, ভুল সে একটুও করে নি। রয় সাহেবকে সে আচ্ছাসেই চেনে। ভারি বড়া এঞ্জিনর, দো হাজার তনখা তলব। তাঁর দেমাকভি অনেক উঁচা। নিজের নোকরদের হোলীর দিন পাঁচ পাঁচ রুপায়া বকশিষ দেন। এ-কথা সে আপনা কানসে শুনেছে। তাঁর দপ্তরমে চাপরাশীর কামও না কি বহুৎ আছে। হুজুর যদি থোড়া মেহেরবানী করে সাহেবকে শুধু একদফে বলেন, তবে কালই তার বৈঠে হুয়ে বড় লেড়কার একটা নোকরীর ব্যবস্থা হয়।

অসহিষ্ণু মলী সেন ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় আছেন এখন রয় সাহেব?

সে সংকুচিত হয়ে জানাল, সাহেব ওদিকের সজ্জাকক্ষেই আছেন। মেমসাহেবের হুকুম হলে সে আবার এক্ষুনি গিয়ে তাঁকে বলতে পারে।

না, তার প্রয়োজন নেই। বেয়ারাকে বিদায় দিলেন মলী সেন।

সে বেচারা যেতে যেতে ভাবল, ছেলের চাকরির সুপারিশের কথাটায়ই মনিব চটেছেন। কিন্তু তার যুক্তি খুঁজে পেল না। ভাবল, মেমসাহেবের সঙ্গে এঞ্জিনর সাহেবের যখন এত দোস্তী, তখন তার ছেলের জন্য একটু বলে দিতে আপত্তি কিসের? এ-সব বড়লোকেদের মেজাজের ঠিকানা পাওয়া যে তার মতো গরীব মানুষের সম্ভব নয়, অবশেষে এই সিদ্ধান্তেই তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো।

মলী সেন অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি ডেকে পাঠালে কোনো পুরুষের সময়ের অভাব হয়, জীবনে এ-কথা তিনি এই প্রথম শুনলেন।

এক তাড়া প্রুফ হতে নিয়ে ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলেন সুরেন লাহিড়ী। বললেন, "এই যে মিসেস সেন, আপনাকেই খুঁজছিলেম। কালকের কাগজে যে রিভিউটা ছাপা হবে তার প্রুফটা একবার দেখে দেন যদি।"

মলী সেন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "রিভিউর প্রুফ? তার মানে? রাম-জন্মের আগেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল শুনেছি। নাট্য সমালোচনাও নাটক সুরু হওয়ার আগেই ছাপা থাকে নাকি?

লাহিড়ী বিজ্ঞজনোচিত হেসে বললেন, "হুঃ, ঐখানেই তো পাবলিসিটি অফিসারের এফিসিয়েন্সী। কাগজে ভালো সমালোচনা ছাপাতে হলে অভিনয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলে বুঝি? আমার টেক্‌নিকই আলাদা। ড্রেস রিহার্সেলের দিনে এডিটর, ও রিপোর্টারদের এনে এত আদর-আপ্যায়ন করেছি কি অমনি? অভিনয়ের সমালোচনাটা ফলাও করে আগেই লিখেছিলেম। কেক, স্যান্ডুইচের ফাঁকে এক সময় দিয়ে দিয়েছি তাঁদের হাতে। কাল সকালে নিজেস্ব নাট্য-সমালোচকের নামে ছাপা হয়ে যাবে দেড় কলাম। দেখবেন, এ-সব ট্রেড সিক্রেট যেন আবার কাউকে বলে দেবেন না।"

পাবলিসিটি অফিসারের ট্রেড সিক্রেট নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মনের অবস্থা তখন মলী সেনের নয়। লাহিড়ীকে বিদায় করার উদ্দেশ্যে বললেন, "কিন্তু আমার তো এখন আর একটুও সময় নেই সুরেনবাবু, আমাকে মাপ করতে হচ্ছে।"

লাহিড়ী নাছোড়বান্দা। বললেন, "এ দু'মিনিটের ব্যাপার, আপনি শুধু চট করে একবার প্রুফগুলির উপরে চোখ বুলিয়ে দিন, কাটাকুটি সংশোধন যা কিছু আমি করছি।"

ব্যাপারটার গুরুত্ব যাতে মলী সেন যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করতে পারেন সেজন্য স্বর নীচু করে বললেন, "কাগজের আপিস থেকে এ-ভাবে গ্যালী বাইরে আনা নিয়ম নয়। শুধু আমার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব বলেই এ খাতিরটা পাওয়া গেছে।"

বিশেষ খাতিরের জন্য অবশ্য মলী সেন বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কিন্তু সুরেন লাহিড়ীর অধ্যাবসায় তাঁর জানা ছিল। রিভিউটা একবার না পড়া পর্যন্ত এখান থেকে উঠবেন, এমন সম্ভাবনা অল্প।

হাত বাড়িয়ে কাগজগুলি নিয়ে দ্রুত তার উপরে দৃষ্টি চালনা করলেন মলী সেন। নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা। ব্যবস্থাপনার, অভিনয়ের, আলোক সম্পাতের, দৃশ্যসজ্জার,

নৃত্য-পরিকল্পনার, সঙ্গীতের সব কিছুরই প্রথম-প্রত্যয়ান্ত সাধুবাদ। বিশেষ করে অভিনয়ের যুগ্মপ্রয়োগকর্ত্রী মিসেস মলী সেনের অভিনয় সম্পর্কে প্রায় পুরো তিন প্যারাগ্রাফ। তৃতীয় অঙ্কে মঞ্জুশ্রীর রাজগৃহ ত্যাগের দৃশ্যে তাঁর স্বাভাবিক ও মর্মস্পর্শী অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহে অনেকেই যে অশ্রু সংবরণ করতে পারে নি,—সে কথারও উল্লেখ আছে।

"চমৎকার।" বলে মলী সেন প্রুফগুলি ফিরিয়ে দিলেন সুরেন লাহেড়ীর হাতে।

"কাল সকালে এটা পড়ে, যারা আজ টিকিট কেনে নি তারা বুঝতে পারবে যে, কী জিনিস মিস্ করেছে। দেখবেন, আমি বলে রাখছি, রিপিট পারফরমেন্সের জন্য চিঠি আসবে অনেক।" বলে বীরদর্পে প্রস্থান করলেন উৎফুল্ল প্রচার-সচিব।

পরক্ষণেই ডলি এসে উৎকন্ঠার সঙ্গে বলল, "মলীদি, বীরেশ্বরবাবু বাড়ি চলে গেলেন এই মাত্র। স্টেজ সাজাবার ভার দিয়ে গেলেন আমার উপরে, আমার তো বড্ড ভয় হচ্ছে।"

কথাটা উদ্বেগেরই বটে।

"বাড়ি চলে গেলেন ? কেন ?" জিজ্ঞাসা করলেন মলী সেন।

"বললেন, বাড়িতে কী বিশেষ দরকার ; এক্ষুনি না গেলেই নয়।" উত্তর করল ডলি।

মলী সেনের স্মরণ হলো, স্ত্রীকে অভিনয় দেখতে নিয়ে আসবার জন্য বাড়ি যেতে চেয়েছিলেন বটে বীরেশ্বর। মলী সেন নিবৃত্ত করেছিলেন। তাই এবার তাঁকে না বলেই বীরেশ্বর চলে গেছেন মনে করে মলী সেন ক্ষুব্ধ হলেন। ভীরু কোথাকার ! সাহস হয় নি মুখোমুখি তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা করতে। যাক। পশ্চাদপসরণের দ্বারা আত্মরক্ষা করে যারা, তারা মলী সেনের মনোযোগের অযোগ্য।

ডলি মলী সেনের মনোভাবটা অনুমান করেছে কি না তা সে-ই জানে। সে বলল, "আমি তোমাকে বলে যাওয়ার কথা বলেছিলেম। তিনি বললেন, 'সময় নেই।'

বটে ! সময় নেই !! মলী সেনের জন্য আজ কী সবারই সময়ের অভাব ? অথচ এতকাল তাঁর একটু সখ্য, একটু প্রশ্রয়, একটু সান্নিধ্যের জন্য অকাতরে সময় বিসর্জন দিয়ে সময় সার্থক মনে করেছে কতজন। আজও অপরাহ্ণে তাঁর একটি সামান্য ইঙ্গিত, একটি ক্ষুদ্র আহ্বানের অপেক্ষা করেছে কত উৎকর্ণ শ্রবণ, কত উদ্বেল হৃদয়। এই ঘন্টা কয়েকের মধ্যে কোথায় ঘটেছে বিপ্লব ? কোনখানে নেমেছে যবনিকা ? নির্দিষ্ট দিনশেষে চিত্রাঙ্গদার অপসৃত দেহ-লাবণ্যের মতো তার আকর্ষণ কি নিঃশেষ হয়েছে আজ সন্ধ্যায় ? চক্ষে কি নেই বিদ্যুৎ, হাস্যে কি নেই সম্মোহন, কণ্ঠে কি নেই মদিরতা ?

সে-মুহূর্তে হাজির হলেন অমলা। মেয়েদের ড্রেস করার ভার তাঁর উপরে। বললেন, "মলী ভাই, সহচরীর পার্টে ছোট মেয়েদের চুলে ওয়েভ দিয়ে দিলে চমৎকার দেখাতো। কিন্তু কার্লিং ক্লিপ দেখছিনে ড্রেসিং রুমে। তোমার কাছে—"

কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্রোধ ও বিরক্তিজড়িত কন্ঠে মলী সেন বললেন,—"সবই কি আমাকে করতে হবে ? কোনো কিছুই কি তোমরা দেখে শুনে নিজেরা করতে পার না ? কী কুক্ষণেই যে এই অভিনয়ে হাত দিয়েছিলেম ! বিরক্তি ধরেছে আমার !"

ডলি ও অমলা দুজনেই মলী সেনের এই আকস্মিক বিক্ষোভে বিস্মিত হলেন বোধ করলেন। অভিনয়ে আয়োজনে মলী সেনের পরিশ্রম ও উদ্বেগের কথা

অমলার অজানা ছিল না। তিনি অনুমান করলেন, ক্লান্তিজনিত অবসাদেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে তাঁর।

তাঁরা চলে গেলেও মলী সেনের চিত্ত শান্ত হলো না। কিসের এক দুর্জয় অভিমান যেন তাঁর হৃদয়কে দলিত, মথিত ও পীড়িত করতে লাগল সর্বক্ষণ। সমস্ত পরিচিত নরনারী, সমুদয় প্রচলিত রীতিনীতি ও সর্ববিধ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক দুর্দমনীয় বিদ্রোহের তাড়নায় উত্তেজিত হলো তাঁর মন। তাঁর চক্ষে এই বিশ্ব চরাচরের জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে কোথাও কোনোখানে আর লেশমাত্র আনন্দের চিহ্ন রইল না।

নিজেকে আর কখনও এমন নিঃসঙ্গ নিরালম্ব মনে হয় নি। বৃহৎ পৃথিবীটা যেন একটা অতলস্পর্শী গহ্বর; তার সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল সুধাংশুকে। তাঁর বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র অথচ ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। অন্তহীন দুঃখ-রজনীর মেঘাবৃত আকাশে স্বল্পায়ু চন্দ্রালোক।

নিজের মনে মনে তাঁকে তিনি বারংবার আহ্বান করে বলতে লাগলেন, "সুধা, তুমি দূরে চলে গেলে কেন? কেন এমন চিরকালের মতো পর হয়ে গেলে তুমি?"

তাঁর অনুক্ত কণ্ঠের সেই অনুচ্চারিত কাতরতা নির্জন সজ্জাকক্ষটিকে যেন এক গভীর শোকাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতায় পূর্ণ করে দিল।

দ্রুতপদে সত্যসিন্ধু প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁকে কিছু বলার সুযোগ মাত্র না দিয়ে বিরসকণ্ঠে মলী সেন বললেন, "যদি আবার কোন উপদেশ দিতে এসে থাক সিন্ধু, তবে ক্ষান্ত হও। উচিত-অনুচিতের তালিকায় আমার আর রুচি নেই।"

সত্যসিন্ধু বললেন, "তাতে অবাক হই নি। মরণ-কালে সুপথ্যে অরুচি ঘটে, এ-কথা আয়ুর্বেদেও আছে। কিন্তু ভয় কোরো না, আমি লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্ট নই; অনিচ্ছুক লোককে কর্তব্য বোঝানো আমার পেশা নয়।"

মলী সেন ঈষৎ হেসে বললেন, "শুনে আশ্বস্ত হলেম। অনেক ডাক্তারই ভুলে যান যে, ওষুধ এবং উপদেশ কোনোটাই বিনামূল্যে দিতে নেই। তাতে কারো আস্থা থাকে না।"

"বোধ হয় তাই। কিন্তু এ-আলোচনা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন। আমি একটি জরুরী সংবাদ দিতে এলেম। শচীনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।"

"গ্রেপ্তার করেছে! কখন?" ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন মলী সেন।

"হ্যাঁ, আজ বিকেলে। ডি. সি. হেড কোয়ার্টার্স আমার বিশেষ বন্ধু। স্কুলে সাত বছর আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। এইমাত্র টেলীফোনে আমায় খবর দিলেন। আমি এক্ষুণি লালবাজারে যাচ্ছি।"

"গ্রেপ্তার কিসের জন্য? শচীন কি নতুন কোন—"

"বোধ হয় না। টেলীফোনে যতটুকু জানা গেল তা এই যে, সে নিজে পুলিশের কাছে গিয়ে যেচে সমস্ত কনফেশান করেছে। পুরানো কোন কোন রাজনৈতিক ডাকাতিতে তার যোগাযোগ ছিল তাও বলেছে। আমি জামিনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। ওঃ, আর একটা কথা। আমার বন্ধু বলছিলেন, শচীনের বাড়ি তল্লাসীর সময়ে কোন এক মহিলার নামে লেখা একখানা চিঠি পাওয়া গেছে। প্রেমপত্র জিনিষটা ভালো। যিনি লেখেন তিনি নিশ্চয়ই আনন্দ পান। যাঁকে লেখা হয়, অনুমান করি, তাঁরও

মন্দ লাগে না। কিন্তু সেটা প্রকাশ্য আদালতে বহুজন সমক্ষে পঠিত হলে কতখানি রুচিকর হবে, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কাগজপত্র এখানেও যদি কিছু থাকে তবে সেগুলি এই বেলা অবিলম্বে সরিয়ে ফেল।”

এক মুহূর্ত থেমে সত্যসিন্ধু পুনরায় বললেন, “রোগী-বিশেষে ওষুধটা আমি বিনিপয়সায়ই দিয়ে থাকি। মানুষ-বিশেষে উপদেশটাও বিনামূল্যেই দিলেম। আস্থা থাকা না-থাকাটা অবশ্য আমার হাতে নয়।”

আকস্মিক এই দুঃসংবাদের আঘাতে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন মলী সেন। গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কায় আচ্ছন্ন হলো তাঁর শরীর ও মন। সুসম্বন্ধ চিন্তার ক্ষমতা পেল লোপ। বাকস্ফূর্তি হলো না রসনায়। চলৎ-শক্তিহীন প্রস্তর-মূর্তির মতো বসে রইলেন নিজের আসনে।

কিন্তু সে মিনিট কয়েক মাত্র। ছুটে এলেন সিদ্ধনাথ। “মিসেস সেন, আপনি এখনও বসে আছেন? ড্রপসিন উঠবে এই মুহূর্তে। ডোবাবেন দেখছি। চলুন, চলুন, আর এক সেকেন্ড দেরী নয়।” বলে এক রকম হাত ধরেই টেনে নিয়ে গেলেন মলী সেনকে। দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে-নিয়ে-যাওয়া তৃণখণ্ডের মতো মলী সেনকে সজ্জাকক্ষ থেকে যেন তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই সিদ্ধনাথ নিয়ে এলেন স্টেজে। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো মলী সেন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে বসলেন অভিনয়ের সেটে।

স্টেজ ম্যানেজার শেষবারের মতো পাত্রপাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে কি না। তারপর দ্রুতপদে উইংসের আড়ালে গিয়ে বললেন, “রেডী? ওয়ান, টু, থ্রি।”

হুইসিল।

প্রেক্ষাগৃহের অবশিষ্ট আলোগুলি একসঙ্গে নিবে গেল। ইলেকট্রিক সুইচের প্রক্রিয়ায় মঞ্চের সম্মুখ থেকে নীল ভেলভেটের মোটা যবনিকা নিমেষে হলো অপসৃত।

উৎসুক দর্শকদের চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হলো রঙ্গস্থল।

‘স্বপন কুহেলী’ গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্য।

সমগ্র মঞ্চটি ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিস্তব্ধ। শুধু বহু দূর হতে বাতাসে-ভেসে-আসা বীনাধ্বনির ঈষৎ একটুখানি আভাস আসে যেন।

রজনীর শেষ প্রহরে পূর্বাকাশের মতো ধীরে ধীরে অন্ধকার দূর হয়ে রঙ্গস্থলে দেখা দিল আলোর রেখা। যেন তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বীণার সুর হলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর।

রঙ্গস্থল পূর্ণালোকিত হলে দেখা গেল,—নদীবক্ষে ভাসমান সুদৃশ্য এক প্রমোদ-তরণী। ময়ূরপংখী গড়ন। শ্বেত পংখের কাজ করা ছাদের উপরে বীণা বাজাচ্ছেন সুন্দরী রাজকন্যা মঞ্জুশ্রী। তাঁর প্রায় কোলের কাছ ঘেঁষে বাহুতে ভর দিয়ে অর্ধশায়িত সৌম্যদর্শন ইন্দ্রজিৎ। নীচে দ্বাররক্ষিকার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সুবেশা দুটি তরুণী; রাজকন্যার প্রিয় সহচরীদ্বয়। দূরে অপর তীরে আকাশ নীচু হয়ে যেখানে গাছের সারির সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে, সেখানে উঠেছে আধখানা চাঁদ। তার আলো

দুলছে নদীর বুকে। বীরেশ্বরের সুনিপুণ তুলির রেখা ও নিখিলের আলোকসম্পাতের কৌশল 'স্বপন কুহেলী'র দৃশ্য-বিন্যাসে স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই।

প্রেক্ষাগৃহের মুগ্ধ নরনারী করতালি দ্বারা সংবর্ধনা জানাল নয়নমুগ্ধকর মঞ্চসজ্জার এই অপূর্ব কলাকৌশলকে।

সমীর স্তব্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে ছিল স্টেজের দিকে। ধীরার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "মলী মামীকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু।"

সত্য কথা। মলী সেনের স্বাভাবিক দিব্যকান্তি যে-কোনো নারীর পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু। সযত্ন প্রসাধন, বর্ণাঢ্য বসন-ভূষণ, আলোকোজ্জ্বল পরিবেশের সহযোগে সেই পর্যাপ্ত রূপ হয়েছে অপরূপ।

কিন্তু সত্য কথা শুনেও যে মন অপ্রসন্ন হতে পারে, তা কি ধীরা ইতিপূর্বে কোনোদিন কল্পনা করেছে?

উত্তেজিত সমীর দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মলী সেনের প্রশংসায় নিজের উচ্ছ্বাসের থলি উজাড় করে দিতে লাগল। বলল, "দেখেছ, বীণার তারে হাতের আঙুলগুলি খেলছে কেমন গ্রেসফুল্!"

"সায়লেন্স প্লিজ।"—পিছন থেকে অন্য দর্শকের কাছে তাড়া খেল সমীর। তার ডান পাশের ভদ্রলোকটিও বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। বাধ্য হয়ে সমীরের মন্তব্য বন্ধ হলো।

পার্শ্ববর্তিনীটি অহেতুক মনোবেদনায় অনর্থক পীড়িত হতে লাগল নিঃশব্দে। মলী সেনের রূপ নিয়ে এতকাল সবচেয়ে গর্বিত ছিল ধীরা স্বয়ং। আজও সমীর কিছু না বললে সম্ভবতঃ সে নিজেই প্রশংসা করত। হায়, যে-কথা নিজের মুখে সবাইকে বলে বেড়াতে পারা যায় মনের আনন্দে, সে-কথা পরের মুখে শুনলে বুকে ব্যথা বাজে কেন, এ-রহস্য ধীরা কিছুতেই বুঝে ওঠে না।

অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা স্টেজের ভিতরে উইংসের পাশ থেকে অভিনয় দেখছিল। যদিও নীরজা দাঁড়িয়ে ছিলেন দূরে এক প্রান্তে, সেখান থেকে অভিনয়রত নায়ক-নায়িকাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার অসুবিধা ছিল না।

অভিনয়ের সঙ্গে বাস্তবের যোগ থাকে না, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি নীরজার আছে। থিয়েটারের প্রণয়, দ্বন্দ্ব, সখ্য, বৈরিতা পাত্রপাত্রীরা মুখের গ্রিজ-পেইণ্টের মতোই অভিনয় শেষে ধুয়ে মুছে ফেলে রেখে যায় পাদপ্রদীপের ছায়াতে, এ-কথা তাঁরও অজানা নেই। তবুও প্রেমমুগ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের মতো মঞ্জুশ্রী ও ইন্দ্রজিতের এই ভাবাবেগে ঘনসন্নিবদ্ধ অবস্থিতিটুকুকে নীরজা কিছুতেই যেন প্রসন্ন মনে দেখতে পারলেন না। নিজের মনকে বারংবার বোঝাতে চেষ্টা করলেন,—এতো শুধু অভিনয়। কিন্তু মানবমনে বিচার বুদ্ধির গণ্ডি অতিক্রম করেও আছে যে যুক্তিতর্কের অতীত এক অনুভূতির কেন্দ্র, সেখানে নীরজার কেবলই ব্যথা বাজতে থাকে।

মঞ্জুশ্রীর বীণাবাদন সাঙ্গ হলো। সন্তর্পণে বীণাটিকে রাজকন্যা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। ইন্দ্রজিৎ তাকিয়ে ছিলেন তাঁর মুখের পানে। সে তন্ময় দৃষ্টিতে প্রণয়বিহ্বল পুরুষের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। সে-দৃষ্টির সঙ্গে

দৃষ্টি মিলতেই নয়ন নত করলেন মঞ্জুশ্রী।

এই অংশটুকু নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত করতে নিখিল ও মলী সেনকে রিহার্সালে যে অনেক দিন ধরে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে, সে তো নীরজা স্বচক্ষেই দেখেছেন। অথচ সে-কথা এখন তাঁর মনেই পড়ল না। ঈর্ষাকাতর হৃদয়ের পীড়িত তন্ত্রীগুলি অবিরাম বেদনায় আলোড়িত হতে লাগল।

সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটি নীরব। বোধ হয়, একটা আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। দর্শকজনের বিস্ময়বিমুগ্ধ চক্ষুগুলি স্টেজের উপরে নিবদ্ধ।

সমীর ধীরার কানের কাছে কী যেন বলার উপক্রম করছিল। পাশের ভদ্রলোকটি নিজের ওষ্ঠাধরে তর্জনী স্থাপন করে বললেন, "হাশ্‌শ—।"

বেচারা সমীরকে অগত্যা উৎসাহ সংবরণ করতে হলো।

দর্শকজনের উৎসুক দৃষ্টির বাইরে ইন্দ্রজিতের মহার্ঘ রাজসজ্জার অন্তরালে যে রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ নিখিলচন্দ্র রায়টি আছেন, তাঁর চিত্ত শান্ত ছিল না।

মান্নামাসির কটু ভাষণের আঘাতে নিখিলের স্বপ্ন গেছে ভেঙ্গে, মন হয়েছে বিষাক্ত। মোহভঙ্গের পরিণাম তো মোহমুক্তি নয়, মোহভেদ। এক ভ্রম থেকে অপর ভ্রান্তি। ফলে প্রথমে যতখানি ছিল অনুরাগ, পরিণামে তার বেশী জমেছে বিদ্বেষ। যতখানি ছিল আকর্ষণ, তার বেশী দেখা দিয়েছে বিতৃষ্ণা।

কিন্তু নিজ দায়িত্ব পালনে কোনোদিন কোনো ত্রুটি ঘটে নি নিখিলের। আজ সন্ধ্যায় এই অভিনয়েও আপন কর্তব্যে এতটুকু স্খলন হবে না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা মন থেকে বার বার সরিয়ে দিলেন ব্যক্তিগত দুঃখ-ক্ষোভের ভার। নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগলেন আপন অংশটুকুর অভিনয়।

আহত নিখিলের সমস্ত বেদনা চাপা রইল ইন্দ্রজিতের রাজবেশের আড়ালে। মুখে ফুটিয়ে তুললেন প্রফুল্লতা, দৃষ্টিতে আনলেন বিহ্বলতা, কণ্ঠে জাগালেন ভাবগম্ভীর স্বর। জড়তাহীন উচ্চারণে সুরু করলেন নিজ পার্ট,—"সুলক্ষণে, ধন্য মানি আপনারে তোমার প্রসাদে। প্রেমে তব মোর অভিষেক।"

নীরজার দুই কানে কে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করল। কিন্তু আত্মসংবরণে ব্যর্থ হলে তো লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না কোথাও। তাই নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় মনে মনে বলতে লাগলেন "না ঈর্ষা করব না। ফেলব না চোখের জল। দুঃখকে জয় করব আমি।"

"হে কল্যাণী, ভিক্ষা এক আছে তব পাশে। বিমুখ করো না যেন—" নিখিলের কণ্ঠ কানে এল—

নীরজা দুই হাত দিয়ে সজোরে নিজের কান দুটি চেপে ধরলেন। স্মরণ করলেন সত্যসিন্ধুর উপদেশ,—যা রইবে না জানি, তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারলেই হারানোকে আর ক্ষতি মনে হয় না। ঠিক কথা। ত্যাগ করবেন তিনি। শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সবচ্ছন্দচিত্তেও। অনুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রের মতো পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে লাগলেন নীরজা, "আমি দিলেম, আমি দিলেম। নিঃশেষে দিলেম।"

চেয়ে দেখলেন, নিখিল আবেগভরে তাঁর দুই হাতের মধ্যে মলী সেনের ডান হাত-

খানি গ্রহণ করেছেন। বলছেন—কী বলছেন? কী জানি, তার এক বর্ণও আর নীরজার বোধগম্য হলো না। দুই চক্ষে তাঁর জ্বালা ধরল। ছিঃ ছিঃ। এ-দৃশ্য কি লুপ্ত করা যায় না দৃষ্টির সম্মুখ থেকে? ঢেকে দেওয়া যায় না সূচীভেদ্য আঁধারে? আকাশে অমাবস্যার কালিমা কি নেই? সমস্ত আলো কি মুছে দেওয়া যায় না রঙ্গমঞ্চ থেকে? ন্যায়হীন, নীতিহীন, নির্মম, নিষ্ঠুর এই পৃথিবী থেকে?

উত্তেজনায় কম্পিত পদে নীরজা দ্রুত ছুটে গেলেন বৈদ্যুতিক কলাকৌশল ও আলোক নিয়ন্ত্রণের সুইচ বোর্ডটার দিকে।

নিখিলের মনেও ঝড় বইছিল প্রচণ্ড।

এতদিন মলী সেনের ক্ষণিক উপস্থিতিকে তিনি জ্ঞান করতেন সৌভাগ্য, তাঁর সঙ্গকে মনে করতেন পুরস্কার। আজও অপরাহ্ণ বেলায় ইলিকট্রীক সুইচ বোর্ডটার কাছে মলী সেনের অঙ্গুলির অতর্কিত ছোঁয়াটুকু নিখিলের সর্বাঙ্গে পুলকের প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। সেই নৈকট্যই এখন বিরক্তি উৎপাদন করে। সেই আকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ মনে হয় অশুচি। আশ্চর্য!

এতক্ষণ যে-মনোবলের দ্বারা নিখিল পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় অভিনয় করে যাচ্ছিলেন, মলী সেনের হাতটি হাতে নেওয়া মাত্রই যেন ছিটকে-পড়া কাচের বাসনের মতো তা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে তাঁর আর জ্ঞান রইল না। অভিনয় বিস্মৃত হলেন। ভুলে গেলেন, তিনি মগধের যুবরাজ ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আপনাকে দেখতে পেলেন এক ছলনাময়ী নারীর অপ্রীতিকর অতিনিকট পরিবেষ্টনে। প্রবল ঘৃণা ভরে তার কলুষিত হস্তের অবাঞ্ছিত স্পর্শ থেকে তড়িদ্বেগে সরিয়ে নিলেন নিজের হাত।

সজোরে হাত টেনে নিলেন, না, কি হাত দিয়ে ধাক্কা দিলেন?

কে জানে?

মানসিক আলোড়নের প্রাবল্যে নিজেকে অবিচলিত ও সংহত রাখা কঠিন হলো মলী সেনেরও পক্ষে।

সিদ্ধনাথ তাঁকে গ্রীনরুম থেকে প্রায় একটি জড় পদার্থের মতো টেনে স্টেজে বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আপনার বোধশক্তিকে পুরোপুরি বজায় রাখা যেন মলী সেনের শক্তির বাইরে মনে হলো। তিনি প্রাণপণে যতই মনোনিবেশের প্রয়াস করেন অভিনয়ে, তাঁর সমস্ত চৈতন্য কেবলি হারিয়ে যেতে চায় অতীত স্মৃতিতে। মনে পড়ে একটি সুকুমার তরুণ মুখ,—সারল্যে নির্মল ও বীরত্বে নির্ভীক। স্মরণে আসে দুটি স্বচ্ছ চপল চক্ষের দৃষ্টি,—সাংসারিক অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক নয়; ভাবপ্রবণতার উদ্দীপ্ত। নিজের অজ্ঞাতে মলী সেন উন্মনা হয়ে যান।

এ কী বিপত্তি! ইন্দ্রজিৎ চেয়ে আছে মঞ্জুশ্রীর মুখের পানে। অধীর আগ্রহে প্রত্যাশা করছে উত্তর; প্রেমময়ী রাজকন্যার সলজ্জ সম্মতি। কিন্তু, কোথায়? সে যে বাক্যহীনা! এক বর্ণও মনে আসছে না তাঁর পার্ট! উপায়? লজ্জা ও উৎকণ্ঠায় মলী সেনের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল।

যাক, ঐ যে উইংসের পিছন থেকে পার্টের খেই ধরিয়ে দিচ্ছে স্মারক। মলী সেন শুনতে পেলেন,—"আমি চাই তোমাকে বিয়ে করতে, চাই দুজনে ঘর বাঁধতে।" সর্বনাশ! এ তো নাট্যকারের রচনা নয়, এ যে শচীনের উক্তি। এ কী বিভ্রম, না, ইন্দ্রজাল? মলী সেন কী জেগে স্বপ্ন দেখছেন?

প্রম্‌টার বেচারা বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল—"হে অতিথি কিছু নাহি অদেয় তোমায়—বলুন মিসেস সেন, হে অতিথি—।"

বৃথা। মলী সেনের মস্তিষ্কে যেন একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের বিপর্যয় চলছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো তাঁর রসনা হলো ভাষাহীন, অঙ্গ হলো বিবশ। মনে হলো, পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে আশ্রয়। সম্মুখে চেয়ে দেখলেন,—এ কী, প্রেক্ষাগৃহটা রথের মেলার নাগরদোলার মতো ঘুরছে যেন! রঙ্গমঞ্চের আলোগুলি যাচ্ছে নিবে! এ কী, চারদিকে এত অন্ধকার কেন?

অন্ধকার! হ্যাঁ, অন্ধকারই চান নীরজা। ঘন, কালো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। যে-অন্ধকারে লুপ্ত হবে সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নির্লজ্জ প্রণয়লীলার এই প্রগল্‌ভ প্রকাশ। লুপ্ত হবে নিখিল, মলী সেন, উৎসব-আয়োজনের সমস্ত সমারোহ।

রুদ্ধশ্বাসে নীরজা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন সুইচবোর্ডের ক্ষুদ্র মঞ্চটির উপরে। ঠিক যেখানে ঘণ্টা দুই আগে নিখিল মলী সেনকে সযত্নে দেখিয়েছেন আলোক নিয়ন্ত্রণ ও বৈদ্যুতিক কৌশলগুলির নিয়ন্ত্রণসংকেত। সারিবন্দী অসংখ্য সুইচের মধ্যে যেটা প্রথম হাতের নাগলে পেলেন নীরজা সেটাই টিপে দিলেন সজোরে।

দুম্‌! দাম্‌!! দড়াম্‌!!!

বিকট শব্দে কেঁপে উঠল রঙ্গস্থল। বিপুলবেগে প্রমোদতরণীটি হলো আন্দোলিত। ছাদের উপর থেকে মলী সেন সবলে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলেন। পড়ে গেলেন স্টেজের নীচে যেখানে নানা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ভীড়।

চক্ষের পলকে ঘটল দুর্ঘটনা।

সভয় আর্তনাদ উঠল স্টেজের ভিতরে। কেউ চীৎকার করছেন, "স্ট্রেচার"। কেউ চেঁচাচ্ছেন, "এ্যাম্বুলেন্স"। কেউ বা হাঁক দিচ্ছেন, "ফায়ার-ব্রিগেড"। কী করবেন ভেবে না পেয়ে অর্থহীনভাবে ছুটোছুটি করছেন শঙ্কিত মুখে কর্মকর্তার দল। স্টেজ-ম্যানেজার তাড়াতাড়ি নীল পর্দাটা টেনে দিলেন।

প্রেক্ষাগৃহেও দর্শকেরা ভীত, চমকিত। কী ঘটেছে বুঝতে না পেরে অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁরা সবাই অবিলম্বে বাইরে বেরোবার চেষ্টায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটলেন। সেখানে কে কার আগে নিষ্ক্রান্ত হবেন তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। ব্যস্ততা ও ভীড়। মায়েদের ত্রাস, শিশুদের আর্তনাদ। চতুর্দিকে বিশৃংখলা ও কোলাহল।

সমীর আসন ছেড়ে ছুটে গেল স্টেজের উপর। নিমেষে লাফিয়ে পড়ল মঞ্চের তলদেশে। জীমনাস্টিক-করা শরীর তার। মলী সেনের সংজ্ঞাহীন লঘুভার দেহ দুই হাতে অনায়াসে বহন করে উপরে নিয়ে এল। ড্রেসিং রুমে টেবিলের উপর শুইয়ে দিল।

কৌতূহলী বন্ধুবান্ধবীরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। মেয়েদের মধ্যে কেউ

খুঁজতে লাগলেন স্মেলিং সল্ট, ছেলেদের মধ্যে কেউ ছুটলেন বরফের সন্ধানে। বর্ষীয়সীরা "ডাক্তার, শীগগির একজন ডাক্তার" বলে ব্যাকুলভাবে তাকাতে লাগলেন আশেপাশে।

এই হিতাকাঙ্ক্ষী অথচ কিংকর্তব্যবিমূঢ় নরনারীর ভীড় ঠেলে যিনি সামনে এগিয়ে এলেন, তিনি শচীনের মা। হতবুদ্ধি সমীরকে বললেন,—"আমি ওঁকে দেখছি বাবা। তুমি চট করে একটু ঠাণ্ডা জল আনো দিকিন।'

মলী সেনের মাথাটি স্নেহভরে মহিলা তুলে নিলেন নিজের কোলে। বুকের কাঁচুলির শক্ত বাঁধনটা শিথিল করে দিলেন। হাত-পাখার অভাবে একটা প্রোগ্রামের বই দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন সযত্নে।

ঘণ্টা দুই কেটে গিয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহ জনশূন্য। স্টেজের উপরেও ভীড় নেই। বেশীর ভাগ অভিনেতা ও অভিনেত্রীই চলে গিয়েছেন। শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন তখনও অপেক্ষা করছেন।

ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলীফোন বাজছে মুহুর্মুহুঃ। নানা জায়গা থেকে আসছে পরিচিত ও অপরিচিতদের কণ্ঠে ঘন ঘন উৎকণ্ঠিত অনুসন্ধান।

একাধিক সম্ভবপর স্থানে খোঁজ করে শিবনাথকেও ধরা গিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে দেরী হওয়ায় আসানসোল যাত্রায় তাঁর বিলম্ব ঘটেছিল। তিনিও রোগীর কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

অবশেষে ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন, "জ্ঞান হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। ইনজুরি তেমন বিশেষ কিছু নয়। পায়ে ও পিঠে কয়েকটা সামান্য ব্রুইসেস ছড়ে যাওয়ার মতো। খুব আশ্চর্য রকমভাবে বেঁচে গিয়েছেন বলতে হবে। ওঁর ঘরে আজ রাত্তিরে কেউ যাবেন না যেন!"

প্রাণের আশঙ্কা নেই। আঘাত সামান্য। শুনে খুবই খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু শিবনাথের মনে যেন আশ্বাসের সৃষ্টি হলো না। কেন? শিবনাথ কি সহজে উতলা হন? বেশী উদ্বিগ্ন বোধ করেন? না কি—তিনি—হঠাৎ শিবনাথের কাছে নিজের হৃদয়ের গোপন কুঠরীর দ্বার উদঘাটিত হলো। শিবনাথ সভয়ে আবিষ্কার করলেন, এ তো উদ্বেগ নয়, এ হতাশা। মলী সেনের দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে তিনি অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই দুঃখ ও দুর্ভাবনার সঙ্গে তার অবচেতন মনের নিভৃততম স্তরে সমান্তরালভাবে বইছিল একটি অতি সূক্ষ্ম প্রত্যাশার ধারা। অরুচিকর দাম্পত্য-বন্ধন থেকে গ্রন্থিমোচনের ইঙ্গিত। নিরন্তর কৃত্রিম জীবনযাপনের শ্বাসরুদ্ধকর বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতির আশা। ডাক্তারের আশ্বাসে তাই যেন মনে অতি সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট নিরাশার ভাব জাগল।

শিক্ষা ও শুভবুদ্ধির প্রভাবে শিবনাথ সভয়ে দুই হাত দিয়ে যেন সজোরে প্রতিরোধ করতে চাইলেন এই হীন মনোভাব। কিন্তু নিজের কাছে নিজের সততায় কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলেন না তার অস্তিত্ব। ফলে নিজের উপরেই ক্রুদ্ধ হলেন।

স্ত্রীর জ্ঞান হওয়া মাত্রই তাঁর কাছে যেতে না পারার দুঃখেই যে স্বামীর মুখ ম্লান হয়ে আছে, সে-সম্পর্কে ডাক্তারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তিনি শিবনাথকে বোঝালেন, "শারীরিক আঘাত বেশী না হলেও জোর শক লেগেছে তো। এখন প্রিয়জনকে দেখলে একটা ইমোশানাল এক্সাইটমেন্ট হতে পারে। তাতে ব্রেইনে ব্লাড রাশ করার আশঙ্কা।"

আপন সুপ্ত মানসের গুপ্ত তথ্য জানতে পেরে নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিল শিবনাথের। হৃদয়হীন পাষণ্ড বলে নিজেকেই নিজে ভর্ৎসনা করলেন তিনি। স্ত্রীর চিকিৎসা ও পরিচর্যায় যাতে কিছুমাত্র ত্রুটি না ঘটে সে-দিকে অতি মাত্রায় তৎপর হয়ে উঠলেন। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একবার কর্নেল এমার্সনকে ডাকলে হয় না?"

"না, না, এ সামান্য ব্যাপারে তাঁকে কেন? পেশেন্টের দরকার শুধু এখন রেস্টফুল স্লিপ। ভালো করে ঘুমোতে পারলেই হয়। আমি লুমীনল আর ব্রোমাইড দিয়ে একটা মিকশ্চার রেখে গেলেম। তাই যথেষ্ট।"

শিবনাথ বললেন, "একজন বিলাতী নার্স—"

ডাক্তার বললেন, "যে-মহিলা ওঁর কাছে রয়েছেন তিনি বোধ হয় মিসেস সেনের মা? তাঁর চাইতে ভালো শুশ্রূষা নার্স এসে করতে পারবে না। তবে, আপনি যদি টাকা খরচ করতে চান, আমার আপত্তি কী?"

শিবনাথ নিবৃত্ত হলেন।

আত্মনিগ্রহের পালায় আরও একজনের অংশ ছিল। সে ধীরা। মলী সেনের ঘরের বাইরে অন্ধকার এক কোণে থামে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিঃশব্দে। ভয়ে, দুঃখে ও অনুশোচনায় প্রায় বিবর্ণ চেহারা। মলী সেনের প্রতি কিছুক্ষণ পূর্বে সে বিরূপ হয়ে ছিল, এ-কথা মনে করে ধীরার অনুতাপের আর সীমা রইল না। নিজের দুই গালে নিজ হাতে চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছা হলো তার। মলী মামীর আর জ্ঞান ফিরে আসবে কি? তিনি সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন তো? তিনি যদি না বাঁচেন? না, না, সে কি কখনও হয়? মনে মনে সমস্ত ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করে সে প্রার্থনা করল, "ঈশ্বর, কালী, দুর্গা, তোমরা মলী মামীকে ভালো করে দাও, সুস্থ করে দাও।"

পাশে কার যেন উপস্থিতি অনুভব করল ধীরা। মুখ তুলে দেখল,—সমীর।

সমীর চুপি চুপি বলল, "ডাক্তার বলেছেন, বেশী লাগে নি। কোনো ভয় নেই!"

ধীরা সমীরের দেহলগ্ন হয়ে তার কাঁধে আপন অশ্রুপ্লাবিত মুখটি স্থাপন করল। সমীর ডান হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলল, "কেঁদ না ধীরা, মলী মামী ভালো হয়ে উঠবেন।"

অভিমানের দ্বারা যে-দুটি হৃদয় কেবলই দূরে সরে যাচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে, উদ্বেগ ও অনুশোচনার মধ্য দিয়ে তারা এখন নিকটতর হলো। সমীর দেখল, হাসিতে যে-ব্যবধান দূর হয় নি, অশ্রুতে তা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হলো।

নিখিল বসেছিলেন এতক্ষণ একান্তে। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলেন, রাত কম হয় নি। গৃহে ফিরবার উদ্যোগ করলেন। মনে হলো স্টেজের বাইরে সিঁড়ির উপর কে যেন বসে আছে। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। কাছে এগিয়ে গেলেন।

"এ কী নীরজা! তুমি বাড়ি যাও নি এখনও? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন নিখিল।

নীরজা উঠে দাঁড়াতেই নিখিল লক্ষ্য করলেন, তার মুখ ছাই-এর মতো পাংশু। ভাবলেন, দুর্ঘটনায় তাঁরও আঘাত লেগেছে মনে। বললেন, "চল আমি পেঁাছে দিচ্ছি তোমাকে।"

গাড়িতে বসে দু'জনের কারুর মুখেই কথা ছিল না। ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করলেন নিখিল। ক্লান্তি শুধু দেহের নয়, মনেরও। চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করলেন আজ অপরাহ্ণ থেকে দ্রুত পরিবর্তিত সমুদয় ঘটনা-প্রবাহ। অসীম এক শূন্যতায় যেন ছেয়ে গেল মন। যেন খুঁজতে লাগলেন কোনো একটা নির্ভর, হাত বাড়িয়ে পেতে চাইলেন কোনো একটা অবলম্বন। হাতের সামনে যা ছিল, নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন।

নীরজাও অন্যমনস্ক ছিলেন তেমনি। কখন যে তাঁর ডান হাতখানি পার্শ্ববর্তী নিখিলের হাতের মধ্যে আশ্রয় লাভ করেছে তা জানতেও পারেন নি।

হঠাৎ খেয়াল হলো নীরজার। সর্বাঙ্গে জাগল কম্পন। সুখে কী দুঃখে, সে-কথা বোঝবার সাধ্য রইল না।

গ্যাসের আলোয় আলোকিত রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। বাইরের পানে চেয়ে নীরজা মনে মনে কা'কে যে প্রণাম করলেন, কেন যে প্রণাম করলেন, সে শুধু তাঁর অন্তর্যামীই জানেন।

"এই যে শিবনাথবাবু, আপনি এখানে—"

চমকিত শিবনাথ তাকিয়ে দেখলেন, সুরেন লাহিড়ী।

পূর্ণিমার নিদ্রা নেই। নিদ্রা নেই সাগরের। আর নিদ্রা নেই দেখা গেল প্রচার-সচিবের চক্ষে।

প্রথমে মলী সেনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মামুলী দুশ্চিন্তা ও পরে শিবনাথের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে লাহিড়ী বললেন, "কী দুর্ভাগ্য! অভিনয়ের রিভিউটা বিশ্ববার্তায় পেজ মেক আপ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ করে দিতে হলো। যাকগে, গতস্য শোচনা নাস্তি। তার জায়গায় এই রিপোর্টটা ছাপার জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড তাড়াহুড়া করে লিখতে হলো। একটু শুনুন দিকিন, কেমন হয়েছে। এক্ষুণি পেঁাছে দিতে হবে নিউজ এডিটরের ডেস্কে। নইলে ডাক এডিশানটা ধরা যাবে না!"

শিবনাথের সম্মতির অপেক্ষা মাত্র না করে লাহিড়ী পড়তে সুরু করলেন। এমন একটি উপভোগ্য অভিনয় সুরুতেই পণ্ড হওয়ার ফলে দর্শকগণের হতাশা, আর্টের ক্ষতি, প্রধানা অভিনেত্রীর আঘাত ইত্যাদির মর্মস্পর্শী বর্ণনা। শেষ কয় ছত্রে আছে শিবনাথেরও উল্লেখ ;—

> "অপ্রত্যাশিত শোচনীয় দুর্ঘটনায় অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা মিস্টার সেন স্বভাবতঃই অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পত্নীগতপ্রাণ স্বামীর এই উদ্বেগ ঘটনাস্থলে উপস্থিত

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণের গভীর সহানুভূতি উদ্রেক করিয়াছে। যে-সকল বিশিষ্ট নাগরিক বাড়িতে আসিয়া বা টেলিফোনযোগে মিস্টার সেনকে তাঁহার এই বিপদে সমবেদনা জানাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য,—স্যার ও লেডী প্রফুল্লনাথ; জাস্টিস এস. পি. সেন; কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র জনাব মহম্মদ জারীফ; শেরীফ রামসুখন ভাণ্ডারী; মিস্টার ডি. কে. বোস, আই. সি. এস ও তাঁহার স্ত্রী।"

"নামের লিস্টটা আরও একটু বড় হ'লে ভালো হয়। যাই দেখি গে, নতুন আর কেউ টেলীফোন করেছে কি না।" বলে লাহিড়ী প্রস্থান করলেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ফিরে এসে প্রচারসচিব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "রিপোর্টার সঙ্গে সিক্-বেডের একখানা ছবি ছাপতে পারলে চমৎকার হতো। কপালে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, চোখ বুজে শুয়ে আছেন মিসেস সেন, নার্স মাথায় আইস-ব্যাগ দিচ্ছে,—ওঃ, ফার্স্ট ক্লাস পার্বালিসিটি এফেক্ট হতো। একদম বিলাতী কায়দা। একজন ফটোগ্রাফারকে যদি একবার আনতে পারেন, মিস্টার সেন,—আচ্ছা, থাক, আমি বিশ্ববার্তায় একবার টেলিফোন করে দেখিগে, তাঁদের স্টাফ-ফটোগ্রাফারকে ধরা যায় কি না।"

বন্ধুজন ও পরিচিতের দল একে একে সবাই চলে গিয়েছেন। শুধু শিবনাথ তখনও বসে আছেন মলী সেনের ঘরের সামনে লক্ষ্যহীন, নিরুদ্যম আলস্যে।

রাত্রি গভীর হতে লাগল। বাড়ির সম্মুখের গলিতে দোকানপাট অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পথ জনবিরল। আশেপাশে দীপহীন রুদ্ধদ্বার গৃহগুলিতে অধিবাসীরা বেশীর ভাগ সুপ্তিমগ্ন।

আসন ত্যাগ করে শিবনাথ ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন ঘরের সংলগ্ন খোলা ছোট ছাদটিতে। আলসের উপরে দু'হাত রেখে তাকিয়ে দেখলেন—উর্ধ্বে নিঃশব্দতিমির-বেষ্টিত বিস্তীর্ণ আকাশ। সেখানে লক্ষ লক্ষ তারকা-অক্ষরে লেখা বুঝি মহাকালের দুর্বোধ্য লিপিকা! তাতে কি আছে সমাপ্তির ইঙ্গিত? মুক্তির নিশানা? আছে পরিত্রাণের সংকেত?

বেদনামথিত বক্ষস্থল থেকে নিজের অলক্ষ্যেতেই গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করলেন শিবনাথ।

উত্তর ভাষণ

আমার কথাটি ফুরালো। কিন্তু নটে গাছটি মুড়োবার আগেই বিস্মিত বন্ধুজনেরা প্রশ্ন করেন, "সে কী কথা? এই কি শেষ?"

জবাবে চুপি চুপি বলি, শেষ কিছুরই হয় না। উপসংহারের অন্তে থাকে পরিশিষ্ট, পঞ্চম অঙ্কের অবসানে আসে এপিলোগ, পরিশেষের পরে পুনশ্চ। তাই প্যারাডাইজ লস্টের পরে আবার প্যারাডাইজ রিগেইনড্ হয়। বঙ্কিমের হাতে মরা উদাসিনী বন্য বালিকা দামোদরের হাতে বেঁচে উঠে নম্র বধূরূপে স্বামী পুত্র নিয়ে করে ঘর। পর্বের পর পর্ব যোজনায় পাটনার পিয়ারী বাঈজীর ধারা বয়ে পৌঁছয় মুরারিপুরের দ্বারকাদাস বাবাজীর আশ্রমে বৈষ্ণবী কমললতায়। টানলে বাড়ে শুধু দ্রৌপদীর বস্ত্র নয়, উপন্যাসের ভল্যুমও। প্রমাণ—আপ্‌টন সিনক্লেয়ার।

অবশ্য জগতে বস্তু এবং প্রাণী দু'-এরই আয়ুষ্কাল বাঁধা আছে বিশ্বদেবের খাতায়। সেই নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম মাত্রই তাদের অস্তিত্ব যায় ঘুচে। কিন্তু জীবনসাঙ্গের মধ্য দিয়েই যে, জীবনের উজ্জীবন ঘটে তার প্রমাণ আছে যুগে যুগে জগতের একাধিক মহামানবের ধর্মপূত জীবনে। ক্রুশদণ্ডে যিশুর যে-জীবনাবসান, সে খৃস্টের সত্যিকার মৃত্যু, না, জন্ম? ইংরেজী উনিশ শ আটচল্লিশ সালের তিরিশে জানুয়ারী নাথুরাম গডসে গান্ধিজীকে প্রকৃতপক্ষে মেরেছে, না, বাঁচিয়েছে?

মরণ নিয়ে কবিদের নানা জল্পনা-কল্পনার কথা সুপরিজ্ঞাত। তাঁকে কেউ বলেছেন মধুর, কেউ বলেছেন ভয়াল, কেউ বলেছেন শান্তির পারাবার। কেউ বা তাঁকে মনে করেছেন শ্যাম সমান। মৃত্যুর রূপ সম্পর্কে তাঁদের যতই মতভেদ থাক, তাকে চরম সমাধান বলে তাঁরা কখনও ভুল করেন নি! কবিদের সাংসারিক জ্ঞানের পরিমাণ সম্পর্কে বহু কৌতুক প্রচলিত আছে; কিন্তু তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির অভাব নেই। মরণেই যদি সমস্ত নিঃশেষ, তবে কোন পরিতৃপ্তি নিয়ে মরবে নায়ক? কোন প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাঁচবে নায়িকা? না, একমাত্র বাংলা সিনেমার পরিচালক ছাড়া এ-যুগে মৃত্যুকে আর কেউ সমাপ্তির অবধারিত উপায় মনে করে না।

পদার্থবিদ্যায় বলে,—বস্তুর বিলোপ নেই; আছে পরিবর্তন। আধ্যাত্মিকতার মতে, প্রাণের বিনাশ নেই, আছে বিবর্তন। সাদা কথায়, তথ্যজ্ঞানীরা মানে রূপান্তর। তত্ত্বজ্ঞানীরা মানে জন্মান্তর। এ দু'-এর কোনোটাই যারা নয়, সেই সাধারণ মানুষেরও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আছে অনুরূপ উদাহরণ। ধূপ দগ্ধ হলেই তো মেলে সুরভি, প্রদীপের তেল ক্ষয় হয়েই দেয় আলো। বসন্তে চেরীর শাখায় পাতা খসে গেলে ফোটে ফুল। ফুল ঝরে গিয়ে ধরে ফল। ফল থেকে বেরোয় বীজ। সে কি তরুর সারা, না, শুরু? শ্রাবণ আকাশের শ্যামল মেঘমালা কি জলের আদি, না, অন্ত? জপের মালায় কোন রুদ্রাক্ষটি শেষের? স্তবের ভাষায় কোন্ মন্ত্রটি সমাপ্তির?

বস্তুতঃ, জগতে বিরাম নেই, আছে বিশ্রাম। যাত্রাশেষ নেই, আছে যাত্রাভঙ্গ। সে-থামাটা শুধু পুনরারম্ভেরই পূর্বভাস, গানের যেমন সম, কবিতার যেমন চরণ। সেগুলি তো ইতি নয়,—যতি। একমাত্র দাম্পত্য কলহে স্ত্রীর উক্তি ছাড়া জগতে 'শেষ কথা' বলে কিছুই নেই।

শুনে বন্ধুরা নিরস্ত হন। কিন্তু বান্ধবীরা তাঁদের খোপাশুদ্ধ মাথা নেড়ে কানের দুলে দোলা দিয়ে বলেন, "বা রে, তা বলে তোমার গল্পের কি পূর্ণচ্ছেদ থাকবে না?

প্লটের থাকবে না কনক্লুশন ?”

সেই সাহিত্যানুরাগিনীদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, গল্পের বায়না নিয়ে আমি বসি নি।

গল্প এ-যুগে হয় না। গল্প রচনার জন্য চাই যে-রহস্যময় পরিবেশ এবং কল্পনাপ্রবণ মনোভাব তার কোনোটাই বর্তমানে আর সম্ভব নয়। অপরিচয়ের যে দুরত্ব ও কৌতূহল শ্রোতার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ও মনকে মোহাবিষ্ট করে, আজিকার ভুগোল-ইতিহাস-ব্যাখ্যাত বিজ্ঞান-বিশ্লেষিত দিনে তার অস্তিত্ব নেই।

পৃথিবীর সকল দেশের সর্বাপেক্ষা আদি ও অকৃত্রিম গল্প হলো রূপকথা। তার পাত্র-পাত্রীরা সাধারণ নরনারীর প্রাত্যহিক পরিচিতির বাইরে। তার ঘটনাবিন্যাস সাংসারিক অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। সেই অজ্ঞাত, অভাবিত রহস্য তাই শ্রোতার মনে এক অনির্বচনীয় মোহ বিস্তার করে। রূপকথার রাজ্য পুরোপুরি স্বপ্নের রাজ্য। সে-গল্পলোক আসলে হলো কল্প-লোক। তাই তার আবেদন এত সর্বজনীন, এত দেশ-কাল-নিরপেক্ষ।

কিন্তু আধুনিক জগতে মানুষের বিস্ময়ের পরিধি সংকীর্ণ। বিশ্বাসের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। যন্ত্র এবং বিজ্ঞান মিলে অচেনা অজানার ক্ষেত্রকে করেছে অপরিসর, অসম্ভবের তালিকাকে করেছে সংক্ষিপ্ত। এরোপ্লেনে যখন হামেশাই তিল, তিসি, মায় হাতির বাচ্চা চালান হচ্ছে, তখন পুষ্পকরথের নামে কারো মন উত্তেজিত হয় না। প্রত্যহ খবরের কাগজে যখন থাকে হাইড্রোজেন বোমার রোমহর্ষক বিবরণ, তখন অগ্নি বা বরুণ বাণের কথা শুনে কারো দুই চোখ কপালে উঠবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে-দিনে প্রমাণ ছাড়া কিছুই প্রত্যয় হয় না, সে-দিনে ‘এ হ্যান্ড বুক অব বটানি’র পাতায় উল্লেখ না থাকলে সাত ভাই চম্পার পারুল বোনটিকেও কারো মনে ধরে না এবং প্রাণী-তত্ত্ববিদের ছাড়পত্র না পেলে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীদেরই বা সাধ্য কি যে, শ্রোতাদের অবিশ্বাসের বেড়া ডিঙোয় !

এক যে ছিল রাজা ! সুদূর অতীতে কোন এক বিস্মৃত দিবসের কর্মহীন সন্ধ্যায় মৃদু দীপালোকিত গৃহকোণে বৃদ্ধা পিতামহী সর্বপ্রথম এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন, তা শুধু পণ্ডিতেরাই জানেন। কিন্তু যুগ-যুগান্ত ধরে এই সহজ ও সামান্য সূচনাটি নিঃসংশয় শিশুচিত্তে যে কী মোহিনী মায়া বিস্তার করে আসছে, সে-কথা কারুরই অজানা নেই। ভাষার কারুকার্য নয়, ভাবের গাম্ভীর্য নয়, আড়ম্বরহীন নিরলঙ্কার চারটি মাত্র শব্দ,—এক যে ছিল রাজা ! সে তো কথা নয়, সে ইন্দ্রজাল।

মুস্কিল এই যে, এ-যুগে রাজা নেই। আছে রাজ্যপাল। নৃপতির বদলে রাষ্ট্রপাত। তাঁদের ভ্রূকুটিতে কারো শিরশ্ছেদ হয় না, তাঁদের তুষ্টিতে হয় না অর্ধেক রাজত্বসহ রাজকন্যা লাভ। প্রজাপালন বা দুষ্টদলন কোনোটাই তাঁদের এক্তিয়ারে নয়। প্রভাতে ত্রিষ্টুভ অনুষ্টুপ ছন্দে গেঁথে কোনো সভাকবি করে না তাঁদের স্তুতিপাঠ। চাঁদির রেকাবে হাজার আশরফি সাজিয়ে কোনো আমীর ওমরাহ দেয় না নজরানা। অনাথ আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন বা বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণী সভার সভাপতিত্ব ছাড়া তাঁদের আর কোনো সার্থকতা নেই। ফুঃ ; তাঁদের গল্প লিখতে বসবে কে ?

এ-কালের রাজকন্যারাও পাঁচ-মহলা রাজপুরীর অন্তঃপুরে সোনার কাঠি ছোঁয়ার

অপেক্ষায় নিদ্রামগ্ন থাকে না। সোনার গয়না গড়াতে স্যাকরার দোকানে ভীড় বাড়ায়। কেশবতীদের কেশদাম মেঘবরণ হওয়ার আগেই ববড্ হয়ে যায়। আধুনিক কঙ্কাবতীর অশ্রুতে মুক্তা ঝরে না, বরং গালের মেকআপ ধুয়ে যায়। তাদের গল্প শুনতে বসবে কে? ডেমোক্রেসীতে ফেয়ার ট্রায়েল হয় তো হতে পারে, কিন্তু ফেয়ারী টেলস কদাচ নয়। হায়, গণতন্ত্রে ছেলেদের মত গঠন করে মন্ত্রীমণ্ডলী, মেয়েদের রুচি নিয়ন্ত্রণ করে সিনেমা প্রযোজক এবং শিশুদের চিত্ত বিনোদন করে ডিটেকটিভ বই-এর প্রকাশক।

রূপকথার পরবর্তীকালে উপকথা রচিত হয়েছে যাঁদের নিয়ে, তাঁদের সঙ্গেও আধুনিক নরনারীর সাদৃশ্য সামান্য। ক্রোধ, করুণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি মৌলিক প্রবৃত্তিগুলির তীব্র অনুভূতি ও প্রচণ্ড প্রকাশ সে-যুগের অধিকাংশ নরনারীর আচরণে দিয়েছে অভিনবত্ব, চরিত্রকে করেছে রহস্যময়। পাপে, পুণ্যে, ক্রূরতায়, ঔদার্যে, লোভে, বৈরাগ্যে, মহত্ত্বে ও দুষ্কৃতিতে তাঁরা অসাধারণ। তাই তাঁদের সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল ও কল্পনার কিছুমাত্র অভাব ঘটে নি।

আধুনিক মানুষের জীবনে বিস্তার নেই। বিক্রমও না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মতো তার না আছে রং, না আছে ঝাঁজ। নিতান্তই নিরীহ। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হলে আধুনিক ভেনিসের মুর শয্যাগৃহে সুন্দরী ভার্যাকে গলা টিপে মারে না, বড় জোর বিবাহবিচ্ছেদের পরামর্শ নিতে উকীলের বাড়ি ছোটে। ওসমান এবং জগৎসিংহ এখন আর তরোয়াল নিয়ে তেড়ে আসে না। একে অন্যকে সিগারেট-কেস বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "হ্যাভ এ স্মোক।" প্রণয়িনীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এ-যুগে প্রেমিক আত্মহত্যা করে না; বরং মাসিক পত্রিকায় অপাঠ্য গদ্য কবিতা লিখে পাঠকের মনেই হত্যা-প্রবৃত্তি জাগায়।

এ-যুগে মানুষের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখ, ক্ষুদ্র কল্পনা। উচ্চাভিলাষ রাজসিংহাসন নয়, খুব বেশী হলে একটা প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব। তার জন্য গুপ্তহত্যার প্রয়োজন হয় না, খদ্দরের টুপিই যথেষ্ট। কলহের উত্তেজনায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধযাত্রা করে না, থানায় ডায়েরী লিখিয়ে আসে। এখন জয়ের লক্ষ্য নির্বাচন, দানের দৌড় ফ্ল্যাগ-ডে এবং প্রতিহিংসার মাত্রা বেনামী চিঠি। এ-কালে বাসের জন্য উদ্ভব হয়েছে ফ্ল্যাট, আহারের জন্য ক্যাফেটেরিয়া এবং পড়ার জন্য 'ডাইজেস্ট' অথবা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় অংশ। কোনোখানে আর বিশালতা বা নাটকীয়ত্বের অস্তিত্ব নেই। তাই এ-যুগে ড্রামা হয় না, হয় প্লে। সেক্সপিয়ার হয় না, হয় নোয়েল কাওয়ার্ড। এখন জীবনে টেম্পেস্ট নেই; আছে কেবলই ব্রিফ এনকাউন্টার।

বাস্তবিক গল্প-উপন্যাসকে যে ইংরেজীতে ফিকশান বলে সেটা একেবারে নিরর্থক নয়। কী কঠিন সংকটে পড়েই যে আধুনিক সাহিত্যিকেরা চাষীমজুরদের গল্প রচনায় বসেন, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। যেন রেশনের দিনে বাঙ্গালী মেয়েদের রুটি খাওয়ার দায়। অবশ্য অপরিচয় এবং ব্যবধান নিরঙ্কুশ কল্পনার অনুকূল, সন্দেহ নেই। কিন্তু অবকাশ, অপব্যয় ও অজস্রতার মাটি না পেলে কল্পনাধর্মী রচনার অঙ্কুরোদগম হয় না। তাই আইন সভায় স্বতন্ত্র দল যেমন প্রচ্ছন্ন সুবিধাবাদী, রাষ্ট্রনীতিতে নিউ ডেমোক্রেসী যেমন বেনামী কম্যুনিজম, রচনা শাস্ত্রে আধুনিক

গল্প-উপন্যাসও তেমনি ছদ্মবেশী প্রচার পুস্তিকা। 'মেহনতি'তে আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না। সাহিত্যিকেরই কথা ধার করে বলতে পারি, মানুষের মনোহরণ করে বংশীধর। সেটা হলধরের সাধ্যে নেই।

এ-যুগের সার্থক সাহিত্যসেবীদের কাছে সমাজ ও জীবনের এই সংকীর্ণ পরিধির কথা অজ্ঞাত নেই। তাঁরা জানেন, নলেন গুড়ের মরশুম ফুরোলে নলেনতর গুড়ের আশায় বসে কালহরণে লাভ নেই, তখন বাজার থেকে চিনি কিনে সন্দেশের পাক দিতে হয়। তাই তাঁরা এখন গল্প না লিখে লেখেন প্রসঙ্গ। ঘটনা-বিন্যাসের চেষ্টা ছেড়ে মন দেন চরিত্র-সৃষ্টিতে। জীবনের গতি অপেক্ষা মনের ধারা তাঁদের রচনার অধিক উপজীব্য। তাতে বিবরণ অপেক্ষা বিশ্লেষণ বেশী। মানসিক একটি বিশেষ অবস্থা, বা আচরণের একটি বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তাঁদের রচনা সফল।

পুরান দিনের রচনায় পাত্র-পাত্রীদের মাতৃজঠরবাস থেকে শ্মশানযাত্রা পর্যন্ত সমগ্র জীবনের কাহিনী থাকত। এখনকার লেখায় থাকে তাদের জীবিতকালের কোনো একটি অংশ, কোনো একটি দিন, এমন কি কোনো দু'একটি ঘণ্টার কথামাত্র। সেগুলি কথাসাহিত্যের ভোজনশালায় ডিনার নয়,—আলাকার্ট। কাহিনী-সমুদ্রের তরঙ্গ নয়,—বুদ্বুদ। এ-যুগের গল্প-লেখক,—শেকভ। কবি,—টি. এস. এলিয়ট। জগতে রোমাণ্টিক কাব্য আর হয় না। সত্যিকার গল্পও আর হবে না। যেমন আর ফিরে আসবে না সামন্ততন্ত্র বা পালের জাহাজ, কিংবা চণ্ডিমণ্ডপের আড্ডা।

তবুও সংশয় নিরসন হয় না। বান্ধবীরা সহৃদয়া। তাঁরা হৃষ্টচিত্তে বই-এর মলাট মুড়ে রেখে তাঁদের কমলকরপল্লবে চা-এর পেয়ালা এগিয়ে ধরেন। কিন্তু দেখ বৎস সম্মুখেতে প্রসারিত তব সমালোচকের জিজ্ঞাসু নেত্র।

বাগ্‌বিস্তার দ্বারা ভোটদাতাদের ভোলানো যায়, সমালোচকদের নয়। তাঁরা ঊর্ধে ও অধে মৃদু শির সঞ্চালনপূর্বক সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র, ইংরেজী কাব্য-জিজ্ঞাসা ও রাশিয়ান সাহিত্য-বিচার উদ্ধৃত করে শব্দবহুল ও কটাক্ষ-কুটিল যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করেন তার সহজ সারাংশ এই যে, "আচ্ছা না হয় মেনেই নিলেম এটা মলী সেনের গল্প নয়। কিন্তু বাপু হে, তাঁর জীবনের কি পরিণতি নেই?"

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন করি, "না, নেই।" শুধু মিসেস মলী সেনের নয়, সংসারে কারুর জীবনেরই পরিণতি থাকে না। থাকে পরিণাম। জিভে ক্যানসার ক্ষতকে কি গণ্য করব ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিব্য জীবনের পরিণতি? অতীতের কারাবরণকারী বহুনির্যাতিত দেশহিতব্রতীদের জীবনের পরিণতি কি বর্তমান পারমিটলোলুপতা?

পরিণতি কথাটার মধ্যে যে সুসমঞ্জস সমাধানের ইঙ্গিত আছে, জীবনের প্রকৃতিই তার বিরুদ্ধে। বাস্তব জীবন হচ্ছে কতকগুলি আকস্মিকতার সমষ্টি। সুপরিকল্পিত ধারা বা যুক্তিসম্মত ধাপ বেয়ে তা চলে না। তার আরম্ভ, তার স্থিতি এবং তার অবসান সমস্তই পুরোপুরি কার্যকারণবিরহিত, খামখেয়ালীভরা,—ইংরেজীতে যাকে বলে আরবিট্র্যারী। তার মধ্যে ঔচিত্যানুগ বিকাশ বা সঙ্গতিপূর্ণ সমাপন খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। কাল পূর্ণ হলে মলী সেনের জীবনেরও নিশ্চয় একটা পরিণাম ঘটবে। কিন্তু সে তো আমার জানা নেই। এটা খণ্ডিত জীবনচিত্র মাত্র। পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নয়। মলী সেনের যিনি বসওয়েল, তিনি গোকুলে বাড়ছেন।

প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এই যে, দুর্ঘটনার পরে মলী সেনের সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ ঘটে নি। কর্তার ইচ্ছায় শুধু কর্ম নয়, কর্মস্থানও বটে। আমার কর্মদাতাদের আদেশে অভিনয় রাত্রির পরদিনই আমাকে দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে যেতে হয়। মাঝে এই প্রাসাদপুরীতে কখনও আসি নি, এমন নয়। কিন্তু মলী সেনের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করি নি। সেটা ইচ্ছাকৃত। যাঁকে ভালো লাগে, তাঁর সঙ্গে পরিচয় পরিমিত রাখা বিধেয়। যে-গানের রেকর্ডটি পছন্দ, সেটি বেশী বাজাতে নেই।

অবশ্য পছন্দ হলে কৌতূহলটাও একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তারও একটি সীমা থাকা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে মলী সেন পুনরায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন কি না, সে-সংবাদ আমার পক্ষে অনাবশ্যক। একমাত্র সাহায্য-রজনীর টিকেটের যাঁরা মূল্য ফেরত আশা করেন, তাঁরা ছাড়া আর কারুরই তাতে ঔৎসুক্য নেই। উপর থেকে নীচে ছিটকে পড়া সত্ত্বেও মলী সেনের আঘাত কেন গুরুতর হয় নি, তার কারণ নিয়ে মাথা ঘামাবেন ডাক্তারেরা। হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদে সংজ্ঞা লোপ হয় কি না তার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন মনস্তত্ত্ববিদ। প্রমোদ-তরণীর ছাদ থেকে পতনের সঠিক কারণ কি, সেটা নির্ণয়ের কাজ সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের। আমি আর যাই কেন না হই, অন্ততঃ রবার্ট ব্লেক নই।

মলী সেন সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। কিন্তু মনোযোগ আছে। বিদেশে আমার এক আত্মীয়াকে মলী সেনের কাহিনী বলেছিলেম। শুনে নিরতিশয় ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করে তিনি ধিক্কার দিলেন, "অমন মেয়ের মুখে আগুন।"

মহিলার পাঁচটি মেয়ে ও চারটি ছেলে, একুনে এই নয়টি জীবিত সন্তানের জননী। বয়স চল্লিশের উপরে। এখন স্বামীর নামীয় খামের চিঠি গোপনে খুলে পড়েন এবং তাঁর বাড়ি ফিরতে দেরী হলে আপিসের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্টেনোগ্রাফার মেয়েদের চেহারা সম্পর্কে চাপরাশীকে জেরা করেন। তাঁর উষ্ণতার কারণ বুঝি।

মলী সেনের সগোত্রদের মধ্যে অনেক মেয়েই এখন স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে মুখে সধূম অগ্নিবহন করেন। সমাজের উপরতলায় অতিআধুনিকাদের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, ঠোঁটে রং মাখাটাই এখন আর যথেষ্ট প্রগতিশীলতার চিহ্ন নয়। আমার আত্মীয়ার ভৎর্সনা কানে গেলে মলী সেন বিচলিত হবেন, এমন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং সে-প্রসঙ্গ থাক।

এদেশে সুনীতি সংঘের চাঁদা-না-দেওয়া সদস্য আছেন সর্বত্র। আপামর সাধারণের নৈতিক চরিত্রের স্বয়ংনিযুক্ত অভিভাবকের সংখ্যাও অগুণতি। যদিও তাঁরা জেনে আতঙ্কে প্রায় শিউরে উঠবেন, তবুও স্বীকার করতে লজ্জা নেই, মলী সেনের সম্পর্কে আমার দুর্বলতা আছে। অন্ততঃ সাধুভাষায় পাপীয়সী বলে তাঁকে গাল দিতে আমার মন সরে না।

স্ত্রী অনন্যমতি নয়, এ-কথা শুনে স্বামীসম্প্রদায় আনন্দে একেবারে গদগদ হয়ে উঠবেন এমন প্রত্যাশা অবশ্য করিনে। কিন্তু বিবাহিতা নারীর জীবনেও যে দুরূহ সংকট দেখা দিতে পারে সে-কথা উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। অপকৃষ্ট ভূমিকা—ব্যাড পার্ট—শুধু যে প্রবঞ্চিত স্বামীর তা নয়, অবহেলিত স্ত্রীরও। সসম্মানে অভিনয় করা সমানই কষ্টসাধ্য। এ-কথা ঋষি টলস্টয়ের হয়তো জানা ছিল না।

কিন্তু কারাবাস যাদের ঘটেছে কারাযন্ত্রণার খবর তাদের কাছে তো অজ্ঞাত নয়।

পুরাকালে বিবাহের লক্ষ্য ছিল বংশরক্ষা। নিজের অবর্তমানে ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য ছিল সন্তান-সন্ততির আবশ্যকতা। শ্রমশিল্পের যুগে সে-প্রয়োজন অন্তর্হিত। যৌথ কোম্পানীর উদ্ভব হওয়াতে সম্পত্তির পারিবারিক তদারক আর অপরিহার্য নয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যদি না থাকে, তবে তার জন্যে ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তাও অনাবশ্যক।

পরলোকে পিণ্ডপ্রাপ্তির তাগিদে দারপরিগ্রহ যে-দেশের সনাতন রীতি, সেই ভারতবর্ষেও এখন বেশীর ভাগ লোক ইহলোকের পিণ্ড সংস্থানেই হিমশিম। পরিবারের আকার বৃদ্ধিতে এ-কালে আনন্দ হয় না; আতঙ্ক ঘটে। কুলগুরুর অনুশাসন অগ্রাহ্য করে আধুনিক হিন্দু যেমন বিলাতি হোটেলে খানা খায়, তেমনি পোপের অনুজ্ঞা উপেক্ষা করে আধুনিক রোমান ক্যাথলিক পর্যন্ত গোপনে জন্মশাসন করে। মেরী মাতার চাইতে মেরী স্টোপসের প্রতি তাদের এখন বিশ্বাস বেশী।

শুধু প্রজনার্থং-ই মহাভাগাঃ হতে এ-যুগের নারীর আপত্তি আছে। ভার্যা এখন আর পুত্রার্থে নয়, প্রীত্যর্থে। ঘরকন্না দেখার জন্য স্ত্রী ঘরে আনার যুক্তিও আজ আর তেমন গ্রাহ্য নয়। বিলাতে তো গৃহস্থালীর পারিশ্রমিক হিসাবে স্বামীর কাছে নির্দিষ্ট বেতন আদায়ের যুক্তি দেখিয়ে এরই মধ্যে নারী-আন্দোলন শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন ওঠে প্রীতি আগে পরে বিবাহ; না, আগে বিবাহ পরে প্রীতি? এ-তর্ক প্রায় তৈলাধার পাত্র-এর মতোই পুরাতন ও ক্লান্তিহীন। সুতরাং নিরর্থক। কিন্তু বিনা প্রেমসে যে না চলে দাম্পত্য জীবন, সে-বিষয়ে এ-কালে মতদ্বৈধ নেই। মীরা দে, দত্ত, দাস বা দেবী সবাই সে-কথা মানেন। আগে স্বামীরা সেবায় নিষ্ঠা এবং স্ত্রীরা শয্যার ভাগ পেয়েই খুশি থাকতেন। এখন দু'পক্ষেরই মন না পেলে মন ওঠে না। তাই সমুদ্রের ওপারে শুধু ভাই-এরাই ঠাঁই ঠাঁই নয়, মনের অমিলে স্বামী স্ত্রীতেও পার্টিশান সুট হয় যার সহজবোধ্য নাম ডাইভোর্স।

সমুদ্রের এপারে আমাদের সমাজে মেয়েদের পক্ষে বাসরঘরগুলি অভিমন্যুর চক্রব্যূহ। তাতে প্রবেশের পথ আছে, নির্গমনের উপায় নেই। পতিপ্রেমবঞ্চিতা নারীকে এ-দেশে গৃহকর্মে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করে হতে হয় দাসী। নয়তো পূজা-অর্চনাও দানধর্মে মন ব্যাপৃত করে হতে হয় দেবী। সাধারণ মানবী হয়ে জীবনধারণের কোনো সুযোগ নেই তার সামনে। এ-দেশে বিবাহ স্থির হয় স্বর্গে, সুতরাং স্বর্গারোহণের পূর্বে তার পরিত্রাণ কোথায়? তার তো হোলি ওয়েডলক্ নয়, হোলি ডেডলক্।

দুঃখে অচঞ্চল সুখে চ বিগতস্পৃহ যে-নারী তিনি নমস্যা। তাঁকে নিয়ে তো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু হৃদিস্থিত হৃষীকেশের দোহাইতে যার হৃদয় সান্ত্বনা না পায়, সমাজের আর পাঁচজন নারীর মতো যে প্রত্যাশা করে সখ্য, প্রীতি ও অনুরাগ, সেই কাদামাটিতে-গড়া সাধারণ মেয়ে স্বামীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকবে কী নিয়ে? মলী সেনের শৈশবের শিক্ষা, কৈশোরের আবেষ্টন ও যৌবনের সমাজ কোনোটাই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের অনুকূল নয়। কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধ ঠিক কোনখানে সে আমার জানা নেই। কিন্তু সোনার বোতাম আঁটা সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে যে

ব্রহ্মচিন্তা চলে না, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সমাজে অধিকাংশ আধুনিকাদেরই উভয় সংকট। পূর্বজন্ম বা কর্মফলের উপর যে-অসন্দিগ্ধ নির্ভরতায় প্রাচীনারা আপন দুর্ভাগ্যকে অনিবার্যরূপে গ্রহণ ও বহন করতেন, সে তাঁরা বর্জন করেছেন। অথচ যে-দুঃসাহসের দ্বারা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায়, তাও তাঁরা অর্জন করেন নি। তাঁদের না আছে অন্ধ বিশ্বাসের প্রশান্তি, না আছে যুক্তিপরায়ণতার দৃঢ়তা। যে-পাখীর মনে আকাশে উড়ে বেড়াবার বাসনা আছে অথচ ডানায় যথেষ্ট জোর নেই, তার মতো দুঃখী নেই ত্রিজগতে। পাখা-ঝটপটানিতে কেবলই ক্ষত-বিক্ষত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তার।

মলী সেন তো ছায়া নন। তাঁর হৃদয় আছে, আশা আছে, আসক্তি আছে এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ যে-সম্পদ সেই ভালোবাসা আছে। ভালোবাসায় তিনি আপন স্বামীকে জয় করতে পারেন নি। অন্যকে আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু হায়, যে-প্রেম নরনারীর পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত নয়, যে-অনুরাগ নিত্যকার সাংসারিক জীবনযাত্রায় অপ্রতিফলিত, স্বজন-বন্ধুগণের দ্বারা অস্বীকৃত এবং সমাজের মৌলিক-কল্যাণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিহীন, সে ঝঞ্ঝার মতো বেগবান হলেও ঝঞ্ঝার মতোই অস্থায়ী। বন্ধনহীন প্রেম বৃন্তহীন পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি বিকাশ মনোহরণ করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে না। প্রেম—স্ফুলিঙ্গ। বাস্তব জীবনের দীপশিখায় আশ্রয় না পেলে সে দীপ্তিময় হয়েও স্বল্পায়ু। এ-সত্য মলী সেনের জানা ছিল না। তাই ব্যর্থমনোরথ হয়ে তিনি ক্ষোভে বিদ্রোহে ও ভ্রান্তিতে বারংবার কেবলি মাথা খুঁড়েছেন চারদিকের দেয়ালে। তাতে দেয়ালে চিড় ধরে নি। তাঁর নিজেরই আহত ললাট থেকে ঝরেছে শোণিত।

অসামান্য রূপ ও অসাধারণ বুদ্ধি নিয়ে অতুল ঐশ্বর্যে এবং অসংখ্য ভক্তজনের মধ্যে মলী সেন রিক্ত, নিঃসঙ্গ ও বুভুক্ষু। চিরাচরিত রীতিতে যেখানে তাঁর স্থান, সেখানে তিনি অনাহূত। স্বাভাবিক নিয়মে যাঁর কাছে তাঁর মান, তাঁর কাছে তিনি অনাদৃত। সেই অবাঞ্ছিত অবস্থিতির অপরিমিত গ্লানি নিরন্তর বহন করে আপন আত্মাকে তিলে তিলে হনন করছেন অনন্যোপায় মলী সেন। তিনি যা চেয়েছেন তা রয়েছে তাঁর পাওয়ার অতীত। তাঁর কাছে যা চাওয়া হয়েছে, তা ছিল তাঁর দেওয়ার অসাধ্য।

এই হলো তাঁর ট্র্যাজেডি।

এই হবে তাঁর এপিটাপ।

ঝিলম নদীর তীর

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী
শ্রীচরণকমলেষু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ঝিলম নদীর তীর" সাময়িক পত্রে খণ্ডিতাকারে প্রকাশিত রচনার পরিবর্ধিত ও পূর্ণতররূপ। সাহিত্যিক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ও শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে এর সূচনা। তাঁরা লেখকের অশেষ ধন্যবাদভাজন।

তথ্যসংগ্রহকার্যে যে সকল পুস্তক, পুরাতন দলিল ও সরকারী মুদ্রিত বিবরণীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং যাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি থেকে সমসাময়িক ইতিহাসের অলিখিত অধ্যায় ও নেপথ্য বৃত্তান্ত গ্রন্থকারের গোচরীভূত করেছেন তাঁদের ঋণও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁদের নামের তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ;—

হোয়ার থ্রি এম্পায়ার্স মিট (ই. এফ. নাইট) ; জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর টেরীটরীস (ফ্রেডারিক ড্রু) ; গোলাব সিং (কে. এম. পান্নিকর) ; রেমীনিসেন্স অব এ বেঙ্গল সিভিলিয়ান (উইলিয়ম এডোয়ার্ডস) ; ডিফেণ্ডিং কাশ্মীর (পাবলিকেশন ডিভিশন) ; কনডেমড্ আনহার্ড (অজ্ঞাত) ; ডেসপাচেস টু দি সেক্রেটারী অব স্টেটস (এইচ. এম. ডুরাণ্ড) ; হিস্টরী অব দি শিখস (কানিংহাম) ; ইউ. এন. কমিশনস রিপোর্ট ; মিশন উইথ মাউণ্টব্যাটেন (এ. ক্যাম্পবেল জনসন) ; হোয়াইট পেপার অন কাশ্মীর (গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া) ; শেখ মহম্মদ আবদুল্লা ; মাননীয় জি. এম. সাদেক ও মিসেস রাজেন্দ্র সিং।

গ্রন্থকার।

Mountbatten says,
as a military operation, the speed
of the fly in on the 27th October
left our SEAC efforts standing.

—Allan Campbell Johnson

ঝিলম নদীর তীর

হিমালয়ের বরফ গলে গলে হয়েছে নদী। পাহাড়ের গা বেয়ে, পাইনের বন পেরিয়ে, আঁকাবাঁকা পথে সে নদী নেমে এসেছে নীচু মাটিতে। মৌরী ক্ষেতের ধার দিয়ে, উইলো ঝাড়ের কাছ দিয়ে চলে গিয়েছে শহরের বুক চিরে। কাঠের ঘর-বাড়িতে ঢাকা দু'পাশের তীর; মধ্যিখানে ধীরে বয়ে যাচ্ছে জলধারা। অন্ধকারে দূর থেকে দেখায় যেন কনে বউ-এর মাথায় দু'পাশের কালো চুলের মাঝখানে একটানা সরু সিঁথিটি।

ছোট্ট নামটি তার; সহজ ও মিষ্টি। ঝিলম। সকালবেলা সোনালী রোদের আভা ঠিকরে পড়ে তার বুকে। সন্ধ্যাবেলা দোলে তারা-ভরা আকাশের ছায়া। ঝিলম ঝিলমিল করে দিন-রাত।

নদীর কোল ঘেঁষেই উঠেছে দুধের মতো ধবধবে শ্বেত পাথরে গড়া মস্ত রাজপুরী। দুয়ারে তার সেপাই। সিঁড়িতে তার সান্ত্রী। দেউড়িতে সঙ্গীন উঁচিয়ে কুচকাওয়াজ করে উর্দিপরা পাহারাওয়ালার দল।

পুরানো আমলে এটাই ছিল রাজাদের খাশমহল। বুড়ো মহারাজা জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন এখানেই। নতুন রাজার চাল-চলন আলাদা। স্ত্রী পুত্র দাস দাসী নিয়ে তিনি উঠে গিয়েছেন দূরে পাহাড়ের গায়ে বিলাতী ধরনে তৈরী নূতন বাড়িতে। সেখানে সেজের বদলে জ্বলে বিজলী বাতি, হাতীশালের বদলে আছে মোটর গ্যারেজ।

সেকেলে রাজবাড়ী একালে হয়েছে সরকারী আপিস। তকমা-আঁটা কর্মচারীরা সেখানে বসে মহারাজার নামে প্রজা শাসন অর্থাৎ প্রজা শোষণ করে। শুধু বছরে দু'দিন রাজ-দরবার বসে মাঝের গোল হল্ ঘরটিতে। তখন চতুর্দোলায় চেপে রাজা আসেন। পুরানো রাজমহলের সাবেকি জাঁকজমক আবার জেগে ওঠে। আগে সাজে লোক, পিছে সাজে লস্কর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

দশহরার দরবার দেশের সবচেয়ে বড় পার্বণ, বছরের সবচেয়ে সেরা সমারোহ।

মুক্তার ঝালর আঁটা জড়োয়া চাঁদোয়ার নীচে কিংখাবে মোড়া গজদন্তের সিংহাসন। তাতে বসেছেন রাজা। মহারাজ শ্রীহরি সিং। কাশ্মীরের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সামনে পায়ের কাছে খোলা তলোয়ার হাতে প্রতিহারী। পিছনে মাথার কাছে ছাতাহাতে ছত্রধর। দু'পাশে চামর দুলিয়ে হাওয়া দিচ্ছে আটজন কিঙ্কর কিংকরী। রুপোর পিলসুজের মাথায় জ্বলছে সোনার প্রদীপ; জয়পুরী পাথরের ধূপদানিতে পুড়ছে কস্তুরী ধূপ। জমকালো পোষাকে পাত্র, মিত্র ও অমাত্যরা বসেছেন প্রথম সারিতে। তার পিছনে গণ্যমান্য লোকদের আসন পড়েছে যার যার মর্যাদা বুঝে। ফুলের শোভায়, জরির সাজে, নানা রঙের আলোর মেলায় ঝলমল করছে সভা-ঘর।

কিন্তু এত ধুমধামের মধ্যেও মহারাজাকে কেমন মনমরা দেখাচ্ছে যেন। তাঁর মুখে কেন নেই হাসি? চোখে কেন নেই খুশি-খুশি ভাব?

সত্যি, মহারাজা হরি সিং-এর মনে একটুও সুখ নেই।

মাস দুই হলো এদেশ থেকে ইংরেজ সরকার চলে গিয়েছে। যাবার বেলায় দেশকে দু'ভাগ করে এক ভাগ দিয়ে গিয়েছে একদল মুসলমানের হাতে। হিন্দুদের সঙ্গে তাদের মহা আড়ি। এক সঙ্গে এক রাজত্বে বাস করতেও তারা রাজী নয়। ভারতবর্ষ থেকে কেটে নেওয়া এই মুসলমানী দেশের নাম হয়েছে, পাকিস্তান।

ইংরেজ আমলের আরও যে-সব দেশীয় রাজা ছিলেন, ইংরেজ যেতে না যেতেই তাঁরা প্রায় সবাই নিজ নিজ রাজ্যের সীমানার মিল দেখে ভাগ হওয়া দেশের এ-দিকে কিম্বা ও-দিকে যোগ দিয়েছে। জয়পুর, গোয়ালিয়র, কুচবিহার ইত্যাদি মিশেছে ভারতবর্ষে। ভাওয়ালপুর ও কালাত মিশেছে পাকিস্তানে। কাশ্মীর এখনও আছে দো'টানায়।

কাশ্মীরের সীমানার যোগ রয়েছে দু'দেশেরই সঙ্গে। পশ্চিমে প্রায় পাঁচশ মাইল ধরে আছে পাকিস্তান। আবার পূর্ব-দক্ষিণে তার সীমানা মিলেছে ভারতবর্ষে। কাশ্মীর কোন্ দেশে যোগ দেবে? মহারাজা মন ঠিক করতে পারেন না। অনেক ভেবে শেষটায় তিনি বললেন, "এখন কোনো দেশেই যোগ দিচ্ছি না। যেমন আছি তেমনি থাকি। পরের ভাবনা পরে হবে।"

মহারাজা যাই ভাবুন, দেখা গেল, পরের আশায় বসে থাকতে অপরেরা রাজী নয়। ভারতবর্ষের নেতারা কিছু বললেন না বটে। ও-দিকে পাকিস্তানের কর্তাদের তো সবুর সয় না। তাঁরা চান কাশ্মীর তক্ষুণি তাদের দখলে আসুক। কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু। ডোগরা রাজপুত। রাজ্যের প্রজারা বেশীর ভাগ মুসলমান। পাকিস্তানের বড় নেতারা মাথা নেড়ে বললেন, "এ অসহ্য।" বাবু যত কন, পারিষদগণ কহে তার শত গুণ। ক্ষুদে নেতারা ঘুষি বাগিয়ে হুংকার দিলেন, "লড়কে লেঙ্গে—"

যেই কথা সেই কাজ। প্রথমে শুরু হলো অভাব অনটনের চাপ দেওয়া। হাতে না মেরে ভাতে মারার ফাঁদ।

কাশ্মীর পাহাড়ী রাজ্য। চাষবাসের দেশ। ক্ষেতে ধান আর বাগানে ফল,—এই হলো সেখানকার মোটামুটি ফসল। অন্য সব জিনিষ তাকে আনতে হয় বাইরে থেকে। লাহোর বা রাওলপিণ্ডির পথে চালান আসত এতকাল। পাকিস্তান বন্ধ করে দিলে তা'। তখন পেট্রোলের অভাবে কাশ্মীরের পথে মোটর বাস অচল হলো, কাগজের অভাবে স্কুল কলেজে লেখাপড়া বন্ধ, চিনির অভাবে ময়রার দোকানে সন্দেশের থালা পড়ে রইল খালি। রাজ্যে রোগী পায় না ওষুধ, শিশু পায় না পথ্য। নেহাত গরীব যে দিনমজুর, একটু নুন না মেলাতে তারও মুখে ভাত রোচে না।

এ তো শুধু আরম্ভ। যেমন ফাঁসীর আগে হাজত, মারের আগে ধমকানি। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে শুরু হলো জবরদস্তি হামলা। রোজই সীমানার ও-পার থেকে পাকিস্তানীরা দল বেঁধে কাশ্মীরের গ্রামে ঢুকে লুঠতরাজ করতে লাগল।

গত চার দিনে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। খবর এসেছে, যুদ্ধের সৈন্যদের মতো হাজার হাজার হানাদার কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করেছে। ভিন্ন ভিন্ন দলে শত্রু রাজ্যের নানা জায়গায় সীমানা পার হয়ে গ্রামের পর গ্রাম দখল করেছে। সব চেয়ে বড় দলটা এগিয়ে আসছে মোটর লরী চেপে ডোমেলের পথে রাজধানী শ্রীনগরের দিকে। সে-দলে আছে হাজারখানেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি, কয়েক শ' পাঠান

আফ্রিদি, আর অগণিত মুসলীম লীগের ভলান্টিয়ার,—নিজেদের তারা বলে, "মুসলীম ন্যাশন্যাল গার্ড।"

দেশীয় রাজ্যগুলি এতকাল আপদে বিপদে নির্ভর করেছে ব্রিটিশ সরকারের উপর। তাদের নিজেদের সৈন্য যা' ছিল, সে শুধু নামকাওয়াস্তে। কাশ্মীরের সৈন্য-সংখ্যা সামান্য। তারও আবার অর্ধেক ছিল মুসলমান। শত্রুরা হানা দিতেই তারা দল ছেড়ে সরে পড়লো। বাধা দেওয়া দূরে থাক, "আল্লাহো আকবর" বলে তারা হানাদারদেরই দলে ভিড়ে গেল। কথায় বলে, যার খায় পরে তারই দাড়ি উপাড়ে। এই নিমকহারামেরাও হানাদারদের রাস্তা দেখিয়ে এগিয়ে আনতে লাগল রাজধানীর দিকে। মহারাজা উতলা হবেন না তো হবে কে?

দশহরার দিনে রাজা দরবারে না বসলেই নয়। একশ' বছর ধরে চলে আসছে এ নিয়ম; মহারাজা গোলাব সিং-এর আমল থেকে। পিতা-পিতামহদের সে নিয়ম তো ভাঙা চলে না। তাই এবারেও সভা ডাকতে হয়েছে।

দরবারে কুল-পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন। ভাট গান বেঁধে রাজার মহিমা শোনাল। মনের উদ্বেগ চেপে রেখে রাজা কাউকে দিলেন সনদ, কাউকে দিলেন শিরোপা। সভাসদেরা একের পর একে রাজার পায়ের কাছে রাখল প্রণামী। কেউ পাঁচ মোহর, কেউ বা দুই,—যার যেমন হার বাঁধা আছে বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে। জমিদার জায়গিরদারেরা কেউ দিল আসমানী রঙের কল্কা পাড় পশমী জমিয়ার, কেউ দিল ঝুড়ি-ভর্তি সুগন্ধ মৃগনাভী, কেউ বা দিল গিলগিটের নামকরা নীল গাই-এর শিং।

হঠাৎ ব্যস্ত-সমস্তভাবে শহর কোটাল এসে ঢুকল দরবারে। চুপি চুপি কী যেন বলল নগরপালকে। নগরপাল আঁতকে উঠে ফিসফিস করলেন তার উপরওয়ালার কানে। উপরওয়ালা অমনি কানে কানে বললেন তাঁরও উপরওয়ালাকে। তিনি গোপনে জানালেন মন্ত্রীকে, মন্ত্রী ভয়ে ভয়ে শোনালেন দেওয়ানকে। দেওয়ান মুখ কালো করে উঠে গিয়ে রাজাকে দিলেন দুঃসংবাদ।

শুনে মহারাজ হরি সিং-এর মুখে কথা সরলো না খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দেওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন বাইরে। এবার আর চতুর্দোলা নয়; শাঁ শাঁ শব্দে মোটর হাঁকিয়ে দিলেন নতুন রাজবাড়ির দিকে।

সভাসদেরা সবাই অবাক। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। ব্যাপার কী? একটু পরেই জানতে পারা গেল, ব্যাপার গুরুতর। মন্দ খবর বাতাসের আগে ছোটে। শোনা গেল, ব্রিগেডিয়র রাজেন্দ্র সিংজী যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। কী সর্বনাশ!

রাজেন্দ্র সিং ছিলেন মহারাজার প্রধান সেনাপতি। যেমন বীর, তেমনি সাহসী। তাঁর উপরেই মহারাজার যা' কিছু ভরসা। কাশ্মীরের হিন্দুসৈন্য তখনও শ' দেড়েক বাকি ছিল। তাদের নিয়ে রাজেন্দ্র সিং এগিয়ে গিয়েছিলেন দুশমনদের রুখতে।

হানাদারেরা তখন শ্রীনগর থেকে পঁয়ষট্টি মাইল দূরে উরি অবধি এসেছে। সেখানে ঐ অল্প ক'টি মাত্র সৈন্য নিয়ে রাজেন্দ্র সিং পাকিস্তানীদের বাধা দিলেন। প্রাণের মায়া ছেড়ে লড়তে লাগলেন তিনি; লড়তে লাগল তাঁর সৈন্যরা। হানাদারেরা সংখ্যায় প্রায় দশ গুণেরও বেশী। অসাধারণ বীরত্বে রাজেন্দ্র সিং তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন উরিতে পুরা দুটি দিন। তারপর নিজ সৈন্যদের সঙ্গে নিজেও মারা পড়লেন যুদ্ধে। দেড়শ' জন দেড় হাজারের বিরুদ্ধে লড়তে পারে কতক্ষণ?

রাজদরবার থেকে মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল, পথে লোক চলে না, ঘরে ঘরে মেয়ে-পুরুষ সবাই ভয়ে জড়সড়। কী জানি কী হবে আজ রাতটুকু পোহালে।

কিন্তু ততক্ষণও সময় পেলো না তারা। রাত তখন দশটার কাছাকাছি। হঠাৎ শহরের সমস্ত আলো নিবে গেল। বিজলী আলোর কারখানাটা মহুরায়। পাহাড়ী ঝরনার জল ধরে জলবিদ্যুৎ তৈরী হয় সেখানে। থামের মাথায় তারের মধ্য দিয়ে সে-বিদ্যুৎ আসে দূর দূরান্তের শহরে। হানাদারেরা মহুরায় পৌঁছে কারখানার যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

মহুরা? সে-তো রাজধানী থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল। চমকে উঠলো সবাই। তবে শ্রীনগরের আর বাকি রইল কত? পিচ-বাঁধানো চওড়া সড়ক গিয়েছে মহুরার গা দিয়ে। সে-পথে মোটর লরী বোঝাই হানাদারদের শ্রীনগরে এসে পেঁছিতে কতক্ষণ লাগবে? তবে আর কিসের ভরসা? সেই রাত্রিতেই শহর থেকে প্রাণের ভয়ে লোক পালাতে শুরু করল। মোটরে, লরীতে, টাঙায়, গরুর গাড়িতে, সাইকেল-এ বা ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটল নানা দিকে। যাদের কিছুই জুটল না, তারাও স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পায়ে হেঁটে রওনা হলো নিরাপদ জায়গার খোঁজে।

রাজবাড়িতে হরি সিং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেওয়ান, এখন উপায়?"

দেওয়ান হাত জোড় করে বললেন, "মহারাজ, উপায় একমাত্র ভারত সরকার। তাঁদের সাহায্য চান।"

এক বছর আগে পন্ডিত নেহরুকে রাজ্যে ঢুকতে দেননি, কয়েদ করেছিলেন; সে কথা রাজার মনে ছিল। সেই নেহরু এখন ভারত সরকারের কর্তা। রাজা চিন্তিত মুখে বললেন, "তাঁরা কি সাড়া দেবেন?"

দেওয়ান উত্তর করলেন, "হুজুর, আর্তকে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম; তা' যদি না করেন তবে তাঁরা কেমন মহৎ? অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া ন্যায়ের বিধান; তা' যদি না মানেন, তবে তাঁরা কিসের শাসক? আপনি আবেদন করুন, আর দেরিতে সর্বনাশ হবে।"

তখন সেই অন্ধকার রাজপুরীর খাসকামরায় লন্ঠনের আলোতে বসে কাশ্মীরের শেষ মহারাজা হরি সিং নিজ হাতে পত্র রচনা করলেন। করুণ প্রার্থনা জানালেন ভারতের নতুন সরকারের কাছে। লিখলেন,—"এক্ষুণি সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে কাশ্মীরকে রক্ষা করুন। দোহাই, তার চল্লিশ লক্ষ লোককে বাঁচান।"

সে-দিন তারিখটা ছিল ২৫শে অক্টোবর, ইংরেজী ১৯৪৭ সাল।

দুই

নয়াদিল্লীতে মহারাজার তার পেয়ে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ভাবেন, কী করা যায়?

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সহকারী প্রধান মন্ত্রী। তিনি এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা

বললেন, তাড়াতাড়ি সৈন্য পাঠাতে হবে কাশ্মীরে ; হানাদারদের ঠেকাতে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখন বড়লাট। তাঁর খুবই আপত্তি। তবে তিনি এখন নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর জেনারেল, নিজের মত খাটাতে পারেন না, শুধু উপদেশ দিতে পারেন। বললেন, "পাকিস্থানও যদি সরাসরি সৈন্য পাঠায় হানাদারদের পক্ষে, তবে ?"

ডাকা হলো সেনাপতি ও সৈন্যদলের কর্তাদের। তাঁরা সবাই ইংরেজ। এসে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো বিপদের কথা।

মন্ত্রীসভা জোর দিয়ে বললেন, বিপদের ভয়ে মহারাজকে সাহায্য না দেওয়া কাপুরুষতা। পাকিস্থানীরা জোর করে দখল করবে কাশ্মীর, এ কখনই হতে দেওয়া যায় না।

সে-কথা ঠিক। কিন্তু কাশ্মীর তো ভারতবর্ষে তখনও যোগ দেয়নি। আইন মানতে গেলে কাশ্মীরকে রক্ষা করা তো ভারত সরকারের দায় নয়।

মহারাজা হরি সিং সে-কথা জানতে পেরে পর দিনই দলিল সই করে পুরোপুরি ভারতবর্ষে যোগ দিলেন।

তখন ভারত সরকার তাঁদের সেনাপতিকে হুকুম দিলেন কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে।

দিল্লী থেকে কাশ্মীরে যাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা। অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদী-নালা পার হয়ে, বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সে-পথ। প্রায় তিনশ' মাইল। তারও এখানে ভাঙা, ওখানে মেরামতি। কোথাও এত খাড়া উঁচু যে, গাড়ি চলা দায়, কোথাও বা এত ভীষণ সরু যে, পাশাপাশি হাঁটা কঠিন। সে-পথ ধরে গেলে নুন আনতেই পান্তা ফুরোবে। ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে পৌঁছবার আগেই হানাদারেরা তা' পুরোপুরি দখল করে নেবে। তাই আকাশ পথে বিমানে সৈন্য পাঠানো ছাড়া অন্য গতি নেই।

দিল্লীর ছাউনিতে তখন যথেষ্ট সৈন্য নেই। বারো মাইল দূরে গুরগাঁয়ে শিখ রেজিমেন্টের এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য ছিল। হুকুম পেয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাদের কিছু এসে পেঁছিল পালমের বিমানঘাঁটিতে। তাড়াতাড়ি কোনো মতে সেখানে গোলা বারুদ পোষাক পরিচ্ছদ দেওয়া হলো তাদের। সাতাশে অক্টোবর ভোরবেলা প্রভাতী তারাটি যখন সবে অস্ত গিয়েছে, দূরে খোলা মাঠের শেষে পুবের আকাশে দেখা দিয়েছে একটুখানি আবছা আলোর আভা, তখন বিমানবহরের তিন তিনখানা ডাকোটা বিমানের পাখা এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল। শিখ সৈন্যদের নিয়ে নিমেষে আকাশ-পথে রওনা হলো শ্রীনগরের দিকে। স্বাধীন ভারতের সৈন্যদের এই প্রথম যুদ্ধযাত্রা।

সৈন্য তো রওনা হয়ে গেল। কিন্তু তারা শ্রীনগরে নামতে পারবে তো ? সেখানকার বিমানঘাঁটিটি এরই মধ্যে হানাদারেরা দখল করে বসেনি তো ? দিল্লীর সদর দপ্তরে সবার মনেই সেই ভাবনা। বেতার টেলিফোনের ঘরে যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছে লোক। হেডফোন কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করছে খবর দেয়া-নেয়ার কর্মচারীরা। আধঘন্টা পর পর বড়কর্তারা খোঁজ নিচ্ছেন, খবর এসেছে কি ? না, আসেনি।

ন'টা বেজে গেল। তখনও খবর এল না। সাড়ে ন'টা বাজলো। বাজলো দশটা। কোনো খবর নেই। দশটা পনের,—কুড়ি,—পঁচিশ ঘড়ির কাঁটাটা এগিয়ে যাচ্ছে মিনিটে মিনিটে। মিনিট তো নয়, মনে হয় যেন এক একটা যুগ। কারো

মুখে কথা নেই, ঘরে নেই শব্দটি। একটা পিন পড়লেও বুঝি আওয়াজ শোনা যাবে। উদ্বেগে সবার যেন দম আটকে আসছে। এত দেরি হচ্ছে কেন? তবে—কি—? সাড়ে দশটা, দশটা একত্রিশ,—হঠাৎ বেতার যন্ত্রের বোর্ডে আলো জ্বলে উঠলো।

"হ্যালো, হ্যালো দিল্লী, হ্যালো,—দিস ইজ শ্রীনগর কলিং, হ্যালো—।" খবর এসেছে। ডাকোটা তিনটি নিরাপদে বিমানঘাঁটিতে নেমেছে। প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী পোঁচেছে কাশ্মীরে! হুররে!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দপ্তরের উপরওয়ালারা বললেন, "থ্যাঙ্ক গড। ভগবানের দয়া।"

তিন

যে শিখ সৈন্যরা আকাশ-পথে শ্রীনগরে পোঁছল তাদের নেতা ছিলেন লেফটেনেন্ট কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রায়। নামের শেষটা বাঙালীর মতো। তাই না? আসলে তিনি পাঞ্জাবী। লম্বায় প্রায় ছ' ফুট, ছত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, হাতের কব্জি দুটি লোহার বাঁটের মতো শক্ত এবং চওড়া। দেখে মনে হয়,—হ্যাঁ, লড়াই করার যোগ্য একখানা চেহারা বটে!

কথা ছিল, তিনি তাঁর ঐ অল্প ক'জন সৈন্য নিয়ে বিমানঘাঁটিটা শুধু আগলে থাকবেন। যথেষ্ট সৈন্য আর গোলা বারুদ না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ নয়।

বিমানঘাঁটিতে কাশ্মীরের অবস্থা শুনে এবং দেখে কর্নেল রায়-এর তো চক্ষুস্থির। শত্রু রাজধানী শ্রীনগরের কাছে বারমুলা শহর দখল করেছে। আর খানিকটা এগিয়ে এলেই পাহাড়ী এলাকা পার হয়ে গ্রামে, মাঠে ছড়িয়ে পড়ে চারদিক থেকে শ্রীনগরকে ঘিরে ফেলতে পারবে!

তাই তো। এখন করা কি? হানাদারেরা সংখ্যায় কত, কোন্ পথে আসছে, কী তাদের সাজ-সরঞ্জাম, সমস্তই অজানা। না জেনে-শুনে শ'খানেক সৈন্য নিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়তে যাওয়ার বিপদ অনেকখানি। অথচ আরও সৈন্য আর অস্ত্র-শস্ত্র এসে পোঁছনোর অপেক্ষায় থাকলে শ্রীনগরের আশা শেষ। কঠিন সমস্যায় পড়লেন কর্নেল রায়।

বসে ধীরে-সুস্থে ভাববারই বা সময় কোথায়? এক মিনিট দেরি মানে হয় তো শত্রুকে এক গজ এগোতে দেওয়া। চটপট ঠিক করে ফেললেন কর্নেল রায়। দিল্লীর হুকুম যাই থাক, এই মুহূর্তে হানাদারদের ঠেকাতে না গেলে সবই হবে খতম। তিনি সৈন্যদের নিয়ে তৈরী হলেন।

আর এক সমস্যা দেখা দিল। সৈন্যরা যাবে কী করে? সঙ্গে না আছে মিলিটারী লরী, না আছে জীপ, না আছে অন্য কোনো রকমের গাড়ি বা ঘোড়া। শ্রীনগরের রাস্তায় যে মোটর বাসগুলি যাত্রী বা মাল বইতো, খুঁজে পেতে তারই কয়েকটা যোগাড় হলো কোনো মতে। তাই নিয়ে কর্নেল রায় আর তাঁর সৈন্যরা রওনা হলেন।

বারমুলার মাইল দুই পুবে আছে একটা ছোট পাহাড়। তার একপাশ দিয়ে

চলে গিয়েছে শ্রীনগরের পাকা সড়ক। দু'শ' গজ দূরে বইছে ঝিলম নদী। সেই পাহাড়ের চূড়ায় ঘাঁটি করলেন কর্নেল রায়। হানাদারেরা ঐ সড়কে এগিয়ে আসতেই হুকুম দিলেন—"ফায়ার"।

শিখদের বন্দুকগুলি একসঙ্গে গর্জে উঠলো—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম!

উরি থেকে এই অবধি হানাদারেরা বিনা বাধায় এগিয়ে আসছিল। আচমকা গুলী খেয়ে প্রথমে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। যারা সামনে ছিল তারা ঝড়ে উপড়েফেলা কলাগাছের মতো ধপাস করে পড়ে পড়ে মরতে লাগল রাস্তার দু'পাশে। পিছনের লোকগুলি দিশেহারা হয়ে এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল।

শেষে কিছুটা সামলে নিয়ে হানাদারেরাও পাল্টা আক্রমণ করল।

একটু পরেই কর্নেল রায় বুঝলেন, যা' শোনা গিয়েছে তা' সত্যি নয়। দিল্লীতে অনেকে ভেবেছে, হানাদার মানে হলো একদল গুণ্ডা। দা, কাটারি, বর্শা, বল্লম, বোমা, পটকা ও গাদা বন্দুক নিয়ে লুঠতরাজ করতে এসেছে বুঝি। মোটেই তা' নয়। এরা আজকালকার লড়াই-এর ফিকিরফন্দি সব জানে। ইউনিট, সাব-ইউনিট অর্থাৎ আলাদা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ চালাবার কায়দা কৌশল শিখেছে এরা। ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল—এমনি সব শিক্ষিত কমাণ্ডার হচ্ছে দলের সর্দার। ব্রেনগান, স্টেনগান, হাল্কা ও মাঝারি মেশিনগান, হ্যাণ্ড গ্রেনেড, ট্যাংকমারা রাইফেল —আরও সব বিলাতী হাতিয়ার আছে তাদের হাতে। লাল পাগড়ি বা সঙ্গিন উঁচনো দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যাবে, এ-সব দৈত্য নয় তেমন।

শিখ সৈন্যরা সংখ্যায় হানাদারদের কাছে নগণ্য। তবে পাহাড়ের মাথায় ঘাঁটি করার মস্ত একটা সুবিধা আছে। আড়ালে লুকিয়ে গুলী ছোঁড়া যায়। সেই সুযোগ নিয়ে তারা বিপক্ষ দলকে ঘায়েল করতে লাগল।

অবিরাম যুদ্ধ চলল কয়েক ঘণ্টা। সূর্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কর্নেল রায় লক্ষ্য করলেন পাহাড়ের অন্যদিক দিয়ে হানাদারদের একটা দল গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। সর্বনাশ! শত্রু দু'দিক দিয়ে ঘিরে ফেললে শিখ সৈন্য যে একটিও জ্যান্ত রইবে না। তিনি বুঝলেন, তক্ষুণি সৈন্যদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে না পারলে রক্ষা নেই। হুকুম দিলেন তাদের পিছু হটতে।

বড় হাবিলদার পায়ে পায়ে ঠোক্কর দিয়ে ডান হাতে স্যালুট করে জিজ্ঞাসা করল, "হুজুর, আপ্? আপনি?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, গুলী চালিয়ে দুশমনদের কেউ আটকে না রাখলে তারা পিছু নেবে। তাই সব শেষে যাবেন তিনি। নিজের সৈন্যদলের শেষ লোকটিও নিরাপদে পার না হওয়া পর্যন্ত অধিনায়ককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নড়তে নেই। এই হলো তাঁর মত। তিনি নিজ হাতে মেশিনগানের ঘোড়া টিপতে লাগলেন খট্ খট্ খট্ খট্ খট্...।

শিখ সৈন্যরা ধীরে ধীরে পিছনে সরতে লাগল। হানাদারেরা অবশ্য চুপ করে বসে নেই। তাদের বন্দুক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী এসে পড়তে লাগল কর্নেল রায় আর তাঁর সেনাদলের চার পাশে। কিছু শিখ পড়ল মারা, কয়েকজন হলো জখম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাকি সৈন্য হানাদারদের এড়িয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছল।

সবার শেষে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল রায়। সেই মুহূর্তে অন্ধকার থেকে একটা

গুলী এসে লাগল তাঁর কপালে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। বীর রণজিৎ রায় বীরের মতোই যুদ্ধ করতে করতে মারা গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

বছর তের আগে দেরাদুনের মিলিটারী কলেজ থেকে পাশ করে সেকেন্ড লেফটেনেণ্ট হয়ে রণজিৎ রায় ঢুকেছিলেন সেনাদলে। গত মহাযুদ্ধের সময় বর্মার জঙ্গলে জাপানীদের সঙ্গে লড়ে খুব নাম করেছিলেন। তাড়াতাড়ি প্রমোশন পেয়েছেন। উন্নতির ধাপে ধাপে হয়েছেন লেফটেনেণ্ট থেকে ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর, মেজর থেকে লেফটেনেণ্ট কর্নেল। আরও ওপরে উঠবার আগেই মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে জীবন শেষ হলো তাঁর। সব পাপড়িগুলি মেলার আগেই যেন শুকিয়ে গেল ফুলটি। পাক ধরার আগেই যেন বোঁটা থেকে খসে পড়ল গাছের কাঁচ ফল।

সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার আলো-ছায়া ঘেরা এই মর্তভুমি থেকে অকালে বিদায় নিলেন কর্নেল রায়। কিন্তু বাঁচিয়ে গেলেন শ্রীনগরকে। রক্ষা করলেন কাশ্মীর রাজ্যকে। নিরাপদ করলেন লক্ষ লক্ষ নরনারীকে। শিখ সৈন্যদের আক্রমণে হানাদারেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। সে-দিন আর এগিয়ে আসার সাধ্য ছিল না তাদের।

মরেও অমর হয়ে রইলেন কর্নেল রায় আর তাঁর সঙ্গীরা। বারমুলার পথে আজ যারা যাতায়াত করে তাদের চোখে পড়ে রাস্তার ধারে ছোট পাহাড়টির গায়ের কাছে একটি স্মৃতিফলক। একটি কাঠের বোর্ড। তাতে ইংরেজীতে লেখা—

"ভারতের সেই সব বীর শিখ সৈন্যদের কথা চিরকাল মনে থাকবে, যারা কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষায় ১৯৪৭ সালের ২৭শে অক্টোবর প্রথম এইখানে হানাদারদের রুখতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।"

কাশ্মীরে আরও আছে একটি ছোট্ট স্মৃতিস্তম্ভ। পাথরের মনুমেণ্ট। তার চারদিক কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ইংরেজীতে কী লেখা আছে তা' না পড়লেও চলে। কারণ লেখাপড়া শেখেনি এমন যে অজ পাড়াগাঁয়ের চাষী সে-ও জানে, এই স্মৃতিস্তম্ভটি কার জন্যে। মাথা নীচু করে হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, "কর্নীল রায় বাবর থে। ওয়ে ওহি থে জিন্‌হোনে হামকো বচায়া।"

চার

করাচী প্রাসাদ কূটে, হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে টুটে।

আসলে কিন্তু করাচী নয়,—য়্যাবটাবাদ এবং তন্দ্রা নয়,—স্বপ্ন। পাকিস্তানের শাহেনশা জনাব জিন্নার বহুকালের স্বপ্ন। স্বপ্নরাজ্য কাশ্মীর। এতদিনে আসছে বুঝি তাঁর অধীনে। 'বুঝি' আর কেন?—একেবারে নিশ্চিত। হাতের মুঠিতে বললেই হয়। হাজার হাজার হানাদারদের দেওয়া হয়েছে হরেকরকম হাতিয়ার। দেওয়া হয়েছে অসংখ্য মোটর লরী, ট্রাক ও গ্যালন গ্যালন পেট্রোল। তারা এরই মধ্যে পেঁছে গিয়েছে পাটানে। সেখান থেকে এগিয়ে যাবে শ্রীনগর। যেন রিষড়া থেকে কোন্নগর, বেহালা থেকে ডালহৌসী স্কোয়ার।

নয়া বাদশাহ তাই চলে এসেছেন করাচী থেকে য়্যাবটাবাদ। এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছেন মাঝ পথে। সামনেই ইসলামের সব চেয়ে বড় পরব। রমজানের রোজার শেষে ঈদ। সেই পুণ্য দিনে হজরত মহম্মদের নাম স্মরণ করে বিজয়গর্বে শ্রীনগরে প্রবেশ করবেন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ইসলাম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জনক কায়েদ-এ-আজম মহম্মদ আলী জিন্না। হজরতবাল মসজিদের জমায়েতে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে পড়বেন নামাজ।

কিন্তু হঠাৎ এ কী খবর! হানাদারদের এগোবার পথে পড়েছে কাঁটা? শ্রীনগরের কাছে তাদের বাধা দিয়েছে ভারতীয় সৈন্যদল? এ যে ঘাটের কাছে নৌকাডুবি, ল্যান্ডিং-এর মুখে এয়ার ক্র্যাশ! বিশ্বাস হতে চায় না যেন।

দুর্গম পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে কোনোখান থেকে কোনো সাহায্য এসে পৌঁছবার আগেই মহারাজের সিপাই বরকন্দাজ হবে নিকাশ, লোক লস্কর হবে নিশ্চিহ্ন, অনায়াসে পাকিস্তানী নিশান উড়বে শ্রীনগরের সরকারী দপ্তরখানার চূড়াতে—এই ছিল পাকিস্তানের ধারণা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আকাশপথে ভারতীয় ফৌজ এসে নামবে কাশ্মীরে, রুখবে হানাদারদের—এমন সম্ভাবনা ছিল পাকিস্তানী কর্তাদের গোণাগুণতির বাইরে।

এত বড় আশাভঙ্গ জিন্নার জীবনে এর আগে আর ঘটেনি। তাঁর ক্রোধের আর সীমা পরিসীমা রইল না। পাঞ্জাব-গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারীকে ডেকে বললেন— প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্র্যাসীকে টেলিফোন করো এই মুহূর্তে। আমার হুকুম। এই দণ্ডে পাকিস্তানের সমস্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করুক কাশ্মীরে।"

শুনে সেনাপতির চক্ষুস্থির। এ কী অদ্ভুত আদেশ! ব্রিটিশ আমলের ইংরেজ কর্মচারীরা প্রায় সবাই ভারতবর্ষের শত্রু। ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়েছে ভারতীয় কংগ্রেস। সেই কংগ্রেস যাতে ধ্বংস হয় তাতেই তাঁদের আনন্দ। কিন্তু আর যাই হোক, তাঁদেরও কাণ্ডজ্ঞান আছে। তাঁরা জানেন, পিছনে থেকে অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও বুদ্ধি-ব্যবস্থা দিয়ে হানাদারদের সাহায্য করা এক, প্রকাশ্যে যুদ্ধে নামা আর। বেগতিক দেখে গ্র্যাসী সবিনয়ে বললেন,—

"ইওর এক্সেলেন্সী, আমি তো অকিনলেকের অধীন। তাঁর মারফতে আদেশ না পেলে করি কী?"

কথাটা ঠিক। দেশ বিভাগের সময় দু'পক্ষের সম্মতি নিয়ে দু' দেশেরই সামরিক সর্বাধিনায়ক হয়েছেন অকিনলেক। ভারত ও পাকিস্তানের দুই পৃথক কামান্ডার-ইন-চীফ লেফটেনেন্ট জেনারেল সার রব লকহার্ট ও ডগলাস গ্র্যাসী। তাঁদের উপরে এক যুক্ত সুপ্রীম কমান্ডার,—ফিল্ড মার্শাল সার ক্লড অকিনলেক।

খবর পেয়ে অকিনলেক তাড়াতাড়ি বিমানযোগে গেলেন লাহোরে। জিন্নাকে বললেন, কাশ্মীরে পাকিস্তানের সৈন্য পাঠানো মানেই, ভারতবর্ষের সঙ্গে যুদ্ধ। তাতে সর্বনাশ।

জিন্নার যুক্তি,—হিন্দুস্থানের ফৌজ এসেছে কাশ্মীরে হিন্দু মহারাজার পক্ষে। কাজেই পাকিস্তানের সৈন্য যাবে সেখানকার মুসলমানদের সাহায্যে।

অকিনলেক বললেন, "কাশ্মীর দলিল সহি করে যোগ দিয়েছে ভারতবর্ষে। সুতরাং কাশ্মীর এখন ভারতবর্ষেরই অংশ, তাকে রক্ষা করা ভারত সরকারেরই দায়িত্ব। সেখানে

ভারতীয় সৈন্য লড়তে যাওয়া সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত।"

"দলিল? সে তো মিথ্যে বাহানা। স্রেফ জোচ্চুরি। কাশ্মীরের ভারতে যোগ দেওয়া একটা সাজানো কারসাজি।" গর্জে উঠলেন জিন্না সাহেব।

অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে শেষকালে অকিনলেক ঠান্ডা করলেন জিন্নাকে। কাশ্মীরে পাকিস্তানী সৈন্য পাঠাবার হুকুম রদ করলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। অকিনলেকেরই পরামর্শে চিঠি লিখলেন মাউন্টব্যাটেনকে। তিনি ও নেহরু আসুন লাহোরে। তাঁরা তিনজনে আলাপ আলোচনা করে একটা মীমাংসা করবেন কাশ্মীর সমস্যার।

নরম চিঠি পাঠালেন দিল্লীতে। খবরের কাগজে দিলেন এক গরম বিবৃতি। 'ভারতভুক্তি'র ধাপ্পা দিয়ে ভারত সরকার কাশ্মীর দখল করেছে। পাকিস্তান তা' কোনো দিন মেনে নেবে না। হিন্দুস্থানী বন্দুকের জোরে সেখানকার মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা চলবে না, চলবে না।

দিল্লীতে মন্ত্রীসভার সদস্যরা শক্ত হলেন। চিঠি পেয়ে বললেন, "সমস্যা? কিসের সমস্যা? কাশ্মীরে হামলা? যারা হানাদারদের পাঠিয়েছে তারা তাদের ফিরিয়ে নিলেই তা' মিটে যায়। তার জন্যে আলাপের দরকার কি? আলোচনারই বা অবকাশ কোনখানে?"

মাউন্টব্যাটেন অবশ্য আপোষের জন্যে ব্যগ্র। যে-ভাবেই হোক। তিনি চান, জিন্নার নিমন্ত্রণ রাখতে।

মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে বললেন, "হ্যাঁ, নিমন্ত্রণই বটে। ধরনটা যে বড়ই চেনা চেনা ঠেকছে! নেহরুর অবশ্য ছাতা নেই, জিন্নারও নেই আধটুকরো গোঁফ, তবুও মিউনিক পর্বের সঙ্গে ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে না কি? গদেসবার্গ আর লাহোর,—এ-দু'-এর তফাত তো শুধু নামে।"

এ-কথার জবাব দেওয়া কঠিন।

অবশেষে অনেক যুক্তিতর্কের পর ঠিক হলো নেহরু নয়, একা মাউন্টব্যাটেন যাবেন লাহোরে।

পাঞ্জাবের লাটপ্রাসাদে দুই গভর্নর জেনারেলের সাক্ষাৎ।

নমস্কার ও কুশল বিনিময়ের পরে জিন্না বললেন, "ভারত সরকার যে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে যাচ্ছে পাকিস্তানকে তা' সময় মতো জানানোই হয়নি।"

মাউন্টব্যাটেন বললেন, "সে কী কথা? মন্ত্রীদের যে-সভায় বিমানে সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়, সে-সভা থেকে বেরিয়ে নেহরু প্রথমেই যা' করেছেন, তা' হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলীকে টেলিগ্রাম।"

জিন্না তখন অন্য কথা পাড়লেন। সোজা প্রশ্ন করলেন, "পররাজ্যে ভারত সরকার সৈন্য পাঠায় কোন্ সাহসে?"

মাউন্টব্যাটেন জবাব দিলেন, "ইনস্ট্রুমেণ্টস অব য়্যাকসেসান, 'ভারতভুক্তি'র অধিকারে।"

জিন্না গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভারতভুক্তি সে তো নিছক ছল।"

মাউন্টব্যাটেন বললেন, "না, পুরোপুরি সত্য।"

জিন্না ব্যঙ্গ করে বললেন, "ওঃ, কাশ্মীরের পঁচিশ লক্ষ মুসলমান দরখাস্ত করেছে

বুঝি ভারত সরকারের কাছে ?"

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, "আইনে তার দরকার হয় না। মহারাজ স্বয়ং দস্তখত করেছেন দলিলে।"

জিন্না বললেন, "মহারাজা ? তিনি সহি করার কে ? কোন্ দেশীয় রাজ্য ভারতবর্ষে আর কোন্ রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দেবে তা' ঠিক করার একমাত্র মালিক হলো সেখানকার জনগণ।"

মাউণ্টব্যাটেন নীরবে একটু শুধু মুচকি হাসলেন। মনে মনে বোধহয় বললেন, সে কী কথা, মিস্টার জিন্না, এই কিছুদিন আগে জুনাগড়ের বেলায় আপনারাই তো বলেছিলেন যে, যোগদানের ব্যাপারে নবাবের ইচ্ছাই হলো আইনত শেষ কথা।

জিন্নাও বোধহয় বুঝলেন মাউণ্টব্যাটেনের হাসির অর্থ। কড়া সুরে বললেন, "কাশ্মীরের 'ভারতভুক্তি' আমরা কোনো কালেই মানবো না। তার পিছনে আছে বল প্রয়োগ, গায়ের জোর।"

মাউণ্টব্যাটেন শান্তভাবে বললেন, "খুব খাঁটি কথা। সে-বল প্রয়োগ করেছে হানাদারেরা। গায়ের জোর খাটিয়েছে আক্রমণকারীরা। তার দায়িত্ব পাকিস্তানের।"

ঘুরে ফিরে ঐ একই উক্তি ও একই যুক্তি। একই অভিযোগ এবং একই উত্তর।

এমনি করে কেবল কথা কাটাকাটি চললো দুই গভর্নর জেনারেলের মধ্যে।

অবশেষে জিন্না বললেন, "আচ্ছা, আসুন একটা মিটমাট করা যাক। দু'পক্ষই অবিলম্বে একই সঙ্গে কাশ্মীর থেকে চলে আসুক।"

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, "ভারতবর্ষ তাদের সৈন্য ফিরিয়ে আনবে কাশ্মীর থেকে, সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু হানাদারদের ফেরাবে কে ?"

জিন্না বললেন, "আপনি ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনলেই, হানাদারদের হামলা থামাবার ব্যবস্থা আমি করবো।"

বটে! তবে যে এতদিন পাকিস্তান বলে আসছে,—কাশ্মীর আক্রমণ সীমান্তের উপজাতীয়দের কাজ। হানাদারদের উপরে পাকিস্তানের কোনো হাত নেই! সেটা তা' হলে শুধু বাইরে প্রচারের জন্যে। ভিতরে আসল কথাটা স্বীকার করতে তেমন আপত্তি নেই!

আলোচনা শেষ হলো। তর্কের শেষ হলো না। মীমাংসা হলো না সমস্যার। দুই নবগঠিত রাষ্ট্রের বিরোধ রইল অবিদূরিত।

মাউণ্টব্যাটেন ও জিন্না একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আন্তরিক হৃদ্যতায় নয়, মৌখিক ভদ্রতায়।

পাঁচ

এবার কাশ্মীর যুদ্ধের সেনাপতি হয়ে এলেন একজন বাঙালী। ব্রিগেডিয়র এল. পি. সেন। লাবণ্যপ্রসাদ বা ললিতপ্রসন্ন নয় কিন্তু। লাওনেল প্রতীপ সেন। নামটা পুরোপুরি স্বদেশী নয়, তার কারণ লাওনেল প্রতীপের জন্মও স্বদেশে নয়। তাঁর

বাবা ছিলেন ব্রহ্মদেশের এক নামকরা ব্যারিস্টর। লাওনেল জন্মেছেন রেঙ্গুনে। পড়াশুনা করেছেন সেখানকার সাহেবী কনভেন্টে। বিলাতের স্যান্ডহার্স্ট থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখে ভারতীয় সেনাবিভাগে অফিসার হয়েছেন গত মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে।

ডিস্টিংগুইসড সার্ভিস অর্ডার সেনাদলের খুব উঁচু খেতাব। খুব বীরত্ব না দেখালে মেলে না। গত যুদ্ধে ব্রিগেডিয়র সেন ছিলেন দশ নম্বর বালুচ রেজিমেন্টের সেনানায়ক। বর্মায় কংগ-এর জঙ্গলে জাপানীদের নির্মূল করে তিনি সেই সেরা খেতাব পেয়েছিলেন।

শ্রীনগরে এসে ব্রিগেডিয়র সেন দেখেন, শত্রু চায় রাজধানীকে দু'দিক দিয়ে ঘিরে ফেলতে। একদল হানা দিচ্ছে সমুখ থেকে। আসছে বারমুলা হয়ে পিচ-বাঁধানো পথে। মোটর লরীর মাথায় চাঁদ-তারা মার্কা সবুজ ঝাণ্ডা উড়িয়ে। আর একদল আক্রমণ করছে বাঁ পাশ থেকে। তারা আসছে গুটি গুটি পায়ে হেঁটে গাঁয়ের পথ বেয়ে। দুটো জোরালো জঙ্গীদল। যেন সাঁড়াশির মুখে দু'পাটি ধারালো দাঁত। দু'পাশ থেকে শহরটাকে চেপে ধরবে শক্ত কামড়ে। চিবিয়ে গিলে ফেলবে ধীরে ধীরে।

ব্রিগেডিয়র সেন বুঝলেন, প্রথমে চাই দিন কয়েকের সময়। আপাতত চাই হানাদারদের কিছু দিন ঠেকিয়ে রাখা। তাড়িয়ে দেওয়ার কথা হবে পরে।

সবার আগে হলো শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিটি। শহরের মাইল আটেক বাইরে এই বিমানঘাঁটিটিই এখন কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের একমাত্র যোগাযোগ। ঘরের যেমন দোর, নদীর যেমন ঘাট। হাত ছাড়া হলে যাওয়া-আসারই পথ রইবে না আর।

আকাশ-পথে গাড়োয়ালী সৈন্যদের এক রেজিমেণ্ট এসে পেঁছেছিল শ্রীনগরে। তাদেরই একদলকে মোতায়েন করলেন ব্রিগেডিয়র সেন বিমানঘাঁটির পাহারায়। বন্দুক কাঁধে নিয়ে তারা টহল দিতে লাগলো সর্বক্ষণ। পাশ না দেখালে ঢুকতে দেয় না জনপ্রাণীকে। কেউ কাছে ঘেঁষেছে কি অমনি বাজখাঁই আওয়াজে হাঁক দিয়ে শুধোয়, —হু-কুম-দার্—? শুনে পিলে চমকে ওঠে সবার।

দিন কাটে তো, রাত কাটে না। ভোর হওয়ার আগেই হানাদারদের আনাগোনা শুরু হয় বাদগামে। গ্রামটা বিমানঘাঁটি থেকে আধ মাইল দূরে। চেঁচালে গলা শোনা যায়। আগুন জ্বালালে ধোঁয়া দেখা যায়। এত কাছে।

যুদ্ধ বেধে গেল। একেবারে হাতাহাতি লড়াই। একদিকে পাকিস্তানী হানাদার, অন্যদিকে গাড়োয়ালী সৈন্য। কণ্ঠ আকড়ি' ধরিল পাকড়ি' দুই জনা দুই জনে।

শত্রুদলে প্রায় সাতশ'। তারা হ্যাণ্ড গ্রেনেড আর ব্রেনগান নিয়ে আক্রমণ করছে। গাড়োয়ালীরা সংখ্যায় তার অর্ধেক। তারা চালাচ্ছে রাইফেল। চার ঘণ্টা ধরে চলল তুমুল হানাহানি। গোলার ধোঁয়ায় আকাশ হলো কালি, গুলীর শব্দে কানে লাগলো তালা। নিহত আর আহতদের রক্ত ঝরে' জমীন হলো রাঙা।

হানাদারেরা মরীয়া হয়ে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো জোরে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো গাড়োয়ালীদের উপরে। তীরে ঘা-খাওয়া ঢেউ-এর মতোই বারবার ফিরে যেতে হলো তাদের। গাড়োয়ালীদের একচুল হটাতে পারল না তাদের জায়গা থেকে।

খবর পেয়ে ব্রিগেডিয়র সেন শ্রীনগর থেকে তাড়াতাড়ি আরও সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র

পাঠিয়ে দিলেন। ততক্ষণে হানাদারেরা হাঁপিয়ে উঠেছে। নতুন সৈন্যের মহড়া নেওয়ার সাধ্য নেই। নিমেষের মধ্যে শ' দুই হানাদার গেল মারা। বেগতিক দেখে তারা পালিয়ে যেতে লাগল। বিমানঘাঁটিটির আর কোনো আশঙ্কা রইল না।

বাদগামের জয়লাভ গাড়োয়ালীদের এক মস্ত বড় কীর্তি। কিন্তু এই যুদ্ধে তাদের সেনানায়ক মেজর সোমনাথ শর্মা নিহত হলেন। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নিজ সৈন্যদের তিনি পরিচালনা করছিলেন। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ অনেকখানি মলিন হয়ে গেল তাঁর শোকে।

শোকে কাতর হয়ে বসে থাকার উপায় থাকে না সেনাপতিদের। রোগীর মৃত্যুতে উতলা হলে ডাক্তার চিকিৎসা করবে কখন? ব্রিগেডিয়র সেনও মন দিলেন কাশ্মীরের রক্ষা ব্যবস্থায়। খোলা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে তৈরী হলো সৈন্যদের ব্যারাক, বালির বস্তা সাজিয়ে অস্ত্রাগার। দেবদারু গাছের গুঁড়ি খাড়া করে টেলিফোনের তার খাটানো হলো এ-দপ্তর থেকে ও-দপ্তরে।

সৈন্য। বেশী সৈন্য। আরও বেশী সৈন্য চাই কাশ্মীরে। পাঠাতে হবে আকাশ-পথে। পাঠাতে হবে অবিলম্বে। কিন্তু এত বিমান মিলবে কোথায়? তাই তো! দিল্লীতে যুদ্ধ দপ্তরের বড় কর্তারা ভেবে কূল পান না।

হঠাৎ খেয়াল হলো। অনেকগুলি বেসামরিক বিমান কোম্পানী রয়েছে যে দেশে। তারা কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, গোহাটি প্রভৃতি বড় বড় শহর থেকে আকাশ-পথে যাত্রী আর মাল আনা-নেওয়া করে প্রত্যহ। একুনে তাদের প্রায় শ' খানেক বিমান আছে। বেশীর ভাগই ডাকোটা। সরকারী হুকুমে রাতারাতি সবগুলি বিমান জড়ো করা হলো নয়া দিল্লীতে। পালাম আর সফদারজঙ্গ—এই দু'টি বিমানঘাটি থেকে সেগুলি খেয়া নৌকার মতো ঘণ্টায় ঘণ্টায় সৈন্য আর লড়াই-এর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসা-যাওয়া করতে লাগল শ্রীনগরে।

পাইলট, রেডিও অফিসার, গ্রাউণ্ড এঞ্জিনীয়র, ক্রু, কারুরই বিশ্রাম নেই এতটুকু। ভোর হতে না হতেই শুরু হয় বিমানগুলির আকাশে ওড়ার পালা। সন্ধ্যায় একে একে ফিরে আসে মাটিতে। দিন শেষ হয় বটে, কাজ শেষ হয় না। তক্ষুণি আরম্ভ হয় আবার পরের দিনের উদ্যোগ আয়োজন।

সারারাত কুলীরা মাথায় বয়ে বোঝাই করে মাল, কর্মচারীরা ফর্দ করে জিনিষ-পত্রের। ফিটার মিস্ত্রীরা তেল ন্যাকড়া দিয়ে ঘষা-মাজা করে বিমানের কলকব্জা, ইঞ্জিন প্রপেলর ইত্যাদি। নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না অনেকের। মেলে না দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে নেওয়ার ফুরসত। দিনের পর দিন বিমান কর্মচারীদের এমন হাসিমুখে একটানা কাজ করার ক্ষমতা দেখে সবাই অবাক হয়। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে, "মানুষ তো নয় এরা; এক একটি কল।"

কলের মতোই নিখুঁত নিয়মে চলতে লাগল সরবরাহের কাজ। বিমানপথে শ্রীনগর পৌঁছতে লাগল বাক্স-বন্দী বোমা, বন্দুক, বস্তা-বোঝাই রসদ। দলে দলে আসতে লাগল সৈন্য সামন্তেরা। হেমন্তের শেষে হিমালয়ের কোলে মানস সরোবর থেকে যেমন সমতল ভূমিতে উড়ে আসে সারস, তিতির আর হংস-মিথুনের ঝাঁক।

রোগের মতো উৎসাহটাও ছোঁয়াচে। একজনকে দেখলে আর একজনের বুক উঁচু হয়ে ওঠে। বিমানবাহিনীর লোকেরা যদি এত যোগ্যতা দেখাতে পারে তবে

সাঁজোয়াবাহিনীর লোকেরা পিছনে পড়ে থাকবে নাকি? কখনও নয়। তারা উপরওয়ালাদের কাছে প্রার্থনা জানাল, হুকুম পেলে এক ডিভিসন আরমার্ড কার তক্ষুণি রওনা হতে পারে কাশ্মীরে।

আরমার্ড কারগুলি কামান বসানো মোটর গাড়ি। চারিদিকে মোটা লোহার পাতে ঘেরা; যেমন তাদের কামানের দূর পাল্লা, তেমন তাদের দ্রুতগতি। শত্রু ছত্রভঙ্গ হয় তাদের দাপটে।

কিন্তু যে-পথে সৈন্য চলা দায়, সে-পথে আরমার্ড কার যাবে কেমন করে? ঘন জঙ্গলে আটকে যাবে হয়তো উপরের ছাদ। পাথরে পিছলে যাবে নীচের চাকা। কামানের ভারে গুঁড়িয়ে যাবে নদী নালার উপরে হাল্কা কাঠের যতো সাঁকো।

তখন স্যাপার্স আর মাইনার্স দলের লোকেরা এগিয়ে এসে বলল, তারা থাকবে সাঁজোয়া গাড়ির সামনে। আগের ভাগে গাছ কেটে বন সাফ করবে, পাহাড় কেটে পথ।

"এম. ই. এস."-এর লোকেরা সব এঞ্জিনীয়র। তারাই বা কম যাবে কেন? সেলাম করে জানাল, তার বাঁধবে খাদের ধার, গড়বে নতুন শক্ত পুল। ব্যস।

আর কথা কী? সেই রাত্রে দিল্লী থেকে রওনা হলো তারা।

পাঠানকোটের মাঠ ছাড়িয়ে, পীর পঞ্জলের চূড়া ডিঙিয়ে, বানিহালের সুড়ঙ্গ-পথ ঘর্ঘর শব্দে পেরিয়ে একদিন সকালবেলা শ্রীনগরে এসে পৌঁছল ছোট একটি সাঁজোয়া-বাহিনী। লাইনবন্দী আরমার্ড কার। দেখে শহরের ছেলে বুড়ো সবার বুকে এল বল, মনে জাগলো আশা, মুখে ফুটলো হাসি। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তারা মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি করতে লাগলো। "ভারত মাতা-কী জয়!" "জয়, পণ্ডিতজী-কী!"

ছয়

অক্টোবর মাসের বাকি দিন ক'টা শেষ হয়ে গেল। এল নভেম্বর। শীতের আমেজ দেখা দিল কাশ্মীরে। হরি পর্বতের গায়ে লাগল কুয়াশার প্রলেপ। নাশিমবাগে চেনারের পাতা হলো পীতাভ। পথের ধারে ফল-ঝরা আখরোটের শাখাগুলি শূন্য। ডাল্ হ্রদের জলে পানকৌড়িদের ডুব-সাঁতারের খেলাও হয়েছে সাঙ্গ। তীরে ডানা মেলে বসে কুঁড়ে বাদশা'র মতো তারা এখন শুধু রোদ পোহায় সারা দুপুর।

সে-দিন শুক্রবার। ৭ই নভেম্বর। রাত তখনও শেষ হয়নি। ব্রিগেডিয়র সেন হুকুম দিলেন, "ফরোয়ার্ড মার্চ!"

গত ক'দিন ধরে ব্রিগেডিয়র সেন এবং তার সহযোগীরা মিলে আক্রমণের তোড়জোড় সম্পূর্ণ করেছেন। শ্রীনগরের আশেপাশে কেবলই ছোট ছোট পাহাড়। তার আড়ালে কোন্‌খানে জড় হয়েছে শত্রুদল; বন-বাদাড়ের মাঝে কোথায় আছে পথ, কোথায় আছে খাদ,—তার খবর যোগাড় করেছেন গোপনে। মাইল মেপে

এঁকেছেন রাস্তা-ঘাটের নক্সা। এতদিন ভারতীয় সৈন্যদের ছিল আত্মরক্ষার লড়াই। এবার এসেছে আক্রমণের পালা।

পাটান থেকে শ্রীনগরের পথে হানাদারদের আস্তানায় বেশীর ভাগ তখনও ঘুমে বেঘোর। দু'চার জন মাত্র আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসেছে। এমন সময়, "হারে রে রে রে—।"

হানাদারদের সর্দার তখনও বিছানায়। এ ক'দিনের লুটের আনন্দে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা যেমন মশগুল; জয়লাভের আশায় তিনি নিজেও তেমনি খোশ মেজাজ। বাদগামের যুদ্ধের পরে এ পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যদের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

বিনা বাধায়-ই হানাদারেরা ক্রমশঃ এগিয়ে এসেছে বারমুলা থেকে পাটান। পাটান থেকে সেলাটং। শ্রীনগর শহরের প্রায় দোর গোড়ায়। এখন রাজধানী শ্রীনগর তাদের নাগালে। ঠিক যেন গাছের নীচু ডালে ঝুলছে লাল টুকটুকে পাকা আপেলটি। শুধু হাত বাড়িয়ে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা। অনেক রাত জেগে সর্দার তাই ইয়ার-দোস্ত নিয়ে আমোদ ফুর্তি করেন। কখনও মনের সুখে গোঁফে লাগান চাড়া। কখনও বা গন্ধ-ভরা রুমাল হাতে নিয়ে সহস্রবার দাড়িতে দেন ঝাড়া।

শেষ রাত্রির দিকে সর্দারের ঘুমটা জাঁকিয়ে এসেছিল। স্বপ্ন দেখছিলেন।—যেন শ্রীনগর দখল করে মহারাজাকে কোতল করেছেন। মহারাণীকে করেছেন বাঁদী। তাকিয়া ঠেস দিয়ে সোনার গড়গড়ায় রুপোর নলে অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া খাচ্ছেন আরামে। হঠাৎ শোনেন "হারে রে রে রে—।"

ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করেছে ভীষণ বেগে।

চমকে উঠে বসে বললেন, "অ্যাঁ, যুদ্ধ? সে কী?"

চোখ রগড়ে চারদিকে তাকিয়ে শেষটায় হাঁক দিলেন, "বন্দুক লাও।"

লাও তো বটে! কিন্তু আনে কে? হট্টগোলের মধ্যে হানাদারেরা কেউ খুঁজছে হাতিয়ার, কেউ খুঁজছে পোষাক, কেউ বা দিশেহারা হয়ে অনর্থক ছুটোছুটি করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই কপালে খেল ঠোক্কর, মাথায় পেল চোট। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারার আগেই কচুকাটা হয়ে গেল অনেকে।

ব্রিগেডিয়র সেন আগের ভাগে একদল সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন উত্তরে, আর একদলকে দক্ষিণে। মাঝখানে ছিল মূল পদাতিক বাহিনী। ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মতো তিন দল সৈন্য একসঙ্গে আক্রমণ করল হানাদারদের।

তিনদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে লড়াই করা চলে কতক্ষণ? কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হানাদারেরা কাবু হয়ে পড়ল। তার উপরে—।

এ কী, মেশিনগানের আওয়াজ শোনায় যেন! হানাদারেরা অবাক হয়ে এদিকে ওদিকে তাকায়। ওমা, তাই তো। এ যে সাঁজোয়া গাড়ি! সর্বনাশ!! ঘর্ঘর শব্দে ছুটে আসছে পথের ধুলো উড়িয়ে, কামানের ধোঁয়া ছড়িয়ে। গুলী ছুঁড়ছে যেন শিলাবৃষ্টি! "ইয়া আল্লা" বলে হানাদারেরা তখন দিল সোজা চম্পট। দৌড়, দৌড়, চোঁচা দৌড়।

কমাণ্ডার দেখলেন মহা বিপদ। দলের লোকেরা এভাবে পালাতে শুরু করলে যুদ্ধ করবেন কাকে নিয়ে? তিনি তাদের ফেরাবার চেষ্টা করলেন। বললেন,

"ভাইজান, তোমরা পিছু হটছ কেন? মনে হিম্মৎ রাখ, হিন্দুস্থানী কাফেরগুলি এখুনি ঘায়েল হবে। একটু পরেই শ্রীনগর আমাদের কব্জায়। জিহাদ হাসিল কর—"

কে শোনে কার কথা? হানাদারেরা বলে, "আরে রাখো মিঞা, তোমার শ্রীনগর। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। জান যায়, তায় জিহাদ!" তাড়াতাড়ি পালাতে লাগল তারা যার যে দিকে দু'চোখ যায়।

কিন্তু যেদিকে সেদিকে যাওয়ার কি জো আছে? ভারতীয় সৈন্যরা আছে যে তিন দিকেই। খোলা একমাত্র পিছনের পথ। যে পথে হানাদারেরা হানা দিয়েছিল শ্রীনগরের পানে। উল্টে সে পথেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পিছু হটল তারা। পিছনে মরে পড়ে রইল তাদের শ'তিনেক সঙ্গী। কিছু রেখে গেল লুঠের মাল, কিছু ফেলে গেল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম।

প্রাণের মায়ায় ছোটা,—বড় বিষম ছোটা। পড়ি তো-মরি করে ছুটতে ছুটতে হানাদারেরা সেলাটং থেকে পালালো পাটানে। পাটান থেকে বারমুলায়।

উল্লাসে ভারতীয় বাহিনী পিছনে ধাওয়া করল তাদের। কিন্তু শহরে যাত্রীচলাচল মোটর বাসগুলি কত আর জোরে চলতে পারে? তবুও সৈন্যদলের ড্রাইভারেরা চেষ্টা করল প্রাণপণ। গাড়ির এক্সিলারেটরটা ডান পায়ে চেপে ধরল পুরোপুরি। স্পিডোমিটারের কাঁটাটা, চল্লিশ থেকে লাফিয়ে উঠল পঞ্চাশে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। সৈন্য বোঝাই বাসের জানলা খড়খড়িগুলি কাঁপতে লাগলো সশব্দে। স্টিয়ারিংটা ধরতে হলো শক্ত মুঠোয়।

"চালাও, চালাও জোরসে।" হাঁকতে লাগল ভারতীয় সৈন্যদলের সেনানায়ক। ঐ যে দেখা যাচ্ছে,—পালাচ্ছে দুশমনেরা। আর একটু এগোলেই ধরে ফেলা যাবে তাদের। "জোরে, আরও জোরে চালাও ড্রাইভার, আউর জোরসে"। পঞ্চান্ন, সাতান্ন —স্পিডোমিটারের কাঁটা উঠছে। ষাট, বাষট্টি—আর একটু, আরও—!

ঘট্ ঘট্ ঘট্‌ট—ঘটাং।

বেগ কমে ধীরে ধীরে গাড়ি ঠায় থেমে গেল। কী ব্যাপার? মোটরের ইঞ্জিন বিগড়েছে বুঝি? ড্রাইভার হ্যান্ডল ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে চেষ্টা করল। টানল চোক। বনেট খুলে পরীক্ষা করলো যন্ত্রপাতি। না। পেট্রোল ফুরিয়েছে গাড়ির। এক ফোঁটা তেল নেই পেট্রোল ট্যাঙ্কে।

সাত

বারমুলা থেকে হানাদারেরা পালিয়ে গেল দূরে।

গাছ না উপড়ে বড় থামে না ঝড়, গাঁ না মজিয়ে নড়ে না মড়ক। লুঠতরাজ খুন-খারাপি না করে দস্যুদলই বা বিদায় হয়েছে কবে কোন্ দেশে? হানাদারেরা গেল। কিন্তু যাবার আগে তাদের হাতের ছাপ রেখে গেল বারমুলার আষ্টেপৃষ্ঠে। হাতের ছাপ তো নয়, নখের দাগ। সে দাগ বহু শোকের অশ্রু দিয়ে ভেজা, বহু

লোকের রক্ত দিয়ে লাল।

হানাদারেরা বারমুলায় চড়াও হয়েছিল দিনে-দুপুরে। পুরুষেরা তখন যে যার কাজে বাইরে। হাটে চলেছে বেচাকেনা, মাঠে চলেছে নিড়েন। কাছারিতে চোখে চশমা এঁটে মুন্সীরা লিখছে উর্দু বয়ানে দশধারার আরজি। মাদ্রাসার বুড়ো মৌলভী সাহেব শাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে কিশোর ছাত্রদের শেখাচ্ছেন—আলীফ্, বে, তে, সে।

শহর দখল করে দস্যুরা দলে-বেদলে ছড়িয়ে পড়ল নানা দিকে। যেন পাকা ফসলের ক্ষেতে আচমকা নেমে এল রাশি রাশি পঙ্গপাল। সব ধ্বংস করে দিল দু'দণ্ডে।

প্রথম পর্যায়ে লুঠ। বাক্স ভেঙ্গে নিল টাকাকড়ি। সিন্ধুক ভেঙ্গে সোনাদানা। মেয়েদের গা থেকে ছিনিয়ে নিল গয়না। তাঁতিবউ হারাল গলার হাঁসুলি, নাপিতবউ-এর গেল হাতের বাজুবন্ধ্। অতি দরিদ্রের ঘরে আর কিছু না পেয়ে দস্যুরা হেঁশেল থেকে টেনে নিয়ে গেল পিতল কাঁসার বাসনপত্র। সন্ধ্যাবেলা ধানের গোলায় আর তিসির আড়তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে করল উল্লাস। রঙ্গ করে একে অন্যকে বলল,—বড়ি আচ্ছি রোশনাই হো রহী হৈ,—বাঃ, খুব উজ্জ্বল আলো হচ্ছে তো!

লুণ্ঠন আর হনন। যমজ ভাই-এর মতো চলে পিঠোপিঠি। হিন্দু আর শিখ সামনে পেলে আর রক্ষে নেই। হানাদারেরা নিমেষে তাদের হত্যা করতে লাগল পৈশাচিক উল্লাসে। যুবক, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ,—কোনো বাছ-বিচার রইল না আর কোনোখানে। স্ত্রীর চোখের সামনে কত স্বামীর মাথা পড়ল কাটা। মায়ের কোলে কত শিশুর বুকে বিঁধলো গুলী। ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে যারা কোনো মতে প্রাণ বাঁচালো তাদেরও সবার দেহ অক্ষত রইল না।

কাশ্মীর আক্রমণকে পাকিস্তান বরাবর বলছে—ধর্মযুদ্ধ। কাশ্মীরের প্রজারা বেশীর ভাগ মুসলমান। মহারাজ হিন্দু। তিনি নাকি কেবলই মুসলিম নির্যাতন করেন। তাই উপজাতীয় মুসলমানেরা ক্ষেপে গিয়ে কাশ্মীরে চড়াও হয়েছে, তাদের স্বধর্মীদের ত্রাণ করতে। এ তো যেমন তেমন লড়াই নয়,—এ জিহাদ। ওরা তো হানাদার নয়,—ওরা মুজাহিদ! বলেছেন পাকিস্তানের কর্তারা।

মুজাহিদেরা কিন্তু মুসলমানকেও রেহাই দিল না বারমুলায়। ত্রাণ করণের বদলে প্রাণ হরণ হলো সেখানে। মুসলমান যাদের ধন বা প্রাণ গেল তাদের মধ্যে নাম না-জানা ছিল অনেকে। নামজাদা ছিলেন অবশ্য মকবুল শেরোয়ানী।

শেরোয়ানী বারমুলার গণ্যমান্য নেতা। তাঁর কথা সবার মুখে মুখে, তাঁর খ্যাতি রটেছে পথে-ঘাটে। লোকের রোগে-শোকে তিনি ভাই-এর মত দরদী, বিপদে-আপদে তিনি সখার মতো সহায়। সারা শহরে তাঁর সুনাম ধরে না।

কিন্তু তাঁর উপরে পাকিস্তানীদের রাগ ছিল অনেক দিনের এবং অনেকখানি। পাকিস্তানের যিনি শাহানশা বাদশা, সেই কায়েদে আজম জিন্নাকে একবার বড়ই অপদস্থ করেছিলেন মকবুল শেরোয়ানী।

কয়েক বছর আগে জনাব জিন্না এসেছিলেন কাশ্মীরে। বারমুলার এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বললেন "কাশ্মীরী মুসলমানেরা সব এক হোক, তাদের এক আল্লা এক কলেমা, এক দল।"

শেরোয়ানী ছিলেন সে সভায় একজন শ্রোতা। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক

কথা। এক হোক, তবে শুধু মুসলমান নয়—এক হোক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারশি, খৃস্টান।—এক হোক কাশ্মীরের সমস্ত জনগণ।"

জিন্না রেগে বললেন, "হিন্দুরা কাফের, মুসলমানের শত্রু।"

মকবুল শেরোয়ানী উত্তর দিলেন, "হিন্দুরা মানুষ, মুসলমানের ভাই।"

রাগে জিন্না সাহেবের চক্ষু রক্তবর্ণ। মুখে যোগাল না কথা। বার্নিশ করা জুতো মশ্ মশ্ করে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে সভা ছেড়ে চলে গেলেন সেই মুহূর্তে। ফুলের মালা রইল পড়ে। জয়ধ্বনি রইল বাকী।

সেই পুরানো কাহিনী মনে ছিল পাকিস্তানীদের। তার শোধ তুলল এতদিনে। হানাদারেরা শেরোয়ানীকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে হাজির করল তাদের সর্দারের সামনে। বলল, "সেলাম কর।"

শেরোয়ানী নির্ভীক। হেসে বললেন, "গুরুজনের চরণ ছাড়া করিনে কারে প্রণিপাত।"

স্পর্ধা বটে! রোষে ফুলতে থাকে সর্দারের অনুচরেরা।

মনের ক্রোধ চেপে রেখে সর্দার বললেন, "আমরা কাশ্মীর জয় করেছি। শ্রীনগর দখল করব দু'-এক দিনে। আমাদের দলে যোগ দাও। সাহায্য কর।"

শেরোয়ানী জবাব দিলেন, "আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়া কাশ্মীরের প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য। তোমরা দস্যু। তোমরা নিপাত যাও!"

শুনে সবাই গর্জে ওঠে। কেউ হাঁকে গর্দান লাও, কেউ চড়াতে চায় শূলে। আর কেউ বা চোখ লাল করে বলে, হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক; ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক।

সর্দার হুকুম দিলেন, "হাটের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে প্রথমে গুণে গুণে লাগাও দু'শ' কোড়া। পিঠে পাঁচশ' পয়জার। কমবক্তের তাতেও শিক্ষা না হলে, গুলী করে মাথার খুলি উড়িয়ে দাও সবার সামনে।"

তখন শেরোয়ানীর হাতে উঠল হাতকড়ি, পায়ে পড়ল বেড়ি। কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে জল্লাদেরা নিয়ে গেল চৌরাস্তার মোড়ে। বধ্যভূমিতে। সেখানে হানাদারেরা এসে ভিড় জমাল মজা দেখার আশায়।

শেরোয়ানী অবিচলিত। শপাং শপাং শব্দে পিঠে পড়তে লাগল চাবুক। একের পর এক। কতগুলি লাগল বুকে, মুখে, চোখে। কেটে গিয়ে, রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল সর্বাঙ্গে।

সর্দারের লোকেরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "এখনও বাঁচার সময় আছে, আমাদের দলে যোগ দিতে রাজী থাক তো বল, বল—পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

মকবুল শেরোয়ানীর চেঁচিয়ে কথা বলার শক্তি নেই, চেতনা পাচ্ছে লোপ, জিব আসছে জড়িয়ে। তবুও কোন মতে অতি ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "কাশ্মীর জিন্দাবাদ, মেরী পিয়ারী কাশ্মীর—কাশ্মীর বেঁচে থাক, আমার সাধের কাশ্মীর—।"

পর মুহূর্তে তিন দিক থেকে তিনটে বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল তাঁর মাথা তাক করে।

হানাদারেরা উল্লাসে হর্ষধ্বনি করে বলল—অবাধ্যের এই সমুচিত শাস্তি। অন্য লোকেরা দেখে শিখুক।

দেখে শেখার লোক আর বড় বাকি ছিল না। হানাদারেরা মেরে কেটে প্রায় সাবাড় করে এনেছিল সব।

কিন্তু ঠেকে শিখতে হলো আরও কয়েকজনকে। তারা কাশ্মীরী নয়, বিদেশী।

খৃস্টান মিশনারীদের এক আশ্রম ছিল বারমুলায়। "প্রেজেণ্টেশান কনভেণ্ট" তার নাম।

অনেক কাল আগের কথা। এক ইংরেজ মহিলা এসেছিলেন কাশ্মীরে। রোমান ক্যাথলিক সিস্টার। চিরকুমারী, সন্ন্যাসিনী। কাশ্মীরে চাষী মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাঁর হৃদয় কাতর হলো করুণায়। স্থির করলেন, সেইখানে দরিদ্রের সেবায় জীবন কাটিয়ে দেবেন তিনি। স্বদেশ, সমাজ ও স্বজন পড়ে রইল পিছনে। নিজের ইচ্ছায় মাথায় তুলে নিলেন সহস্র যোজন দূরে এক অপরিচিত দেশের দুঃস্থ জনগণের দুঃখ মোচনের ভার। নিজের অতি সামান্য সম্বল নিয়ে স্থাপন করলেন এক আশ্রম। এই প্রেজেণ্টেশান কনভেণ্ট। তার আয়তন ক্ষুদ্র, আয়োজন সামান্য। কিন্তু আন্তরিকতা কম নয়।

তারপরে বহু বছর গিয়েছে কেটে। বহু ধর্মপ্রাণ দানশীল বিদেশীর দানে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে সেই কনভেণ্ট। ক্ষুদ্র অংকুর থেকে দিনে দিনে যেমন গড়ে ওঠে বিরাট মহীরুহ। শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, পুষ্প-পল্লবে সমৃদ্ধ। আজ প্রেজেণ্টেশান কনভেণ্টে আছে হাসপাতাল। সেখানে প্রত্যহ শত শত অসুস্থেরা পায় ওষুধ! আছে বিদ্যালয়। সেখানে দরিদ্র ছেলেমেয়েরা নেয় পাঠ। আছে নারী শিল্পাগার। সেখানে অনাথা স্ত্রীলোকেরা শেখে তাঁত চালনা, উল বোনা, সেলাই ও অন্যান্য কারুকাজ।

সেদিনের সেই পুণ্যশীলা প্রতিষ্ঠাত্রী গিয়েছেন পরলোকে। তিনি নেই। কিন্তু আছে তাঁর কাজ, রয়েছে তাঁর আদর্শ। সে কাজ হাতে নিয়েছেন, সে আদর্শ সফল করেছেন নানা দেশ থেকে আগত নবীন সন্ন্যাসিনীরা। নতুন একদল সিস্টার। কেউ ফরাসী, কেউ জার্মান, কেউ বা ইটালীয়ান। তাঁদের জাতি আলাদা, ভাষা পৃথক, কিন্তু লক্ষ্য এক। সে লক্ষ্য পরোপকার।

হানাদারেরা বারমুলায় আসছে শুনে কনভেণ্টের অনেকেই ভীত হলো। মাদার সুপিরিয়র কনভেণ্টের প্রধান কর্ত্রী। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন "আসে আসুক। আমরা রোগীর শুশ্রূষা করি, আর্তের সেবা করি, দীন দরিদ্র নিয়ে আমাদের কাজ। কারো সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই আমাদের। আমাদের ভয় কিসের?"

হায়! তিনি জানতেন না যে, যারা লুঠ করে তাদের রীতি আলাদা। সাধুর তারা শত্রু, ভালোর তারা যম। তাদের বিরোধ জগতের সমস্ত সভ্য ও শিক্ষিত নরনারীর সঙ্গে।

মাদার সুপিরিয়রের ভুল ভাঙতে বিলম্ব হলো না।

বেলা তখন পাঁচটা। পীর পঞ্জালের মাথায় শাদা বরফের গায়ে লেগেছে পড়ন্ত রোদের আধ-গোলাপী রঙ। বাগানে সবুজ ঘাসের উপর পপলার গাছগুলির ছায়া পড়েছে দীর্ঘ। আলখাল্লার মতো লম্বা ময়লা পিরান গায়ে, চাপা টুপি মাথায় ক্লান্ত গুজরালেরা মেষের পাল নিয়ে কাঁচা মকাই চিবোতে চিবোতে ফিরছে ঘরে।

কনভেণ্টের স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বেজেছে অনেকক্ষণ। ছাত্র-ছাত্রীরা চলে গিয়েছে

যে যার বাড়িতে। হাসপাতালে রোগীরা শুয়ে আছে বিছানায়। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল কোলাহল। হৈ-হুল্লোড়ে একদল হানা দিল কনভেণ্টে।

কনভেণ্টের অতিথিশালায় ছিলেন কয়েকজন বিদেশী। কেউ নতুন এসেছেন বেড়াতে, কেউ বা আছেন অনেক দিন। তাদের মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ ইংরেজ। লেফটেনেণ্ট কর্ণেল ভি. ও. টি. ডাইকস। আগে কাজ করতেন ভারতীয় সেনা বিভাগে, পেন্সনের পর রয়ে গিয়েছেন এদেশে। সস্ত্রীক বসবাস করছেন এই কনভেণ্টে। বাতে প্রায় পঙ্গু। তবুও সাধ্যমতো হিসাবপত্র লেখার কাজকর্ম করে সিস্টারদের সাহায্য করেন মাঝে মাঝে। বিপদের সময় এই বৃদ্ধই বন্দুক হাতে এগিয়ে গেলেন সামনে। রুখতে চাইলেন দস্যুদের কনভেণ্টের বাইরে।

কিন্তু বার্ধক্যে ডাইকসের শরীর বলহীন। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। বাতে আড়ষ্ট হাত বন্দুক তুলে তাক করার আগেই হানাদারদের গুলিতে প্রাণ হারালেন তিনি।

ভয়ে ও উদ্বেগে স্বামীর সঙ্গে ঠিক তাঁর পিছনেই ছিলেন স্ত্রী মিসেস ডাইকস। একটি ভীরু খরগোশের ছানার উপরে এক পাল হিংস্র জন্তুর মতো তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদারদের দল। শুধু একবার বুঝি একটি আর্তনাদ শোনা গেল। পর মুহূর্তেই আক্রমণকারীদের উদ্দাম আস্ফালন ও উন্মত্ত কোলাহলে চাপা পড়ে গেল সে কাতর স্বর! দু'দিন পরে মিসেস ডাইকসের নগ্ন মৃতদেহটা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল একটা গভীর কূপের মধ্যে। মৃত মহিলার গায়ের জামা কাপড়টুকু পর্যন্ত নিতে বাকি রাখেনি তাঁর হত্যাকারীরা।

কনভেণ্ট থেকে প্রচুর ধনদৌলত বস্তা বোঝাই করে নিয়ে যাবে—এই আশা ছিল দস্যুদের। নিরাশ হলো। আশ্রম শোভার জন্য নয়,—সেবার জন্যে। সেখানে না থাকে মণি-মুক্তার ছড়াছড়ি, না আছে হীরা-জহরতের জাঁকজমক। অগত্যা দেয়ালের ঘড়ি, আলনার জামা কাপড় আর জানলার পর্দা নিয়েই হানাদারেরা কাড়াকাড়ি করতে লাগল।

লুঠের মাল যতই হলো কম, লুণ্ঠনকারীদের ততই বাড়ল রোষ। জিনিষপত্র ভেঙ্গে গায়ের ঝাল ঝাড়তে লাগল। ঘরের টেবিল, চেয়ার, আলমারি, দেরাজ, পেয়ালা, পিরিচ, শার্শি, কপাট করল চৌচির। তাদের অস্ত্রের আঘাতে বাগানের পাশে সমাধিস্থানে শ্বেত পাথরের ক্রুশ চিহ্নগুলি পর্যন্ত হলো চূর্ণবিচূর্ণ।

এতেও শান্ত হলো না ক্রোধ। বরং খুন চেপে গেল মাথায়। কনভেণ্টের বিদেশী সন্ন্যাসিনী মেয়েদের ন'জনকে সঙ্গীনের পাহারায় এনে এক সারিতে দাঁড় করাল উঠনে। ন'জন হানাদার বন্দুক উঁচিয়ে তাক করল তাদের কপালে। শুধু গুলী ছোঁড়ার অপেক্ষা। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দুরুদুরু বুকে চোখ বুজে ভগবানের নাম স্মরণ করলেন সন্ন্যাসিনীরা।

কিন্তু রাখে খৃস্ট মারে কে? আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে ন'টি পরোপকারী সন্ন্যাসিনীদের রক্ষা করলেন অদৃশ্য থেকে নিশ্চয়ই ভগবান, কিন্তু প্রকাশ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র জিনিষ।

সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে একজনের মুখের একটি দাঁত ছিল সোনা-বাঁধানো। সেটা চোখে পড়তেই এক জল্লাদ বন্দুক ফেলে দিয়ে ছুটল সেটা দখল করার লোভে। কিন্তু লুঠের নজর তো একা তারই তীক্ষ্ম নয়, তার অন্য সাঙাতরাও কিছু চোখ বুজে ছিল

না। কাজেই সোনার লোভে নিজেদের মধ্যেই বাঁধল কলহ। প্রথমে গালাগালি; শেষে হাতাহাতি। হট্টগোলের মধ্যে হানাদারদের এক কর্তা এসে হাজির। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান আছে। কাশ্মীরী মেয়ে পুরুষ হত্যা করা এক, য়ুরোপীয় সন্ন্যাসিনীদের গুলী করায় আর—সেটুকু তিনি বোঝেন। তাই শেষ মুহূর্তে অভাবনীয় রূপে প্রাণ রক্ষা হলো তাঁদের।

হানাদারদের আর এক দল ততক্ষণ ব্যস্ত ছিল কনভেণ্টের অন্য এক অংশে। তারা চড়াও হলো হাসপাতালে। যা' সামনে পেল তাই করল খান্‌খান্‌। যাকে হাতে পেল তাকেই করল আহত বা নিহত। বন্দুকের বাঁটের ঘায়ে টুকরো টুকরো করল দামী এক্স-রে যন্ত্রপাতি। শিশি বোতল দিল গুঁড়িয়ে, ওষুধপত্র গেল গড়িয়ে, ক্ষত-বিক্ষত হলো অসহায় অসুস্থ নরনারী। মারা গেল একজন নার্স, আয়ু শেষ হলো দু'জন রোগীর।

প্রাণ দিলেন আরো একটি পুণ্যবতী মহিলা। সিস্টার টেরেসেলীন। কনভেণ্টের সহকারী মাদার সুপিরিয়র। সুদূর য়ুরোপের স্পেন দেশ থেকে এসেছিলেন বারমুলায় পরহিতের ব্রত নিয়ে। কনভেণ্টের উপাসনা স্থানটি পাছে হানাদারদের আক্রমণে অপবিত্র হয়, এই আশংকায় প্রহরীর মতো তিনি একা দাঁড়িয়ে ছিলেন মন্দিরের দুয়ারে। গুলী এসে বিঁধল তাঁর বুকে।

সেদিন বারমুলায় দস্যুদের আঘাতে ছিন্ন হলো একটি কোমল লতার মূল। সেদিন জনসেবার বেদীতে নিবল একটি স্নিগ্ধ দীপের শিখা।

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্ত লিখা।

আট

শ্রীনগর থেকে পেট্রোল জোগাড় করে অবশেষে বারমুলায় এসে পৌঁছল ভারতীয় সৈন্যদল। সূর্য তখন অস্ত গিয়েছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে ঘনিয়ে।

নিঝুম নিস্তব্ধ নগর। অনেক ঘা খেয়ে অসহ্য ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মানুষের মতো যেন পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত বারমুলা। অসাড় অচৈতন্য। তার পথগুলি জনহীন, ঘর-দোর শূন্য। রাস্তার ধারে, বাড়ির উঠনে ছড়িয়ে আছে মৃতদেহ। সেখানে শকুন গৃধিনীদের চলছে ফলার, শেয়াল কুকুরে বেধেছে মারামারি। হায়, বারমুলা ছিল শহর,—বারমুলা হয়েছে শ্মশান!

পরদিন সকালবেলাই ব্রিগেডিয়ার সেনের সৈন্যদল আবার বেরিয়ে পড়ল হানাদারদের সন্ধানে। কিন্তু তাদের কি আর নাগাল পাওয়া যায়? তারা ততক্ষণে সরে পড়েছে অনেক দূরে। পালাবার সময় রাস্তাঘাট নষ্ট করে রেখে গিয়েছে যাতে ভারতীয় সৈন্যদল সহজে পিছু ধাওয়া করতে না পারে। পথের মাঝখানে ফেলে রেখে গিয়েছে বিরাট গাছের গুঁড়ি। কোথাও বা পাশের পাহাড় থেকে গড়িয়ে দিয়েছে মস্ত মস্ত পাথরের চাঁই। সে সব না সরিয়ে এগোতে পারে না জীপ বা মোটর বাস। তার উপরে আবার পেট্রোল ফুরিয়ে যায় মাঝে মাঝে। শ্রীনগর থেকে নতুন পেট্রোল এসে

না পৌঁছানো পর্যন্ত বসে থাকতে হয় নিরুপায়।

এমনি করে ভারতীয় সৈন্যরা এসে পৌঁছল রামপুর। যে-পথে লাগে কয়েক ঘণ্টা, সে-পথে লাগলো কয়েক দিন।

শ্রীনগরে যারা আছে তারা আশা ও আশংকায় দুলছে অহরহ। কী হয়, কী হয়। সেলাটং ছিল ঘরের কোণায়। কানের কাছে গোলাগুলীর আওয়াজ শোনা গিয়েছে। লোকের মুখে খবর পাওয়া গিয়েছে। এখন শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দূরে। সেখানকার হারজিতের সঠিক সংবাদ জানে না কেউ। থেকে থেকে গুজব রটেছে নানা রকম। তার কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে হদিশ পাওয়া ভার। সকালে শোনা গেল, ভারতীয় সৈন্য, হানাদারদের ঘায়েল করেছে। শুনে লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। পরক্ষণেই শোনা যায় তার উল্টো। ভারতীয় সৈন্যদের নির্মূল করে হানাদারেরা নাকি আবার এগিয়ে আসছে শ্রীনগরের পথে। তখন ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে যায়। বুক করে দুরু দুরু। বাক্স-বিছানা বেঁধে পালাবার উদ্যোগ করবে কিনা ভাবে। এমনি করে দিন কেটে যায়।

হঠাৎ এক সন্ধ্যেবেলা শ্রীনগরের বিজলী আলোগুলি ঝলমলিয়ে উঠলো।

ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। প্রথমে লাগে অবাক, পর মুহূর্তেই জাগে আনন্দ। য়্যা, মহুরা? তাহলে মহুরায় পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় সৈন্যদল? হানাদারদের দিয়েছে হটিয়ে? খুশিতে এ ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, "মহুরা, মহুরা এসেছে আমাদের দখলে।"

হ্যাঁ; রামপুর থেকে মহুরায় এসে পৌঁছেছে ব্রিগেডিয়র সেনের সৈন্যদল। আজকাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকে জন কয়েক এঞ্জিনীয়র। তাঁরা যুদ্ধ করেন না, কিন্তু যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিখুঁত রাখেন। জোড়াতালি দিয়ে অচল কলকব্জা সচল করতে তাঁরা ওস্তাদ। জীপ, লরী, মোটর, ট্যাংক মেরামতিতে তাঁদের জুড়ি নেই। জলবিদ্যুতের যন্ত্রপাতি তাঁদের কাছে নতুন হলেও একেবারে অসাধ্য নয়। দিন কয়েকের চেষ্টায় ভাঙা টুকরোগুলো জুড়ে তাঁরা বিদ্যুৎ কারখানার ডাইনামোটা চালু করে দিলেন। আলো জ্বলে উঠল রাজধানীতে।

শুধু পথে বা ঘরে নয়, লোকের মনেও।

নয়

মহুরা থেকে উরির পথের দুধারে উঁচু পাহাড় আর ঘন বন। সেখানে লুকিয়ে থেকে শত্রু আচমকা আক্রমণ করতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তাই ভারতীয় সৈন্যদলকে এবার এগোতে হয় সাবধানে। খবরদারীর জন্য সহায়তা নিতে হয় বিমান বাহিনীর।

শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিটি ক্ষুদ্র। মহারাজ তৈরী করেছিলেন তাঁর নিজের বিমান চলাচলের জন্যে। সে-বিমান সৌখীন প্রমোদ-ভ্রমণের বাহন। আকারে ছোট, ওজনে কম। তাই বিমানঘাঁটির রানওয়ে যেমন সরু, ফ্লাইং কন্ট্রোল, বাতাসের গতি ও

আবহাওয়ার হালচাল জেনে নেওয়ার যন্ত্রপাতি তেমনি সাধারণ। বড় বিমান চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর বড় কর্তারা তখন প্রায় সবাই ইংরেজ। তাঁরা দিল্লী থেকে এসে বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করলেন। বিশেষজ্ঞ যত ছোট, মেজ, সেজ ও বড় সাহেব তাঁরা দিন দুই ধরে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পরিধি প্রভৃতি পরীক্ষা করলেন। ফিতা ফেলে মাপলেন, খড়ি দিয়ে দাগলেন, খাতা-পেন্সিল নিয়ে করলেন ভগ্নাংশ, দশমিক ও বর্গফলের রাশি রাশি অংক। তারপরে এক দিস্তা কাগজে নোট লিখে বললেন—অসম্ভব। শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে জঙ্গী বিমানের ওঠা নামা চলে না।

বিশেষজ্ঞদের মত, সে তো না মেনে উপায় নেই। অগত্যা পালম থেকেই বিমান বাহিনীর বিমানগুলিকে উড়ে আসতে হয় কাশ্মীরে। তাতে অসুবিধা অনেক। বিমানে পেট্রোল নেওয়ার জায়গা অল্প। যেতে আসতেই বেশীর ভাগ পেট্রোল ফুরিয়ে যায়।

দিন কয়েক পরেই কিন্তু সমস্যার সুরাহা হয়ে গেল এক আশ্চর্যজনক ঘটনায়।

পাহাড় পর্বতের আড়ালে, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধের এলাকাটা আকাশ থেকে চিনতে যাতে অযথা বিলম্ব না ঘটে সে জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। দিল্লীর সদর দপ্তর থেকে খবর পেলেই কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যদল খড়কুটো জড়ো করে আগুন জেবলে রাখতো তাদের ছাউনির কিনারে। বিমানগুলি সেই আগুন দেখে সহজেই তাদের লক্ষ্যস্থল বুঝতে পারতো।

সেদিন সকালবেলা পালম থেকে দু'খানা স্পিটফায়ার বিমান নিয়ে রওনা হলো বিমান বাহিনীর দু'জন তরুণ পাইলট। উড়ে এল পাটানে। নীচে তাকিয়ে দেখল, কোথাও কোনখানে আগুনের চিহ্ন নেই। বেতারে খবর পাঠাতে ভুল করেছে বেতার-বার্তার অপারেটার। তাই ব্রিগেডিয়র সেনের দপ্তর আগে ভাগে জানতে পায়নি বিমানগুলির দিল্লী থেকে রওনা হওয়ার সংবাদ।

তাই তো, এখন কী করা যায়? ফিরে যেতে হবে দিল্লীতে? তাছাড়া আর উপায় কী? পাইলটেরা ভাবে, মিছিমিছি এতখানি পেট্রোল নষ্ট হবে, কোনো কাজ না করে ফিরে যাবো, সে কেমন কথা। তার চাইতে—। মিনিট দুই ভেবে নিয়ে এক পাইলট বেতার টেলিফোনে অন্য পাইলটকে জিজ্ঞাসা করে, "শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে নেমে একবার খোঁজ নিলে হয় না?"

দ্বিতীয় জন জবাবে বলে, "তা' হয়, কিন্তু বড় সাহেবরা যে বলেন,—স্পিটফায়ার নামতে পারে না সেখানে।"

"সাহেবরা যাই বলুন আমি কিন্তু আমার বিমান নিয়ে ঠিক নামতে পারি ঐ রানওয়ের উপরে।" বলল প্রথম পাইলট।

দ্বিতীয় জন বলে, "আমিও।"

"তবে এস, জয় হিন্দ বলে নামা যাক শ্রীনগরে।"

যেই কথা সেই কাজ। রেডী? ওয়ান, টু, থ্রী, ডাউন! হুশ, হু-উ-শ্।

একের পর এক, দুটি স্পিটফায়ার বিমানঘাঁটির কর্তৃপক্ষ ও ফ্লাইং কন্ট্রোলের কর্মচারীদের অবাক করে দিয়ে নির্বিঘ্নে নেমে পড়ল শ্রীনগরের ছোট রানওয়ের উপর। ভুলের ফলেই ফলল সুফল। বিমানঘাঁটি থেকে পাইলটেরা ম্যাপের উপর লাল

পেন্সিলের দাগ দিয়ে নিল লড়াইএর সীমানা। আবার উঠল আকাশে। শত্রুপক্ষের মাথার উপরে গুলীবৃষ্টি করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে গেল দিল্লীতে।

বিমান শাস্ত্রের বিধানে যা' ছিল এতকাল অসম্ভব, তাই সম্ভব করল অসম সাহসিক দুটি ভারতীয় তরুণ। তাদের গর্বে ভরে উঠল তাদের সহকর্মীদের বুক। তাদের বীরত্বে উজ্জ্বল হলো সমস্ত ভারতবাসীর মুখ।

পরদিন শ্রীনগর বিমানঘাঁটিতে নতুন দপ্তর খোলা হলো ভারতীয় বিমান বাহিনীর। দিল্লী থেকে এসে পৌঁছল অনেকগুলি স্পিটফায়ার। সেই সঙ্গে এল. ক্রু, ফিটার, মেকানিক, গ্রাউন্ড এঞ্জিনীয়র, পাইলট অফিসার ইত্যাদি বিমান বহরের কর্মচারী দল। তাদের মালপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম। অধিনায়ক হয়ে এলেন গ্রুপ ক্যাপটেন মেহের সিং, ডি. এস. ও.।

বিমান বাহিনীর সহায়তায় ব্রিগেডিয়র সেনের সেনাদল মহুরা থেকে রওনা হলো হানাদারদের সন্ধানে। আশেপাশের ঝোপ-জঙ্গলে ছোটখাটো শত্রুদল যা' লুকিয়ে ছিল, তারা সাবাড় হয়ে গেল ভারতীয় সৈন্যদের বন্দুকের গুলীতে। কিন্তু আসল বড় দলটা তখনও অনেক দূরে। তাকে ধরতে হলে জোরে পিছু ধাওয়া করতে হবে।

কিছু দূর এগোতেই দেখা গেল সামনে গভীর ও চওড়া বিরাট এক নালা। তাতে পাহাড়ের ঝরনা থেকে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তীর বেগে। গাড়ি পার হওয়ার উপায় নেই। পাথরে বাঁধানো শক্ত পুলটিকে হানাদারেরা বারুদ জ্বালিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে অনেক আগেই।

ডাক পড়ল এঞ্জিনীয়রদের। তাঁরা বললেন, নতুন করে সেতু গড়তে চাই ভারী ভারী মাল-মশলা, তা' এখন দুর্ঘট। আর চাই যথেষ্ট সময়। তার এখন অভাব।

কোনো কিছুতেই হাল ছাড়ার পাত্র নন ব্রিগেডিয়র সেন। বললেন, গাড়ি, জীপ, ট্রাক, লরী থাক পড়ে এখানে। শত্রুর পিছু ধাওয়া করতে হবে পায়ে হেঁটে। দখল করতে হবে উরি যেমন করে হোক।

সৈন্যরা সেলাম করে বলল, "জো হুকুম।"

পায়ে হেঁটেই তারা তাড়া করল হানাদারদের। বীর দর্পে দখল করল উরি। চৌদ্দই নভেম্বর তিন সপ্তাহ আগে হানাদারদের রুখতে গিয়ে যেখানে প্রাণ দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়র রাজেন্দ্র সিং ঠিক সেইখানেই উঁচু এক মঞ্চের উপর ব্রিগেডিয়র এল. পি. সেন সর্বপ্রথম উত্তোলন করলেন অশোক চক্র আঁকা গেরুয়া, সাদা ও সবুজ রঙের নিশান। স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা।

সবার কণ্ঠে উঠল উচ্চ রব, "জয় হিন্দ"। স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি।

সৈন্যদলের ব্যান্ডে বাজতে লাগল, "জন গণ মন অধিনায়ক—"। স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। উরিতে সে সঙ্গীত এই প্রথম শোনা গেল।

দশ

উরির জয়ধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কিন্তু এল নতুন দুঃসংবাদ।

জম্মু থেকে।

জম্মু আর লাডাক,—দুই দিকে দুই পৃথক প্রদেশ, মাঝখানে তার কাশ্মীর, এই তিন নিয়ে মহারাজা হরি সিং-এর রাজ্য। জম্মুর প্রায় গায়েই পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় শহর আর সেনানিবাস,—শেয়ালকোট, ওয়াজিরাবাদ ও মারি। সেখান থেকে হানাদারেরা করেছে আক্রমণ। এরই মধ্যে দখল করে নিয়েছে অনেকখানি এলাকা। খুন, লুট আর জখমের তো কথাই নেই।

কাশ্মীর প্রদেশে আক্রমণকারীরা সবাই ছিল বাইরের লোক। তাদের ঠেকানো সহজ। জম্মুতে দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কিছু স্থানীয় মুসলমান। তারা ঘরের শত্রু বিভীষণ। সব চেয়ে মারাত্মক। সর্দার ইব্রাহিম খান তাদের নেতা।

জম্মুতে মহারাজা হরি সিং-এর অধীনে পুঞ্চে ছিলেন এক মস্ত জায়গিরদার। তাঁর উপাধি রাজা। রাজার মতোই তাঁর প্রতাপ। রাজার মতোই তাঁর দান ও দাক্ষিণ্য। ইব্রাহিম এই রাজারই প্রজা। ছাত্রকালে সে ছিল মেধাবী। খুশি হয়ে পুঞ্চের রাজা নিলেন তার লেখাপড়ার ভার। স্কুল থেকে কলেজ। কলেজ থেকে বিলাত। রাজার অর্থে ব্যারিস্টার হয়ে ইব্রাহিম ফিরে এল জম্মুতে। সেখানে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য। দু' দিনেই তাদের নেতা হয়ে বসল নতুন ব্যারিস্টার।

ততদিনে পাঞ্জাবে মুসলীম লীগের পসার জমে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক ঝড়ো হাওয়ায় হিন্দু-বিদ্বেষের পাল তুলে দিয়ে তারা ভাসিয়েছে দুই জাতিতত্ত্বের তরণী। তাই দেখে চতুর ইব্রাহিমের মাথায় গজাল দুবুদ্ধি। আরও অনেকে সুযোগ-সন্ধানীর মতো সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চেপে বসল সে নৌকায়। যে রাজার টাকায় হয়েছে মানুষ তাঁরই বিরুদ্ধে শুরু করল ষড়যন্ত্র। কুৎসিত কৃতঘ্নতার এমন নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই আছে ইতিহাসে।

দুরাত্মার যেমন ছল, দুষ্কর্মেরও তেমনি সহযোগীর অভাব হয় না কোনোদিনই। ইব্রাহিমেরও জুটল দোসর। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী। আব্দুল কৈয়ায়ুম খান। তাঁর বর্ণ-বিবর্তনের কাহিনীও কম চমকপ্রদ নয়।

গোড়াতে কৈয়ায়ুম ছিলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম সারিতে কংগ্রেস দলপতি ভুলাভাই দেশাই-এর পাশেই ছিল তাঁর আসন। তখন ইংরেজের সমালোচনা করতেন কঠোর ভাষায়। সাম্প্রদায়িকতাকে বলতেন বিষ। দেশনেতাদের য়্যালবামে থাকতো তাঁর ছবি। স্বদেশী সভা সমিতিতে শোনা যেত তাঁর ভাষণ।

হঠাৎ একদিন তাঁর মতি হলো বদল, গতি হলো বিপরীত। যোগ দিলেন মুসলীম লীগে। রাতারাতি কংগ্রেসকে গাল দিতে লাগলেন এলোপাতাড়ি। গান্ধীকে বললেন,—ভণ্ড। নেহরুকে—গোঁয়ার। আর পেটেল? সে তো সাক্ষাৎ শয়তান, মুসলমানদের পয়লা নম্বর দুশমন।

কংগ্রেসের নেতারা তখন সবাই আমেদনগরে আগা খানের বাড়িতে বন্দী। তাঁরা পুরানো সহকর্মীর কীর্তি দেখে অবাক হয়ে ভাবেন, এ কী অঘটন!

কথায় বলে, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু, ভাই শত্রু মহাকাল। দলত্যাগীরাই হয় কালাপাহাড়। ভারতবর্ষের প্রতি আব্দুল কৈয়ায়ুম খানের রাগটাই যেন সব চেয়ে প্রচণ্ড। কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনা হয়েছে পেশোয়ারে, মূল পরিচালনাও

সেখান থেকেই। সব কিছুরই পিছনে ছিল কৈয়ায়ুমের হাত। সর্দার ইব্রাহিম খান যোগাযোগ রাখল তাঁর সঙ্গে। অস্ত্র শস্ত্র যোগাড় করে করল বিদ্রোহ। বলল, "রাজা, মহারাজা মানিনে। আমরা নতুন সরকার গড়েছি। তার নাম,—আজাদ কাশ্মীর।"

মীরপুর, পুঞ্চ, নৌশেরা ও রাজোরীতে ছিল মহারাজা হরি সিং-এর ছাউনি। কিন্তু সেগুলিতে সৈন্য সংখ্যা যেমন অল্প, অস্ত্র শস্ত্রও তেমনি অপ্রচুর। তার উপরে সেখানে ভিড় করেছে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে-আসা বহু হিন্দু ও শিখ শরণার্থী। অগণিত আহত ক্লান্ত ও সর্বস্বান্ত নরনারী। তাদের ক্ষুধার অন্ন আর বাসের ব্যবস্থাই দুরূহ। হানাদারেরা চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল এই ঘাঁটিগুলিকে।

খবর পেয়ে ভারত সরকার সৈন্য পাঠালেন পুঞ্চের পথে।

কিন্তু পথ বলি তাকে কী মুখে? গহন ঘন বনের মাঝে এঁকে বেঁকে গিয়েছে কোনোমতে পায়ে চলার সরু রেখাটি। তাই বেয়ে আট হাজার ফুট উঁচু হাজি পীরের গিরিবর্ত্ম পার হয়ে বহু কষ্টে পুঞ্চের ছাউনিতে এসে পৌঁছলেন ব্রিগেডিয়র প্রিতম সিং ও তাঁর এক ব্যাটিলিয়ন সৈন্য।

সেখানে প্রথম সমস্যা খাদ্য। ওৎ-পাতা বাঘের মতো সহস্র সহস্র হানাদার ঘিরে বসে আছে শহরের সর্বদিক। সাধ্য কী যে তাদের এড়িয়ে বাইরে থেকে আসবে চাল ডাল তেল বা নুন। ভিতরে গৃহস্থদের গোলায় আর পাটোয়ারীদের আড়তে শস্য যা' ছিল তা' এসেছে ফুরিয়ে। বাইরে থেকে খাদ্য আমদানীর এক মাত্র উপায় বিমান। কিন্তু বিমান নামবে কোথায়? ছাউনিতে সৈন্য যারা আছে তারা হানাদারদের দূরে ঠেকিয়ে রাখতেই হিমশিম। বিমান অবতরণের রানওয়ে গড়বে কখন? প্রিতম সিং ভেবে কুল পান না।

পুঞ্চে শরণার্থীদের মধ্যে ছিল এক হিন্দু ছুতোর। একদিন সে এসে হাজির হলো প্রিতম সিং-এর দপ্তরে। ব্রিগেডিয়র সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। আরদালী চাপরাসীরা প্রথমে হাঁকিয়ে দিতে চায়। শেষটায় অনেক বিনীত মিনতিতে মন নরম হলো তাদের। নিয়ে গেল প্রিতম সিং-এর সামনে।

বৃদ্ধ সেলাম করে বলল, "হুজুর আমাকে কাজে লাগান।"

ব্রিগেডিয়র জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি বুড়ো মানুষ, কী কাজ করবে?"

বুড়ো উত্তর দেয়, "হাওয়াই জাহাজের জমি তৈরী করব!"

প্রিতম সিং অবাক হয়ে বলেন, "রানওয়ে? তুমি তার কী জান?"

বুড়ো বলে, "হুজুর কিছুই জানিনে, শুধু খাটতে জানি। আপনার এঞ্জিনীয়রেরা বানাবে নক্সা, রাজমিস্ত্রীরা গাঁথবে ইট। আমি মোট বয়ে যোগাবো মাটি, জল, চুন, সুরকী ও সিমেণ্ট।"

প্রিতম সিং-এর সন্দেহ ঘোচে না। বলেন, "সে কী কথা। তোমার এই অশক্ত শরীরে সে পরিশ্রম সইবে কেন?"

ছুতোরের চোখের কোণে জল দেখা দিল। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, "মালিক, এই শক্ত হাড়গুলি অনেক সয়েছে। আমার জোয়ান দুই ছেলে মরেছে দাঙ্গাকারীদের হাতে, একমাত্র মেয়ে হয়েছে নিখোঁজ। রুগ্না স্ত্রীর হাত ধরে রাত্রির অন্ধকারে পায়ে হেঁটে এসেছি পাঁচ ক্রোশের পথ। আর ক'টা দিন বাঁচব? কোন্

সুখেই বাঁচব ? মরার আগে যদি বিমানঘাঁটি তৈরীর কাজে কিছু মদদ দিতে পারি তবে জানব আমার জিন্দ্‌গী সফল।"

বৃদ্ধকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না।

পরদিন ভোরবেলা অনেক লোকের হট্টগোলে ঘুম ভাঙল প্রিতম সিং-এর। জানালায় তাকিয়ে দেখেন, প্রায় হাজার দুই শরণার্থী। যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ। ব্যাপার কী ? সবাই রানওয়ে তৈরীর কাজে লাগতে চায়। বলে, "বুড়ো ছুতোর যদি পারে মোট বইতে, আমরা কি এতই অধম ?"

অদম্য উৎসাহে কাজ শুরু হয়ে গেল রানওয়ের। ঝোপ-ঝাড় কেটে জমি হলো সাফ, দুরমুশ পিটিয়ে মাটি হলো শক্ত। ইট চুন সুরকী ঢেলে জায়গা হলো বিমান অবতরণের। রুগ্ন ও অশক্ত যারা, তারাও সাহায্য করল নানা ভাবে। সমর্থ লোকেরা কাজে চলে গেলে তারা কেউ আগলাল পড়শীদের ঘর সংসার, কেউ সামলাল তাদের ছেলে মেয়ে। এক মাসের কাজ সারা হলো এক সপ্তাহে। পুঞ্চের অবরুদ্ধ অধিবাসীদের জন্যে আকশপথে আসতে লাগল নিত্যকার খাদ্যসামগ্রী।

হানাদারেরা ভেবেছিল, অনাহারের চাপে ছাউনির লোকেরা হার মানবে দু'দিনেই। তার আর সম্ভাবনা রইল না। অনেক শলা-পরামর্শের পরে তারা তখন নিয়ে এল বড় এক বিলাতী কামান। তিন পয়েণ্ট সাত হাউইটজার। পাহাড়ের উপর থেকে গোলা ফেলতে লাগল ঠিক একেবারে রানওয়ের উপরে। বাধ্য হয়েই বিমান অবতরণ বন্ধ হলো সেখানে।

খাদ্যাভাব দেখা দিল শহরে। রেশনের মাপ কমিয়ে দিয়ে চলে কিছু কাল। সেনাবাহিনীর লোকেরা নিজে কম খেয়ে শিশুদের খাবার যোগাল আরও কিছু দিন। তার পর ?

প্রিতম সিং তার সিগন্যালারদের ডেকে বললেন, "এ অসহ্য ! পাহাড়ের উপর শত্রুপক্ষের কামানটাকে ঠাণ্ডা না করলেই নয়। বেতারে খবর পাঠাও সদর দপ্তরে। গোটা কয়েক দূর পাল্লার কামান পেঁৗছে দিক এই ছাউনিতে। বাকি ভার আমাদের।"

খবর পাঠানো যত সহজ, কামান পাঠানো তত নয়। তবুও সদর দপ্তরের কর্তারা বললেন, "চেষ্টা করতে দোষ কী ?"

পঁচিশ পাউণ্ডার গোটা কয়েক কামান, গোলা বারুদ আর জনকয়েক গোলন্দাজ নিয়ে একদিন দুপুর বেলা রওনা হলো বিমান বাহিনীর তিন খানা ডাকোটা। এয়ার কমোডোর মেহের সিং তখন কাশ্মীরে বিমান বাহিনীর কর্তা। তিনি ভাবলেন, এমন বিপজ্জনক কাজে পাইলটদের একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। জেনারেল কুলবন্ত সিং সেখানকার সেনাবাহিনীর অধিকর্তা। তিনিও সঙ্গ নিতে চান। দু'জনে চেপে বসলেন একখানা হাওয়ার্ড বিমানে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চারখানা বিমান এসে পেঁৗছল পুঞ্চে। প্রথম ডাকোটাখানা যেই নামতে যাবে মাটিতে অমনি পাহাড় থেকে হানাদারদের হাউইটজারটা গর্জে উঠল গুড়ুম গুড়ুম শব্দে। বাজ পড়ার আওয়াজে একটা বড় গোলা ফেটে পড়ল ডাকোটারই গা ঘেঁষে। বুঝি এক চুলের জন্য বেঁচে গেল ডাকোটার ডান দিকের ডানাটা। মেহের সিং বুঝলেন, চেষ্টা নিরর্থক ! এ ক্ষেত্রে বিমান-অবতরণ আত্মহত্যারই সামিল। বেতারে হুকুম দিলেন। সব বিমানগুলি ফিরে গেল সদর দপ্তরে। পুঞ্চের

ছাউনিতে শরণার্থীরা হতাশচিত্তে ফেলল দীর্ঘ নিঃশ্বাস। পাহাড়ের উপরে হানাদারদের ঘাটিতে উঠল হর্ষধ্বনি।

মেহের সিং-এর মাথায় ফন্দি খেলে অনেক। সন্ধ্যেবেলা তাঁর বাছাবাছা পাইলটদের ডেকে বললেন, "বন্ধুগণ, যে কাজ শুদ্ধ বলে হয় না, সে কাজ হয় কৌশলে। শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে আমাদের।"

তিনি খুলে বলেন তাঁর মতলব। শুনে পাইলটরা সবাই মহাখুশি। তারা বয়সে তরুণ, নতুনত্বের নামে মেতে ওঠে, বিপদের ঝুঁকিতে হয় আরও বেশী বেপরোয়া।

পুঞ্চে সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ। শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। আধেক আলো আধেক ছায়া আবছা কুয়াশার মতো ঘিরেছে দূরে শালবনের সারি আর শালিধানের ক্ষেত। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে লেগেছে নিঝুম নীরবতার রেশ, ঘুম জড়িয়ে এসেছে বুঝি বনলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ আনত দুটি নয়নের শ্যামল আঁখিপল্লবে।

অকস্মাৎ সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে এল মেঘ গর্জন। না, মেঘ নয়, বিমান। ভারতীয় বিমানবাহিনীর খান কুড়ি বিমান এসে পৌঁছল পুঞ্চের আকাশে। তার প্রথমটিতে পাইলট স্বয়ং মেহের সিং।

হানাদারদের গোলন্দাজরা তাড়াতাড়ি গোলাবারুদ বোঝাই করল কামানে।

কিন্তু এ কী? বিমানগুলি কেবলই চক্রাকারে ঘুরছে আকাশে। মাটিতে নামছে না তো! হানাদারেরা ভেবে পায় না এর অর্থ। স্পষ্ট দেখা যায় না সবগুলি, গুণে বোঝা যায় না তাদের সংখ্যা।

এই দেখা-অদেখা আর বোঝা-না-বোঝার সুযোগে আধ-আলো আধ-অন্ধকারের আড়ালে হঠাৎ হুশ করে নেমে পড়ল একখানা ডাকোটা। প্রিতম সিং-এর লোকেরা আগেই তৈরী হয়ে ছিল বিমানঘাটির ভিতরে। তারা চক্ষের পলকে হাতে হাতে নামিয়ে ফেলল বিমান থেকে মাল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানটি আকাশে উড়ে গিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল অন্যান্য বিমানগুলির সঙ্গে। বাকি বিমানগুলির ঘোরা-ফেরা আর পাখার গর্জনে দূর থেকে ব্যাপারটা কারো চোখে পড়ল না।

এক, দুই, তিন। একে একে ডাকোটাগুলি নামল মাটিতে। একে একে সাজ সরঞ্জাম খালাশ করে দিল শত্রুর অলক্ষে। একে একে ঝাঁকের পাখীর মতো আবার উড়ে মিশে গেল দলে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বিমান বাহিনী নিয়ে মেহের সিং বিজয় গর্বে ফিরে গেলেন তাঁর সদর আস্তানায়।

পাহাড়ের উপরে হানাদারেরাও মহাখুশি। হিন্দুস্থানের হাওয়াই জাহাজগুলি নামতেই সাহস করল না পুঞ্চে। কাফেরগুলি ভয় পেয়েছে খুব। বিলকুল ডরকে মারে ভাগ গয়া, হাঃ হাঃ হাঃ।

তাদের হাসি অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পরদিন ভোর হতে না হতেই শুরু হলো পুঞ্চের ছাউনি থেকে পঁচিশ পাউণ্ডারের গোলা বর্ষণ। যেমন তার পাল্লা, তেমন তার আওয়াজ, আর তেমনি তার তেজ। হানাদারেরা তখন কামান বন্দুক সাজ সরঞ্জাম ফেলে প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পায় না।

এগারো

পুঞ্চ রক্ষা পেল, কিন্তু উদ্ধার হলো না। দুর্গ শক্ত হলো, মুক্ত হলো না। হানাদারেরা আগের ভাগেই দখল করে বসেছিল নৌশেরা ও তার আশেপাশের গ্রাম্। ঘাঁটি করেছিল পাহাড়ের মাথায়। সেগুলি পুঞ্চের সেতুমুখ। সেখান থেকে তাদের হটাতে না পারলে পুঞ্চ উদ্ধার করা কঠিন।

কঠিন কাজের জন্যে চাই কঠিন পণ। সেই পণ ছিল ব্রিগেডিয়র ওসমানের। পঞ্চাশ নম্বর প্যারা ব্রিগেডের অধিনায়ক হয়ে তিনি এসেছিলেন ঝানগড়ে। সেটা নৌশেরারই কাছাকাছি। হানাদারেরা সেখানে মর্টার ও মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ করেছে প্রবল বেগে। ভারতীয় সৈন্যরা তাদের এঁটে উঠতে পারছে না।

উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলায় ওসমানের পৈতৃক বাস। বেনারসে হরিশ্চন্দ্র কলেজ থেকে ম্যাট্রিক ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করে যান বিলাতে। যুদ্ধবিদ্যা শিখতে। স্যান্ডহার্স্টের তিনিই শেষ ভারতীয় শিক্ষার্থী।

অতি তরুণ বয়সেই ওসমানের স্বভাবে ছিল অস্বাভাবিক দৃঢ়তা। এক জাতীয় লোহা আছে যা' ভাঙা যায় কিন্তু বাঁকানো যায় না। তার সঙ্গে বুঝি ওসমানের মিল ছিল। আর ছিল তাঁর দেশাত্মবোধ। সজাগ এবং সুতীক্ষ্ন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী এক মুসলমান নেতা বিলাতে এক ভোজ সভায় বসেছিলেন ওসমানের ঠিক ডাইনে। নাম শুনে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সুরে বললেন, "ও, আপনি জাতিতে মুসলমান ? আমিও তাই। বড়ই সুখের···"

বাধা দিয়ে ওসমান বললেন, "আমি জাতিতে ভারতীয়। হ্যাঁ, ধর্মের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তো বলবো,—ইসলাম।"

নেতা সাহেবের মুখের আধখানা কথা রইল মুখে। সমুখের প্লেটে খাবারও আর তেমন রুচিকর বোধ হলো না।

ভারত বিভাগের সময় ওসমান ছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতানে। সাম্প্রদায়িক নৃশংসতার বহু দৃশ্য দেখেছিলেন স্বচক্ষে। বহু বিপন্ন শিখ ও হিন্দুকে রক্ষা করেছেন স্বহস্তে। বুঝি তারই প্রভাব পড়েছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে। গান্ধী-হত্যার পরদিন থেকে ওসমান মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়ে হয়েছিলেন নিরামিষাশী।

ব্রিগেডিয়র ওসমান যে-দিন ঝানগড়ে সৈন্যদলের অধিনায়ক হয়ে এলেন, তার দু'দিন পরেই ঘটল ভারতীয় বাহিনীর পরাজয়। তাদের পিছনে হটে আসতে হলো কয়েক মাইল। অন্য কেউ হয় তো মুষড়ে পড়তো এই প্রাথমিক বিফলতায়। ওসমানের বাড়ল জেদ। ভবিষ্যতে পাল্টা আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন। কঠোর পরিশ্রমে ভরে তুললেন গোলা গুলী আর রসদের ভান্ডার। গড়ে তুললেন স্থানীয় বালকদের নিয়ে এক অসামরিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। নিখুঁত করলেন খবর আনা-নেওয়ার সিগন্যালিং ব্যবস্থা। নিজ সহকর্মী ও সেনাবাহিনীকে দিলেন আশা ও আশ্বাস। তাদের মনে জাগিয়ে তুললেন প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা।

প্রথমে ওসমান হানাদারদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন কোট। সামান্য একটি

পাহাড়ী গ্রাম। কিন্তু অসামান্য তার সামরিক গুরুত্ব। নৌশেরা, ঝানগড়, রাজৌরী ও পুঞ্চের সড়কগুলি মিলেছে এসে ঐখানে।

কোটের পরেই দখল করলেন নৌশেরা।

হানাদারদের সদর ঘাঁটিতে সবাই প্রমাদ গণল। বড় কর্তারা চটে মটে কোটের সর্দারকে করলেন বরখাস্ত, নৌশেরার সেনাপতিকে করলেন কয়েদ। নতুন অধিনায়কের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত দিয়ে পাঠালেন যুদ্ধে। হুকুম করলেন, আবার দখল করা চাই হারানো এলাকাগুলি। যে হেরে পালিয়ে আসবে তার যাবে গর্দান। হয় নৌশেরা, নয় তো শির।

মরীয়া হয়ে হানাদারেরা নিশুতি রাতে আক্রমণ করল নৌশেরা। দক্ষিণ, পূব আর উত্তর,—তিন দিক থেকে এল তিন তিনটে বাহিনী। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার পনেরো হানাদার। সঙ্গে তাদের বিলাতী রাইফেল, মাঝারি ও হাল্কা মেশিনগান, মর্টার ও গ্রেনেড। আধুনিক সামরিক পদ্ধতিতে আক্রমণের রকম দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, যুদ্ধের আসল পরিচালক কারা, কারা আছে কাশ্মীর হামলার পিছনে।

প্যারা ব্রিগেডের সৈন্যদল বিপুল বিক্রমে বাধা দিল এই বিশাল শত্রুতরঙ্গ। হানাদারদের লক্ষ্য,—যে করেই হোক আবার দখল করবে নৌশেরা। ভারতীয় বাহিনীর পণ,—যে করেই হোক রক্ষা করবে নৌশেরা। কাশ্মীরের সংঘর্ষে এমন কঠোর ও এমন ভীষণ যুদ্ধ আর ঘটেনি। দু' দলই করেছে জান্ কবুল। যেন দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।

ব্রিগেডিয়র ওসমান নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের সেনাদলকে দিতে লাগলেন নির্দেশ। যেখানে দেখেন বিপদের একটুখানি আভাস, সেখানেই যান তিনি।

রাত শেষ হলো। যুদ্ধ শেষ হলো না। কাটল দুপুর। তবু যুদ্ধের বিরাম নেই। বেলা গড়িয়ে গিয়ে অপরাহ্নের ক্লান্ত সূর্য নামলো পাটে। তখনও চললো হানাহানি।

হানাদারদের শক্তি শৌর্যে নয়, সংখ্যায়। একজনকে নিকাশ করলে থাকে আরও এগারো জন। এই সংখ্যার জোরেই তারা ভারতীয় বাহিনীকে করল বিপন্ন। পঞ্চাশ গজের মধ্যে এগিয়ে এল। ক্রমশঃ কাছে। কাছের চাইতেও কাছে। আরও বেশী কাছে।

ব্রিগেডিয়র ওসমান গোড়াতেই বুঝেছিলেন, শত্রুসংখ্যা অগুণতি। তাঁর নিজের বাহিনীর চতুর্গুণ। তিনি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন পিছনের ঘাঁটিতে। তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেন আর মুহূর্ত গোণেন। কতক্ষণে এসে পৌঁছবে নতুন সৈন্যদল? ততক্ষণ যুঝতে পারবে তো তাঁর নিজের বাহিনী? রুখতে পারবে তো দুশমনকে?

বারে বারে ঘাড় দেখছেন ওসমান। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গেই পাল্লা তাঁর আর তাঁর সেনাবাহিনীর। কাঁটা যত এগিয়ে যাচ্ছে তত বাড়ছে আশঙ্কা, তত কমছে জয়লাভের আশ্বাস।

অবশেষে শত্রুসৈন্য এসে পড়ল আরও নিকটে। একেবারে ঘাড়ের উপরে। ওসমান অধীর হয়ে তাকাচ্ছেন ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে। সৈন্য, আরও সৈন্য চাই এই মুহূর্তে। কিন্তু কোথায় পাবেন সৈন্য? দেখলেন ছাউনির কারখানা ঘরে এঞ্জিনীয়রেরা করছে

যন্ত্রপাতি মেরামত। হাঁক দিয়ে বললেন ব্রিগেডিয়র, "যেখানে যে আছো বন্দুক নিয়ে চলে এসো সমুখের সারিতে। কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখ শত্রুকে।"

এঞ্জিনীয়রেরা হাতুড়ি ফেলে হাতে নিল হাতিয়ার।

সরবরাহ বিভাগের কর্মীদের কাজ রসদ, যোগানো। তারা থাকে আসল যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পিছনে। তাঁদেরও নামতে হলো যুদ্ধে।

ব্রিগেডিয়র ঘূর্ণির মতো ঘুরছেন তাঁবুতে তাঁবুতে। যাকে সামনে পান তাকেই যুদ্ধে পাঠান। "তুমি কে? রাঁধুনি? এখন রান্না থাক পড়ে। লড়াই কর। তুমি? মশালচি? কুছ পরোয়া নেই, হানাদারদের রোখো।"

যে লোকটা চিরকাল হিশাবের খাতা লেখে, খড়ি রেখে খাঁড়া ধরতে হলো তাকেও।

"সৎ শ্রী আকাল।"

"পিছন থেকে শোনা গেল বহু কণ্ঠে শিখদের রণ-হুংকার। নূতন সৈন্যদল এসে পৌঁছেছে এতক্ষণে। ইস, আর একটুখানি, বুঝি পাঁচ মিনিট দেরি হলেই শেষ হয়ে যেত সব। নির্মূল হয়ে যেত ওসমানের সৈন্যদল। ফাঁড়া কেটে গেল যেন। যেন প্রায় কানের উপর দিয়ে গেল কোপ।

নতুন সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গেই এল ভারতীয় বিমান বাহিনীর খান কয়েক বোমারু বিমান। মাটিতে শিখ-সৈন্যের আক্রমণ আর আকাশে বোমারু বিমানের গুলীবর্ষণ। এ দু'-এর সামনে হানাদারেরা টিকে থাকবে কতক্ষণ?

সহস্র সহস্র হানাদারের মৃতদেহ পড়ে রইল, মাঠে, পথে, পাহাড়ের গায়ে, যেখানে সেখানে। ভারতীয় সৈন্যদের জয়ধ্বনিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিত হলো দূর ও নিকটের গিরিকন্দর। নৌশেরার যুদ্ধ হলো সারা। যে-পথ দিয়ে শত্রু এসেছিল, সে-পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।

শুরু হলো নতুন অভিযান।

নৌশেরা থেকে ঝানগড়। পথে পড়ল গায়কোটের বন। শত্রুর চক্ষু এড়াতে ভারতীয় বাহিনীকে এগোতে হলো অতি সাবধানে। ঝোপ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে। কখনও দৌড়ে, কখনও হেঁটে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা কেবল বুকে চলে।

সৈন্যদল নিয়ে ওসমান পৌঁছলেন পৃথল পাহাড়ের সানুতে। শিকার-সন্ধানী নেকড়ে বাঘের মতো গোপনে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। সবাই লুকিয়ে রইলেন বড় গাছের আড়ালে আবডালে।

হানাদারেরা অনেক দিন থেকেই ঘাঁটি গড়েছিল এই পাহাড়ে। উঁচু চূড়ার উপর বসিয়েছিল হাল্কা ও মাঝারি মেশিনগান। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরেছিল চার পাশ। যেখান দিয়ে পাহাড়ের ওঠার পথ, সেখানে ছিল সঙ্গীনধারী কড়া পাহারা।

পশ্চিমে আকাশে প্রদোষের ক্ষীণ আলো যখন গেল মিলিয়ে, শিশু গাছের মাথায় নামলো প্রথম অন্ধকার, শেয়ালকাঁটার বনে ঝিঁঝি পোকারা সমস্বরে ধরলো তান, তখন আচম্বিতে একজন ভারতীয় সেপাই একটা গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল প্রথম পাহারাওয়ালার ঘাড়ে। শক্ত মুঠিতে গলা টিপে নিমেষে সাবাড় করলো তাকে। টুঁশব্দটি করার অবকাশ পেলে না বেচারা। দ্বিতীয় প্রহরী ছিল খানিকটা দূরে। আর একজন সৈন্য গুটিগুটি এসে তাকে পিছন থেকে পিঠে বসিয়ে দিল ঝকঝকে ধারালো ছুরি। সামান্য একটু গোঙানি শোনা গেল। তার পরেই সব নীরব,

নিশ্চল। আল্লার নাম নেওয়ারও সময় মিললো না হতভাগার।

বাকি সৈন্যরা সব তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সামনে। যেন আলাদিনের প্রদীপ ঘর্ষণে পাষাণের বুক চিরে দেখা দিল দৈত্যদল।

হানাদারেরা এমন অকস্মাৎ আক্রমণের জন্যে মোটেই তৈরী ছিল না। কিছুক্ষণ বাধা দিয়েই দেখালো পিঠ। ভারতীয় বাহিনী ঘাঁটি দখল করে দেখে, অস্ত্রশস্ত্রের তো কথাই নেই, জামা, জুতো ফেলে গিয়েছে অনেকে। রসুই ঘরে পড়ে আছে দিস্তা দিস্তা গরম চাপাটি, গামলা-ভরা সুরুয়া আর ডেকচি-ভরা বকরীর গোস্ত। আহা রে! বাছারা পালাবার তাড়ায় খাবারগুলি মুখে দেওয়ার সময় পায়নি এতটুকু।

ঝানগড়ের ঝাণ্ডাচকে আবার উড়তে লাগল ভারতীয় নিশান। গ্যাসের আলো জেলে সেই রাত্রিতে সেখানে হলো সমুদয় বাহিনীর পংক্তি ভোজন! নাচ, গান, হৈ-হল্লা—বিজয়ের আনন্দোৎসব। ঠিক দু'মাস পাঁচিশ দিন পরে ব্রিগেডিয়র ওসমানের ঘরে প্রথম বিছানা হলো খাটিয়ার উপরে। রাজপুত প্রতাপ সিং-এর মতো তিনিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতদিন ঝানগড় উদ্ধার না হবে শত্রুর হাত থেকে, ততদিন ঘুমোবেন মেঝেতে।

নৌশেরা ও ঝানগড় যেন দেউড়ির দুই গম্বুজ, দরজার দুই পাটি। হাতছাড়া হওয়ায় প্রতিপক্ষ পড়ল বিপাকে। পাকিস্তান থেকে রসদ, অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহের রাস্তাগুলি পড়ল ভারতীয় কামানের পাল্লায়। হলো ভারতীয় গোলন্দাজদের সহজ নিশানা। রঙের টেক্কার মতো ঝানগড়ের ছাউনি যার হাতে, তারই হবে জিৎ। তাই দূর থেকে হানাদারেরা মাঝে মাঝে বোমাবর্ষণ করতে লাগল ঝানগড়ের উপরে।

জুলাই মাসের আরম্ভ। সেদিন চার তারিখ। রাত্রিবেলা ঝানগড়ে শুরু হলো শত্রুর বোমাবৃষ্টি। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত—কোনো দিকেই রইল না ফাঁক। দুম্, দাম্, দড়াস্। মুহুর্মুহুঃ বোমা পড়তে লাগল ভারতীয় ছাউনীর উপরে। কালীপুজার রাত্রিতে শত শত উড়ন তুবড়ি আর হাউই বাজির মতো আকাশের বুকে খেলছে শুধু আগুনের হল্কা।

সকল সঙ্কটে নিজ সৈন্যের পাশে এসে দাঁড়ান ব্রিগেডিয়র ওসমান। সেদিনও সেই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে তিনি আসা যাওয়া করেছিলেন এক বাঙ্কার থেকে অন্য বাঙ্কারে। খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন সবাকার। এমন সময় একটা বোমা ফেটে পড়ল তাঁর সামনে। একেবারে গায়ে বললেই হয়।

ছাউনীর ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারীর দল করল প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু তাঁরা তো ওষুধ দিতে পারেন। প্রাণ দিতে পারেন না। রাত্রিশেষে আকাশের তারাগুলি যখন একে একে গেল নিবে, চাঁদ ঢাকা পড়ল পুংহল পাহাড়ের আড়ালে, তখন ভোরের স্নিগ্ধ মৃদু বাতাসে মিশে গেল ব্রিগেডিয়র ওসমানের শেষ নিঃশ্বাস। ঝানগড়ের ছাউনিতে কঠিন সৈনিকেরও চোখ হলো ছলোছল। খবর পেয়ে পাকিস্তানে উঠল আনন্দরোল। পেশোয়ারে হানাদারদের শিবিরে হলো দীপালি।

পুষ্পস্তবকে সাজিয়ে বীরের মৃতদেহ বিমানযোগে নিয়ে আসা হলো নয়া দিল্লীতে। সেখানে হিন্দু, শিখ, খৃস্টান, পারসিক ও মুসলমানেরা শ্রদ্ধাভরে ফুল ছড়িয়ে দিল শবাধারে। জাতীয় পতাকায় ঢেকে কামানের গাড়িতে হলো পূর্ণ

সামরিক সম্মানে শবযাত্রা। শবানুগমন করলেন স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর তিন সর্বাধিক্ষ ও অন্যান্য সেনানায়ক, মন্ত্রীসভার সমুদয় সদস্য ও প্রধান মন্ত্রী নেহরু। পথের দু'ধারে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল সকল সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র নরনারী।

স্বাধীন ভারতে এর আগে একমাত্র গান্ধীজীর শবযাত্রা ছাড়া আর কারো মৃত্যুতে দিল্লীতে পড়েনি এমন সর্বজনীন বিষাদের ছায়া। ঘটেনি এমন রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধানিবেদন।

বারো

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ভারতীয় বাহিনীর জয়রথ। তার চাকার তলায় পিষে চূর্ণ বিচূর্ণ হলো হানাদারদের অভিলাষ, পাকিস্তানের সাধ এবং ষড়যন্ত্র। মুক্ত হলো কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মুর বহু শত্রুকবলিত অঞ্চল। গায়ের জোরে কাশ্মীর দখলের পরিকল্পনা হলো বিফল। শ্রীনগরের রাজভবনে পাকিস্তানী নিশান তোলার স্বপ্ন আর সফল হলো না।

ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল কাশ্মীরে। ব্যবসা বাণিজ্য আবার চলতে লাগল হাটে বাজারে। আগের মতো স্কুল-কলেজে বসলো ক্লাশ, আপিস আদালতে শুরু হলো কাজকর্ম। ধীরে ধীরে আসতে লাগল বাইরে থেকে দেশ-ভ্রমণকারীর দল। গুলমার্গের গালিচার মতো নরম সবুজ ঘাসের চত্বরে দেখা দিল ক্যাডির কাঁধে গলফের ব্যাগ চাপিয়ে পুরু টুইডের প্লাসফোর্স-পরা প্রৌঢ়ের দল। বরফ-জমা পাহাড়ের গা বেয়ে 'শী' করার উদ্দেশ্যে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে খিলনমার্গের পথে রওনা হলো দুঃসাহসী তরুণ-তরুণীরা। ঝিলমের বুকে হাউসবোটগুলির বন্ধ ঝাঁপ খুলতে লাগল একে একে। শিকারায় কাঠের কারুকাজ, কাগজমণ্ডের সৌখীন কৌটা, আর বুটিদার শালের সওদা সাজিয়ে ফিরিওয়ালার দল ফিরতে লাগল বিদেশী যাত্রীদের দুয়ারে দুয়ারে।

রাজধানীর বিপদ কাটল। কিন্তু রাজার দিন ফুরিয়ে এল রাজত্বের। মহারাজা হরি সিং-এর সিংহাসনে পড়ল টান।

তেরো

রূপকথার রাজপুত্র রাজা হয়, মন্ত্রীপুত্র—সচিব, সওদাগরের ছেলে সপ্ত ডিঙায় সওদা সাজিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যায় বাণিজ্যে।

কাশ্মীরের অধিপতি হরি সিং কিন্তু রাজার পুত্র নয়,—ভ্রাতুষ্পুত্র। বুড়ো মহারাজ প্রতাপ সিং ছিলেন হরি সিং-এর জ্যাঠামশাই। নিজের ছেলে ছিল না। ভাইপোকে তিনি রাজত্ব দিয়ে গেলেন মরার পূর্ব মুহূর্তে। অনেকেই অবাক হয়েছিল।

অবাক হওয়ারই কথা। হরি সিং-এর বাপ অমর সিং ছিলেন মহারাজ প্রতাপ সিং-এর আপন সহোদর। শৈশবে এক মায়ের বুকের দুধ খেয়েছেন, একসঙ্গে করেছেন খেলা, সন্ধ্যাবেলায় একই আইমার কাছে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প শুনে ঘুমিয়ে পড়েছেন পাশাপাশি পালঙ্কে। কৈশোরে এক শিক্ষকের কাছে নিয়েছেন পাঠ, যৌবনে একত্র গিয়েছেন মৃগয়ায়। কিন্তু বড় হয়ে তিনিই হলেন বৈরী। সিংহাসনের লোভে ভাই-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াল ভাই। প্রতাপ সিংকে সরিয়ে নিজে রাজা হওয়ার চক্রান্ত করলেন অমর সিং। সে-কাহিনী জানতে হলে তাকাতে হবে অনেক পিছনে, একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে পুরানো ইতিহাসের ধুলো-জমা পাতায়।

সে প্রায় একশ বছর আগের কথা। পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং তখন শিখ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তার সৈন্যদলে ছিল এক তরুণ সেনানায়ক। ডোগরা রাজপুত গোলাব সিং। যেমন বীর তেমন চতুর। খুশি হয়ে মহারাজ রণজিৎ সিং তাঁকে দান করলেন জম্মু প্রদেশ। সেনাপতি গোলাব সিং হলেন রাজা গোলাব সিং।

ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল জম্মু রাজ্যের সীমানা। গোলাব সিং যোগ করলেন বালটিস্থান, জয় করলেন লাডাক। তাঁর তলোয়ার আর বুদ্ধি, দুই-ই সমান ধারালো। তাঁর বুঝতে দেরি হলো না যে, মোগলরাজ্যের দিন ফুরিয়েছে, আশা নেই শিখ সাম্রাজ্যের, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হবে ইংরেজ। ততদিনে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু ঘটেছে লাহোরে।

উদ্যোগী পুরুষকে সুযোগ দেন লক্ষ্মী, বুদ্ধিমানেরই সহায় হয় ভাগ্য। সীমান্ত যুদ্ধে বিব্রত হয়ে ইংরেজ সাহায্য চাইল গোলাব সিং-এর কাছে। রাজা ইংরেজ সৈন্যদলকে অকাতরে দিলেন অর্থ, দিলেন আহার, দিলেন আশ্রয়। চার বছর পরে ইংরেজ শিখ সৈন্য পরাজিত করে লাহোর দখল করল। অমৃতসরের সন্ধিসূত্রে প্রায় দু' কোটি টাকা দিয়ে রাজা গোলাব সিং পেলেন জম্মুর পাশাপাশি সমুদয় পাহাড়ী এলাকা। তার সীমানা সিন্ধু নদের পুব দিক থেকে রাবি নদীর পশ্চিম তীর অবধি বিস্তৃত। তার মধ্যে আছে কাশ্মীর আর গিলগিট।

গোলাব সিং নতুন রাজ্যের অধিকার পেলেন, কিন্তু দখল পেলেন না। কাশ্মীরের শাসনকর্তা শেখ ইমামুদ্দিন কাউকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। অবশেষে জম্মু থেকে রওনা হলো সৈন্যদল। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইমামুদ্দিন মানলো হার। কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন মহারাজা গোলাব সিং।

গোলাব সিং-এর মৃত্যুর পরে রাজা হলেন তাঁর পুত্র রণবীর সিং। বাপের ধারা বজায় রাখল ছেলে। বহুভাবে সাহায্য করলেন ইংরেজকে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈন্য পাঠিয়ে রক্ষা করলেন অনেক ইংরেজপ্রাণ।

কিন্তু দুর্দিনের বন্ধুকে সুদিনে মনে রাখা ইংরেজের স্বভাব নয়। বিপদ কেটে যেতেই ইংরেজ ভুলে গেল ডোগরা রাজবংশের উপকার। ততদিনে বড়লাট ও অন্যান্য ইংরেজ বড়কর্তারা জানতে পেরেছেন কাশ্মীরের সামরিক গুরুত্ব। বুঝেছেন, আফগান ও চীন এবং জারের রাশিয়াকে রুখতে হলে গিলগিটে রাখা চাই ইংরেজ ঘাঁটি। কাশ্মীর হাতছাড়া করে নিজের হাতে নিজেদের স্বার্থ হানি করেছেন,—একথা ভেবে তাঁদের আপসোসের আর শেষ রইল না।

তখন শুরু হলো নানা কূটকৌশল। নানা ছলে ইংরেজ নিজ কর্তৃত্ব বহাল করতে চাইল কাশ্মীরে।

রণবীর সিং-এর বড় ছেলে প্রতাপ সিং নেহাতই নিরীহ মানুষ। রাজা হয়েও জপ, তপ, পুজো-অর্চনা নিয়েই সময় কাটান বেশী! সুযোগ পেয়ে ইংরেজ কাশ্মীরে বসালেন এক রেসিডেন্সী, মানে—নিজেদের এক খবরদারি-আপিস। তার কর্তা হয়ে এলেন স্যার অলিভার সেন্ট জন্—কাশ্মীরের প্রথম রেসিডেন্ট।

কথামালার উট জানতো, জানলা দিয়ে একবার নাক গলাতে পারলে আস্তে আস্তে গোটা ঘরটা দখল করতে দেরি হয় না। সে কৌশল ইংরেজ রেসিডেন্টদের অজানা ছিল না। বিশেষ করে রেসিডেন্ট প্লোডেন লোকটা ছিল যেমন খল, তেমনি ধড়িবাজ। সে মহারাজের দরবারের কাউকে দেখাল লোভ, কাউকে দেখাল ভয়। দু'হাতে ঘুষ দিয়ে একে একে হাত করলে কর্মচারীদের অনেককে। মহারাজার রাজস্বমন্ত্রী গোপনে যোগ দিল প্লোডেনের দলে।

একদিন সকালবেলা মহারাজ প্রতাপ সিং আহ্নিকে বসেছেন। এমন সময় ছোট ভাই অমর সিং এসে বললেন, "দাদা, বাইরে এস ; জরুরী কথা আছে।"

পুজোর আসনে বসে কথা বলা চলে না। মহারাজ ইসারা করে বোঝালেন, আহ্নিক শেষ হতে তখনও কিছু বাকি।

অমর সিং চড়া মেজাজে বললেন, "নিকুচি করেছে তোমার আহ্নিক। পারো তো, আগে রাজ্য সামলাও, পরে করো পুজো-পার্বণ। নিজের মাথা বাঁচাতে পারলে ঠাকুর দেবতার মাথায় গঙ্গাজল ঢেলো ঘটি ঘটি।"

মহারাজ ব্যস্ত হয়ে ঠাকুর দালানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী ?"

অমর সিং বললেন, "এখানে নয়। চল শোবার ঘরে।" সাবধানে সমস্ত দোর জানলা বন্ধ করে চুপি চুপি অমর সিং দিলেন সংবাদ। নিদারুণ দুঃসংবাদ।

ইংরেজ রেসিডেন্টের হাতে ধরা পড়েছে অনেকগুলি গুপ্ত চিঠি। সমস্তই মহারাজ প্রতাপ সিং-এর নিজ হাতে লেখা। রাশিয়ার সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন তিনি। রেসিডেন্ট প্লোডেনকেও গোপনে হত্যা করার চেষ্টায় আছেন মহারাজ।

শুনে মহারাজার দুই চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বললেন, "এ শুধু মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমাকে রাজ্যচ্যুত করার চক্রান্ত।"

অমর সিং বললেন, "চক্রান্ত ?"

মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ তাই, আর সে চক্রান্তে আছ তুমি।" ছোট ভাই-এর দুই হাত ধরে মহারাজ কাতরভাবে অনুনয় করলেন, "ভাই তুমি কাশ্মীরের গদিতে বসতে চাও, আমি জানি। কিন্তু এমন অধর্ম ভগবান সইবেন না, এমন কাজ করো না।"

অমর সিং আমতা আমতা করে বললেন, "আমি—ইয়ে—চক্রান্ত—সে কি কথা—মানে—!" তাঁর মুখে আর কথা যোগাল না। তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন মহারাজার সুমুখ থেকে।

মহারাজার বুঝতে বাকি রইলো না যে, রেসিডেন্ট প্লোডেন ও ভাই অমর সিং মিলে তাঁর চার দিকে জাল পেতেছে—বিষম ফাঁদ। কিন্তু কি করে পরিত্রাণ পাবেন

ভেবে না পেয়ে ফাঁদে আটকে-পড়া শিকারের মতোই তিনি অসহায়ভাবে শুধু ছটফট করতে লাগলেন। অবশেষে মহারাণীকে বললেন, নিজের ভাই যখন শত্রু হয়েছে তাঁর, তখন পরিত্রাণের চেষ্টায় আর কী ফল ? অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক।

সেদিন থেকে অন্ন-জল ত্যাগ করলেন প্রতাপ সিং।

রেসিডেণ্ট তৈরী করল এক 'ইরসাদ'। তাতে লেখা, মহারাজ প্রতাপ সিং স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করছেন। রাজ্য সুশাসনের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট যেন ব্যবস্থা করেন অবিলম্বে।

মহারাজ প্রথমে অস্বীকার করলেন সে চিঠিতে সহি করতে। কিন্তু অমর সিং ভয় দেখাতে লাগলেন অবিরত। শেষকালে তিন দিন উপবাসে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নিরুপায় প্রতাপ সিং দিলেন দস্তখত। নিজ হাতে স্বাক্ষর করলেন নিজের বরখাস্ত পরোয়ানায়।

রাজ্য শাসনের ভার নিল এক নতুন মন্ত্রণা পরিষদ। সে পরিষদের সভাপতি হিসাবে তার প্রকাশ্য প্রধান হলেন রাজা অমর সিং। অপ্রকাশ্য কর্তা রইলেন অবশ্য রেসিডেণ্ট প্লোডেন। গিলগিটে দুর্গ তৈরী হলো ইংরেজের। তাতে কামান, বন্দুক নিয়ে জাঁকিয়ে বসলো ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট,—গোরা সৈন্যদল।

নিজের রাজ্যে নিজ রাজপ্রাসাদের এক কোণে প্রায় বন্দী হয়ে রইলেন অক্ষম, অসহায়, অবজ্ঞাত, গদিচ্যুত মহারাজ। প্রতাপহীন প্রতাপ সিং।

নিরাশায় নিরানন্দে, তাঁর দিনগুলি মনে হয় দীর্ঘ। মাসের বুঝি শেষ নেই, বছর যেন সংখ্যাহীন, অনাদি অনন্ত। অবশেষে মরীয়া হয়ে মহারাজ নিজ হাতে এক চিঠি লিখলেন বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের কাছে ! সে পত্রের ভাষা অনিপুণ, রচনা অপটু, কিন্তু ভাব সরল ও সুস্পষ্ট। তিনি বললেন, রাশিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কথা আগাগোড়া মিথ্যা। রেসিডেণ্ট যে চিঠিগুলি দেখিয়েছেন, সেগুলি সমস্তই জাল। হয় মহারাজকে তাঁর নিজের সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হোক, নয় তো বুকের মাঝখানে গুলী করে তাঁকে হত্যা করা হোক। এমন অপমানিত লাঞ্ছিত জীবন আর তিনি সইতে পারছেন না।

হঠাৎ একদিন কলকাতার এক খবরের কাগজে বেরুলো এক সরকারী দলিলের হুবহু নকল। তাতে প্রকাশ হয়ে গেল কাশ্মীরে ইংরেজের কীর্তিকাহিনী, রেসিডেণ্ট প্লোডেনের কারসাজি। পার্লমেণ্টে উঠল তরঙ্গ। উদারনৈতিক সদস্য চার্লস ব্র্যাডলো মহারাজের পক্ষ নিলেন। উইলিয়ম ডিগবী ছিলেন সেকালের একজন ন্যায়নিষ্ঠ ইংরেজ। তিনি মহারাজার প্রতি অবিচারের নিন্দা করলেন জোরালো ভাষায়। অগত্যা ভারত সরকার মহারাজকে তাঁর শাসনভার ফিরিয়ে দিলেন। পনেরো বছর পরে আবার কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন মহারাজ প্রতাপ সিং।

তারপরে আরও কুড়ি বছর বেঁচেছিলেন তিনি। তাঁর আগেই অমর সিং মারা গেলেন। যুবক হরি সিং হলেন মহারাজের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য।

প্রতাপ সিং-এর পাটরাণী বললেন, পুষ্যিপুত্র নেব আমি। আর যাই হোক, বিশ্বাসঘাতক অমর সিং-এর ছেলেকে বসতে দেব না সিংহাসনে।

প্রতাপ সিং কিন্তু চুপ করে থাকেন। তাঁর মনের কথা কেউ জানতে পায় না।

ক্রমে মহারাজের চুলে ধরল পাক, চোখে পড়ল ছানি। বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হয়ে বাধল বিষম ব্যাধি। শয্যা নিলেন তিনি। রাজবৈদ্য এসে নাড়ী দেখেন দুবেলা,

চরক ও সুশ্রুতের শ্লোক আউড়ে বড়ি ব্যবস্থা করেন নানা রঙের, ত্রিফলার জল আর মধু দিয়ে মেড়ে খাওয়ানো হয় প্রহরে প্রহরে।

বৃথা। মহারাজের রোগের উপশম নেই। প্রতাপ সিং বুঝলেন, তার অন্তিমকাল আসন্ন। পাত্র মিত্র, সভাসদদের ডাকলেন কাছে। ভ্রাতুষ্পুত্র হরি সিং-এর মাথায় হাত রেখে বললেন, "সবাই জেনে রাখো এই আমার উত্তরাধিকারী, জম্মু ও কাশ্মীরের ভাবী অধীশ্বর।"

মহারাণী ছিলেন পাশে।—তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "হায়, কি করলে মহারাজ ? শেষকালে অমর সিং-এর ছেলেকেই দিলে রাজ্যভার !"

সে প্রশ্নের জবাব মিলল না। প্রতাপ সিং ততক্ষণে চোখ বুঝেছেন। সে চোখ আর খোলেননি।

সিংহাসনে বসে মহারাজ হরি সিং প্রথমে মন দিলেন প্রজার কল্যাণে। রাজ্যের বড় চাকরিগুলি যাতে বিদেশীরা না দখল করে সেজন্য করলেন আইন, কর্মচারীরা যাতে কাজে ফাঁকি না দেয় সেদিকে রাখলেন কড়া নজর। গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বচক্ষে দেখতে লাগলেন চাষী মজুরদের অবস্থা। ঝিলমে বান এলে শিকারা নিয়ে নিজে উদ্ধার করতে লাগলেন বন্যার এলাকা থেকে বিপন্ন নরনারীর দল। বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে বক্তৃতা দিলেন,—ভারতবর্ষের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত ভারতীয়দেরই হাতে। একজন দেশীয় রাজার মুখে এমন কথা এর আগে কেউ কখনও শোনেনি।

ইংরেজ গভর্নমেন্ট খুশি হলেন না। কাশ্মীরে পুরোপুরি ইংরেজ কর্তৃত্ব না থাকায় তাঁরা তুষ্ট ছিলেন না। এখন রুষ্ট হলেন। কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলেন তাঁরা।

উপায় ছিল সহজ। কাশ্মীরের প্রজারা অজ্ঞ মুসলমান। তাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি উস্কে দিতে কতক্ষণ ? ওয়েক ফল্ড নামে এক ইংরেজ ছিল মহারাজ হরি সিং-এর মন্ত্রী। তারই মারফতে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা হলো কাশ্মীর ও জম্মুতে। রাজ্যের বাইরে থেকে সে অসন্তোষের আগুনে যোগান হলো প্রচুর ইন্ধন। মুসলমানদের নির্যাতন করছে হিন্দু মহারাজ আর তার হিন্দু কর্মচারীরা,—এই বলে চেঁচাতে লাগল পাঞ্জাবের অহ্‌রার আর আহম্মদীয়া দলের নামজাদা সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরা আর তাদের দলের উর্দু খবরের কাগজগুলি।

লাহোরের দৈনিক শিয়াশৎ পত্রিকা খোলাখুলি কাশ্মীরী মুসলমানদের কাছে জানাল আবেদন,—আল্লার নামে, শপথ নিয়ে তারা জান কবুল করুক। ইসলামের মান রাখতে তারা কোতল করুক দুশমনদের, সাবাড় করুক বিধর্মী সরকার। পত্রিকার হাজার হাজার সংখ্যা রোজ বিনামূল্যে হলো বিতরণ শ্রীনগর, সপুর, বিজবিহারা ও অন্যান্য শহরে। গুপ্তচর পুস্তিকা "কাশ্মীরী মজলুস" আর "মকতাব কাশ্মীর" ছড়িয়ে পড়ল হাটে বাজারে, মজলিসে, মসজিদে। সুদূর পাড়াগাঁয়ের মক্তব মাদ্রাসার মুসলীম ছাত্রমহলে। আসতে লাগল অসংখ্য, কখনও ডাকে, কখনও বা হাতে হাতে। সেগুলির ছাপার কালি লাল, লেখার ভাষা হিংস্র। পড়লে নেহাত শান্ত মানুষেরও রক্ত তেতে ওঠে, মাথায় চাপে খুন।

রাজ্যের ভিতরে আন্দোলনের নেতা হলেন এক তরুণ শিক্ষিত মুসলমান। তাঁর নাম—শেখ মহম্মদ আবদুল্লা।

চৌদ্দ

কাশ্মীরের এক সাধারণ গৃহস্থ ঘরে জন্ম হয়েছে শেখ আবদুল্লার। তাঁর বাপ তৈরী করতেন পশমী শাল। মা রান্না করতেন, ঘর নিকোতেন, বিকালে হাটে বেচার জন্যে উদুখলে কুটতেন শালীধানের চিড়া। স্কুলের পাঠ সাঙ্গ হলে আবদুল্লা কলেজে পড়তে যান লাহোরে। সেখান থেকে আলীগড়।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানে বিরোধের বীজ বুনেছে ইংরেজ। তার জমি তৈরী হয়েছে আলীগড়ে। আলীগড় মুসলীম কলেজের সাহেব অধ্যক্ষ মিস্টার বেক আর থিওডর মরিসন সে মাটিতে যুগিয়েছেন সার ও জল। যত্নে বাড়িয়ে তুলেছেন সাম্প্রদায়িক হিংসার চারা গাছ। সরকারী উৎসাহ আর উস্কানির আলো হাওয়ায় শাখা প্রশাখা মেলে পরে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিরাট বিষবৃক্ষ। সর্বাঙ্গে তার কাঁটা। সে গাছের ছায়াতে বসে যে নিয়েছে পাঠ, সেখানকার ঘাসের উপরে যে চলেছে পথ, সেখানকার বাতাস থেকে যে নিয়েছে নিঃশ্বাস সে কি হবে সাক্ষাত প্রেমাবতার? মরুর দেশে ফুটবে কি নাগ কেশরের ফুল। আলীগড়ের ছাত্র শেখ আবদুল্লা যে কাশ্মীরে ফিরে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলবেন হিন্দু বিদ্বেষে তাতে আর আশ্চর্য কী?

তিনি প্রথমে ফতেকদলে স্থাপন করলেন এক মুসলীম পাঠাগার। সেখানে রোজ সন্ধ্যায় যে সব তরুণ পড়তে আসত তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ। শ্রীনগরের শাহহামদানের মসজিদে জুম্মার নামাজে বড় জমায়েত হয়। তাতে দিতে লাগলেন উত্তেজক বক্তৃতা। অজ্ঞ মুসলীম জনসাধারণ মোল্লাদের কথায় ওঠে বসে। চতুর আবদুল্লা শ্রীনগরের প্রধান মীরওয়েজ মৌলানা ইউসুফ শাহকে দলে টানলেন। তাঁর ফতোয়া হাতে নিয়ে গ্রামে গ্রামে গড়ে তুললেন নিজ সমর্থকের সংঘ।

কাশ্মীরের রাজকর্মচারীদের মধ্যেও অনেকে ছিল বুদ্ধিহীন। তাদের হঠকারীতায় মুসলীম জনগণের বিক্ষোভ ক্রমেই বেড়ে চলল।

এই সময়ে হরি সিং-এর ঘটল মতিভ্রম। খ্রীষ্টানরা বললেন, ভগবান যাকে মারতে চান, আগের ভাগে তার বুদ্ধি দেন গুলিয়ে। মহারাজ রাজ্যশাসনের বদলে মাতলেন প্রমোদ ভ্রমণে। রাজকার্য গেল চুলোয়, প্রজাহিতের কথা তোলা রইল শিকায়। আজ লন্ডন, কাল প্যারিস, পরশু রিভিয়ারায় কাটে তাঁর দিন। সেখানে তাঁর কীর্তি কলাপ মাঝে মাঝে প্রায় কেলেংকারির কোঠায় গিয়ে ঠেকে। বিদেশে বিলাস বাসনের সহস্র ছিদ্রপথে দ্রুত শূন্য হয়ে আসে রাজকোষের সুবর্ণ ঝারিটি। তলানি সামান্য যেটুকু থাকে সেটুকুও লাগে আমলা গোমস্তার ভোগে। তখন তারা টাকার তাগিদে দরিদ্র প্রজার গলায় ট্যাক্সের ফাঁসে আরও কষে লাগান টান।

ফল ফলতেও দেরী হলো না। অতি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করেই ঘটলো বিপর্যয়। বারুদস্তূপে একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গই তো বৃহৎ বিস্ফোরণের পক্ষে যথেষ্ট।

ইংরেজী উনিশ শ একত্রিশ সাল। মে মাসের মাঝামাঝি। জম্মুর পুলিশ ব্যারাকে সেদিন একজন মুসলমান পুলিশ কাজে হাজির হয়নি। তার উপরওয়ালা,—লাভরাম

হিন্দু। কাশ্মীরী পণ্ডিত। তিনি এসে দেখেন, লোকটা বিছানায় শুয়ে দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে। শাসন করতে গেলে সে উল্টে লাভরামকেই গাল মন্দ শুরু করল। রাগে লাভরাম পুলিশের বিছানাটা টান মেরে ফেলে দিলেন ঘরের মেঝেতে। বালিশের তলায় ছিল পবিত্র কোরানশরীফের কয়েকটি পৃষ্ঠা, তা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

কী! এত বড় স্পর্ধা। কাফেরের হাতে কোরানের হতাদর? বিধর্মী করে ইসলামের অপমান? ফতেকদলের পাঠাগারে গর্জে উঠল শেখ আবদুল্লা আর তাঁর সমস্ত দলবল। জম্মু ও কাশ্মীরে যেখানে যত মুসলমান ছিল তাদের সবার কানে পৌঁছে দিল তারা এই খবর। ধূমায়িত অসন্তোষের অগ্নিতে পড়ল ঘৃতাহুতি।

গভর্নমেণ্ট বুঝলেন ব্যাপার গুরুতর। তাঁর মন্ত্রিসভার এক সদস্যকে দিলেন তদন্তের ভার। সাক্ষ্য প্রমাণে বোঝা গেল লাভরামের দোষ নেই। বিছানার ভিতরে যে ছিল ধর্মগ্রন্থ তা তার জানা ছিল না। তবুও মুসলীম সম্প্রদায়কে খুশি করতে লাভরামকে দেওয়া হলো চাকরি থেকে অবসর। অবাধ্যতার অপরাধে অবশ্য মুসলীম পুলিশটিকে করা হলো বরখাস্ত।

মুসলীম জনমত শান্ত হলো না। শেখ আবদুল্লা এক সভা ডাকলেন শ্রীনগরে খান কোয়াইমুল্লার চত্বরে। সেখানে হাজার হাজার উত্তেজিত মুসলমানের কাছে হিন্দু মহারাজ তাঁর হিন্দু কর্মচারী ও হিন্দু প্রজাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বক্তৃতা দিল এক পাঠান। নাম আবদুল কাদের। লোকটা এক ইংরেজের রাঁধুনি—বাবুর্চী। মনিবের সঙ্গে সদ্য এসেছে শ্রীনগরে। গভর্নমেণ্ট সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করলেন।

তেরোই জুলাই শ্রীনগর সেণ্ট্রাল জেলে আবদুল কাদেরের বিচারের দিন। সকাল থেকেই জেলের দরজায় জড় হতে লাগল জনতা। দলে দলে মুসলমান ছোট বড় শোভাযাত্রায় পৌঁছল এসে নানা অঞ্চল থেকে। তারা চেঁচাতে লাগলো, আবদুল কাদের শহিদ। তাদের মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারে কাঁপতে লাগল জেলখানার দরজা জানলা।

অবশেষে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো বিক্ষোভকারীর দল ঢুকে পড়ল জেলের আঙিনায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর তার সহকর্মীরাও চরম নিবুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। জনতাকে বুঝিয়ে শান্ত করার কিছুমাত্র চেষ্টা না করেই করলেন গুলী-বর্ষণ। নিহত হলো জন দশেক, আহত ততোধিক।

কোথাও আর কোনো মাত্রা রইল না। মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করে বিপুল জনতা রওনা হলো গোরস্থানে। দশ হাজার ক্রুদ্ধ মুসলমানের শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে ছিলেন পাঠাগারের নেতারা। তাদের হাতে আহতদের রক্তমাখা জামা কাপড়ে তৈরী বৃহৎ পতাকা। মুখে মহারাজার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ধ্বনি। শোভাযাত্রা তো নয় যেন আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত তপ্ত লাভার স্রোত।

প্রধান রাজপথ দিয়ে জনস্রোত এসে পৌঁছলো মহারাজগঞ্জের বাজারে। সেটা রাজধানীর সবচেয়ে বড় ব্যবসায় অঞ্চল। মুহূর্তে উত্তেজিত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল পথচারী হিন্দু স্ত্রী পুরুষের উপর। শ্রীনগরে শুরু হলো ভয়াবহ দাঙ্গা। দেখতে দেখতে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ল বিচরনগ এবং শহরের আরও অন্যান্য এলাকায়।

হিন্দু দোকান পসার হলো লুট, হিন্দু বাড়ি-ঘর হলো পুড়ে ছাই। তিনজন

হলো খুন, একশ' তেষট্টি জন জখম। দাঙ্গাকারীরা থানা করল তছনছ, টেলিফোনের লাইন করল খান্‌খান্‌।

ওয়েকফিল্ড তখন কাশ্মীরের দেওয়ান। দাঙ্গার সময়ে তিনি হলেন নিখোঁজ। ক্রিং ক্রিং শব্দে মুহুর্মুহুঃ টেলিফোন বাজছে তাঁর বাংলোতে। ভয়ার্ত হিন্দুরা জানাচ্ছেন ধন, প্রাণ, মর্যাদা রক্ষার কাতর আবেদন। পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারী কর্মচারীরা চাইছে নির্দেশ। ওয়েকফিল্ডের বেয়ারা টেলিফোন ধরে কেবলি বলছে, "সাহেব কোঠিমে নেহি হৈ"।

কখন ফিরে আসবে?

তা সে জানে না, "নেহি মালুম"।

শেষটায় ছাউনি থেকে মহারাজার সৈন্যদল এসে গুলী করে থামালো দাঙ্গাহাঙ্গামা, শান্তি ফিরিয়ে আনলো শহরে।

গভীর রাত্রে দেওয়ান দিলেন দেখা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "য়্যাঁ, দাঙ্গা হয়েছে না কি? কী আস্পর্ধা! বদমাশদের শায়েস্তা করছি এখুনি। ডাকাত ব্যাটাদের আগে পাঠাবো জেলে, ফাঁসিতে লটকাবো তারপর—।" বলতে লাগলেন ওয়েকফিল্ড।

আসল ব্যাপার বুঝতে বাকী রইল না মহারাজের। তিনি আবদুল্লা আর তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করে আটক করলেন হরি পর্বতের গারদে। ওয়েকফিল্ডকে করলেন বরখাস্ত। তাড়িয়ে দিলেন অপদার্থ অকর্মণ্য অনেক কর্মচারীকে। শক্ত হাতে দমন করলেন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। রাজ্যে বিশৃংখলার অজুহাতে মহারাজকে সরিয়ে কাশ্মীরের কর্তৃত্ব হাতে নেওয়ার যে চক্রান্ত ছিল ইংরেজের, তা সফল হলো না।

পনেরো

কয়েক বছর পরের কথা।

শেখ আবদুল্লা গিয়েছিলেন পেশোয়ারে। সেখানে দেখেন এক বিরাট জনসভা। প্রায় লক্ষাধিক শ্রোতা। দীর্ঘদেহ পাঠানরা অধীর আগ্রহে শুনছে বক্তৃতা। কৌতূহলে আবদুল্লা এগিয়ে গেলেন কাছে।

মঞ্চের উপরে শুভ্র খদ্দরের টুপি মাথায় বক্তা নাতিদীর্ঘ ঋজুদেহ, উন্নতনাসা গৌরকান্তি পুরুষ। ললাটে বুদ্ধির দীপ্তি, চক্ষে সাহসের বহ্নি, চিবুকে কাঠিন্যের ইঙ্গিত। কণ্ঠে তীব্রতা নেই অথচ দৃঢ়তা আছে। যেন ঝকঝকে ইস্পাতের তলোয়ার। ব্যক্তিটি কে?

বক্তা আর কেউ নন—কংগ্রেস-নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সভা শেষ হলে শ্রোতারা জয়ধ্বনি করতে করতে নেহরুকে ভক্তের মতো ঘিরে ধরলো চারদিকে।

শেখ আবদুল্লা অবাক হলেন। তাই তো, হিন্দু নেহরু মুসলমান পাঠানদের এমন মন জয় করলেন কেমন করে? কী তাঁর কৌশল? কোথায় তাঁর আকর্ষণ? গেলেন নেহরুর কাছে। একবার নয়, দু'বার নয়, অনেকবার অনেক কথা বললেন।

অনেক কথা শুনলেন। জানতে পারলেন ভারতে জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস, কংগ্রেস আন্দোলনের ধারা।

আবদুল্লা নেহেরুকে জানালেন কাশ্মীরে মুসলীম চাষী মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা। হিন্দু মহারাজ তাদের শোষণ করছেন।

নেহরু বললেন, চাষীরা গরীব বলেই দুঃস্থ, মুসলমান বলে নয়। সরকার হৃদয়হীন, তার কারণ এ নয় যে, তাঁরা হিন্দু বা ডোগরা, তার কারণ তাঁরা স্বৈরাচারী।

আবদুল্লার চোখ খুলল।

পেশোয়ার থেকে ফেরার পথে আরও একটি ঘটনা ঘটল। কাশ্মীরের এক আপেল বাগানের মধ্য দিয়ে আসছিলেন আবদুল্লা। বাগানের মালিক এক ধনী মুসলমান। নিজে দাঁড়িয়ে ফল পাড়াচ্ছিলেন। মজুরেরা হিন্দু। গাছের কোনোখানে একটি ফলও যাতে রয়ে না যায় সেদিকে মালিকের কড়া দৃষ্টি। তাঁর তাড়ায় মজুরেরা ক্রমশঃ নীচের ডাল থেকে উঠছিল উঁচু ডালে। মানুষের ভারে গাছের শাখাগুলি এমন ঝুঁকে পড়ছে যে, আবদুল্লার ভয় হলো, কখন বুঝি বা—কড়্ড়-কড়াৎ—'বুঝি বা' নয়, সত্যি সত্যিই একটা গাছের সরু আগ ডাল ভেঙ্গে পড়ল মাটিতে। বছর কুড়ি বয়সের একটি মজুর ধপাস শব্দে হলো ধরাশায়ী।

হা হা করে মালিক ছুটে এলেন। বসিয়ে দিলেন শপাং শপাং করে কয়েক ঘা বেত। মরার উপর খাঁড়ার ঘা। গর্জন করতে লাগলেন। উল্লুক কোথাকার, গাছের একটা ফলন্ত ডাল ভেঙ্গে ফেললে! হায় হায়, কত টাকা লোকসান হলো। হতভাগার মজুরি কেটে নিতে হবে সবটা। তাতেই বা ক্ষতি পূরণ হবে কতটুকু? ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবদুল্লা ও আর পাঁচজন মিলে কোনো মতে মাটি থেকে তুললেন আহত অচৈতন্য মজুরকে। নিয়ে যাওয়া হলো তার বাড়িতে। সেখানে আবদুল্লা দেখলেন, ঠিক একই দুঃখ, কষ্ট, একই অভাব অনটন যা এতকাল দেখেছেন মুসলীম শাল কারিগরদের বাড়িতে। নেহরুর কথা মনে পড়ল, জনগণের যে দুর্দশা তার মূলে ধর্ম নয়,—অর্থ।

বদলে গেল শেখ আবদুল্লার দৃষ্টিভঙ্গি, বদলে গেল তাঁর মত। বদলে গেলেন তিনি নিজে। যেন তাঁর নবজন্মলাভ।

সেবার শহরে কী নিয়ে যেন হিন্দু-মুসলমানে বাধলো এক বিতর্ক। তর্ক থেকে কলহ। কলহ থেকে ক্রোধ। তার পরেই দুই পক্ষে ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি। হিন্দুদের বিপদ বেশী। সংখ্যায় তারা নগণ্য। এক ঘর হিন্দুবাড়ি ঘিরে বাস করে দশ ঘর মুসলমান।

ঝিলমের দু'নম্বর পুলের পাশে একটি ছোট হিন্দু মেয়ে জ্বরে মরে পড়ে ছিল দু'দিন। তার সৎকারের উপায় নেই। ভয়ে হিন্দুরা ঘরের বাইরে বেরোয় না। নিজেদের হাটবাজারে যাওয়া বন্ধ। শব নিয়ে শ্মশানে যাবে কে? মড়া পোড়াতে গিয়ে নিজেরা মারা পড়বে নাকি? প্রাণহীন মেয়ে কোলে নিয়ে মা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন রাত্রি দিন।

শুনতে পেয়ে শেখ আবদুল্লা গেলেন সেই বাড়িতে। দু'হাতে তুলে নিয়ে এলেন ছোট্ট মেয়েটির মৃতদেহ। ঝিলমের স্রোতে নিজ হাতে শিকারা বেয়ে নিয়ে চললেন

শ্মশানে। নদীর দুই তীরে শত শত মুসলমান চলল শিকারার পিছনে। তারা ধিক্কার দিতে লাগল, "ছিঃ ছিঃ, কাফেরের মড়া পোড়াতে যাচ্ছে আবদুল্লা! শেষ কালে শেখ হলো কাভোগ!"

কাভোগ মানে ডোম।

আবদুল্লা চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, "ধেৎ, মড়ার কী কোনো জাত থাকে রে, বোকার দল?"

সেই থেকে শেখ আবদুল্লা হলেন এক নতুন মানুষ! সকল সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে তিনি গড়লেন নতুন সমিতি। মুসলীম কনফারেন্স ভেঙ্গে হলো ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। বৃদ্ধ শিখ সর্দার বুধ সিং তার সভাপতি, তরুণ ব্রাহ্মণ প্রেমনাথ বাজাজ তার কর্মকর্তা, মুসলমান শেখ মহম্মদ আবদুল্লা তার অধিনায়ক।

জনগণকে নিয়ে কাশ্মীরে শুরু হলো গণ-আন্দোলন। এতকাল যিনি ছিলেন মুসলীম নেতা এখন তিনি হলেন গণনায়ক। হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি করল তাঁর "শের-ই-কাশ্মীর জিন্দাবাদ।" কাশ্মীরের ঘরে ঘরে সহস্র সহস্র অজ্ঞ, অন্ধ ও অসহায় নরনারীর কাছে তিনি আনলেন নবীন অরুণালোক। বঞ্চিত, লাঞ্ছিতকে তিনি দিলেন অভয় ও আশ্বাস। দিলেন বর্তমানের মন্ত্র ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন। মৃতের দেশে তিনি নব ভাব-গঙ্গার ভগীরথ।

ষোলো

কুক্ষণে মহারাজ হরি সিং-এর প্রধান মন্ত্রী হলেন রামচন্দ্র কাক। কাশ্মীরী পণ্ডিত। লোকটা সুচতুর। গোড়াতে শ্রীনগরের প্রতাপ সিং কলেজে লাইব্রেরীর কেরানী ছিলেন কুড়ি টাকা বেতনে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে হয়েছেন সরকারী দপ্তরের নানা বিভাগের কর্তা, আইন সভার সভ্য, মন্ত্রী সভার সদস্য, সবশেষে দেওয়ান। রাজকার্যে তাঁর কড়া দৃষ্টি ছিল, কিন্তু রাজনীতিতে দূরদৃষ্টি ছিল না। কংগ্রেসকে তিনি করলেন মহারাজের শত্রু। তারই হুকুমে কাশ্মীর রাজ্যে গ্রেপ্তার হলেন পণ্ডিত নেহরু। চিরকালের মতো বিরোধ ঘটে রইল কাশ্মীরের মহারাজ আর ভারতবর্ষের ভাবী প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে।

দুর্ভাগ্য আর গরুর গাড়ি, আসে যখন ভিড় করে আসে। শ্রীনগরের পথে একদিন দেখা দিল এক সন্ন্যাসী। স্বামী সন্তদেব। কেউ বলে তাঁর বয়স দু'শ' বছর, কেউ বলে পাঁচশ'। হিমালয়ের গুহায় বসে তপস্যা করেছেন এতদিন। ভক্তরা রটনা করল স্বামীজী সিদ্ধপুরুষ। ভুত, ভবিষ্যৎ কিছু নেই তাঁর অজানা। শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারেন মানুষের পূর্বজন্মের অজ্ঞাত ইতিহাস, আর পর জন্মের আগাম কাহিনী।

ক্রমে তাঁর খ্যাতি পেঁছিল মহারাজারও কানে। স্বামীজীর ডাক পড়ল রাজপ্রাসাদে। সেখানে সন্তদেব দেবতার মতোই আসন পাকা করে বসলেন দু'দিনে।

সন্ন্যাসী মহারাজকে বললেন, "ইংরেজ চলে যাচ্ছে ভারতবর্ষ ছেড়ে। তোমার

ললাটে দেখছি রাজ্য ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট সামুদ্রিক লিখন। ইংরেজী 'এল্' অক্ষরের মতো। কোন শব্দের আদ্যে আছে 'এল্'? লাহোর এবং লাডাক। কুছ ফিকির নেই, মহারাজ, হনুমানজী কি কৃপাসে লাহোর থেকে লাডাক রাজ্য হবে তোমার।

গুরুজীর অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস হলো হরি সিং-এর।

সেদিন থেকে হরি সিং-এর কাল হলো দুই,—কাক আর সন্তদেব। যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা, ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত। মন্ত্রী দেয় দুর্বুদ্ধি, গুরু দেয় দুরাশা। সর্বনাশের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেন মহারাজ। অন্য সব দেশীয় রাজারা যখন একে একে যোগ দিচ্ছেন ভারত সরকারের সঙ্গে, তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের মাঝখানে এক বিস্তীর্ণ স্বাধীন সাম্রাজ্যের। লাহোর থেকে লাডাক। ইংরেজী 'এল' আছে তাঁর ললাটে! হুঃ, সে কি আর অমনি?

নদীর জোয়ারের মতো সংসারে সুযোগ আর সময়ও বসে থাকে না কারো জন্যে। মহাকালের কাছে মহারাজারও খাতির নেই। দিন আর মাস বয়ে গেল হেলায়। স্বপ্নভঙ্গে হরি সিং যখন চোখ মেললেন, রাজধানীও তখন যায় যায়, রাজ্যপাট টলমলো। অগত্যা প্রাণের দায়ে পাকিস্তানী হানাদার ঠেকাতে ধরনা দিতে হলো ভারত সরকারেরই কাছে। প্রধান মন্ত্রী নেহরু বললেন, সৈন্য তিনি পাঠাবেন। কিন্তু মহারাজের পিছনে চাই জনমতের সমর্থন।

আগের কালের রাজারা তাঁদের আপন খেয়ালে রাজ্য চালাতেন। রেগে কারো নিতেন শির, কাউকে চড়াতেন শূলে। খুশিতে কাউকে দিতেন ধন-দৌলত, কাউকে বানাতেন সভাসদ। রাজকন্যাসহ অর্ধেক রাজত্ব দান করতেন ইচ্ছামতো। তখন প্রজা শুধু চোখ বুজে খাজনা যোগাত, মুখ বুজে দুঃখ সইত। পাইক পেয়াদার পকেট পুরিয়ে খালি পেটে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলতো, "রাজ্যেশ্বরো জগদীশ্বরো বা।"

সেদিন আর নেই। প্রজা ফেলবে কড়ি, রাজা মাখবে তেল—এ রীতি একালে অচল। এখন দেশের লোক চায় দেশ শাসনের ভার। রাজাকে রাজ্য চালাতে হয় প্রজার পরামর্শ শুনে। নেহরু বললেন, জননেতাকে দিতে হবে কাশ্মীরের জনশাসনের ভার।

তথাস্তু। আবদুল্লা হলেন কাশ্মীর শাসন ব্যবস্থার সাময়িক অধিকর্তা,—হেড অব য়্যাডমিনিস্ট্রেশান।

রাজ্য সরকারের মাথা হয়েই কিন্তু আবদুল্লার মাথা গেল ঘুরে।

আসলে আবদুল্লা লোকটার নিজস্ব কোনো মত নেই। যখন যার বুদ্ধি নেন, তখন তারই কথা বলেন, যার সাথে থাকেন তারই পথে চলেন। সঙ্গদোষ বড় দোষ। তার উপরে আছে আবার ক্ষমতার স্বাদ। লোভী বালকের ভোজন স্পৃহার মতো তা কেবলই বাড়তে থাকে।

আবদুল্লার আশপাশে আবার এসে জুটল কয়েকটি ক্রূর ও স্বার্থপর মুসলমান। তারা রাত্রিদিন ঘিরে থাকে তাঁকে। দুধের বাটির চারপাশে যেমন ভন্ ভন্ করে মাছি। দুষ্ট সরস্বতীর মতো তারা কেবলই দুষ্টবুদ্ধি দিল অষ্টপ্রহর।

দেখতে দেখতে আবদুল্লার মন আর মতি দুই-ই আবার হলো ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন ও স্বার্থবোধে মলিন। জাতীয়তাবাদের উন্নত শীর্ষ থেকে ধাপে ধাপে গড়িয়ে

পড়লেন সাম্প্রদায়িকতার অতল গহ্বরে। জলেভেজা পুতুলের মতো তাঁর রং ধুয়ে মুছে বেরিয়ে পড়ল ভিতরের কাদামাটির ডেলা। রূপ ঘুচে গিয়ে দেখা দিল স্বরূপ।

আবদুল্লার রাগ ছিল হরি সিং-এর উপরে ষোল আনা। মহারাজ যে তাঁকে জেলে পুরেছিলেন, সেকথা ভুলতে পারেননি তিনি কোনো দিন। কিন্তু কথামালার উটের গল্প জানা ছিল তাঁরও। দড়িতে একবারেই হেঁচ্‌কা টান দিলে তা' ছিঁড়ে যাওয়ার আশংকা। তাই আস্তে আস্তে জাল গুটিয়ে আনলেন তিনি। এগোলেন ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে।

আবদুল্লা প্রথমে চাইলেন কাশ্মীরে পুরোপুরি এক মন্ত্রীসভা। হরি সিং হবেন ক্ষমতাহীন নিয়মতান্ত্রিক মহারাজ। যেমন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আছে রাজ্যপাল। কাজের জন্য নয়, সাজের জন্য। নৈবেদ্যের চূড়ায় যেমন সন্দেশ, খোঁপার উপরে যেমন গোলাপ ফুল।

ভারত সরকারের অনুগ্রহে শেখ মহম্মদ আবদুল্লা হলেন কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী।

কাটল কিছু কাল। হরি সিং-এর প্রতাপ নেই, কিন্তু প্রভাব আছে। সরকারী কর্মচারীরা তখনও মহারাজকেই মনে করে রাজ্যের মালিক। নিরক্ষর চাষী মজুরেরা পুরান অভ্যাসে তখনও বিপদে দেয় মহারাজের দোহাই, আমোদে আহ্লাদে মহারাজের গায় জয়। সেটা প্রধান মন্ত্রীর পছন্দ নয়। ততক্ষণে ভারতীয় সৈন্যদল হানাদারদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে দূরে। আবদুল্লা ভাবলেন, এই সময়। তিনি তাঁর ধনুকে দিলেন টঙ্কার। তূণ থেকে বের করলেন দারুণ অগ্নিবাণ। হরি সিং-এর কপাল গেল পুড়ে।

ভারত সরকারের কাছে পত্র দিলেন আবদুল্লা, রাজ্যের জনগণ চায় না হরি সিংকে। সিংহাসন ছাড়তে হবে তাঁকে।

সে কী কথা? শুনে চমকে ওঠেন মহারাজ। ছুটে আসেন দিল্লীতে। সেখানে তাঁর সহায় কে? গেলেন নেহরুর কাছে। হায়, তিনি হরি সিং-এর বন্ধু নন। শেখ আবদুল্লার উপরেই তাঁর অটুট বিশ্বাস। রাজতন্ত্রের চাইতে গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা বেশী। তাঁর কাছে মহারাজের অনুনয় নিষ্ফল।

অবশেষে একটা মাসোহারা নিয়ে গদি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গতি রইল না আর। তরুণ যুবরাজ করণ সিং হলেন রিজেন্ট—অর্থাৎ পিতার অবর্তমানে কাশ্মীরের রাজ্যধর। তাঁর বয়স তখনও আঠারো পার হয়নি।

রাজপুত্র না হয়েও রাজা হয়েছিলেন হরি সিং। রাজা হয়েও রাজ্য হারালেন তিনি। ইংরেজী 'এল' অক্ষরটা আছে আরও একটা ইংরেজী শব্দের গোড়ায়। সেটা 'লস্ট'। গুরু সন্তদেবের তা' জানা ছিল না। শিষ্য হরি সিং-এর তা' মনে ছিল না। মূর্খ হরি সিং!

রাজ্যহারা হরি সিং গেলেন বম্বে। নিরালা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে লাগলেন সেখানে।

ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় অদূরে সমুদ্র তীর। বেলাভূমিতে কেবলই আছাড় খেয়ে পড়ছে ফণাতোলা সাপের মতো অসংখ্য সাগর তরঙ্গ। ঢেউ-এর পরে ঢেউ। বিরামহীন, সংখ্যাহীন। দিনের পর দিন কর্মহীন হরি সিং তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই মন উধাও হয়ে যায় দূর দূরান্তের দেশে।

সেখানে পাহাড়ের মাথায় সোনালী রোদ্রে ঝলমল করছে রূপালী বরফের আস্তরণ, চার-চেনারীর পাতায় বইছে ঝিরঝিরে হাওয়া, ঝিলমের স্রোতে হরতনের টেক্কার মতো বৈঠা নিয়ে মাঝিরা বাইছে ঝালরআঁটা রঙিন শিকারা, আমীরাকদলের পুলের কিনারায় ল্যাঠি হাতে নিঃস্ব দুঃখীর দল 'মিস্কিন', 'মিস্কিন', বলে, হাত বাড়িয়ে মাগছে ভিখ্।

সে দেশ থেকে চিরকালের মতো বিদায় হয়েছেন হরি সিং। সেখানে কোনোদিন আর ঘটবে না তাঁর পদক্ষেপ।

মন্দমতি, ভ্রষ্টনীড়, ভাগ্যহত হরি সিং।

লঘুকরণ

"ঠিকানা নেই আগুপিছুর,
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই টাট্টা।"
—রবীন্দ্রনাথ।

উৎসর্গ

আমার নানা রঙের দিনগুলিকে

রাম গরুড়ের ছানা

হাকিমেরা জানেন, বিচারকার্য সহজসাধ্য নয়। বিচারকের দায়িত্ব একাধিক। সে-দায়িত্ব আইনের প্রতি, আসামীর প্রতি, ন্যায় এবং নীতির প্রতি। তাই জেলের হুকুম দিতে নবীন ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বিধা ঘটে ; ফাঁসির আদেশ দিয়ে জজ সাহেবের মুখে অন্ন বিস্বাদ হয়, চোখে ঘুম আসে না।

অথচ মেকলে থেকে শুরু করে বেভারলী নিকলস পর্যন্ত যে-সকল ইংরেজ ঐতিহাসিক, সাংবাদিক ও ভ্রমণকারীরা ভারতীয়দের সম্পর্কে রায় দিয়েছেন তাঁদের কাজ কঠিন ছিল না। কারণ তাঁরা জজিয়তির ভান করে আসলে করেছেন ওকালতি। বিচারের অছিলায় বাতিল। উকীলের বুদ্ধি থাকাটা আবশ্যিক, বিবেক না থাকলেও ক্ষতি নেই। তাই আমাদের সম্পর্কে ইংরেজ লেখকদের ভাষা এবং ভাব কোনোটাই এমন হয়নি গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

বিস্ময়ের কিছুই নেই। সংসারে একমাত্র প্রেমের দৃষ্টিতেই স্খলন অপরাধ অনুদ্ঘাটিত থাকে। রাষ্ট্রীয় বিবাহতন্ত্রে একদা অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই ইতিহাসের ছাঁদনাতলায় ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছিল। পুরাকালে স্বামীরা স্ত্রীদের স্বাতন্ত্র্য দিতেন না। দিতেন আশ্রয় ও ঐশ্বর্য। সে-দিনের ইংরেজও আমাদের কর্তৃত্ব দেয়নি, দিয়েছিল নিরাপত্তা, জাতীয় ঐক্য এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের দীক্ষা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের দ্বারা ভারতবর্ষের নিদ্রিত আত্মাকে সে বহুধা বিকাশের পথে উদ্বুদ্ধ করেছিল,—একথা নীরদ চৌধুরী বলার আগেও অনেকেরই জানা ছিল।

জগতে বিবাহ মাত্রেরই আদিতে কুসুম ও অন্তে কণ্টক। প্রারম্ভে প্যারাডাইস ও পরিণামে পারগেটরী। মধুমাসের মতো মধুচন্দ্রিকারও আয়ুষ্কাল পরিমিত। হ্যান-মুনের পরে যে দীর্ঘ দিনগুলি আসে তাতে মোহের বদলে থাকে মুদ্গর, ফুলশয্যা হয় হুলশয্যা। ভারত ও ইংলণ্ডের নব পরিণয়ের বিহ্বলতাও স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন শেষ হয়েছে। তার পরবর্তী অধ্যায়ে না ছিল পূর্বরাগের ব্যাকুলতা, না ছিল উত্তর প্রণয়ের প্রশান্তি। দুপক্ষেরই গলার মালা ততদিনে গলার দাঁড়িতে পরিণত। আশ্চর্য নয় যে, তখন একের চোখে অন্যের তিল পরিমাণ ত্রুটি বিচ্যুতি তাল পরিমাপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

কিন্তু ত্রুটির সংজ্ঞা তো ধ্রুব নির্দিষ্ট নয়। আইনস্টাইনের অঙ্কের মতো সেটা রিলেটিভ। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে তার রূপান্তর ঘটে। একই প্রথা বা কাজ একক্ষেত্রে গর্হিত ও অন্যক্ষেত্রে নমস্য হয়ে ওঠে। শ্যালিকা বিবাহ বিলাতী সমাজে নিন্দনীয়। অথচ পত্নীবিয়োগে স্ত্রীর অনূঢ়া অনুজাকে জায়ারূপে গ্রহণ করা এদেশে শুধু অনুমোদিত নয়, বিশেষ অবস্থায় পিতৃকুল ও শ্বশ্রূকুল দুদিকের অভিপ্রেতও বটে। ওদেশে যে সকল লজ্জাবতীরা অস্টারেট ক্লোদস-এ পথে বিচরণ করেন, এদেশের পুরুষদের দেহের উপরার্ধ অনাবৃত দেখলে তাঁরা প্রায় মূর্ছা যান। ইলেকশানে রাজ্য

মহারাজারা স্বতন্ত্রপার্টির ছাপ নিলে হন রিএ্যাকশনারী, কংগ্রেসের মনোনয়ন পেলে হন প্রোগ্রেসিভ। পররাজ্যগ্রাস এমেরিকা করলে এ্যাগ্রেশান, চীন করলে লিবারেশান!

তবে একথা ঠিক যে, সকল দেশে এবং সকল কালেই এমন কতগুলি ব্যাপার আছে যা অনুচিত গণ্য হয়। অসত্যভাষণ যে দূষণীয় এবং পতিতাবৃত্তি যে অশ্রদ্ধেয় সে বিষয়ে কোথাও কোনো দ্বিমত নেই। বৃহত্তর পাপ পুণ্যের কথা বাদ দিলেও সামাজিক আচরণে এমন কয়েকটা লিখিত বা অলিখিত অনুশাসন আছে যা সকল সভ্যতায়ই স্বীকৃত। মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার পক্ষে সেগুলি অনুকূল। সিনাই পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে যে-দশটি অনুজ্ঞা প্রচারিত হয়েছিল, অখ্রীষ্টীয় সমাজেও সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে সেগুলি পালন করা হয়। কারণ আমার প্রতিবেশীর সুন্দরী স্ত্রীর দিকে আমি বার দুই অপাঙ্গে তাকালে স্বর্গস্থ ভগবানের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি আছে কি না জানিনে; কিন্তু স্বামী ভদ্রলোকের যে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং মেনে নেয়া যাক যে, দোষ ত্রুটি নামে সংসারে কতকগুলি সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় আছে। সেগুলির উল্লেখ মাত্রই দুরভিসন্ধির পরিচয় নয়। অন্ততঃ কোনো বিদেশী পর্যটক যদি কোনো দিন বলে থাকেন যে, বাঙ্গালী হাসতে জানে না তবে আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে না আসাই ভালো। তাতে বিক্রম যদি বা প্রকাশ না পায়, বিবেচনার পরিচয় মিলবে।

ভ্যালেন্টাইন চীরল যাঁরা পড়েননি এবং মিস মেয়োর নামটাও যাঁদের কাছে অজ্ঞাত তাঁদের মধ্যেও অনেকেই নিজ অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন যে, বাঙ্গালীর রসবোধ, ইংরেজীতে যাকে বলে সেন্স অব হিউমার, অল্প। আমাদের জীবন ও সংস্কৃতিতে হাসির চিহ্ন নেই। বাংলাদেশে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আছে শুধু আলপনায়, তাঁর বাহনটি দেখা যায় সর্বত্র।

পরলোকগত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। নামটা কিছুটা ভ্রমাত্মক। কারণ বইটির বিষয়বস্তু মূলতঃ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য। পরবর্তী কালের সাহিত্যের উল্লেখ যা আছে তা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। সুতরাং আলোচনাটা আংশিক। অবশ্য কারণটা বোঝা যায়। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের সংখ্যা এত প্রচুর নয় যে তা নিয়ে তিন চার খণ্ড বই লেখা যায়। পঞ্চানন্দ থেকে পরশুরাম অবধি বছর অনেকগুলি, কিন্তু রসরচনা সামান্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে বাংলার গৌরবময় যুগ বলা হয়। সেটা একেবারে নিরর্থক নয়। ঘটা করে জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা যায় এমন বাঙ্গালী একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ ও সুভাষ চন্দ্র ছাড়া সমস্তই ঐ শতকের। কলকাতা কর্পোরেশানে প্রতি সপ্তাহে রাস্তার নাম বদলাতে যাঁদের নাম কাজে লাগে তাঁদের কেউ এ শতাব্দীতে জন্মাননি।

চিন্তায় ও কর্মে, আচার ও আচরণে বিগতযুগের বাঙ্গালী পরিপূর্ণ প্রাণপ্রবাহের গতিশীল উচ্ছলতায় মহিমান্বিত হয়েছিল। একালের মাপকাঠিতে সেকালের অনেক রীতি, নীতি, সংস্কার ও অনুষ্ঠান হয়তো অর্থহীন, অনাবশ্যক, এমনকি অশ্রদ্ধেয় মনে হতে পারে। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমস্ত সত্ত্বা একটা বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির সতেজ প্রকাশের দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। প্রাণ চাঞ্চল্যের অজস্রতায় তাদের জীবন ও সমাজ সেদিন বসন্তের বহুপুষ্পিত তরুবিথিকার মতো

একটা বেহিসেবী প্রাচুর্যের প্লাবনে ধন্য হয়েছিল। তাঁদের অন্দরে স্ত্রী, সদরে এয়ার এবং পরিবারে আশ্রিতের সংখ্যা যেমন ছিল একাধিক, তাঁদের আহার, ঔদার্য এবং অট্টহাসিও তেমনি ছিল অপরিমিত। ছেলেদের গোঁফ এবং মেয়েদের নথের মতো বাঙ্গালীর জীবন থেকে হাসিও তাঁদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়েছে। তাই সাহিত্যে কমলাকান্ত, নাটকে নিমে দত্ত এবং সঙ্গীতে নন্দলালের কোনো পরিশিষ্ট নেই। ডি. এল. রায়ের পরে বাংলা ভাষায় কোনো হাসির গান রচিত হয়নি।

জানি, আধুনিক বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে লাভ নেই। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব বৈভব অল্প, পরস্ব কলরব প্রচুর। তার অহঙ্কার তার মালার মণি নিয়ে নয়, গলার ধ্বনি নিয়ে। সুতরাং সাহিত্যের কথা থাক।

ইংরেজীতে একটা চলিত কথা আছে,—টেল মি দি কম্পোনী হি কিপস্, আই শ্যাল টেল ইউ দি পারসন্ হি ইজ। লোকটা কাদের সঙ্গে মেশে তা জানলেই বোঝা যায় লোকটা কী প্রকৃতির। প্রাচীন প্রবাদের ঈষৎ পরিবর্তন করে বলা যায়,—টেল মি দি প্রেস দি পিপল হ্যাভ, আই শ্যাল টেল ইউ দি পিপল দে আর। বাস্তবিক দেশের সংবাদপত্র দেখে দেশের মানুষগুলি সম্পর্কে অনেকটা সঠিক ধারণা করা চলে।

ভারতবর্ষের প্রথম ইংরেজী খবরের কাগজ 'হিকির গেজেট' বাংলা দেশে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আগে শুরু করলেই যে আগে থাকা যায় না একথা ঈশপের গল্পে কে না পড়েছে?

অপ্রীতিকর হলেও স্বীকার করা ভালো, ভারতবর্ষের ইংরেজী সাংবাদিকতায় বাঙ্গালীর আসন প্রথম সারিতে নয়। যে ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক প্রথম পদ্মভূষণ, তিনি বাঙ্গালী নন, যে ইংরেজী দৈনিকের সর্বাধিক সার্কুলেশান সে বাংলা দেশে নয়, এবং যে ইংরেজী সংবাদপত্র মুদ্রণ সৌষ্ঠবে প্রথম পুরস্কৃত সে বাঙ্গালী পরিচালিত নয়।

কিন্তু দেশীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব আছে। সংবাদ পরিবেশন এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে বাংলা সংবাদপত্র অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার তুলনায় অগ্রগামী। বাঙ্গালীর সমাজ ও জীবনের সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্র ধীরে ধীরে অনন্য-সম্বন্ধ হয়ে উঠেছে। সুতরাং তার মধ্যে আধুনিক বাঙ্গালীর জীবনধর্মের অনুসন্ধান করা বোধহয় অসমীচীন নয়।

কিছুকাল পূর্বে এদেশে সদ্য আগত এক মার্কিন সাংবাদিক কথাচ্ছলে আমাদের ইংরেজী কাগজগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,—ডাল, ড্রাই, ড্রিয়ারী। চমৎকৃত হয়েছিলাম। অনুপ্রাসের জন্য নয়, তাঁর প্রশংসনীয় পর্যবেক্ষণ শক্তির জন্য। শুধু চমৎকৃত নয়, শঙ্কিতও। আমাদের ভাগ্য ভালো যে ভদ্রলোক বাংলা পড়তে পারেন না।

বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা উৎসাহজনক। অবশ্য এদেশের মাপকাঠিতে। কিন্তু সেগুলি অনাবশ্যকরূপে হাস্য লেশহীন। ধরনটা প্রায় সুনীতি সঙ্ঘের সভাপতির মতো, শুষ্কং কাষ্ঠং। মনে হয়, বুঝিবা সংসারে বীতরাগ নিরন্তর কোপন স্বভাব একদল এডিটর, সাব-এডিটর, রিপোর্টার ও প্রিন্টার ইত্যাদি মিলে দিনের পর দিন পরিপূর্ণ বিরক্তিতে সেগুলি লিখে ও ছেপে বের করছে। হাসি নেই, চটুলতা নেই, কোথাও একটু লঘু পরিহাসের বাষ্প মাত্র নেই। সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি থেকে শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইন—শ্রীঅমুক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত পর্যন্ত—সবই

যেন রক্ত চক্ষু, রুক্ষ কেশ দুর্বাসা মুনির মতো কটমট তাকিয়ে আছে! আগে বছরে একবার অর্থাৎ পুজো সংখ্যাগুলিতে এই কঠোপনিষদের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটতো। সম্প্রতি একাধিক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের চাপে সেখানেও রসরচনার ঠাঁই মিলে না।

সাধারণতঃ অবাঙ্গালীদের প্রতি আমাদের মনে একটা করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব আছে। মেড়ো শব্দটা মাড়োয়ারীর অপভ্রংশ, সুতরাং ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে আপত্তিকর নয়। কিন্তু প্রচলিত অর্থে সেটা শুধু মাড়োয়ার বা রাজপুতনার অধিবাসীদের বোঝায় না। আসানসোলের ওপারে—বিহার থেকে উত্তর প্রদেশ, এমন কি দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ অবধি বিস্তৃত ভুখণ্ডে যাদের বাস—তারা সবাই বাঙ্গালীর কাছে মেড়ো এবং অনুকম্পার পাত্র। কথাটা আর যাই হোক খুব সম্মানার্থে ব্যবহৃত নয়।

আমাদের আর্থিক দুর্গতি নিয়ে বাইরের কেউ যখন খোঁটা দেয়, আমরা আর্যতেজে দর্পভরে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলি,—জান, আমরা ইনটেলেকচুয়্যাল জাতি? জান, আমাদের রবিঠাকুর ইত্যাদি ইত্যাদি। গলায় যাঁদের জোর কম এবং লজ্জা সরম যাঁদের একেবারেই যায়নি তাঁরাও অন্ততঃ মনে মনে ভাবেন, বড়বাজারের ঝুনঝুনওয়ালাদের ব্যবসা, বাণিজ্য বিরাট বাড়ি ও বিশাল গাড়ি আছে বটে কিন্তু কালচার নেই। বাঙ্গালীর টাকা নেই, কিন্তু রিফাইনমেণ্ট আছে। মেড়োদের কাছে চাঁদের চাইতে চাঁদির কদর বেশী। ছ্যা।

বাইরে কারো কাছে তর্কে হারতে বলিনে। কিন্তু ঘরে ফিরে একান্তে একবার আত্মজিজ্ঞাসা করতে ক্ষতি কী? তামিল ভাষায় চৌষট্টি পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক কৌতুক পত্রিকা আনন্দ বিকেতনের প্রচার সংখ্যা দু'লক্ষ পঁচাত্তরের কাছাকাছি। বাংলায় হাসির পত্রিকা অধুনালুপ্ত সচিত্র ভারতের আকার, প্রচার ও স্থিতিকাল স্মরণ করতেও লজ্জা বোধ হয়। ব্যঙ্গ কৌতুকের লেবেল ললাটে এঁটে যে শনিবারের চিঠি সাহিত্যের আসরে নেমেছিল অল্পদিনেই তার চেহারা পাল্টাতে হয়েছে। অন্য আর পাঁচটা মাসিক পত্রিকার মতো তারও পরে ছিল গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে সন্ন্যাসীর বেশ, শিরে জটাজাল এবং বদন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে নবজলধর আবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় গুরুগম্ভীর।

সম্পাদককে দোষ দেওয়া বৃথা। গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে একটি অতি পুরাতন উক্তি এই যে, দেশের লোক যে-রকম শাসনের যোগ্য ঠিক সে-রকম শাসনতন্ত্রই তারা পায়। এই খাঁটি কথাটা সংবাদপত্র সম্পর্কেও খাটে। কারণ একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সিনেমা প্রযোজকের দৃষ্টি যেমন বক্স আপিসের দিকে, পত্রিকা প্রকাশকেরও একটা চোখ থাকে সার্কুলেশনের খাতায়। অতি উৎসাহী সম্পাদককেও কিছুদিন পরেই দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিতে হয় যে এদেশে রসের নিবেদনটা নিতান্তই অরসিকেসু।

জীবনে হিউমারের অভাবকে ত্রুটি বললে কম বলা হয়। তাকে বলা উচিত অভিশাপ। বাঙালীর সকল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা সংক্রামিত। বাংলা নাট্যশালায় প্রহসন নামে কোনো বস্তু নেই। হাসির নাটক সেখানে মাঝে মাঝে যা অভিনীত হয় তা দেখে হাসা যায় না,—হাসি পায়। বাংলা সিনেমায় হাসাবার চেষ্টা তো রীতিমতো হাস্যকর।

যা হওয়া উচিত বা যা হতে পারত তার বিপরীত কিছু ঘটার মধ্যেই আছে হাসির উৎস। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনামাত্রই হাসির উপাদান নয়। দু' পায়ে চলা মানুষের

রীতি। সুতরাং সার্কাসে যে লোকটা দু'হাতে ভর দিয়ে চলে সে আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কারণ তাতে অসম্ভবের অংশটাই প্রধান। কিন্তু যে বিপুলকায় ব্যক্তি চলতে গিয়ে পথের কদলীবল্কলে পদস্খলন হেতু অতর্কিতে ধপাস শব্দে ধরাশায়ী হন, তিনি দর্শকের হাসির উদ্রেক করেন। পূর্ণবয়স্ক লোকের পতনটা একেবারে অসম্ভব নয়,—অস্বাভাবিক। মানুষের আকৃতি সম্পর্কে আমাদের মনে একটা চিরন্তন ধারনা আছে। কেশশূন্য মস্তক, সুদীর্ঘ লম্বমান গুম্ফ ও উদরের বিরাট পরিধি সহ কর্নেল ব্লিম্প সে ধারনাকে অতিক্রম করে অথচ পুরোপুরি অবিশ্বাস্যের কোঠায়ও পৌঁছায় না। তাই কার্টুন হিসাবে সে সার্থক সৃষ্টি। সে হাসির উদ্রেক করে; কিং কং জাগায় বিস্ময়।

স্বাভাবিক যখন বিকৃত আকৃতি বা অভাবিত আচরণের মধ্য দিয়ে অসামঞ্জস্যরূপে দেখা দেয়, তখনই তা হাস্যরসের সৃষ্টি করে। জাত বৈষ্ণবের কন্যা যদি সূত্রধরকে রন্ধনশালায় প্রবেশে বাধা দেয় তা হলে সেটা অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইনের আওতায় আসে কি না জানিনে। কিন্তু বিশ বছর এক সঙ্গে ঘর করার পরেও টগর বোষ্টমী যখন রেঙ্গুনের নন্দ মিস্ত্রীকে শুধু সাত পাকের সোয়ামী নয় এই যুক্তিতে হেঁসেলে ঢুকতে দেয় না তখনই তা হাসির খোরাক যোগায়।

কোনো একটা বিশেষ বয়সে যুবকেরা প্রথমে বিয়ের প্রস্তাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এটা স্বাভাবিক। পরে কোনো একটি ধনীকন্যা অথবা রূপসী তরুণী দেখলে বিয়ের জন্য ব্যগ্র হয়। এতেও নূতনত্ব নেই। কিন্তু চুলের কাঁটা, গানের খাতা দেখা মাত্রই চিরকুমার সভার যে সকল সদস্যের কৌমার্যের অন্তিমদশা উপস্থিত হয় তাদের কাহিনী ন্যায্যতই প্রহসনের বিষয়।

আমাদের জীবনে এবং জীবনের নানা অভিব্যক্তিতে হাসির অভাবদ্বারা যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, আমরা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত তবে ক্ষোভ ছিল না। পরিতাপের বিষয়, চিন্তায়, কর্মে, জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে আমরা অহরহ কেবলই হাসির উপকরণ পুঞ্জীভূত করে তুলছি। বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্ত্রীর হিস্টিরিয়া নিরাময়ের জন্য স্বপ্নাদ্য মাদুলী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বিত্তবান জমিদার নন্দন কার্ল মার্কস উদ্ধৃত করেছেন, বাঘা বামপন্থী গভর্নমেন্টের পারমিট সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন এমন দৃষ্টান্ত ঝুরি ঝুরি। আমাদের মেয়েরা একই সঙ্গে যোড়শ শতাব্দীর উজ্জয়িনীর জনপদবধূদের অনুকরণে কঙ্কন এবং বিংশ শতাব্দীর মার্কিন তরুণীর অনুসরণে জাম্পার পরিধান করেন। ছেলেরা একাধারে জন্ম নিরোধ ও ঠিকুজীতে বিশ্বাসী। ভোজনে একই সঙ্গে সুফ্‌লে ও সন্দেশ এবং বক্তৃতায় কমিউনিজম ও জন্মান্তরবাদ। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

হাসির কারণ হওয়া সহজ; হাসি উপভোগ করা কঠিন। প্রথমটির জন্য চেষ্টার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়টির জন্য চাই নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও নিরাসক্ত মনোভাব। সেটা অনুশীলন ও শিক্ষা সাপেক্ষ। মোহনবাগান শীল্ড ফাইন্যালে হারলে যেখানে বিষ খাওয়ার গল্প আছে, সেখানে আত্মনিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি সহজলভ্য নয়। এদেশে মতভেদ ঘটলে মনোভেদ হয়। কথা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটাফাটি ঘটে।

গ্রীষ্মে স্নিগ্ধকারী ও শীতে উষ্ণদায়ক রূপে বিজ্ঞাপিত এক পানীয় সম্পর্কে কোনো এক বাংলা পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একদা একটু নির্দোষ রসিকতার

আভাস ছিল ফলে পরের দিনই পত্রিকায় ঐ কোম্পানীর মোটা টাকার বিজ্ঞাপনের কন্ট্রাক্ট নাকচ হওয়ার উপক্রম। একটি নিরীহ রসরচনা প্রকাশের ফলে জনৈক তরুণ সাহিত্যিকের বন্ধুবিচ্ছেদ, স্বজন বিরোধ, এমনকি পত্নীলাভে বিঘ্ন ঘটেছিল, এমন জনশ্রুতি আছে। বিয়ের কথাবার্তা যখন প্রায় পাকা, শুধু পাঁজি দেখে শুভদিন নির্ধারণটুকু বাকী, তখন সম্ভবপর স্ত্রীর মেজদা পশুপতিবাবু হঠাৎ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভাবী বরের রচনায় "এ জগতটা এক বিচিত্র পশুশালা" এ লাইনটা তাঁকে লক্ষ্য করেই লেখা !

আমাদের রসবোধ যথেষ্ট তীক্ষ্ম নয় বলেই পরিহাসকে আমরা পরিবাদ জ্ঞান করি এবং সে কারণেই কৌতুক ও ভাঁড়ামির প্রভেদ বেশীর ভাগ বাঙালীর নিকট খুব পরিষ্কার নয়। পিঁড়ির নীচে সুপারী রেখে জামাইকে আছাড় খাওয়ানোকে আমাদের দেশে বলে রসিকতা এবং নির্জলা গালাগালিকে ঠাট্টা। নাটকে সিনেমায় কমিক বলতে বোঝায় পূর্ববঙ্গীয় অর্থাৎ বাঙাল উচ্চারণ ; বাসরঘরে রসিকতার অর্থ শ্যালিকার হাতে কানমলা। বাংলাদেশে সাংবাদিক আছেন, সাহিত্যিক আছেন, কবি ও শিল্পী আছেন একাধিক। নেই কার্টুনিস্ট। কলকাতায় বাজারে ল্যাংড়া আম, হেঁসেলে রাঁধুনী এবং রাস্তায় ট্যাক্সি ড্রাইভারের মতো দৈনিক কাগজের সার্থক কার্টুনও বাংলার বাইরে থেকে আসে।

প্রতিবাদের যুক্তি অনুমান করা কঠিন নয়। "বাঙালীর অভাব, অনটন, বেকার সমস্যা, অবাঙ্গালীদের বাঙ্গালী বিদ্বেষ, দিল্লী সরকারের উপেক্ষা ইত্যাদি"—বাংলা সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধের নিত্যকার অবলম্বন।

অভাব, অনটন আছে। হয়তো বেশী পরিমাণেই আছে। কিন্তু পাটালি গুড় বা জামদানী শাড়ীর মতো দুঃখ দৈন্য তো একমাত্র বাংলাদেশেরই নিজস্ব বিশেষত্ব নয়। দারিদ্র্যের তো কোনো সোল এজেন্সি নেই। উত্তর ভারতে দেখা যায়, মজুর মেয়েরা দিন শেষে গোধূলি বেলায় কর্মান্তে গৃহে ফিরছে। কেউ সারাদিন রাজমিস্ত্রীর কাজে ইট যোগান দিয়েছে, কেউবা মাটি কেটে পি-ডব্লিউ-ডির রাস্তা বানিয়েছে। কারো কাঁকালে শিশু, কারো মাথায় পুঁটুলি বাঁধা বাজরা, কারোবা কাঁধে পথের পাশে কুড়িয়ে পাওয়া জ্বালানি কাঠের আঁটি। ঘাগড়া দুলিয়ে বা আঁচল উড়িয়ে দল বেঁধে চলেছে। তাদের হাস্য পরিহাস এবং সম্মিলিত সঙ্গীতে পথঘাট আলোড়িত বললেই চলে। তাদের একটি সন্ধ্যার কাকলি কলরব দেখে বাঙ্গালী পথিকের মুখব্যাদন দীর্ঘ হয়। বাজি রেখে বলা যায়, বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল থেকে প্রফুল্ল সেনের আমল পর্যন্ত বাংলা দেশের মুটে মজুরেরা একযোগে এতখানি হাসেনি। অথচ অনাহার ও অনটন সেদেশে কিছু অশ্রুতপূর্ব নয়। রাজপুতনার অনেক অঞ্চলে ওজন করে জল কিনতে হয়। এবং সেটা জলের দরে নয়।

জীবন যতিপতনহীন ছন্দোবন্ধ কাব্য নয়। ব্যর্থতার ব্যথা ও পরাজয়ের বেদনা দ্বারা তা ক্ষণে ক্ষণে খণ্ডিত। জানি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা কঠিন। আপন পরাভবের গ্লানি নিয়ে হাস্যপরিহাস দুরূহতর। কিন্তু ফুটবল মাঠের দর্শকের মতো নিরাপদ দূরত্বে গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে (হায়, ফুটবলের মাঠ কি আর নিরাপদ আছে ? কোন একটি বিশেষ দল না জিততে পারলে রেফারীর তো কথাই নেই, দর্শকদের মধ্যেও অনেকের শারীরিক নিরাপত্তা বিপন্ন হতে কতক্ষণ। থান ইট বা

সোডার বোতলকে যারা স্থাণু পদার্থ বলে জানেন তারা নিশ্চয়ই লীগ বা শীল্ড ম্যাচের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত নন !) যাঁরা সেই পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা ও তার অগণিত ধাবিত যাত্রীদের অবলোকন করার সুযোগ পান সেই বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা কি সেখানে কোনো হাসির উপকরণ দেখেন না ? বিখ্যাত ইংরেজী রসরচয়িতার একটি বিশিষ্ট উক্তিতে আছে,—দুঃখ থেকেই হাসির জন্ম। স্বর্গে দুঃখ নেই, তাই সেখানে হাসিও নেই। স্বর্গে এখনও যাওয়া ঘটেনি ; সেখানকার কোনো খবরও রাখিনে। কিন্তু বাংলাদেশ যে স্বর্গরাজ্য নয় একথা বোধহয় সবাই মানেন। অবশ্য মন্ত্রীমণ্ডলী ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীরা ছাড়া।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এস্কুইথ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। যুদ্ধের যখন অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্ত, জার্মেন অগ্রগতির মুখে ইংরেজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিধ্বস্তপ্রায়, তখন এক নিদাঘ সন্ধ্যায় তাঁকে এক বন্ধুগৃহে ব্রিজ খেলতে দেখা যায়। কাহিনীটি হয়তো সত্য, হয়তো বা কল্পিত। কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেন যে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র, অপরিসীম বীরত্ব ও গোড়ায় বিস্ময়কর সাফল্যের পরেও জার্মেনী পরাজিত হয় এবং ইংরেজ সন্ধির সর্ত নির্দেশ করে, এই গল্পের মধ্যে তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যে সকল দেশনায়ক দেশের দুঃখ, দুর্দশা, অভাব অভিযোগকেই একমাত্র সত্য জ্ঞান করে এই রূপ, রস, আলো ও গন্ধভরা জননী বসুন্ধরার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছেন এবং অহর্নিশি তারস্বরে 'ইনকিলাব' ধ্বনি দ্বারা গগন বিদীর্ণ করাকেই পৃথিবীতে একমাত্র সার জ্ঞান করেন তাঁরা নিশ্চয়ই নমস্য লোক। তাঁদের নিন্দা করিনে। কিন্তু সবিনয়ে তাদের এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে বোধহয় অন্যায় হবে না যে, ধনুতে সর্বদা জ্যা যুক্ত করে রাখলেই তার তীরক্ষেপণ ক্ষমতা বাড়ে না, বরং কমে।

সমাজের অসচ্ছল শ্রেণীর কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। বিত্তবানদের কথাই ধরা যাক। অর্থ যাঁদের অজস্র এবং অবসর যাঁদের অখণ্ড তাঁদের সংসারেও হাস্য পরিহাস আনন্দ মুখর পরিবেষ্টনটি সহজে দৃষ্টিগোচর নয়। সম্পন্ন বাঙ্গালী গৃহে ভোজের অনুষ্ঠানে দেখা যায়, অনুরোধ উপরোধে অতিথিকে ক'খানা মাছের ফ্রাই খাওয়ানো যায় গৃহকর্তার শুধু সেই উৎকণ্ঠা। পেটে জায়গা নেই ? আহা তবুও নিন না আর একখানা। পাতেই যদি কিছু পড়ে না রইল, তবে আর পাত পাতা কেন ?

যাঁরা নিমন্ত্রিত তাঁরাও এতেই অভ্যস্ত। তাঁরা আসেন, পংক্তিতে বসেন, আহার সমাধা করেন, তার পরে রুমালে হাত মুছে পান মুখে পুরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রাম বা বাস ধরতে ছোটেন। না আছে দুদণ্ড বসে বিশ্রম্ভালাপ, না আছে পরিহাসকুশল বাগবিভূতি। হাস্য, কৌতুক, গান, গল্প ও হাল্কাধরণের ক্রীড়াকৌশলের মধ্য দিয়ে যে বন্ধুসমাগমকে আনন্দ রসঘন করে তোলা যায়, একমাত্র গলদা চিংড়ির কাটলেটের উপরেই যে ভোজসভার উৎকর্ষ নির্ভর করে না এ তথ্য অনেক আধুনিক বঙ্গললনাই অবাঙ্গালীদের কাছে শিখতে পারেন।

সামাজিক ভোজের নিমন্ত্রণে মেয়েরা যাঁরা আসেন তাঁরাও হাসিতে, খুশিতে, সহজ বাকপটুতা ও সাবলীল গতিতে বিশিষ্টা নন। অপাঠ্য উপন্যাসের অতিবর্ণাঢ্য

প্রচ্ছদপটের মতো তাঁদের দ্যুতি ও তাঁদের ঝলমল করা শাড়ি ও গয়নার মোড়কে। অকুণ্ঠিত, পরিহাসপটু, সজীব ও নেকামিবর্জিত, সহজ, সতেজ, অথচ স্নিগ্ধ বাঙ্গালী তরুণী প্রায় ভেজালহীন ঘি-এর মতো দুর্লভ এবং খদ্দরহীন নেতার মতো অভাবনীয়। তাঁরা বেশীর ভাগই স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের ছড়া বিশেষকে স্মরণ করিয়ে দেন।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আনন্দের অভাব সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। তাঁরা তিরস্কারের যোগ্য নন, কৃপার পাত্র। কিন্তু এ নীরস, নিরানন্দ জীবনযাপনকে যাঁরা আমাদের সারবত্তার অর্থাৎ সিরিয়াসনেসের পরিচয় জ্ঞান করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাঁরা হয় আত্মপ্রতারক, নয়তো কাণ্ডজ্ঞানহীন। আলো জিনিষটা হাল্কা। কিন্তু সে তৃণ লতায় যোগায় প্রাণ; জলে, স্থলে, অসীম নভোমণ্ডলে মাখায় রং। অন্ধকার গুরুভার। তাতে আছে কেবল ভয়। সে শুধু নীরস নয়, নিরেটও বটে। বসন্তে গাছের শাখায় অকারণ শিহরণ জাগিয়ে যে অজস্র ফুল ফোটে সেটা হিসেবী লোকের কাছে অনাবশ্যক চপলতা মনে হতে পারে। কিন্তু তারই পরিণতি ফল। বাবলার ডালে থাকে অসংখ্য কাঁটা। তাতে ফলের আশ্বাস নেই। আছে পট করে গায়ে বিঁধবার আশংকা। সেটা যথেষ্ট সিরিয়াস সন্দেহ নেই, যদিও ভিন্ন অর্থে। বাস্তবিক, বিরসবদন মাত্রই বিদগ্ধ মনের প্রতীক নয়, ঠিক যেমন গেরুয়া বসন মাত্রই নয় সাধুত্বের গ্যারান্টি। সংসারে বেশীর ভাগ মুখই গোমড়া হয় বিজ্ঞতায় নয়, অজ্ঞতায়।

উত্তরাধিকার এবং পারিপার্শ্বিক—হেরিডিটি অ্যাণ্ড এনভারনমেণ্ট—এ দুয়ের মধ্যে কোনটি দ্বারা মানুষের প্রকৃতি প্রভাবান্বিত হয় সে সম্পর্কে একটা অন্তহীন তর্ক আছে। সুতরাং সে প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। তবে যুগধর্মটা দু' পক্ষই স্বীকার করেন। আধুনিক বাঙ্গালীর জীবনদর্শন যুগের প্রভাব দ্বারা কতখানি চিহ্নিত সে প্রশ্ন সযত্ন গবেষণার অপেক্ষা রাখে। একথা ঠিক যে, তার জীবন ও সংস্কৃতি বর্তমানে নানা পরস্পরবিরোধী শক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণে বিপর্যস্ত। যুগপরিবর্তনের মধ্যপথে সেটা অপরিহার্য। দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণটি যেমন দিবসের দীপ্তি ও নিশীথের গাম্ভীর্য উভয় বৈশিষ্ট্য থেকেই বঞ্চিত, সমাজের বিবর্তনকাল—পিরিয়ড অব ট্র্যানজিশানও তেমনি নিষ্ফলা। পুরাতনকে বর্জন এবং নূতনকে গ্রহণ—এ দুয়ের কোনোটাই তখন পুরোপুরি হয়ে ওঠে না। ফলে যা দাঁড়ায় তা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণপর্বের ন্যায় করুণরসাত্মক।

বাঙ্গালীর জীবন ও সমাজে এখন এই প্রদোষকাল, যার না আছে প্রভা না আছে প্রশান্তি। আমরা ফরাস ছেড়েছি, কিন্তু চেয়ারেও সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইনি। কৌচের উপরেও পা তুলে না বসলে আমাদের আরাম হয় না। আশ্চর্য নয় যে, আমাদের সোফাসেটের কুশন বছর খানেকের বেশী টেকে না।

দোটানার প্রতিক্রিয়া আছে আমাদের অশনে, বসনে ও আহারে, বিহারে। প্রাচীন সমাজে মজলিস নামে একটা ব্যাপার ছিল। সেখানে আলাপ আলোচনা সর্বদাই সুরুচির সীমানা মেনে চলতো, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তাতে প্রচুর প্রাণ এবং প্রচুরতর হাস্যপরিহাসের সন্ধান মিলত। তাকিয়া, তামাক ও সতরঞ্চ সহ সে বারোয়ারী মজলিসগুলি কলকাতার রাজপথ থেকে ফিটনগাড়ির মতোই অন্তর্হিত। অথচ ক্লাবকেও আমরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারিনি। ক্লাবে বাঙ্গালী ব্রিজ খেলতে

পারে, বড়া বা ছোটা পেগ হুকুম করতে পারে কিম্বা অত্যন্ত দুঃসাহসী হলে নিতান্ত পরিচিতি একান্ত নিরাপদ পার্টনারের সঙ্গে দু' পাক ওয়লজ চেষ্টা করতে পারে; প্রাণ খুলে হাসতে পারে না। কারণ ক্লাব বস্তুটা আমাদের সমাজের গায়ে চেপে বসেনি, ডিনার জ্যাকেটের নীচে সার্টের ষ্টিফ ফ্রন্টের মতো খাড়া হয়ে আছে।

জগতে সযত্ন চেষ্টা দ্বারা অনেক কিছুই আয়ত্বে আনা সম্ভব। কিন্তু হাসির ক্ষমতা আয়াসলভ্য নয়। কষ্ট করে ব্ল্যাক কফি গেলা রপ্ত হয়, কষ্ট করে কায়দা মাফিক দন্তবিকাশও অসাধ্য নয়। কিন্তু কষ্টকরে সহজ সরল হাসি হাসা যায় না। সেটা স্বতঃস্ফূর্ত, ইংরেজীতে যাকে বলে স্পণ্টেনিয়স। মার্কারের কাছে বিলিয়ার্ড বা কনভেন্টে পড়ে এ্যাকসেন্টের মতো সেটা শেখার বিষয় নয়।

প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি আমরা একেবারেই অপদার্থ?

নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, "আমরা ইতস্ততঃ যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহাই পদার্থ!"

খাপছাড়া

পরিবারে নূতন বধূটি আগন্তুক। বংশ বিচারে যেখানে স্বঘর এবং কোষ্ঠী অনুসারে যেখানে রাজযোটক, সেখানেও পিতৃপরিচয়ে সে ভিন্নকুলোদ্ভবা। স্বামীগৃহে গাছের ডালে পাতার মতো সে সহজাত নয়, জড়িয়ে-ওঠা লতার মতো বহিরাগত।

বাইরে থেকে এসেও এই বধূই ধীরে ধীরে ঘরের ঘরণী গৃহিণী হয়ে ওঠে। নূতন পরিবেশ ও পরিজনের সঙ্গে সে এক হয়ে মিশে যায়। তখন সে শ্বশুরকুলেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিছুকাল পরে নিজের পিতৃকুলের কথা তার নিজেরই বুঝিবা তেমন মনে পড়ে না। বাংলার পল্লী অঞ্চলে একটি অতিপ্রচলিত ছড়া আছে,—

কান্দিয়া কেন মর ?
আপনি ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর।

সদ্যবিবাহিতা কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় অশ্রুমুখী জননীকে লক্ষ্য করে অজ্ঞাতনামা গ্রাম্যকবির এ রচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাষাতত্ত্বেও অনুরূপ গোত্রান্তরের দৃষ্টান্ত আছে। ভাষার উৎপত্তি এবং প্রসার নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা জানেন, ধনের মতো ভাষারও বৃদ্ধি ঘটে সংযোজনে। বাস্তবিক, জগতের সমস্ত জীবন্ত ভাষায়ই ভাষান্তর থেকে শব্দ গ্রহণের চিহ্ন আছে। সেটা অপহরণ নয়, আহরণ।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি তাদের নিজস্ব নয়। বহু ব্যবহারের ফলে সেগুলি ক্রমশঃ ঐ সব ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তাদের মূলের কথা সবাই ভুলে গেছে। কলম যে বাংলা শব্দ নয় একথা যাঁরা কলম চালিয়ে খান তাঁরাও অনেকেই জানেন না। ইঞ্জিন কথাটা আছে ওয়েবস্টার ডিক্সেনারীর পাতায়। কিন্তু বিহারের গণ্ড গ্রামে নিরক্ষর চাষীর কানেও সেটা আজ আর অশ্রুতপূর্ব নয়। শুচিধর্মী সনাতনী পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, যিনি জুতা, চিনি ও সাবান বর্জন করেছিলেন, তিনিও অবিচলিত চিত্তে রেল ব্যবহার করেছেন, অনাবশ্যক লোহাবর্জ্যের খোঁজ করেননি। জয়প্রকাশ নারায়ণের দলহীন গণতন্ত্রেও ভোট বাদ দেওয়ার প্রস্তাব নেই।

আমাদের নিত্যব্যবহার্যের তালিকায়ও বহু বিদেশী দ্রব্যের স্বদেশীকরণ ঘটেছে। গডাঢর চন্দ্রের মতো একই সঙ্গে যদিও নয়, আলু এবং তামাক আমরা অনেকেই খেয়ে থাকি। কিন্তু দুটোই যে গোড়াতে সাগরের ওপার থেকে এসেছে, সে খবর আমরা অনেকেই রাখিনে। ধুতিপরিহিত স্যালভেশান আর্মির মতো স্যালাড ও ক্যাপসিকামের গায়ে সাহেবী গন্ধটা এখনও আছে বটে। তবে যে পরিমাণে তারা এখন আমাদের লাঞ্চ বা ডিনার টেবিলে পরিদৃশ্যমান, তাতে আশা হয়, অদূরভবিষ্যতেই তারা পুঁইশাক ও ঢ্যাঁড়শের ন্যায় নির্জলা নেটিভ রূপে গণ্য হবে। বিলাতী বেগুনে বিলাতিত্ব তো আছে কেবল নামে। কলকাতার নাহার, মহাতব বা বর্মনদের অবাঙ্গালীত্ব যেমন শুধু পদবীতে।

বর্তমানে ভারতীয় সমাজে 'জন্মদিন' নামে একটা নূতন উৎসবের প্রচলন হয়েছে। ক্রিকেট ব্যাট ও গ্রিটিংস্‌কার্ডের মতো এটাও আমরা ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছি। কংগ্রেসী রাজত্বে দেশে বিলাতী জিনিষের উপরে ইম্পোর্ট কন্ট্রোল আছে, বিলাতী প্রথার উপরে নেই। দিল্লী, সিমলা বা মুসৌরীতে অভিজাত হোটেল, রেস্তোরাঁয় সালোয়ার কামিজ-পরা পাঞ্জাবী নিতম্বিনীদের 'টুইষ্ট' দেখলে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অতি আধুনিকতাই একমাত্র বস্তু যা আমদানী করতে ফরেন এক্সচেঞ্জ লাগে না।

অবশ্য 'জন্মোৎসব' এদেশে অভূতপূর্ব নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে এ অনুষ্ঠানটি অজ্ঞাত ছিল না। তবে সেটা একান্তভাবে দেবদেবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যুগযুগান্ত ধরে ধর্মপ্রাণ হিন্দুনরনারী জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণ জন্মোৎসব পালন করে আসছেন। আজও ক্রিসমাসে খৃষ্টের অনুগামীরা যিশুর জন্মক্ষণটিতে গীর্জায় হাই-মাস-এ যোগ দিয়ে থাকেন। বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধদেবের জন্মতিথি। সে দিনটিতে দেশদেশান্তরে বৌদ্ধশ্রমণদের সম্মিলিত কণ্ঠে ওঠে ভগবান তথাগতের স্তব-ধ্বনি,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

প্রতি বৎসর বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব হয়, পণ্ডিচেরীতে ঋষি অরবিন্দের। গভীর অনুরাগে ও নিষ্ঠায় থিরুমানমালাইতে রমন মহর্ষির জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেন তাঁর অগণিত শিষ্য শিষ্যার দল। তাঁরা পুরাণোক্ত ঠাকুর দেবতার ন্যায় পূজনীয়। দেব না হলেও দেবতুল্য।

হাল আমলে ভক্তির ধারা বদলেছে। এখন দেবতারা পাণ্ডার এবং দ্বিজরা চাকরির অধীন। তাঁরা স্বভাবতঃই ভক্তির অতীত। কিন্তু জগতে কোন স্থানই শূন্য থাকে না। ভ্যাকুয়াম অসম্ভব শুধু ফিজিক্সে নয়, মেটাফিজিক্সেও। তাই ভজন, পূজন, আরতি, আরাধনার ক্ষেত্র এখন ধর্মজগৎ থেকে কর্মজগতে স্থানান্তরিত। কর্মটা অবশ্য রাজকর্ম।

অতীতে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ছিল। রাজ্যজয়ে ইসলামের একহাতে ছিল তলোয়ার অন্যহাতে কোরান। য়ুরোপে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রের ভারকেন্দ্র ছিল চার্চের পুলপিটের তলায়। রাজ্যশাসনে রাজার চাইতে রাজগুরুর গুরুত্ব অধিক ছিল। দৃশ্যতঃ একজন রাজদণ্ড ধারণ করতেন, কার্যতঃ অন্যজন তা চালনা করতেন। কার্ডিন্যাল রিশলু ধর্মযাজক ছিলেন কি রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন সে-সম্পর্কে ঐতিহাসিকের মনেও সন্দেহ জাগতে পারে।

অতীতের ভারতবর্ষেও কি রাষ্ট্রতন্ত্রে ধর্মমতের ছাপ লেগেই বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন ঘটেনি? মুস্লিম শাসনে হিন্দুদের মাথায় যে জিজিয়া করের বোঝা চেপেছিল তার পিছনে কি ছিল রাজস্বের প্রয়োজন না বিধর্মী বিদ্বেষ?

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে একালের রাজনীতিতে ধর্মনীতির চাইতে অর্থনীতির প্রভাব বেশী। হবেও বা। অর্থ না থাকলে যে রাজনীতি অর্থহীন একথা ইলেকশানে

ধরাশায়ী রাজনীতিকেরা সবাই বলেন।

বর্তমানে ধর্মের ঐক্য রাজনৈতিক মৈত্রীর গ্যারাণ্টি নয়। ইংরেজ ও জার্মেন দুইই ভগবান খৃষ্টের উপাসক। অথচ পঁচিশ বছরের ব্যবধানে দু' দু'টো মহাযুদ্ধ বাধাতে তাদের বাধেনি। পাকিস্থান ও আফগানিস্থানের কর্তৃপক্ষের ধর্মের মিল সত্ত্বেও মনের মিল ঘটেনি। তবুও একথা মানতেই হবে যে, বেশীর ভাগ দেশেই রাষ্ট্রনীতি আজও সম্পূর্ণরূপে ধর্মবিযুক্ত নয়। বিধর্মীনির্যাতনের দৃষ্টান্ত হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়নি। এমন রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রাত্যহিক যেখানে পরোধর্ম সত্যি সত্যিই ভয়াবহ।

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের জন্মভূমি ব্রিটেনেও রাজা বা রাণীকে ডিফেণ্ডার অব ফেইথ না হয়ে উপায় নেই। ক্যাণ্টরবেরীর আর্চবিশপের মাইনে আসে রাজকোষ থেকে। সেদিক দিয়ে তিনি রাজানুচর। কিন্তু তাঁর বিরোধিতায় এই শতকেও রাজাকে ছাড়তে হয়েছে সিংহাসন, রাজকন্যাকে ছাড়তে হয়েছে প্রেমাস্পদ।

সেকুলারিজম অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিধি যে সব দেশে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকৃত সেখানেও সংখ্যালঘুদের সমস্যা রাজনীতিকে ধর্মের ছোঁয়াচ দিতে ছাড়ে না। মাইনরিটি কথাটা আসলে সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবিভাগেরই ভদ্র পরিভাষা। সম্ভ্রান্ত হোটেলে টিপস্‌কে যেমন বলা হয় সার্ভিস চার্জেস এবং বাথরুমকে টয়লেটস।

একথা ঠিক যে, এযুগের অগ্রগামী চিন্তাধারায় ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত অভিরুচির বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। তার সামাজিক বা সমষ্টি জীবন মৌলিক ন্যায় ও নীতি-বোধের পরিবর্তে ধর্মীয় কিংবা লৌকিক অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, এ ধারণা একালে অগ্রাহ্য। অন্ততঃ রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো একটি ধর্মমতকে মূলমন্ত্র করে তুলতে শিক্ষিত সমাজের রুচিতে বাধে। দেশে ধনতন্ত্র চাই কি গণতন্ত্র চাই তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। আর যাই হোক, মোল্লাতন্ত্র যে চাইনে সে সম্পর্কে দ্বিমত নেই,—দু একটা দেশে ছাড়া।

তবুও গয়লার দুধ থেকে জল বাদ দেওয়ার ন্যায় রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ কাজ। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিকে ধর্মবিরহিত করার চেষ্টায় রাজনীতিই এখন ধর্ম হয়ে উঠেছে। গডের জায়গা দখল করেছে ডেমিগড। বিশ্বপতির স্থানে দলপতি। কনফেশান ও অবতারবাদে ক্যাথলিকদেরও হার মানায় এমন রাজনৈতিক দলের অভাব নেই। প্রসিলিটাইজেশানের অত্যুগ্র আগ্রহে তারা মধ্যযুগের ধর্মান্ধতাকেও লজ্জা দেয়।

মাথা বেশী ঘামালেই যেমন মাথাধরার আশংকা, তেমনি ধর্মের মাতামাতি অধিক হলেই ধর্মান্ধতার উদ্ভব অনিবার্য। মত ও পথের দিক দিয়ে ক্যাপিটালিজম ও সোসিয়েলিজমের মধ্যে আকাশ-পাতাল দূরত্ব। ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমে অহি-নকুল সম্বন্ধ। কিন্তু সব ইজমেরই এক জায়গায় মিল,—সে ফ্যানাটিসিজম। তাই ট্রটস্কী হন নিহত, মহাত্মা গুলিবিদ্ধ, জিলাস কারারুদ্ধ, ও মিখাইল মলোটভ বা জর্জ ম্যালেংকফ পদচ্যুত।

ভারতবর্ষে গান্ধী চেয়েছিলেন সত্যবাদ, নেহরু চান সাম্যবাদ। কিন্তু দেশের জলবায়ুতে যা আছে সে হচ্ছে ভক্তিবাদ। এখানে হাকিম থেকে পিয়াদা, বট থেকে তুলসী এবং গো থেকে গোময় সমস্তই পূজনীয়। পতিমাত্রই পরম গুরু এবং গেরুয়ামাত্রই গরিয়সী। আমাদের রাজনীতিতেও যুক্তির চাইতে ভক্তির ভাগ বেশী, প্রশ্নের চাইতে প্রণাম। তাই এখানে নেতারা নবী হন ; ভোটাররা ভোটারী। গান্ধী ইতিমধ্যেই গণেশে পরিণত। সিদ্ধিদাতা। সকল কাজেই তাঁর নাম নিতে হয়। নইলে ইলেকশান সিদ্ধ হয় না।

স্বর্গস্থ ঈশ্বর অদৃশ্য। তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর নয়। মর্তের দেবতা অথবা উপদেবতারা পার্থিব সংজ্ঞায় অনেক বেশী সত্য। বহুরূপে বিরাজিছে সম্মুখে তোমার। ত্রিকোণ কাঁচের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির মতো তাঁদের মাহাত্ম্য চাকরি, প্রমোশন, লাইসেন্স পারমিট ইত্যাদির মধ্যদিয়ে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় ভক্তদের পানে বিচ্ছুরিত। আশ্চর্য নয় যে, রাষ্ট্রনায়কদের জন্মোৎসব ক্রমশঃ হোলী বা দেয়ালীর মতো বার্ষিক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েছে।

সেকালে গ্রামে, গঞ্জে বারোয়ারি তলায় কবি, যাত্রা বা পালাকীর্তন হতো। একালে সহরের ক্লাব ও সমিতিতে নেতাদের জন্মদিন হয়। পাড়ায় পাড়ায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব বা সরস্বতীপূজার মতো এগুলি সংখ্যায় যেমন বহুল আড়ম্বরেও চমকপ্রদ। বিয়ের লগনসায় বাজারে মাছ দুর্ঘট এবং দৈ সন্দেশ দুর্মূল্য হয়। রবীন্দ্রজয়ন্তী, নেতাজী জন্মোৎসব বা নেহেরু-জন্মতিথিতে রজনীগন্ধার দাম বাড়ে, সভাপতি দুষ্প্রাপ্য হন।

জন্মদিনকে পারিবারিক গণ্ডিতে নিয়ে আসেন প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজ এবং বিলাত ফেরতা ক' ভাই, ডি. এল. রায়ের ভাষায় যারা সাহেব সেজেছে সবাই। কিন্তু জগতে নিম্নগামী শুধু জল নয়, ফ্যাশনও। ধনীর প্রাসাদ থেকে মধ্যবিত্তের ফ্লাটে পেঁছে যেতে তার বিলম্ব ঘটে না। তারতম্য যেটুকু থাকে সেটুকু দামের। অবলীলাক্রমে মোটা অঙ্কের চেক লিখে র‍্যাঙ্কিন বা ফেলপস্ এর দক্ষিণা যোগানো যাদের সাধ্যাতীত, তারা কলেজস্ট্রীটে বা মেটিয়াবুরুজের দর্জির হাতে দেহ সমর্পণ করে লাউঞ্জ সুটের শোক নিবারণ করে। গ্রেট ইস্টার্নে লাঞ্চ বা অশোকায় ডিনার যাদের কাছে অনধিগম্য, তারা মহামায়া কেবিন বা দিলখুশ রেস্টুরেন্টে মাটনচপের সন্ধানে ছোটে। মধুর অভাবে গুড়ং-এর বিধি সকল শাস্ত্রেই আছে। দুধের স্বাদ ঘোলে না মিটতে পারে ; কিন্তু দুধ যেখানে মোটেই জোটে না সেখানে শেষ পর্যন্ত পিটুলিকেই দুধ বলে চালাতে হয়, এ তথ্য মহাভারতের বৃদ্ধরাও জানতেন।

সুখের বিষয়, শিশুদের আনন্দের বস্তু বা বিষয়েই সীমাবদ্ধ। সেগুলির আনুপাতিক মর্যাদা নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা নেই। ম্যাণ্ডাভিল গার্ডেনসে জজসাহেবের বাংলোতে ছেলের জন্মদিনে আসে ফ্লুরি থেকে কেক বা ফ্যারাজিনি থেকে কারিপাফ্। বকুলবাগান রোডে উকীলবাবুর বাড়িতে আসে শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সিঙ্গারা বা

সন্দেশ। মায়েদের কাছে এটা মনোবেদনার কারণ হতে পারে। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ যদি কিছু থাকে তবে সেটা নিছক স্বাদের।

কিশোর জীবনে জন্মদিন অনুষ্ঠানটি সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর ঘটনা। নতুন পরিচ্ছদ বা লোভনীয় আহার্যের দিক দিয়ে গৃহে যে-কোনো পূজা পার্বণ বা সামাজিক উৎসবই ছোটদের পক্ষে আকর্ষণের বিষয়। কিন্তু সে উৎসবে তাদের কোন বিশিষ্ট অংশ নেই। সেখানে তারা বড়দের আনুষঙ্গিক মাত্র। সংবাদপত্রের উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাদের উল্লেখ থাকে না। একমাত্র জন্মদিনেই কিশোরের নিজস্ব ভূমিকা আছে এবং সে ভূমিকাটি অপ্রধান পার্শ্বচরিত্রের নয়,—মূল নায়কের। সেদিনের আয়োজন, আমন্ত্রণ, আনন্দ, কলরব সমস্তই তাকে কেন্দ্র করে। সে দিনটিতে সে রাজার রাজা রাজাধিরাজ। তাই জন্মদিনের জন্য বাল্যকালের আগ্রহ ও উত্তেজনা তুলনাহীন। প্রতীক্ষারত কিশোর মানসে বৎসরে তার আগমনটি সপ্তাহের শেষে রবিবারের মতো যেন বহুবিলম্বিত। তার স্থিতিকালও যেন যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। বছরের অন্য দিনগুলির যাবার তাড়া নেই, অথচ জন্মদিনটি ভোর থেকে দুপুর, এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যায় গড়িয়ে শেষ হয়ে যায়। মনে হয়, ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন আধঘণ্টার পরে।

জন্মদিনে আধুনিক যুগের সমানাধিকারবাদের পরিচয় আছে। উত্তর ভারতে ভাইদোজ ও বাংলাদেশে ভাইফোঁটায় ছেলেদের সমাদর। সেঁজুতি বা মাঘমণ্ডল ব্রতে মেয়েদের একাধিপত্য। জন্মদিনই একমাত্র উৎসব যা ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত। অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা হিন্দুকোডের আগেই প্যারিটি লাভ করেছিল।

ধর্মভেদে সামাজিক প্রথার বিভেদ ঘটে, স্থানভেদে দেশাচারের। বাংলায় আছে নবান্ন, তামিলনাদে পোঙ্গল, পাঞ্জাবে ধুলেণ্ডী। জন্মদিন কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ নয়। আধুনিক মতি গতি যাঁদের তাঁরা শিলং থেকে সৌরাষ্ট্র এবং কাশ্মীর থেকে কেপ কমরীন যেখানেই থাকুন, সেখানেই জন্মদিনের প্রসার ঘটেছে। দেশে সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রতীক আগে ছিল কংগ্রেস, এখন হয়েছে করাপশান। আশা করি ভবিষ্যতে হবে বার্থডে পার্টি। ইমোশন্যাল ইণ্টিগ্রেশানের নামে যাঁদের চক্ষে অশ্রুর বন্যা বয়, একথাটা তাঁরা মনে রাখতে পারেন।

জগতে সমস্ত কিশোর কিশোরীরই অন্তরের কামনা, জন্মদিনটা আরও ঘন ঘন আসুক। হায়, তারা তো কল্পনা করতে পারে না যে তাদের জীবনেই এমন এক সময় আসবে যখন প্রতিটি জন্মদিনের মধ্যেই থাকবে আসন্ন বার্ধক্যের ক্রমিক পদক্ষেপ। সেটা তখন যৌবনের ফেয়ারওয়েল পার্টি; জরার ট্রাফিক সিগন্যাল। বয়স বাড়ছে এ অনুভূতি জীবনের পূর্বাহ্নে যেমনই আনন্দদায়ক, অপরাহ্নে তেমনি অপ্রীতিকর। দাদার চেয়ে অনেক বড় হওয়ার সাধ বড় হয়ে বাবার মতো হলে আপনিই উবে যায়।

চেষ্টা ভিন্ন সংসারে কোনো কিছুই মেলে না। কিন্তু না চাহিতে যারে পাওয়া যায় সে শাদা চুল। টাকার জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন, টাকের জন্য নয়। ধারের সুদের মতো বয়স আপনি বাড়ে। সেটা কমানোটাই সমস্যা। লাইফ ইনসিওরেন্সে নকল

কোষ্ঠী, গভর্নমেণ্টের আপিসে এফিডেভিট এবং দ্বিতীয় পক্ষে কেশে কলপ লেপনের দ্বারা বয়সের ঊর্ধ্বগতি গোপনের জন্য লোকের চেষ্টার অন্ত থাকে না। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে জন্মবার্ষিকীতে উৎসবের পরিবর্তে হরতাল করা উচিত। মামার মাথায় পানিটেল এবং দিদিমার গায়ে রঙিন শাড়ির মতো একটা বিশেষ বয়সের পরে 'জন্মদিন'টা হাস্যকর। ট্রেনে, বা এরোপ্লেনে যেমন হাফটিকিটের বয়স বাঁধা আছে জন্মদিনেরও তেমনি একটা সিলিং থাকা ভালো।

সম্প্রতি জন্মবার্ষিকীটা ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানেও সংক্রামিত হয়েছে। নৌবহরের প্রতিষ্ঠা দিবসটি প্রতিবৎসর নেভি-ডে রূপে পালিত হয়। কলেজ-ডে বিদ্যায়তনের জন্মতিথি। বিশেষ সংখ্যা বা অন্ততপক্ষে বিশেষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের দ্বারা যে নববর্ষ উদযাপিত হয় সে মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিকপত্রের জন্মবার্ষিকী।

প্রাণীমাত্রেরই বেঁচে থাকার একটা সীমানির্ধারিত আছে। গুরুজনের আশীর্বাদ ও প্রিয়জনের প্রার্থনায় প্রত্যেক মানুষেরই শতায়ু হওয়ার কামনা থাকে। কিন্তু সেঞ্চুরিটা যে হামেশাই ঘটে না একথা অন্তত ব্যাটসম্যানেরা জানেন। সর্বাধিক দীর্ঘজীবীর দেশ নিউজিল্যাণ্ডেও মানুষের গড়পরতা আয়ু বাষট্টি বছর মাত্র। গ্রীষ্মপ্রধান ও অনগ্রসর দেশে তার পরিধি হ্রস্বতর। সরকারী চাকরিতে এক্সটেনশন মেলে,—মন্ত্রী সহায় থাকলে। মহাকালের দরবারে সময় পার হলেই রিটায়ারমেণ্ট।

পৃথিবীতে দিনের অন্তে আসে রাত, রাতের সমাধিতে দেখা দেয় দিনের উজ্জ্বল আভাস। আলো ও অন্ধকারের এই ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে ধরিত্রী আপন অক্ষপথে ধীরে নিশ্চিত গতিতে সাঙ্গ করে সূর্য পরিক্রমায় একটি আবর্তন। শীতের বাতাসে তরুশাখা থেকে পরিত্যক্ত পীতপত্রের মতো ক্যালেণ্ডারের সর্বশেষ পাতাটি পড়ে খসে। মানুষের বয়সের অঙ্কে ঘটে যোগ, জীবনের পুঁজিতে ঘটে বিয়োগ। বয়োবৃদ্ধির মানেই তো আয়ু হ্রাস।

পত্রিকার কোনো ধরাবাধা আয়ুষ্কাল নেই। তার জীবন তার কর্তৃপক্ষের আর্থিক সচ্ছলতা, পরিচালন নৈপুণ্য ও সাময়িক অভিরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বোধ হয় সে-কারণেই প্রেস রেজিস্ট্রারের কাছে পত্রিকার হিসাব থাকে, ডেথ-রেজিস্ট্রারের কাছে নয়, যদিও তার মৃত্যুর হার যে কোনো এপিডেমিকের সমতুল্য। ভারতবর্ষ শিশু মৃত্যুর দেশ। এখানে সন্তান থেকে লিমিটেড কোম্পানী বেশীর ভাগের আঁতুড়েই অন্তিম। মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ইত্যাদিও এখানে নিত্য গজায়, নিত্য শুকায়। উদ্ভিদতত্ত্বে ওষধির ন্যায় কোনো কোনো পত্রিকার আবির্ভাব সংখ্যাই অন্তর্জলি সংখ্যায় পরিণত হয়।

সংবাদপত্রের পক্ষে সুবিধা এই যে, প্রাচীনতা তার পক্ষে ক্ষতিকর নয়। সংসারে ওল্ড ফুলদের কেউ পাত্তা দেয় না, কিন্তু ওল্ড ওয়াইনের কদর অসাধারণ। কবিরাজের কাছে পুরানো ঘি সেরের বদলে ভরি দরে বিক্রি হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বাড়ে। তাই তার প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লেখ থাকে,—স্থাপিত আঠারশ' বিরানব্বই সাল, অথবা প্রকাশের অশীতিতম বৎসর। ঠিক

যেমন থাকে ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর লেটারহেডে, জামাকাপড় বা মনোহারী দোকানের সাইনবোর্ডে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংবাদপত্রের কোথাও কোনো মিল আছে এমন ইঙ্গিত মাত্রেই সংবাদপত্রের পাঠকেরা বিস্মিত, মালিকেরা ক্রুদ্ধ এবং সম্পাদকেরা ক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু এ দুয়ের সাদৃশ্য বাহ্যত যতখানি প্রতীয়মান ভিতরে তার চাইতে অনেক বেশী গভীর এবং সে সাদৃশ্য একান্ত আকস্মিকও নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সংবাদপত্রকে ফোর্থ স্টেট বলা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সভ্যজগতে একটি অতি বাঞ্ছিত অধিকার এবং একমাত্র কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব ও সামরিক শাসন ব্যতীত সমুদয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা স্বীকৃত। অতীতে সংবাদপত্রের সূচনা হয়েছে বৃত্তিরূপে নয়, ব্রতরূপে। কিন্তু প্রারম্ভের সঙ্গে পরিণতির সব সময়ে সঙ্গতি থাকে না। গাছের মূলের সঙ্গে ফুলের মিল কতটুকু? উৎস আর সঙ্গমে নদীর রূপ কী এক?

প্রাচীনপন্থীরা বলেন বর্তমানটা কলিযুগ। নবীনপন্থীদের ভাষায় এটা যন্ত্রযুগ, কলি নয় কলীয়। প্রকৃতপক্ষে এখন বৈশ্য যুগ। কমার্শিয়েল এক্সপ্লয়টেশান—ব্যবসায়িক প্রয়োগ ছাড়া একালে কোনো কিছুরই সার্থকতা নেই। টুরিস্ট আকর্ষণের কাজে না লাগালে নয়ন ভুলানো প্রকৃতির শোভাও বৃথা গণ্য হয়। তাই লেকের জলে প্যাডলো, পাহাড়ের গায়ে ফিউনিকুলার ও সমুদ্রতীরে হোটেলের পসরা সাজায়ে বসে রূপোপজীবিনীদের ন্যায় দেশজননীরাও এখন পরদেশীদের হাতছানি দেয়,—এস এস বঁধু, আধ আঁচরে বোস, নয়ন ভরিয়া আমা দেখ।

যুগধর্মে চিত্রকরকে হতে হয় বিজ্ঞাপনের ডিজাইনার, গায়িকাকে প্লে-ব্যাক সিঙ্গার, টেনীস চ্যাম্পিয়ানকে উইম্বেলডনের সেণ্টার কোর্ট থেকে ঝাপ দিতে হয় জ্যাক ক্রামারের ঝুলিতে। যেকালে স্কুল ফ্যাক্টরীতে এবং দেশসেবা ইনভেস্টমেণ্টে পরিণত সেকালে সংবাদপত্রকেও জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর খাতায় নাম না লেখালে চলে না।

ফ্রিডম অব দি প্রেস বলতে যা বোঝায় তা হলো শুধু সরকারী কর্মচারীদের এলোপাতাড়ি গাল পাড়ার অধিকার। নতুবা অন্য যে কোনো ব্যবসায়ীর মতো পত্রিকার সত্বাধিকারীরও মাসের শেষে কাগজের দাম, ব্লকের খরচ, বিজলী বিল, মেটাতে হয়। নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপিত দিনে লোকজনদের মাইনে কড়ায় গণ্ডায় না চুকিয়ে দিলে পেমেন্ট অব ওয়েজেস এ্যাক্টে তার সাজার ব্যবস্থা আছে। সংসারে আর পাঁচজন সাধারণ লোকের মতো সাংবাদিকেরাও ক্ষুধা তৃষায় কাতর, আধিব্যাধিতে ক্লিষ্ট এবং পুত্রকলত্রের ভরণপোষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন। সুতরাং সাংবাদিকতা যদি মিশন থেকে প্রফেশানে রূপান্তরিত হয়ে থাকে তবে তাতে লজ্জার কারণ নেই। সংবাদপত্র কবির ভাষায় কথার বাণ্ডিল হতে পারে। কিন্তু কথার পিছনে যদি অর্থ না থাকে তবে তা নিতান্তই অর্থহীন।

অতীতে পূর্বপুরুষদের দিনের শুরু ছিল পাঁজিতে। বর্তমানে আমাদের দিনের

আরম্ভ খবরের কাগজে। প্রভাতে গরম চায়ের পেয়ালার সঙ্গে দৈনিক পত্রিকার যোগাযোগ প্রায় অবিচ্ছেদ্য। হুইস্কির সঙ্গে যেমন সোডা, গানের সঙ্গে যেমন হারমোনিয়াম। পঞ্জিকা ও পত্রিকার সাদৃশ্য শুধু অনুপ্রাসে নয়, নানা দিকে তারা সমধর্মী। ব্যবহারের মিয়াদে উভয়েই ক্ষণস্থায়ী। বৈশাখের নূতন পঞ্জিকা চৈত্রের শেষেই ঘরের কোণে অনাবশ্যক পুরাতন জঞ্জাল। রবিবারের পত্রিকা সোমবারেই মুদির দোকানে সওদা বাঁধার সরঞ্জাম।

পত্রিকা এবং পঞ্জিকা দুইই মানুষের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাড়ে। পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠা আমাদের অন্ধবিশ্বাসের উপর। বৎসরের কোনো একটি বিশেষ দিনের বিশেষ সময়ে গঙ্গায় ডুব দিলেই পরিণামে অক্ষয় স্বর্গলাভ,—এ ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল। তাই পঞ্জিকা দুরদুরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে চূড়ামণি যোগ এবং মকরসংক্রান্তিতে দশাশ্বমেধের ঘাট বা ত্রিবেণী সঙ্গমে টেনে আনতে পারে। পত্রিকার প্রসার আমাদের অন্ধবুদ্ধির অনুসরণে। সে ভগবানের নামে নিরীহ পথচারীর পিঠে ছোরা বসিয়ে দেওয়ার প্ররোচনা এবং শান্তি আন্দোলনের নামে দূতাবাসের দরজায় চড়াও হতে উৎসাহ জোগায়।

সম্পাদক ও পঞ্জিকাকার উভয়েই সর্বজ্ঞ। পঞ্জিকাকারের ক্ষেত্র আধ্যাত্মিক। কত দণ্ড কত পল গতে উত্তরে যাত্রা নাস্তি সে খবর তিনি জানেন। কোন তিথিতে বার্তাকুভক্ষণে কী দোষ স্পর্শে তারও হদিস আছে তাঁর কাছে। সম্পাদকের কারবার আধিভৌতিক। তিনি হনলুলুর রাষ্ট্রবিপ্লব, নাইজেরিয়ার সাহিত্য এবং ল্যাপল্যাণ্ডের শিল্পকলা সম্পর্কে সমান পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতামত দিতে পারেন। বিজ্ঞানের তত্ত্ব, পাটের বাজার, বাট্টার হার ইত্যাদি জগতের সমুদয় ব্যাপারে তাঁর যদৃচ্ছ বাগবিস্তারের ক্ষমতা আছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন রিভার ভ্যালী প্রজেক্টের মতো তাঁদের লেখনীও মালটি পারপাস।

পঞ্জিকায় আকাশের গ্রহ উপগ্রহের গতি-বিধির নিশানা আছে। বৃদ্ধ পিতামহের কাছে সে তথ্য বিশেষ মূল্যবান ছিল। পুনর্বসু নক্ষত্র ঠিক কখন বৃশ্চিকে সঞ্চারিত হবে সে খবরটুকু ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ডের মাপে না জানলে তাঁর পক্ষে হলকর্ষণ, নৌকাযাত্রা, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি কোন শুভ কর্মেই হাত দেওয়া সম্ভব ছিল না। বর্তমানের পৌত্রপৌত্রীরা ওসব নৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। তারা তারকা বলতে বোঝে চিত্র তারকা। তাঁদের হাঁড়ির খবর থাকে পত্রিকার পাতায়। বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিকের তা জীবনীরস,—রুগ্ন শিশুর পক্ষে যেমন গ্লুকোজ, চলন্ত মোটরগাড়ির পক্ষে যেমন গ্যাসোলীন।

ট্যাক্সির দাপটে যেমন শহরের রাজপথ থেকে ছ্যাকড়া গাড়ি বা টাঙ্গা অন্তর্হিত, পত্রিকার চাপে তেমনি পঞ্জিকা বাঙালীর গৃহচ্যুত। হায়, পঞ্জিকার ক্রমিক অবলুপ্তির ফলে হাঁচি, টিকটিকী, মঘা, অশ্লেষা, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি আমাদের সনাতন জাতীয় ঐতিহ্যও বিনষ্টপ্রায়। মৃতপ্রায় দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য আজকাল সরকারী প্রচেষ্টায় একাধিক কমিটি, কমিশন গঠিত হয়েছে। পঞ্জিকা পূর্ব গৌরব

উদ্ধারের জন্য অনুরূপ প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। এজন্যে কেন্দ্রীয় সরকারে এবং প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে অবিলম্বে একজন তিন পোয়া মন্ত্রী অর্থাৎ মিনিস্টার অব স্টেট নিযুক্ত করা আবশ্যক। পঞ্চায়েত মন্ত্রী অপেক্ষা পঞ্জিকামন্ত্রী নিশ্চয়ই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁদের অধীনে ডিরেক্টার জেনারেল, ডিরেক্টার, জয়েন্ট ডিরেক্টার, ডেপুটি ডিরেক্টার ইত্যাদি সহ এক একটি মিনিস্ট্রী বা ডিপার্টমেণ্ট অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

বলাবাহুল্য, প্রাচীন তাঁতশিল্প, মৃৎ শিল্প প্রভৃতির ন্যায় পঞ্জিকার পুনঃ প্রচলনও একমাত্র যুগোপযোগী সংস্কারের দ্বারাই সম্ভব। আধুনিকীকরণ ছাড়া কোনো পুরানো বস্তু বা প্রথাই এযুগে আর গ্রহণযোগ্য হবে না। মডার্নইজমের দাবীতেই এখন চানাচুর প্যাকেটে, সন্দেশ বাক্সে এবং ময়দা পলিথীনের ব্যাগে বিক্রী হয়। গরুর গাড়িতে রবার টায়ার ও চরখায় বল বিয়ারিং দেখা যায়। সুতরাং পঞ্জিকারও যথোচিত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন পঞ্জিকায় বর্ষারম্ভে লেখা থাকে শনি রাজা মঙ্গল মন্ত্রী ইত্যাদি। পরিবর্তিত সংস্করণে সে স্থলে হবে, মেট্রোগল্ডুইন রাজা প্যারামাউণ্ট মন্ত্রী। ফলং সিনেমাহলের টিকেট কাউণ্টারে কিউ বৃদ্ধি। প্রচলিত পঞ্জিকায় মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের উল্লেখ থাকে। অধুনা মহাপুরুষদের ডেফিনেশান অর্থাৎ সংজ্ঞা বদলে গেছে। সুতরাং মডার্ন পঞ্জিকায় লিখতে হবে—সাতই বৈশাখ ওয়াহিদা রেহমান বা ব্রিগেড বার্ডোটের জন্মতিথি। বারোই শ্রাবণ ক্লার্ক গেবল বা ছবি বিশ্বাসের মৃত্যু বার্ষিকী!

স্ত্রীষু

দুই বর্ণের সংযোগে সন্ধি। দুই নদীর সমাবেশে সংগম। দুই নরনারীর মিলনে পরিণয়। সংগীতে যেমন ডুয়েট, রসায়নে যেমন কম্পাউন্ড, রাজনীতিতে যেমন পি-এস-পি।

মানব-ইতিহাসে বিবাহের প্রবর্তন কবে তা জানিনে। তার প্রচলন কেন তা অনুমান করতে পারি।

সৃষ্টির গোড়ায় স্বর্গোদ্যানে মানুষ ছিল মাত্র দুটি। কোনো শুভদিন-নির্ঘন্টের সুতহিবুক যোগে শ্রীমতী ইভের কুশণ্ডিকা হয়েছিল এমন জনশ্রুতি নেই। পুরাণে জেট-প্লেন ও বেদে এ-আর-পি'র অস্তিত্ব প্রমাণ করে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট পেয়ে থাকেন, তাঁরাও এখন পর্যন্ত আদমের বাসর-ঘর আবিষ্কার করতে পারেননি।

ক্যাফেটারিয়ায় স্বহস্ত-পরিবেশনের মতো নিজেরাই ফলমূল আহরণ করে আদি জনক-জননী মোটামুটি অনন্যনির্ভর জীবন যাপন করেছেন। শীত, আতপ এবং বর্ষা-বাদলের অকস্মাৎ হ্রাস-বৃদ্ধিতে যকৃত বা পাকস্থলী বিকৃত হয়ে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেহকে হয়তো বিকল করেছে। কিন্তু হাতের কাছেই বত্রিশ টাকা ফিজ-এর বিলাতী ডিগ্রীওয়ালা ডাক্তার না থাকায় সামান্য সর্দি কাশি বা অগ্নিমান্দ্য প্যারাটাইফয়েড বা গ্যাসট্রো-এনট্রাইটিস প্রভৃতি মারাত্মক নাম নিয়ে প্রাণঘাতিকা হয়ে ওঠেনি।

প্রথম মানব-মানবীর সন্তান সন্ততির সঠিক সংখ্যা অপরিজ্ঞাত। গার্ডেন অব ইডেনে আর যাই থাক, সেন্সস কমিশনার ছিল না। তবুও সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে, জগতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ জীবনযাত্রা জটিলতর হয়েছে। মানুষ মৃগয়া ছেড়ে ধরেছে ভূমিকর্ষণ। শরায়ুধ থেকে হয়েছে হলায়ুধ। গুহাবাস পরিত্যাগ করে শুরু করেছে গৃহবাস।

চুলের সঙ্গে যেমন টেড়ি এবং কানের সঙ্গে যেমন দুল, গৃহের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দেখা দিয়েছেন গৃহিণী। প্রশ্ন উঠতে পারে, গৃহের তরে গৃহিণী, না গৃহিণীর জন্য গৃহ? এ-তর্ক শুধু অর্থহীন নয়, অন্তহীনও বটে। ধপাস করে পড়ে না, পড়ে ধপাস করে? নেতা হয়ে জেলে যায়, না, জেলে গিয়ে নেতা হয়?

অবশ্য নৈয়ায়িককে লজ্জা দিতে পারেন এমন সুচতুর ভাষ্যকারও আছেন। পররাষ্ট্রনীতিতে নিরপেক্ষতা রক্ষার মতো শ্যাম এবং কুল বজায় রাখার কৌশল তার আয়ত্তে। তিনি বলেছেন, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে,—গৃহ বলতেই বোঝায় গৃহিণী। অনুমান করি, লোকটা অকৃতদার।

আসল কথা, আদিযুগে সংসারযাত্রাটা নারী বা পুরুষ কারুর পক্ষেই এককসাধ্য ছিল না। নেহাত প্রয়োজনের তাগিদেই দু'পক্ষকে হাত মিলাতে হয়েছে। ব্যবসা চালাতে যেমন পার্টনারশিপ। গভর্নমেন্ট দখল করতে যেমন কোয়ালিশন। কলকাতায় যেমন স্যান্ডারসনস অ্যান্ড মরগ্যানস; ঢাকায় যেমন আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তানী কংগ্রেস, প্রাক আয়ুব পর্বে।

বিবাহকে কল্পনাবিলাসী কবিরা বলেন,—ফুলডোর। যুক্তিবাদী আইনজ্ঞেরা

বলেন, সামাজিক চুক্তি। কোষ্ঠী বা হস্তরেখা বিচারক জ্যোতিষশাস্ত্রীরা বলেন দৈবের নির্বন্ধ। এ-ছাড়াও পরিণয়ের একাধিক পরিচিতি আছে। তার সবগুলি কিছু শ্রুতিসুখকর নয়।

সকলেই জানি, জগতে একজাতীয় অতিসন্দিগ্ধ লোক আছে কোনো কিছুতেই যাদের আস্থা নেই। ইংরেজীতে এদের বলে সীনিক। এরা নিন্দুকের অধিক। সভাপতিত্বের অনুরোধের পিছনে এরা দেখতে পায় চাঁদার খাতা, সামনে নিজের সুখ্যাতি শুনে আশঙ্কা করে টাকা-ধারের ভূমিকা। ন্যাশন্যালাইজেশনের অর্থ জানে,—ইনেফিসিয়েন্সি। প্ল্যানকে বলে,—চাকরি-সৃষ্টি এবং জনগণের নামে অশ্রু-বরিষণ দেখলে ভাবে, আসন্ন ইলেকশন। অর্ধপূর্ণ কুম্ভ এদের চোখেই দেখায় অর্ধশূন্য। এই স্বভাব-সংশয়ীরা বিবাহের আখ্যা দেয়—বেড়ি। এরা বন্ডকে বলে বন্ডেজ; উদ্বাহ-বন্ধনকে উদ্বন্ধন।

সংসারের বৈশিষ্ট্যহীন বাকী শতকরা নিরানব্বইজন, বাংলা দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাদের বলা হয় আপামর সাধারণ, এসব সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ধার ধারে না। সেক্সপীয়র তারা পড়েনি। গোলাপের সন্ধানও বিশেষ রাখে না। কিন্তু জানে, পৃথিবীতে নামে কিছুই যায় আসে না। যে ট্রেনের নাম এক্সপ্রেস সেও টাইমটেবেলের তিন ঘণ্টা পরে পৌঁছায়। যে-দোকানী শিশিতে চিরতার আরক বেচে, সেও দোকানের সাইনবোর্ডে লেখে,—দি গ্রেট ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস। সুতরাং কোনো কিছুরই সংজ্ঞা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তাদের দিব্যজ্ঞান নেই, কিন্তু কান্ডজ্ঞান আছে। বিবাহকে তারা মনে করে একটা লটারী। পৃথিবীতে ভীরু ব্যক্তিদের আদি, অকৃত্রিম ও একমাত্র অ্যাডভেঞ্চার। তবে ডার্বি বা রেঞ্জার্সের সঙ্গে তার তফাত শুধু এই যে, হেরে গিয়ে টিকিটখানা ছিঁড়ে ফেলা চলে না। চক্রব্যূহের মতো উদ্বাহেরও আগমন-পথ সহজ, নির্গমনপথ দুরূহ। আধুনিক অভিমন্যুদের জানা থাকা ভালো যে, দাম্পত্যনগরীর সবগুলি রাস্তাই ওয়ান-ওয়ে।

মানুষের জন্ম আকস্মিক, মৃত্যু অনিবার্য। এই অনিয়ন্ত্রিত উপক্রমণিকা ও উপসংহারের মধ্যপথে বিবাহ জীবনের স্বরচিত অধ্যায়। কোর্টশিপের তো কথাই নেই, চাক্ষুষ পরিচয় বিবর্জিত বর-কনের গুরুজন নির্ধারিত সনাতন হিন্দু-বিবাহও স্বয়ম্ভু নয়। তার পিছনে দীর্ঘদিনব্যাপী সজ্ঞান আয়োজনের প্রাচুর্য আছে। বিবাহ স্থির যদি-বা হয় স্বর্গে, রেজেস্ট্রি হয় মর্তে। সেটা যথেষ্ট চেষ্টাসাপেক্ষ। মাসিকপত্রিকার নবপর্যায়ে প্রকাশের মতো নরনারীর বিবাহিত পর্ব যুগ্ম সম্পাদনায় জীবনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র।

বিবাহ পুরুষকে দেয় স্থৈর্য, নারীকে দেয় প্রতিষ্ঠা। স্বামীর বাড়ায় দায়, স্ত্রীর বাড়ায় দাম। সে-দাম নারীর নিজস্ব নয়। গালের উপরে পাউডার এবং নখের উপরে রঙের মতো সেটা প্রক্ষিপ্ত।

গণিতশাস্ত্রে শূন্যের নিজের কোনো সত্তা নেই। তার মূল্য নির্ধারিত হয় পার্শ্বস্থ সংখ্যাটির গুরুত্বে। দশের চাইতে কুড়ির কদর বেশী। ষাটের চাইতে আশীর ওজন অধিক। সমাজে নারীর মর্যাদা নিরূপিত হয় পিতা অথবা পতির গৌরবে। নায়েবকন্যা অপেক্ষা জমিদার-নন্দিনীর প্রতাপ প্রবল থার্ড-মাষ্টার অক্ষয়বাবুর মেয়ের তুলনায় ব্যারিষ্টার নন্দী সাহেবের তনয়ার নাসিকা উত্তুঙ্গ।

পিতৃপরিচয়ের চাইতেও ভর্তৃপরিচয় গুরুতর। সেকশন-অফিসর বসু-গিন্নীর চেয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি সেন মহিষী অধিকতর দুঃসহ। কবিরা যে নারীকে আকাশের চন্দ্রমার সঙ্গে তুলনা করেন সেটা বিশেষ অর্থপূর্ণ। কে না জানে যে, চাঁদের আলো তার নিজের নয়,—সমস্তটাই পরস্ব।

মালাবদলের দ্বারা নারী বদল করে পদবী। সেটা প্রকাশ্যে। পুরুষ পরিহার করে পদ। সেটা অলক্ষ্যে। সপ্তপদীর পর পরিবারের কর্তৃপদ থেকে স্বামীর ত্বরিত অপসৃতি লেবার-য়ুনিয়নে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের মতোই নিঃশব্দ কিন্তু নিশ্চিত।

কে না জানে যে যুক্তির চেয়ে শক্তি প্রবল, রূপের চেয়ে সোনা। কিন্তু সোনার চাইতেও জোরালো অস্ত্র আছে জগতে। তার নাম সোহাগ। অকারণ হাস্য এবং অকারণ অশ্রু—এই সাঁড়াশি-আক্রমণ, সামরিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'পিনসার মুভমেণ্ট' দ্বারা স্ত্রীরা অবলীলাক্রমে স্বামী এবং সিন্দুকের চাবি আঁচলে বাঁধেন। মাল ও মালিক দুই-ই দখলে আনেন বিস্ময়কর তৎপরতায়।

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ নারীর জীবনের আরম্ভ। আইনসভায় ডিবেটের আগে কোশ্চেন-আওয়ারের ন্যায় তার প্রাগবৈবাহিক অংশটুকু বিবাহিত পরিচ্ছেদটিরই মুখবন্ধ। পালার আগে প্রস্তাবনা। কবির ভাষায় বলতে গেলে, সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালার আগে দুপুরবেলায় সলতে পাকানো। অতি আধুনিক অভিজাতমন্ডলীর ভাষায় ব্যাখ্যা করলে, ডিনারের আগে যেমন ড্রিংকস্; সিনেমায় অভিনয়ের আগে যেমন মেক-আপ।

বস্তুতঃ, গোত্রান্তরের দ্বারা প্রত্যেক নারীরই ঘটে জন্মান্তর। কাকে বিয়ে করব সে-ভাবনায় একালের যুবকেরা যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় সেটা একান্তই নিরর্থক। কারণ যাকেই বিয়ে করা যাক না কেন, দু'দিন পরেই দেখা যায়, সে অন্য আর কেউ।

পরিণয় পুরুষের জীবনে আনে সমাপ্তি। তার বিবাহোত্তর অস্তিত্ব শুধু পূর্বজীবনের ভগ্নাবশেষ। নাটকের এপিলোগ বা বক্তৃতার পেরোরেশানের মতো সেটা মূল কর্মকাণ্ডের অকিঞ্চিৎকর অনুবর্তন। শুধু করুণ নয়,—কৌতুকাবহ। আশ্চর্য নয় যে, পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সাহিত্যেই বিবাহিত পুরুষকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সর্বাধিক প্রহসন।

দাম্পত্যে স্বামীর প্রয়োজন প্রকট, প্রভাব নাস্তি। ইংরেজী ভাষায় অ্যাপস্ট্রপি চিহ্নের ন্যায় তার অবস্থিতি আছে, উচ্চারণ নেই। কাঁঠালের বোঁটার মতো রস বা রসদ সংগ্রহের দিক থেকে তার অপরিহার্যতা স্বীকৃত হলেও ভোজের থালায় সে মনোযোগের বাইরে। কর্তা ছাড়া কর্ম ব্যাকরণে অসিদ্ধ হতে পারে,—গৃহস্থালিতে নয়।

রাষ্ট্রনেতার পক্ষে বিদেশে রাষ্ট্রদূত হওয়া মানেই যেমন সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায়, তরুণের জীবনে পত্নীযোগের অর্থ তেমনি দুঃসাহস ও দুঃসাধ্যের পথ থেকে পশ্চাদপসরণ। সোলার টোপরটি আকারে ক্ষুদ্র এবং ওজনে লঘুভার। সেটি শিরোধার্য করা মাত্রই মস্তিষ্ক থেকে নিশ্চিহ্ন হয় ছাত্রজীবনে উদ্গত যত বৃহৎ কল্পনার অংকুর। প্রতিবাদ-সভা, ইনকেলাব, ট্রামে অগ্নি-সংযোগ, পরীক্ষার গার্ডকে প্রহার ইত্যাদি প্রগতিমূলক কার্যেয় সে সমাধি-স্তম্ভ। সেকালের সেজের বাতি নিবিয়ে দেওয়ার ঠোঙা আর একালের ফায়ার-এক্সটিংগুইশারের সঙ্গে তার সাদৃশ্য একান্ত

অহেতুক নয়।

পাণিগ্রহণের ফলে পুরুষ ঘরে আনে স্ত্রী, ডাক্তারের বিল ও সেকরার ক্যাটালগ। কুইনিনের বড়ির উপরে চিনির প্রলেপের মতো তার সঙ্গে আসে কিছুটা যৌতুক। সেটা পাত্র-সংগ্রহের জন্য পাত্রীপক্ষের দেয়া ঘুষ। ক্রেতা আকর্ষণের জন্য সিগারেট বা চা-এর প্যাকেটের সঙ্গে যেমন গিফ্‌ট-কুপন।

পরিণয়ের দ্বারা নারীর ঘটে বিস্তার। জায়া থেকে জননী তো প্রাণিতত্ত্বের সিঁড়িতে একটি মাত্র ধাপ। এমন কি একা গৃহিনীও একক নন। এ-যুগের মেয়েরা সচিব হলে সেক্রেটারিয়েটে বসে, অন্দরে নয়। সখীরা মিলে কলেজের করিডর বা রেস্তোঁরায় এবং ললিতকলার দৌড় সিনেমা বা বড়জোর সঙ্গীত-সম্মেলন। সুতরাং কালিদাসের তালিকার সঙ্গে একালিনী গৃহিনীর ঠিকুজি মেলে না। কিন্তু গিলবার্ট-সলিভ্যানের গীতিনাট্য-বিশেষের মতো আধুনিক পারিবারিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও সবক'টি মুখ্যপদেরই অধিকারিণী মাত্র একটি। পত্নীমাত্রেরই ধমনীতে বয় একনায়কত্বের রক্ত। অন্ততঃ এক্‌জিকিউটিভ ও জুডিশিয়ারির পৃথক অস্তিত্বে তাদের বিশ্বাস নেই।

মোট কথা, স্ত্রী হচ্ছেন সেই বস্তু যার অভাবে সংসার চলে না এবং উপস্থিতিতে সংসার অভাবে অচল হয়। যাকে পাওয়ার পূর্বে পুরুষেরা কবিতা পড়ে এবং পাওয়ার পরে গীতা। যাকে না পেয়ে খোঁজে পটাশিয়াম সায়ানাইড বা লেক এবং পেয়ে সন্ধান করে গেরুয়া বা রুদ্রাক্ষ। বোধহয় তার সম্পর্কেই লেখা হয়েছে—যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। সম্ভবতঃ কবিগুরুরও এটি বিবাহিত জীবনেরই রচনা।

বিবাহের প্রসঙ্গ তুললেই প্রেমের কথা আসে। য়ুনিয়নের নাম নিলেই যেমন ধর্মঘট কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেমের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। প্রেম ও পরিণয়কে যাঁরা শাড়ির সঙ্গে সায়া অথবা ভোটের সঙ্গে ক্যানভাসিং-এর মতো অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করেন তাঁরা পণ্ডিত হলেও সংসার অনভিজ্ঞ।

সাগরের ওপারে বিদেশী সমাজের রীতি,—আগে প্রেম, পরে বিবাহ। আগে সুর সাধা, পরে গান। সাগরের এপারে স্বদেশী শাস্ত্রের বিধান,—আগে বিবাহ, পরে প্রেম। আগে অস্ত্রোপচার, পরে ব্যাণ্ডেজ। প্রথম পক্ষের ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় পক্ষের প্রমাদ দুই সমতুল্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন, রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা মেশাতে গেলে ইতঃ নষ্ট এবং ততঃ ভ্রষ্ট হয়। বিবাহের সঙ্গে প্রেমের সংমিশ্রণের চেষ্টাও হাস্যকর। প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে বিয়ে করা, টাকা বাড়ানোর জন্য রেস খেলার মতোই সর্বনাশা হঠকারিতা।

রাজকুলেষু চ

মহাকাঞ্চনদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট

অর্থমেব জয়তে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ফাইল নং	ই। জি। ৪৫৩
সাল	১৯৫৭-৫৮
বিষয়	স্কুলে অর্থ সাহায্য

করেসপণ্ডেন্স ঃ এস- ১

মহামান্য মহাকাঞ্চন সরকারের শিক্ষা বিভাগ সমীপেষু,

মহামহিম সরকার বাহাদুরের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, পঞ্চদশ পরগণার নিকাশীপুর গ্রামে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের বাস। কিন্তু গ্রামের বালক বালিকাদের জন্য এতাবৎ এতদঞ্চলে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গত কয়েক বৎসরে পার্শ্ববর্তী যবন দ্বীপ হইতে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার গ্রামে আসিয়াছে। ইহাতে স্কুলের অভাব আরও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। গ্রামবাসীদের সকলের চেষ্টা ও সহযোগিতায় গত বৎসর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

এযাবৎ স্কুলের সমুদয় ব্যয়ভার আমরা গ্রামবাসীরা নিজেরাই চাঁদা তুলিয়া নির্বাহ করিয়াছি। কিন্তু এ-বৎসর প্রথমে অনাবৃষ্টি ও পরে বন্যায় শস্য নষ্ট হওয়াতে আমাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। অনেকেরই চাঁদা দেওয়ার সামর্থ নাই। শিক্ষক মহাশয়ের বেতন নিয়মিত দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বটতলায় যে পুরাতন চালা ঘরটিতে স্কুল বসিতেছে তাহারও আশু সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হইতেছে না।

অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, সদাশয় সরকার বাহাদুর গ্রামের এই বিদ্যালয়টিকে মাসিক দশ টাকা নিয়মিত সাহায্য এবং স্কুল ঘরের দরমার বেড়া ও খড়ের চাল মেরামতের জন্য পঞ্চাশ টাকা এককালীন দান মঞ্জুর করিয়া গ্রামস্থ বালক বালিকাগণের শিক্ষালাভের পথ সুগম রাখিতে আজ্ঞা হয়।

ইতি—ইংরেজী ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সাল।

বশংবদ নিবেদক

নিকাশীপুর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নোটিংস ঃ

সিরিয়েল নম্বর ১। নিকাশীপুর গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে আবেদন (পি-ইউ-সি)।

নিকাশীপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক দশ টাকা ও এককালীন দান হিসাবে পঞ্চাশ টাকার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহা উদ্বাস্তুদের শিক্ষার বিষয়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে যথোচিত ব্যবস্থার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সি. কে. জি.
১৩। ১২। ৫৭
ইউ. এস.

আর. ব্যানার্জী
১৬। ১২। ৫৭

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় (শ্রী বি. বাসু)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউ নোট নম্বর ২০৩৫। এফ। ৫৭ তারিখ ১৯। ১২। ৫৭

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

এই মন্ত্রণালয় হইতে শুধু সে-সব স্কুলেই সাহায্য দেওয়া হয় যেগুলি পুরাপুরি অথবা মুখ্যতঃ উদ্বাস্তু বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত। বর্তমান দরখাস্তে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে যে স্কুলটি গ্রামের সমুদয় বালক বালিকাদের জন্য। সুতরাং ইহা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার বিষয়। ডি. এস. দয়া করিয়া দেখিতে পারেন। নির্দেশের জন্য।

পি দাস.
১২।১।৫৮

এল. এস. আর.
।১।৫৮
ইউ. এস.

ডি. এস. (প্রাইমারী স্কুল)

সমগ্র গ্রামের শিক্ষার দায়িত্ব উদ্বাস্তু মন্ত্রণালয় লইতে পারে না। শিক্ষা বিভাগকে জানাইয়া দেওয়া হউক।

এন. চক্রবর্তী
ডি. এস.
১৬।১।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য ঘটনাসম্মত নহে। বিদ্যালয়টি সমগ্র গ্রামের বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য হইলেও উহাতে বর্তমানে অনেক উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রী পড়িতেছে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ সকল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বিদ্যালয়টি উক্ত মন্ত্রণালয় হইতে অর্থ সাহায্য পাইবার অধিকারী। এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো যাইতে পারে।

আর. ব্যানার্জী
ইউ. এস.
৭।৩।৫৮

সি. কে. জি.
৩।৩।৫৮
ইউ. এস.
ডি. এস.

জে. এসও হয়তো দেখিতে চাহিবেন

পি. সি. দত্ত

জে. এস. ডি. এস.

১০।৩।৫৮

এন. সি. রায়

১১।৩।৫৮

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাহারা স্টাইপেণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত আমরা তাহাদিগকে নির্ধারিত হারে বৃত্তি দিতে প্রস্তুত আছি। যে সব উদ্বাস্তু ছাত্র অথবা ছাত্রী পরীক্ষায় শতকরা অন্যূন পঞ্চাশ ভাগ নম্বর পাইয়াছে তাহারা নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত শিক্ষা বিভাগের মারফতে পাঠাইলে প্রত্যেকটি আবেদন বিবেচিত হইবে। দরখাস্তের সঙ্গে যথারীতি উদ্বাস্তু সার্টিফিকেট, অভিভাবকের মাসিক আয়ের পরিমাণ, পরিবারের জনসংখ্যা একজন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক এটেস্টেশান করাইয়া দাখিল করিতে হইবে।

পি. দাস

ইউ. এস.

১৭।৪।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জয়েণ্ট সেক্রেটারী অনুগ্রহপূর্বক দেখুন। এ অবস্থায় অর্থ সাহায্যের বিষয় আমাদিগকেই বিবেচনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্ল্যানিং শাখার অভিমত জানা প্রয়োজন। তাহাদের বর্তমান অথবা আগামী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিকাশীপুরে অথবা উহার নিকটবর্তী কোনো গ্রামে কোনো স্কুল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে কি? একই অথবা কাছাকাছি গ্রামে একাধিক স্কুল স্থাপন গভর্ণমেণ্টের পলিসি নহে। প্ল্যানিং শাখা দয়া করিয়া দেখিতে পারেন।

আর. ব্যানার্জী

জে. এস. ইউ. এস.

৯।৬।৫৮

এন. সি. রায়

ডি. এস. (প্ল্যানিং) ১০।৬।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ফ্রেস রিসিট

মাননীয় শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী

সমীপেষু

মহাশয়,

আমাদের প্রাথমিক স্কুলের জন্য মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য এবং স্কুলঘরের মেরামতের জন্য এককালীন অর্থ প্রার্থনা করিয়া গতবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মহামান্য সরকারের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলাম। অদ্যাবধি তাহার কোনো প্রাপ্তি সংবাদ পাই নাই। ইতিপূর্বে দুইখানি চিঠি লিখিয়া এ-বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। তাহারও কোনো উত্তর পাই নাই। এক্ষণে জানাইতেছি যে আর্থিক অনটনের হেতু আমাদের বিদ্যালয় পরিচালনা সুকঠিন হইয়াছে। গত তিনমাস যাবত স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের বেতন বাকী পড়িয়াছে। গৃহটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, সম্মুখে বর্ষা আসন্ন। তাহার পূর্বেই উহার চাল নতুন করিয়া না ছাওয়া হইলে ঐ ঘরে বিদ্যালয় বসিতে পারিবে না।

অতএব আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে অবিলম্বে আমাদের অর্থসাহায্যের আবেদন মঞ্জুর করিয়া বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়।

ইতি—ইংরেজী ২০শে জুন, ১৯৫৮ সাল।

আপনার একান্ত বশংবদ
নিকাশীপুর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

করেসপণ্ডেন্স ঃ সিরিয়েল নম্বর ২—রিসিট (এফ-আর)

ফ্রেস রিসিটটি নিকাশীপুর গ্রামের অধিবাসীদের পত্র। এ সংক্রান্ত সমুদয় কাগজপত্র প্ল্যানিং শাখায় পাঠানো হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে তাহা ফিরিয়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

সি. কে. জি.
২৯।৭।৫৮

ইউ. এস.

পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করা হউক। প্ল্যানিং শাখাকে রিমাইন্ডার দেওয়া হউক।

আর. ব্যানার্জী
২।৮।৫৮

করেসপণ্ডেন্স ঃ সিরিয়েল নম্বর (৩) ইস্যু

নিকাশীপুর গ্রামবাসীদের প্রতি

মহাকাঞ্চনদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ই। জি। ৪৫৩। ৫৭-৫৮ মহানগর ১০।৮।৫৮

প্রিয় মহাশয়গণ,

আপনাদের ১১-৯-৫৭ তারিখের আবেদনপত্র ও তৎপরবর্তী রিমাইন্ডারগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
পক্ষে/আণ্ডার সেক্রেটারী

নোটিংস ঃ

সিরিয়েল নম্বর (৪) ইস্যু

বিষয় ঃ—নিকাশীপুর গ্রামের স্কুলের অর্থসাহায্যের আবেদন

প্ল্যানিং শাখা দয়া করিয়া ৯।৬।৫৮ তারিখে প্রেরিত ই। জি। ৪৫৩।৫৭-৫৮ ফাইলটি তাঁহাদের মন্তব্য সহ শীঘ্র ফেরৎ পাঠাইবেন কী?

পি. সি. সাক্সেনা
সেক্সান অফিসার
গ্রেড. টু
১০।৮।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্ল্যানিং শাখা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, নিকাশীপ্‌র গ্রামে কোনো বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব নাই। যখন চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হইবে তখন অন্যান্য অঞ্চলের প্রয়োজন বিবেচনার সঙ্গে নিকাশীপ্‌র গ্রামের দাবী বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে। র্‌রেল ডিভলাপমেণ্ট এবং আর. ই. এস. ব্লকের স্কিমেটিক বাজেট হইতেও স্কুলের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এই কাগজপত্র দেখিতে পারেন।

কে. এল. বক্সী
বিশেষ কাজে নিয্‌ক্ত অফিসার
প্ল্যানিং,
১৯। ৮। ৫৮

গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয়

নিকাশীপ্‌রে কোনো আর. ই. এস; আর. ডি. অথবা পোস্ট ইনটেনসিভ ব্লক নাই। স্‌তরাং স্কিমেটিক বাজেট হইতে সাহায্য দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

এল. এম. দাস.
জয়েণ্ট ডিভলাপমেণ্ট কমিশনার
৩। ৯। ৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্‌র্ববর্তী মন্তব্যগ্‌লি দয়া করিয়া দেখা হউক। উপয্‌ক্ত ক্ষেত্রে বেসরকারী স্কুলে মাসিক সাহায্য দেওয়ার প্‌র্ব নজীর আছে। স্কুল ঘরের মেরামতের জন্য এককালীন সাহায্য দিতে হইলে আমাদের অর্থদপ্তরের অন্‌মোদন লইতে হইবে। কিন্ত্‌ তৎপ্‌র্বে ইহা স্থির করা প্রয়োজন যে একই ঘরে ছাত্র ও ছাত্রীদের ক্লাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা। স্ত্রীশিক্ষার ডেপ্‌টি ডিরেক্টারের অভিমত লওয়া সমীচীন।

সি. কে. জি.
১২। ৯। ৫৮

আর. ব্যানার্জী
ইউ. এস.
১৩। ৯। ৫৮

ডি. ডি. (মিসেস মিত্র)

স্কুলে সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে। তবে যেখানে প্‌থক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব নহে সেখানে নিম্ন শ্রেণীতে সহশিক্ষা অন্‌মোদন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

নিকাশীপুরের বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বয়স নয় বৎসরের অধিক না হইলে একই ঘরে ক্লাশ করিতে আপত্তি নাই। প্রসঙ্গতঃ চালাঘরটি স্বাস্থ্যসম্মত কিনা সে বিষয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে হয়।

(মিসেস) টি. মিত্র
ডেপুটি ডিরেক্টার (স্ত্রী শিক্ষা)

ইউ. এস. (গ্রাণ্টস) ২৭। ৯। ৫৮

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (ডি. জি. এইচ. এস.) তাঁহাদের অভিমত দয়া করিয়া জানাইবেন কি?

আর. ব্যানার্জী
২। ১০। ৫৮

ডি. জি. এইচ. এস. (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়)

ডিরেক্টার জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

যথেষ্ট আলো হাওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে চালাঘরে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া কোনো আপত্তি নাই। ঘরটি নিয়মানুযায়ী কিনা তাহা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের রিপোর্ট না পাইলে আমাদের পক্ষে কোনো মতামত জানানো সম্ভব হইবে না।

এ. কে. গুপ্ত
লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল এম. বি. (কলি), এম. আর. সি. পি. (এডিন),
এল. আর. সি. পি. (লণ্ডন)
ডি. জি. (এইচ. এস.)
১৯। ১১। ৫৮

ডি. ডি. জি.

পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট অনুগ্রহপূর্বক দেখুন।

এল. রুস্তগী
ডি. ডি. জি. (এইচ. এস)
২৩। ১১। ৫৮

পি. ডব্লিউ. ডি.

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউ নোট নম্বর ২০৩৫। এফ। ৫৭, তারিখ ১৮। ১০। ৫৮

পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট

নিকাশীপুর স্কুল গৃহ সম্পর্কে এই দপ্তরে তথ্য নাই। তবে নীতির দিক দিয়া চালাঘর সমর্থনযোগ্য নহে। উহার ননরেকারিং এক্সপেণ্ডিচার কম হইলেও রেকারিং এক্সপেণ্ডিচার এত বেশী যে চালাঘর নির্মাণ পরিণামে জনসাধারণের অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে। পাকা দালান ছাড়া কোনো স্কুলঘর তৈয়ার বা মেরামতে কোনো সরকারী অর্থসাহায্য দান এই বিভাগ সুপারিশ করিতে পারে না। বস্তুতঃ নূতন স্কুলের স্থাপনে পি. ডব্লিউ. ডি. কোড অনুযায়ী পাকাবাড়ি তৈয়ার আবশ্যিক ঘোষণা করিয়া নিয়ম প্রণয়ন আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রস্তাব করিতেছি।

এ. পি. চক্রবর্তী
চীফ ইঞ্জিনিয়র (কনষ্ট্রাকশন)
৯।১২।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপরের নোট দ্রষ্টব্য। পাকা দালান ব্যতীত স্কুল স্থাপন করা হইবে কিনা তাহা পলিসি ডিশিসানের ব্যাপার।। যতক্ষণ ক্যাবিনেট সেইরূপ কোনো সিদ্ধান্ত না করিতেছেন ততক্ষণ স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই রীতি। দরখাস্তে উল্লেখিত সাহায্যদানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চাওয়া যাইতে পারে।

সি. কে. জি.
৩০।১২।৫৮

ডি. এস. (গ্রাণ্টস)

ডি. এস. (গ্রাণ্টস) টুরে গিয়াছেন। ফিরিয়া আসিলে পুনরায় পাঠাইবেন।

পি. কে. রায়
(ডি. এস.-এর খাশ সহায়ক)
১।১।৫৯

পুনরায় পেশ করা হইল।

সি. কে. জি.
১৪।১।৫৯

পি. সি. দত্ত
১৬।১।৫৯

অর্থ মন্ত্রণালয়

ইহা দুঃখের বিষয় যে কেসটি অসম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা বিভাগ হইতে পাঠানো হইয়াছে। সমুদয় তথ্য জানা না থাকিলে অর্থদপ্তর কী ভাবে অর্থব্যয়ের যুক্তিযুক্ততা বিচার করিতে পারে? বর্তমান ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সর্বাগ্রে জানা দরকার ঃ—(১) স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কত? (২) ছাত্র বেতন হইতে স্কুলের আয় কত? (৩) আয় ব্যয়ের অডিট সার্টিফিকেট (৪) স্কুল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কিনা।

সরকারী সাহায্য পাইতে হইলে শিক্ষকের যে শিক্ষার মান গ্রান্টস রুলে বাঁধিয়া দেওয়া আছে বর্তমান শিক্ষকের তাহা আছে কি?

বি. সি. মুখার্জী
আণ্ডার সেক্রেটারী

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২। ৩। ৫৯

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পঞ্চদশ পরগণার শিক্ষা-ইনস্পেক্টরকে সরজমীনে তদন্ত করিয়া উক্ত বিদ্যালয় সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলা হউক।

আর. ব্যানার্জী
১৮। ৩। ৫৯

শিক্ষামন্ত্রীর নোট

গত রবিবারের 'দৈনিক কালান্তর' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক স্কুলে সাহায্য দেওয়া হয় না বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিকাশীপুর নামক গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের কথা তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, দেখিলাম। অবশ্য নিকাশীপুর অঞ্চলে অনেক সরকার বিরোধী আন্দোলনকারী আছে। বিগত নির্বাচনের ফলই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যাহা হউক, সেক্রেটারী অনুগ্রহপূর্বক ব্যাপারটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জানাইবেন কি?

সেক্রেটারী এম. এম. পানিগ্রাহী

১৩। ৬। ৫৯

অত্যন্ত জরুরী

এইচ. ই. এম. এর নোটে যে বিষয় উল্লেখ আছে সে সম্পর্কে কোনো কাগজ-পত্র আছে কি ?

এ. স্বামীনাথন
১৩। ৬। ৫৯

জে. এস.

প্লিজ স্পিক, ইমিডিয়েটলী

এন. সি. রায়
ডি. এস. (গ্রান্টস) ১৪। ৬। ৫৯

(পূর্ব পৃষ্ঠা হইতে)

আলোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চদশ পরগণার স্কুল ইন্সপেক্টারের রিপোর্ট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পেশ করা হইল। এই সঙ্গে লিংকড ফাইলটির প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। ইনস্পেক্টরের রিপোর্টে দেখা যাইতেছে প্রায় একবৎসর হইল স্কুলটি উঠিয়া গিয়াছে। বেতন না পাওয়ায় স্কুলের শিক্ষক অনেকদিন পূর্বেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। যে ঘরে স্কুল বসিত তাহাও গত বৎসর বর্ষার সময় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। উহার বাঁশের বেড়া, খুঁটি ইত্যাদি হয় স্থানীয় অধিবাসীরা উনন ধরাইতে ব্যবহার করিয়াছে নয়তো বৃষ্টিতে পচিয়া নষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে একমাত্র মাটির ভিটাটুকু ছাড়া উহার আর কোনো চিহ্ন নাই। এমতাবস্থায় বিষয়টি অর্থদপ্তরে পুনরায় পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। জয়েন্ট সেক্রেটারী অনুগ্রহপূর্বক দেখুন।

পি. সি. দত্ত
১৫। ৬। ৫৯

জে. এস.

আমি একমত। বিষয়টি সমাপ্ত গণ্য করিয়া ফাইল বন্ধ করা হউক। সেক্রেটারী অনুগ্রহ করিয়া দেখুন, তিনি বোধ হয় এইচ. ই. এম. কে জানাইয়া রাখিতে চাহিবেন।

এন. সি. রায়
১৬। ৬। ৫৯

সেক্রেটারী

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক দেখুন। তথ্য হিসাবে।

এম. স্বামীনাথন
১৭। ৬। ৫৯

এইচ. ই. এম.

দেখিলাম, ধন্যবাদ।

এম. এম. পানিগ্রাহী
২১।৬।৫৯

সেক্রেটারী

কাগজপত্র প্রচার বিভাগে দেখানো হউক। প্রচার অধিকর্তাকে প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া একটি প্রেস নোট ইস্যু করিতে অনুরোধ করা হউক।

এম. স্বামীনাথন
২২।৬।৫৯

জে. এস.

যথোচিত এ্যাকশানের জন্য প্রচার অধিকর্তা দয়া করিয়া সেক্রেটারীর মন্তব্য দেখুন।

এন. সি. রায়
২৪।৬।৫৯

প্রচার বিভাগ

প্রচার বিভাগ

শিক্ষা বিভাগের ইচ্ছানুযায়ী প্রেস নোট ইস্যু করা হইল। জে. এস. অনুগ্রহপূর্বক দেখিবেন।

পি. খাশনবীশ
প্রচার অধিকর্তা
২৯।৬।৫৯

জে. এস.

'এন. সি. রায়
২।৭।৫৯

প্রেস নোট

নিকাশীপুর গ্রামের বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য দেওয়া হয় না বলিয়া অভিযোগ করিয়া সম্প্রতি মহানগরের কোনো একটি দৈনিক পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। পাছে এই প্রবন্ধের দ্বারা জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় সেজন্য এই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপন করা প্রয়োজন।

কোন বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন পাওয়া গেলে শিক্ষাবিভাগ স্কুলের ছাত্রসংখ্যা, অবস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের যোগ্যতা ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, কোনো প্রকার তদন্ত ব্যতিরেকে অর্থসাহায্যের আবেদন মঞ্জুর করিয়া সরকার জনসাধারণের অর্থের অপচয় হইতে দিতে পারেন না। নিকাশীপুর বিদ্যালয়ের আবেদনেও অনুরূপ অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, নিকাশীপুরে বর্তমানে কোনো বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং বিদ্যালয়কে অর্থসাহায্যদানে অস্বীকৃত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঐরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত।

শিক্ষা বিস্তারে বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আগ্রহ সুবিদিত এবং যে সকল বিদ্যালয় সহায়তা লাভের যোগ্য বিবেচিত তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট অকাতরে অর্থসাহায্য করিতেছেন। চলতি বৎসরের বাজেটে বিদ্যালয়ে সাহায্যের জন্য সাত লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও অধিকতর অর্থ নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, একখানি প্রতিষ্ঠাবান সংবাদপত্র বিষয়টি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা না করিয়া একমাত্র স্বার্থান্বেষী সরকারী বিরোধী পক্ষের কথায় এইরূপ দায়িত্বহীন মন্তব্য করিয়াছেন।

তির্যক অক্ষি

জ্যোতির্বিদেরা বলেন, সৌরমণ্ডলের মধ্যবিন্দুতে আছে সূর্য। তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অক্ষ-পথে অবিরত আবর্তিত হচ্ছে নানা গ্রহ-উপগ্রহের দল।

মর্তলোকে বাঙ্গালীজীবনের মর্মস্থলে আছে আপিস। সেখানে তার ভারকেন্দ্র—ইংরেজীতে যাকে বলে সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি।

প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে মারোয়াড়ী বসে গদিতে, শিখ চালায় ট্যাক্সি, গুজরাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। বঙ্গবালকেরা সে-বয়সে সেন বা মিত্র কোম্পানীর নোট মুখস্থ করে গোলদীঘির ধারে পরীক্ষা দেয় লালদীঘির পারে ঠাঁই পাওয়ার আশায়।

পুরাকালে জাতিভেদে বৃত্তিভেদ হতো। ব্রাহ্মণ করত যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয় করত যুদ্ধ। বৈশ্যের ছিল বাণিজ্য এবং শূদ্রের সেবা।

এযুগে দ্বিজ বলতে বোঝায় মন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রী বা নিদেনপক্ষে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী। আর যাই হোক, পড়াশুনা তাঁদের কোয়ালিফিকেশান নয়।

অহিংস অসহযোগের দেশে সত্যমেব জয়তে। সেখানে নিজের রাজ্য পরের দখলে গেলে সৈন্য না পাঠিয়ে প্রতিবাদপত্র পাঠানোই রীতি। সুতরাং যুদ্ধ এখন যা ঘটে তা ভোটের। তাতে হাতিয়ারের বদলে হাত তুললেই যথেষ্ট।

বাণিজ্য ধীরে ধীরে এসে ঠেকছে স্টেট ট্রেডিং-এর দপ্তরে এবং সেবার উল্লেখ থাকে একমাত্র ইলেকশানের বক্তৃতায়। বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্মবিভাগ একালে অচল।

ইংরেজী প্রবাদে বলে, সব রাস্তাই মেশে রোমে। রোম যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, কথাটা সত্য নয়। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, সব বাঙ্গালীই যায় আপিসে, যেমন ঝান্ডা হাতে সব "আমাদের দাবি মানতে হবে"-র মিছিলই ধায় এসেম্বলী বা পার্লামেণ্টের দিকে।

শিক্ষিত বাঙালীর নেশা অনেক : কারো ফুটবল, কারো সাহিত্য, কারো বা কার্ল মার্কস। কিন্তু পেশা এক এবং অদ্বিতীয়,—চাকরি। তাই এম-বি পাস করে তারা হতে চায় চা-বাগান, কয়লার খনি বা বিলাতী জাহাজের মেডিক্যাল অফিসার। বি-এল পাস করে সওদাগরী আপিসের ল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।

শৈশবে মুখে কথা ফোটার আগেই চাকরির কথাটা বাঙালীর কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে থাকে। সন্ধ্যাবেলা মৃদু-দীপালোকিত শয্যায় ঠাকুমা-দিদিমাদের কণ্ঠে যে ছেলে-ভুলানো ছড়া শুনে বাঙ্গালী খোকাখুকুদের চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসে তাতেও চাকরির উল্লেখটা খুব স্পষ্ট :—

হাঁড়ির ভিতর ধনে,
গৌরী বেটী কনে ;
নোকে বেটা বর
টাঁকশালেতে চাকরি করে, ঘুঘুডাঙায় ঘর।

নোকে বেটার ঘর ঘুঘুডাঙার বদলে চেতলা বা খিদিরপুরে হলেও কারো কোনো আপত্তি হতো না। তার বয়স কত, চেহারা কেমন তা নিয়েও বিশেষ উদ্বেগ আছে এমন মনে হয় না। কনে এবং কনের অভিভাবকদের কাছে যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে ঐ তার টাঁকশালে চাকরির খবরটা। সেটা সঠিক জানতে পারলেই গৌরীর

মা-মাসিরা ঢেঁকিতে আনন্দ-নাড়ু কুটতে শুরু করেন, বাপ-কাকারা ময়রার দোকানে দৈ-সন্দেশ ফরমাস দিতে ছোটেন।

কালিদাসের কালে যাই হোক না কেন, আমাদের কালের পাত্রীপক্ষের সবারই কামনা এক। এমন কি গেস্ট-কন্ট্রোলের দাপটে যখন মিষ্টান্নম অনেক বিয়েতেই জোটে না তখন ইতরে জনাঃও বর ভালো চাকরি করে জেনেই খুশি। পাত্র ব্যবসা করে শুনলে ভাবী বধূর মুখ মলিন এবং সম্ভপর শ্বশ্রুঠাকুরাণীর নাসিকা কুঞ্চিত হয়। বরের বাজারে দোকানের মালিকের চাইতে ম্যানেজারের দর বেশী।

হর্স-পাওয়ার দিয়ে ইঞ্জিনের দাম বাড়ে, সিলেন্ডার দিয়ে মোটর গাড়ীর। হীরার মূল্য দ্যুতিতে, চাপরাসীর ভার তকমায়। সাবালক বাঙ্গালীর দাম নিরূপিত হয় চাকরির ওজনে। তার পক্ষে পদবীর চাইতে পদের বিবরণটা গুরুতর। সাব-ইনস্পেক্টরের চাইতে ইনস্পেক্টর বড়; ডিরেক্টারের চাইতে ডিরেক্টার-জেনারেল। শুধু শব্দে নয়, অর্থেও।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী জানায় বইপড়ার হিসাব। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তার খোঁজ পড়ে না। মাইনের অংক বোঝায় কর্মকুশলতা, সাদা কথায় যাকে বলে কাজ-বাগানোর ক্ষমতা। সংসারে সেটাই মুখ্য। বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ কতখানি সে তত্ত্ব কোনো বৈজ্ঞানিকের জানা নেই। কিন্তু টাকার সঙ্গে কৃতিত্বের খ্যাতি ধারের সঙ্গে সুদ বা জ্বরের সঙ্গে মাথাধরার মতোই প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। জগতে বিদ্যুতের মাপ এম্পিয়ারে, গতির মাপ বেগে এবং বিচক্ষণতার মাপ ব্যাংক-ব্যালেন্সে। মেট্রিক পদ্ধতিতেও তার নড়চড় নেই।

স্থানের দ্বারা যে দ্রব্যের আদর বাড়ে সে দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে হামেশাই চোখে পড়ে। বর্ষার দিনে ইলিশ মাত্রই বাঙ্গালীর রসনায় উপাদেয়। সে ইলিশ গঙ্গার হলে তার স্বাদ বাড়ে কি না তা নিয়ে সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু দাম যে বাড়ে সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই। স্থানগৌরবেই গোয়ালন্দ বা পাকশীর যে চালানী ইলিশ সকালবেলায় ছাতুবাবুর বাজারে তিন টাকায় বিকোয়, সন্ধ্যাবেলা তক্তাঘাটে তা পাঁচটাকার কমে মেলে না। জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বে সাজানো ল্যাংড়া বেনারসের কি দ্বারভাঙ্গার তা দিয়ে শাশুড়ীরা বেয়ানের নজর বিচার করেন। ফ্ল্যাট আকারে এক এবং প্রকারে সদৃশ হলেও ভাড়ার হিসাবে করোলবাগ এবং গলফ্-লীংকস্ কিম্বা গলু ওস্তাগরের গলি আর হ্যারিংটন স্ট্রীটে কি তফাত নেই?

শুধু বস্তু নয়, ব্যক্তিও বহুক্ষেত্রেই তার বসতি দিয়ে কৌলীন্য লাভ করে। সেকালে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণেরা রিষড়া, কোন্নগর, আগরপাড়া বা হালিশহর যেখানেই থাকুন, সবাই টিকি, নস্য এবং পাত্রাধার তৈলের তর্ক নিয়ে মোটামুটি জীবন কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু ভাটপাড়ার নাম করলেই ব্রাহ্মণত্বটা যেন বেশী প্রকট হয়ে উঠত। শাস্ত্রজ্ঞান পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গের সর্বত্রই সমান সম্ভব। মোনাজাইট বালুকা বা ম্যাঙ্গানীজ ধাতুর মতো তার অবস্থিতি কোন মানচিত্রের গায়ে দাগ দেওয়া নেই। তবুও কাশীর অথবা নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বিধানই সর্বাগ্রে গ্রাহ্য ছিল। বৈদ্যসমাজে কুল মিলিয়ে যাঁরা মেয়ের বিয়ে দিতেন তাঁরা কালিয়া বা সেনহাটির সেনগুপ্ত-দাশগুপ্তের ঘরে পাত্র খুঁজতেন। বাংলার বাইরে হিন্দুস্থানীদের

মধ্যেও কাশ্মীরী মিশ্র, কনৌজের চতুর্বেদী ও মথুরার পাঁড়েজীরা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে সামনের সারিতে আসন দাবি করেন।

ঠিকানার জোরে মর্যাদাবৃদ্ধি এ যুগেও কিছু কম নয়। কে না জানে যে, হার্লে স্ট্রীটে চেম্বার হলেই ডাক্তারের এবং বন্ড স্ট্রীটে দোকান হলেই দর্জির বিল বিপুলাকার হয়?

চাকরিরও মান বাড়ে আপিসের নামে। খ্যাংরাপটিতে রামসুখদেওর আড়তে টাইপিস্ট যে চিঠি টাইপ করে তার পরিমাণ ফেয়ারলী প্লেসের হেণ্ডারসন ব্রীজের টাইপিস্টের চাইতে কিছু কম নয়। বেতনেও হয়তো পার্থক্য নেই। কিন্তু ঘরে স্ত্রী এবং পাড়ায় প্রতিবেশীদের কাছে দ্বিতীয়জনের মর্যাদা অধিক। বিদ্যাদানের মতো একান্ত নির্বিরোধী কাজেও প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপক মশাই যে হালিশহর কলেজের প্রফেসারের চাইতে অধিকতর মনোযোগের পাত্র সে কি শুধু মাইনের পার্থক্যে?

বাঙ্গালীর অশন, বসন, আচার আচরণে আপিসের প্রভাব অনেকখানি। বাঙ্গালী মেয়েদের পোষাক নিয়ন্ত্রণ করে সিনেমার নায়িকা। সেটা অভূতপূর্ব নয়। বিদেশেও তাই। এলিজাবেথ টেলার বা সোফিয়া লরেনের স্কার্টের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারাই পনর আনা ইংরেজ, আমেরিকান বা ফরাসী মেয়েদের ফ্যাশান নির্ধারিত। ক্রিশ্চেন ডিয়র তে, আছে শুধু মুষ্টিমেয় উর্ধ্বচারিণী উচ্চাভিলাষিণীদের জন্যে কোর্টে প্রেজেন্টেড না হওয়া পর্যন্ত যাদের দিবস বিস্বাদ এবং রজনী নিদ্রাহীন।

বাঙ্গালী পুরুষের পোষাকের ধারা স্থিরীকৃত হয় আপিসের প্রয়োজনে। অধিকারীভেদে তন্ত্রসাধনার মতো চাকরিভেদে পরিচ্ছদ। ইংরেজের আমলে সিভিল সার্ভেন্ট কণ্ডাক্ট রুলের সঙ্গে সরকারী আপিসে পরিধেয়ের নিয়মকানুন বাঁধা ছিল। বেসরকারী আপিসগুলিতেও অলিখিত আইনে কেরানীর ছিল ধুতি, অফিসারের সুট। ব্রিটিশোত্তর যুগে সরকারী অফিসারদের জন্য একটা পোষাকের রীতি নির্দিষ্ট হয়েছে বটে। কিন্তু বিয়ের বরযাত্রীর গায়ে গিলে-করা পাঞ্জাবীর মতো সেটাও শুধু বিশেষ উপলক্ষেই ব্যবহৃত।

এখন ধীরে ধীরে অফিসারেরা ছাড়ছেন টাই, কেরানীরা ধরেছেন প্যান্ট। এই নীচের মহলে যোগ ও উপরের মহলে বিয়োগের ফলে পোষাকের একতলা ও দোতলার দূরত্ব কমে গিয়ে মাঝখানে একটা নতুন তলার উদ্ভব হয়েছে স্থপতিদের ভাষায় যাকে বলে মেজেনাইন ফ্লোর। সেখানে শ্রী ছন্দহীন একটা অঙ্গাবরণের সর্বব্যাপী বিস্তার। তার নাম—বুশ-শার্ট। প্রাচীন ফতুয়ার আধুনিক শোভন সংস্করণ; ইংরেজীতে যাকে বলে ডিলাক্স এডিশান। ভারতবর্ষে কালোবাজার ও মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে বিগত মহাযুদ্ধের এটি তৃতীয় অবদান।

জামাকাপড় থাকে মানুষের দেহে। তার রকমফের তাকালেই দেখা যায়। মনের পরিবর্তন থাকে গভীরে সেটা সহজে দৃষ্টিগোচর নয়। আমাদের জীবনযাত্রা ও মনোভাবের উপরে আপিসের কাজের প্রভাব কতখানি সেটা নিরপেক্ষ গবেষণার বিষয়। বৃদ্ধ মহেশবাবুর বড় ছেলে রেলের মালবাবু। তিনি মেজেতে পিঁড়ি পেতে বসে খাগড়াই কাঁসার থালায় ভাত খান। এলুমিনিয়মের কৌটয় টিফিন নিয়ে ট্রামে চেপে আপিসে যান। পাটের গাঁট, চালের বস্তা ও কয়লার ওয়াগানের 'বিলটি' লিখে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে প্রতিবেশীদের আড্ডায় মোহনবাগান, সুচিত্রা সেন, বা ক্রুশ্চেভ

নিয়ে বাগবিস্তার করেন। তাঁরই অনুজ রেলের অফিসার। তাঁর খাবার ব্যবস্থা টেবিলে, বাসন কাচের বা চীনেমাটির। দুপুরে বেয়ারা আপিসে বয়ে নিয়ে আসে হট কেসে-ভরা লাঞ্চ। বিকালে ক্লাবে গিয়ে খেলেন দু' সেট টেনিস বা দু' রাবার অকশান ব্রীজ।

সদরের মতো অন্দরমহলেও দু' পক্ষের প্রভেদটা সুস্পষ্ট। কেরানী-গিন্নী ঘরসংসারের কাজ সাঙ্গ করে দুপুরবেলা সময় পেলে পাশের-বাড়ির বউদের সঙ্গে মাছের দাম, গয়লার শঠতা বা ছোটখুকীর হুপিং কাশি নিয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করেন। দিবানিদ্রা ও প্রেমের উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে অফিসারের মিসেস সেজেগুজে করেন সোশ্যাল ওয়ার্ক বা মহিলা-সমিতির সভানেতৃত্ব।

বাস্তবিক, জন্মশাসন থেকে সাম্যবাদ এবং হুইস্কি পান থেকে অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিতর্কমূলক বিষয়েই আমাদের মতবাদ আমাদের পদাধিকার দিয়ে প্রভাবান্বিত। উচ্চপদের সঙ্গে অতি-আধুনিকতার যোগাযোগ প্রায় বাসরঘরের সঙ্গে শ্যালিকার চতুরালির মতোই অবিচ্ছেদ্য।

জোয়ার ভাঁটা দিয়ে নৌকাযাত্রার মতো আপিস দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত। আপিসের ঘড়ি দেখে রাস্তায় ট্রাম চলে, আপিসের সময় মেনে হেঁসেলে হাঁড়ি চড়ে। আপিসের ছুটি হিসাব করে বৌভাতের দিন থেকে টেস্টম্যাচের তারিখ ধার্য হয়। কাশী বৃন্দাবন বা পুরী দার্জিলিঙে পুণ্যকামী বা স্বাস্থ্যান্বেষীদের আগমন নির্গমনের মরশুমও আপিসের দরজা বন্ধ এবং খোলার উপরে নির্ভর করে। অধিকাংশ বাঙ্গালীরই আপিসের ফাইলে ছাড়া লেখা নেই, আপিসের তাড়া ছাড়া জীবনে তাগিদ নেই। কানু বিনা গীত এখন হয়, শিবহীন যজ্ঞও। কিন্তু আপিসের গল্প নইলে সান্ধ্যবৈঠকের গল্প জমে না।

রূপকথায় রাক্ষসের প্রাণ ছিল জলের নীচে পাথরের কৌটার ভিতরে। বাঙ্গালীর প্রাণ আপিসের হাজিরাখাতায়। হাতে মারার চাইতে ভাতে মারার শাস্তি তার পক্ষে বেশী ভয়াবহ। ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী কোন বল্লভে স্মরণ করে সে খবর আছে কবিসম্রাটের কল্পনায়। উৎসুক নেত্রে বাঙ্গালী কেরানী যেদিনটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে হচ্ছে মাসের পহেলা। 'পে-ডে'টাই তার 'ডি-ডে'। স্যামসনের চুল কেটে নেওয়ার মতো চেয়ার কেড়ে নিলেই সে ভূমিসাৎ,—একাধিক অর্থে।

চাকরি বাঙ্গালীকে দিয়েছে ইংরেজী-শিক্ষার আগ্রহ ও সুযোগ, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাদ ও সন্ধান। মন্থরগতি গ্রাম্যজীবনের নিস্তরঙ্গ পরিবেষ্টন থেকে তাকে শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতার কোলাহলমুখর আঙিনায় টেনে এনেছে। তারই ফলে গড়ে উঠেছে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ—ভারতীয় দেশাত্মবোধের যা সূতিকাগার, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার যা অবলম্বন এবং সুকুমার রুচি ও প্রগতিপরায়ণতার যা ধারক ও বাহক।

কিন্তু এযুগে মধ্যপন্থার কোনো স্থান নাই। হয় কংগ্রেস নয় কমিউনিস্ট,—পি-এস-পি অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। পঞ্চাশোর্ধ্বে মাথার চুলের মতো সবকিছুই এখন সাদা আর কালোয় ভাগাভাগি। ধূসরের অস্তিত্ব নেই। সমাজেও মধ্যবিত্তেরা অপাঙ্‌ক্তেয়।

ধনীজনের আছে টাকার জোর। সেটা প্রকাশ্যে ধিকৃত হলেও অপ্রকাশ্যে

সকলেরই শিরোধার্য। গণজনের আছে সংখ্যার জোর। গণতন্ত্রের গণনায় মস্তিষ্কটা অপ্রাসঙ্গিক, খোঁজ পড়ে মাথার। তাই জানকীর চরণ-নখরে নিবদ্ধদৃষ্টি বনবাসী লক্ষ্মণের মতো রাজনৈতিক নেতা থেকে দৈনিক কাগজের সম্পাদক পর্যন্ত সবাই তাদের পানে অবিচলনেত্রে তাকিয়ে গলদাশ্রু। ঘরেও নহে, পরেও নহে যে জন আছে মাঝখানে সেই মধ্যবিত্তেরাই বসেছে ঘাটের কিনারায়। চাকরি একদিন তাদের বিভিন্ন প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিল। চাকরির কারণেই তারা আজ সেখান থেকে বিতাড়িত। যে কারণে একদা তারা পেয়েছিল প্রতিষ্ঠা সেকারণে আজ তারা পাচ্ছে প্রহার।

প্রহার বা পীড়ন মাত্রই অকল্যাণকর নয়। না পোড়ালে কোন সোনা শুদ্ধ হয়? না পেটালে কোন লোহা শক্ত হয়?

আঘাতে পাথর থেকে বেরোয় আগুনের ফুলকি, মাটির ডেলা থেকে শুধু ধূলিকণা এবং তিল, তিসি থেকে নির্গত হয় তরল তৈলাক্ত ধারা। গভীর পরিতাপের বিষয়, দুঃখে বাঙালী দৃঢ়ীভূত হয় না দ্রবীভূত হয়।

এক গালে চড় খেয়ে যাঁরা অন্য গাল এগিয়ে দেন, অন্ততঃ খৃস্টের অনুগামীদের কাছে তাঁরা নমস্য। কিন্তু মার খেয়ে যারা শুধুই করে নামটা সহি লম্বা পিটিশানে তাদের দু'গালেই চুনকালি মাখা। কেবলই নাকীসুরে কান্না শিশুর হলেও বিরক্তিকর; প্রাপ্তবয়স্কের বেলায় সেটা নিতান্তই অসহ্য।

চাকরি বাঙ্গালীকে কায়িকশ্রমে বিমুখ, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুৎসাহী ও দুঃসাহসিকতায় পশ্চাৎপদ করেছে এ অভিযোগ অতি পুরাতন ও বহুশ্রুত। সবচেয়ে শোকাবহ এই যে, নিশ্চিত আয়ের নিরাপদ ছত্রছায়ার মোহ দিয়ে চাকরি তাকে করেছে রিক্ততেজ, হতোদ্যম, ঐক্যহীন ও বাক্যসার। তিন কোটি সন্তানেরে রেখেছে বাঙ্গালী করে, মানুষ করেনি।

কালকের পোষাক

মনের ভাব ঠিক মতো ব্যক্ত করার জন্যেই পৃথিবীতে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে একথা ছেলেবেলায় স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আমরা পড়েছি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে বহু অভিজ্ঞতার ফলে বুঝেছি ব্যাপারটা আসলে বিপরীত। হামেসাই দেখি, দজ্জাল শাশুড়ীর অসুখের খবর পেয়ে পিত্রালয় থেকে পুত্রবধূ লেখেন,—আপনার অসুখের সংবাদে বিশেষ চিন্তিত আছি। কলকাতার ছোট ফ্ল্যাটবাড়িতে যখন কুটুম্বের দল ছেলে মেয়ে নিয়ে অতিথি হয়, বাড়ীর গৃহিণীকে তখন শরৎচন্দ্রের নায়িকার মতো আনন্দে মুখ কালি করে বলতে শোনা যায়,—এস ভাই এস, বড় খুশী হলেম!

মনে যা নেই তা প্রকাশ করার জন্যেই যেমন ভাষা, দেহে যা নেই তা প্রমাণ করার জন্য তেমনি পোষাক। কুলগুরু শিষ্যগৃহে আসেন নামাবলী গায়ে জড়িয়ে, চেহারাটা যেন যথেষ্ট সাত্ত্বিক দেখায়। চাকরির উমেদার সুট পরে ইণ্টারভিউ দিতে যায়, যাতে বেশী স্মার্ট দেখায়। বিয়ের কনেকে দেখানো হয় নীলাম্বরী পরিয়ে রংটা যাতে বেশী ফর্সা মনে হয়। বস্তুতঃ আমাদের বেশীর ভাগ বেশই হচ্ছে ছদ্মবেশ।

অবশ্য বেশের সঙ্গে পরিবেশের একটা যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক। বরফে ঢাকা এস্কিমোর দেশে চর্মনির্মিত পোষাক আত্মরক্ষার তাগিদেই আবশ্যক। আন্দীর পাঞ্জাবী বা ঢাকাই উড়ুনী গায়ে লণ্ডনের রাস্তায় বেরুলে পুলিশে ধরার আগেই প্লুরিসীতে ধরে। ব্যাঙ্কক শহরে ওভারকোট পরিহিত ব্যক্তিকে পাগলা গারদে নেওয়ার পূর্বে হাসপাতালে নিতে হয়।

শুধু পরিবেশ নয়, পেশাও অনেকাংশে মানুষের পোষাকের জাত নির্ধারণ করে থাকে। বিভিন্ন জীবিকার জন্য বিভিন্ন ধরনের পোষাক চলতি আছে। তার নাম য়ুনিফর্ম। জজকে পরতে হয় উইগ, ক্যাথলিক ধর্মযাজককে গায়ে দিতে হয় আলখাল্লা, পুলিশকে মাথায় বাঁধতে হয় পাগড়ি, নার্সকে রুমাল। এগুলি নিয়ম! তা ছাড়া সুবিধা অসুবিধার কথা বিচার করেও এক এক ধরনের কাজের জন্য এক এক রকমের পোষাক আপনিই প্রচলিত হয়। ডেস্কে বসে লেজার লিখতে ধুতিই যথেষ্ট। কিন্তু ল্যাবরেটারীতে এ্যাসিড, কেমিক্যাল নিয়ে যারা কাজ করেন এপ্রনটা তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং কারখানায় যারা মেশিন চালান শর্টস্ তাদের দরকার। অবশ্য বৃত্তিভেদে পরিচ্ছদভেদটা একমাত্র পুরুষের বেলায়ই ঘটে মেয়েদের বেলায় নয়। কারণ জগতে মেয়েমাত্রেরই শুধু একটিমাত্র পেশা আছে,—সে হলো স্বামী-পরিচালনা। তার জন্য শাড়ি, ফ্রক, সালোয়ার, পায়জামা, ঘাগরা সব পোষাকই সমান উপযোগী।

অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, পোষাকের যত রকমারি, যত আয়োজন, যত বর্ণবিন্যাস তার সবটাই মেয়েদের জন্যে। স্বর্গোদ্যানে আদি মানব-মানবী আদম ও ইভের পোষাকে পার্থক্য ছিল না। উভয়ে একইভাবে তিনটি মাত্র

ডুমুরের পাতা সেলাই করে দেহাচ্ছাদন করেছিলেন। অবশ্য আমার বিশ্বাস, বসন ব্যবহারের সেই প্রথম মুহূর্তটিতেও বৃক্ষপত্র নির্বাচনের ব্যাপারে আদম অপেক্ষা ইভের অনেক বেশী সময় লেগেছে। বৌভাতের নেমন্তন্নে যেতে আজকের দিনের মিসেস সেন, মিসেস ঘোষেরা যেমন কোন শাড়িটা পরবেন তা স্থির করতে দিশেহারা হন, সেদিনের আদি জননী ইভও তেমনি ডুমুরপত্রগুলির আকার, আকৃতি ও বর্ণ নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়ে থাকবেন।

সৃষ্টির সেই ঊষাকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পোষাকের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। বৃক্ষপত্র থেকে নাইলন অনেকটা পথ; পোষাক বিবর্তনের এই সুদীর্ঘ পথে ইভের উত্তরাধিকারিণীরা আদমের জাতকে অনেক পিছনে ফেলে গেছেন। গারো পাহাড়ের নাগা কুটির থেকে নিউ ইয়র্কের ড্রয়িং রুম পর্যন্ত সর্বত্রই মেয়েদের তুলনায় পুরুষের পোষাক সংখ্যা ও বৈচিত্র্য দু'দিক দিয়েই অনেক বেশী সরল এবং সাধারণ। বাড়ীর কর্তা দুদিনের ছুটিতে পুরী বা মিহিজামে বেড়াতে যেতে একটা ছোট এটাচী কেস হাতে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে পারেন। গিন্নীকে সঙ্গে নিলে স্টেশানে স্টেশানে কুলি ভাড়া দিতেই প্রাণান্ত। একালের মেয়েদের সৌষ্ঠব সব জমা থাকে তাদের ওয়ারড্রোবের মধ্যে।

সকলেই জানি, বাঙ্গালী পুরুষের মূল পোষাক ধুতি, মেয়েদের পোষাক শাড়ি। এরই সঙ্গে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে কালে কালে তার রকমফের ঘটেছে। সে পরিবর্তনের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক থাকেনি। থাকলে এই গরম দেশে গলায় শক্ত কলারে টাই বেঁধে কেউ ঘর্মাক্ত কলেবর হতে চাইতো না। সত্যি কথাটা এই যে আমাদের পোষাক ঠিক হয়েছে রুচি নিয়ে নয়—রীতি দিয়ে। আর পুরুষের বেলায় সে রীতিটা রাজরীতি।

আমাদের গত কালকের রাজপুরুষেরা ছিলেন সাহেব। তাদের কোট, ট্রাউজার্স, হ্যাট, বুটকেই তখন আমরা পোষাকের চরম আদর্শ জ্ঞান করে অঙ্গে ধারণ করেছি। সরকারী দপ্তরখানার অফিসার থেকে হাসপাতালের ডাক্তার এমন কি সিগারেটের ক্যানভাসার পর্যন্ত সবাই সুট পরাটা আবশ্যিক জ্ঞান করেছে। কালকের আগে পরশু রাজত্ব ছিল মুসলমান বাদশাহদের। সে আমলে তাই চোগা চাপকান ছিল ভদ্র পোষাক নিদর্শন। আমাদের দাদামশায়দের দেহে তাদের স্থান হয়েছে সমাদরে।

আজ দিল্লীর রাজপাটে প্রভাব আছে আগ্রা, অযোধ্যা, কাশী, কাঞ্চী ও কোশলের। তাই শেরোয়ানী ও চোস্ত ধীরে ধীরে আমাদের রাজবেশ হয়ে উঠেছে। ঢিলে পাজামা পাঞ্জাবী ও তার উপরে ওয়েস্ট কোট হয়েছে আটপৌরে পোষাক।

সুতরাং কাল আমাদের ছেলেদের পোষাক কী হবে তা নির্ভর করবে কাল আমাদের রাজ্য শাসন কারা করবেন তারই উপরে। যারাই করুন, পাজামা ও পাঞ্জাবীকে তাঁরা বাতিল করবেন মনে হয় না। বামপন্থীরাও পণ্ডিত নেহরুর যে একটি মাত্র জিনিস সমর্থন করেন তা হচ্ছে তাঁর ওয়েস্ট কোটটি। এমনকি লালপন্থীদেরও ঝান্ডা আলাদা বটে, কিন্তু পোষাক আলাদা নয়। শুধু এদেশে

নয়, য়ুরোপেও। এনাড্রি ভিসিনস্কী এবং আর্নেস্ট বেভিনের মধ্যে পরিচ্ছদের তফাৎ ছিল না। কেনেডি ও ক্রুশ্চেভের পোষাক এক।

তবে হিন্দী যেমন ভারতের রাষ্ট্রভাষা, পাঞ্জাবী, পাজামা এবং ওয়েস্ট কোটও ঠিক তেমনি হবে ভারতের রাষ্ট্রবেশ। অর্থাৎ হিন্দীও যেমন কোনকালেই ভারতের সব লোক সব সময়ে বলবে না, ঐ পোষাকটাও তেমনি সর্বদা সর্বত্র পরা হবে না। কালকের দিনেও বিয়ের আসরে বাঙ্গালী বরযাত্রীর দলকে গিলে কোঁচানো ধুতিতেই দেখা যাবে, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি আড্ডা দিতে মাদ্রাজী ভদ্রলোকেরাও একখানা বিছানার চাদর আধখানা করেই পরবেন। সর্বভারতীয় পোষাকটা হবে সত্যি সত্যিই পোষাকী।

অবশ্য নকল করতে গেলেই কিছুটা নাকাল হতে হয়। নায়েবী আমলে আমরা চাপকানের সঙ্গে চাদর গায়ে জড়িয়েছি, সাহেবী আমলে পাঞ্জাবীর উপরে কোট পরেছি, আসছে কালও হয়তো ধুতির সঙ্গে শেরোয়ানী চালাতে থাকবো। তবে বাঁচোয়া এই যে, সংখ্যা বেশী হলেই যেমন পৃথিবীতে হত্যাকাণ্ডের কলঙ্ক স্খালন হয়, বহু ব্যবহারের দ্বারাও তেমনি রুচি-বিকৃতি ফ্যাশানে পরিণত হয়।

ফ্যাশান কথাটার মধ্যেই যেন একটা লঘুচিত্ততার আভাস আছে। অস্কার ওয়াইল্ডের নায়ক বলেছেন, অতি আধুনিক ফ্যাশান হলো সেই কদর্য বস্তু যা এত অসহ্য যে প্রতি ছ'মাস পরেই বদল করতে হয়। মেয়েদের দেখে ও কথাটায় আমার বিশ্বাস জন্মেছে।

অজ্ঞাতবাসকালে একদা মায়া সরোবরের তীরে বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করেছিলেন। যুধিষ্ঠির সব কটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। তার একটি ছিল এই, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা পরিবর্তনশীল কি? পাণ্ডুতনয় উত্তর করলেন, মানুষের মন। আজকের দিনে ধর্ম বালীগঞ্জে লেকের পারে দাঁড়িয়ে যদি ঐ প্রশ্ন করতেন, তবে যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাঁর আগের ভ্রম সংশোধন করে জবাব দিতেন, জগতে সবচেয়ে পরিবর্তনশীল মেয়েদের কানের দুল। শুধ দুল নয়, মেয়েদের সমস্ত সাজ-সজ্জাই হচ্ছে স্বল্পায়ু। এ পূজায় যে জর্জেটটি শোভা পায় সামনের শো কেসে, পরের পূজায় তাই পড়ে থাকে পিছনের গুদামে। আমাদের ঠাকুমাদের আমলে শাড়িতে পাড় ছিল তিনটে। মায়েদের আমলে পাছাপাড় উঠে গিয়ে তার সংখ্যা হলো দুই। বউদিদের কালে তার আকার শীর্ণ হয়ে দাঁড়ালো অর্ধেক, পাইপিং। বোনেদের সময়ে তাও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে শাড়ি হলো পাড়হীন। আমাদের মেয়েদের যুগ সবে আরম্ভ হয়েছে। এখন চলছে আঁচলা, যাকে বলে পুল। জামা প্রথম যুগে ছিল লেস, ফ্রিলে ভরা পুরো আস্তিনের জ্যাকেট। তারপরে এলো ব্লাউজ। তার হাতার দৈর্ঘ্য কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মান চাঁদের মতো ক্রমশঃ কব্জির কাছ থেকে কাঁধের উপরে এসে পৌঁচেছে।

ব্লাউজের আদি যুগে সম্মুখ দিকটা ছিল গলার সঙ্গে আঁটা; তাতে নেকলেস পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যেতো। সদ্যাবিগত যুগে তার নিম্নগতি নীতিবাগীশদের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। সদ্য আগত যুগে শুরু হয়েছে তার ঊর্ধ্ব গতি। আমার কাছে দুটোই সমান মারাত্মক ঠেকে। প্রথমটাতে চোখ চাইলেই দেখতে হতো বিশীর্ণ কণ্ঠা; দ্বিতীয়টাতে দেখতে হচ্ছে মেদবাহুল্য।

কিন্তু এসবই তো হলো গতকাল এবং আজকের কথা। আগামীকালের মেয়েদের পোষাক হবে কী? ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। মেয়েদের মন যেমন দেবতাদেরও অজ্ঞাত, মেয়েদের পোষাকও তেমনি মানুষের গবেষণার বাইরে। তবে কিছুটা হয়তো আঁচ করা যেতে পারে। সেজন্য যেতে হবে দার্জিলিং কিম্বা মুসৌরীতে। সেখানকার ম্যালে দর্শন মিলে স্ল্যাকস্ পরিহিতা বঙ্গললনার। ফ্যাশান নভোমণ্ডলের সর্বাধুনিক তারকার দল। পুরুষের পোষাক মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলে বাইবেলে অনুশাসন আছে বটে, কিন্তু ওল্ড টেস্টামেণ্টের আমলে মেয়েদের তো শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভানেতৃত্ব করতে হয়নি, করতে হয়নি পোস্টার হাতে নিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে অবস্থান ধর্মঘট।

কালকের দিনে ট্রামে, বাসে, সিনেমার দরজায় দেখা যাবে শুধু এই স্ল্যাকস্; পুরুষের ট্রাউজার্সের সামান্য পরিবর্তিত মহিলা সংস্করণ। হায়, সেদিন আর তরুণীর রাঙ্গিন অঞ্চল দেখে তরুণের নাড়ী চঞ্চল হবে না, বউমার আঁচলে ছেলে বাঁধা পড়েছে বলে শাশুড়ী আক্ষেপ করবেন না এবং "চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর"—বলে কবির দল দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন না!

কিন্তু সাজ বদল হলেই তো ছাঁচ বদল হয় না। সেদিনও জ্যোৎস্না নিশীথের বান্ধবীকে সকাল বেলার প্রখর সূর্যালোকে দেখে আজকের মতোই চমকে উঠতে হবে। কারণ সংসারে সব মেয়েরই দুটো করে চেহারা; ঠিক যেমন ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রত্যেক অসাধু ব্যবসায়ীর দুটো করে হিসেবের খাতা!*

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে

মীমাংসা

এক

আমাদের বাড়ির পাশেই বৃন্দাবন চাটুয্যের বাড়ি। একেবারে সংলগ্ন বলিলেই হয়।

আমি কখনও তাঁহাদের বাড়ি যাই না। অপরাহ্নে কেশপরিচর্য্যার ছলে ছাদে উঠিয়া কাহারো সঙ্গে গল্প করি না। সকালে জানালায় দাঁড়াইয়া পাঠাভ্যাসের ফাঁকে কোনো গৃহাভ্যন্তরে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপও করি না। নিয়মিতভাবে ছাপা শাড়ি ও হাই হিলের জুতা পরিয়া বেথুনের বাসে চাপিয়া কলেজে যাই।

বৃন্দাবন চাটুয্যের সেজ ছেলে বিকাশ। বয়স পঁচিশ। সে কেন আমাদের বাড়িতে আসে? সকালে সদর দরজায় অপেক্ষা করে,—কখন বাহির হইব। বিকালে পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—কখন ফিরিব। সন্ধ্যায় বাড়ির ভিতর আসিয়া প্রার্থনাপূর্ণ নয়নে মুখের পানে চাহিয়া রহে।

তাহাকে অনেক দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়াছি। সে বারণ মানে না। ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিয়াছি। সে নিরস্ত হয় নাই। বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়াছি। সে অবিচল। চিঠির উত্তর না পাইয়াও চিঠি লেখে। বারবার 'রং-নাম্বার' পাইয়াও টেলিফোন করিতে ছাড়ে না। হায়, তাঁহাকে কী ভাবে ফিরাইব?

আমি কবি নই, সাহিত্যিক নই, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক নই। মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে পারি না। কেবল ভয়ে ভয়ে থাকি। পদশব্দে সচকিত হই। ছায়া দেখিলে চমকিয়া উঠি। নিজের দুর্ব্বলতায় নিজেই বিক্ষুব্ধ হই। ইচ্ছা করে, ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাই।

বুঝিতে পারি, রাধিকা কেন তাহার সখীকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে কহিয়াছিলেন,—

"বারণ করলো সই, আর যেন
শ্যামচাঁদ আসে না আসে না।"

বুঝিতে পারি, চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছিলেন,—

"যে না দেশে পুরুষ ঘর সেই দেশে যাব
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

কিন্তু পাঠক আমার এ হৃদয়বেদনা কি তুমি বুঝিয়াছ?

উত্তর

আমি বুঝিয়াছি। যদিও আমি ছাপা শাড়ি ও হাই হিলের জুতা পরিয়া বেথুনে যাই না। কারণ আমি পুরুষ মানুষ। ঘরে স্ত্রী আছেন, এবং সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করি।

কিন্তু আমার বাড়ির পাশেও একটি বাড়ি আছে। একেবারে সংলগ্নই বটে।

সে বাড়ির একটি ছোকরা লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট। সবেমাত্র কাজে নামিয়েছে, এখন পর্যন্ত একটিও 'কেস' দিতে পারে নাই। সে প্রত্যহই আমাদের বাড়িতে আসে। সকালে আসে, বিকালে আসে, অনেক রাত্রি অবধি বসিয়া মাসিক দেয় চাঁদা এবং বার্ষিক প্রাপ্য বোনাসের অংক নামতার মত শুনাইয়া যায়। পথে ঘাটে দেখা হইলেই ফস করিয়া ফরম সামনে ধরিয়া সহি করিতে বলে।

অনুনয়, বিনয় ব্যর্থ হইয়াছে। কটুবাক্য নিষ্ফল। আমিও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। পদশব্দে শঙ্কিত হই। ছায়া দেখিলে চমকিয়া উঠি। ইচ্ছা করে, শুধু ঘর নয়,—এ পাড়া ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাই।

বুঝিতে পারিতেছি, রাধিকা কেন বলিয়াছিলেন,—

"বারণ করলো সই আর যেন
শ্যামচাঁদ আসে না আসে না।"

শ্যাম বোধকরি তখন একটা পাঁচ হাজার টাকার এন্ডাউমেন্ট পলিসি গছাইবার ফিকিরে ছিলেন।

বুঝিতে পারি, চণ্ডীদাস কেন লিখিয়াছিলেন—

"যে না দেশে পুথির ঘর সেই দেশে যাব
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

বোধহয় ফি ডাকেই চণ্ডীদাসের নামে বীমা কোম্পানীর ঝুড়ি ঝুড়ি প্রসপেক্টাস আসিতেছিল।

আমার বাড়ির পাশে যাঁহাদের বাড়ি তাঁহারাও চাটুয্যে। বোধহয় যে ছোকরা লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি করে তাহারই নাম 'বিকাশ' হইবে।

ইতি
শ্রীইনসিওরেন্সভীত।

দুই

আমার এ কী হইল? এ কী বেদনা? দিনে আহার নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। মনে সুখ নাই। "অথির হইয়া ফিরি এখানে ওখানে।"

মলয় পবন, ফুলের সৌরভ, কোকিলের কুহুস্বর ও চন্দ্রের কিরণ সমস্তই আমার নিকট নিরর্থক মনে হয়। জীবন বিস্বাদ ঠেকে। নববরষার মেঘাড়ম্বর দেখিয়া হৃদয় আমার ময়ূরের মতো নাচে না, অধিকতর বেদনাভারাক্রান্ত হয়।

মনোবেদনায় নিশি জাগরণান্তে প্রভাতে উঠিয়া ভাবি,—আজিকার দিন ব্যর্থ যাইবে না। আজি মিলাইবে বিধি। দিন সাঙ্গ হয়, সন্ধ্যায় হৃদয় যন্ত্রণায় অধিকতর কাতর হইয়া পড়ি।

শুনিয়াছি কাব্যালোচনায় উদ্বেল হৃদয় শান্ত হয়। অমরশতকের অনুবাদ পাঠ করি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করি। কোন ফল হয় না।

আমার ন্যায় কোনো হতভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় কবি লিখিয়াছেন,—

"আর কতকাল থাকবো বসে ?"

বুঝিতে পারি, গ্রাম্য কবি কেন গাহিয়াছেন,—"আমার বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল শ্রীরাধা বিহনেরে।" হায়, আমি কি হইলাম ? আমি কি করিব ?

উত্তর

তুমি রিট্রেঞ্চমেন্টে পড়িয়া বেকার হইয়াছ। অতএব আহার, নিদ্রা এবং মনে সুখ না থাকিবারই কথা। অস্থির হইয়া এখানে ওখানে ফেরাটাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু মুরুব্বির জোর না থাকিলে কিছুই হওয়ার আশা নাই।

মলয় পবন, ফুলের সৌরভ, কোকিলের কুহুধ্বনি ও চন্দ্রালোকের সহিত ব্যাঙ্কের পাশ বই-এর একটা অদৃশ্য কিন্তু অবধারিত যোগ আছে। যাহাদের চাকরি নাই, তাহাদের কাছে ঐগুলি বাঙ্গালী প্রকাশকের নিকট কবিতার পাণ্ডুলিপির ন্যায় অগ্রাহ্য।

প্রভাতে সংবাদপত্রের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পড়িয়া মনে যে আশা জাগে সারাদিন চেষ্টার পরে অপরাহ্নে তাহা বিলুপ্ত হয়। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তবে সন্ধ্যাবেলার হৃদয় বেদনা বলিয়া যাহাকে ভুল করিতেছ উহা আসলে উদরের যন্ত্রণা,—হৃদয়ের নহে। পাক-যন্ত্রের অবস্থানটা হৃদযন্ত্রেরই কাছাকাছি। সারাদিন অনাহারে থাকিলে সন্ধ্যায় গ্যাস্ট্রিক ব্যথা চাড়া দিয়া ওঠে, এ কথা কবিরা জানে না, কবিরাজেরা মানে।

অমরুশতক বা রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলীতে তোমার কোন উপকার হইবে না। বরং দিন কতক পিটম্যানের সর্টহ্যান্ড চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

"বিনা কাষ্ঠে অনল জ্বলিবার" কথা নিতান্তই কবি-কল্পনা। উহাতে বিশ্বাস করিও না। নতুবা বিনা অন্নে ক্ষুধা নিবারণ হইত, বিনা বক্তৃতায় সভা।

তবে শ্রীকৃষ্ণের আমলে ব্রজধামে রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। কাজেই বেকার কানু গয়লাদের পাড়ায় সোমত্ত মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করিয়া ও বাঁশী ফুঁকিয়া দিন কাটাইয়াছেন। একালে সভা, সমিতি, এসোসিয়েশান বা পলিটিক্যাল পার্টির অভাব নাই। তুমি অবিলম্বে আমাদের ডি. এস. পি ; সি. এস. পি ; এস. এস. পি প্রভৃতি যে কোনো একটা বামপন্থী অথবা দক্ষিণপন্থী দলে ঢুকিয়া নেতা বানিয়া যাও। সকল বেদনার অবসান হইবে।*

ইতি
শ্রীরাজনীতিক।

* রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ।

বর্তমান শতকের ত্রিশের পর্যায়ে বাংলা সাময়িক পত্রের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, অধুনালুপ্ত বিচিত্রা মাসিক পত্রিকায় কুমু ও মধুসূদন কাহিনীর গোড়াতে নাম ছিল,—তিন পুরুষ। দুই কিস্তি প্রকাশের পরে কবি তার নব নামকরণ করেন—যোগাযোগ। পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে সে নামেই তার প্রকাশ ও প্রচলন।

নামান্তরের কারণ নির্দেশে কবি বলেন, নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করে ছায়েবানুগতা হয়ে চলবে সে তাঁর পছন্দ নয়। তাঁর ভাষায়, তিন পুরুষের তিন তোরণয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এটা লেখকের খেয়াল, কিছু প্রমাণ করার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করার জন্যেই। সুতরাং নামটা ত্যাগ করলে গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না। কবির মতে নামটা লাউয়ের বোঁটার মতো ; তাতে ধরবার সুবিধে। বোঁটার আকার নিয়ে কেউ লাউয়ের বিচার করে না।

লাউ সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য নিতান্তই পরিমিত। শ্রাবণের মেঘকজ্জল দিবসে পুষ্পিত কদম্ববন অথবা হেমন্তের অলস অপরাহ্নে নির্মল নীল আকাশের নীচে স্বর্ণাভ শস্য ক্ষেত্র অতি সাধারণ কবিত্বরসলেশহীন মানুষের মনকেও ক্ষণেকের জন্য মোহাবিষ্ট করতে পারে। কিন্তু উঠনের একপাশে বাঁশের মাচায় লম্বমান লাউয়ের দৃশ্য কোনো কালে কোনো কল্পনাপ্রবণ কোমল চিত্তকে উতলা করেছে, এমন কথা শোনা যায়নি। রোহিতের মুন্ড বা গলদাচিংড়ি সহযোগে সুপক্ক ব্যঞ্জনে লাউয়ের যে রস তা যতই উপাদেয় হোক না কেন তার উপলব্ধি একমাত্র রসনাতেই সীমাবদ্ধ। অতি ভোজন জনিত অপরিপাকে তার বেদনাদায়ক অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কাউকে যদি সচেতন হতে হয়, তবে সেটা উদরে, হৃদয়ে নয়। সুতরাং লাউয়ের বোঁটা সম্পর্কে কবিগুরুর অবজ্ঞা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু সংসারে নামটা কি সত্যি সত্যিই অলাবুবৃন্তের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ? সন্দেহ আছে।

পরিচয় সৌকার্যের জন্যই জগতে নামের উদ্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নামকরণ একটা কার্যকরণহীন ঘটনা। ইংরেজীতে যাকে বলে আরবিট্র্যারী। মার্জার জাতীয় জন্তুর এক বিশেষ শ্রেণীর নাম বাঘ, সার্কাস বা চিড়িয়াখানা ছাড়া অন্যত্র যার উল্লেখমাত্রই প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। অপর শ্রেণীর নাম বিড়াল,—যে গৃহিণীর সস্নেহ পরিচর্যায় ঘরে ঘরে প্রতিপালিত। কে কবে এদের বর্তমান প্রচলিত নাম দিয়েছিল তা যেমন জানা নেই, বাঘকে বিড়াল এবং বিড়ালকে বাঘ আখ্যা দিলে কী ক্ষতি ছিল তাও তেমনি প্রাণীতত্ত্ববিদদের বুদ্ধির অগম্য। আমকে আমলকি এবং জামকে জামরুল বললে প্রচলিত ধারণার অপহ্নব ঘটতে পারে বটে, কিন্তু উদ্ভিদ রাজ্যে কোনো বিপ্লবের আশঙ্কা থাকে না।

ভাষান্তর ও স্থানান্তরের ফলে পরিচিত নামের অপরিচিত রূপান্তরে নামের এই কারণহীন উৎপত্তি আরও স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। কে না জানে যে বরাকরের পুল পার হলেই বাংলার সিঙ্গাড়া বিহারের 'শামোশায়' পরিণত হয়, ঢ্যাঁড়স 'ভিন্ডি' আখ্যা পায় এবং তরুণীর সযত্নরচিত কবরীবন্ধনে শ্বেত করবীর গুচ্ছটি মুহূর্তেই

'কানের' হয়ে ওঠে? তাতে তাদের স্বাদ, গন্ধ বা শোভার কিছুমাত্র আরতম্য ঘটে না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাম অবশ্য বস্তু বা প্রাণীর আকার, বর্ণ বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে। সেখানে যদৃচ্ছ নামকরণের স্বাধীনতা স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ। গোলাকার সন্দেশের নাম বরফি এবং চতুষ্কোণ মিষ্টান্নের নাম কাঁচাগোল্লা হলে তাদের মিষ্টত্বের হানি ঘটে না, কিন্তু চোখে হাস্যকর এবং কানে পীড়াদায়ক হয়। দোকানে শাড়ি লাল, সবুজ বা বাসন্তী যে কোনো রঙেই স্ত্রীর মনে চাঞ্চল্য এবং স্বামীর পকেটে ছিদ্র সৃষ্টি করতে সক্ষম; কিন্তু নীলাম্বরী শুধু একটি বিশেষ রঙেই প্রাপ্তব্য। আষাঢ় গগনের পুঞ্জিত ঘনঘটায় দিনান্তে যদি কেউ ব্যাকুল কন্ঠে "ধবলীরে আন গোহালে" বলে হাঁক দেয় তবে যে পয়স্বিনী গাভীর চিত্রটি শ্রোতার মনে জাগে তার রঙটা অবশ্যই সাদা।

সনাক্তকরণ নামের অন্যতম উদ্দেশ্য,—একমাত্র নয়। নইলে নামের বদলে সংখ্যা দিয়েই পালা মিটতো। রাস্তায় কর্পোরেশান বা মিউনিসিপালিটির নম্বর মিলিয়ে অনায়াসেই বাড়ি চেনা যায়। খামের উপরে পয়ষট্টি-বি কিম্বা একশ তিয়াত্তর ডি-ওয়ান লিখলেই ডাকপিয়ন যথাস্থানে চিঠি পৌঁছে দেয়। তবুও নতুন বাড়ি তৈরী করে বাড়ির মালিক তার নাম দেন "'উদয় ভিলা', গেটের গায়ে পাথর বা কাঠের ফলকে উৎকীর্ণ করেন "শান্তি কুটির" অথবা তার চাইতে বেশী কাব্যগন্ধী,—"মিতালী" বা "মালঞ্চ"। সেগুলি বাড়ির শুধু আখ্যা নয়, আভরণও বটে।

আসল কথা, গল্প লেখা বা ছবি আঁকার মতো নামকরণও মানুষের রচনাত্মক মনোভাবের একটা বিশেষ প্রকাশ। কল্পনাশ্রয়ী শ্রবণসুখকর নাম দিয়ে সাধারণ জড় বস্তুকেও মানুষ অসাধারণত্বের স্পর্শ দেয়। রেলের উপর দিয়ে যে গাড়ি চলে তার রেলগাড়ি নামটা পুরোপুরি অর্থসঙ্গত। কিন্তু সেটা নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক। পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জার বা ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস বললে নামটা সমষ্টির গন্ডি থেকে ব্যষ্টিতে, বহুর মধ্যে থেকে একের কোঠায় নেমে আসে। তবুও সে-নাম পরিচয়ের চিহ্ন মাত্র। চাপরাশীর যেমন উর্দি, ভলাণ্টিয়রের যেমন ব্যাজ, বোষ্টমের যেমন কন্ঠি। শুধু গতির আভাস বা গন্তব্যের হদিস ছাড়া তার সঙ্গে টুয়েন্টি-আপ বা থার্টিসেভেন-ডাউনের তফাৎ সামান্য। কিন্তু ডেকান কুইন বা ফ্লাইং স্কটসম্যান নামের মধ্যে আছে এমন কিছু যা নামের অধিক। সে রেলগাড়ির বস্তুরূপকে অতিক্রম করে ভাবরূপে পরিব্যাপ্ত। ট্রেনকে সে শুধু পরিচিতি নয়, ব্যক্তিত্ব দান করে।

রজ্জুতে সর্পভ্রম মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু বস্তুতে ব্যক্তিত্ব আরোপ সৃজনধর্মী মনের সার্থক বিকাশ। আমের বস্তুরূপটা ফল; পোস্তা অথবা হাতিবাগানে যা ঝুড়ি দরে বিক্রী হয়। আমের ভাব রূপটি আছে রাণীপসন্দ নামের মধ্যে। তাতে আছে উন্নতরুচি রাজমহিষীর দুর্লভ পক্ষপাতের ইঙ্গিত। 'ইউ'দের সেন্ট এবং 'নন-ইউদের'দের পারফিউম কথাটায় অতি আধুনিকাদের টয়লেট কেশে সুদৃশ্য শিশিতে-ভরা প্রসাধন দ্রব্যের গুণের ব্যাখ্যান হয়। 'ইভিনিং-ইন-প্যারি' বা 'রেড মস্কো' নাম তাকে দেয় স্বপ্নলোকের মোহজাল। সেটা নোবেল প্রাইজ পাওয়া রাসায়নিকেরও সাধ্যাতীত।

গোলাপ যে-কোনো নামেই সমান মনোহরণ করে বলে যে মহাকবি নামের গুরুত্ব অস্বীকার করে গেছেন, হায়, তাঁর জানবার সুযোগ হয়নি যে গোলাপ-বিলাসীরা ইতিমধ্যে গোলাপেরই সহস্রাধিক নামকরণ করেছেন বস্তু হিসাবে গোলাপের যে মাধুর্য তা কয়েকটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের মধ্যেই নিবদ্ধ। তার জন্যে চমৎকারিত্বের প্রয়োজন না থাকতে পারে। কিন্তু পিকাডেলী, মন্টিজুমা বা ফ্লেমিং সান-সেট নামের মধ্যে আছে একটা ভাবের ইসারা যা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না। সে নামগুলি গোলাপকে এমন একটি স্নিগ্ধ মহিমা দান করে যা তার শোভা ও সুরভির বহু ঊর্ধ্বে। সে নামের পিছনে বোটানিস্টের হাত নেই, কল্পনাপ্রবণ কবিমানসের সুকুমার অনুভূতির চিহ্ন আছে যা রূপকে করে অপরূপ, রসকে করে বচনাতীত।

বস্তুর ন্যায় ব্যক্তির পরিচয় কেবল গুটি কয়েক প্রত্যক্ষগোচর গুণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার আত্মপ্রকাশের ধারা বহুবিধ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পরিবেশে তার বিভিন্নরূপ। সকালবেলা থলে হাতে গড়িয়াহাটের বাজারে যিনি আলু কেনেন, দুপুরে হাইস্কুলে তিনি ছেলেদের রুল অব থ্রি অঙ্ক কষান, বিকালে ময়দানে সবুজ গ্যালারীতে বসে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের জন্য চেঁচিয়ে গলা ফাটান। অধস্তন কেরানীদের কাছে আপিসের যে বড়সাহেবের দুর্ধর্ষ চেহারা, ঘরে শাসনপটু গৃহিণীর কাছে তাঁরই বিনয়াবনত মুখ।

এই বহুমুখী অস্তিত্বের মধ্যে মানুষের পরিচয় যখন পারিবারিক সম্বন্ধের সূচনা করে তখন তার নাম প্রচলিত প্রথা দ্বারা সুনির্দিষ্ট। সম্পর্কের বিচারে আমরা কাউকে বলি ছোড়দি ; কাউকে বলি—বেয়ানঠাকরুণ। ভাষা ভেদে খুড়োমশাই চাচাজী এবং বউদি ভাবীতে রূপান্তরিত হতে পারেন। কিন্তু মূলতঃ সে নামগুলি সরকারী আপিসের কার্যবিধির মতো স্মরণাতীতকাল থেকে অবিসংবাদে স্বীকৃত। প্রকৃত পক্ষে সেগুলি মানুষের সংজ্ঞা নয়,—সম্বোধন।

কখনও কখনও মানুষের নামে থাকে তার জাতি বা বৃত্তির নিশানা। পাড়ার বামুনদি সম্পর্কে আর কিছু না জানলেও এইটুকু জানি যে, তিনি কায়েতের মেয়ে নন। পণ্ডিতমশাই-এর বিদ্যা অথবা পুরুতঠাকুরের সাত্ত্বিকতা নিয়ে মতদ্বৈধ ঘটতে পারে। কিন্তু তাঁদের জীবিকা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। তাঁদের বনমালী, গোবর্ধন, চন্দ্রমোহন বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত নাম নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। কিন্তু একমাত্র ভোটার লিস্টে ছাড়া অন্য কোথাও তার কোনো খোঁজ পড়ে না। রেলের মালবাবু এবং আদালতে জজসাহেবের পিতৃদত্ত নাম চাপা পড়ে থাকে তাঁদের চেয়ারের আড়ালে। পদ ও পদবীতে প্রভেদ থাকে না বস্তুতঃ মাইনারের মাথায় হেলমেট এবং আম্পায়ারের গায়ে সাদা কোটের মতো পেশা দিয়ে যে শুধু পোষাক নিরূপিত হয় তা নয়, নামেরও উদ্ভব ঘটে।

কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির যে প্রকাশ তা আপিসে প্রমোশন, ইলেকশানে ভোট এবং সংবাদপত্রে শোক-সংবাদ রচনার জন্যে যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন মানুষের পরিচয়ের দিক দিয়ে তা একান্তই আংশিক। কর্মকেন্দ্রিক জীবনের বাইরে নরনারীর যে একটি বৃহত্তর সত্তা আছে তা কোনো একটি বিশেষ লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত নয়। লঙ্কায় ঝাল, তলোয়ারে ধার এবং বাঁশীতে সুর ছাড়া আমারা আর কিছুই প্রত্যাশা করিনে। কিন্তু মানুষকে পাই তার রূপ, গুণ, বীর্য, প্রেম, ধৃতি ও তিতিক্ষায়।

পুণ্যে পাপে, দুঃখে সুখে, পতনে উত্থানে তার ব্যক্তিত্ব বহুধাবিকীর্ণ। মানুষের এই বহু বিচিত্র বিকাশকে কোনো একটি মাত্র নামের মধ্যে ব্যক্ত করা কঠিন। তাই পুরাণ ইতিহাসে ব্যক্তির একাধিক নাম। মহাভারতের ভীম বৃকোদর, রামায়ণের রাবণ দশানন এবং দশরথ তনয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

সেকালে ঠাকুর দেবতাদের নাম ও নারী দুই-এরই সংখ্যা ছিল অগুনতি। কৃষ্ণের শতনাম, সহস্র গোপিনী। বর্তমান মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে সে সব এলাহী কাণ্ড ভাবতেও আমাদের হৃৎকম্প হয়। একশ্চন্দ্র যেমন তমোহন্তি এখন এক স্ত্রীই শান্তি হরণের জন্য যথেষ্ট।

নামের বহুলতা একালেও একেবারে পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি। ওয়ারড্রোবে পোশাকী ও আটপৌরে দুই প্রস্ত শাড়ি গয়নার মতো বেশীর ভাগ মেয়েরই নামও একাধিক। কলেজের রেজিস্ট্রারে যে তম্বঙ্গী বিদ্যার্থিণী বাসন্তিকা রায়, বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে সে হয়তো টুনু বা বাবলু। ছেলেদের নামেরও সদর অন্দর আছে। এন্ডারসন কোম্পানীর মুৎসুদ্দী মহাতপ চাটুয্যের ঝাঁটার মতো গোঁফ, হাঁড়ির মতো ভুঁড়ি এবং ফুটবলের মতো টাকের পানে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য মনে হলেও তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা জানেন, তাঁর বৃদ্ধা পিতামহীর কাছে এখনও তিনি খোকন।

সংসারে আলো ও বাতাসের মতো নামটাও এত স্বতঃসিদ্ধ যে তার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা নিজেরাও তেমন সচেতন নই। দুর্ভিক্ষ এ দেশে প্রাত্যহিক এবং রাষ্ট্রবিপ্লব আছে শুধু সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। সুতরাং সে প্রসঙ্গ থাক। কিন্তু রাজদ্বারে শ্মশানে চ যার খোঁজ পড়ে থাকে সে হচ্ছে নিজের নাম। আপিসের হাজিরা বই থেকে রেশনের কার্ড এবং ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন থেকে জমির দলিল অবধি সর্বত্রই নামের উল্লেখ চাই। আপনাতে আপনি বিকশি বৃন্তহীন পুষ্পের খবর আছে কবিসম্রাটের কল্পনায়, রাষ্ট্রহীন নাগরিকের অস্তিত্বও অসম্ভব নয় আধুনিক জগতে। কিন্তু নামহীন মানুষের জায়গা নেই কোনোখানে। যাঁরা বলেন যে জেলের কয়েদী এবং স্টেশনের কুলীদের নাম নেই, আছে নম্বর, তাঁরা জানেন না যে এগজামীনের খাতার মতো তাদেরও পূর্ণ পরিচয়ের তালিকা থাকে নেপথ্যে।

সবাই জানি, মহাত্মা বলতে বোঝায় গান্ধীজিকে। বালগঙ্গাধর তিলকের আখ্যা ছিল লোকমান্য। দেশবন্ধুরূপে জনচিত্তে আজও অবিস্মরণীয় বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশ। এগুলি তাঁদের পিতৃদত্ত নাম নয়,—আপন পুণ্য জীবনের মহিমামণ্ডিত লোকদত্ত বিশেষণ, অগণিত অনুরক্ত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। কিন্তু সংসারে বেশীর ভাগ নামই অর্জিত নয়, প্রাপ্ত। জমিদার-নন্দনের যেমন ব্যাংক ব্যালেন্স, মন্ত্রীদের যেমন মোটরকার।

ভূমিষ্ঠ হয়েই বিত্তলাভ ঘটে কোটিতে গুটিকের। জন্ম নিলেই একটা নাম জোটে যে-কোনো শিশুর। বলাবাহুল্য, সে নাম নির্বাচনে শিশুর নিজের কোনো কৃতিত্ব নেই। অর্থের সাচ্ছল্য থাকলে বেনারসী, চন্দ্রহার, মোটরগাড়ি মায় স্বামী পর্যন্ত পছন্দ করে নেওয়া চলে। কিন্তু নিজের কৌলিক নামের উপরে নিজের রুচি খাটে না। ঐখানে আমরা সবাই পিতৃমাতৃনির্ভর। তাই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে বই-এর ভ্রমসংশোধনের মতো নামেরও পরবর্তীকালে পরিমার্জন, পরিবর্জন ঘটে। পেল্লারাম পেলব রায়ে পরিণত হয়, অরুণ চাটুয্যে হন উত্তমকুমার।

সুখের বিষয় নিজের নাম নিয়ে নিজের কোনো দায় নেই। সন্তানের শিক্ষা সহবৎ এবং আচার আচরণে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য মা-বাবাকে নিন্দা সইতে হয়। কিন্তু তার নামকরণের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। শরৎচন্দ্রের নায়ক ঈর্ষাদগ্ধ সতীশ মেসের ঝি সাবিত্রীকে "মা-বাবা সার্থক তোমার নাম রেখেছিলেন" বলে ব্যঙ্গ করেছিল। সেটা নিতান্তই রাগের কথা। নইলে একথা বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, নামের অর্থ বজায় রেখে বেঁচে থাকা পৃথিবীতে খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব।

কানাছেলের পদ্মলোচন নাম কৌতুকের বিষয় সে-কথা বাংলা প্রবাদে বলে। টেলিফোন রং-এর কন্যার নাম গৌরী শুনলেও চমকে উঠতে হয়। কারণ অসঙ্গতিটা এতই সুস্পষ্ট যে অতিশয় নির্বোধ ব্যক্তির কাছেও তা অজ্ঞাত নয়। কিন্তু শিশু সাধুচরণ যদি বড় হয়ে নোট জাল করে জেলে যায় এবং বুদ্ধদেব বাঁড়ুয্যে যদি পুলিশ কোর্টে নারী হরণের মামলায় আসামী হয়, তবে তাদের নাম নিয়ে তাদের মা-বাবাকে খোটা দেওয়া চলে না। জনক-জননী স্নেহপরায়ণ হবেন, এটা স্বাভাবিক। তাঁরা যে জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞও হবেন, এমন প্রত্যাশা অনুচিত। পাঁজি দেখে যাত্রা এবং ঠিকুজি দেখে বিয়ের সম্বন্ধ আমরা অনেকেই করে থাকি। কিন্তু করকোষ্ঠি দেখে ছেলের নামকরণ করেছেন এমন সাবধানী বাপের কথা আজও শোনা যায়নি।

ইংরেজীতে একটা সহজ নিয়ম আছে যাকে বলে, রুল অব থাম্ব। তাতে অনেক জটিল বিষয়ের কাজ চালানো মীমাংসা হয়। নামকরণেও গোটা কয়েক সাধারণ নীতি মেনে চললে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে না। এযুগে রাজা প্রায় সব দেশ থেকেই অন্তর্হিত, রাজ্য চালায় রাজপুরুষ। সুতরাং নৃপতি, ভূপতি, নাম নিয়ে আর টানাটানি করে কাজ নেই। সোনা যখন বাজারেই ফোরটিন ক্যারেট তখন হিরন্ময়ী বা স্বর্ণলতারা নিশ্চয়ই অলীক এবং সোনামনিরা এ্যানাক্রোনিজম। মোট কথা, বাঙ্গালী ছেলেদের নাম বীরেন্দ্র এবং বাঙ্গালী মেয়েদের নাম সুদর্শনা না হলেই ভালো। জানি, স্নেহ অন্ধ এবং কল্পনা বল্গাহীন। কিন্তু তারও একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকা প্রয়োজন মনে করি।

জীবনে নামকরণের গুরুত্ব যতটুকু সাহিত্যে তার বেশী। মানব মনের সুকুমার ও সূক্ষ্ম অনুভূতিকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ। তার যে রস সে অনির্বচনীয়। কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা। সে-রস শুধু পুঁথির পাতার মধ্যে নয়, পাঠকের হৃদয়ের গভীর উপলব্ধিতে প্রসারিত। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের তত্ত্ব লেখকের কলমের মারফতে যতখানি প্রকাশ ততখানিই বোধ্য। সাহিত্যে লেখার যেথায় শেষ সেথায় বোঝারও অন্ত নয়।

নির্দিষ্ট অক্ষপথে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে জগতে দিবা-রাত্রি ঘটে, ছাপার অক্ষরে এটা একটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক। কিন্তু 'গগনে গরজে মেঘ' এই যুক্তাক্ষর বর্জিত অতি সহজ তিনটি শব্দের সমাবেশ আমাদের কাছে শুধু তথ্য বহন করে না, মনের পর্দায় ঘনবরষার একটি শ্যাম গম্ভীর চিত্র সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানে বস্তুটাই মুখ্য। সাহিত্যে ব্যঞ্জনাটাই আসল। ওস্তাদী গানে কথার মতো তার বিষয়টা অপ্রধান।

কাব্য উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে আমরা গ্রন্থকারের রচনার সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ রাখিনে, আপন কল্পনার তুলিতে রাঙ্গিয়ে তুলি। নাম সেই অংকনকার্যে সহায়তা করে। কবি ও কথাশিল্পীরা যে তাঁদের কাব্য ও পাত্র-পাত্রীদের নামকরণে বিশেষ যত্ন নিয়ে থাকেন সেটা অকারণ নয়। মলাটের উপরে 'প্রাথমিক পাটীগণিত', বা ইংলন্ডের ইতিহাস' দেখলে বই-এর ভিতরে কী আছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হই। প্রয়োজন হলে কিনতেও দ্বিধা ঘটে না। কিন্তু 'নলিনাক্ষের সহিত কমলার মিলন' নাম হলে অতিবড় রবীন্দ্রকও 'নৌকাডুবি' পড়তে উৎসাহ বোধ করতেন কিনা সন্দেহ, যদিও নামটা বিষয়সঙ্গত। কবি নিজেও সাহিত্যে নামকণের এই গুরুত্ব সম্পর্কে কম সচেতন ছিলেন না। দ্রৌপদীর নাম যদি ঊর্মিলা হতো তবে পঞ্চপতিগর্বিতা সেই ক্ষত্র নারীর দীপ্ত তেজ যে ঐ তরুণ কোমল নামটির দ্বারাই পদে পদে খন্ডিত হতো সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন।

পোষাকের মতো নামেরও বাহার এবং বৈচিত্র্য ছেলেদের চাইতে মেয়েদের বেশী। অতীত থেকে বর্তমান অবধি বাঙ্গালী পুরুষের নামের হেরফের যা হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত অল্প। মেয়েদের নাম তাদের শাড়ির পাড় এবং ব্লাউজের ছাট-কাটের মতো অনেক অদল-বদলের মধ্য দিয়ে চলেছে। সে বিবর্তনের ধারার সঙ্গে বাংলা বই-এর নামকরণের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়

আদি যুগে নাম ছিল ঠাকুর দেবতার অনুকরণে। যথা, মেয়েদের নাম—জগদম্বা, যোগমায়া বা সিদ্ধেশ্বরী। বই-এর নাম,—অন্নদামঙ্গল, হরিবংশাবলী, কৃষ্ণচরিত্র। পরবর্তীকালে চার পাঁচ অক্ষরের পার্থিব নাম। যেমন মেয়েদের শৈলবালা, কমলকুমারী, মাধুরীলতা এবং উপন্যাসের দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্গবিজেতা ও মাধবীকঙ্কন। তারপরের অধ্যায়ে তিন অক্ষরের সাদা সিধে নাম। তখন মেয়েরা মালতী, দামিনী ও সুষমা। বই—গীতালি, বলাকা, ও চৈতালী। মাঝে মাঝে যমকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিশুদের ফালতু বা হেলা এবং সমালোচক ঠকাবার জন্য পুস্তকের পর্ণপুট বা তৃণখন্ড নামও দেখা গেছে।

একদা ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙ্গালীর মন্দতেজ নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোতে বিদেশী ভাবধারার একটা প্রচন্ড জোয়ার এসেছিল। সে বিপুল জলোচ্ছ্বাসে আমাদের বহু জীর্ণ ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণের মূল ধ্বসে তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাতে আমরা উপকৃত হইনি একথা বললে সনাতন আর্যধর্মের জয় হয় কিনা জানিনে, সত্যের মর্যাদা নিশ্চয়ই রয় না। অবশ্য জোয়ারের প্রথম বেগে জল মাঝে মাঝে নদীর কূল ছাপিয়ে যায়। তাকে বলি বন্যা। সে দিনের বিলাতীভাবের বন্যায় আমাদের শিক্ষিত সমাজেও একটা নোঙর ছেঁড়া, বাঁধন ভাঙ্গার ঢেউ উঠেছিল, চলতি কথায় যাকে বলা হত সাহেবিয়ানা। তার কতটা ভালো, আর কতটাই বা মন্দ সে-বিচারের ভার ঐতিহাসিকের। তবে একথা ঠিক যে মাঝে মাঝে তার অত্যুগ্র প্রকাশ ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলা, বা পা ফাঁক করে সিগারেট খাওয়ার মতো নিছক অর্থহীন পরানুকরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে। সেদিনের নামকরণের মধ্যেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইঙ্গবঙ্গ মনোভাবের পরিচয় ছিল। আইভি-দি, কুইনী-মাসি, মিলি মিত্তির, মেরী চ্যাটার্জীরা শুধু সমাজের উচ্চস্তরেই নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরেও দেখা দিয়েছিলেন। সেদিন বাঁড়ুয্যেরা ব্যানার্জী হয়েছেন,

বসু মশাই—মিস্টার বোস। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ডি-এল-রায় এবং সিভিলিয়ন সত্যেন্দ্রনাথ রায় এস-এন-রে নামে পরিচিতি লাভ করেছেন।

নামের এই বিলাতীকরণ পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে ব্যবসায়িক জগতেও সংক্রামিত হয়েছিল। দত্ত এ্যাণ্ড কোং বা চ্যাটার্জী ব্রাদার্স নাম ইংরেজী এ্যাণ্ডারসন লিমিটেড বা পিলকিংটন এ্যাণ্ড সন্সের অনুকরণ হলেও একেবারে অভূতপূর্ব নয়। বিদেশী হাওয়া গায়ে লাগার আগেও আমরা হাটে বাজারে 'সাহাদের আড়ৎ' বা 'চৌধুরীদের গদি'র সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। পালেরা পল্ এবং করেরা কার হওয়াতেও অবাক হইনে। কিন্তু বিপিন মোদক যখন বি, পীন. এ্যাণ্ড কোম্পানী এবং গোপাল বটব্যাল যখন জি. ও. পী. অল (প্রাইভেট) লিমিটেড নামে ব্যবসা শুরু করে, তখন নামের গায়ে বিদেশী আস্তরণ লাগাবার প্রয়াসটা আর উহ্য থাকে না। অবশ্য সে-যুগে ডবল দামে সাহেবী দোকান থেকে জিনিস কেনা প্রগতি এবং আভিজাত্যের লক্ষণ গণ্য হতো সে-যুগে এ মনোভাব সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। স্বনামে পুরুষ ধন্য হতে পারে, কিন্তু ধনী হতে গেলে অনেক সময়ে বেনামীতেই কাজ সারতে হয়, এ তথ্য বর্তমান ব্ল্যাক মার্কেটের দিনে কে না জানে?

বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে—এভরি এ্যাকশন হ্যাজ ইটস্ ইকুয়্যাল এ্যাণ্ড ওপোজিট রি-এ্যাকশান। অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারেও কথাটা কম প্রযোজ্য নয়। যৌবনে যাঁরা মদ্য, মাংস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সম্পর্কে একেবারে মোহমুক্ত পুরুষ, বার্ধক্যে তাঁরাই গীতা, গঙ্গাস্নান ও গুরুদেব নিয়ে মাতামাতির আর সীমা রাখেন না। বাঙ্গালীর নামকরণেও এই নিউটনীয় সূত্রের প্রভাব আছে। বিগত যুগে যেমন ইংরেজী নাটক-নভেল থেকে মেয়েদের নাম আমদানি করা হতো, বর্তমান যুগে তেমনই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য মন্থন করে নাম নির্বাচন হচ্ছে। একালের গয়নার ডিজাইনের মতো নামেরও প্রাচীনত্বটাই আধুনিকতার চিহ্ন। এ্যান, ন্যান্সী এখন আর ফ্যাশান নয়। এখনকার নাম,—স্বাতী, শর্মিলা, চিত্রলেখা বা প্রজ্ঞাপারমিতা।

দোকানের সাইনবোর্ডেও এখন রিভার্স গিয়ারের পালা। অক্সফোর্ড স্টোর, এম্পায়ার মেডিক্যাল হল্ কিম্বা এলিফিনস্টোন পিকচার প্যালেস এখন পুরাতত্ত্বের কোঠায়। হালে খাবারের দোকানের নাম মিষ্টিমুখ, সিনেমার নাম রূপালী, এবং জুতার দোকানের নাম শ্রীচরণেষু। প্রতিক্রিয়া? বোধ হয়। প্রতিশোধ বললেও ক্ষতি নেই।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ

উৎসর্গ

দুর্গাকে

পুরানো আমলের সাদা সাহেবেরা বলতেন—সুটীর। হাল আমলের কালো মনিবেরা ডাকেন—নোবীশ। আসলে নামটা সুধীর খাশনবীশ। কেরানীরা বলে—বাঁশনবীশ। অবশ্য আড়ালে। সামনে "স্যার" ছাড়া অন্য কোন সম্বোধন করবে এমন বুকের পাটা নেই কারো।

এটাচড্ আপিসের লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক থেকে মিনিস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারী। শিলিগুড়ির সমতলভূমি থেকে প্রায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া, এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিংএর বেসমেন্ট থেকে টেরেস। দুষ্প্রাপ্য প্রমোশনের সোপানে সোপানে উত্তীর্ণ হয়েছেন খাশনবীশ। শত্রুপক্ষ নিন্দা রটায়—ইস্, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। অর্থী-প্রত্যর্থীর দল প্রশংসায় গদগদ হয়ে বলে—ওহো, রিজেন ফ্রম দি র‍্যাংকস্; কি অপূর্ব কর্মক্ষমতা।

লোকটা কাজের সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। বিদেশী ও স্বদেশী দুই রাজত্বেই সমান সুনাম আছে খাশনবীশের। উপরয়ালারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চুনি, পান্না বসানো জড়োয়া গয়নার মতো তাঁর ক্যারেক্টার রোলগুলি "হাইলী এফিসিয়েণ্ট", "এক্সট্রিমলী ডিলিজেন্ট" প্রভৃতি বাছা বাছা ইংরেজী বিশেষণের দ্যুতিতে ঝলমল।

সেটা কিছু অহেতুক নয়। সরকারী কাজে এমন অনন্যমতি অনুরাগ কদাচিৎ দেখা যায়। ঋতুভেদে সূর্যের উদয়-অস্তের তারতম্য ঘটে। শুধু খাশনবীশের আপিসে আসা-যাওয়ার সময়ের এদিক-ওদিক নেই। তাঁকে সকালে দশটার পাঁচ মিনিট আগে ছাড়া পরে আসতে কেউ কখনও দেখেনি। রাত সাড়ে সাতটার আগে বাড়ি ফিরেছেন এমন ঘটনা বিরল।

সেবারে খাশনবীশের ছেলের অসুখ। তিনদিন জ্বরের বিরাম নেই। আপিসে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে আশ্বাস দিলেন বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় ডাক্তার নিয়ে ফিরবেন।

পিছনে খাস চাপরাশীর কাঁধে ফাইলের বোঝা সহ যখন বাড়ি এলেন রাত তখন প্রায় ন'টা।

স্ত্রীর কাছে এটা অভূতপূর্ব নয়। তিনি নিজেই ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলেন। পান্ডে ডাক্তার পরিবারের অনেক দিনের বন্ধু, প্রায় ঘরের লোকের মতো। চিকিৎসা এবং প্রয়োজন মতো মৃদু ভর্ৎসনা দুইই করে থাকেন। অবাক হয়ে বললেন, "বাড়িতে ছেলের এমন অসুখ, আর তুমি রাত নটা অবধি আপিস করছো? এ কী কাণ্ড?"

খাশনবীশ লজ্জিত স্বরে বললেন, "বল কেন গেরো! পোনে পাঁচটায় চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌তে যাচ্ছি এমন সময় জয়েণ্ট সেক্রেটারী ডেকে বললেন—কাল সাড়ে দশটায় কমার্স মিনিস্ট্রিতে জরুরী মিটিং। নোট তৈরী করে সকাল সাড়ে আটটায় পৌঁছে দেওয়া চাই তাঁর বাড়িতে। দেখ দেখি একবার হুজুরের আক্কেল; মিটিং হবে, তা' সে কথা দু'দিন আগে বলবি তো। না একেবারে শিরে সংক্রান্তি! খোকা আছে কেমন? সিরিয়াস কিছু নয়তো?"

ডাক্তার সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, "তাকে বলতে পারলে না যে

তোমার ছেলের অসুখ, ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছ। তিনি তাঁর নোট অন্য আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতেন!"

"তিনি করিয়ে নেবেন? তবেই হয়েছে আর কি? গাড়ি নিয়ে সেজেগুজে মেমসায়েব আগের ভাগেই এসে বসেছিলেন। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই হর-পার্বতী চলে গেলেন পার্টিতে।" নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন খাশনবীশ।

সে হাসিতে কিছুমাত্র যোগ না দিয়ে ডাক্তার বললেন, "যার মিটিং তিনি গেলেন পার্টিতে, আর যার ছেলের অসুখ সে রইল তাঁর কাজ করতে। খুব চমৎকার ব্যবস্থা দেখছি।"

এবার গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন খাশনবীশ, "আরে ভাই এ যে তোমাদের রঘুপতি রাঘব রাজারামের রাজ্য। এইখানে এই তো হয়েছে রেয়াজ। সেক্রেটারিয়েটে পনর আনা লোকই কাজ করে না, কেবল গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। তাই যে দু-চারজন লোক খাটে তাদের একের ঘাড়ে দশের বোঝা চাপে। নাঃ, আর পারিনে,— চাকুরি-বাকুরি ছেড়ে দিলে বাঁচি।"

বিরক্তিটা যে কপট, তা বুঝতে বাকী থাকে না কারো।

ডাক্তার রাগ করে বললেন, "রাখ তোমার ন্যাকামি। তুমি না থাকলে যেন গভর্নমেন্ট আর দুনিয়া উল্টে যাবে।"

খাশনবীশের অভাবে গভর্নমেণ্টের পতন এবং পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে এমন কথা তিনি বলেন না। তবে তিনি নজর না দিলে অসাবধান সেকশন অফিসার আর অপরিপক্ক আণ্ডার-সেক্রেটারীরা মিলে কোথায় যে কী তালগোল পাকিয়ে রাখবে তার কিছু ঠিক আছে কি?

এ ধারণাটা শুধু খাশনবীশেরই নয়, তাঁর উপরয়ালাদেরও। তাঁরা জানেন, যে কোনো দুরূহ কাজের ভার খাশনবীশকে দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই সময়ে এবং অসময়ে তাঁরই ডাক পড়ে।

মেয়ের বিয়ের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন খাশনবীশ। দু'মাস, একমাসের আর্নড লীভ নয়। ক্যাসুয়েল। মোটে চারটি দিনের। পার্লামেন্টে বাজেট সেশান চলছে, এ সময়ে বেশী দিনের ছুটি চাইবেন কি করে? খাশনবীশের কি বিচার বিবেচনা নেই?

কিন্তু সে চারটি দিনেও সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। আপিস জড়িয়ে থাকে খাশনবীশের অদৃষ্টে। বিয়ের দিন সকাল বেলায় পট্টবস্ত্র পরে কুশাসনে বসেছেন আভ্যুদয়িকে। পুরোহিত মশায় মন্ত্র পড়াচ্ছেন,—মধু বাতা ঋতায়তে ইত্যাদি। এমন সময় টেলিফোন আসে স্বয়ং সেক্রেটারীর কাছ থেকে। পার্লামেণ্ট কোশ্চেনের ফাইল পেশ হয়নি মন্ত্রীর কাছে। যার উপরে ভার ছিল সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছে হাসপাতালে। আজকের দিনে খাশনবীশকে ওয়ারী করতে হচ্ছে এজন্য তিনি অফুলি সরি। কিন্তু খাশনবীশের যদি কাইন্ডলি—

'যদি'র কোনো অবকাশ নেই খাশনবীশের কাছে। তৎক্ষণাৎ ফাইল হাতে স্টেনোগ্রাফার এল খাশনবীশের বাড়িতে।

উঠানে মেরাপ বাঁধা হচ্ছে, আত্মীয় বন্ধুরা কেউ তদারক করছেন ভিয়েনের কেউ ছুটেছেন বাজারে, কেউ বা ফর্দ মিলিয়ে সন্দেশের থালা, দৈ-এর হাঁড়ি তুলছেন

ভাঁড়ারে। স্বজনকুটুম্ব, ছেলেমেয়েদের কল-কোলাহলে বিয়ে বাড়িতে কোথাও এতটুকু নির্জন জায়গা নেই। বারান্দার এক কোণে টুল পেতে বসে ওরই মধ্যে কন্যাকর্তা লোকসভার প্রশ্নের জবাব এবং "নোট ফর সাপ্লিমেন্টারী" লিখে দিলেন।

আশ্চর্য নয় যে আপিসে খাশনবীশের খাতির প্রচুর এবং প্রতিপত্তি প্রভূত। উপরন্তু কর্তারা তাঁকে যে পরিমাণ পছন্দ করেন, অধীন কর্মচারীরা ঠিক সেই পরিমাণে করে ভয়। নিজের ভুলচুক নেই; তাই অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে তিনি ক্ষমাহীন। না বলে কয়ে এক কেরানী কদিন অনুপস্থিত। সে আপিসে আসতেই তাকে লিখিত কৈফিয়ৎ দিতে হল। জ্বর হয়েছিল বললেই পার পাওয়া যায় না। অসুস্থতা অপরাধ নয়। অসুখ করলে কাজে না আসাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু নিয়ম অনুসারে ছুটির দরখাস্ত পাঠায়নি কেন? অফিস ডিসিপ্লীন নেই কি?

এক চাপরাশী কাবুলীয়ালার কাছে টাকায় চার আনা সুদে ধার নিয়েছিল। খাশনবীশ জানতে পেরে নিজে উদ্যোগী হয়ে আপিসে কো-অপারেটিভ ব্যাংক চালু করলেন। আপদে বিপদে গরীব কর্মচারীরা যাতে ঋণ পেতে পারে। কিন্তু চাপরাশীর সাসপেনসন রোধ হল না। সরকারী কর্মচারীদের কন্ডাক্ট-রুলস-এ ধার দেওয়া এবং নেওয়া দুই-ই নিষিদ্ধ! সে কথা তো ভুললে চলে না। খাশনবীশ নির্দয় নন, নিয়মনিষ্ঠ।

প্রতাপ শুধু আপিসেই সীমাবদ্ধ নয়, নিজের বাড়িতেও প্রসারিত। সাধারণতঃ সমাজে স্ত্রী-পুরুষের কর্তৃত্বের একটা এলাকা বিভাগ থাকে। স্বামী আপিস-আদালত, ব্যবসা বাণিজ্যে খাটেন, টাকা আনেন। স্ত্রী ঘরকন্না দেখেন, ছেলেমেয়ের স্বামী শ্বশুরের সেবাশুশ্রূষা করেন গৃহে তাঁর শাসন নিরংকুশ। সদর অন্দরের এই কার্যবিভাগের ফলে সংসারযাত্রাটা সুগম হয়।

কিন্তু খাশনবীশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইউনিটারী ছাড়া অন্য কোনো গভর্নমেন্ট নেই। প্রভিন্সিয়েল অটোনমীতেও তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর স্ত্রী শৈলবালার আরাম আয়েসের আয়োজন ত্রুটিহীন। ঝি, চাকর, রাঁধুনি, মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটার কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু গৃহের কর্তৃত্ব গৃহিনীর হাতে নয়।

খাশনবীশ নিজে সেকরা ডেকে গিন্নীকে বার ভরি সোনার বালা গড়িয়ে দেন। সে বালা মকরমুখের হবে কি বলপ্যাটার্নের হবে সে সিদ্ধান্তও করেন তিনিই। পুজাপার্বণে ফি বছর দামী বেনারসী, চান্দেরী কিনে আনেন দোকান থেকে। শীতের মরশুমে কেনেন শাল বা মালদা। কিন্তু তার পাড় বা রং পছন্দ করার স্বাধীনতা নেই স্ত্রীর। আলমারীর চাবির গোছাটা ভদ্রমহিলার আঁচলে। কিন্তু সংসারের চাবিকাঠিটি তাঁর স্বামীর পকেটে।

এই নিরবচ্ছিন্ন একাধিপত্যের মধ্য দিয়েই কেটে গেছে এত কাল। কোনোখানে প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু নিচ্ছিদ্র পাথরের দেয়ালেও ফাটল দেখা দেয় একদিন। নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলেও ঢেউ ওঠে কখন কখনও।

ছুটির দিনে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হয়েছে। পান চিবুতে চিবুতে একটা আরাম-কেদারায় আধশোয়া ভাবে বিশ্রাম করছিলেন খাশনবীশ। স্ত্রী কদিন থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সন্তর্পণে কথাটা পাড়লেন।

"এবার পল্টুর বিয়ে দিলে হয় না?"

পল্টু অর্থাৎ ছেলে। বাড়ির একমাত্র পুত্রসন্তান। বছর চব্বিশ বয়স। যেমন সুদর্শন, তেমনি মেধাবী। স্কুল কলেজে স্কলারশিপ পেয়েছে বরাবর। সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে সেখানেই হাউস-সার্জেন হয়েছে।

কথাটা খাশনবীশের মনেও উদয় হয়েছে বটে। বললেন, "আমিও তাই ভাবছিলুম, সেদিন ভবেশ রায় বলছিল তার মেজ মেয়েটির কথা—"

স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, "রাম বল, সে মেয়ে যেমন কালো তেমনি বেঁটে, তাকে পল্টুর কখনও পছন্দ হবে না।"

পল্টুর পছন্দ অপছন্দের কথাটা অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। তবে কালো মেয়ে ঘরের বউ করা খাশনবীশের নিজেরও ইচ্ছা নয়। তাই এসম্বন্ধে তিনিও নিরুৎসাহ ছিলেন। বললেন, "বিয়ের প্রস্তাব তো কতই আসছে। তার মধ্যে খুঁজে বেছে একটি ঠিক করলেই হবে।"

চতুর সেনাপতির সুকৌশল সৈন্যপরিচালনার মতো গৃহিনী এবার আলোচনাটা নিজের অভীষ্ট পথে টেনে আনলেন। বললেন, "অত খোঁজাখুঁজির দরকার কী আমাদের চেনা-জানা একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দিলেই তো হয়।"

চেনা-জানার মধ্যে মেয়ে নিশ্চয়ই আছে। হয়তো একটু অতিরিক্ত মাত্রায়ই আছে। কিন্তু ভাল মেয়ে বলতে বোঝায় কাকে ? খাশনবীশ জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

স্ত্রী বেচারী এতক্ষণ ধরে যে সাহস সঞ্চয় করেছিলেন খাশনবীশের দৃষ্টির প্রথম আঘাতেই তার অর্ধেক অন্তর্হিত হলো। কদিন ধরে নিজের মনে মনে সম্ভবপর কথাবার্তার একটা মহড়া দিয়ে রেখেছিলেন। কোন প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তা আগের ভাগেই ভেবেছিলেন। এখন তা সবই গুলিয়ে গেল। কোনোমতে তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, "এই ধরো যেমন দীপালী, কিম্বা—" কথাটা নিজের কানেই বড় আচমকা ঠেকল। শেষ করতে পারলেন না।

খাশনবীশ খাড়া হয়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "দিপালী ? সুরেন চৌধুরীর মেয়ে ?"

স্ত্রী ঘাড় নেড়ে জানালেন, সে-ই।

"পাগল !" একটিমাত্র শব্দে সমস্ত নস্যাৎ করে দিলেন খাশনবীশ।

পরিবারের চিরাচরিত রীতিতে আলোচনাটার ঐখানেই ইতি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। একবার ভয় ভেঙ্গে যেতেই শৈলবালার মনে আর দ্বিধা সঙ্কোচ রইল না। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কেন ? আপত্তি কিসের ? দীপালী দেখতে সুশ্রী, স্বভাবটি মিষ্টি। তার মা গরীব বটে, কিন্তু আমাদের তিনি কম উপকার করেননি।"

সমস্তই সত্য। খাশনবীশের প্রথম কেরানী জীবনে দীপালীর মা-বাবা তাঁর পাশের বাড়িতেই থাকতেন। দীপালী মেয়েটি তখন সবে জন্মেছে। খাশনবীশের স্ত্রী তিন বছরের ছেলে কোলে নিয়ে প্রথম এলেন দিল্লী শহরে। সঙ্গে এনেছিলেন বাক্স, বিছানা, রান্নার বাসনপত্র ও দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া। কাঁপুনি ধরা জ্বরে প্রায়ই বিছানায় পড়ে থাকতেন। অজ্ঞান-অচৈতন্য। বিদেশ বিভুঁই মুখে জলটুকু দেওয়ার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। সে সময়ে দীপালীর মা-বাবা আপনজনের মতো দেখাশোনা

সেবা-যত্ন করেছিলেন, নইলে খাশনবীশের স্ত্রী সেরে উঠতেন কিনা সন্দেহ। দীপালী ছোট বেলায় পল্টুর সঙ্গে খেলেছে, কিণ্ডারগার্টেনে একই স্কুলে পড়েছে।

হঠাৎ সুরেন চৌধুরী মারা গেলেন। বিধবা মেয়ে তিনটিকে নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। সেখানে স্বামীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় বড়টির বিয়ে দিয়েছেন, মেজটি মাস্টারী করছে। দীপালী সর্ব-কনিষ্ঠা। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেছে। কলেজে পড়ার খরচ অনেক, তাই নার্সিং কোর্স করছে।

দূরে থেকেও দুই পরিবারের হৃদ্যতার বন্ধন একেবারে ছিন্ন হয় নি। কলেজ হোস্টেলের একঘেয়ে খাওয়ায় অরুচি ধরে, তাই পল্টু প্রায়ই পটলডাঙা থেকে কালীঘাটে যায় কাকীমার হাতের রান্না খেতে। মাঝে মাঝে দীপালীরা দুবোন বেড়াতে আসে দিল্লীতে জেঠাইমার বাড়িতে।

দীপালী মেয়েটি লোকের মন কুড়োতে পারে সন্দেহ নেই। অমন যে পরাক্রান্ত খাশনবীশ, নিজের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সব সময় যাঁর কাছে ঘেঁষতে চায় না, তাঁকেও সে বশ করতে ছাড়েনি। যে-কদিন দীপালী থাকে, আপিসে যাওয়ার সময় পানের কৌটো, নস্যির শিশি, সাদা ধবধবে রুমাল সবই হাতের কাছে পাওয়া যায়। সে চলে গেলে খাশনবীশেরও মনে হয় বাড়িটা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।

কিন্তু পরের মেয়েকে স্নেহ করা এক কথা, তাকে পুত্রবধূ করা আর। বিশেষতঃ একে ভিন্ন জাত, তায় নার্স। অসম্ভব।

খাশনবীশের মনোভাব স্ত্রী আগেও অনুমান করেছিলেন। এখন আর সে সম্পর্কে কোন সংশয় রইল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেমে বললেন, "তোমার ছেলে কিন্তু ঐ মেয়েকেই পছন্দ করে রেখেছে।"

এর চেয়ে এটম বা হাইড্রোজেন বোমা ফাটালেই বা ক্ষতি ছিল কি? হিরোশিমার লোকেরা কি এর চেয়ে বেশী অপ্রস্তুত ছিল?

উদ্দীপ্ত ক্রোধ যথাসাধ্য দমন করে খাশনবীশ জিজ্ঞাসা করলেন, "কী করে জানলে? সে তোমায় বলেছে?"

"না, চিঠিতে জানিয়েছে," স্ত্রী জবাব দিলেন।

"কৈ দেখি সে চিঠি," বললেন খাশনবীশ।

স্ত্রী জানালেন, চিঠিটা তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন। কথাটা সত্য নয়। চিঠিটা তিনি নিজের আলমারীতে শাড়ীর নীচে লুকিয়ে রেখেছেন। খাশনবীশ সে চিঠির সবখানি পড়বেন, এ তাঁর ইচ্ছা নয়।

খাশনবীশ চিঠির জন্য কোন ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন না। স্ত্রীকে বললেন, "ছেলেকে লিখে দিও, সে এখন বড় হয়েছে, নিজে জামা, জুতো যেমন পছন্দ কিনতে পারে, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু তার বেশী বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করিনে।"

সে দিন থেকে খাশনবীশ আপিসে যান, ফাইল করেন, কেরানী চরাণ এবং ঐ দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যবিধির ফাঁকে ফাঁকে সম্ভবপর বৈবাহিকের সন্ধান করেন। তার স্ত্রী ভাঁড়ার আগলান, রান্নাবান্নার তদারক করেন এবং আড়ালে নীরবে অশ্রুপাত করেন।

ছমাসে প্রায় ছ'ডজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রস্তাব যাচাইবাছাই করে নিজের মনোমতো একটি পাত্রী আধাআধি নির্বাচন করলেন খাশনবীশ। আপিসের সাজ

পরতে পরতে স্ত্রীকে বললেন, "আজ বিকেলে মেয়ে দেখতে যেতে হবে, তুমি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তৈরী হয়ে থেকো।"

স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। খাশনবীশ জিজ্ঞাসা করলেন, "চুপ করে রইলে কেন? আজ কি কোন অসুবিধা আছে?"

স্ত্রী বললেন, "মেয়ে দেখতে হয়, তুমি একাই দেখ গে। আমি যাব না।"

বিস্মিত খাশনবীশ প্রশ্ন করলেন, "সে কী কথা? ভদ্রলোককে বলেছি, দুজনেই যাব, এখন—"

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই স্ত্রী বলে উঠলেন, "ছেলে যখন এ মেয়েকে বিয়ে করবে না জানি, তখন মিছেমিছি তাকে দেখতে যাওয়ার বিড়ম্বনা কেন?"

খাশনবীশ বললেন, "হুঃ, আমি ভেবেছিলুম তার বিদঘুটে মতলব সে ছেড়েছে। দেখছি তা নয়। আমার সম্মতি নেই জেনেও সে ঐ দীপালীকেই বিয়ে করতে চায়? তার সাহস তো কম নয়?"

স্ত্রী বললেন, "সে তো তোমারই ছেলে, জেদ তারই বা কম হবে কেন?"

খাশনবীশ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, "সে যেন মনে না ভাবে যে, ছেলে বলেই আমি তার বিলাতী নাটুকেপনা বরদাস্ত করব। ইনডিসিপ্লিনকে আমি প্রশ্রয় দেব না। আমার কথা তাকে মেনে চলতে হবে, নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"

ফাইল এবং জীবন কোন ক্ষেত্রেই নিজেই সিদ্ধান্তের নড়চড় করেন না খাশনবীশ। পিতাপুত্রের সম্পর্কে ঐখানেই ছেদ। বাপ যদি চিঠি লেখা বন্ধ করলেন, ছেলে চলে গেল স্বেচ্ছাকৃত বনবাসে অর্থাৎ চাকুরি নিয়ে আসামের কোন এক চা-বাগানে। সেদিন থেকে শুরু হল দুই তীরে দুই অভিমানক্ষুব্ধ পুরুষের স্বকৃত কৃচ্ছ্রসাধন, মাঝখানে বহমান নিরুপায় জননীর স্নেহকাতর অশ্রুস্রোত।

একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগের বেদনা দুঃসহ। কিন্তু তার ভার রইল শুধু খাশনবীশের মনে। আপিসের কাজে তার একটুকু প্রকাশ নেই। সেখানে তাঁর মনোযোগ আরও প্রখর, তৎপরতা আরও সুস্পষ্ট।

মাসখানেক পরেই খাশনবীশের বয়স আটান্নর সীমা পার হবে। সরকারী চাকুরীর সেটা ডুরান্ড বা ম্যাকমোহন লাইন। পার হলেই নো ম্যানস্ ল্যান্ড, অর্থাৎ রিটায়ারমেণ্ট, চলতি বাংলায় যাকে বলা হয় 'পেন্সন'।

খাশনবীশের উদ্বেগের অবধি নেই। নিজের জন্য নয়, আপিসের জন্য। কেরানী ও অন্যান্য অফিসারদের কার কতটুকু দক্ষতা সে তো তাঁর অজানা নয়। তাঁর অবর্তমানে কাজ-কর্মের যে কী অবস্থা হবে, তা ভাবতে গিয়ে তিনি শিউরে ওঠেন। কোন চিঠির জবাবে কি লেখা হবে, কোন ফাইলে কী নোটিং তার বিস্তারিত-নির্দেশ লিখে রাখেন পৃথক কাগজে। ভবিষ্যতের জন্য। যে অফিসারটি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন তাঁর পাছে ভুল না হয়, সে জন্য জরুরী কেসগুলির কোনটি কবে সেক্রেটারীর কাছে পেশ করতে হবে তার ফর্দ করে রাখেন একটা খাতায়।

রিটায়ারমেণ্টের দিন আপিসে ঘটা করে বিদায় অভিনন্দন সভা হলো। সেক্রেটারী উচ্ছ্বসিত ভাষায় খাশনবীশের প্রশংসা করলেন; নিজের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে এমন নির্ভরযোগ্য সহকর্মী খুব কমই দেখেছেন অকপটে স্বীকার করলেন। শুনে

খাশনবীশের চোখে জল আসার উপক্রম। গলায় ফুলের মালা এবং পকেটে নামখোদাই রূপোর সিগারেট কেস উপঢৌকন নিয়ে শেষবারের মতো আপিস থেকে বাড়ি ফিরলেন।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই খাশনবীশের মনে পড়ল, আজ আর আপিসে যেতে হবে না। দাড়ি কামাবর তাড়া নেই, স্নান আহার সেরে সাড়ে নটার মধ্যে কোট প্যান্টুলান গায়ে চাপাবার প্রয়োজন নেই। আজ আর নীল রং-এর "ইমিডিয়েট" ও লাল রং-এর "প্রাইওরিটি" শ্লিপ-আঁটা ফাইল ঘাঁটতে হবে না। "ড্রাফট ফর এ্যাপ্রুভ্যাল" সংশোধন করতে হবে না। প্রাত্যহিক কাজকর্মের একটানা বন্ধন থেকে আজ পরিপূর্ণ মুক্তি। কিন্তু কৈ, মুক্তির আনন্দ বোধ করছেন না তো!

এতদিন সকাল বেলায় খবরের কাগজটা পড়তে সময় পেতেন না। শুধু হেডলাইনগুলির উপরে চোখ বুলিয়ে নিতেন। আজ সময়ের অভাব নেই। প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নাম, তারিখ থেকে সুরু করে শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশকের নাম, ছাপাখানার ঠিকানা পর্যন্ত প্রতিটি লাইন পড়ে ফেললেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, নটা তখনো বাজেনি। বাড়িতে রেডিওটা তিনিই কিনে এনেছিলেন, কিন্তু কোনোদিনই শোনার অবকাশ হয়ে ওঠেনি। আজ নিজেই রেডিওর সুইচটি খুলে ছিলেন। হিন্দী সিনেমার গান আর দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন শুনে বিরক্তি ধরল। বন্ধ করে দিলেন।

ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রাস্তায় আপিসযাত্রীদের সাইকেল অভিযান শুরু হয়েছে দলে দলে। ট্রাফিক আইন বা রোড ম্যানার্সের কোনো ধার ধারে না। রংসাইড করে ডাইনে বাঁয়ে যদৃচ্ছা সাইকেল চালায়। আপিসে যেতে প্রতিদিন খাশনবীশকে এই বেপরোয়া সাইকেল বাহিনীকে বাঁচিয়ে সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে হতো। নিরাপদে অর্থাৎ কাউকে চাপা না দিয়ে আপিসে না পৌঁছনো পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলির উপরে সে এক নিদারুণ অত্যাচার। আজ আর তার আশঙ্কা নেই।

অয়েল মিনিস্ট্রির মধু সরকার যাচ্ছিলেন। খাসনবীশকে দেখে গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "কি হে, এখনও তৈরী হওনি দেখছি, আপিসে যেতে হবে না? রিটায়ার করেছ? ও তাই নাকি? কবে থেকে? তা বেশ বেশ এবার প্রাণ ভরে জিরিয়ে নাও; ওয়েল আর্নড রেস্ট। আমাদের তো এখনও বছর চারেক ঘানি টানতে হবে!"

খাশনবীশ মৃদু হাসির চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে নিতান্তই কাষ্ঠহাসি। রাস্তা দিয়ে পরিচিত আরও দু'চারজন গেলেন। তাঁরা হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানালেন। প্রতিসম্ভাষণে খাশনবীশও যথারীতি হাত নাড়লেন। কেমন যেন লজ্জিত বোধ করলেন। কাল বিকেল পর্যন্ত তিনি ছিলেন তাঁদের সগোত্র। একটি রাত্রির অবসানে আজ তিনি একটা পৃথক শ্রেণীতে নেমে এসেছেন। বুকের কোণে খচ করে একটা ব্যথা বাজল।

দূরে স্কুটার-বাহন প্রীতম সিং-এর চেহারা দেখা গেল। মাথায় আসমানী রং-এর পরিপাটি পাগড়িটি। মুখে দাড়ির সযত্ন বিন্যাস। দেখে মনে হয় বুঝি ধোপায় কাচা কাপড়ের মতো মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা। সুট, টাই, কলারের বাহার

দেখলে তাক লাগে। এপাড়ায়ই থাকে। খাশনবীশের সঙ্গে দেখা হলেই বলে "নোবীশবাবু, বেশী খেটে লাভ কি? গভর্নমেন্টের চাকরীতে গ্রেড বাঁধা মাইনে। কাজে জান দিন কিম্বা ফাঁকি দিন, বছরের শেষে ইনক্রিমেন্টের হার যে কে সেই। এক পয়সা কম বেশী হবে না।" অপদার্থ কোথাকার! আজ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাক এটা খাশনবীশের ইচ্ছা নয়। মানুষের মৃত্যুর মত সরকারী চাকরীতে রিটায়ারমেন্টও অবধারিত। তবুও কেন যে প্রীতম সিং-এর কাছে অবসর গ্রহণের কথাটা গোপন রাখার জন্য খাশনবীশ ব্যগ্র হলেন তা তিনি নিজেই জানেন না। তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে সরে গেলেন।

দুপুরে আহারের পর প্রথমে একটা মাসিক পত্রিকা পড়তে চেষ্টা করলেন। মন বসল না। দিবানিদ্রার উদ্যোগ করলেন। টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠতেই সবার আগে গিয়ে রিসিভার তুললেন। রং নাম্বার। বেলা পাঁচটার মধ্যে আরও দুটো টেলিফোন এল। দুবারই খাশনবীশ ধরলেন। না একটাও আপিস থেকে নয়।

একবার ভাবলেন নিজেই একটা টেলিফোন করে খবর নিলে কেমন হয়? বহু কষ্টে সে বাসনা দমন করলেন। আশা করলেন আপিসের শেষে দু'একজন নিশ্চয়ই আসবে দেখা করতে। কেউ এল না। খাশনবীশের হতাশা তাঁর মুখে চোখে গোপন রইল না। দুপুর থেকে রাত দশটায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে সময়টুকু ঘড়ির অঙ্কে ঘণ্টা কয়েক মাত্র। কিন্তু খাশনবীশের কাছে মনে হয় যেন কয়েক যুগ। কি করে কাটাবেন ভেবে পান না।

পাড়ায় সরকারী চাকুরেদের একটা ক্লাব আছে। তার সেক্রেটারী নাছোড়বান্দা লোক। খাশনবীশকেও সদস্য না করে ছাড়েনি। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে যে কখনও আপিসের টেবিল ছাড়তে পারে না তার পক্ষে শুধু চাঁদা দেওয়াই সার হয়, ক্লাবে যাওয়ার সময় কোথায়? যাক, এতদিনে বুঝি চাঁদাটার সদ্ব্যবহার হয়। কিন্তু খাশনবীশ সারাটা জীবন শুধু কাজই করেছেন। খেলাধুলার খবরও রাখেননি। পিং পং, ক্যারম কখনও খেলেননি। অকশনব্রিজ দূরে থাক, সাধারণ টুয়েণ্টিনাইন কিম্বা ব্রে পর্যন্ত জানেন না। ক্লাবে গিয়ে করবেন কী?

সরকারী কর্মচারীদের গল্পগুজব সমস্তই সেক্রেটারীয়েট কেন্দ্র করে। কোন সেক্রেটারী প্রাদেশিক গভর্নর বা বিদেশে রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন, কোন জয়েণ্ট সেক্রেটারীর কোথাও প্রমোশন আসন্ন, কোন মিনিষ্ট্রিতে কোন মন্ত্রীর প্রীতিভাজনদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে—তারই আলোচনা। সে আলোচনায় খাশনবীশ এখন শ্রোতামাত্র। তিনি কোনো নূতন তথ্য শোনাতে পারেন না। অস্বস্তি বোধ করেন। মনে হয় তিনি যেন আর পাঁচ জনের সমকক্ষ নন। ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিলেন।

টেলিফোনের মিস্ত্রী এসে খাশনবীশের বাড়ীর টেলিফোনটি তুলে নিয়ে গেল। এটা অপ্রত্যাশিত নয়। গভর্নমেন্ট অফিসারদের বাড়িতে সরকারী কাজের প্রয়োজনে সরকারী খরচে টেলিফোন দেওয়া হয়। অফিসার বদলী হলে বা অবসর নিলে সে টেলিফোন তুলে নিয়ে অন্য অফিসারের বাড়িতে বসানো হয়। সরকারী নিয়ম কানুনে অভিজ্ঞ খাশনবীশের তা অজানা নয়। তবুও কেন যে তিনি আহত বোধ করলেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিগতদিনের পদমর্যাদার সর্বশেষ চিহ্ন ছিল ঐ

টেলিফোনটি, আপিসের সঙ্গে তার অন্তিম যোগসূত্র। আজ সেটিও ছিন্ন হওয়াতে বুকের মাঝখানে একটা প্রকান্ড ফাঁক অনুভব করলেন। রাত্রিতে শয্যায় শুয়ে চোখে ঘুম এল না। স্ত্রীকে বললেন, "চল কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসি।"

স্ত্রী তাই চাইছিলেন। সোৎসাহে বললেন, "বেশ তো, চল না কলকাতায়, পরশু নাগাদ বেরিয়ে পড়ি।"

যে কারণে কলকাতার প্রতি স্ত্রীর আকর্ষণ, ঠিক সে কারণেই স্বামীর বিতৃষ্ণা। কলকাতা থেকে আসাম তো কাছেই। শৈলবালার আশা, ছেলেকে দেখতে পাবেন। খাশনবীশের আশংকা, ছেলেকে দেখতে হবে।

অবশেষে মরীয়া হয়ে স্ত্রী বললেন, "দেখ, দিনকাল বদলেছে, এখন সবাই তোমার মতে চলবে এমন আশা করো না।"

খাশনবীশ খুশী হলেন না। বিরস কণ্ঠে বললেন, "ছেলে হয়ে সে বাপকে অগ্রাহ্য করবে আর আমি তাই নিয়ে আনন্দে ধেই ধেই নেচে বেড়াব, এই তুমি চাও?"

স্ত্রী বললেন—"আনন্দনিরানন্দের কথা নয়, যা ঘটে তাই মানতে হয়। আর অগ্রাহ্য করার কথাই যদি বললে, একবার ভেবে দেখ তো ছেলে যদি ভালোবাসার জোরেই বাপকে না মানে তবে শুধু কর্তৃত্বের চাপ টিকবে ক'দিন?"

সংসারে শৈলবালা কোনোদিন কোনো বিষয়েই নিজের মতামত প্রকাশ করেননি। খাশনবীশ যা স্থির করেছেন, নির্বিবাদে তাই মেনে নিয়েছেন। তাই আজ তাঁর এই স্পষ্ট ভাষণে খাশনবীশ বিস্মিত হলেন। স্ত্রীরও যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, সে কথা আজ প্রথম অনুভব করলেন। চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

কলকাতার কথা স্ত্রী আর তুললেন না। দেশভ্রমণে খাশনবীশের কোনোকালেই আগ্রহ নেই। বাকী থাকে শুধু তীর্থপর্যটন। অবশেষে তাই স্থির হল। পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাওয়া যদি সম্ভব না হয়, তবে অগত্যা বৃন্দাবনেই যাওয়া যাক।

প্রচলিত গল্পের বিষয়াসক্ত অনিচ্ছুক তীর্থযাত্রীর মতো খাশনবীশ অবশ্য চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লাউএর মাচা দেখতে পাননি। তবে একথা ঠিক যে, কোনো তীর্থক্ষেত্রেই খাশনবীশের দু'একদিনের বেশী ভাল লাগল না। তাই বেনারসে শৈলবালার দিদি যখন বোনকে কিছুদিনের জন্য কাছে রাখতে চাইলেন খাশনবীশ আপত্তি করলেন না। সে অবকাশে তিনি একবার দিল্লী ঘুরে আসবেন। পেন্সনের কাগজপত্রগুলির ফলো-আপ করতে হবে।

দেখা গেল, শুধু দুরাত্মার নয়, প্রয়োজন হলে সজ্জন ব্যক্তিদেরও ছলের অভাব হয় না,—পেন্সনের কাগজগুলি উপলক্ষ মাত্র, আসল লক্ষ অন্যত্র। তাঁর অবর্তমানে আপিসটা কিভাবে চলছে তা জানার কৌতূহল দমন করা খাশনবীশের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

যে-আপিসে খাশনবীশ তাঁর কর্মজীবনের সুদীর্ঘ কুড়িটি বছর কাটিয়েছেন, ছ'মাস পরে সে আপিসে ঢুকতে আজ যেন একটা বিশেষ উত্তেজনা বোধ করলেন। এ দালানের প্রতিটি কক্ষ, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ, এমন কি দেয়ালের প্রতিটি ইটের সঙ্গেও বুঝি খাশনবীশের পরিচয় আছে। তবু প্রতি পদক্ষেপেই তাঁর নাড়ীর গতি

চঞ্চল এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর হলো। পরীক্ষার হলে প্রবেশের মুখে পরীক্ষার্থীর মনে যে নার্ভাসনেস দেখা দেয়, ঠিক অনুরূপ অনুভূতি।

লিফটের মুখেই গুরুদত্তের সঙ্গে দেখা, নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কবে এলেন ? কেমন আছেন ?"

গুরুদত্ত মানুষটি ভালো, কাজেও চতুর। খাশনবীশ তাকে বরাবরই পছন্দ করতেন। খাশনবীশ খুশি হলেন। কিন্তু সে যে 'স্যার' সম্বোধন করেনি, সেটা খাশনবীশের মনোযোগ এড়াল না। ভাবলাম, ইচ্ছাকৃত নয়।

তাঁর নিজের পুরোনো ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ালেন, সাদা জমির উপরে কালো অক্ষরে "এস সি খাশনবীশ" লেখা বোর্ডটি নেই। আছে একটি নতুন বোর্ড, তাতে নতুন নাম।

বিস্ময়ের কিছুই নেই। তবু খাশনবীশ যেন অবাক হলেন। ঠিক ঐখানে যে মাত্র কয়েক মাস আগে অন্য একটা নামের বোর্ড ছিল তা বোঝার উপায় নেই তো আজ! দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। ঘরের নূতন মালিক তখনও আসেননি। খাশনবীশ নিজের হাতঘড়িটির পানে তাকিয়ে দেখলেন দশটা বেজে ছাব্বিশ মিনিট। তাঁর কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হলো। পাংচুয়ালিটির জ্ঞান নেই। অফিসারদের হাজিরা খাতায় সময় লিখতে হয় না বটে, কিন্তু তাদের নিজেদের কি সেন্স অব প্রপ্রাইটি থাকবে না ? অফিসার নিজেই যদি ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আপিসে না আসেন তবে কেরানীদের দেরী হলে কৈফিয়ৎ চাইবেন কোন মুখে ?

খাশনবীশ ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। কৈ কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই তো। কেলেণ্ডারটি যেখানে ছিল সেখানেই ঝুলছে। তার ছবিতে তন্বঙ্গী রূপসীর মুখের হাসিটি এতটুকু ম্লান হয়নি। টেবিলে পিতলের কলমদানটি তেমনি উজ্জ্বল, চকচকে। আলমারী, শেলফ, "ইন ও আউট" লেখা কাঠের ট্রে দুটি সবই যথাস্থানে আছে। শুধু চেয়ারে এতকাল যে মানুষটি বসতো সে নেই। কিন্তু তার অদর্শনে টেবিলের উপরে টাইমপীস ঘড়িটি বন্ধ হয় নি, মেজেতে কার্পেটের রং বিবর্ণ হয়নি। ঘরের কোনোখানে এতটুকু বিষাদের চিহ্ন পড়েনি। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন খাশনবীশ। নির্লাজ কুলটা শুধু ভূমিই নয়, ঘরদোর, আসবাবপত্র সব কিছুই বহুবল্লভা নারীর মতো "যখন যাহার তখনই তাহার"। হৃদয়হীন, শোকহীন আনুগত্যহীন।

খাশনবীশ সেক্রেটারীর ঘরের কাছে যেতেই চাপরাশী বাধা দিয়ে বলল, "সিলিপ দিজিয়ে।"

স্লীপ মানে কার্ড। কার্ড পাঠিয়ে ঢুকতে হবে খাশনবীশকে ? অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন চাপরাশীটার পানে। চাপরাশী ছাড়বার পাত্র নয়, কেবলই বলে, বিনা সিলিপে ঢোকার অনুমতি নেই। ভাগ্যক্রমে সেইক্ষণে পুরানো চাপরাশী এসে পড়ল, সেলাম করে বলল, "এ নতুন লোক, হুজুরকে চেনে না। আপনি ভিতরে যান।" ব্যাপারটা কিছুই নয়, তবু খাশনবীশের মেজাজটা খিঁচড়ে গেল।

ঘরের ভিতরে খাশনবীশের অভ্যর্থনার ত্রুটি হলো না। সেক্রেটারী হাসিমুখে করমর্দন করলেন, স্বাস্থ্যের খবর নিলেন। দুঃখ প্রকাশ করলেন, অনেক গল্প করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এক্ষুনি ঘরে বাজেট সংক্রান্ত জরুরী মিটিং হবে। বাৎসরিক ব্যাপার,

খাশনবীশের তো জানাই আছে।

খাশনবীশ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বছরের পর বছর এই বাজেট-মিটিংএ খাশনবীশই ছিলেন ব্যবস্থাপক। মধ্যবিন্দু—সেন্ট্রাল ফিগার বললেই হয়। বাজেটের খসড়াটা তিনিই করতেন, মিটিংটা ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে তা অনুমোদনের জন্য। আজ সেই মিটিং হবে বলে খাশনবীশকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। খাশনবীশের বুকে ব্যথা বাজল। ভাগ্যক্রমে তিনি যখন এ সময়ে এসেই পড়েছিলেন, তখন তাঁকে মিটিংএ যোগ দিতে বললেই বা ক্ষতি ছিল কি? আলোচনায় তিনি যে সহায়তা করতে পারতেন সে কথা কি সেক্রেটারীর জানা নেই?

বারান্দায় বেঞ্চিতে জনচারেক চাপরাশী বসে জটলা করছিল। খাশনবীশ সমুখ দিয়ে চলে গেলেন, কেউ উঠে দাঁড়াল না। তাঁকে দেখতে পায়নি কি? কে জানে?

হঠাৎ মনে পড়ল, যে প্রয়োজনে এসেছিলেন সেই পেন্সনের কাগজপত্রের খোঁজ করা হয়নি তো। ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারীর ঘরে গিয়ে দেখলেন সেখানেও এক নবাগন্তুক। খাশনবীশ নিজের পরিচয় দিতেই ভদ্রলোক খাতির করে বসালেন, ডিলিং এ্যাসিস্টান্টকে ডাকতে পাঠালেন।

কথায় কথায় আপিসে ডিসিপ্লীনের কথা উঠল। খাশনবীশের যেটা সদ্য ক্ষোভের কারণ। নূতন অফিসারটির সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে মনে হলো না। শাস্তির ভয় দেখিয়ে নাকি কাজ আদায় করা যায় না। বলে কিনা আপিসে কেরানী, টাইপিস্টদের মনে সেন্স অব পার্টিসিপেশান না জন্মাতে পারলে কর্মদক্ষতা আশা করা বৃথা। যত উদ্ভট মতবাদ! রাবিশ!

ততক্ষণে ডিলিং অ্যাসিস্টান্টটি এসে গেল। খাশনবীশের আমলের পুরানো কর্মচারী। খাশনবীশকে যেন চিনতেই পারে না এমন ভাব। বলল, "ফলো-আপের" কাগজপত্র লিখে পড়ে তৈরী তো আর আজই হতে পারে না। চার-পাঁচদিন পরে যেন একদিন খোঁজ নেন।

চার-পাঁচদিন? খাশনবীশের সময়ে এ কাজ যে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে হয়ে যেত। কেরানীটি অবজ্ঞার হাসি হাসল। ভাবখানা এই যে, সে সময়ের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। আসল কথা, কেরানীটি অতীতে খাশনবীশের কাছে তাড়না খেয়েছে অনেক। এখন তারই শোধ নেবার চেষ্টা। ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে প্রায় খাশনবীশকে শুনিয়েই বলল—"হুঃ, এখন আর ডেপুটি সেক্রেটারী নন। থোড়াই কেয়ার করি ওকে। এবার বাছাধনের জুতোর সোল ক্ষয় করিয়ে ছাড়ব।"

আপিসে আরও কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করার বাসনা নিয়ে এসেছিলেন এখন আর সে ইচ্ছা রইল না। ফিরে চললেন। লছমন চতুর্বেদী খাশনবীশের পুরাতন অনুগত সহকর্মী। দেখতে পেয়ে বলল, "কি এখনই চললেন? আবার কবে আসছেন? যাবেন কি করে? একটা ট্যাক্সী আনিয়ে দেব কি?"

যথেষ্ট অমায়িক ব্যবহার। কিন্তু খাশনবীশকে আজ বুঝি শুধু খুঁত ধরার ব্যাধিতে পেয়েছে। তাঁর কেবলই মনে পড়তে লাগল, চতুর্বেদীর তো ড্রাইভার আছে। নিজের গাড়িতেই তাঁকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়া তো কঠিন ছিল না। এর আগে যখনই খাশনবীশের গাড়ি বিকল হয়েছে তখনই চতুর্বেদী নিজে যেচে খাশনবীশকে বাড়ি থেকে আপিস এবং আপিস থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়নি কি? অভিমানে

খাশনবীশের দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, ট্যাক্সীর প্রয়োজন নেই।

ভেবেছিলেন নিজেই রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সী ধরবেন। সিঁড়ির কাছে এসে বাইরে রোদের দিকে তাকিয়ে সাহস হলো না। পাশের দরজায় এক অফিসারের পিওন বসেছিল। তাকে বললেন, একটা ট্যাক্সী ডেকে আনতে। পিওনটি অনেকদিন মিনিস্ট্রিতে আছে। খাশনবীশকে চেনে। বলল, ডিউটি ছেড়ে বাইরে গেলে তার সাহেব বিশেষ গোসা হন। হুজুর যদি মেহেরবানী করে অন্য আর কাউকে বলেন।

খাশনবীশের গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলেও তিনি এর চাইতে বেশী আহত হতেন না। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে তাঁর মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল। মনে হলো বুঝি বা মুখ থুবড়ে পড়ে যান। তাড়াতাড়ি শক্ত করে রেলিংটা ধরে ফেললেন। ধীরে ধীরে সতর্ক পদক্ষেপে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

এপ্রিলের খর রৌদ্রতাপে পথ জনবিরল। ধূলিকীর্ণ বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে তৃণগুল্ম দগ্ধ, বিশীর্ণ। সমস্ত পৃথিবীটা খাশনবীশের কাছে ঐ তপ্ত পাণ্ডুর আকাশের মতো বিবর্ণ মনে হলো। যে আপিসের কাজে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্যম, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সময় নিঃশেষে দান করেছেন সেখানে আজ তাঁর কিছুমাত্র স্বীকৃতি নেই। একদা যেখানে তিনি ছিলেন অপরিহার্য, আজ সেখানে তিনি অনাবশ্যক। এই নগ্ন সত্য আবিষ্কার করে খাশনবীশ মর্মাহত হলেন। নৈর্ব্যক্তিক সরকারী শাসনযন্ত্রটাকে একটা বিরাট প্রবঞ্চনা মনে হলো। এতকাল যে প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত ছিল সে কি তবে তাঁর নিজের নয়? শুধু তাঁর চাকরিটার?

মুহূর্তে খাশনবীশের দৃষ্টি থেকে মোহজাল অপসৃত হলো। মন থেকে সকল গর্ব, সকল অভিমান দূর হয়ে গেল। ভূতপূর্ব ডেপুটি সেক্রেটারীর অতি উন্নত কল্পলোক থেকে নেমে এলেন ধূলোকাদার মাটিতে। ইণ্ডিয়া গেজেটের পাতার বাইরেও যে হাসিকান্নায় গড়া একটা বৃহত্তর জগৎ আছে, সে তত্ত্ব আজ প্রথম উদঘাটিত হলো খাশনবীশের জীবনে। মনের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ সংহত প্রশান্তি অনুভব করলেন।

পথের এক ক্ষীণদেহ ভিখারী পথচারীদের দয়া উদ্রেকের চেষ্টায় ঢোলক বাজিয়ে সুরদাসের ভজন গাইছিল,—নৈন সলোনে শ্যাম হরি কভ আওঙ্গে। খাশনবীশ তাকে কাছে ডেকে তার হাতে একটা টাকা দিলেন। সে বেচারী দু'আনা, চার আনার বেশী কখনও প্রত্যাশা করে না। অবাক হয়ে খাশনবীশের মুখের পানে চেয়ে রইল।

সেদিন অনেক রাত্রিতে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে বেনারসে শৈলবালার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁর নামে এক্সপ্রেস টেলীগ্রাম। দেখলেই দুঃসংবাদের আশঙ্কায় বুক কাঁপতে থাকে। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে পড়লেন। পাঁচটি ইংরেজী শব্দে সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য—"দীপালীর সঙ্গে পল্টুর বিয়ে স্থির কর।"

কৌন্তেয়

স্থান,—পাঞ্জাবের ফজিলপুর। কাল,—ঊনিশশো বাহান্ন সালের মাঝামাঝি। পাত্র, —সর্দার মেহের সিং। বলে দেওয়া প্রয়োজন, নামধামগুলি সবই কল্পিত। সেটা ইচ্ছাকৃত। কারণ মেহের সিং ও তাঁর স্ত্রীর সত্যিকার পরিচয় ইঙ্গিতেও কারো কাছে প্রকাশ হোক, এ আমার অভিপ্রেত নয়।

মেটকাফ হাউসে ট্রেনিং শেষ করে ছোট খাটো গোটা দুই তিন কাজের পরে ফজিলপুর আমার প্রথম সাবডিভিশন। ফার্স্ট ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেট রূপে সেখানে হাতে খড়ি।

বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা অল্পতর। ইণ্ডিয়া গেজেটের পাতায় আই-এ-এস পরীক্ষার ফল দেখে যে সকল পাত্রীপক্ষ তৎপর হয়ে ওঠেন, তাঁদের তীক্ষ্ন সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে কৌমার্য তখনও অটুট। সুতরাং স্কুলের ছেলেদের নারী ভূমিকা বর্জিত নাটকের মতো নিছক পুরুষপরিচালিত সংসার। ফৌজদারী বিচার, তাকাভি ঋণ, বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ, হাসপাতাল কমিটির সভাপতিত্ব, মন্ত্রীদের ফরমাস ও এম-এল-এ, এম-এল-সি-দের নালিশ এবং পারমিটের তদ্বির ইত্যাদি প্রাত্যহিক রুটিন কাজের পরেও অবসর যেটুকু থাকে সে-টুকু শুধু আগাথা ক্রিস্টী ও উডহাউস নিয়ে কাটতে চায় না। তাই ফুলের বাগানে মন দিয়েছিলাম।

কাজটা খুব সহজসাধ্য ছিল না। সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারের বাড়িটা ব্রিটিশ আমলের। সেকালের শ্বেতাঙ্গ আই-সি-এস-দের লক্ষ্য করে লী কমিশনের দরাজ সুপারিশের মাপে তৈরী। বিরাট বাংলো, বিস্তৃত চত্বর। একদিকে গ্র্যাভল করা টেনিস কোর্ট, অন্যদিকে বাবুর্চী, খানসামা, মালী, মশালচী নিয়ে এক ব্যাটালিয়ন অনুচরের বাসের ব্যবস্থা।

এ বাড়ীতে আমার পূর্ববর্তী অধিবাসী যিনি ছিলেন, তিনি প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক। প্রমোশন পেয়ে সাবডিভিশনের কর্তা হয়ে ছিলেন। তাঁর চাকরি জীবনের সেটা অস্তাচল। গুটিদশেক পুত্রকন্যা নিয়ে বৃহৎ পরিবার। আশ্চর্য নয় যে, ফুলের চাইতে ফুলকপিকে তিনি অনেক বেশী সত্য জ্ঞান করতেন। সমস্ত বাগানটা তিনি ভিণ্ডি, ভুট্টা আর কাকড়িতে ছেয়ে ফেলেছিলেন। কোথাও কোনখানে এতটুকু শোভা বা গন্ধের আভাসমাত্র ছিল না। ফলে পুষ্পচর্চায় আমাকে বাগানটার সমস্তটাই প্রায় ঢেলে সাজাতে হল। সে কাজে সর্দার মেহের সিং ছিল আমার প্রধান নির্ভর।

নিরস্ত পাদপ দেশের সঙ্গে পরিচয় নেই। সুতরাং এরণ্ড সত্যি সত্যি কোথাও দ্রুমরূপে গণ্য হয় কিনা জানিনে। কিন্তু মহকুমা শহরে সাবডিভিশন্যাল অফিসারই যে রাজাধিরাজ সে কথা হলপ করে বলতে পারি।

নয়া ম্যাজিস্টার সাবকো ফুলোমে বহুত সখ হ্যায়—এই বার্তা গ্রামে গ্রামে রটে গেল ক্রমে। অধস্তন সরকারী আমলা সেরেস্তাদার থেকে শুরু করে বেসরকারী অর্থীপ্রত্যর্থীর দল সবাই সাহেবের ফুলের বাগানে মদত অর্থাৎ সহায়তা দানের জন্য উদগ্রীব। ভদ্র উপায়ে তাদের আগ্রহ ও উদ্যমকে ঠেকিয়ে রাখাই কঠিন। মেহের সিং কিন্তু নিজে যেচে আসেনি। আমিই ডেকে এনেছিলাম।

খবরটা দিয়েছিল আমার খাস চাপরাশী সুখনলাল। গৃহিণীহীন গৃহস্বামীদের প্রতি চাকর বেয়ারাদের একটা স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব থাকে। গৃহকর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে অপত্নীক গৃহকর্তারা কেবলই খুঁত ধরেন না। ভাঁড়ারের চাবি ও বাজারের হিসাব সম্পর্কে তাঁরা সমান উদাসীন। ফলে প্রভুভৃত্যের মধ্যে একটা সহৃদয় সখ্যতার সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধ সুখনলালের বিশ্বাস জগতে অধিকাংশ লোকই দুর্জন। সুযোগ পেলেই তারা তার তরুণ মনিবটিকে ঠকিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে যাবে। তাই কারণে অকারণে এবং সময়ে অসময়ে সে উপদেশ বিতরণ করে থাকে। শুধু উপদেশ নয়, তথ্যও। বাগিচা সম্পর্কে মেহের সিং যে কত বড় ওস্তাদ এবং তার গুলাব যে নোমায়েস অর্থাৎ এগজিবিশানে প্রাইজ পেয়েছে সে তথ্য একাধিকবার শোনাতে সে ভোলেনি।

মেহের সিং লোকটা লম্বায় ছ'ফুট। ওজনে বারো স্টোন। কালিদাসের ভাষায় শালপ্রাংশু মহাভুজঃ বললে ক্ষতি নেই। গালে গালপাট্টা, মাথায় পাগড়ি, হাতে লোহার কঙ্কণ। শিখধর্মের চিরপরিচিত পরিচয়-চিহ্ন। ঐ চেহারার সঙ্গে আর্মির কর্ণেল, রেলের ঠিকাদার, শহরের ট্যাক্সিচালকের যোগাযোগটা আমাদের মনে প্রায় বদ্ধমূল। সুতরাং মেহের সিং গোলাপের বিশেষজ্ঞ শুনে অবাকই হয়েছিলাম। শরৎ চাটুয্যে মশাই যাই বলুন না কেন, কাবুলীওয়ালার গান গাওয়ার চাইতে সেটা কম বিস্ময়কর নয়।

ফুল সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা যেমন পরিমিত, মেহের সিং-এর জ্ঞান তেমনি গভীর। ক্যাটালগ ঘেঁটে সিনেরেরিয়ার বীজ এনেছিলাম। অথচ ফুল হল না। মেহের সিং বলল, এ ফুল ছায়া চায়, বাংলোর পিছনে যেখানে বেশী রোদ আসে না সেখানে কেয়ারী বানাতে হবে। সাহারানপুরের নার্সারী থেকে অনেক দাম দিয়ে আনা হেলেন-ট্রবল গোলাপ গাছে কুঁড়ি ধরে শুকিয়ে যাচ্ছিল। মেহের সিং এসে রোগ নির্ণয় করল ; ডাইব্যাক হচ্ছে, গাছের ডাল কেটে বাদ দিয়ে তিসির তেলের সঙ্গে তুঁতে মিশিয়ে প্রলেপ লাগাতে হবে। চন্দ্রমল্লিকায় কখন স্টেক বাঁধা চাই, ডালিয়া কি করে ডি-বাডিং হয়, সে বিষয়ে তার অভিমত অভ্রান্ত।

অথচ ফাজিলপুরে জনসাধারণের কাছে মেহের সিং-এর প্রসিদ্ধি তার ফুলের জন্যে নয়। আসলে সেটা তার খ্যাতি নয়,—অখ্যাতি। এমন কঠিন কৃপণ কেউ কখনও দেখেনি। চালানী ব্যবসায়ে অঢেল টাকা করেছে, কিন্তু কখনও কাউকে এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেয় না। পাড়ার ছেলেরা ফুটবল ক্লাবের জন্যে চাঁদা চাইতে গিয়ে তাড়া খায়। শহরের বারোয়ারী দুর্গাপূজার জন্য একটা টাকা আদায় করতে কর্মকর্তাদের প্রাণান্ত ঘটে। জনশ্রুতি এই যে, প্রভাতে তার নাম নিলে দিনটায় নানা দুর্ভোগ ভুগতে হয়।

জানি, পরের অর্থ এবং নিজের আয়ু সম্পর্কে আমাদের সবারই ধারণা কিছুটা অতিরঞ্জিত। কিন্তু মেহের সিং-এর ব্যয়কুণ্ঠতা নিয়ে গল্প বানাবার প্রয়োজন নেই। সে ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা এমনিতেই এত হাস্যকর যে তার উপরে রং চড়ানো নিতান্তই অনাবশ্যক।

হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশীরা বলে, "সর্দারজী রাজ্যের লোককে ইট, সিমেণ্ট, লোহা-লক্কড় যোগাচ্ছে। এবার নিজের জন্য পাকা বাড়ি তুলবে কবে ? টাকা তো অনেক কামালে, ভোগ করবে কখন ?"

মেহের সিং হেসে জবাব দেয়, "ঠিক বলেছ তোমরা। আর কটা দিনই বা আছে ?

দিনের বেলায় তো ব্যবসা বাণিজ্যের ধান্ধায় বাইরে বাইরেই কাটে, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তো শুধু রাত্তিরে। সুতরাং জিন্দেগী যদি আর বিশ সালও হয় তার অর্ধেক মাত্র থাকব বাড়িতে। ঘুমের মধ্যে ফকিরের চালাঘর যা মোগল বাদশা'র দেওয়ানীখাসও তাই। বাকী থাকে শুধু সকাল আর সন্ধ্যার কয়েকটা ঘণ্টা। সমস্ত যোগ করলে চার, কিংবা বড়জোর ছ' বছর হবে। তার জন্যে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা রাজমিস্ত্রী আর কন্ট্রাক্টর ওভারশীয়রের পেটে দেওয়া কেন?"

এমন গাণিতিক যুক্তির উপরে তর্ক চলে না। প্রশ্নকর্তারা নিরুত্তর হয়।

মেহের সিং-এর এক অন্তরঙ্গ সুহৃদ নামজাদা এক সাইকেল কোম্পানীর সেলিং এজেন্সি নিয়েছিল। সে ধনী বন্ধুকে একটা সাইকেল বেচতে উৎসুক। একসঙ্গে সব টাকা চায় না, ইনস্টলমেন্টে অর্থাৎ কিস্তিতে দাম দিলেও চলবে।

প্রস্তাবটা লোভনীয়। কিন্তু পাষাণে তো কর্দম থাকে না। মেহের সিংকে প্রলুব্ধ করা অসম্ভব। সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে বলে, "বাবুয়ানির কম্পিটিশানের কি আর শেষ আছে, ভাই? আমি সাইকেল কিনেছি তো আড়তদার চিরঞ্জিলাল কিনবে এক্কা অথবা ফিটন। মোটর গাড়ি কিনে আবার তাকেও হয়তো ছাড়িয়ে যাবে কুঠিয়াল কিষণচাঁদ শেঠ। কৈ, কেউ হারাক দেখি আমাকে পায়ে হাঁটার তাগদে?"

দম্ভটা অনর্থক নয়। চার আনা বাসের ভাড়া বাঁচাতে মেহের সিং শীতগ্রীষ্ম বার মাস চার ক্রোশ পথ হেঁটে মণ্ডিতে মাল কিনতে যায়। পদচারণার প্রতিযোগিতায় মেহের সিংকে পরাস্ত করবে, এমন লোকের সংখ্যা বেশী নয়।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার রসবোধ তীক্ষ্ণ! তিনি বোধ হয় কৌতুকচ্ছলেই সর্দারজীর ভাগ্যে এমন এক স্ত্রী জুটিয়েছেন যাঁর হৃদয় দয়ার্দ্র এবং দাক্ষিণ্য অকুণ্ঠিত। হায়, ব্যয়কাতর মেহের সিং-এর অন্তঃপুরেই দানদাতব্যের অবারিত ব্যবস্থা। প্রদীপের নীচেই যেমন অন্ধকার, পুলিশের বড় কর্তার ছেলেই যেমন নক্সালাইট! নিঃস্ব ভিখারী সদরে কর্তার কাছে তাড়না খেয়ে পালাবার পথ পায় না। অন্দরে গিন্নীর কাছে পৌঁছুতে পারলে দিনতিনেকের চাল-ডাল ঝুলি ভরে নিয়ে যায়।

বাড়ির যে বৃদ্ধা ঝি শীতে কাতর তার জন্যে কম্বল, রাস্তার যে ঝাড়ুদার ম্যালেরিয়ায় আধমরা তার জন্যে ওষুধ, স্কুলে যে গরীবের ছেলে বই-এর অভাবে পড়তে পায় না তার জন্যে পাঠ্যপুস্তক যোগায় মেহের সিং-এর স্ত্রী।

শাস্ত্রকারেরা বলেন, স্ত্রীচরিত্র মানুষ দূরে থাক দেবতাদেরও বুদ্ধির অগম্য। যদিও স্ত্রীজাতি সম্পর্কে নিজের জ্ঞান খুবই সামান্য, তবুও শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ করিনে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যতটুকু জানি, তাতে মনে হয়, সংসারে পুরুষচরিত্রটাও কম দুর্বোধ্য নয়। মেহের সিং-এর ডিক্সনারীতে সদ্ব্যয় বা অসদ্ব্যয় বলে কোন কথা নেই। ব্যয় মাত্রই তার কাছে অপব্যয়। স্ত্রীর বেহিসেবী পরোপকারবৃত্তি নিয়ে তার মনস্তাপের সীমা নেই। অথচ তাতে বাধা দিতেও সে অনিচ্ছুক।

ফুলের পরেই যে প্রসঙ্গ নিয়ে মেহের সিং বেশী আলোচনা করে, সে তার নিজের স্ত্রীর নির্বিচার দানশীলতা। কোনদিন এসে বলে, আজ হরিয়ানা থেকে এক বিধবা এসে দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে বিবিজীর আনকোরা দু'খানা সালোয়ার হাতিয়ে নিল। অন্যদিন সখেদে জানায় শহরের অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েরা দেয়ালীর মিঠাই খাবে

বলে দশ দশটা টাকা নিয়ে গেল।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, "সর্দারজী, ওরা দুঃস্থ। তোমার বিবিজী যদি মাঝে মাঝে তাদের কখনও কিছু দান করেন, তাতে তোমার ঐশ্বর্য ফুরোবে না।"

মেহের সিং অবাক হয়ে বলে, "ফুরোবে না? এ-রেটে চললে কুবেরের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হতে সময় লাগে না, আমি তো কোন ছার। শেষকালে হয়তো আমাকেই পরের দুয়ারে হাত পাততে হবে।"

আমি আশ্বাস দিয়ে বললাম, "ভয় নেই, তুমি যা উপায় করছ এবং যা জমিয়েছ তাতে হেসে খেলে তোমাদের জীবন কেটে যাবে, কিছু ভাবতে হবে না।"

মেহের সিং আশ্বস্ত হয় না, বলে, "সাহেব জামানা বদলে যাচ্ছে। আমাদের জোয়ানীতে দেখেছি টাকায় বারো সের দুধ। এখন এক সেরের দাম এক টাকা; তাতেও পাওভর নলকী পানি!"

প্রতিবাদ নিষ্ফল। বললাম, "তোমার স্ত্রীকে বারণ কর না কেন? যদি না শোনে তার হাতে টাকাকড়ি দিও না।"

মেহের সিং করুণ কণ্ঠে বলে, "না হুজুর, তা হয় না। আমার টাকাকড়ি তো সব তাঁরই। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিয়ে তাঁর মনে কষ্ট দিতে পারব না।"

আমি যে অবাক হয়েছি সে কথা তার বুঝতে বাকী রইল না। কিছুটা সংকোচের সঙ্গেই বলল, "ছেলেপুলে নেই, একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই তো। তা ছাড়া নসীবের ফেরে এক সময় অনেক তক্‌লিফ সয়েছে, আমি তাঁকে কোন দুঃখ দিতে চাইনে।"

আসল কথাটা বুঝতে কষ্ট হয় না। স্ত্রীকে বেচারা খুবই ভালোবাসে। বাস্তবিক স্ত্রৈণ কথাটার মানে জানতে অভিধান খোলার দরকার নেই। মেহের সিংকে দেখাই যথেষ্ট। অর্থে মেহের সিং-এর আসক্তি গভীর। স্ত্রীর প্রতি তার অনুরাগ গভীরতর।

টেস্ট রিলিফের কাজে প্রায় একটানা মাস চারেক গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছিল। সে পালা শেষ হতেই বদলীর হুকুম এল। বাক্স পেটারা বাঁধাছাদার মধ্যে মেহের সিং এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

পাঞ্জাবী ভাষাটা কিছু কিছু রপ্ত হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্যা গাল্? খবর কি?"

সে হেসে জবাব করল, "চাঙগা।"

কিন্তু গলার স্বরে প্রসন্নতার আভাস ছিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে দেখি মুখে চোখে ক্লান্তি ও উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

বাগানের গোলাপের গাছগুলি তুলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এ বাড়িতে আমার অনুগামীর জন্য রেখে যাওয়াও নিরর্থক। সেগুলি মেহের সিংকেই দান করলাম। আমেরিকান পীস্ আর সাসপেন্স গোলাপ দুটো মিহিজামের নার্সারি থেকে অনেক দাম দিয়ে এনেছিলাম; ফুল আর দেখা হলো না।

কিন্তু এসব আলোচনায় মেহের সিং-এর আজ তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ব্যাপার কি? অসুস্থ? ব্যবসায়ে গোলযোগ? সর্দারনী কি আবার কোনো দরিদ্রের কল্যাণে মোটা দান করে বসে আছেন?

কোনটাই নয়। মেহের সিং বলল, "সাহেব, আমি বড় বিপদে পড়েছি।"

সে কি কথা ? মেহের সিং কৃপণ সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষটা সৎ। সে-কথা সবাই বলে। কন্ট্রোলের দিনে ব্ল্যাকমার্কেট করে দু'পয়সা উপরি কামানো, কারো পাওনা ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি দুষ্ট ব্যবসায়ীদের প্রচলিত অভ্যাস থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত। তার আবার বিপদ কিসের ?

মেহের সিং বললে, "সে অনেক কথা, গোড়া থেকে শুনতে হবে।"

বারান্দায় বেতের চেয়ারগুলি প্যাক হতে তখনও বাকী ছিল। তারই দুটোতে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। শোনা গেল তার কাহিনী।

মেহের সিং-এর বাপ ছিল গ্রামের মধ্যে বর্ধিষ্ণু চাষী। ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। পাড়াগাঁয়ে সারদা আইনের অনুসরণ যত, লঙ্ঘন তার বেশী। বরের বয়স তখন বারো, কনের বয়স ছয়। কিন্তু 'বরাত' অর্থাৎ বরযাত্রীদের সমাদরে কি ত্রুটি ঘটেছিল তা নিয়ে দুই বৈবাহিকে বিয়ের পর দিন থেকেই মন কষাকষি ও কলহ। শেষ কালে মেহের সিং-এর শ্বশুর রাগ করে মেয়েকে জোর করে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। বরকর্তা বললেন, কুছ্ পরোয়া নেহি। ছেলের আবার বিয়ে দেবেন। কিন্তু সে সংকল্প পূর্ণ হবার আগেই হঠাৎ গেলেন মারা।

বছর না ঘুরতেই পিতৃহীন মেহের সিং-এর কাকারা সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে প্রায় এক বস্ত্রে তাকে পথে বার করে দিল। গ্রামের এক সর্দারজী রেঙ্গুনে ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টের কাজ করতেন। তাঁর দয়া হল। তিনি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে নিজের ব্যবসায়ে ভর্তি করে দিলেন।

জাপানী বোমার ভয়ে যখন দেশে ফিরে এল মেহের সিং, তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ পার হয়ে গেছে। সে-বয়সে বিয়ে করতে গেলে তাদের সমাজে ভালো মেয়ে পাওয়া কঠিন। তাই নিজের পূর্বপরিত্যক্ত স্ত্রীকে এনে সংসার শুরু করল। আত্মীয়পরিজনেরা অবশ্য আপত্তি করেছিল। বিয়ে হয়ে বিশ বছর স্বামীর মুখ দেখেনি যে মেয়ে তার স্বভাবচরিত্র কেমন কে জানে ? নানা লোকে যে নানা কথা বলে। তা বলুক। সে সব কথা গ্রাহ্য করেনি মেহের সিং।

সেজন্য কখনও অনুতাপ করতে হয় নি তাকে। পূর্বজন্মে বিশ্বাস করে মেহের সিং। সে জন্মে নিশ্চয় তার অনেক সুকৃতি ছিল। নইলে এমন সুশীলা স্ত্রী সংসারে মেলা ভার। বর্মা থেকে আনা সামান্য পুঁজি নিয়ে সে ছোট কারবার শুরু করেছিল। আজ সে-ব্যবসায়ে হাজার হাজার টাকা খাটছে। এ সমস্তই তার বিবিজীর পয়ে। ঘরকন্নার কাজ, সেবাশুশ্রূষা, এমন কি সেলাই এমব্রয়ডারীতে পর্যন্ত তার জুড়ি মেলে না। তার হাতের রান্না রগোনজোসের কাছে সাহেবী হোটেলের খানা দাঁড়াতে পারে না। কী আপশোষ, হুজুরকে একদিন সে বিবিজীর পাকানো তন্দুরের রুটি, সরষের শাক আর গাজরের হালুয়া খাওয়াতে পারল না।

দুঃখের কখনও কোনো কারণ ঘটেনি এমন কথা অবশ্য মেহের সিং বলতে চায় না। বাল-বাচ্চা হয়নি বলে এক সময় তাদের মন খারাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু ইলাজ অর্থাৎ চিকিৎসার সে কোন ত্রুটি করেনি। আম্বালা, দিল্লী এমন কি বোম্বাইতে যত বড় বড় লেডি ডাক্তার আর নামকরা স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ আছে তাদের কাউকেই সে দেখাতে বাকী রাখেনি। তা ছাড়া গুরুদোয়ারায় মানত, চিস্তির কবরে সুতো বাঁধা, জলপড়া, মাদুলী, ঝাড়, ফুঁক সবই করেছে। ভগবান দেননি, কী আর করা যাবে ?

এ তো মানুষের হাতে নয়।

বিবিজীর খরচের হাতটা দরাজ, সে কথাও অবশ্য না মেনে উপায় নেই। ঘরের টাকাটা পরকে দিলেই যে জমার অংকে ঘাটতি পড়ে সে-কথাটা তাকে আজও বোঝান গেল না। কেউ এসে কেঁদে পড়লেই সে গলে যায়। ছোট ছেলেমেয়ের নাম করে কিছু চাইলে তো আর দেবার তর সয় না।

দানধ্যান একেবারে খারাপ এমন কথা অবশ্য মেহের সিং বলে না। পরকালের জন্য কিছু পুণ্য সঞ্চয় নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু তা বলে নিজেদের ভবিষ্যৎটাও তো ভাবতে হবে।

স্ত্রীর পরহিতৈষণা নিয়ে মেহের সিং দুঃখ করে, কিন্তু রাগ করে না। ষোল আনা নিখুঁত পৃথিবীতে কী আছে? মোটামুটি তার সুখেরই জীবন। ব্যবসা, গোলাপ আর স্ত্রী এই তিন নিয়ে বাকী দিনগুলি এভাবে কাটলেই সে খুশি।

কিন্তু হায়, বিধাতা বিরূপ। তার সুখের সংসারে অতর্কিতে ফাটল ধরেছে, ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় বুঝিবা।

মাস কয়েক আগের ঘটনা। হুজুর তখন দৌড়েমে অর্থাৎ টুরে। মেহের সিং দৈনন্দিন কাজকর্মের শেষে বাড়ি গিয়ে দেখে চৌদ্দ-পনর বছরের এক ছোকরা বারান্দায় বসে আছে। জীর্ণ বসন, শীর্ণ শরীর। দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যে সুস্পষ্ট চিহ্নিত।

স্ত্রীর কাছে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া গেল। ছোকরার নাম জগজিৎ। সোণিপতের কাছে কোথায় যেন বাড়ি; বাপ মা, ভাইবোন আপনার বলতে কেউ কোথাও নেই। লুধিয়ানার কোন এক লেদ মেশিনে ঠিকে কাজ করত। ছাঁটাইতে পড়ে এখন বেকার। আহা, বেচারীর ক'দিন খাওয়া জোটেনি।

এ গৃহে এরকম অনাহূত আগন্তুকের আকস্মিক আবির্ভাব অভূতপূর্ব নয়। স্ত্রীর "আহা"র অর্থও মেহের সিং-এর জানা আছে। পরিপাটি ভোজন, কিছু জামা কাপড় বা নগদ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা হাতে পেয়ে তবেই এধরণের অপ্রার্থিত অতিথিরা বিদায় হয়।

কিন্তু এবার সে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটল। দিন পাঁচ সাত পার হয়ে গেল, জগজীতের নড়বার লক্ষণ নেই। কারণটা স্ত্রীই ব্যাখ্যা করল, "একটা ছোকরা চাকর রাখব কয়েকদিন থেকে ভাবছিলাম। ভালোই হলো; জগজীতকে পাওয়া গেল। মাইনে দিতে হবে না, শুধু দুবেলা দু'মুঠো খেতে দেওয়া, ব্যাস।

স্ত্রীর সুবিধার ব্যাপারে মেহের সিং কোনকালে কথা বলে না। একটা কেন, দু'টো চাকর রাখলেও বোধ হয় মেহের সিং-এর আপত্তি ছিল না।

অনাহারে পিড়িত লোকের ক্ষুধার প্রকোপটা সাধারণতই বেশী হয়। বিশেষত পরিবেশনে ঔদার্য ঘটলে তার আর মাত্রা থাকে না। দু'বেলায় প্রায় আধ সের আটা এবং সে অনুপাতে ডাল তরকারী না হলে জগজিতের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। তার চা পেয়ালার বদলে ঘটিতে দিলেই ভালো মানায়। তাতে জলের চাইতে দুধের অংশ দ্বিগুণ এবং চিনির পরিমাণ পায়সের।

অপরিণতবয়স্ক বালকের এই ভোজনপটুতা মেহের সিং-এর স্ত্রীর কাছে সত্যিকার কৌতুকের বিষয়। সে জগজিতের থালায় রুটির সংখ্যা কেবলই বাড়িয়ে দেয়। ফলে জগজিতের আগেকার উপবাসক্লিষ্ট দেহে কিছুদিনের মধ্যেই সবল

স্বাস্থ্যের নধর চিক্কণতা দেখা দিল। মেহের সিং-এর স্ত্রীর নতুন কেনা জামাকাপড়ে তাকে এখন রীতিমত ভদ্রসন্তান বলে ভ্রম হতে পারে। কারখানার দিন মজুর বা বাড়ীর সামান্য চাকর বলে আর চেনাই যায় না।

আহারে জগজিতের যতখানি মনোযোগ, কাজে তার ততখানিই অবহেলা। মেহের সিং তাকে দোকানের চিঠি বিলি করতে পাঠালে তার অর্ধেক ভুল ঠিকানায় পৌঁছয়। বাজার থেকে জিনিস কিনতে দিলে পয়সা হারিয়ে আসে। ঘরের টেবিলচেয়ার ঝাড়-পোঁছের কাজে সে তেলের শিশি ভেঙে রাখে। কালির দোয়াত উল্টে দেয়। এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিতে তার বুঝি আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। এক সের গম পিষতে দিন কাবার। এমন অপদার্থকে হাতির খোরাক দিয়ে পোষার অর্থ কী?

মেহের সিং বলে, "আপদটাকে বিদায় কর দিকিন।"

স্ত্রী বাধা দিয়ে বলে, "ছেলেমানুষ, এসব কাজ করেনি তো কখনও। দুদিন যেতে দাও, ধীরে ধীরে শিখবে।"

ছেলে-মানুষের কিন্তু শেখার কোন গরজ দেখা গেল না। সে অনেক ঘাটের জলখেয়ে মানুষ, বয়স অল্প হলেও সাংসারিক বুদ্ধি তার কিছু কম নয়। মেহের সিং-এর স্ত্রীর দুর্বলতা সে বুঝি নিয়েছে। সে জানে, কাজ না করেও এখানে খেয়ে দেয়ে দিব্যি আরামে দিন কাটানো চলবে।

তা হয়তো চলতো। কিন্তু প্রশ্রয়ের আধিক্যে দিনে দিনে তার সাহস এবং দৌরাত্ম্য দুই-ই বাড়তে লাগল। সে লুকিয়ে মেহের সিং-এর লস্যীর গেলাসে চুমুক দেয়। চিরুনীতে টেরী বাগায়। তার পশমের রঙিন গলাবন্ধটা গলায় জড়িয়ে পাড়ার বন্ধুদের কাছে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়।

এসব উপদ্রবে মেহের সিং যতই বিরক্ত হয়, তার স্ত্রী ততই জগজিতের দোষত্রুটি ঢাকবার চেষ্টা করে। মেহের সিং-এর সাধের ছড়িটা কদিন থেকে অদৃশ্য। স্ত্রী বলল, বিড়াল তাড়াতে ভেঙে দুখানা হয়ে গেছে। মেহের সিং রুমাল খুঁজে পায় না। শোনে ধোবী হারিয়েছে। ইদানীং মাঝে মাঝে মেহের সিং-এর পকেট থেকে সিকিটা, আধুলিটা উধাও হয়। স্ত্রীকে জানাতে সে বলে, ফিরিওয়ালার কাছে জিনিস কিনেছিল, হাতে খুচরো ছিলো না। তাই স্বামীর মানিব্যাগ থেকে দাম দিয়েছে।

কিন্তু হাড়িতে সরা ঢাকা দিলেই দগ্ধ মৎস্যের গন্ধ চাপা থাকে না। সেদিন দোকান থেকে ফেরার পথে মেহের সিং স্বচক্ষে দেখতে পেল, জগজিৎ গলির মোড়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তার মানিব্যাগ থেকে অপস্রিয়মাণ টাকাকড়ির গতি যে কোথায়, এবং হেতু যে কী সে সম্পর্কে আর সংশয়ের অবকাশ রইল না।

অথচ জগজিতকে শাসন করলে স্ত্রীর মুখ ভার হয়, তাকে তাড়াতে গেলে স্ত্রীর চোখ জলে ছলছলিয়ে ওঠে। মেহের সিং কারণ খুঁজে পায় না। ধনীগৃহে অপুত্রক নারী পুষ্যি নিয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার রক্ষা করে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে সন্তানহীনারা কেউ ভাই-এর ছেলে, বোনের মেয়েকে মানুষ করে। কেউ বা পশুপক্ষী,—কুকুর-বেড়াল, টিয়া-কাকাতুয়া পোষে। সে বরং বোঝা যায়। কিন্তু একটা গোত্র পরিচয়হীন পথের ভিখারী নিয়ে বাড়াবাড়ির অর্থ কী? জগজিতের প্রতি স্ত্রীর এই অন্ধ স্নেহাধিক্য মেহের-সিং-এর কাছে একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকা।

স্ত্রীর প্রতি মেহের সিং-এর অসাধারণ প্রেম ও অবিচলিত বিশ্বাস। বর্মা থেকে ফিরে এসে নূতন করে সে শুধু স্ত্রী পায়নি, পেয়েছে নূতন জীবন। সেই শান্ত নিরুপদ্রব প্রীতিসমৃদ্ধ জীবনের মর্মস্থলে পুষ্পকোরকে দুষ্ট কীটের মত প্রবেশ করেছে এই মন্দমতি তস্কর-স্বভাব বালক। সুখের দলগুলিকে সে কেটে ছিন্নভিন্ন করেছে। মেহের সিং-এর কাছে জগজিৎ একটা মূর্তিমান বিভীষিকা। তাকে দেখলে ক্রোধ এবং বিরক্তিতে তার সর্বাঙ্গে জলবিছুটির জ্বালা ধরে। তার নামটা পর্যন্ত তিক্ত বিষের মতো ঠেকে।

অনেক দুঃখ আছে যা কেবলই গোপনে সইতে হয়, মুখ ফুটে কাউকে বলা চলে না। মেহের সিং আপন মনের অগ্নিদহনে আপনি দগ্ধ হয়।

কিন্তু ধৈর্যেরও সীমা আছে। সহ্যেরও আছে শেষ। আঘাত পেয়ে পেয়ে শক্ত পাথরের দেওয়ালও একদিন ধসে পড়ে ধূলায়।

দিন তিনেক আগে বিকালে মেহের সিং দোকানের জাবেদা খাতায় বেচা-কেনার হিসাব মিলিয়ে দেখছিল, এমন সময় মোতিওয়ালা গিরিধারীলাল এসে চুপি চুপি বলল, "দেখ তো সর্দারজী, গয়নাটা চিনতে পার কিনা ?"

চিনতে কোন অসুবিধা ছিল না। সাবেকী ধরনের ভারী কুন্দনের একটি কণ্ঠি বারো চৌদ্দ ভরি সোনার কম নয়। বছর তিনেক আগে মেহের সিং নিজেই গড়িয়ে দিয়েছিল স্ত্রীকে।

গিরিধারীলাল বলল, জগজিৎ তা বন্ধক রেখে তিনশ' টাকা নিয়ে গেছে।

রাগে মেহের সিং-এর সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপতে লাগল, তার নিঃশ্বাস তপ্ত এবং কানের ভিতর থেকে আগুনের হল্‌কা ছুটল। তক্ষুনি বাড়ি এসে জগজিতের পিঠে কষে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। চুরির দায়ে তাকে অবিলম্বে পুলিসে ধরিয়ে না দিলে তার ক্রোধ শান্ত হবে না। কিন্তু স্ত্রী কেবলই প্রতিবাদ করে। বলে, সে নিজে জগজিতের হাত দিয়ে হারটা দোকানে পাঠিয়েছে। টাকার তার জরুরী প্রয়োজন ছিল।

কথা কাটাকাটিতে প্রয়োজনটা কী এবং কেন তা গোপন রইল না। ফুলেল তেল, গন্ধ সাবান, জরি-বসানো জুতো ইত্যাদি পেয়ে পেয়ে জগজিতের লোভ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। বায়না ধরলেই যদি পাওয়া যায় তবে স্বভাবতই আব্দারের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ইদানীং একটা ট্রানজিস্টার রেডিওর জন্য জগজিৎ মেহের সিং-এর স্ত্রীকে ধরে পড়েছিল।

মেহের সিং স্ত্রীকে প্রচুর অনুযোগ ও কঠোর তিরস্কারে ধিক্কার দিল। ঘর থেকে জগজিতের নতুন কেনা তোরঙ্গসহ জিনিসপত্র টান মেরে বাইরে ফেলে দিল। এ বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি তাকে ফের দেখতে পাওয়া যায়, তবে মেরে তার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে বলে শাসাতে লাগল।

সেই দিন থেকে স্বামীস্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ। বলতে বলতে হঠাৎ মেহের সিং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত দুটি চেপে ধরে বলল, "হুজুর আমাকে আপনি বাঁচান। আমার মানসম্ভ্রম, টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি সে ক্ষতি সইতে পারব। কিন্তু আমার স্ত্রী আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সে দুঃখের ভার আমি আর বইতে পারছি নে।"

মানতেই হবে, ব্যাপারটা যেমন দুঃখের তেমনি হতবুদ্ধিকর। কিন্তু এসব হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে বাইরের লোকের কী করার আছে ?

মেহের সিং সে-কথা শোনে না। তার বিশ্বাস, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইচ্ছা করলে না করতে পারেন জগতে এমন কিছু নেই। বলে, "সাহেব, আপনি দু'দিন পরে চলে যাবেন। যাবার আগে আমাকে এই মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন।"

আমাকে নিরুত্তর দেখে বলল, "স্যার, ঐ ছোকরাকে এখান থেকে না সরালে আমার সংসার, আমার জীবন ছারখার হয়ে যাবে। এক সময় মনে হয় ওকে আমি নিজ হাতে গলা টিপে মেরে ফেলি, কিংবা তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিই।"

সাংঘাতিক কথা, সন্দেহ নেই। আমার সাধ্যমতো তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব এই আশ্বাস না নিয়ে মেহের সিং গেল না।

দিন দুই তিন ভেবে ভেবে যখন কূলকিনারা পাইনে, তখন হঠাৎ যেন একটা আশার আলো দেখা গেল।

শহরে এয়ার ফোর্সের এক রিক্রুটিং অফিসার ক'দিন থেকে তাঁর ক্যাম্প করেছিলেন। নানা জায়গা থেকে বিমান বাহিনীর জন্য তরুণ ক্যাডেট জোগাড় করা তাঁর কাজ। তাঁকে ডেকে পাঠালাম। সলাপরামর্শের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। সে সব প্রকাশ করাও অনুচিত।

চাপরাশী সুখনলাল একটি জীবন্ত রয়টার। সে বার্তা নিয়ে এল, "হুজুর, জগজিৎ হাওয়াই ফৌজে দাখিল অর্থাৎ ভর্তি হয়েছে। আজ রাত্রির ট্রেনে যোধপুরে ট্রেনিং-এর জন্য রওনা হবে। সেখানে হাওয়াই জাহাজ চালাবে। চার সালের মধ্যে হাজার রুপেয়ে তনখা পাবে।"

মনোভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা করলাম, "জগজিৎ ? সে আবার কে ?"

সুখনলাল ব্যাখ্যা করল, "মেহের সিং-এর মুন্ডে অর্থাৎ ছোকরা চাকর। ভারি শয়তান ছেলে। মেহের সিং-এর বিবিজীকে জরুর যাদু করেছে। নইলে—

সে-আলোচনায় রুচি ছিল না। তাকে নিরস্ত করলাম।

রাত্রি পোনে বারোটায় যোধপুরের দিকে ট্রেন। যে নাটিকার প্রযোজনায় হাত দিয়েছি তার যবনিকাপতনটা স্বচক্ষে দেখার কৌতূহল হলো। ওভারকোটটা গায়ে জড়িয়ে জীপে চেপে বসলাম।

ছোট স্টেশান। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুমটা সাধারণতঃ তালাবন্ধই থাকে। আজ সেখানে রিক্রুটিং অফিসার তার সদ্যসংগৃহীত ছাত্র অর্থাৎ রিক্রুটদের নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন। সামনের বারান্দায় একদল বখাটে ছেলে উচ্চ রবে জটলা করছিল। তারা জগজিতের বন্ধু সম্প্রদায়। এত দিন তার পয়সায় ফুর্তি করেছে। অনুমান করি, ব্যথিত চিত্তেই তারা তাকে বিদায় দিতে এসেছে।

শৌখিন জামাকাপড়ের বাহার দেখে জগজিতকে চিনতে বিলম্ব হল না। দিব্যি সযত্নপরিপুষ্ট চেহারা, নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র ঘর থেকে এসেছে এমন কথা মনেই হয় না।

পাছে কেউ চিনতে পারে, এজন্য প্ল্যাটফরমের একধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সুখনলাল এসে চুপি চুপি জানাল, "হুজুর, মেহের সিং-এর বিবিজী।"

"বটে ? কোথায় ?"

"ঐ যে ঐখানে" বলে প্লাটফরমের অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

শীতের রাত্রি। হালকা কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তার মধ্য দিয়ে অর্ধঅস্পষ্ট নারীমূর্তি চোখে পড়ল। আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। সাদা সালোয়ারের উপর হাঁটু অবধি লম্বিত ডোরাকাটা কামিজের প্রান্তভাগ হাওয়ায় ঈষৎ দুলছিল। কাঁধের ওপর দিয়ে রঙিন দোপাট্টা ঘোমটার মতো করে মাথায় জড়ানো। সেটা শীতের ভয়ে, কিংবা আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে জানিনে।

বিরক্তি বোধ করলাম। সম্পন্ন ভদ্রঘরের মহিলা ; তার এ কী আচরণ। কোথাকার কোন এক অচেনা অজানা ঘরের ছোকরার জন্য গভীর রাত্রিতে একা এসে স্টেশানে দাঁড়িয়ে থাকতে কি একটু দ্বিধা হল না ? ছিঃ ছিঃ লজ্জা ভয়ের কিছু কি আর অবশিষ্ট নেই ?

ট্রেন এসে গেল। যাত্রীরা নামল, উঠল। রিক্রুটিং অফিসার রিক্রুটদের নিয়ে একটা ফার্স্টক্লাস কামরা দখল করে বসলেন। ফ্লাইংঅফিসার হয়ে এরোপ্লেন চালনার স্বপ্নে জগজিতের মনে উত্তেজনার অবধি ছিল না। প্ল্যাটফরমের এক প্রান্তে একজোড়া স্নেহকাতর চক্ষের অনিমেষ দৃষ্টি যে আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় ক্ষণে ক্ষণে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে সে কথা সে মূঢ় জানতেও পারল না।

ট্রেন চলে গেল। শেষ মুহূর্তে পাছে জগজিতের মত পরিবর্তন ঘটে, ফজিলপুর থেকে যেতে না চায়, এ আশঙ্কার আর অবকাশ রইল না।

মেহের সিং-এর স্ত্রী তখনও অপস্রিয়মান ট্রেনের পিছনে লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে যেতেই প্ল্যাটফরমের অনতিপ্রখর কেরোসিনের আলোতে তার অনাবৃত অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি স্পষ্ট চোখে পড়ল। চমকে উঠলাম। কী আশ্চর্য। এ কী নিখুঁত সাদৃশ্য। নাক, চোখ, চিবুকের গড়ন হুবহু এক। মনে হয়, একখানা প্লাস্টার অব প্যারিসে গড়া ছাপ বুঝি দোপাট্টার অর্ধমুক্ত অবগুণ্ঠনে জড়িয়ে আছে।

মুহূর্তে আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সমাধান উদঘাটিত হলো। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানালার পর্দা উড়িয়ে নিলে ঘরের ভিতরের দৃশ্য যেমন সহজে দেখা যায়, অজ্ঞাতকুলশীল ভিখারী বালকের জন্য সম্ভ্রান্ত রমণীর দুর্নিবার দুর্বলতার কারণ তেমনি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এবার দুর্ভাগিনীর জন্য সত্যিকারের বেদনা বোধ করলাম। অতৃপ্ত স্নেহ ক্ষুধার সহস্র নাগিনী জাগায়ে জর্জর বক্ষে এই নিরুপায় নারী দিনের পর দিন আপন সমাজ, সংসার, স্বামী ও সম্ভ্রমের জন্য নিজের সঙ্গে কী কঠিন যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। শেষে হৃদয়ের অপ্রতিরোধনীয় শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে নিরুপায় ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সে কথা কল্পনা করে করুণা হলো।

কিন্তু বিস্ময়ের তো সেখানেই শেষ নয়। মেহের সিং-এর কথা ভেবেও অবাক হতে হয়। তার কি চোখ নেই ? লোকটা কি নির্বোধ না বিচারশক্তিহীন ? এক মুহূর্তের দেখায় যে গুপ্ত তথ্য আমার কাছে ধরা পড়ল তা এতকাল কি করে তার অগোচরে রইল ? এ শুধু বিস্ময়কর নয়, প্রায় অবিশ্বাস্য।

মেহের সিং-কে আমি পছন্দ করি। ফুলের বাগানে সে নিঃস্বার্থভাবে আমার সহায়তা করেছে। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি তার ভালো হোক। যে মারাত্মক সত্য আজও তার কাছে গোপন রয়েছে, তা যেন কোনদিন তার গোচরে না আসে। ইগনোরেন্স যে ব্লিস, অজ্ঞানতায় যে শান্তি সে কথা এর আগে কখনও এমন

প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিনি।

দিন পনের পরে চার্জ হ্যান্ড-ওভার করে ফজিলপুর পরিত্যাগ করলাম। ম্যাজিস্ট্রেটকে বিদায় দিতে স্টেশানে সরকারী বেসরকারী গণ্যমান্য লোকের উপস্থিতি মফঃস্বল শহরের চিরাচরিত প্রথা। যথারীতি নমস্কার, করমর্দন ইত্যাদির পরে বার-লাইব্রেরী, মোক্তার এসোসিয়েশান, নাগরিক সমিতি ইত্যাদির পক্ষ থেকে দেওয়া একরাশ গাঁদা ফুলের মালা গলায় দুলিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

মেহের সিং একপাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই সে তা নিজের দুই হাতে চেপে ধরে বোধ করি নিঃশব্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করল। "সেলাম, সাহেব, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

আমি অন্য লোকের কান বাঁচিয়ে নিচু গলায় বললাম, "ভগবান তোমারও মঙ্গল করবেন। আপদটা বিদায় হয়েছে, আর ভাবনা নেই।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মেহের সিং জবাব দিল, "জগজিৎ লৌট আয়া।"

"ফিরে এসেছে ? সে কী ? কবে ? বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলাম বললেই হয়।

সে খানিকটা ইতস্তত করে অপরাধের স্বরে বলল, "এই দিন কয়েক হল, আমিই দিল্লী গিয়ে ফৌজি দপ্তরে জেনারেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ছাড়িয়ে এনেছি।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে নির্বাক তার পানে তাকিয়ে রইলাম।

গার্ড হুইসিল বাজিয়ে তার লণ্ঠনের সবুজ আলোটা উঁচিয়ে ধরল।

জট

রাত্রিতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং ভোরে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা একটি মহৎ গুণ। অন্তত শিশুপাঠ্য পুঁথি-পুস্তকে সে কথাই লেখে। আরলি টু বেড অ্যান্ড আরলি টু রাইস মেকস্ এ ম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার পণ্ডিতেরা ক্ষমা করবেন, ও কার্যটি আমার জন্যে নয়।

অনেক দিনের অভ্যাস, সম্পাদকীয় ও নানা কথার গ্যালি প্রুফটা নিজে 'পাস' না করা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে আপিস থেকে উঠতে পারিনে। ততক্ষণে রাস্তার শেষ ট্রাম ডিপোতে ফিরে যায়, গলির মোড়ে হিন্দুস্থানী পানওয়ালার দোকানে ঝাঁপ হয় এবং পাড়ার অধিকাংশ ফ্ল্যাটে নিষুতির অন্ধকার নেমে আসে।

ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে আহার ও সিগারেট শেষ করে বিছানায় যাওয়ার আগেই ঘড়ির কাঁটা বারোটার নিশানা পার হয়ে যায়, ইংরেজী ক্যালেন্ডারে তারিখের পরিবর্তন ঘটে।

বলা বাহুল্য, পরদিন সকালে আটটার আগে শয্যা ত্যাগ শুধু কষ্টকর নয়, রীতিমত দুঃসাধ্য। দার্জিলিঙের টাইগার-হিলে এবং পুরীর সমুদ্রতীরে সূর্যোদয় নিশ্চয়ই অতি মনোরম দৃশ্য। কিন্তু সেটা এমেরিকান টুরিস্ট ও কলেজ ম্যাগাজিনের তরুণ কবিদের জন্যই তোলা থাক। তা না দেখার মনোবেদনায় আমি কিছুমাত্র ম্রিয়মাণ নই।

আজও যখন ঘুম ভাঙল, আকাশে মার্তণ্ডদেব তখন যথেষ্ট উঁচুতে। পাশের বাড়ির হেঁসেলে কড়ায় ঘন ঘন খুন্তি আন্দোলনের শব্দ এবং মাঝে মাঝে ঝি চাকরের সরোষ হুঙ্কার। বোঝা যাচ্ছে, কেরানীবাবুদের আপিস অভিযানের সময় অদূরবর্তী।

গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দৈনিক কাগজগুলির পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নি। ময়রা নিজে সন্দেশ খায় না। সেটা সুলক্ষণ। কিন্তু সম্পাদককে নিজের পত্রিকা পড়তে হয়। শুধু পড়া নয়, আর তিনখানা প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে হয়, কোথায় কী ভুল-ত্রুটি ঘটেছে। তার পরেই টেলিফোনে এক প্রস্থ প্রশ্ন, অনুযোগ, নির্দেশ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৃদু ভর্ৎসনা বা সতর্কীকরণ। কর্পোরেশানের খবরটা 'নবযুগের' ফ্রন্ট পেজে বেরিয়েছে; আমাদের কাগজে তিনের পাতায় কেন? 'রাষ্ট্রবাণী' শ্রম মন্ত্রীর গুপ্ত চিঠি ফাঁস করেছে; আমাদের স্টাফ রিপোর্টারেরা কি ঘুমুচ্ছে? নিউজ এডিটার, চীফ-সাব, স্পেশাল রিপ্রেসেন্টেটিভ কাউকেই রেহাই দিই নে।

কাজটা অপ্রিয় সন্দেহ নেই। অথচ অপরিহার্য। সংবাদপত্র নির্ভীক হতে পারে, কিন্তু নির্বিকল্প নয়। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর সিগারেট, সাবান বা তরল আলতার মতো পত্রিকার জগতেও কম্পিটিশান মানে প্রতিযোগিতা আছে।

প্রাত্যহিক কর্মসূচীর এই অবধারিত টেলিফোন পর্ব সমাধা করে যখন দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের প্রতীক্ষায় আছি, তখন ভৃত্য এসে ঘোষণা করল—জনে বাবু আসিছান্ত।

জিজ্ঞাসু নেত্রে তার পানে তাকাতেই কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করে বলল,—সে দারোগাবাবু আছি।

দারোগা? অবাক হলাম। ব্রিটিশ আমলে সম্পাদকের গৃহে দারোগা এবং তাঁর স্বগোত্রীয়দের আগমন একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। দিনে এবং রাত্রে সময়ে এবং অসময়ে এ বাড়িতেও তাদের অতর্কিত আবির্ভাব অনেকবারই ঘটেছে। ঘরের বাক্স-পেঁটারা কাগজ-পত্র এমন কি ভাঁড়ারের হাঁড়ি-কলসী পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড করে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা, শাসানি মায় চড়টা চাপড়টা কিছুই বাদ যায়নি। সশস্ত্র পাহারায় কালো বন্ধ গাড়ি চেপে পর্যায়ক্রমে লর্ড সিংহ রোড, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট ও আলিপুর সেন্ট্রাল অথবা প্রেসিডেন্সী জেল—সব কিছুরই অভিজ্ঞতা আছে।

কিন্তু কংগ্রেসী আমলে দিনকাল বদলেছে। গভর্ণমেন্টকে গাল দিলে এখন আর রাজদ্রোহ হয় না; বরং কাগজের জনপ্রিয়তা অর্থাৎ বিক্রি বাড়ে। সম্পাদকের খ্যাতি বিস্তৃত এবং মালিকের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স পরিপুষ্ট হয়।

তরোয়ালের চাইতে কলমের জোর বেশী এ কথাটা বর্তমান অগণিত শিক্ষিত বেকারের যুগে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু পুলিশের চাইতে যে প্রেসের প্রতাপ প্রবল, সে বিষয়ে এখন দ্বিমত নেই।

বেশীক্ষণ অবশ্য সন্দেহের অবকাশ রইল না। নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পরে আগন্তুক নিজেই পরিচয় দিলেন। নাম সুধীর বসু। কলকাতা পুলিশের—দারোগা নন, ইনস্পেক্টার। যদিও ইতিপূর্বে আমাদের আলাপ পরিচয় ঘটেনি, তিনি আমারই নিকট প্রতিবেশী। রাস্তার ওপারে লাল বাড়িটায় থাকেন।

বিস্ময়ের কিছু নেই। কথামালার কূপে নিমজ্জিত জ্যোতির্বিদের ন্যায় সাংবাদিকদের দৃষ্টিও সুদূর নভোমণ্ডলে নিবদ্ধ। পায়ের কাছে গুহা গহ্বরের তাঁরা খোঁজ রাখেন না। কাটাঙ্গায় শোম্বে বা টিউনিশিয়ায় বেন খেদার নাড়ীনক্ষত্রের খবর আমাদের নখাগ্রে। পাশের বাড়ির মানুষটিকে চেনা দূরে থাক, তার নামও জানিনে।

উভয় পক্ষে ভদ্রতাসূচক সামান্য দু একটা মামুলি কথাবার্তার পরে সুধীরবাবু বললেন, "আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এসেছি।"

এবার অবাক না হয়ে উপায় নেই। সম্পাদকের কাছে প্রত্যহই লোক আসে এবং একটু অধিক সংখ্যায়ই আসে। তারা কেউ নিজের বক্তৃতা বা বিবৃতি ছাপাতে চায় কেউ আনে নানা অভাব-অভিযোগের চিঠি, কেউ বা প্রকাশ করতে চান পাড়ার ক্লাব বা মহিলা সমিতিতে সংগীত অথবা নৃত্যকলায় নিজের অনূঢ়া কন্যার প্রাইজ পাওয়ার বিবরণ ও ফটোগ্রাফ। সম্পাদকের কাছে উপদেশ চাইতে আসাটা অভুতপূর্ব বটে! ব্যাপারটা বিস্তারিত শুনতে হয় তো!

সুধীরবাবু কিছুটা কুণ্ঠার সঙ্গেই বললেন, "ঠিক কী ভাবে যে বিষয়টা আপনাকে বোঝাব ভেবে পাচ্ছিনে। দিন দুই হলো একটি মেয়েকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

সে কী কথা? এতকাল তো জানতাম, স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে সাধারণ মানুষেরাই পুলিসের ফ্যাসাদে পড়ে থাকে। কিন্তু সে-কথা ভদ্রলোককে বলা যায় না। তাই বিস্ময় গোপন করে ঘটনাটা জানতে চাইলাম।

সুধীরবাবু বললেন, "ঘটনাটা বড়ই অদ্ভুত। পরশু দিন সন্ধ্যাবেলা ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরেছি। দেখি, উঠোনে একটি মেয়ে বসে আছে। চুলগুলি রুক্ষ এলোমেলো, হাত-পা কাঠির মতো, চোখ দুটো যেন কোটরে ঢুকে গেছে। বিশীর্ণ আকৃতি থেকে বয়স সঠিক অনুমান করা শক্ত। তবে সেটা যে পঁচিশের উপরে নয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাবলাম ভিখারী, অনাহারে অস্থিচর্মসার। পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে একটা আধুলি দিতে গেলাম। নিলে না। হঠাৎ আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল—"সায়েব আমাকে ফাঁসি দাও।"

বিস্ময়ের বিষয়, মানতেই হবে। গান্ধী যুগে অনেকে স্বেচ্ছায় জেলে যেত বটে। কিন্তু তাঁরা তো বেশীর ভাগই এখন মন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রী। নিদেন পক্ষে এম-পি, এম-এল-এ হয়ে তাঁরা পারমিট ও লাইসেন্সের চেষ্টায় আছেন। আপনি সেধে ফাঁসিতে মরতে চায়, এমন কথা কে কবে শুনেছে? পাগল নয় তো?

সুধীরবাবু নিজেও প্রথমে তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তার অপ্রকৃতিস্থতার কোনো লক্ষণ নেই। আর যাই হোক, মেয়েটা যে উম্মাদ নয়, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

ভদ্রলোক প্রথমে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে পরে রূঢ় ভাষায় শাসিয়ে মেয়েটিকে তাড়াতে চেষ্টা করেছেন। সে কিছুতেই নড়বে না।

ইনস্পেক্টার-গৃহিণী ছেলেমেয়ে-সহ সম্প্রতি তাঁর পিত্রালয়ে গেছেনে। কলকাতার বাড়িতে একটা ঠিকে চাকর ও ইকমিক-কুকার সম্বল করে গৃহকর্তা একা বাস করছেন। তার মধ্যে হঠাৎ এ কী অপ্রত্যাশিত উপদ্রব? খালি বাড়িতে বাইরের একটা অজ্ঞাতকুলশীল যুবতী মেয়ে মানুষ দু'দিন দু'রাত্রি কাটিয়েছে, এ খবর যদি একবার

গিন্নীর কানে পেঁছিয়, তবে কুরুক্ষেত্র বাধবে না ? তাছাড়া দিনকাল খারাপ। কে কোথা থেকে কখন খবরের কাগজে একখানা উড়ো চিঠি ছেড়ে বসবে তার ঠিকানা আছে কি ? লজ্জায় তখন কাউকে কি আর মুখ দেখানো চলবে ? চাই কি, চাকরি নিয়েও হয়তো টানাটানি পড়বে। ভদ্রলোক অত্যন্ত কাতর চক্ষে আমার দিকে তাকালেন।

তার জন্যে সত্যিকার করুণা বোধ করলাম। আশ্বাস দিলাম—আমাদের কাগজে সে চিঠি ছাপা হবে না। বললেম, "ঘাড় ধরে মেয়েটাকে সদর দরজার বাইরে পার করে দিন। নিজে না পারেন থানা থেকে পুলিস এনে হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আপনি পুলিস অফিসার ; আপনার ভাবনা কিসের ?"

সুধীরবাবু বিশেষ আশ্বস্ত হলেন এমন মনে হলো না। তাই লঘু-চপল কণ্ঠে বললাম, "ডাক্তারেরা নিজের চিকিৎসা করেন না শুনেছি ; আপনাদের পুলিসেও কি সে-রকম রেয়াজ ?"

সুধীরবাবু সে পরিহাসে যোগ না দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "কনষ্টেবল অবশ্য হুকুম করলেই আসে। তারা এসে জোর করে মেয়েটাকে অনায়াসেই দূর করতেও পারে। দরকার হলে, কিল, চড়, ঘুষি ইত্যাদি আমাদের চোখের সামনেই চলে। ও সব মাইণ্ড করলে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করা সম্ভব নয়। এ মেয়েটাকেও থানায় টেনে নিয়ে কয়েদ করে রাখতে পারতাম। কিন্তু সত্যি কথা কি জানেন ? কেমন যেন জোর পাচ্ছিনে।"

"কেন বলুন তো ? হঠাৎ তার উপরে মায়া বসে গেল না কি ?" কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম।

সুধীরবাবু জবাব দিলেন, "ঠিক মায়া নয়। বোধ হয় সঙ্কোচ, মানে—একটা যেন হেলপ্‌লেস্‌নেস্‌।"

ক্ষণেক নীরবতার পরে প্রায় অর্ধস্বগতভাবে বললেন, "চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস নিয়ে আমাদের কারবার। সংসারে স্ত্রী এবং পুরুষ দুই-ই যে কত অধম, কত পাষণ্ড হতে পারে তার দৃষ্টান্ত অহরহই দেখতে পাই। সুতরাং মানুষের কোনো অপরাধেই আমরা চমকে উঠিনে। কিন্তু এ মেয়েটা নিজে থেকেই যে স্বীকারোক্তি করেছে, তা যদি সত্যি হয় তবে সে মনুষ্য সমাজের বাইরে। অথচ তাকে কোনো মতেই স্বভাব-পাপী, মানে আমাদের পুলিসী ভাষায় যাকে বলে হ্যাবিচুয়্যালী ক্রিমিন্যাল, বলা যায় না।

মনে মনে বিরক্ত হলাম। এ যে কেবলই ভণিতা করে চলেছে। আসল কথাটা কী ?

কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে মনের ভাব সব সময়ে যথাযথ প্রকাশ করা চলে না। সভ্যতার অনেক খেসারৎ আছে ; তার মধ্যে এটাও একটা। তাই বিরক্তি গোপন করে যথাসাধ্য লঘু কণ্ঠেই বললাম, "এ তো হলো প্রস্তাবনা। এবার মূল পালাটা শুরু করুন। আমার নিজের অবশ্য আপিস বিকেলে, কোনো তাড়া নেই। কিন্তু আপনাকে যদি এবেলা কাজে যেতে হয়, তবে বেলা বড় কম হয় নি।"

ইনস্পেক্টারবাবু লজ্জিত হলেন। বললেন, "ওঃ, তাই তো ! ঘটনাটা সংক্ষেপেই বলছি। আচ্ছা আপনি তো সাহিত্যিক। বলতে পারেন, জেলাসী কথাটার কোনো বাংলা আছে কি ?"

বললাম, "আছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনা পরে হবে, আগে আপনার রহস্যময়ী মেয়ের কাহিনীটা শোনা যাক।"

তিনি মিনিট দুই চুপ করে কী যেন ভাবলেন, তারপরে প্রশ্ন করলেন, "বিন্ধ্যবাসিনীর কথা মনে আছে আপনার ?"

"কোন বিন্ধ্যবাসিনী ? সেই যাকে উপলক্ষ করে শহরে খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে গেল ? মনে আছে বৈ কি।"

ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গ থেকে যেমন সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি, সামান্য টি-এন-টি কণিকায় যেমন বিস্ফোরণ, সে ব্যাপারটার সূচনাও তেমনি অতি সাধারণ ঘটনায়।

একটি শিশুর মৃত্যুসংবাদ। এই আধিব্যাধিপ্রপীড়িত দেশের শত সহস্র অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামে নিত্য এমন কত শিশু মরে কে তার খোঁজ রাখে ? কিন্তু এই বিশেষত্বহীন প্রাত্যহিক মৃত্যু তালিকার মধ্যে থেকে একটি ঘটনা আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে পত্রিকার প্রথম পাতায় একেবারে ডবল কলাম হেডিং নিয়ে প্রকাশিত হলো। পাঠক মহলে চাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

এসেম্বলীতে প্রশ্নোত্তরকালে বিক্ষোভের ঢেউ উঠল। একথা কি সত্য যে, রসুলপুর গ্রামে জনৈক অনাথা বিধবার একমাত্র শিশুপুত্র খাদ্যাভাবে অনাহারে মারা গেছে ? উইল দি অনারেবল চীফ মিনিস্টার বি প্লিজ্‌ড টু স্টেট—?

গভর্নমেন্ট প্রথমে অস্বীকার করলেন। পরে সাপলিমেণ্টারীর চাপে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, শিশুর বিশেষ কোনো অসুখ ছিল না। বললেন, ডাক্তারের অভিমতে যথোচিত পুষ্টির অভাবে জীবনীশক্তির হ্রাস মৃত্যুর কারণ।

এ রকম ধানাই পানাই যুক্তিতে বিরোধী দল শান্ত হয় না। তাঁরা অটপসীর রিপোর্ট দাবি করলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, জনস্বার্থের খাতিরে গভর্ণমেন্ট তা প্রকাশ করতে রাজী নন। ফলে সভাকক্ষে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল।

উত্তেজনা চরমে পৌঁছল, যখন একজন স্বতন্ত্র সদস্য অভিযোগ করলেন যে, শিশুর মৃত্যুর পরে তার মা বিন্ধ্যবাসিনীও অভাবের তাড়নায় জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। বিরোধী পক্ষের 'শেম' 'শেম' ধিক্কার ধ্বনিতে মন্ত্রীর কণ্ঠ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল।

গভর্ণমেন্টের সমর্থকেরা সংখ্যায় ভারি। তাঁরাও তারস্বরে পাল্টা অভিযোগ করতে লাগলেন—একেবারে বাজে কথা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিছক চালবাজি,—পালিটিক্যাল স্টাণ্ট।

স্পীকার শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টায় বৃথাই টেবিলে ঘন ঘন হাতুড়ির শব্দ করলেন—অর্ডার, অর্ডার।

কোথায় অর্ডার ? ডিসঅর্ডারের আর সীমা পরিসীমা রইল না। দুই পক্ষে প্রবল বাদাবিতণ্ডা, সক্রুদ্ধ চীৎকার ও সবেগে মুষ্টি আস্ফালনের মধ্যে বিরোধী পক্ষ এক যোগে ওয়াক-আউট করলেন।

ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ নয়। মনুমেণ্টের তলায় বিরাট জনসভায় বিভিন্ন বক্তা দেশের খাদ্যাভাবের জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় গভর্ণমেন্টকে বিস্তর গালাগাল দিলেন এবং আপিস ভাঙবার মুখে এসেম্বলীর দিকে বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা দ্বারা ট্রাম-বাসের রাস্তা আটক করলেন। "অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, নইলে গদী ছেড়ে দাও"

ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুহুর্মুহু বিদীর্ণ হতে লাগল।

তারপরের অধ্যায় অতি পরিচিত পুরাতন প্যাটার্নেরই পুনরাবৃত্তি। পুলিস কর্তৃক শোভাযাত্রায় বাধাদান, ইষ্টক বর্ষণ, টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ, রক্তপাত, এ্যাম্বুল্যান্স ও হাসপাতাল। পরের দিন হরতাল, ট্রামে অগ্নি-সংযোগ, পাইকারী গ্রেপ্তার এবং গুলীবর্ষণ।

মাত্র মাস দেড়েক আগেকার ঘটনা। তাছাড়া ঐ দক্ষযজ্ঞে নিজেরও কিছুটা অংশ ছিল। একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যথেষ্ট অগ্নি উদ্গিরণ করেছিলাম। সুতরাং আনুপূর্বিক সমস্তই স্মরণে ছিল।

কিন্তু তার সঙ্গে এই অর্ধউন্মাদ নারীর সম্পর্ক কোথায়?

সুধীরবাবু বললেন, "সম্পর্ক খুবই নিকট। এ মেয়েটিই বিন্ধ্যবাসিনী।"

"সে কি? বিন্ধ্যবাসিনী তবে মরেনি?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন, "না। তার ছেলের অনাহারে মৃত্যুর কথাটাও সত্যি নয়।"

"তার ছেলেও বেঁচে আছে?"

অনুরূপ সহজভাবেই সুধীরবাবু বললেন, "না, ছেলে বেঁচে নেই।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললাম, "মাফ করবেন মশাই। আমি সহজ বুদ্ধির মানুষ। হেঁয়ালির ধার ধারিনে। বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলে মরেনি, আবার বেঁচেও নেই—এ ধরণের ধাঁধায় আমি অভ্যস্ত নই। সোজা বাংলায় যদি বুঝিয়ে বলতে পারেন, শুনতে রাজী আছি। নইলে রেহাই দিন।"

তিনি তাড়াতাড়ি অপ্রতিভভাবে বললেন, "আপনি ভুল বুঝেছেন—মানে, আমিই গুছিয়ে বলতে পারিনি। কথাটা হচ্ছে যে, তার ছেলে অনাহারে মরেনি। কোনো অসুখ-বিসুখেও নয়। তাকে মেরে ফেলেছে।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকাতেই তিনি নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "হ্যাঁ, সেটা ডেথ নয়, মার্ডার।"

বিস্ময়ের যেন আর শেষ নেই।

"শিশুকে খুন করল কে? কেনই বা খুন করল?" প্রশ্ন করলাম।

সুধীরবাবু সোজাসুজি জবাব দিলেন না। বললেন, "ব্যাপারটা বিন্ধ্যবাসিনীর নিজের মুখ থেকেই শোনা। এ দু'দিনে খণ্ড খণ্ড ভাবে জেনেছি। জুড়লে যা দাঁড়ায়, তাই বলছি। গোড়া থেকেই শুনুন।"

খানিক চুপ করে থেকে ঈষৎ হেসে বললেন, "বেশী বকা মেয়েদের স্বভাব। সব বলতে গেলে আমার অনেক সময় লাগবে, আপনারও ধৈর্য থাকবে না। তাই অদরকারী অংশগুলি কেটে ছেঁটে সংক্ষিপ্ত সারটুকুই বলছি।"

বিন্ধ্যবাসিনীর মা দীর্ঘকাল নিঃসন্তান ছিলেন। পূজা-মানত, তাগা-তাবিজ ও নানাবিধ তুকতাক করে যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন বিন্ধ্যবাসিনীর জন্ম। পরিবারে বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বহু বিলম্বিত শিশুদের আদরের পরিমাণটা সাধারণতই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সেটা তাদের ভবিষ্যতের পক্ষে হিতকর নয়।

বিন্ধ্যবাসিনী তার মায়ের বক্ষের ধন, বাবার চক্ষের মণি। সে চোখের আড়াল হলে দু'জনেই পলকে প্রলয় জ্ঞান করেন। কে জানে, হয়তো এই স্নেহাধিক্যের

ফলেই বিন্ধ্যবাসিনী ছোটবেলা থেকে কোপনস্বভাব। যখন তার মুখে ভালো করে কথা ফোটেনি, তখনই সে চটে গেলে নিজের চুল টেনে ছিঁড়ত, গায়ের জামা বা মায়ের আঁচল দাঁতে কাটত। তার ঠাকুমা রগড় করে বলতেন, "এক ফোঁটা মেয়ের তেজ দেখে ভয়ে মরি। বড় হলে এ মেয়ে দেবীচৌধুরানী না হয়ে যায় না।"

মায়ের চাইতে বাপের প্রতি বিন্ধ্যবাসিনীর টানটা ছিল বেশী। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে অনেকদিন কপট কলহ ঘটেছে।

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, প্রিয়জনের উপর আপন অখণ্ড অধিকার স্থাপনের প্রয়াস নারী-চরিত্রের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। শৈশবেই, বিন্ধ্যবাসিনী বাপের উপরে নিজের দখল সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। প্রতিবেশীদের খোকা খুকুদের কাউকে তিনি কখনও কোলে নেবেন বা একটু আদর করবেন এমন সাধ্য ছিল না। এমন কি, তার মা স্বামীর সঙ্গে একান্তে হাসি গল্প করলেও তার মুখ ভার ও চোখ ছল ছল হতো।

ক্ষুদ্র বালিকার এই প্রবল ঈর্ষাকাতরতা আত্মীয় পরিজনের কাছে কৌতুকের বিষয় ছিল। তার মা অনেক সময় ক্রোধের ভান করে মেয়েকে বলেছেন, "হিংসুটে মেয়ের কাণ্ডখানা দেখ একবার। বলি, ও বাপ-সোহাগী, তোমার বাবার উপর আমারও কিছুটা দাবি আছে যে। সে খবর রাখ কি ?"

স্কুলে বিন্ধ্যবাসিনীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল পার্বতী। সে বিন্ধ্যবাসিনীর হোমটাস্কের অঙ্ক কষে দেয়, সেলাই-এর পরীক্ষার জন্য রুমালে ফুল তুলে রাখে। বিন্ধ্যবাসিনীও আমচুরের অর্ধেক বা নারিকেল-তক্তির ভাগ পার্বতীকে না দিয়ে খায় না। তারা এক সঙ্গে বেড়ায়, এক সঙ্গে খেলে, এক সঙ্গে গল্প করতে করতে স্কুলের শেষে বাড়ি ফিরে আসে। অপরিণতবয়স্কা দুই কিশোরীর এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পাড়ার বয়স্কা গৃহিনীরা ঠাট্টা করে তাদের নতুন নাম দিয়েছেন—গঙ্গা-যমুনা।

এই নিবিড় সখীত্বের সুখ-স্বর্গে একদিন মূর্তিমতী বিঘ্নের মতো দেখা দিল মালতী—বিন্ধ্যবাসিনীদের ক্লাসে শহর থেকে নবাগত ছাত্রী। বয়সে সে বিন্ধ্যবাসিনীর চাইতে দু'তিন বছরের বড়ই হবে। তার নিজের রূপ ও বাবার অর্থ দুই-ই সাধারণের চাইতে বেশী। সে ফুলেল তেল মাখে, চিত্রবিচিত্র ফ্রক পরে, কথায় কথায় কলকাতার চিড়িয়াখানা বা মোটর গাড়ির গল্প শুনিয়ে সরলচিত্ত সহপাঠিনীদের তাক লাগিয়ে দেয়। স্কুলের অন্য মেয়েরা তার সঙ্গে ভাব জমাতে ব্যগ্র। শিক্ষয়িত্রী দিদিমণিরাও বুঝি তাকে একটু বেশী খাতির করেন।

সে-দিন স্কুলে পৌঁছুতে বিন্ধ্যবাসিনীর একটু দেরী হয়েছিল। ক্লাশে ঢুকতেই দেখল, মালতী পার্বতীর পাশে বসে আছে। বিন্ধ্যবাসিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে বসেছ কেন ?"

মালতী উদ্ধত কণ্ঠে জবাব দিল, "বসেছি আমার ইচ্ছে। তোমার তাতে কী ?"

বিন্ধ্যবাসিনী দৃঢ়স্বরে বলল, "এটা আমার সীট।"

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। পার্বতী ও বিন্ধ্যবাসিনী বরাবর একই বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে, সে কথা ক্লাশের সবাই জানে। কিন্তু কনভেনশান তো আছে শুধু দুর্বলের জন্যে, প্রবলেরা চিরকালই তা যদৃচ্ছ লঙ্ঘন করে থাকে। শুধু রাষ্ট্রনীতিতে নয়,—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও। মালতী বিন্ধ্যবাসিনীর সর্বজনস্বীকৃত দাবি হেলায় উপেক্ষা করল। "তোমার সীট মানে ? নাম লেখা আছে কোথাও ?

টাকা দিয়ে কিনে রেখেছ বুঝি ?" ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করল সে।

বই, খাতার মতো নাম লেখা না থাকলেই যে ক্লাশে বসার জায়গাটাও অন্য কেউ দাবী করতে পারে, সে কথা বিন্ধ্যবাসিনী কখনও ভাবেনি এবং অর্থ দ্বারা ক্রয় না করলে কোনো জিনিসে কারো নিশ্চিত অধিকার জন্মে কিনা সে সম্পর্কেও তার মনে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন জাগেনি।

সে মালতীর কথার জবাব না দিয়ে আদেশের স্বরে বলল, "এখান থেকে উঠে যাও বলছি, নইলে ভালো হবে না।"

"ইস, হুকুম শোনো মেয়ের ! উঠব না তো, দেখি, কী করতে পার ?" যুদ্ধের ভঙ্গিতে বলল মালতী।

রাগে বিন্ধ্যবাসিনী টান মেরে মালতীর বই পত্র মাটিতে ফেলে দিল।

মালতী সহজে হঠবার পাত্রী নয়। সে তৎক্ষণাৎ ঠাস করে বিন্ধবাসিনীর গালে এক চড় বসিয়ে দিল।

বিন্ধ্যবাসিনীর তখন আর স্থান-কাল বোধ রইল না। সে মালতীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সম্মুখের বারান্দা দিয়ে হেডমিস্ট্রেস যাচ্ছিলেন। অন্য মেয়েদের চেঁচামেচিতে ক্লাশে ঢুকে তিনি যুদ্ধরত দুই পক্ষকে থামিয়ে দিলেন। বিন্ধ্যবাসিনীই আগে বলপ্রয়োগ করেছে। বিচারে তার শাস্তি হলো। হুকুম দিলেন, বিন্ধ্যবাসিনী অন্য বেঞ্চিতে বসবে। মালতী দর্পভরে পার্বতীর পাশে বিন্ধ্যবাসিনীর এতদিনের অবিসংবাদিত আসনে উন্নতশির জয়ধ্বজার মতো সদর্পে বিরাজ করতে লাগল।

তখন বিন্ধ্যবাসিনীর সমস্ত রাগটা পড়ল পার্বতীর উপরে। মালতীকে সে তার পাশে বসতে দিল কেন ? কেন সে তাকে বাধা দিল না ? এখনই বা সে ঐ কুচক্রী ডাইনীটার সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসে আছে কোন লজ্জায় ? সে উঠে চলে আসতে পারে না বিন্ধ্যবাসিনীর পাশে ? তাকে কি কেউ পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছে ?

ছুটির শেষে বিন্ধ্যবাসিনী পার্বতীর দিকে না তাকিয়ে হন হন করে হেঁটে একা বাড়ি চলে এল। অন্যদিনের মতো বিকেলে পার্বতী যখন তাকে খেলায় ডাকতে এল, বিন্ধ্যবাসিনী তখন মুখ ফিরিয়ে রইল। পার্বতী অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তার প্রসন্নতা লাভ করতে পারল না।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর রোষ দূর হয়ে গেল। বন্ধুকে যে সে অযথা লাঞ্ছনা দিয়েছে, তার সমস্ত অনুনয় অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছে, সে কথা স্মরণ করে বিন্ধ্যবাসিনীর মন খচ খচ করতে লাগল। রাত্রির বাধা না থাকলে বিন্ধ্যবাসিনী সেই দণ্ডে পার্বতীর কাছে গিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে নিতে প্রস্তুত ছিল।

পরদিন সকালে বিন্ধ্যবাসিনী অনেক আগে স্কুলে গেল। তার নতুন নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসে পার্বতীর আসার অপেক্ষায় রইল।

ক্লাসের ঘণ্টা বাজবার মিনিট কয়েক মাত্র আগে পার্বতী এল। তার সঙ্গে কে ? বিন্ধ্যবাসিনী চোখে ভুল দেখছে কি ? না, ভুল দেখার জো কোথায় ? এ তো মালতী। তারা দুজনে এক সঙ্গে এসেছে। পার্বতী কোনোদিকে না তাকিয়ে তার নিজের পুরানো স্থানটিতে গিয়ে বসল। মালতী বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতি একটা কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গর্বভরে তারই পাশের জায়গাটি দখল করল।

প্রকৃত তথ্য এই যে, পার্বতীও বিন্ধ্যবাসিনীর মন ফিরে পাওয়ার জন্য কম ব্যগ্র

ছিল না। সেদিন সে নিজে থেকেই বিন্ধ্যবাসিনীর পাশে গিয়ে বসবে, এই সংকল্প নিয়ে স্কুলে এসেছিল। কিন্তু মালতী যে বিন্ধ্যবাসিনীকে জব্দ করার মতলবে স্কুলের দরজায় তার জন্যে প্রায় ওঁৎ পেতে বসে ছিল তা তার জানা ছিল না। মালতী পার্বতীকে গ্রেপ্তার করা আসামীর মতো হাত ধরে ক্লাশে নিয়ে এসে নিজের পাশে বসালো।

পার্বতী মেয়েটি শান্ত নিরীহ ধরণের। প্রভুত্বপরায়ণা বিন্ধ্যবাসিনীর বন্ধুত্বের অনেক অত্যাচার সে নির্বিবাদে মেনে নিত। কোনো কিছু অপছন্দ করলেও মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে না। সেদিক দিয়ে সে বিন্ধ্যবাসিনীর ঠিক বিপরীত। মালতীর জুলুমে বিরক্ত হলেও তাকে অগ্রাহ্য করার মতো জোর পার্বতীর স্বভাবে ছিল না। বিন্ধ্যবাসিনীর অসন্তুষ্টি কল্পনা করে সে তার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারল না। তাকে না দেখার ভান করে বিরসচিত্তে মালতির পাশে বসে ক্লাশের পড়া পড়তে লাগল।

ক্লাশের অপর প্রান্তে বসে বিন্ধ্যবাসিনী নিস্ফল ক্রোধের দুঃসহ আবেগে পীড়িত হতে লাগল। পার্বতী যে নিজে ইচ্ছা করেই মালতীর পাশে বসেছে, সে বিষয়ে তার মনে কোনো সংশয় রইল না। মালতীর সঙ্গে ভাব করতেই সে ব্যগ্র, বিন্ধ্যবাসিনীকে তার কোনো প্রয়োজন নেই এ ভাবনায় তার বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকল। গত রাত্রিতে পার্বতীকে নির্দোষ কল্পনা করে আজ যে এতক্ষণ তার জন্যে সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সে শুধু তার নিজের নির্বুদ্ধিতা। পার্বতীর জন্য বাগান থেকে অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সে পেয়ারা সংগ্রহ করে এনেছিল। সেগুলি বরং তার পরম শত্রু অংকের মাস্টারনীকে দিতে রাজী আছে। কিন্তু পার্বতীকে কদাচ নয়।

বাড়ি ফিরে গিয়ে সে তার টিনের বাক্সটিতে সযত্নে সঞ্চিত পার্বতীর দেওয়া পুঁতির মালা, চুলের ক্লিপ, কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি উপহার দূর করে ফেলে দিল। রাগে, দুঃখে ও অপমানে তার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ধীরে ধীরে নতুন সঙ্গিনী মালতীর সঙ্গে পার্বতীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বিন্ধ্যবাসিনীর মন ফিরে পেতে পার্বতী এখন আর তেমন উৎসুক নয়। বিন্ধ্যবাসিনীর ক্রোধকে পার্বতী ভয় করতো। একবার রাগলে সে যে কোনো সমবয়স্কা মেয়েকে ধরে তার কপালটা দেওয়ালে ঠুকে দিতে পারে, সে অভিজ্ঞতা পার্বতীর ছিল। কিন্তু এবার সে অবাক হয়ে দেখল, বিন্ধ্যবাসিনী ঝগড়া, মারামারি কিছুই করল না; শুধু কথা বলা বন্ধ করে গম্ভীর হয়ে রইল। পার্বতী নিশ্চিন্ত হল। মালতীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বে আর কোনো দ্বিধা রইল না। তাকে দোষ দেওয়া চলে না। মালতীর দেওয়ার হাতটা দরাজ, দানের সামগ্রীগুলিও লোভনীয়। নানা রঙের লজেন্স ও নানা স্বাদের চকোলেটের কাছে সামান্য আমসত্ব ও কুলের আচারের আকর্ষণ কতদিন টিকতে পারে? বেচারী বিন্ধ্যবাসিনী।

শুধু কেক, বিস্কুট বা টফির প্রাচুর্যই নয়, মালতীর অন্য উপহারগুলিও যে-কোন সহপাঠিনীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে সক্ষম। বিন্ধ্যবাসিনী লক্ষ করল, পার্বতী নতুন ধরণে চুল বেঁধে এসেছে। কেশচর্চার এ ফ্যাশানটা কার অনুকরণ তা বুঝতে বাকী থাকে না। স্কুলের অন্য মেয়েদের মা-মাসিরা জবজবে তেল মাখা চুল কষে

টেনে খোঁপা বেঁধে দেয়। নেহাতই যে শৌখিন, সে তারই উপরে বড় জোর একখানা মোষের শিং-এর চিরুনি চড়ায়। মালতীর রকম আলাদা। সে ঘাড়ের কাছে রঙিন ফিতা ফুলের আকারে গেরো দিয়ে চুলগুলিকে সাপের মতো পিছনে ঝুলিয়ে দেয়। তার নাম বুঝি "পনি-টেল।" আহা ছিরি দেখে মরে যাই যেন! নির্লজ্জ পার্বতীটাও ঐ ঢং নকল করেছে থেকেই কদিন দেখে বিন্ধ্যবাসিনী মনে মনে গর্জাচ্ছিল। আজ তার উপরে চুলে জড়ানো নীল রিবনটা দেখামাত্র বিন্ধ্যবাসিনীর সর্বাঙ্গে যেন আগুনের জ্বালা ধরে গেল। মাথায় খুন চাপল।

সে তড়িৎবেগে সেলাই-এর বাক্স থেকে কাঁচিটা বের করে পার্বতীর দিকে ছুটে গেল। পার্বতী ডেস্কের উপরে ঘাড় হেঁট করে খাতায় নোট লিখছিল। মুখ তুলে তাকাবার অবকাশমাত্র পেল না। বিন্ধ্যবাসিনী নিমেষে তার চুলের মধ্যে ঘ্যাচ ঘ্যাচ শব্দে কাঁচি চালিয়ে দিল। গুচ্ছ গুচ্ছ ঘন কালো চুলের রাশি মেজেতে ছড়িয়ে পড়ল।

পার্বতীর দীর্ঘ চুলের সৌন্দর্য স্কুলে বিখ্যাত ছিল। মুহূর্তের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শোকে পার্বতী ডুকরে কাঁদতে লাগল।

সামান্য একটা সিল্কের সরু রঙিন ফালি কেন যে বিন্ধ্যবাসিনীকে এমন দুর্জয় ক্রোধে আত্মহারা করল, তার ব্যাখ্যা একমাত্র সাইকো-অ্যানালিস্টেরাই জানেন। ইউনিয়ন জ্যাক যেমন ব্রিটিশ অধিকার বোঝায় বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে ঐ ফিতাটা কি তেমনি পার্বতীর উপরে মালতীর পরিপূর্ণ দখলের ইঙ্গিত বহন করেছে? কে জানে?

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে কান ধরে স্কুল থেকে দূর করে দিলেন। অন্য মেয়েরা সবাই তাকে দুয়ো দিল। বাড়ীতেও তার দণ্ড বিধান কম হলো না। কিন্তু অপরাধিনীকে কিছুমাত্র অনুতপ্ত দেখা গেল না। বরং পার্বতীকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারার আনন্দে সে নিজের সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অনায়াসে অগ্রাহ্য করল। পার্বতীর মাথাটা প্রায় কেশশূন্য হয়ে গেছে। একমাস, দু'মাস, কিংবা তার চাইতেও বেশী, অনেক, অনেক দিন সে আর মালতীর দেওয়া রিবন বাঁধতে পারবে না, একথা কল্পনা করে বিন্ধ্যবাসিনী গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করল।

বিয়ের পর বিন্ধ্যবাসিনী যখন স্বামীর ঘর করতে এল, তখন সে যৌবনে পরিপূর্ণা ষোড়শী। সে বয়সে চপলতা থাকে না; অধিকার স্পৃহা প্রখর হয়। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীকে সাত পাকে বাঁধল—আক্ষরিক এবং সাঙ্কেতিক উভয় অর্থে।

স্বামীর সেবা যত্নে তার ক্লান্তি নেই। যখন যে জিনিষটি চাই হাতের কাছে আগে ভাগে এগিয়ে রাখে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে অর্থস্বচ্ছলতা পরিমিত। কিন্তু নিপুণ গৃহিনীপনায় বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি থাকতে দেয় না। প্রীতি দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে ছোট খাটো অভাবের ফাঁকগুলিকে সুধায় ভরে দেয়।

স্বামী গোকুল মিশুকে প্রকৃতির লোক। গ্রামের সবাই তাকে পছন্দ করে। সবার ঘরেই তার সমান সমাদর। আশ্চর্য এই যে, স্বামীর লোকপ্রিয়তায় বিন্ধ্যবাসিনী খুশি হয় না। কাব্য করে বলা যেতে পারে, গোকুল শুধু স্ত্রীর ভালোবাসার দ্যুতিতে একক চন্দ্রমার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, পাইকারী হৃদ্যতার

ভিড়ে অনন্ত আকাশে লক্ষ কোটি তারকার মতো হারিয়ে যাবে না,—বিন্ধ্যবাসিনীর এই অভিলাষ। গদ্যের ভাষায় ফলটা দাঁড়াল এই যে, বধূ বিন্ধ্যবাসিনী ঘরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই গোকুলের দাওয়ায় বহুদিনের পুরানো দৈনন্দিন তাসের আড্ডাটি উঠে গেল। সমবয়সী বন্ধুদের কাছে মনসা-সংক্রান্তিতে—নৌকা-বাইচে এবং শিবরাত্রিতে গাজনের মেলায় গোকুলের সঙ্গ ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠল।

সেবার বারোয়ারীতলায় গ্রামের ছেলেরা থিয়েটারের আয়োজন করল। তাতে গোকুল অভিমন্যু সাজল। দেখে সবাই ধন্য ধন্য করল। শুধু বিন্ধ্যবাসিনী নীরব রইল। উত্তরা কে সেজেছে তা সে জানে না। কিন্তু ও যে নাকী সুরে 'নাথ' 'নাথ' বলে গোকুলের গায়ে ঢলে পড়ছে সেটা তার কাছে অতিরিক্ত বেহায়াপনা মনে হল। গোকুলেরই বা এত আদিখ্যেতা কেন? এ্যাক্টো করছ, কর। তা' বলে অত 'প্রাণেশ্বরী' বলে চেঁচাবার কি দরকার রে বাপু?

বিন্ধ্যবাসিনী নির্বোধ নয়। সখের দলে ব্যাটাছেলেরাই পরচুল মাথায় পরে মেয়ের অভিনয় করে, সে কথা সে জানে। অথচ স্বামীর পাশে গোঁফ-দাঁড়ি কামানো মুখে খড়িমাখা উত্তরাকে দেখলেই বিন্ধ্যবাসিনীর মন বিরস হয়। স্বামীর থিয়েটার করায় সে আপত্তি করতে লাগল।

প্রথম অভিনয়ে প্রচুর হাততালির স্বাদ পেয়ে গোকুলের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী নাটকে নায়কের পার্ট করার জন্য তার মন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। কিন্তু রিহার্সেলে যাওয়ার সময়টাতে বিন্ধ্যবাসিনী মাথাধরার ভান করে এমন কান্নাকাটি সুরু করে যে, গোকুল বেচারী আর বাড়ির বাইরে যেতে ভরসা পায় না।

গোকুল মানুষটা শান্তিপ্রিয়। ঝগড়া বিবাদকে সে অত্যন্ত ভয় করে। তাই ক্ষুণ্ণচিত্তে সে ধীরে ধীরে খেলাধুলা, বন্ধু-বান্ধব, আমোদ-প্রমোদ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর নিশ্ছিদ্র একাধিপত্যের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল। বিন্ধ্যবাসিনীর বছর দুই সুখেই কাটল।

শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, সংসারে কিছুই একটানা দীর্ঘস্থায়ী নয়। সবই চাকার মতো ঘুরছে। সুখানি চ, দুঃখানি চ। বিন্ধ্যবাসিনী তা জানত কি?

অল্প বয়সেই গোকুলের একমাত্র ছোটবোন সুভদ্রার স্বামী মারা গেল। দু'দিন বাদেই দেওরেরা সুভদ্রার গয়না ও টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। নিরুপায় বিধবা ভাই-এর সংসারে ফিরে এল।

সুভদ্রা বিন্ধ্যবাসিনীর চাইতে বয়সে অনেক ছোট। অত্যন্ত ভীরু-স্বভাব। ভাই-এর গলগ্রহ হয়েছে বলে তার কুন্ঠার সীমা নেই। সংসারের সমস্ত কাজের বোঝা সে মাথায় তুলে নিল। রান্না করা, ঘর নিকানো, কাপড় কাচা, মায় গোয়ালে গরুকে জাবনা দেওয়া, ক্ষেতের ধান ঝেড়ে মেপে মরাইতে তোলা সবই নিজে করে। বিন্ধ্যবাসিনীকে কুটোটি নাড়তে দেয় না। এমন মেয়েকে ভালো না বেসে পারা যায় না। বিন্ধ্যবাসিনীর মনে সত্যিকার করুণা হয়। আহা, দুঃখিনীর আর কোথাও ঠাঁই নেই। একবেলা দুমুঠো ভাতে ভাত দেওয়া বইতো নয়।

গোকুল স্বভাবতই স্নেহপ্রবণ। বোনকে সে বরাবরই ভালোবাসতো। তার দুর্ভাগ্যে তার প্রতি স্নেহটা আরও বেড়েছে। সে তার জন্যে মাঝে মাঝে একটু দই, পাটালি বা তিলের বরফি কিনে আনে। কখন কী খেল তার খোঁজ খবর নেয়।

বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে সেটা অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি মনে হয়। ভাবখানা দেখ একবার। সে যেন গোকুলের বোনকে না খাইয়ে রেখেছে। বাস্তবিক বিন্ধ্যবাসিনী সুভদ্রার খাওয়া-দাওয়ার যথেষ্ট যত্ন নেয়। রাত্রিতে বিধবার ভাত খেতে নেই। বাগানের কলাটা, শশাটা বিন্ধ্যবাসিনী তারই জন্যে তুলে রাখে। একাদশীর দিনে নিজের দুধটুকু জোর করেই সুভদ্রার বাটিতে ঢেলে দেয়। কচি মেয়েটা নির্জলা উপবাস দিতে পারে কি?

বৌঠানকে সুভদ্রা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কখনও সে তাকে আদর করে। স্নেহের স্বরে বলে, "ও সুবি, দু'দণ্ড বসে একটু জিরিয়ে নে দিকিন। মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে গেছে। তোকে এখন ঐ চাকি-বেলুন নিয়ে পড়তে হবে না। রুটি ক'খানা আমি নিজেই করে নেবো 'খন।"

আবার তার পরমুহূর্তেই গোকুল যদি তাকে ডেকে দুটো কথা বলেছে তো অমনি বিন্ধ্যবাসিনীর অন্য মূর্তি। মুখ ভার করে তিক্তস্বরে বলে, "বসে বসে ভাই-এর সোহাগ কুড়ানো হচ্ছে। ওদিকে উননে দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে, তার হুঁস নেই।" সুভদ্রা অনেক আগেই দুধের কড়া নামিয়ে সরা ঢাকা দিয়ে তুলে রেখেছিল। সেটা কখন আবার কী করে যে উননে উঠল ভেবে পায় না।

তবে এইটুকু বুঝতে বাকী থাকে না যে, দাদার কাছে বেশী ঘেঁষাটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। গোকুল ডাকলেও এখন সে কাজের ছুতো করে তাকে এড়িয়ে চলে।

স্ত্রীর আচরণ গোকুলের কাছেও হতবুদ্ধিকর। বিন্ধ্যবাসিনী দয়ামায়াহীন নয়। গ্রামের দুঃস্থ দরিদ্রের অনেককেই সে সাধ্যমত সাহায্য করে, সে তো গোকুল নিজের চোখেই দেখেছে। অনাথা ননদিনীর প্রতি তার বিরূপতার গোকুল কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না।

একই সঙ্গে শ্যাম এবং কুল বজায় রাখা কঠিন কাজ, সেকথা গোকুল শুনেছে। বউ ও বোনকে একই বাড়ীতে রাখা তার কাছে কঠিনতর মনে হল। অবশেষে বোনকে আবার তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসাই স্থির করল।

সেদিন সকালেই তাকে কেন্দ্র করে স্বামীস্ত্রীতে এক পালা কথা কাটা-কাটি হয়েছিল। তাই যাওয়ার আগে সুভদ্রা যখন বৌঠানকে প্রণাম করতে গেল, বিন্ধ্যবাসিনী মুখ গম্ভীর করে রইল। কিন্তু সে যখন তার শাড়ি দু'খানা, জল-খাওয়ার পাথরের ছোট ঘটিটি, একখানা রাধাকৃষ্ণের পট ও অনুরূপ দু'একটা অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তির সামান্য পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে গেল, বিন্ধ্যবাসিনীর বুকে ব্যথা বাজল।

বিন্ধ্যবাসিনী সুভদ্রাকে একটি ছোট টিনের বাক্স দিয়েছিল। তার পরিত্যক্ত ঘরটিতে গিয়ে দেখল সেটি কুলুঙ্গির উপরে ঠিক তেমনি রয়েছে। বিন্ধ্যবাসিনী বাক্সের ডালাটি তুলে দেখল, গুটি দুই সুতী জামা, কাঠের ফ্রেমে আঁটা ছোট একটি আরসি, একটি পশমের জীর্ণ আলোয়ান এবং একটি ছোট কৌটায় কয়েক আনা ও পয়সা মিলিয়ে দু'টাকার কাছাকাছি অর্থ পড়ে আছে। জিনিষগুলি বিন্ধ্যবাসিনীরই নানা সময়ের দান। সুভদ্রা কিছুই নিয়ে যায়নি, ফেলে রেখে গেছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর অশ্রু আর বাধা মানল না। অকারণ বৈরিতায় যে নিরাশ্রয় বিধবাকে সে এ-বাড়িতে তিষ্ঠতে দেয়নি তারই বিচ্ছেদ বেদনায় মেজেতে বসে সে ফুলে

ফুলে কাঁদতে লাগল।

আগুনের মতো অসুবিধাজনক খবরগুলিও কিছুতেই চাপা থাকে না। শারদীয় পুজা আসন্ন। বিন্ধ্যবাসিনী সুভদ্রার জন্য একজোড়া থান, কিছুটা আখের গুড়, নিজের গাছের গুটি কয়েক পেঁপে ও পাঁচটি টাকা গুছিয়ে রেখেছিল। দত্তদের বাড়ির একটি ছেলের হাতে পাঠাবে। সেখানেই কথাটা শুনে এল। সুভদ্রার হৃদয়হীন দেওরেরা হঠাৎ কেন যে বিধবা ভ্রাতৃবধূকে আবার বাড়িতে স্থান দিতে রাজী হয়েছে উদারতার রহস্য এতদিনে উদ্ঘাটিত হল। স্ত্রীকে লুকিয়ে গোকুল তাদের হাতে নগদ একশ টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছে।

গোকুল গোড়াতে প্রতিবাদ করল। শেষটায় বলল, একশ' নয়; নব্বুই। জানাল, টাকাটা সুভদ্রার স্বামীর। মৃত্যুর আগে গোকুলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

জগতে স্বামী মাত্রেই জানেন যে, স্ত্রীর কাছে সময় বিশেষে দু' একটা মিথ্যা কথা না বলে সংসারে বাস করা দুরূহ। কিন্তু ধরা পড়লে যে আর রক্ষা থাকে না,সে-কথাও তাঁদের অবিদিত নেই। গোকুল যে মহাজনের কাছে জমি জমা বন্ধক রেখে চড়া সুদে ধার করেছিল সে গুপ্ত খবরটুকু বিন্ধ্যবাসিনীর অগোচর ছিল না। সে দু'চক্ষে ঘৃণা বর্ষণ করে স্বামীকে মিথ্যাবাদী বলে গাল দিল।

গোকুলের মনে অনেক দিনের বিক্ষোভ জমা ছিল। নদীর মতো সহিষ্ণুতার বাঁধ একবার ভাঙলে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত। সে উদ্ধত কণ্ঠে বলল, "আমার জমি আমি বাঁধা দিয়েছি। বেশ করেছি।"

স্বামীর এমন প্রকাশ্য বিদ্রোহ বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রাগে তার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। প্রায় চীৎকার করে বলল, "জমি তোমার? তুমি ইচ্ছামতো তছনছ করবে ভেবেছ? শেষে আমার ছেলের হাত ধরে পথে পথে আমি ভীক্ষা করে খাই—এই তোমার মনের বাসনা? বেশ তো। তোমার আদরের বোনকে নিয়ে এসে ঘর সংসার চালাও। আমি যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।"

গোকুলেরও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে আরও বেশী চেঁচিয়ে বলল, "তুমি যাবে কেন? আমিই চলে যাচ্ছি। এ অশান্তির পুরীতে আর এক মুহূর্ত নয়।" দড়ির আলনায় হাতের কাছে যে জামাটা ঝুলছিল তাই টেনে নিয়ে গোকূল ঝড়ের বেগে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভেবেছিল, স্বামী বড় জোর দু'চার দিন বন্ধুবান্ধবের বাড়ি কাটিয়ে রাগ পড়লে আপনি ঘরে ফিরে আসবে। দিনের পর মাস কেটে গেল। মাসের পর বছর। গোকুল ফিরল না। কেউ বলল, সে অঘোর অধিকারীর যাত্রাদলে নলরাজার পার্ট করছে। কেউ বলল, সে শহরের চটকলে দিন মজুরী খাটছে। কেউবা বলল, সে বাবুগঞ্জের হাটে মুগ-মুসুরের কিস্তি নিয়ে যাচ্ছিল, নৌকাডুবিতে মারা গেছে।

স্বামী বিরহিতা বিন্ধ্যবাসিনীরও দিন কাটে। সঙ্গহীন, শান্তিহীন জীবন যখন দুর্বিষহ মনে হয়, একমাত্র শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে অশ্রু মোচন করে।

পৃথিবীতে শোকের যদি বা শেষ আছে, দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। বর্ষার শেষে গ্রামে ম্যালেরিয়ার মড়ক লেগেছিল। বিন্ধ্যবাসিনীও শয্যা নিল।

হঠাৎ একদিন ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই চোখ চেয়ে বিন্ধ্যবাসিনী দেখল, সুভদ্রা।

হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিচ্ছে। সে বিন্ধ্যবাসিনীর অসুখের খবর পেয়েছিল কিংবা শ্বশুরবাড়ি অসহ্য হওয়াতে পালিয়ে এসেছে তা সে-ই জানে।

বিন্ধ্যবাসিনী সজল চক্ষে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার অসন্তোষের ভয়েই সুভদ্রাকে একদিন চলে যেতে হয়েছিল, সে অনুশোচনায় বিন্ধ্যবাসিনীর হৃদয় ভারাক্রান্ত। তার জন্যেই ভাই নিরুদ্দেশ এ ভাবনায় সুভদ্রার মন অপরাধী। অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে দুই অনুতপ্তা নারীর পুনর্মিলন ঘটল।

সুভদ্রা ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়ায়, সাবু জাল দিয়ে পথ্য তৈরী করে; রাত জেগে বিন্ধ্যবাসিনীর শিয়রে বসে হাওয়া করে বা সোরাই-এর ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে জ্বরতপ্ত কপাল মুছে দেয়।

মায়ের চেয়ে ছেলে পরিচর্যাটা সর্বক্ষণের। দুরন্ত শিশুর আব্দার অসংখ্য। তাকে সামলাতেই সুভদ্রার দিনের বেশীর ভাগ সময় কেটে যায়।

দুর্ভাগারা চিরকালই দীর্ঘজীবী। তা নইলে দুঃখ কষ্ট সইবে কে? হতভাগিনী বিন্ধ্যবাসিনীও ছ' সাত মাস যমে মানুষে টানাটানির পরে সেরে উঠল। সুভদ্রার চিবুক ধরে বিন্ধ্যবাসিনী সস্নেহ কণ্ঠে বলল, "খোকনকে আজ আমার বিছানায়ই শুইয়ে দিস। ও যে তোকে রাত্তিরেও ঘুমুতে দেয় না।"

খোকনের সে-প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি দেখা গেল। সে তার ঝাঁকড়া চুলভরা ছোট্ট মাথাটি নেড়ে জানিয়ে দিল, "পিসির কাছে ঘুমুবো।"

শুনে বিন্ধ্যবাসিনী ও সুভদ্রা দু'জনেই হাসল।

হায়, হাসিটা বেশী দিন স্থায়ী হলো না।

মায়ের চাইতে মাসির দরদটা চিরকালই হাস্যকর। দেখা গেল পিসির প্রতি বেশী অনুরাগটাও গৃহে শান্তির পক্ষে অনুকূল নয়। বিন্ধ্যবাসিনীর পুত্রগত প্রাণ। এতদিন অসুখে নিজের শক্তি ছিল না; তাকে দূরে রাখতে হয়েছে। এখন একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই ছেলেকে সর্বক্ষণ নিজের কাছে রাখতে ব্যাকুল হল।

বিন্ধ্যবাসিনীর স্নেহ অধিক; ধৈর্য পরিমিত। সুভদ্রা শিশুর সমস্ত দৌরাত্ম্য হাসি-মুখে সহ্য করে। আশ্চর্য নয় যে, মায়ের চাইতে পিসির সঙ্গে তার ভাব বেশী। সেটা বিন্ধ্যবাসিনীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়।

বিন্ধ্যবাসিনী ছেলেকে খাওয়াতে বসেছিল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে দু' গ্রাস গেলাতে পারল না। শিশু খাবার ছড়িয়ে, ফেলে একাকার করল। বিন্ধ্যবাসিনী ক্লান্ত হয়ে হার মানল। সুভদ্রা এসে কাক দেখিয়ে, চিল দেখিয়ে, টুনটুনির গল্প বলে অনায়াসে খাইয়ে দিল। বিন্ধ্যবাসিনী ছেলেকে স্নান করাতে গেলে সে ছুটে পালায়, ঘুম পাড়াতে গেলে দস্যিপনা শুরু করে। সুভদ্রার হাতে সেগুলি নিরুপদ্রবে নিষ্পন্ন হয়।

দিনে দিনে বিন্ধ্যবাসিনীর মন তিক্ততায় ছেয়ে যায়। সুভদ্রা দেখে, বিন্ধ্যবাসিনী আজকাল অকারণে রেগে যায়, অনর্থক বকুনি দেয়, খামকা গুম হয়ে বসে থাকে। বৌঠানের এ চেহারার সঙ্গে অতীতে তার নিষ্ঠুর পরিচয় ঘটেছিল। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কাঁপতে থাকে।

শঙ্কাটা উভয়তঃ। বিন্ধ্যবাসিনীর মনে পড়ল, সুভদ্রাই তার জীবনের দুষ্টগ্রহ, ভাগ্যাকাশে শনি। সে যতদিন আসেনি গোকুলের সঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর বিরোধ ছিল

না। তারই জন্য সে স্বামী খুইয়েছে। তার কাছে কি বিন্ধ্যবাসিনীর শেষ অবলম্বন ছেলেকেও হারাতে হবে? ভাবতেই বিন্ধ্যবাসিনী শিউরে উঠল।

পুরানো শাড়ীর পাড় থেকে সুতো খুলে খুলে সুভদ্রা নিজের ঘরে কাঁথা সেলাই করছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলে পাশে বসে খেলছে। হঠাৎ তার কী খেয়াল হল। বায়না ধরল বেড়াতে যাবে। শিশুকে ভোলাতে তার কথায় সায় দিতে হয়। সুভদ্রা বলল, "যাবে বৈ কি। মা এখন ঘুমুচ্ছে। মা ঘুম থেকে উঠলে আমরা সবাই বেড়াতে যাব। খোকন যাবে, মা যাবে, আমি যাব।"

খোকন বাধা দিয়ে বলল, "না মা যাবে না।"

সুভদ্রা বলল, "মা না গেলে, খোকনকে কোলে নেবে কে?"

সে-টা খোকনের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। সে প্রশ্নের জবাবও তাকে ভাবতে হয় না। সে নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিল, "তুমি কোলে নেবে।"

সুভদ্রা বলল, "বেশ, আমিই খোকনকে কোলে নেব। কিন্তু মাকে সঙ্গে না নিলে মা কাঁদবে যে।"

জননীর ক্রন্দন সম্ভাবনায় শিশুপুত্রকে কিছুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না। সে তার পূর্ব সংকল্পে অটল রইল। বলল, "না, মা যাবে না। মা আমাকে মেরেছে।"

কথাটা অতিরঞ্জিত। সকাল বেলা সে মায়ের ওষুধের শিশিটা নিয়ে খেলা করছিল। মা দেখতে পেয়ে তা হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল মাত্র। শিশুর মন থেকে সে ক্ষোভ দূর হয়নি।

সুভদ্রা বলল, "ওমা, তাই নাকি। তবে তো মাকে কিছুতেই সঙ্গে নেওয়া হবে না। মাকে খুব বকে দিতে হবে। মা বড্ড মন্দ, বড্ড দুষ্টু।"

বিন্ধ্যবাসিনী দোরের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্তই শুনছিল। শেষ কথাটা কানে যেতেই একেবারে যেন ক্ষেপে গেল। মা মন্দ, মা দুষ্টু! এ সব জপিয়েই যে সুভদ্রা ছেলেকে তার কাছে পর করে দিচ্ছে সে বিষয়ে তার মনে সন্দেহ রইল না। সুভদ্রার সেবা, যত্ন, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সমস্তই একটা বিরাট ছলনা মনে হল। বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলের উপরেই সুভদ্রার লোভ। তাকে কেড়ে নেওয়ার জন্যেই মায়াবিনী তার স্নেহের মায়াজাল পেতেছে। নইলে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে সে আবার এখানে আসবে কেন? বিন্ধ্যবাসিনী বোকা, তাই এতদিন বুঝতে পারেনি। সে প্রতিজ্ঞা করল, রাক্ষসীকে আর এক দণ্ড এখানে থাকতে দেওয়া নয়।

হতচকিত সুভদ্রা বুঝতে পারল না, কোথায় কখন তার কী অপরাধ ঘটেছে। সে কাঁদতে লাগল। মেয়েদের চোখে জল দেখলে পুরুষের হৃদয় গলে যায়; স্ত্রীলোকের মন আরও শক্ত হয়ে ওঠে। সুভদ্রার অশ্রুকাতর প্রার্থনায় বিন্ধ্যবাসিনী কিছুমাত্র নরম হল না। তাকে বাড়ি থেকে দূর করে না দিয়ে সে থামল না।

আপদ গেল। কিন্তু বিপদ কাটল না। মুশকিল বাধালো বিন্ধ্যবাসিনীর ছেলে। কিছু না বুঝেও সে এতটুকু বুঝতে পারল যে, মা পিসিকে বকেছে। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা তাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। শ্রান্ত বিন্ধ্যবাসিনী অভুক্ত শিশুকেই ঘুম পাড়াবার উদ্যোগ করল। বিছানায় শুয়ে ছেলে পিসির কাছে যাওয়ার জন্য কান্না জুড়ে দিল।

বিন্ধ্যবাসিনী তাকে কী উপায়ে শান্ত করবে ভেবে পায় না। কোলে নিয়ে

ঘুম-পাড়ানি ছড়া শোনাল, বৈয়ম থেকে মিছরির খণ্ড হাতে দিল, কাঠের ঘোড়া, টিনের ঝুমঝুমি যেখানে যত খেলনা ছিল সব জড়ো করল। সমস্তই বৃথা। পিসি তার জন্য মুড়কি কিনতে গেছে, এক্ষুনি আসবে ইত্যাদি স্তোক বাক্যেও ক্রন্দনরত শিশুকে ভোলান গেল না।

বিন্ধ্যবাসিনীর শরীর দীর্ঘ অসুস্থতার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠেনি। মানসিক উত্তেজনা ও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অবসাদে দুর্বল দেহ আরও অবসন্ন হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় চিত্ত প্রসন্ন ও মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা সহজসাধ্য নয়। সে বিরক্ত হয়ে কড়া স্বরে বলল, "চুপ কর বলছি, নইলে মার খাবে।"

তোষণ এবং শাসন উভয় পন্থাই বিফল। ছেলের কান্না থামে না।

ধৈর্যচ্যুত বিন্ধ্যবাসিনী ছেলের পিঠে নিজের হাতের দু' এক ঘা বসিয়ে না দিয়ে থাকতে পারল না।

শিশু আরও উচ্চ স্বরে 'পিসি' 'পিসি' ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বিন্ধ্যবাসিনীর দুই কানে কে যেন গরম লোহার পেরেক বেঁধাতে লাগল। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শাসাল, "ফের পিসির নাম নিয়েছ কি মেরে খুন করব। চুপ, চুপ।" হাত দিয়ে সে ছেলের মুখ চেপে ধরল।

বাপরে। ঐটুকু শিশুর গায়ে যেন অসুরের জোর এসেছে। ক্ষীণ স্বাস্থ্য বিন্ধ্যবাসিনী তাকে এঁটে উঠতে পারল না। মায়ের হাতটা সজোরে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে চীৎকার করল,—পিসি।

বিন্ধ্যবাসিনীর তখন আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। "তবে রে, তোমার গায়ে বড় জোর বেড়েছে, দাঁড়াও তোমার পিসি ডাকা আমি বন্ধ করছি।" মাথার বালিশটা বিন্ধ্যবাসিনী ছেলের মুখে চাপা দিয়ে পাগলের মতো বলতে লাগল, 'ডাক, ডাক দেখি এবার তোর পিসিকে।"

শিশু নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় সবলে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। ধস্তাধস্তির ফলে বালিশটা এদিক ওদিক একটু সরে গেলেই ছেলের গোঁ গোঁ কান্নার শব্দ বিন্ধ্যবাসিনীর কানে আসে। দুর্জয় ক্রোধে উন্মত্ত বিন্ধ্যবাসিনী আরও প্রাণপণ শক্তিতে চাপতে থাকে।

কতক্ষণ এ যুদ্ধ চলেছে? এক মিনিট? এক যুগ? বিন্ধবাসিনী তা জানে না। সে শুধু স্মরণ করতে পারে ক্রমে অবাধ্য শিশুর প্রতিরোধের বেগ কমে এল। হাতপা ছোঁড়া শান্ত হয়ে গেল। বালিশের নীচে থেকে অবরুদ্ধ কান্নার ক্ষীণতম শব্দও শোনা গেল না। পাজী হতভাগা ছেলে কোথাকার। এতক্ষণে ঢিট হয়েছে। বিছানার পাশে বসে বিন্ধ্যবাসিনী হাঁপাতে লাগল। উত্তেজনায় ও পরিশ্রান্তিতে তার দেহ স্বেদসিক্ত ও কণ্ঠ তৃষ্ণায় শুষ্ক হয়েছে।

হঠাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর খেয়াল হল, ছেলের কোনো সাড়া শব্দ নেই তো। তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর থেকে বালিশ চাপাটা সরিয়ে দিল। শিশুর ছোট চোখ দুটি মুদ্রিত। শরীর অসাড়। ঘুমুচ্ছে কি? কৈ, নিঃশ্বাস পড়ছে না তো। আতঙ্কে বিন্ধ্যবাসিনীর বুকটা ধড়াস করে উঠল। নরম হাত দুটি তুলে নিজের গালের উপরে রাখল। ঠাণ্ডা কিংবা গরম ঠিক বুঝতে পারল না। পায়ের তলায় হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করল। নিশ্চিন্ত হল না। তার বুকের উপর কান পেতে

শুনল। হৃদস্পন্দনের আভাস মাত্র পেল না, কানের কাছে 'খোকন' 'খোকন' বলে বার বার ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকল। সাড়া পেল না। ক্ষুদ্র নিথর নিস্পন্দ দেহটিকে দু'হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝি শিশুকে জাগাতে চেষ্টা করল। তার পরে "ওঃ মাগো" বলে চেঁচিয়ে উঠে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বিন্ধ্যবাসিনীর যখন জ্ঞান হল, তখন রাত্রি গভীর। উর্ধ্বে কৃষ্ণপক্ষের আকাশ চন্দ্রহীন। নিঃশব্দ রজনীর নিবিড় তিমিরাবেষ্টনে সমস্ত গ্রামখানি নিদ্রালস। সেই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু শূন্য গৃহে পুত্রহন্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর অসহ্য শোকভার নিষ্ফল আর্তনাদে বাতাস ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

পরদিন রাত্রে প্রতিবেশিনীদের অলক্ষ্যে বিন্ধবাসিনী চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্যহীন ভাবে চলতে চলতে নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি নদীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে ঝুরিজটে ঘেরা বিপুল প্রাচীন বটগাছটির নবপল্লবের মৃদু আন্দোলনে কিসের নির্দেশ? পরপারে অস্পষ্ট তরুশ্রেণীর ঝাপসা ছায়া-ছবিতে দুর্ভাগিনী বিন্ধ্যবাসিনীর জন্য কিসের ইঙ্গিত? স্রোতস্বতীর কালো জলের উপরে ঘনসন্নদ্ধ অন্ধকারে কোন্ অজ্ঞাত জগতের আহ্বান?

ঝপ করে একটা শব্দ হল। শান্ত নদীর নিস্তরঙ্গ জলে ক্ষণিকের একটা আলোড়ন উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

রসের বিচারে বিন্ধ্যবাসিনীর কাহিনীর ঐখানেই ভাবসঙ্গত সমাপ্তি। কিন্তু পুলিশের কাছে সাহিত্যিক সার্থকতার চাইতে ঘটনার দাম বেশী। অক্ষম গ্রন্থকারের মতো তারাও উপাখ্যানের কোথায় থামতে হয় জানে না। ইন্সপেক্টারবাবু আরও তথ্য যোগ করতে লাগলেন। বৃহদায়তন উপন্যাসের শেষে যেমন পরিশিষ্ট, তিনপাতা চিঠির তলায় যেমন পুনশ্চ।

যে মানুষ ছোটবেলায় মাছের মতো সাঁতার কেটে প্রত্যহ দীঘির এপার-ওপার করেছে, তার পক্ষে জলে ডুবে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। জলের নীচে দম আটকে এলে বিন্ধ্যবাসিনীর হাতপাগুলি আপনি সচল হয়ে দেহটাকে উপরে ভাসিয়ে তোলে। জেলেদের নৌকায়—

বাধা দিয়ে বললাম, "থাক, কে কোথায় কী ভাবে তাকে জল থেকে উদ্ধার করল, কী করে কবে সে গ্রাম থেকে শহরে এল এসব বৃত্তান্ত থানায় ডায়েরী করার পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কোর্টে উকীলের জেরার পক্ষেও বোধ হয় মূল্যবান মালমশলা। আমার কাছে সে সব অনাবশ্যক খুঁটিনাটি মাত্র।"

সুধীরবাবু ক্ষুণ্ণ হলেন কিনা জানিনে। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিন্ধ্যবাসিনীর কনফেশান—"

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, "আমি বিশ্বাস করি কি? করি। তার এক বর্ণও মিথ্যা মনে হয় না।"

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে তিনিই আবার প্রশ্ন করলেন, "এখন আমার কী করা উচিত; বলুন তো?"

তা আমার বুদ্ধির অতীত। বললাম, "আমরা সম্পাদকেরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। জন্মশাসন থেকে কিউবিজম্ এবং কমন মার্কেট থেকে ডেফিসীট ফাইন্যান্স সব বিষয়েই আমরা অনায়াসে উপদেশ বা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিতে পারি। কিন্তু স্বীকার করছি,

বিন্ধ্যবাসিনী সম্পর্কে কী করা উচিত তা জানিনে।"

ভদ্রলোক হতাশ হলেন। তাঁকে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিতে গেলাম। দু'পা গিয়ে হঠাৎ থেমে প্রশ্ন করলেন, "খবরটা আপনার কাগজে কালই বেরোবে বোধ হয়?" তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগের চিহ্ন গোপন রইল না।

আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ব্লক টাইপের ব্যানারহেডিং ভেসে উঠল,—"নিরুদ্দেশ বিন্ধ্যবাসিনীর চাঞ্চল্যকর আত্মপ্রকাশ।" "পদস্থ পুলিশ অফিসারের গৃহে অতর্কিতে আবির্ভাব। পথে পথে হিন্দুস্থানী হকারেরা সাইকেলে কাগজের গোছা নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে ছুটছে—"টিলীগ্রাফ, বিন্ধবাসিনীকা খবর নিকলেছে। জনমভূমি পড়াহিয়ে, জনমভূমি—"

কিন্তু মন স্থির করতে সময় লাগল না। একটা চাঞ্চল্যকর "স্কুপ" এবং পত্রিকার হাজার দশেক কপি অতিরিক্ত বিক্রির নিশ্চিত সুযোগ স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করলাম। জানি, সম্পাদকীয় কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটল। সার্কুলেশান ম্যানেজার জানতে পারলে আমার আর মুখ দেখবেন না।

দিনান্ত

অনেক রাত অবধি চোখে ঘুম আসেনি বলেই বোধহয়, ভোরের দিকে শান্তনু অঘোরে ঘুমিয়ে পাড়ছিল। হঠাৎ মাথার কাছে কিসের একটা শব্দে জেগে উঠল।

কেউ দরজা ঠেলছে কি? এইতো সবে রাত্রির অন্ধকার কেটে আকাশে দিনের আলো দেখা দিতে শুরু করেছে। সূর্য উঠতে এখনও বাকি। এত সকালে কে এল?

শান্তনুদের ফ্ল্যাটটি গলির মোড়ে একটা বাড়ীর তিনতলায়। সামনে রেলিংঘেরা ছোট একফালি বারান্দা। তারই গায়ে শোবার ঘর। শান্তনু দরজা খুলে বারান্দায় চেয়ে দেখল। কই, কেউ কোথাও নেইতো। এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল পায়ের কাছে রবারের ব্যান্ড-জড়ানো ভাঁজ করা খবরের কাগজটা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল। সাইকেলের হাতলের উপরে স্তূপীকৃত পত্রিকা বিলি করা যাদের কাজ তিন-চার তলায় সিঁড়ি বেয়ে প্রতিটি গ্রাহকের হাতে তা পৌঁছে দেওয়া তাদের চলে না। চলন্ত সাইকেলে যেতে যেতে তারা ভাঁজকরা কাগজখানার উপরের ছাদে বা বারান্দায় ছুঁড়ে দেয়। আজ নীচে থেকে সজোরে নিক্ষিপ্ত কাগজটা ঘরের কাঠের দরজার উপরে এসে পড়েছে; তারই আওয়াজে শান্তনুর ঘুম ভেঙে গেছে।

কাগজটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে শান্তনুর মনে হল, আশ্চর্য হাতের তাক ওদের। একদিনও বাইরে বা এদিকে ওদিকে গিয়ে পড়ে নাতো। আউটফিল্ড থেকে উইকেটে বল ছুঁড়ে ওরা অনায়াসেই বোধহয় ব্যাটসম্যানকে রান-আউট করতে পারে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি শান্তনুর ওষ্ঠাধরে ঈষৎ একটু করুণ হাসির রেখা দেখা দিল।

শান্তনুর চোখে ঘুমের রেশটা তখনও কাটেনি। অন্যদিন সে কাগজখানা টেবিলের উপরে তুলে রেখে আবার শুয়ে পড়তো। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনের মধ্যে সে এমন প্রবল এক ঔৎসুক্য বোধ করল যা রোধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি খবরের কাগজখানা খুলে পড়তে শুরু করল।

যে খবরটায় শান্তনুর আগ্রহ সে আজ পত্রিকার শুধু একটি বিশেষ পৃষ্ঠায় আবদ্ধ নয়। টাইটেল পেজ অর্থাৎ প্রথম পাতায় তিনকলমের হেডলাইন দিয়ে তার আরম্ভ। "নিজস্ব বিশেষ সংবাদদাতার" রিপোর্টে খেলার পাতার সবখানি জুড়ে তার বিস্তারিত বিবরণ। খানতিনেক ছবি, অতীতের নামজাদা একজন খেলোয়াড়ের লেখা বিশ্লেষণমূলক আলোচনা, যাকে বলা হয় এক্সপার্ট কমেণ্টারী— সব কিছু মিলিয়ে ঢালাও ব্যবস্থা। এ-কথা মানতেই হবে, স্পোর্টস কভারেজ অর্থাৎ খেলাধুলার খবরে "বিশ্ববার্তা"র খ্যাতিটা অহেতুক নয়।

অবশ্য বিষয়টার নিজের গুরুত্বেই পত্রিকায় মুখ্য সংবাদ হওয়ার দাবি রাখে। রাজ্যপাল ট্রফির ফাইন্যাল শহরের ক্রিকেটে সেরা প্রতিযোগিতা। বিজয়ীর তো কথাই নেই, রানার্স-আপেরও সম্মান কম নয়। কোন দল কতবার ফাইন্যালে উঠেছে সেটাও একটা গর্বের বিষয়। স্বদেশী উইসডেনে সন তারিখ সহ তার তালিকা ছাপা হয়।

আরও একটি বিশেষ কারণে এ-বছরের খেলাটায় উত্তেজনার অংশ বেড়েছে। এবার

ফাইন্যালে খেলেছে ব্লু ডায়মণ্ডস্ এবং সিটি ইয়ঙ্গস্। স্থানীয় খেলার জগতে দুই প্রবল পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী। পার্লামেন্টে যেমন কংগ্রেস ও জনসংঘ। পশ্চিম এসিয়ায় যেমন আরব ও ইস্রায়েল।

শুধু ময়দানেই নয়, শহরের স্কুল, কলেজ, গৃহ ও পরিবারে খেলার অনুরাগী নবীন ও প্রবীণেরা দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। হয় ব্লু ডায়মণ্ড-এর সমর্থক নয়তো সিটি ইয়ঙ্গস-এর পক্ষপাতী। ট্রামে, বাসে, আপিসের টিফিন ঘরে ও পাড়ায় রকের আড্ডায় দুই দলের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলে। কথা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটাফাটি ঘটার উপক্রম।

সিটি ইয়ঙ্গস্ গত দু'বছর পর পর ফাইন্যালে জিতেছে। এবার জিতলে হ্যাটট্রীক, রাজ্যপাল ট্রফিতে অভুতপূর্ব রেকর্ড। ব্লু ডায়মণ্ডস্ বহুদিনের ঐতিহ্যশালী ক্লাব; এ-বছর তাদের পঁচিশ বৎসর পূর্তি। সিটি ইয়ঙ্গস্‌কে হারিয়ে ট্রফি ঘরে তুলতে পারলে রজত জয়ন্তী উৎসবের আলোক সজ্জাটা উজ্জ্বলতর হবে। যদিও লড়াইটা প্রাণের লড়াই নয়, মানের লড়াই, তবু দুই দলই প্রাণপণে লড়ছে।

খবরের কাগজে গতকালের খেলার বিবরণে আগাগোড়াই বিকাশ বোসের প্রশংসা। তার ব্যাটিং-এর সুখ্যাতি। বোলিং-এর ব্যাখ্যান ও ফিল্ডিং-এর গুণগান। একেবারে গদগদ ভাব।

বিকাশ বোস চৌকশ, ইংরেজীতে যাকে বলে অলরাউণ্ডার। উঠতি খেলোয়াড়। সে-কথা শান্তনু অস্বীকার করে না। ছেলেটার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, প্রমীস্ আছে। লেগে থাকলে এবং হাততালিতে মাথা গুলিয়ে না গেলে একদিন ভালোই খেলবে একথাও মানতে শান্তনু রাজী আছে। সে নিজে স্পোর্টসম্যান, অন্য কারুর সত্যিকার কৃতিত্বকে ছোট করবে এমন হিংসুটে সে নয়। কিন্তু সবকিছুরই একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই তো। রাজ্যপাল ট্রফিতে এর আগে আর কেউ যেন সেঞ্চুরী করেনি!

আসল কথা, বিকাশ বোস বড় লোকের ছেলে, চেহারাটাও ভালো। অ্যাম্বাসাডার গাড়ি চালিয়ে মাঠে আসে। আলাপ হলেই দরাজ হাতে চা, লিমোনেড খাওয়ায়। পত্রিকার রিপোর্টারদের আর ণত্ব ষত্ব বোধ থাকে না। লিখেছে—"বাংলার ব্র্যাডম্যান।" ছিঃ ছিঃ, চাটুকারিতার কি কোনো সীমা থাকতে নেই? শান্তনু অবাক হয়ে ভাবে।

শুধু বিকাশ বোসের গুণগানই নয়, শান্তনুকে খাটো করারও সুস্পষ্ট প্রয়াস। তার ব্যাটিং-এ ব্যর্থতা, ফিল্ডিং-এর ত্রুটি ইত্যাদির কঠোর সমালোচনা করে ক্রীড়া সম্পাদক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ক্রিকেটার হিসাবে শান্তনু অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে, বর্তমান সে নিতান্তই স্পেন্ট ফোর্স, বারুদহীন তুবড়ির খোল।

সন্দেহটা ক্রিকেট মহলে আর কারুর মনে হয়েছে কি না জানা নেই। তার এমন নির্মম প্রকাশ্য ঘোষণা এই প্রথম। ছাপার অক্ষরগুলি শান্তনুর বুকের মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ কাঁটার আঘাতের মতো সজোরে বিঁধল। তার সমস্ত শরীর যেন ব্যথায় অসাড় হয়ে এল।

"বিশ্ববার্তা"র ক্রীড়া সম্পাদক অনিল নন্দী মানুষটা উদ্ধত, দুর্মুখ। পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিজের খুশিমতো যা-কিছু লিখবার সুযোগ আছে বলেই ধরাকে সরা জ্ঞান

করে। শান্তনু লোকটাকে কোনদিনই পছন্দ করে না। হামবাগ্ কোথাকার!

অথচ কথাটাকে একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার মতো জোরও শান্তনু নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না। সে যে কাল প্রথম বলেই আউট হয়ে গেছে সে-ক্ষোভ তো সে নিজেই ভুলতে পারছে না। সত্যি তো, এ মরশুমে সে একটা খেলায়ও উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেনি। এমন কি ক্লাবের ম্যাচ, সেখানেও তার অ্যাভারেজ নীচের ধাপে।

রাজ্যপাল ট্রফির ফাইন্যালে শান্তনু খেলবে কি না সে সম্পর্কে ক্লাবের অনেকের মনেই সংশয় ছিল। শোনা যায়, সিলেকশান কমিটিতেও তার নির্বাচন নিয়ে মতভেদ ছিল। টিমের ক্যাপ্টেন তো তাকে দলে নিতে খুবই আপত্তি করেছিলেন। কমিটির সভাপতি মধুসূদনবাবুর কাস্টিং ভোটে শান্তনু দলভুক্ত হয়েছে।

মধুদা' শান্তনুর রক্ষক, শুভানুধ্যায়ী ও উপদেষ্টা। ফ্রেন্ড, ফিলসফার এ্যান্ড গাইড। বালক শান্তনুর মধ্যে যে ক্রিকেটে দক্ষতার বীজ ছিল সে তাঁরই চোখে প্রথম ধরা পড়েছিল। বাগানের মালীর মতো তিনি সযত্ন পরিচর্যায় তাকে অংকুরিত ও পরে বিরাট মহীরুহে পরিণত করেছিলেন।

শান্তনুর বাবা লিলুয়ায় রেলের কারখানায় কেরাণী ছিলেন। ছেলে কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাশ করলেই রেলের উপরওয়ালাদের ধরে কোনো একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে নেবেন, এই ছিল তাঁর অভিলাষ। ছেলে খেলা নিয়ে মাতবে এ তাঁর পছন্দ ছিল না। মধুদাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে পিতার বিধিনিষেধ শিথিল করেছিলেন। স্কুলে ফ্রি-শিপ, কলেজে স্টাইপেন্ড এবং সি-এ-বিতে কোচিং তাঁরই চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল।

স্কুল ইলেভেন থেকে টেস্ট টীম অনেকখানি পথ। নিজের যোগ্যতা যত বেশীই হোক না কেন ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তাদের সহায়তা ছাড়া সে দূরত্ব অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। শান্তনুকে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগও মধুদা'ই করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে শান্তনুর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শান্তনু চমকে উঠল। সাড়ে সাতটা বাজে যে। ন'টার মধ্যে প্যাভিলিয়নে হাজির হতে হবে। তার আগে দাড়ি কামানো, স্নান, খাওয়া, জামা কাপড় পরে তৈরী হওয়া চাই। বুট জোড়াতেও সাদা চক মাখানো প্রয়োজন। শান্তনু খবরের কাগজটা একপাশে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শান্তনু ক্যাম্বিসের ব্যাগে তার ব্যাট, প্যাড, ব্যাটিং গ্লাভস্, মাথার ক্যাপ, একজোড়া বাড়তি বুট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ভরে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল।

গলি থেকে বড় রাস্তায় কয়েক পা গেলেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। বাঁ হাতের ঘড়িতে তাকিয়ে শান্তনু ভাবল, এখনও ঢের সময় আছে। বাসে গেলেই তো চলে। অনর্থক ট্যাক্সি ভাড়ায় টাকা নষ্ট করা কেন? টাকা-কড়ি সম্পর্কে শান্তনু সম্প্রতি খুব সচেতন হয়েছে। সে ধীরে ধীরে তার ব্যাগ নিয়ে রাস্তার ওপারে বাস-স্টপে গিয়ে দাঁড়াল।

বাসের জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীদের একজন শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কাছে এগিয়ে এসে বলল, "কে, শান্তনু নয়? চিনতে পারছ? টাউন স্কুলে,—

আমার নাম—"

নাম বলার প্রয়োজন ছিল না। শান্তনু অনায়াসেই চিনতে পারল। স্কুলের সহপাঠী সুবীর সরকার, ক্লাশে নাম করা মেধাবী ছাত্র ছিল। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছিল। সে আজ কত বছর আগেকার কথা।

শান্তনু বলল, "গোড়াতে চিনতে পারিনি। বেশ গোল-গাল নাদুস-নুদুস চেহারা হয়েছে যে। কোথায় আছিস্? করছিস্ কি? এখনও ফ্রি বুকলেট যোগাড় চলছে কি?"

ছাত্রজীবনে সুবীরের নেশা ছিল খবরের কাগজের কুপন ডাকে দিয়ে নানা জিনিসের বিনামূল্যে বিতরিত সচিত্র পুস্তিকা সংগ্রহ করা। এত দিন পরে কৈশোরের সেই ছেলেমানুষীর কথা স্মরণ করে দু'জনেই খুব হেসে নিল।

সুবীরের খবর গতানুগতিক। বি-এ পরীক্ষার আগে হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। রেসাল্ট ভালো করা আর সম্ভব হল না। টাইপরাইটিং শিখে একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আপিসে কেরাণী হয়ে ঢুকেছে। এতদিনে একটা প্রমোশনও পেয়েছে।

নিজের কাহিনী শোনাতে শান্তনু বলল, "আমার খবর যথাপূর্বং। স্কুলে লেখাপড়ায় যেমন ঢুঢু, এখন কাজের বেলায় তেমনি অকাজ, ভ্যাগাবণ্ড বললেই হয়।"

সুবীর বাধা দিয়ে বলল, "বাজে বকিস নে। তোর খবর কে না জানে? রোজ পত্রিকায় ছবি বেরোয়, দেশজোড়া নাম ডাক। আমার ছোট ছেলেটা তো তোর মস্ত এক ভক্ত। মনে পড়ে আমাদের ইংরেজীর টীচার সাধনবাবুকে? সেই যে ক্লাশে ক্রিকেটের কথা উঠলেই নাক সিটকে বলতেন, হিটিং এ লেদার বল উইথ এ পীস অব উড'— তাঁর সঙ্গে সেদিন এক বিয়ে বাড়িতে দেখা হয়েছিল। তিনি অবধি তোর নাম করছিলেন।"

সুবীরের বাস এসে গেল। বিদায় নেওয়ার আগে নিজের ঠিকানা দিয়ে গভীর আন্তরিকতার স্বরে বলল, "আসিস একদিন আমাদের ওখানে। আমরা সবাই তোর কৃতিত্বে আনন্দ বোধ করি, রিয়্যালী প্রাউড অব ইউ।"

কথাটায় নূতনত্ব নেই। ক্রিকেটে তার খ্যাতি কম হয়নি। চিত্রতারকাদের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, 'ফ্যান' সংখ্যা তারও নেহাৎ অল্প ছিল না। কিন্তু আজ যখন তার ত্রুটি, বিচ্যুতি ও অক্ষমতা নিয়ে নির্দয় সমালোচনার ঝড় বইছে তখন বহুদিন বিস্মৃত বাল্যবন্ধুর শিশুপুত্রের এই শ্রদ্ধার সংবাদটুকু শান্তনুর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল।

প্যাভিলিয়নে ঢুকতেই মধুসূদনদা'র সঙ্গে দেখা।

"এই যে শান্তনু, মুখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? না, না অমন মনমরা হয়ে পড়লে চলবে না। ডোণ্ট বি ডিপ্রেসড। সব ক্রিকেটারদেরই খেলার জীবনে কখনও কখনও একটা বন্ধ্যা সময়, লীন প্যাচ আসে, আবার কেটে যায়। হ্যামণ্ডের হয়েছে, হাটনের হয়েছে, আমাদের মার্চেণ্ট, অমরনাথে কেউ বাদ যায়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ তুমি নিশ্চয়ই ভালো খেলবে। চাই একটু সাহস আর একাগ্রতা, বোল্ডনেস এ্যাণ্ড কনসেনট্রেশান" বললেন মধুসূদনদা'। স্নেহভরে শান্তনুর পিঠ চাপড়ে দিলেন। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে গলার স্বর নীচু করে যোগ করলেন, "সে-টাকাটার চিন্তা করছ বুঝি? কোন ভাবনা নেই। আমি সেক্রেটারীর মত করিয়েছি, ও ঠিক

ম্যানেজিং কমিটিতে পাশ হয়ে যাবে। যাও এবার ড্রেসিং রুমে, প্যাড পরে তাড়াতাড়ি তৈরী হও দিকিন।”

টাকাটার জন্য ভাবনা ছিল এবং আছে। বাড়ি থেকে বের হবার সময় আজও স্ত্রী স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, বুধবারের মধ্যে ন'টুর ফিজ জমা না দিলে মেডিক্যাল কলেজে সে ঢুকতে পারবে না। অ্যাডমিশন ফি, এক টার্মের মাইনে, লেবরেটারীর জমা, কলেজ ইউনিয়নের চাঁদা ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে শ' কয়েক টাকার ধাক্কা। এর আগে শান্তনুকে টাকার জন্য খুব ভাবতে হয়নি। সবাই জানে, খেলাটা এ দেশে এখনও পুরোপুরি পেশা নয়। প্রকাশ্যে খেলোয়াড়েরা যা পায় সেটা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু নামজাদা খেলোয়াড়দের দলে আনতে এবং দলে ধরে রাখতে অপ্রকাশ্যে যে টাকা লেনদেন হয় সেটা অবশ্য তুচ্ছ নয়। ইতিপূর্বে যখনই থোক টাকার দরকার হয়েছে, চাওয়া মাত্রই সে ক্লাব থেকে পেয়েছে। এবার মাস খানেক আগেই সে ছেলের কলেজে ভর্তি হওয়ার অর্থ-সমস্যাটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল। কিন্তু এখনও সেখান থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি।

মেম্বারস গ্যালারীতে ক্লাবের সদস্যরা অনেকেই এসে গেছেন। পাইপ বা সিগার মুখে বিলাতী সুটে ঢাকা বাঙালী ও অবাঙ্গালী সাহেব, ধুতির উপরে আজানুলম্বিত কোটপরা মাড়োয়াড়ী ধনকুবের এবং গায়ে সার্জের পাঞ্জাবী ও কাঁধে ভাঁজকরা কাশ্মীরী শাল নিয়ে বাঙালী ভদ্রসন্তান।

অনেক মহিলাও আছেন। বহু বর্ণাঢ্য শাড়ি জাম্পারে রঙিন প্রজাপতির মেলা। লাল, সবুজ, মেরুন ও টারকোয়েজ রঙের। বেলবটমেরও কমতি নেই। অনেকের চোখে গোল চৌকো বা ডিম্বাকৃতি বিচিত্র ফ্রেমের সান্ গ্লাস। তরুণীদের কারো কাঁধে স্ট্রাপ দিয়ে ঝুলছে ক্যামেরা কারো বা হাতে বাইনোকুলার। প্লাস্টিকের হ্যান্ড ব্যাগে উল ও নিটিং-এর সরঞ্জাম নিয়ে এসেছেন কেউ কেউ। অ্যাস্কট বা মহালক্ষ্মীর রেসকোর্সের মতো শীতের মরশুমে ইডেনগার্ডেনসেও অঘোষিত ফ্যাসন-প্যারেডের একটা সুযোগ পাওয়া যায়।

দূর থেকে শান্তনুর মনে হল তাঁদের কেউ কেউ তার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলছেন। বোধহয় তার ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করছেন। বোধহয় নয়। সবই শান্তনুর অপরাধী মনের কষ্টকল্পনা মাত্র।

ড্রেসিং রুমের দরজার পাশেই গ্রাউন্ড সেক্রেটারীকে ঘিরে জনকয়েক তরুণ সদস্যদের কী জটলা চলছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে শান্তনু ঘরে প্রবেশ করল। দু'চারটে কথার ভগ্নাংশ ও মন্তব্যের টুকরো তার কানে এল,—“অমন রান-আউটের চান্সটা মাটি না হলে আর ভাবনা ছিল কি?” “একটা লাইফ পেয়েছিল, তাই তো সুদর্শন দলের ভাঙনটা রুখতে পারল”; “শেষের অতগুলি রান তো স্রেফ দাতব্য, ফ্রি গিফট” ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সকল উক্তির লক্ষ্যটা যে কে এবং কারণটাই-বা কি তা বুঝতে শান্তনুর বিলম্ব হল না। সে কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘরের অপরপ্রান্তে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

নিন্দায় অবিচলিত এবং স্তুতিতে নিরুৎসুক সাধু সন্ন্যাসী মঠে মন্দিরে অবশ্যই আছেন। কিন্তু সংসারের সাধারণ মানুষের পক্ষে নিরুদ্বেগ নির্লিপ্ততা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন ধরে যে খেলোয়াড় আপন ক্রীড়াশৈলে অগণিত দর্শকের মনোরঞ্জন করেছে

তার পক্ষে তো নয়ই। রাগে শান্তনুর গায়ে জ্বালা ধরল। যারা খেলে বা খেলেছে তাদের তিরস্কার অন্যায় হলেও মেনে নেওয়া চলে। কিন্তু জীবনে কোনো দিন যারা ব্যাট ছোঁয়নি সে-সব আর্মচেয়ার ক্রিকেটারদের টীকা-টিপ্পনি অসহ্য।

"শান্তদা, তুমি কি মডার্ন ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ?" প্রশ্ন কর্তা সীতেশ। ক্লাবের একজন সদস্য, শান্তনুর বন্ধুস্থানীয়। সে যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শান্তনু তা লক্ষ করেনি।

"চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি? না, তো। কে বললে তোমাকে?" পাল্টা প্রশ্ন করল শান্তনু।

অপ্রতিভ সীতেশ লজ্জিত কণ্ঠে বলল, "না, কেউ বলেনি। শুনছিলেম মডার্ন ব্যাঙ্ক না কি একজন তুখড় ব্যাটসম্যান খুঁজছে। তাই ভাবলাম তুমি বুঝি অন্য কোনো আপিসে,—ভুল খবর বুঝতে পারছি। আশা করি, কিছু মনে করনি শান্তদা।" ত্রস্তপদে সীতেশ সেখান থেকে সরে পড়ল।

কিছু মনে না করে থাকার উপায় ছিল না। শান্তনু জানে "ওয়েলফেয়ার অফিসার"-এর চাকুরিটা নামকাবস্তে। আসলে ব্যাংকের ক্রিকেট টীমকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই ঐ চাকরিটার সৃষ্টি; একজন দক্ষ খেলোয়াড়কে মাইনে দিয়ে দলে রাখার ছুতো। কর্তৃপক্ষ ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাছে কাজ প্রত্যাশা করেন না, অফিস লীগে রান কামনা করেন।

এতক্ষণে শান্তনু বুঝতে পারল কেন আপিসের সুপারভাইজার সাহেব কদিন থেকে পিছনে লেগেছে। সুবীরের কথাগুলি শান্তনুর মনে পড়ল,—আপিসে মাইনে বেশী নয়, খাটুনিও অনেক। তবে চাকুরিটা স্থায়ী। পেন্সন আছে, প্রভিডেণ্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটিও পাবে, বুড়োবয়সে একেবারে পথে দাঁড়াতে হবে না। সুবীরের কণ্ঠে যে একটা নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার সুর ছিল সেটা শান্তনুর কান এড়ায়নি।

কিন্তু চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকার সময় ছিল না। খেলা শুরু হবে। সাদা এপ্রন পরিহিত আম্পায়ার দু'জন মাঠে নেমে গেছেন। শান্তনু তাড়াতাড়ি প্যাড পরে তৈরী হয়ে নিল।

ব্লু ডায়মণ্ডসের দ্বিতীয় ইনিংস গতকাল দিনের একেবারে শেষ ভাগে শুরু হয়েছে, ওপেনিং পেয়ার—শশাঙ্ক ও জলিল—তাদের অসমাপ্ত খেলার খেই ধরে ব্যাট করতে লাগল।

প্যাভিলিয়ন ও মাঠের চারদিকে দর্শকদের স্ট্যাণ্ডে ব্লু ডায়মণ্ডস্-এর সমর্থকেরা আনন্দে উৎফুল্ল। সিটি ইয়ঙ্গসকে হারিয়ে ট্রফি জেতার জন্য চাই মাত্র আর দু'শো রান। সময় আছে পুরো দিনটা, হাতে আছে সব ক'টি উইকেট। জয়লাভের পক্ষে এর চাইতে আশংকাজনক সুযোগ কল্পনাও করা যায় না কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে আগের দিনের রান সংখ্যায় কিছু যোগ হওয়ার আগেই শ্লিপে ক্যাচ তুলে শশাঙ্ক আউট হয়ে গেল। না, অয়মারম্ভ শুভায় হয়নি।

শান্তনু ওয়ান-ডাউনে ব্যাট করে। কিন্তু ক্যাপ্টেন আজ বিকাশ বোসকে পাঠালেন সে জায়গায়। পরিবর্তিত ব্যাটিং অর্ডারে শান্তনুর নাম অনেক নীচে,—ছ'নম্বরে। ক্যাপ্টেনকে দোষ দেওয়া চলে না। এ বছরে পর পর প্রায় সবগুলি ম্যাচ, বিশেষ করে এ খেলার প্রথম ইনিংসে, শান্তনুর শোচনীয় ব্যর্থতায় তার উপরে ভরসা রাখা যে

কোনো অধিনায়কের পক্ষেই কঠিন।

বিকাশ ব্যাট করতে মাঠে নামামাত্রই দর্শকেরা হাততালিতে তাকে স্বাগত জানাল। এই উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় আগের ইনিংসের মতো এবারেও সিটি ইয়ঙ্গসকে হিমশিম খাইয়ে ছাড়বে সে সম্পর্কে তার দলের সমর্থকদের মধ্যে আশা এবং বিরোধী দলের মনে উদ্বেগের অবধি ছিল না। সুতরাং সিটি ইয়ঙ্গস-এর ফাস্ট বোলার রামানাথন যখন প্রথম বলেই বিকাশের মাঝের স্ট্যাম্পটি উপড়ে ফেলল তখন সমস্ত মাঠটাই যেন বিস্ময়বিমূঢ় নিস্তব্ধতার ভারে থমথমে হয়ে উঠল।

ব্লু ডায়মন্ডস্‌-এর পরবর্তী ব্যাটসম্যান অসাধারণ না হলেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। স্পেক্টাকুলার নয়, কিন্তু স্টেডী। তার কাছে সব ম্যাচেই অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ রান আশা করা যায়। দু'রান তুলে সে বিদায় নিল। যে তার স্থলাভিষিক্ত হল, তারও সেই দশা। রামানাথন আজ দুর্জয়।

কোনো উইকেট না খুইয়ে সাতাশ রান থেকে মিনিট কুড়ির মধ্যেই পাঁচ উইকেটে আটত্রিশ। ব্লু ডায়মন্ডস্‌-এর ধ্বস নেমেছে যেন। ইংরেজীতে যাকে বলে ল্যান্ডস্লাইড।

এবার শান্তনুর পালা। সে প্যাভিলিয়নের বারান্দা পার হয়ে মাঠে নামছিল। কানে এল কোনো এক অপরিচিত দর্শকের উক্তি—"হায়, ইনি তো রিটার্ন-টিকিটের যাত্রী" আর একজন খোঁচাটাকে আরও ধারালো করে বলল, "আগের ইনিংসে করেছেন লাড্ডু, এবার করবেন রসগোল্লা।"

শান্তনু মনকে দৃঢ় করেছিল। কোনো কিছুতেই সে বিচলিত হবে না। সে যুঝবে। শুধু বিপক্ষদলের বোলারের বিরুদ্ধে নয়, নিজের অপ্রসন্ন ভাগ্যের সঙ্গেও।

কিন্তু ভাগ্য, বিশেষ করে পুরুষস্য, নাকি দেবতাদেরও অজ্ঞেয়, শান্তনু কোন ছার। প্রথম বলটা শান্তনুর ব্যাট এড়িয়ে উইকেটের গা ঘেঁষে চলে গেল। শুধু এক চুলের জন্য অফ স্টাম্পটি ছোঁয়নি। দ্বিতীয়টা এসে লাগল পায়ে।

"হাউজ দ্যাট ?" উইকেট কীপার, বোলার ও শ্লিপের ফিল্ডার সমস্বরে চেঁচিয়ে আম্পায়ারের কাছে আপীল জানাল। শান্তনু সভয়ে আম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে দেখল। না, আম্পয়ার তর্জনী উর্ধ্বে উঁচিয়ে ধরেননি। শান্তনুর কপালে স্বেদবিন্দু জমেছিল, রুমাল দিয়ে মুছে ফেলল।

কথায় বলে, বার বার, তিনবার। তৃতীয় বলটা এল প্রায় বুলেটের গতিতে। শর্টপীচ বল। শান্তনুর বুকের কাছে লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তে শান্তনু তার ডান পা অফ স্টাম্পের বাইরে ও শরীটাকে বলের লাইনের পুরোপুরি পিছনে নিয়ে মরীয়া হয়ে সজোরে ব্যাট হাঁকালো। প্রচণ্ড হুক। বলটা ফাইন লেগের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচু পথে গিয়ে পড়ল বাউন্ডারী লাইনের বাইরে। সিক্সার,—এই ম্যাচে প্রথম ছ'-এর মার।

ভাগ্যদেবীর বাসস্থানটা বোধহয় কাছাকাছিই ছিল। ঐ ছক্কার ধাক্কায় বুঝি তাঁর দরজাটা খুলে গেল। শান্তনু পিটিয়ে খেলতে লাগল। বেপরোয়া ড্রাইভ, পুল ও গ্ল্যান্স করে বলটাকে চক্ষের পলকে বার বার ফিল্ডারদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে পাঠাল। ঘন ঘন বোলার বদল, নানা ভাবে ফিল্ড সাজানো, কোনো কিছুতেই শান্তনুর রানের উর্ধ্বগতি রোধ করা গেল না। এরই মধ্যে তার জুটির দু'-জন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছে।

শান্তনুর নিজস্ব রানসংখ্যা পঞ্চাশ পার হয়ে গেল। ব্লু ডায়মন্ডস্-এর শিবিরে উচ্ছ্বসিত উল্লাস। সিটি ইয়ঙ্গস দলের খেলোয়াড়েরা ভগ্নোদ্যম, সমর্থকেরা হতবাক।

বিপর্যস্ত ও ক্রুদ্ধ রামানাথন থেকে থেকে বাম্পার ছুঁড়ছিল। তার কোনোটাকে শান্তনু ব্যাটের ঘায়ে পাঠিয়ে দিল আউটফিল্ডে, কোনোটা বা ফসকে এসে ঠেকল তার বুকে, বাহুতে ও হাতের কব্জিতে। একটা সবেগে আঘাত করল তার কপালে। কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল মুখে, চোখে ও সার্টের কলারে। মাথা ঘুরতে লাগল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। পায়ের তলায় মাটিটা বুঝি দুলছে। ক্ষতস্থানে রুমাল চাপা দিয়ে ক্রীজের উপরে শান্তনু বসে পড়ল। আম্পায়ার ও ফিল্ডারদের কাঁধে ভর দিয়ে আহত ব্যাটসম্যান ফিরে গেল প্যাভিলিয়নে। রিটায়ার্ড হার্ট।

সমস্ত মাঠে গভীর বিষাদের ছায়া নামল।

অপরিহার্য ক্ষণিক বিরতির পরে পুনরায় খেলা শুরু হল। কিন্তু ন' নম্বর ব্যাটসম্যানের কাছে কেউ কিছু আশা করে না। কোনো মতে মিনিট পনের টিকে থেকে সে যখন কট এ্যান্ড বোল্ড তখন কপালে ব্যান্ডেজ বাঁধা শান্তনু আপন অসমাপ্ত ইনিংস শেষ করতে পুনরায় উইকেটে এসে দাঁড়াল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী বিস্মিত পুলকে উঠে দাঁড়িয়ে বিপুল হর্ষধ্বনিতে তাকে অভিনন্দিত করল।

ব্যাট দিয়ে বল পিটানোই ক্রিকেট একথা শান্তনুর স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক না বলে দিলেও সবাই জানে। কিন্তু শান্তনুর হাতে আজ বোধহয় ব্যাট নেই ; আছে খড়্গ। তারই অবিরাম আঘাতে সে ফাস্ট, সুইং এবং স্পিন বোলিংএর সকল কলাকৌশলকে নির্বিচারে কচুকাটা করে ছাড়ল। স্কোর বোর্ডে তার রানের অংকটা এগিয়ে চলল, দৌড়ে নয়, লাফিয়ে।

রেডিওর ধারাবিবরণীতে "ম্যাগনিফিশেন্ট", "সিন্টেলিটিং", "সুপার্ব" ইত্যাদি বাছা বাছা ইংরেজী বিশেষণগুলি বার বার পুনরাবৃত্তি করেও যেন ভাষ্যকার তৃপ্ত নন। বললেন, যে সকল সমালোচকেরা মনে করেন যে শান্তনুর "হে ডে" অর্থাৎ চরম উৎকর্ষের দিন কেটে গেছে তাঁদের ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান ম্যাচে তার দলভুক্তি সম্পর্কে যাঁদের আপত্তি ছিল, তাঁরাও নিশ্চয়ই এখন লজ্জিত হবেন। স্ট্রোক প্লেয়ার হিসাবে এখনও শান্তনুর জুড়ি নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

খেলা শেষ হল। ব্লু ডায়মন্ডস্ তাদের অভীষ্ট রানের কোঠায় পৌঁছতে পারল না। কিন্তু শান্তনু রইল অপরাজেয়। একশ আট, নট আউট। উদ্বেল জনতার উন্মত্ত অভিনন্দনের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে প্যাভিলিয়নে নিয়ে যেতে পুলিশ ও হোমগার্ডের ব্যূহ রচনার প্রয়োজন হল।

করমর্দন, আলিঙ্গন, সাধুবাদ ও জয়ধ্বনির আর বুঝি শেষ নেই। সিটি ইয়ঙ্গস্ বিরোধী দল। রেকর্ড সৃষ্টির গৌরব থেকে শান্তনু তাদের বঞ্চিত করেছে, ওষ্ঠাধর থেকে কেড়ে নিয়েছে বিজয়ের উদ্যত পেয়ালা। তাদের সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্যেরাও শান্তনুর কাছে এসে সুখ্যাতি জানালেন। অকপটে স্বীকার করলেন এমন অসাধারণ ক্রীড়া কৌশল আগে তাঁরা কখনও দেখেননি। সত্যি, শান্তনু এর আগেও একাধিকবার একশ'র উপরে রান করেছে, কিন্তু আজকের সেঞ্চুরী মহত্তম।

সবচেয়ে গর্বিত ও উৎফুল্ল ব্যক্তি মধুদা'। তাঁর প্রস্তাবে ব্লু ডায়মন্ডস্ তক্ষুণি একটি বিশেষ ঘরোয়া সংবর্ধনা সভার আয়োজন করল।

ক্লাবের সভাপতি শান্তনুর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। সভাপতির স্ত্রী অতি বয়স্কা ; শান্তনুর প্রায় মাতৃস্থানীয়। তিনি ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। অন্যান্য সদস্য একের পর এক বক্তৃতায় প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিলেন।

মঞ্চের উপরে মাঝখানে শান্তনুর আসন। তার দু'পাশে ক্লাবের কর্মকর্তাগণ, সম্পাদক, মধুদা ও আরও গণ্যমান্য সদস্য। নীচে সম্মুখের সারিতে বসেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। একটা অংশে লেবেল আঁটা রয়েছে 'প্রেস'। সেটা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত। সেখানে বিশ্ববার্তার অনিল নন্দীকে দেখা গেল।

ফটোগ্রাফারের দল 'ফ্ল্যাশ' জেবলে ছবি তুলছে। কে একটা মুভী-ক্যামেরাও এদিকে ওদিকে নিশানা করছে। এমন বিপুল সম্মান, সমাদর, এত অজস্র গুণকীর্তন। এতে কে না খুশি হয় ? কিন্তু শান্তনুর মনে এ কিসের আলোড়ন ? একী সুখের আবেশ ? না, ব্যথার অসাড়তা ? সে নিজেই জানে না।

সব শেষে টীমের সহ-খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে উঠল ক্যাপ্টেন। শান্তনুর ক্রীড়া নৈপুণ্যের প্রচুর সুখ্যাতি করে বলল, অধিনায়ক হিসাবে সে নিজে সর্বদাই শান্তনুর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের উপরে নির্ভর করে। শান্তনুই যে দলের স্তম্ভস্বরূপ সে কথাটাই সে নানা ভাবে ব্যক্ত করতে লাগল।

শান্তনুর হল কী ? তার কানের ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে কেন ? অসহ্য গরম লাগছে কেন ? পাখাটা কি ঘুরছে না ?

শান্তনু নিজের আশে-পাশে তাকিয়ে দেখল। প্যাভিলিয়নে অতিথি অভ্যাগত ও ক্রীড়ামোদীদের ভীড়, তিল ধারণের জায়গা নেই। বহু পরিচিত মুখ। অদূরে মধুদা বসে আছেন ক্লাবের কর্মকর্তাদের মধ্যে। তাঁর মুখ গভীর আত্মপ্রসাদের হাসিতে উজ্জ্বল, বাৎসল্যের দ্যুতিতে প্রশান্ত।

ক্যাপ্টেনের ভাষণ তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎ শান্তনু স্প্রিং-এর মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। নিজের গলার মালাটা টান মেরে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেজেতে। ঝাঁপিয়ে পড়ল মধুদা'র সামনে। তাঁর গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে সভা থেকে দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

ঘটনাটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অতর্কিত। এক নিমেষে কোথায় কী যেন গুলিয়ে গেল। বলের আঘাতে শান্তনুর মাথার ভিতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে না তো ? তারই ফলে কী তার সাময়িক মস্তিষ্ক বিকার ? কে জানে ?

সরীসৃপ

নিউহাভেন থেকে ডিয়েপ। ব্রিটেন থেকে ফ্রান্সে আগমন ও নির্গমনের পথ। পথ অর্থে জলপথ। জাহাজে পারাপারের ব্যবস্থা। সে-জাহাজ পি-এ্যান্ড-ও অথবা লয়েড ট্রিস্টীনোর লাইনার নয়, তার পকেট সংস্করণ। শেভ ইম্পালার কাছে যেমন বেবীঅস্টিন, ইভিনিং গাউনের পাশে যেমন মিনি স্কার্ট।

শুধু আকারে ছোট নয়, আরাম আয়েশের আয়োজনও অল্প। আসনের চাইতে আরোহীর সংখ্যা সব সময়েই বেশী। তাই হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল বা শিয়ালদা থেকে সোনারপুরের লোক্যাল ট্রেনের মতো বেশীর ভাগ যাত্রীর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাটাই নিয়ম, বসাটা নিপাতন।

স্কুলপাঠ্য ম্যাপের বই-এ ইংলিশ চ্যানেলকে দেখায় এতটুকু। প্রশান্ত বা ভূমধ্যসাগরের পাশে গোষ্পদতুল্য। কিন্তু আকাশ যেদিন মেঘমেদুর এবং বাতাস যখন খরবেগ তখন এই ক্ষুদ্রে সমুদ্রের প্রতাপও দোর্দণ্ড। ছোট ছোট জাহাজগুলিকে প্রায় টুইস্ট নাচন নাচিয়ে ছাড়ে।

আমি পুরোপুরি শহুরে জীব। শ্যামবাজারের ছোট গলিতে জন্ম, হাতিবাগানে বাস। ট্রামে চেপে স্কুলে গিয়েছি, ট্রেনে চেপে গিরিডি বা দেওঘর। কলতলায় চৌবাচ্চার বাইরে জলাশয় বলতে জেনেছি হেদো, গোলদীঘি কিংবা বালিগঞ্জের লেক। ব্যালার্ডপীয়ারে জাহাজে পা দিয়ে প্রথম উপলব্ধি করলাম, পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থল। ভুগোলে নেহাৎ মিথ্যা লেখেনি।

বোম্বে থেকে এডেন বন্দরের দূরত্ব বেশী নয়। কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার আগেই টের পেয়েছি প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করেছিলেন সেটা অকারণে নয়। মুনিঋষিরা যোগসিদ্ধ পুরুষ, তাঁদের অসাধ্য কিছু নেই। এক চুমুকে সমুদ্র শুষে নিতে পারতেন, শুনেছি। কিন্তু সমুদ্র-পীড়া ঠেকাতে পারতেন এমন কথা শুনিনি। আয়ুর্বেদে বহু ওষুধ এবং অনেক অনুপান আছে; সী-সিকনেসের প্রতিষেধক নেই।

মোট কথা, স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, জাহাজে চাপলেই আমার মাথা ঘোরে, গা গুলোয় এবং উদরস্থ সমুদয় তরল এবং অতরল পদার্থ একযোগে দ্রুতবেগে ঘন ঘন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। এসব জেনে শুনেও কেন যে য়ুরোপের পথে জাহাজের টিকেট কিনেছি সে প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই বিলাতের মধ্যবিত্ত ভারতীয় ছাত্রদের অজানা নয়। দেশ থেকে বাবা মাসে মাসে যে-টাকা পাঠান তা দিয়ে কলেজের মাইনে ও ল্যান্ডলেডীর সাপ্তাহিক বিল চুকিয়ে অবশিষ্ট সামান্যই থাকে। সে অংকটা ভদ্র সমাজে উল্লেখযোগ্য নয়। চার বছর লন্ডনে কাটিয়ে এ-কথাটা ভালো করেই বুঝেছি যে, তরুণ বয়সে সাধ এবং সাধ্যের মাঝখানে আছে এক বিরাট গহ্বর। যে-পরিমাণ ট্র্যাভেলার্স চেক দিয়ে তা পূর্ণ করা যায় সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ভারতীয় ছাত্রের কাছে সেটা সহজলভ্য নয়।

অর্থনীতির এসব দুরূহ তত্ত্বচিন্তায় বাধা পড়ল। পুরুষকণ্ঠের প্রশ্ন কানে এল,

—"কেয়ার ফর এ স্মোক ?"

এতক্ষণ জাহাজের রেলিং-এ ভর দিয়ে তরঙ্গসংকুল সমুদ্রের পানে তাকিয়েছিলাম। চোখ ফিরিয়ে দেখি, পাশে দীর্ঘায়ত এক পুরুষ। মাথায় প্রায় ছ'ফুট। বিশাল দুই বাহু, বলিষ্ঠ গড়ন। কাঁচায়পাকায় মেশানো পুরু একজোড়া গোঁফ, তার উদ্ধত প্রান্ত-দুটিতে বেপরোয়া ভাব। মনে হয় যৌবনে অনায়াসেই সার্কাসের দলে বা বক্সিং রিং-এ পসার জমাতে পারতেন। পরিধানে ওরস্টেডের গ্রে ব্যাগস্, গায়ে হ্যারিস্ টুইডের জ্যাকেট। উচ্চারণ শুনে সংশয়ের অবকাশ থাকে না—ভদ্রলোক ইংরেজ।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত। অভিনবও বটে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপে পরিচিত ব্যক্তিকেও সিগারেট 'অফার' করার রীতিটা উঠে গেছে। চেনা শোনা দূরে থাক, আগে যাকে চোখে দেখেছি বলেও স্মরণ হয় না তিনি ফস্ করে সিগারেটের কেস্ এগিয়ে দিয়ে বলছেন, "আসুন ধূমপানে আড্ডা হোক।" এমন অমায়িকতা কল্পনা করা কঠিন।

"নো থ্যাংকস্। আমি ধূমপায়ী নই।" সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম।

ভদ্রলোক নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়লেন। তারপর কিছুটা স্বগতোক্তির মতো মৃদু কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, "ইণ্ডিয়ান ইয়োগী আই সাপোজ ?"

প্রশ্নকর্তার গলার স্বরে এবং চোখের কোণে পরিহাসের আভাসটুকু আমার দৃষ্টি এড়াল না। অন্য সময়ে একটা উপযুক্ত রূঢ় জবাবও দিতাম। কিন্তু কিছুটা বিস্ময় কিছুটা কৌতূহলের বশেই হাস্যতরল কণ্ঠে বললাম, "ভারতীয় বটে, তবে যোগী সন্ন্যাসী নই। হাত গুণে আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারব না।"

ভদ্রলোক দমবার পত্র নন। "কুড়ি বাইশ বছরের সুস্থ সবল বেটাছেলে, সিগারেট ধরোনি, যোগী নয়তো কী ? ওতে তো এখন মেয়েরাও অভ্যস্ত।" বলে হাসতে লাগলেন।

বোঝা গেল, ভদ্রলোক সরল স্বভাব। ঠাট্টা করাই উদ্দেশ্য, আঘাত করা নয়। সুতরাং আমার মনেও আর বিরূপতার লেশ রইল না। সহাস্যে জবাব দিলাম, "সে-কারণেই ছেলেদের পক্ষে এখন ওটা বর্জনীয়। ফ্লারটিং এবং অর্কিডের মতো সিগারেটটাও এখন মেয়েদের জন্যেই তোলা থাক। আমরা আধুনিক তরুণেরা তাতে ভাগ বসাতে চাইনে।"

উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক। বললেন, "সাবাশ। একেই তো বলে পৌরুষ। সত্যি বলতে কি, আমি নিজেও পাইপের ভক্ত ; সিগারেট চলে শুধু কালে ভদ্রে। বিশেষত বিদেশে বিভূঁইএ। পকেটে রাখা সহজ, পথে-ঘাটে পেতেও কষ্ট নেই।"

একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলেন, "য়ুনিভার্সিটির ছুটিতে কণ্টিনেণ্টে বেড়াতে যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ, তবে আমার দৌড় ফ্রান্স অবধি। বিদেশ-বাসের দিন ফুরিয়ে আসছে। তাই দেশে ফেরার আগে একবার অন্তত প্যারিসটা দেখে নিতে চাই।" আমি জবাব দিলাম।

"দেশে মানে বেঙ্গল তো ? তোমাদের স্বাধীন ভারতের সংবিধানে যার নাম হয়েছে পশ্চিম বঙ্গ ?"

বিস্মিত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "আমি যে বাঙ্গালী, চিনলেন কেমন করে? কপালে তো কিছু ছাপ মারা নেই।"

মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "মাথায় বড়, বহরে ছোট বাঙ্গালী সন্তান। চেহারা ও চলন-বলন দেখে যদি না চিনতে পারব তবে বৃথাই কাল কাটিয়েছি সেখানে।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল। ইংরেজ স্বভাবতই আমশুক যার ইংরেজী নাম ইনসুলার। কেউ যথারীতি পরিচয় করিয়ে না দিলে গায়ে পড়ে কথা বলার পাত্র সে নয়, ভাব করা দূরে থাক। কিন্তু সুয়েজ পার হলেই তার মানসিক জাতিচ্যুতি ঘটে। এ্যাংলোইণ্ডিয়ান বলতে ভারতবর্ষে আমরা জানি বর্ণসংকর একটা বিশেষ সম্প্রদায়। বৃটেনে ভারতপ্রত্যাগত ইংরেজ মাত্রেরই ঐ পরিচয়। আচার, আচরণ, রুচি ও মনোভাবে তারা পৃথক। স্বজাতির সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাদের সাদৃশ্য নেই। তাদের পক্ষে বিদেশীর সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টাটা অভাবনীয় নয়।

আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাংলা দেশে ছিলেন বুঝি? তাই বলুন। কোথায় ছিলেন? কতদিন?"

"কোথায় ছিলাম তা না বলে কোথায় ছিলাম না বলা সহজ। রংপুরের গ্রামে ক্যাম্পে থেকে সেটলমেণ্টের জরিপ করেছি। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ, বাখরগঞ্জে বন্যাত্রাণ। মৈমনসিং-এ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আর হুগলীতে চটকল ধর্মঘটের ফলে না ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছি কতদিন। কলকাতার ময়দানে খেলেছি রাগার, ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট। তখন বাংলাদেশ দু'ভাগ হয়নি। সে-সময়ে কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া যেতে ভিসা লাগত না।" বলে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক।

"আপনি কি···", প্রশ্নটা শেষ করার আগেই ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "ঠিকই আঁচ করেছো। সাবডিভিসন্যাল অফিসার হয়ে শুরু, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার হয়ে শেষ। তার আগে অবশ্য চার বছর কেটেছিল নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রণ্টিয়ারে।"

অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজপুরুষের প্রতি আমার মনে একটা গভীর বিতৃষ্ণা আছে। সেটা তাঁদের অতীত শাসনের কথা মনে করে নয়। তাঁদের বর্তমান প্রচ্ছন্ন পিঠচাপড়ানো মনোভাব—ইংরেজীতে যাকে বলে পেট্রোনাইজিং এ্যাটিচ্যুড-এর জন্য। এদেশে ভারতীয় কারো সঙ্গে আলাপ হলেই তাঁরা বলতে শুরু করেন, নেহেরু একজন গ্রেটম্যান, ভারতবর্ষের উন্নতি দেখে তাঁরা অভিভূত, কিংবা ঐ ধরণের মুরুব্বি চালের ছকবাঁধা নানাবিধ মিথ্যা স্তুতি যা শুনলেই গা জ্বালা করে।

"এক্সকিউজ মী" বলে আলাপ আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়ে জাহাজের অন্য প্রান্তে চলে যাব ভাবছিলাম। কিন্তু জানি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা শুয়ে বসে থাকলেই সী-সিকনেসটা জাঁকিয়ে বসে। বরং কথাবার্তায় সময় কাটালে অনেক উপশম ঘটে। সুতরাং কথার জের টেনে বললাম, "আপনার কর্মক্ষেত্রের পরিধিটা তো বড় কম ছিল না। আদিতে নর্থ-ওয়েস্ট, অন্তে নর্থ-ইস্ট। দেশের পশ্চিম সীমান্ত থেকে একেবারে পূর্ব প্রান্তে।"

"শুধু আয়তনেই অসাধারণ নয়, অভিজ্ঞতায়ও। ফ্রণ্টিয়ার প্রভিন্সের অংশটুকু তো রোমাঞ্চকর। শুনবে সে কাহিনী?"

প্রশ্নটা নিতান্তই অনাবশ্যক। তিনি যে আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখেন এমন মনে হল না। কিন্তু নিজের হাত-ঘড়িটার উপর চোখ পড়তেই বললেন, "ইস্, দেড়টা

বেজে গেছে দেখছি। তোমার খাওয়া হয়েছে কি ? তা হলে চল, লেটস্ গো ফর এ বাইট।"

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিলেন। বললেন, "না, না, আমি কি ডাইনিং সেলুনে এক গিনির লাঞ্চ খাওয়ার কথা বলছি ? পাগল ? পেন্সনের টাকায় ও সব বাবুগিরি চলে কখনও ? চা কিংবা কফির সঙ্গে যা হোক সামান্য কিছু জুটলেই খুশি।"

মনে মনে ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা করলাম। আমি না বললেও আমার পকেটের বিশীর্ণ অবস্থাটা সঠিক অনুমান করেছেন। পাছে আমার পক্ষে কুণ্ঠার কোন কারণ ঘটে সে জন্য নিজের কল্পিত অর্থকষ্টের দোহাই দিয়ে আমার দৈন্যকে ঢেকে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

ভাগ্য ভালো, জাহাজের স্ন্যাক-বারে এক কোণে কয়েকটা চেয়ার খালি ছিল। দু'পেয়ালা কফি ও কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে দু'জনে তারই দু'টো দখল করলাম। মুখোমুখি বসে শোনা গেল ভুতপূর্ব ইংরেজ শাসকের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার ইতিহাস,—মিস্টার জন পার্সিভেল ফেয়ারওয়েদার, সি-আই-ই, আই-সি-এস (রিটায়ার্ড)-এর অলিখিত অটোবায়োগ্রাফী।

ফেয়ার ওয়েদারের বংশে কোন এক পূর্বপুরুষ ছিলেন জাতিতে আইরিশ। বোধ হয় সিনফিনদের রক্তের ধারা ছিল তাঁর ধমনীতে। ছোটবেলা থেকেই দুঃসাহসিকতায় তাঁর আগ্রহ, দুর্গম ও দুঃসাধ্যের প্রতি আকর্ষণ। মনে পড়ে, স্কুলের সামনের রাস্তায় একদিন একটা ল্যাণ্ডো গাড়ির ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে এলোপাতাড়ি ছুটছিল। কোচোয়ান ছিটকে পড়ে গিয়েছিল পথের একপাশে। গাড়ির ভিতরে ভীতসন্ত্রস্ত গুটিতিনেক অসহায় মহিলা আর্তস্বরে চিৎকার করছে। পথচারীরা হতবুদ্ধি—সেই যে সাধুভাষায় লেখা বাংলা রচনায় বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

বালক ফেয়ারওয়েদার ক্লাশে একটা কাঠের রুলার দিয়ে খাতায় লাইন টানছিল। মুহূর্তের মধ্যে পথে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়াটার সামনে হাতের রুলার উঁচিয়ে দাঁড়াল। চারদিক থেকে "গেল, গেল" শঙ্কিত রব উঠল ;—এক্ষুণি উন্মত্ত ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে গুঁড়ো হয়ে যাবে এক রত্তি ছেলেটা।

একী আশ্চর্য ঘটনা। মাস্টার, সহপাঠী, পথের লোকজন সবাই দেখে অবাক, ঘোড়াটা আচমকা বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

বড় হয়ে কলেজ জীবনে বাজি রেখে হোস্টেলের ছাদ থেকে লাফিয়েছেন। পাড়ার গুণ্ডার দলকে হকী স্টীক দিয়ে ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করেছেন। আজও কপালে, বাহুতে একাধিক কাটার দাগে আছে যৌবনের সে-সব অসমসাহসিক কীর্তিকলাপের অলুপ্ত স্বাক্ষর। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত, তাঁর ফেয়ারওয়েদার নামটায় প্রপার নাউনের প্রপার প্রয়োগ হয়নি। বাস্তবিক, তাঁকে যাঁরা ভালো করে জানেন, ডেয়ারডেভিল কথাটার মানে বুঝতে তাঁদের কষ্ট হয় না।

পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় তাঁর নাম তালিকার অনেক উঁচুতে ছিল। অনায়াসেই হোম সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে স্বদেশে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন ভারত সরকারের চাকরি। ফ্রন্টিয়ার ক্যাডারে। সেখানে না আছে বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী শহরের মতো কোন প্রবাসী বেসরকারী

ব্রিটিশ সম্প্রদায় বা সমাজ। না পাওয়া যায় য়ুরোপীয় জীবনযাত্রার যথেষ্ট উপকরণ স্থানীয় জনসাধারণও একটু বিশেষ ধরণের। তারা আবেদন নিবেদনে অভ্যস্ত নয়, হরতাল, পিকেটিং-এর ধার ধারে না। কথায় কথায় খুনোখুনি, রক্তারক্তি ঘটে। কলম চালনার চেয়ে গুলীচালনায় তাদের পারদর্শিতা বেশী।

সীমান্ত প্রদেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য স্থানের শাসন পদ্ধতিরও মিল নেই। প্রদেশের যে অংশটার নাম 'বিধিবদ্ধ এলাকা' সেটেলর্ড ডিস্ট্রিক্টস্' সেখানকার আইন কানুনে যদি বা মোটামুটি একই রকম হিন্দুকুশ পর্বতের গা ঘেঁষে আফগানিস্থানের সীমানা অবধি যে উপজাতীয় অঞ্চল তার ব্যবস্থা আলাদা। ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের ধারা সেখানে সামান্যই পেঁছিয়। সংক্ষেপে, কখনও কামান কখনও বা কাঞ্চন—এ দুই বস্তুর উপরে নির্ভর করে সেখানকার রাজ্যশাসন চালাতে হয়।

যে-বছর ফেয়ারওয়েদার পেশোয়ারে তাঁর কাজে যোগ দিলেন তার কিছুদিন আগে থেকেই উপজাতীয় একটা বিদ্রোহী দলের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ চলছিল। এ কিছু অভাবিত ঘটনা নয়। যদিও কাগজেকলমে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তৃতি ডুরাণ্ড লাইন পর্যন্ত স্বীকৃত, সীমান্তের উপজাতীয়েরা গভর্ণমেন্টের প্রভুত্ব সম্পূর্ণ মেনে নেয়নি। সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে ছোট বড় সংঘর্ষ বেধে যায়। কয়েকদিন গুলী-গোলা অথবা টাকা অথবা উভয় বৃষ্টির পর আবার থেমেও যায়। গোড়াতে বর্তমান বিদ্রোহকেও মনে হয়েছিল ঐ-জাতীয় একটা সাময়িক উৎপাত। কিন্তু সে-ভুল ভাঙ্গতে দেরী হলো না। ক্রমশঃই ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠল।

বিদ্রোহী দলের মালেক অর্থাৎ প্রধানকে সবাই বলে সুপীনের ফকির। রবীনহুড, আনন্দমঠ ও নানাসাহেবের কাহিনী একসঙ্গে জুড়লে যা পাওয়া যায় সুপীনের ফকীর তাই। লোকটা দীনদরিদ্রের বন্ধু, ধর্মপরায়ণ, ব্রিটিশবিদ্বেষী অথচ খুন, লুঠতরাজ ও যুদ্ধবিগ্রহে তার জুড়ি নেই। তার সংগঠন ক্ষমতা অসাধারণ। বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে একটা ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছে বললেই হয়। সেখানে তার হুকুমে অধিবাসীরা ওঠে বসে, তার ফরমানে অপরাধীদের বিচার হয়, জুম্মার জমায়েতে তার ওয়াজ শুনতে হাজার লোকের ভীড় জমে। দু'দিকে উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে ডাকা থেকে পেশোয়ারের মধ্যে যে ব্যবসায়ীরা সওদা নিয়ে আসা-যাওয়া করে তারা কেউ সুপীনের ফকিরকে সেলাম এবং সেলামী না দিয়ে পার পায় না।

বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে বাছা একদল খাসাদার সঙ্গে নিয়ে এক ব্রিগেডিয়ার রওনা হয়েছিলেম সুপীনের দিকে। মাঝপথে পাহাড়ের আড়াল থেকে অতর্কিতে সদলে হানা দিল ফকীর। ব্রিগেডিয়ার আর তার খাসাদার বাহিনীর খবর পেঁছে দেবে গভর্ণমেন্টের কাছে এমন কারো চিহ্ন রইল না কোনো খানে।

দ্বিতীয় অভিযানের যিনি নায়ক তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে লক্ষ্যস্থলে যদিবা পেঁছিলেন যুদ্ধ করার সময় পেলেন না। জীরগার সভা ডেকেছিলেন। হুজরার চত্বরে ঘোড়ার পিঠে থেকে নামার সময় অলক্ষিতে গুলী এসে বিঁধল তাঁর কপালে। ডাক্তার বদ্যি ডাকার ফুরসৎ ছিল না।

অবশেষে বিদ্রোহ দমনের ভার নিয়ে এলেন প্রধানও সুদক্ষ শাসক লেনসট হুইলার।

যৌবনে অনেক দিন সীমান্ত প্রদেশে কাজ করেছেন। উপজাতীয়দের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে। রণনীতির চাইতে কুটনীতিতে তাঁর বেশী বিশ্বাস। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহীদের দলে বিভেদ সৃষ্টি করলেন। সুপীনের ফকিরের এক প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করে দিলেন।

গভর্ণমেণ্ট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে তাঁর উঁচু প্রমোশান যখন প্রায় পাকা হয়ে এসেছে তখন এক গভীর নিশীথে ল্যাণ্ডি-কোটালে নিজের শয়নকক্ষে লেনসট্ নিহত হলেন। বাইরে সশস্ত্র প্রহরী, দরজা জানালা ভিতর থেকে বন্ধ। আত্মহত্যা নয় তো? বিছানার পাশে একটা নীল রুমাল পাওয়া গেল। হত্যাকারী কারা সে সম্পর্কে আর সন্দেহ রইল না। সেটা ফকীরের সিলমোহর।

দিল্লীতে সপারিষদ ভাইসরয় চিন্তিত, লণ্ডনে হোয়াইট-হল বিচলিত। এ সংকটময় সময়ে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে একখানা দরখাস্ত পৌঁছল। আপনি যেচে সুপীনের বিদ্রোহ দমনের ভার নিতে চায় এক তরুণ আই-সি-এস। দরখাস্তের সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশের চীফ কমিশনারের মন্তব্য,—"ছোকরা সার্ভিসে সদ্য ঢুকেছে। সীমান্ত অঞ্চলের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবে সাহস আছে বটে।"

বড় কর্তারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। পর পর তিনজন অফিসার যেখানে খুন হয়েছে সেখানে আপাতত কাউকে পাঠাতে পারলেই হয়। অভিজ্ঞতা? সে পরে হবে। তাঁরা অবিলম্বে পোস্টিং অর্ডার পাঠালেন।

ল্যাণ্ডিকোটালে লেনসটের চেয়ারে বসেই ফেয়ারওয়েদার বুঝতে পারলেন, উপজাতীয়দের ভাষা না জানলে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বা বৈরিতা কোনোটাই সম্ভব নয়। অনেক সন্ধানে একজন মুনশী পাওয়া গেল। মানুষটি বয়সে প্রবীণ, বুদ্ধিতেও বিচক্ষণ। ছাউনি ও কেল্লার সাহেবদের স্থানীয় ভাষা শেখাতেন, এখন অবসর নিয়েছেন। তিনি প্রত্যহ বাড়ি এসে পস্তু শেখাতে রাজী হলেন।

ছাত্রের শিখবার আগ্রহ দেখে মুনশীর উৎসাহ বাড়ল। শিক্ষকতা তাঁর পেশা; কিন্তু তিনি পেশাদারী নন। তাঁর আন্তরিকতায় ফেয়ারওয়েদারের মনে শ্রদ্ধা দেখা দিল।

একদিন মুনশী জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর একা মানুষ, ঘরে মেমসাহেব নেই। আশা করি খানসামা, খিদমদগার, বেয়ারা, বাবুর্চীরা সব কাবল-ই এতমাদ, বিশ্বাসযোগ্য?"

ফেয়ারওয়েদার অবাক হলেন। পাঠ নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও তিনি মুনশীর সঙ্গে ফসল, আবহাওয়া, তন্দুর ইত্যাদি ঘরোয়া বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। লক্ষ করেছেন, বৃদ্ধ প্রতিটি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেন, নিজে কোন প্রসঙ্গ তোলেন না।

"হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?" ফেয়ারওয়েদার জিজ্ঞাসা করলেন।

"বিশেষ কোনো কারণে নয়, একটা পস্তু প্রবাদ মনে এল,—"ঢোলক এবং নৌকর দুই-ই আগে বাজিয়ে নিতে হয়।" মুনশী বললেন।

"আমার চাকর বলতে দুজন। বাবুর্চী ডিসুজা গোয়ানীজ। পেশোয়ারে আমার চাকরিতে ঢুকেছিল। সেই থেকে আছে। দ্বিতীয় দীন মহম্মদ। সে তো দুগ্ধপোষ্য শিশু বললেই চলে। ছেলেটার বাপ-মা আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ কোথাও

নেই শুনেছি।" ফেয়ারওয়েদার জানালেন।

মুনশী বললেন, "গরিবের প্রতি হুজুরের জারবানওয়াজি সবাই জানে।"

ফেয়ারওয়েদার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে-বিষয়ে পস্তুতে কোনো প্রবাদ আছে কি ?"

মুনশীও হাসলেন। জবাব দিলেন, "আছে। প্রবাদে বলে, পথে কুড়িয়ে পাওয়া বদনায় জল ধরে না, তাতে ফুটো থাকে।"

ফেয়ারওয়েদার ইঙ্গিতটা বুঝলেন। মুখে কিছুই বললেন না। মনে মনে ভাবলেন, বেচারী দীন মহম্মদ। ডিসুজা তো তার পিছনে লেগেই আছে। অহর্নিশ কেবলই নালিশ। সে কী করেছে বা কী করেনি তারই সবিস্তারিত ফর্দ। দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধ মুনশী সাহেবও তার প্রতি প্রসন্ন নন।

দীন মহম্মদকে ফেয়ারওয়েদারের খুবই পছন্দ হয়েছে। ছোকরার বয়স অল্প, বারো কিংবা তেরো বছর হবে। ঐটুকু বয়সেই সে কাজে ও বুদ্ধিতে অত্যন্ত হুঁশিয়ার। ডিসুজা রান্নাবান্নার কাজটা ভালোই করে, কিন্তু তার মগজে কিছু নেই। আজ পর্যন্তও হ্যাসাগ-ল্যাম্পটা ঠিকমতো জ্বালাতে শেখেনি। দীন মহম্মদ দু'দিনেই তা রপ্ত করেছে। মনিব কখন কোথায় যেতে কোন জামা কাপড় পরবেন, কোন জিনিস সঙ্গে নেবেন সব তার জানা হয়ে গেছে। সাহেবের আপিসে ফাইল, আলমারির বই, কলম, পেন্সিল সে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। ঘুম ভাঙলেই চায়ের পেয়ালা, বাড়ি ফিরলেই বিয়ারের মগটি হাতের কাছে এগিয়ে ধরে। ফেয়ারওয়েদার বলেন, দীন মহম্মদ তাঁর মাই ম্যান জীভস।

দীন মহম্মদের সব চেয়ে বেশি যত্ন ও মনোযোগ মনিবের মোটর বাইকটার প্রতি। ল্যাণ্ডিকোটালে জিনিসটা তখন নূতন। ফেয়ারওয়েদার যখন মোটরবাইক চেপে আপিসে যান তখন রাস্তার শুধু ছেলের দল নয়, বয়স্ক লোকেরাও বিস্ময়ে কৌতূহলে তাকিয়ে থাকে।

দীন মহম্মদ মোটর-বাইকটাকে দিনে বার বার করে ঝাড়ে, মোছে, পালিশ করে। সাহেব বেরোবার আগে দরজার কাছে এনে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়ি ফিরলে তাঁর হাত থেকে নিয়ে ঘরে তুলে রাখে। কোনো কোনো দিন ফেয়ারওয়েদার তাঁর আপিসের আর্দালীর বদলে দীন মহম্মদকে মোটর বাইকের পিছনে পিলিয়নে বসিয়ে বাজারে বা দপ্তরে নিয়ে যান। হর্ষে, গর্বে ও উত্তেজনায় সে-দিন তার যেন মাটিতে আর পা পড়ে না।

মুশকিল এই যে, ডিসুজার আপত্তি ঠিক ঐখানে। দীন মহম্মদ যে মোটর-বাইকের তদারকি করে এটা তার মোটেই মনঃপূত নয়। সুযোগ পেলেই সে তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। সাহেব যে ঐ পুঁচকে ছোঁড়াটাকে ফটফটিয়ায় হাত দিতে দিচ্ছেন তার ফল ভালো হবে না। হতভাগা একদিন জিনিসটা ভেঙেচুরে রাখবে। তখন যেন কেউ তাকে অর্থাৎ ডিসুজাকে দোষ না দেয় যে, সে আগের ভাগে সাবধান করেনি।

ডিসুজার মনোভাবটা বোঝা যায়। সে সাহেবের পেশোয়ারের আমলের ভৃত্য। সাহেবের জিনিসপত্রের উপরে কর্তৃত্ব তো তারই। অন্য আর কেউ, বিশেষ করে এই ক্ষুদ্র বালক যে তাতে ভাগ বসায় সে তার ইচ্ছা নয়। ফেয়ারওয়েদার মনে মনে হাসেন।

যে-কাজে তাঁর পূর্ববতীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, সে কাজে ফেয়ারওয়েদার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন। দমননীতি সফল হয় না? সে-কথা বলে শুধু তারা সে-নীতি চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করার হিম্মত নেই যাদের। ফেয়ারওয়েদার বলেন, দোমনা-নীতি বিফল হয়, দমননীতি নয়।

কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লা থেকে নির্মূল করলেন। উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। কী উপায়ে তা বিস্তারিত বলতে গেলে সময় লাগবে প্রচুর, শোনার ধৈর্য ও থাকবে না অনেকেরই। নির্মম নিষ্ঠুর হতে হয়েছে, অনেক নিরপরাধ স্ত্রী পুরুষ পাইকারি হারে শাস্তি পেয়েছে, সে-কথাও অস্বীকার করেন না। কিন্তু নাচতে নামলে তো ঘোমটা টানা চলে না। যেমন রোগ তেমনি তার চিকিৎসা। নাক্স-থার্টি খাইয়ে কি অ্যাপেণ্ডিসাইটিস সারানো যায়। তার জন্য সার্জেনের ছুরি চালাতে হয়।

বিদ্রোহীদের অনেকে ধরা পড়ল, অনেকে বা ধরা দিল। কিন্তু সুপীনের ফকীরের কেউ নাগাল পেল না। সে তার অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত জনকয়েক অনুচরসহ পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াল। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে আচমকা হানা দিতেও ছাড়ল না।

সীমান্ত সংঘর্ষ প্রায় মিটল কিন্তু ফেয়ারওয়েদারের ঘরে দ্বন্দ্ব থামল না। একদিন অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ডিসুজা এসে নালিশ করল, দীন মহম্মদ সাহেবের অনুপস্থিতিতে লুকিয়ে মোটর-বাইক চড়ার চেষ্টা করেছে।

অসম্ভব! মোটর-বাইক যেন সাধারণ সাইকেল, ঘণ্টা কয়েক ঠেলে ঠুলে, আছাড় খেয়ে শেখা যায়? ইঞ্জিনের ব্যাপার, তা চালাবার সংকেত জানতে হবে না? হিংসায় ডিসুজার কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়েছে কি? ফেয়ারওয়েদার তাকে নিজের কাজে মন দিতে বললেন।

"মুনশীজী এ সম্পর্কে পুস্তু প্রবাদ কী বলে?"

মুনশী পাশেই বসেছিলেন। তাঁর পানে তাকিয়ে সহাস্যে শুধালেন।

প্রত্যুত্তরে মুনশী হাসলেন না। সবিনয়ে বললেন, "হুজুর দানীশমান্দ, বিজ্ঞ লোক। সব কিতাবের খবর রাখি আমার এমন ইলেম কোথায়? তবে চলতি একটা কথা আছে,—দুনিয়ায় ঘটনার সীমা নেই; সীমা আছে শুধু ধারণার।"

মাস খানেক পরের ঘটনা। হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে ফেয়ারওয়েদারের ঘুম ভেঙে গেল। কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

এই বাংলোয় এই ঘরে এই খাটে ঘুমের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন লেনস্‌ট হুইলার। ফেয়ারওয়েদার বালিশের নীচে থেকে গুলীভরা পিস্তলটা হাতে নিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। সাবধানে জানালাটা একটুখানি খুলে দেখলেন। আকাশে চাঁদের আলো স্তিমিতপ্রায়। আবছা অন্ধকারে মনে হল, কি একটা বিরাট জন্তু বাংলোর বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে গেল।

নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এলেন। খানিকটা এগুতেই বুঝলেন, দূর থেকে যেটা জন্তু মনে হয়েছিল, সেটা তার নিজের মোটর-বাইক। দীন মহম্মদ দু'হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাবে কোথায়? সদর দরজায় বন্দুকধারী সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে।

দীন মহম্মদ সদর দেউড়ির দিকে গেল না। বাড়ির পিছন ভাগে আখরোট গাছটার আড়ালে দেওয়ালে একটা ছোট দরজা আছে। কখনও ব্যবহার হয় না, তালাবন্ধ থাকে। দীন মহম্মদ পকেট থেকে চাবি বের করে ধীরে ধীরে তালা খুলল। সন্তর্পণে মোটর-বাইকটা নিয়ে রাস্তায় নামল। তারপর পিছনের দরজাটা আলগোছে টেনে ভেজিয়ে দিল। বিস্মিত ফেয়ারওয়েদার তার পিছু নিলেন।

নিঝুম নিশুতি রাত্রি। পথে জনপ্রাণী নেই। দীন মহম্মদ মোটর-বাইকটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ছাউনির প্রায় শেষ প্রান্তে রাস্তা যেখানে চৌমাথায় মিলেছে সেখানে এসে সে এক মিনিট থামল। তারপর ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে প্যাডেলে সজোরে আঘাত করতেই মোটর-বাইকের ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়ে গর্জন করে উঠল। দীন মহম্মদ অবলীলাক্রমে সিটের উপর চেপে বসল, সুদক্ষ চালকের মত তীরবেগে চালিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। বোঝা গেল, নৈশ অভিযানটা আজই প্রথম নয়। অনেক দিন থেকেই সে মোটর-বাইক চালনা অভ্যাস করেছে।

ফেয়ারওয়েদার স্তব্ধ বিস্ময়ে ধীরে ধীরে বাংলোয় ফিরে এলেন।

ঘণ্টা খানেক পর যেমন নিঃশব্দে যে-পথ দিয়ে দীন মহম্মদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, তেমনিভাবে ঠিক সে-পথেই সে বাড়ি ফিরে এল। সাবধানে মোটর বাইকটি ঘরে তুলে রাখল। তারই পাশে নিজের খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নিজের ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে তার মনিব যে নির্বাক বিস্ময়ে তার গোপন নৈশবিহারের সমস্তই প্রত্যক্ষ করেছেন, সে-কথা সে জানতে পারল না।

পরদিন সকালে দীন মহম্মদের প্রাত্যহিক কাজে কোথাও কোনো খুঁত ছিল না। বাথ-রুমে সাহেবের স্নানের গরম জল টাব-ভর্তি। আলনায় ইস্তিরিকরা আপিসের পোশাক। জুতোজোড়া পালিশে চকচকে। ফাউণ্টেন পেন, পার্স; নোটবই, তামাকের পাইপ ও পাউচ—যা যা প্রয়োজন সবই টেবিলের উপরে পরিপাটি সাজানো। বারান্দায় মোটর-বাইকটি ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার, তার কোথাও এক কণা ধুলোর চিহ্ন নেই।

"কাল রাত্রিতে কোথায় গিয়েছিলে?" ফেয়ারওয়েদার গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

দীন মহম্মদ প্রথমে চমকে উঠল। তারপর মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কবে থেকে লুকিয়ে আমার মোটর-বাইক চড়ে বেড়াচ্ছ? মুখে কথা নেই যে? জবাব দাও।" ক্রুদ্ধ মনিব দাবী করলেন।

দীন মহম্মদ নিরুত্তর।

"আমি বেয়াদপ পুষিনে। পাজি, হতচ্ছাড়া, তোমার নোকরি খতম। আজই চলে যাবে এখান থেকে।" কঠিন স্বরে আদেশ দিয়ে ফেয়ারওয়েদার আপিসে চলে গেলেন।

বিকেলে বাড়ি ফিরে ডিসুজার কাছে শুনলেন, দীন মহম্মদ চলে গেছে। কোথায় তা ডিসুজা জানে না। তার একান্ত নিজস্ব যে সম্পত্তি নিয়ে প্রথমে সে এ-বাড়িতে ঢুকেছিল—গোটা-দুই সালোয়ার, একজোড়া চপ্পল, একটা পিরান, একখানা তিনফলা ছুরি, কাঠের ছোট চিরুনি—এ-রকম আর দু'একটা ছোটখাটো জিনিস—তাছাড়া দীন মহম্মদ সঙ্গে কিছুই নিয়ে যায়নি। সাহেবের দেওয়া উর্দি, পিতলের বোতাম বসানো জীবনের কোট, পশমের গলাবন্ধ, এমন কি নিকেলের চেনবাঁধা হুইসিল বাঁশিটি পর্যন্ত

ফেলে রেখে গেছে।

ফেয়ারওয়েদারের মনটা খারাপ হল। ছেলেটা অনেকদিন ছিল। তার উপর একটা মায়া বসে গিয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলা মুনশী আসতেই তাঁকে ঘটনাটা বললেন। মুনশীর চোখে মুখে কোনো ভাবান্তরের চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি যে কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিস্মিত হয়েছেন এমন মনে হল না। শান্ত কণ্ঠে বললেন, "হুজুর, স্ত্রীলোক এবং বালক দুই-ই সরল। কিন্তু প্রলোভনে পড়ে একবার যদি পা পিছলোয় তবে তাদের হঠকারিতার সীমা থাকে না।"

হুজুর মৃদু হেসে তার মুখের পানে তাকাতেই মুনশী তাড়াতাড়ি বললেন, "না সাহেব, এ কোনো প্রবাদ বা পুঁথির কথা নয়, এ আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা।"

সেদিন ছাত্র বা শিক্ষক কারুরই পড়া বা পড়ানোতে মন বসল না। মুনশী যখন বিদায় নিতে উঠলেন তখন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "গোস্তাখি মাফ হয়, শুনেছিলাম হুজুর দু'বছরের জন্য এখানকার কর্তা হয়ে এসেছিলেন। আপনি পেশোয়ারে ফিরে যাবেন কবে?"

"আমার টেনিওর অর্থাৎ এখানকার চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এবার গেলেই হয়।" ফেয়ারওয়েদার ঔদাসীন্যের স্বরে জবাব দিলেন।

তিনি যে কাজের ভার নিয়ে ল্যাণ্ডিকোটালে এসেছিলেন, তা সম্পন্ন করেছেন। উপরওয়ালারা খুব খুশি। ছোটখাটো সাময়িক উপদ্রব সীমান্ত সরকারের গা-সহা। ফকীরের দু'চারটে একক বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত। সুতরাং তিনি এখানকার আধা-সামরিক কার্যভার ছেড়ে যে-কোন দিন জয়গৌরবে অনায়েসে ফিরে যেতে পারেন নিজের বেসামরিক সার্ভিসে। ডেপুটি কমিশনার হয়ে বসতে পারেন নিরাপদ নিরুপদ্রব জেলায়। কিন্তু সুপীনের ফকীরকে ধরতে পারেননি, তাঁর মনে সে খেদ ছিল। পুরাপুরি সাফল্যের তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না।

এ তথ্য মুনশী অনুমান করেছিলেন কি না জানার উপায় ছিল না। তিনি সামনে ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে বললেন, "খোদা হাফীজ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" হাতের ডিজ লণ্ঠনের আলোতে পথ দেখে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

পরদিন থেকে মুনশীর আর দেখা পাওয়া গেল না। ইতিপূর্বে কখনও তাঁর কাজে কামাই হয়নি। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টায় ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ডান হাতে একটি লাঠি ও বাঁ হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে এসে হাজির হতেন।

ফেয়ারওয়েদার প্রথমে ভাবলেন বোধহয় অসুখ করেছে। দিন সাতেক পরে খবর পাওয়া গেল মুনশী তাঁর গাঁয়ে চলে গেছেন। কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

জায়রাদ থেকে আফগান সীমান্তে লাণ্ডিখানা অবধি যে-রেল চলে একদিন প্রকাশ্য দিব্যালোকে ফকীর তারই উপরে চড়াও হলো। প্যাসেঞ্জারদের টাকাকড়ি, সরকারের রসদপত্র কেড়ে নিয়ে গেল।

ফেয়ারওয়েদারের জেদ বেড়ে গেল। যে করেই হোক ফকীরকে শেষ না করে তিনি নড়বেন না। তাঁর সন্দেহ হল আশেপাশের পাহাড়ে, অরণ্যে লুকিয়ে থাকলেও সে হামেশাই লোকালয়ে যাতায়াত করে। কেউ তাকে গভর্ণমেন্টের হাতে ধরিয়ে দেয়

না। হয়তো ভয়ে নয়তো ভক্তিতে। তাকে জীবিত বন্দী করার আশা দুরাশা মাত্র। অন্য পন্থা ধরতে হয়।

পেশোয়ারের ক্লাবে লণ্ডন টাইমস আসে। ল্যাণ্ডিকোটালের অফিসারেরা তা পড়তে পায়। সেদিন রাত্রিতে ডিনারের শেষে একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। ডিসুজা এসে সংবাদ দিল, দুপুরে দীন মহম্মদ এসেছিল।

দীন মহম্মদকে তাড়িয়ে দিয়ে ফেয়ারওয়েদার নিজেই অনুতপ্ত ছিলেন। আহা, ছেলে-মানুষ, মোটর-বাইক চড়বার লোভ সামলাতে পারেনি। সেজন্য এতখানি কঠোর দণ্ড না দিলেও চলত। বেয়ারা অবশ্য নূতন একজন রাখা হয়েছে, কাজও আটকে নেই। কিন্তু তার মতো না বলতেই কী চাই তা আঁচ করে হাতের কাছে জিনিসটি আগের ভাগে এগিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। দীন মহম্মদের অভাব ফেয়ারওয়েদার প্রতিদিনই অনুভব করেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দীন মহম্মদ চলে যাওয়াতে ডিসুজাও সুখী নয়। ছোকরা বজ্জাতি একটু করত সন্দেহ নেই। সহবৎও শেখেনি। মানী লোকের অর্থাৎ ডিসুজার মানমর্যাদা কি করে রাখতে হয় তাও জানে না। তা মাঝে মাঝে দু'চারটে চড়চাপড়, বা দু'এক ঘা চাবুক কষিয়ে দিলেই হতো। একেবারে বরখাস্ত করে বাড়ির বার করে দেওয়া কেন? সাহেবের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।

বাড়িতে গৃহিণী নেই। অকৃতদার মানব দিনের বেশির ভাগ সময়টাই থাকেন আপিসে বা শহরের বাইরে কাজেকর্মে ব্যাস্ত। সংসারে কাজের চাপ নেই। এমন অবস্থায় অন্তত ঝগড়া করার জন্যও একজন কাউকে কাছে না পেলে ডিসুজার দিন কাটতে চায় না। নতুন বেয়ারাটা একটা আস্ত উজবুক। কি ভাষায় যে কথা বলে সে-ই জানে। ডিসুজা তো তার অর্ধেক বুঝতেই পারে না।

দীর্ঘদিন পরে দীন মহম্মদকে দেখে ডিসুজা সত্যি খুশী হয়েছিল। সে এসেছিল শুনে সাহেবও যে অখুশী নন, তা বোঝা গেল। কী চায় দীন মহম্মদ? ফিরে আসার ইচ্ছা যদি তবে এসে কাজে লেগে যাক। সাহেবের আপত্তি নেই। তবে না বলে-কয়ে মোটর-বাইকে যেন হাত না দেয়।

ডিসুজা জানাল, দীন মহম্মদ নোকরি চাইতে আসেনি। এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল, অমনি একবার দেখা করে গেল। হাজার হোক, ছোকরা তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। অনেক গল্প করল। ইনামের কথা জিজ্ঞাসা করছিল। কথাটা কি সত্যি? সত্যি হলেই বা ইনাম পাবে কে? সত্যি হলেই বা ইনাম পাবে কে? সুপীনের ফকীর কখন কোথায় থাকে তা কেউ জানতে পারে না। জাদু করতে জানে, ধরতে গেলে চোখের সামনে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যায়। তার গায়ে আঁচড়টি কাটা কারো সাধ্য নেই। তা সাহেব যা-ই মনে ভাবুন না কেন।

ইনাম মানে পুরস্কার। ছাউনিতে, আশেপাশের গ্রামে, হাটে, বাজারে, জীরগায় ঢোল-শহরতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে-কেউ ফকীরের জীবিত বা মৃতদেহ এনে হাজির করবে, সে-ই গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। ফকীরের ফটোসহ হাজার হাজার ইশতাহার ছেপে বিলিকরা হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড় বড় পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন ফল হয়নি। ফেয়ারওয়েদার হতাশ হয়ে নিজের মনে মনে ফকীরের কাছে পরাজয় স্বীকার করছিলেন।

দু'দিন পরে খবর এল, ল্যান্ডিকোটালের দু'মাইল উত্তরে পাহাড়ের ওপারে ফকীরকে কে একজন গুলীর আঘাতে ঘায়েল করেছে। মৃতদেহটা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে এনে দাখিল করেছে ছাউনির দপ্তরে।

পূর্ণ সাফল্যের গর্বে উৎফুল্ল ফেয়ারওয়েদার পুরস্কারের টাকাটা হাতে হাতে চুকিয়ে দিতে চাইলেন।

টাকা নিতে যে এল তাকে দেখে ফেয়ারওয়েদারের দু'চোখে পাতা পড়ে না। মাথায় পাঠানের পাগড়ি, গায়ে ছোট কুর্তা, তার একপাশে বাঁ দিকের কোমরে চামড়ার বেল্টে বাঁধা পিস্তল,—মিলিটারি ভঙ্গিতে সেল্যুট করে দাঁড়াল দীন মহম্মদ।

এও কি সম্ভব? এই একফোঁটা ছেলেটা মেরেছে দুর্ধর্ষ ফকীরকে, যার ভয়ে বয়স্ক লোকেরাও কম্পমান, যার চতুর বুদ্ধির কাছে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত অভিযান ব্যর্থ হয়েছে? দীন মহম্মদ মেরেছে তাকে?

হ্যাঁ, সাক্ষ্যপ্রমাণে ভুল নেই। অব্যর্থ তার তাক। গুলী লেগেছিল ফকীরের বুকের ঠিক মাঝখানে।

ফেয়ারওয়েদার সিন্দুক খুলে থাকে থাকে সাজানো পাঁচ শ-খানা দশ টাকার নোটের তাড়া তুলে দীন মহম্মদের হাতে দিলেন। সে এক, দুই করে গুণে এগার শ টাকা রেখে বাকিটা ফিরিয়ে দিল। "ওতেই হবে, আর চাইনে।"

তার মানে? জিজ্ঞাসু নেত্রে ফেয়ারওয়েদার তার পানে তাকালেন।

দীন মহম্মদ জানাল, একটা ফট্‌ফটিয়া দেখে রেখেছে পেশোয়ারে। তার দাম এগার শ' টাকা। কালই তা কিনতে রওনা হবে।

পুরাতন একটা ঘটনা স্মরণ করলেন ফেয়ারওয়েদার। সরকারী কাজে শলাপরামর্শের জন্য মাঝে মাঝে পেশোয়ারে যেতেন। দু' একবার দীন মহম্মদ সঙ্গে ছিল। পেশোয়ারে মিলটন কোম্পানী বিখ্যাত জে-ডাব্লিউ-এ মোটর-বাইকের সেলিং এজেণ্ট। বড় রাস্তার পাশে তাদের কাঁচ দিয়ে ঘেরা বিরাট শো-রুম। ভিতরে সারিবন্দী মোটর-বাইক সাজানো। মনে পড়ল, দীন মহম্মহদকে সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলেন।

সব টাকাটাই যে তার প্রাপ্য সে কথা দীন মহম্মদকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। মোটর-বাইকের দাম না হয় এগার শ' টাকা। বাকি টাকায় নিজের ইচ্ছামতো আরও অনেক জিনিস সে কিনতে পারবে। নূতন পিরান, জরির কাজ করা চপ্পল, পশমিনার চাদর, আরও কত কী।

দীন মহম্মদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, আর কিছুতে তার জরুরত নেই। সে পুরুষ মানুষ মেহনত করতে পারে। নোকরি করে যা পাবে ততেই দিন গুজারা হবে। বেশী টাকা দিয়ে হবে কী?

কিছুতেই তাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটা নিতে রাজী করানো গেল না।

প্রয়োজনের অধিক টাকা হাতে পেয়েও নিতে চায় না এমন লোককে কবে দেখেছে? দুর্বোধ্য প্রহেলিকা মানব চরিত্র। সব চেয়ে রহস্যময় এ বালক।

ফেয়ারওয়েদার কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেউ যা পারেনি, তুই তা পারলি কেমন করে?"

দীন মহম্মদের চোখে মুখে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়ল। বোধ হয় ভাবল যে,

ফকীরকে কে মেরেছে সে সম্পর্কে সাহেবের মনে সন্দেহ আছে। মিনতির সুরে বলল, "আমি মিথ্যা বলিনি, হুজুর। প্রমাণ চান তো—"

ফেয়ারওয়েদার তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "না আমি তোকে অবিশ্বাস করিনি। আমি শুধু জানতে চাই, তুই এমন অব্যর্থ নিশানা করলি কেমন করে? ফকীরের গতিবিধি কেউ সঠিক জানতে পারে না। সে যে পাহাড়ের ঐ ঘাঁটিতে ছিল সে-খবর তুই পেয়েছিলি কোথা থেকে?"

"বাঃ রে, সে তো খুব সহজ। সে যে আমার বাবা।"

ফেয়ারওয়েদার বোধ হয় বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আওয়াজ বেরুল না। তাঁর মনে হল কে যেন দু' হাত দিয়ে তাঁর গলাটা জোরে চেপে ধরেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হল। বাতাসে কি যথেষ্ট অক্সিজেন নেই? ঘরের মেঝেটা কি দুলছে? পাছে পড়ে যান, দু' হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে চেপে ধরলেন।

দীন মহম্মদ 'আলিকুম সেলাম' বলে শুধু মোটর-বাইকের দাম কুর্তার পকেটে পুরে চলে গেল। ফেয়ারওয়েদার টেবিলের উপরে বাকি টাকার তাড়াগুলির পানে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সে দিনই টেলীগ্রামে বদলীর আদেশ প্রার্থনা করলেন।

ভয়ে? উঁহুঃ, ভয় শব্দ নেই ফেয়ারওয়েদারের অভিধানে।

ঘৃণায়? এতগুলো টাকা সেধে দিতে চাইলেও যে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করে তাকে ঘৃণা করবেন তিনি কোন্ মুখে?

তবে?

সেই 'তবে'র উত্তরটা আর শোনা হল না আমার। আমাদের জাহাজ ততক্ষণে ডিয়েপে পেঁছে গিয়েছে। জেটিতে ভিড়তে আর দেরি নেই। ফেয়ারওয়েদার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন, "আমার ব্যাগেজ আছে আপার ডেকে, যাই তুলে নিতে হবে।"

আন্তরিকতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করে বললেন, "প্যারিসে তোমার ছুটির দিনগুলি সুখকর হোক। হ্যাভ্ এ গুড টাইম।"

বারুদ

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মানুষের স্মৃতিশক্তির নানা প্রকারভেদ আছে। কেউ সহজে মনে রাখে সংখ্যা। তারাই গণিতের পরীক্ষায় বেশী নম্বর পায়। কারুর বা মনে দাগ কেটে বসে ঘটনা। তারা বহু পুরানো দিনের ইতিকথা খুঁটিনাটি সহ স্বচ্ছন্দে নির্ভুল বলে দিতে পারে।

আমার স্মৃতিতে মানুষের চেহারা আঁকা হয়ে থাকে দীর্ঘকাল; তাদের নাম তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। পথে-ঘাটে ক্লাবে, পার্টিতে, অনেক লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা চেনা মনে হয়, অথচ তাঁদের সঠিক পরিচয় স্মরণে আসে না।

আশ্চর্য নয় যে, তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। পনর, বিশ বা পঁচিশ বছর আগে পটুয়াখালী, কিশোরগঞ্জ বা বর্ধমানে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় ছিল আজ দেখা মাত্র তাঁদের নামটা বলতে না পারাটা যে নিছক একটা পোজ অর্থাৎ ভড়ং সে-বিষয়ে তাঁদের মনে সংশয় থাকে না। আড়ালে তিক্ত চিত্তে মন্তব্য করেন,—বড় চাকরির দেমাক, এমনই বটে! প্রতিবাদ করে লাভ নেই। সৃষ্টিকর্তা আমার স্মরণশক্তিতে যে ঘাটতি ঘটিয়েছেন তার খেসারত কিছু না দিয়ে উপায় কী?

প্ল্যানিং কমিশনের একটা ম্যাচিং-গ্র্যাণ্টের স্কীম নিয়ে রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সে উপলক্ষে মাদ্রাজে এসেছিলাম। ফিরতি যাত্রায় মীনাবকম এয়ারপোর্টে প্লেনের অপেক্ষায় ছিলাম। ব্যাগেজ চেক অনেক আগেই হয়ে গেছে। এমন সময়ে মাইকে বিমান-কোম্পানীর ঘোষণা শোনা গেল, তাঁরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন, টেকনিক্যাল কারণে দিল্লীমুখো ফ্লাইট নম্বর চারশ'তিন ছাড়তে আধ ঘণ্টা বিলম্ব হবে।

বিমানযোগে যাঁরা হামেশাই যাতায়াত করেন এবং বিমান কোম্পানীগুলির হাঁড়ির খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন "টেকনিক্যাল কারণটা" বেশীর ভাগ সময়েই প্লেনের যান্ত্রিক গোলযোগ বা আবহাওয়ার অসুবিধা নয়। তার অর্থ কর্মচারীরা আচমকা ধর্মঘট করেছে, এয়ার হোস্টেস আসেনি, পাইলটের মুখে তীব্র মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কিম্বা ঐ ধরনের অন্য কোনো অঘটন যা খোলাখুলি বলা চলে না।

আসল কারণটা যাই হোক, বোঝা গেল, আপাততঃ বসে থাকার পালা। এবং তার মিয়াদটা অনির্দিষ্ট। আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানি টেকনিক্যাল কারণে দেরিটা আধ ঘন্টা থেকে গড়িয়ে তিন চার ঘণ্টায় দাঁড়ালেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং সময় সংহারের জন্য পঠনযোগ্য কিছু চাই। তারই সন্ধানে বুকস্টলের দিকে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ ঝন্‌ঝনাত আওয়াজ। পিছনে তাকিয়ে দেখি অদূরে একটি মহিলার হাত থেকে রূপার পানের ডিবেটা ছিটকে পড়েছে মেজেতে। পান সুপুরি ও অন্যান্য মশলা চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। মহিলার লজ্জাজড়িত মুখটি চোখে পড়তেই চমকে উঠলাম। এ মুখ তো অচেনা নয়।

একটা বিলাতী সচিত্র মাসিক পত্রিকা কিনে ফিরে এসে নিজের পরিত্যক্ত পুরু

গদি আঁটা আসনটা পুনরায় দখল করে বসলাম। কিন্তু ছবি বা গল্প কোনোটাতেই মনোনিবেশ করা গেল না। সেই হঠাৎ দেখা মুখটির কথা ভেবে চিত্ত কেবলই বিক্ষিপ্ত হতে থাকল।

উঠে গিয়ে মহিলা যেখানে বসেছিলেন সেখান দিয়ে বার দুই পাদচারণ করলাম। কিন্তু তিনি শাড়িটা মাথার উপরে এমন টেনে দিয়েছিলেন যে তাঁর মুখটি দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ হল না। মহিলা বর্ষীয়সী। আমি নিজেও অনেক কাল আগেই পঞ্চাশোর্ধ্বে। কিন্তু বয়স যা-ই হোক না কেন, একজন অজ্ঞাতকুলশীল পরস্ত্রীর দিকে বারে বারে দৃষ্টিক্ষেপের চেষ্টা কোনো পুরুষের পক্ষেই সুরুচির পরিচায়ক নয়। অগত্যা কৌতূহল দমন করতে হল। ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের প্লেনে ওঠার ডাক পড়ল।

শুনেছি বিমানযাত্রায় কারুর গা গুলোয়, কারুর বা কানে তালা লাগে। আমার ঘুম পায়। সহযাত্রীরা যখন খবরের কাগজ পড়েন, গল্প করেন বা জানালা দিয়ে নীচেকার অরণ্য পর্বত ও জনপদের দৃশ্য দেখেন আমি তখন সীটের উপরে দেহটাকে আধশোয়া ভঙ্গিতে এলিয়ে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা দিই।

আজ চোখে ঘুম এল না। কবে কোথায় ঐ মহিলাকে দেখেছি সে জিজ্ঞাসা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। এমন তো হতে পারে যে আমার ধারণাটা একেবারেই ভিত্তিহীন; মহিলা সম্পূর্ণ অপরিচিতা। উহুঁ। স্পষ্ট লক্ষ করেছিলাম, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি ত্রস্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। খণ্ডিত মুহূর্তের মধ্যে সে-মুখে যে একটি বিস্ময়মিশ্রিত ভয়ার্ত ছায়া পড়েছিল, সে কি সমস্তটাই আমার দৃষ্টিভ্রম? সেই এক পলকের দেখায় তিনিও আমায় চিনতে পেরেছিলেন বলেই যে আমার কাছে আত্মগোপনের ব্যগ্রতায় পরে আঁচলে মুখ ঢেকে বসেছিলেন সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও যখন পূর্ব পরিচয়ের কিছুই স্মরণে এল না তখন হাল ছেড়ে দিয়ে মনকে বোঝালাম, ধুত্তোর, কোথাকার কে এক বিগতযৌবনা স্ত্রীলোক, তার আইডেণ্টিফিকেশানের জন্য আমার মাথাব্যথা কেন?

কী আশ্চর্য! যে মুহূর্তে মন থেকে তার কথাটা জোর করে ঝেড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম ঠিক সেই ক্ষণে কী জানি কোন্ মন্ত্রবলে স্মৃতির বন্ধ দরজাটা আপনি খুলে গেল। নিমেষে তার অতীত পরিচয় সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো আমার মনের পর্দায় প্রতিফলিত হল। বহুদিন আগেকার এক রোমাঞ্চকর নাটিকার নায়িকা কুমারী তরলা বিশ্বাসকে স্মরণ করলাম।

দেশ বিভাগের আগে অখণ্ডিত বঙ্গভূমির যে অংশটা পদ্মা নদীর দক্ষিণে ছিল তারই একটা ছোট মহকুমার ঘটনা। শহরের নাম না বলাই ভালো। সন তারিখের উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সদ্য সেখানে বদলী হয়ে এসেছি। আমার কর্মজীবনের সেটা গড়া-পেটার অধ্যায়, ইংরেজীতে যাকে বলে ফরমেটিভ ইয়ার্স। সে-কালে ল' এ্যান্ড অর্ডার এবং রেভেনিউ, আইন-শৃংখলা ও রাজস্ব ছাড়া আরও অনেকগুলি সরকারী ও আধা-সরকারী কর্তব্যের ভার থাকতো মহকুমাশাসকের উপর। নৈবেদ্যের চূড়ায় সন্দেশের মতো স্থানীয় হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, পাবলিক লাইব্রেরী জাতীয় সমুদয় প্রতিষ্ঠানের শিরোভাগে তাঁর স্থান। সে-সবের

পরিচালন সমিতির তিনি পদাধিকারবলে সভাপতি, সরকারী পরিভাষায় যার নাম এক্স্অফিসিও চেয়ারম্যান।

শহরের একমাত্র মেয়েদের শিক্ষায়তন জুবিলী গালর্স স্কুল। তার অবৈতনিক সম্পাদক বৈকুণ্ঠবাবু দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক বয়সে প্রবীণ, পেশায় উকীল, অর্থে ও প্রতিষ্ঠায় সকলের শ্রদ্ধেয়। বললেন, অবিলম্বে গভর্নিং বডির একটা সভা ডাকা প্রয়োজন। হুজুরের যদি সুবিধে হয় তো আসছে সপ্তাহে।

মাত্র দিন সাতেক হল চার্জ নিয়েছি, এখনও শহরের লোকজন, রীতি-নীতি ও সামাজিক আবহাওয়ার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হয়নি। এরই মধ্যে মিটিং-এর তাড়া কিসের ?

তাড়া ছিল। বৈকুন্ঠবাবু জানালেন, হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে স্কুল কমিটির একটা সংঘর্ষ চলছে। তাড়াতাড়ি মিটিয়ে না ফেললে স্কুলটা নষ্ট হবে।

ব্যাপারটা যথেষ্ট স্পষ্ট হল না। স্কুলে পড়াশুনার ভারটা হেডমিস্ট্রেসের। আইন-কানুন বেঁধে দেন, টাকা-কড়ি যোগান কমিটি। হেডমিস্ট্রেসকে হয় তাঁদের নির্দেশ মানতে হয়, নয়তো যেতে হয়। এর মধ্যে লড়াই-এর প্রশ্ন আসে কোথা থেকে আর তা না থামালে স্কুলের সর্বনাশই বা হবে কেন ?

সেক্রেটারী মশায় সবিনয়ে জানালেন, তরলা বিশ্বাস সাধারণ হেডমিস্ট্রেসের মতো নয় ; আর পাঁচ-জন প্রধানা-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই চলে না। এখানকার গার্লস স্কুল মানেই মিস বিশ্বাস।

এ-সব উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য কুমারী বিশ্বাসের চাকরিতে "সি-আর" এবং ব্যক্তিগত সার্টিফিকেটের পক্ষে নিশ্চয়ই মূল্যবান। কিন্তু তাতে আমার প্রশ্নটার জবাব মেলে না। বৈকুণ্ঠবাবু নিজেও বোধ হয় তা' উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করলেন, স্কুলটা শুরু থেকেই ছিল একটা আধমরা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষয়িত্রীরা অযোগ্য, ছাত্রীরা অমনোযোগী, পড়াশুনা প্রায় কিছুই হতো না।

যে-দিন থেকে তরলা বিশ্বাস হেডমিস্ট্রেস হয়ে এসেছেন সে-দিন থেকে ধীরে ধীরে স্কুলের চেহারা পালটে গেছে। গত বছর একটি ছাত্রী ডিভিশন্যাল স্কলারশিপ পেয়েছে। "শুধু তাই নয়, স্কুলের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না, মিস বিশ্বাস এখানকার বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা ডোনেশান ও সিনেমা হাউসের মালিকের কাছ থেকে চ্যারিটি-শো আদায় করে স্কুলের বিল্ডিং ফাণ্ড গড়ে তুলেছেন।" সকৃতজ্ঞ কন্ঠে যোগ করলেন বৈকুণ্ঠবাবু।

তরলা বিশ্বাসকে চোখে দেখা দূরে থাক, এর আগে তাঁর নামও শুনিনি। সুতরাং এই গদগদ প্রশংসায় অতিশয়োক্তির ভাগ কতখানি জানিনে। কিন্তু স্কুলের পক্ষে তিনি যদি এতই অপরিহার্য, তবে তাঁর সঙ্গে স্কুল কমিটির দ্বন্দ্বটা কিসের ?

সম্পাদক মশায় যা জানালেন তার সংক্ষিপ্তসারটুকু এই—তখনকার দিনে ছোট শহরের ছেলে-মেয়েরা ধুতি, সার্ট, পাঞ্জাবী, হাফপ্যান্ট, ফ্রক, শাড়ি যার যা জোটে তাই পরে স্কুলে যেত। দার্জিলিং বা সিমলা, দিল্লীর কনভেণ্টে পড়ুয়াদের মতো টিউনিক তাদের কল্পনারও বাইরে ছিল। জামা-কাপড়ে যথেচ্ছাচার বরদাস্ত করা নূতন হেডমিস্ট্রেসের স্বভাবে নেই। তাঁর নির্দেশে জুবিলী স্কুলের মেয়েদের পোষাকেও একটা অলিখিত কিন্তু সুস্পষ্ট ফর্ম গড়ে উঠেছিল। সেটা ব্যয়বহুল না

হয়েও সুদৃশ। সরল ও সহজসাধ্য। এই নিয়মানুবর্তিতার ব্যাঘাত ঘটলে কঠোর ডিসিপ্লিনে বিশ্বাসী তরলা বিশ্বাস খুশি হবেন না—এটা অপ্রত্যাশিত নয়।

সে-দিন দশম শ্রেণীর একটি ছাত্রীর ওষ্ঠাধরে অকস্মাৎ লীপস্টিকের রক্তিম প্রলেপ দেখে তিনি স্তম্ভিত হলেন। মেয়েটি ক্লাশের সেরা ; ফি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। কিন্তু পড়াশুনায় ভালো হলেই কি নিয়ম ভাঙার অধিকার জন্মায় ? ক্রুদ্ধ হেডমিসট্রেস স্কুলের খাতা থেকে মেয়েটির নাম কেটে দিলেন।

অনুতপ্তা ছাত্রীর ত্রুটি স্বীকার এবং বারংবার ক্ষমা-প্রার্থনায় দিন তিনেক পরে উদ্দীপ্ত-রোষ প্রধান শিক্ষয়িত্রী যখন শান্ত হলেন, তখনই অভিভাবকেরা গোল বাধালেন। মেয়েটির কাকা স্কুল কমিটির সদস্য। তিনি হেডমিসট্রেসের লিখিত কৈফিয়ৎ তলব করলেন। কারুর হুমকিতে নত হবেন তরলা বিশ্বাস সে-পাত্রী নন। জবাবে তিনি দু'লাইনের একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। সেটা তাঁর চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার নোটিশ,—লেটার অব রেজিগনেশান।

বোঝা গেল, কারণটা তুচ্ছ এবং বিরোধটা অনাবশ্যক। উভয়পক্ষেই যুক্তির চাইতে জেদ বেশী, অভিযোগের চাইতে উত্তাপ। এ-সব প্রেস্টিজ ইস্যু, মিটিং করে মীমাংসা হয় না। একদিন বিবদমান দুই পক্ষকে নিজের খাশ কামরায় ডেকে আনলাম।

ইংরেজী প্রবাদে বলে, এপিয়ারেন্স নাকি ডিসেপটীভ। হবেও বা। অন্ততঃ তরলা বিশ্বাসকে দেখে রণরঙ্গিণী মনে হয় না। বয়স চল্লিশের ধাপ ছুঁয়েছে, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, চোখে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি, মুখে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ। মহিলা সুন্দরী নন,—মিষ্টি ; প্রিটী নন,—প্লেসেণ্ট।

কিন্তু তিনি যে সংকল্পে অবিচল এবং তর্কে সুপটু সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রইল না। মানুষের জামা, কাপড়, পরিধান, প্রসাধন নিতান্তই বাইরের ব্যাপার, সাজ-সজ্জার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অনর্থক বড় করে না দেখাই উচিত এসব কথায় তাঁকে টলানো গেল না। যুগ-পরিবর্তন, শালীনতার ধারাবদল, ব্যক্তিগত রুচি ইত্যাদিকে তিনি আমলই দিলেন না।

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "মাফ করবেন, ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে কি আপনি আপিসে আসেন ? কোঁচা দুলিয়ে টেনীসে যান ?"

এমন ফ্রণ্ট্যাল অ্যাটাকের—সরাসরি আক্রমণের—জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। শ্রীমতী তরলা আর যাই হোন সার্থকনামা নন।

তাঁর বক্তব্য এই যে, তাঁর স্কুলের মেয়েরা গালে রুজ এবং ঠোঁটে রং মেখে বিয়ের নিমন্ত্রণ বা পার্টিতে গেলে তিনি দুঃখিত হবেন, কিন্তু আপত্তি করবেন না। বিদ্যালয়টা লেখাপড়ার স্থান, বিউটি কনটেস্টের নয়। সেখানে সাজপোষাকের একচুল নড়চড় তিনি সহ্য করবেন না।

বিলাত এ্যামেরিকার অতি-আধুনিকতার দৃষ্টান্ত তিনি এক কথায় নস্যাৎ করে দিলেন, "ওদেশেও যে মেয়েরা বিকিনি পরে সমুদ্রের ধারে রোদ পোহায় তারাই হাঁটু অবধি গাউন ও মাথায় টুপি ছাড়া গির্জায় ঢোকে না।"

তর্ক ছেড়ে তাই অন্য রাস্তা ধরতে হল। ঐ মেধাবী মেয়েটির ভবিষ্যৎ, স্কুলের সুনাম, ছাত্রীদের প্রতি তাঁর মাতৃসম স্নেহশীল দায়িত্ব এবং ঐ রকম আরও বাছা বাছা সেণ্টিমেণ্ট্যাল আবেদনের দ্বারা অবশেষে জুবিলী গার্লস স্কুলের সংকটমোচন করা গেল।

চার পাঁচ মাস তরলা বিশ্বাসের আর কোনো সাড়া শব্দ পাইনি। স্কুল কমিটির সদস্যেরা যথাপূর্বং স্কুলের ভার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের রুজি-রোজগারে ব্যস্ত এবং মিস বিশ্বাস কঠোর শাসন ও কঠিন পরিশ্রমে ছাত্রীদের বিদ্যার্জনের তদারক করছেন ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

খবরের কাগজে ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরিয়েছিল। জুবিলী স্কুলের একটি মেয়ে প্রথম দশজনের মধ্যে স্ট্যাণ্ড করেছে। আরও দু'তিনটি একাধিক লেটার পেয়েছে। মোট পাশের হারও গৌরবজনক। স্কুল কমিটির সভাপতিরূপে হেডমিস্ট্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম।

ধন্যবাদ জানিয়ে তার উত্তর এল। তাতে শিষ্টাচারের চাইতে আন্তরিকতার আভাস অধিক। পত্রের শেষাংশে একটি সসংকোচ অনুরোধ ছিল,—পরবর্তী শনিবার তাঁর বাড়িতে আমার সস্ত্রীক উপস্থিতি প্রার্থনা করেন।

দেয়াল দিয়ে ঘেরা স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যেই এক দিকে শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টারস। পাশাপাশি ছোট ছোট বাড়ি। পাকা দেয়ালের ঘর, করগেটেড টিনের ছাদ, সিমেণ্টে বাঁধানো মেজে। পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ি যেমন হয়, তেমনি। হেডমিস্ট্রেসের বাড়িটি ওরই মধ্যে একটু আলাদা। আয়তনেও বড়। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা আছে। কঞ্চির বেড়ায় ঘিরে সেখানে এক ফালি ফুলের বাগান।

মিস বিশ্বাস নিজেই দোর খুলে অভ্যর্থনা জানালেন।

বসার ঘরটিতে আসবাবের বাহুল্য নেই, পরিচ্ছন্ন পারিপাট্যের চিহ্ন আছে। একদিকে দেয়াল ঘেঁষে একটি নীচু তক্তপোষ। তার উপরে হালকা গদির বিছানা, সাদা ধবধবে চাদরে ঢাকা। খানতিনেক হাতলযুক্ত কাঠের চেয়ার। চেয়ারের পিছনটায় ক্রীম রং-এর কেসমেণ্ট কাপড়ের অড় পরানো। দরজা জানালায় একই রঙের ম্যাচ-করা পর্দা, তার মাথায় পুরানো ঢাকাই শাড়ির পার এপ্লিকের টেকনিকে বসানো। ঘরের এক কোণে ছোট জলচৌকির উপরে বৃন্দাবনী ঘটিতে গুটি কয়েক পাতার সঙ্গে শ্বেত গুলঞ্চের একটি প্রস্ফুটিত স্তবক। সব কিছু মিলিয়ে একটি স্নিগ্ধ সহজ পরিবেশ। মনে মনে মহিলার রুচির প্রশংসা করলাম।

কথায় কথায় তরলা বিশ্বাস জানালেন, কলেজে তিনি আমার মেজদির সহপাঠিনী ছিলেন, ডায়োসিশান থেকে একই বছরে বি-এ পাশ করেছেন। সে-সুবাদে আজ ভাইফোঁটার দিনে তাঁর বাড়িতে আমাদের আগমন তাঁর কাছে একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

আমি ছেলেবেলা থেকেই হোস্টেলে থেকে মানুষ হয়েছি, সিভিল সার্ভিসের জন্য বিদেশে গেছি এবং ফিরে এসে চাকরির খাতিরে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে নিজের বোনেদের হাত থেকে ফোঁটা নেওয়ার সুযোগই জীবনে বেশী ঘটেনি। তাই আজ পাতানো বোনের কাছে সে সম্ভাবনা আমাকে উল্লসিত করেনি।

কিন্তু আমার স্ত্রী অভিভূত হলেন। বেচারীর একটি মাত্র ছোট ভাই এয়ারফোর্সে ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট হয়েছিল। মাস দুই আগে যোধপুরের কাছে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ভাইফোঁটার উল্লেখে তাঁর চোখ দুটি জলে ছলছল হয়ে উঠল।

তরলা বিশ্বাস স্নেহভরে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন,

"আপনি আমাকে দিদি বলবেন, এমন প্রত্যাশা করিনে যদিও সেটা দাবি করলে অন্যায় হতো না। তবে মিলী যে আমার ছোট বোন নয়, একথাটা কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুমেও মানতে রাজী নই।"

এরই মধ্যে তিনি আমার স্ত্রীর আটপৌরে নামটাও জেনে নিয়েছেন।

বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম। মিস বিশ্বাস আমার হাতে কাগজে মোড়া একটি ক্ষুদ্র প্যাকেট দিয়ে বললেন, "সাহেব মানুষকে ধুতি দিয়ে লাভ নেই, সেটা হয় ঝাড়-পোঁছার কাজে লাগবে নয়তো শেষ পর্যন্ত বাবুর্চী, খানসামার ঘরেই যাবে। তাই ভাইফোঁটায় ছুঁচে কাজ করা একটি রুমাল দিলাম। ভয় নেই, ঘুষের দায়ে পড়তে হবে না, আমি বরং মিলীর কাছ থেকে একটা আধ-পয়সা চেয়ে নেব।"

পরিহাসে যোগ দিয়ে বললাম, "সেজন্যে ঘাবড়াই নে। ঘুষ নিলে দোষ নেই, ধরা পড়লেই মুস্কিল। কিন্তু রুমাল দিলে যে ঝগড়া হয় সে-কথা কি আপনি জানেন না?"

"জানি, কিন্তু সে শুধু মেয়েদের বেলায় খাটে, ছেলেদের নয়। মিলীকে অন্য জিনিস দিয়েছি।"

সেদিন হেমন্তের অলস অপরাহ্নের ঘণ্টা দুই সময় তরলা বিশ্বাস সত্যি সত্যি হাসিতে খুশিতে সরস এবং আন্তরিকতায় মধুর করে তুলেছিলেন।

অতি অল্পদিনেই মিলী ও তরলার মধ্যে একটি নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠল।

ম্যাজিস্ট্রেটকে স্থানীয় জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, কিন্তু জড়িত হতে মানা। শাসনকার্যের স্বার্থেই শাসকদের পক্ষে মেলামেশার ব্যাপারে একটু রাশ টেনে চলতে হয়। আমি যে তরলা বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কটা সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয়তার ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার পর্যায়ে উন্নীত করতে ব্যগ্র নই সেটা তিনি অনুমান করেছিলেন। তাছাড়া স্কুল কমিটির সভাপতি ও স্কুলের হেডমিসট্রেসের মধ্যে যে কিছুটা সসম্ভ্রম দূরত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার তিনি চেষ্টা করেননি। তাঁর মাত্রাজ্ঞান, ইংরেজিতে যাকে বলে সেন্স অব প্রোপোরশান, লক্ষ্য করে শ্রদ্ধাশীল হয়েছি।

সে-দিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে মিলী খবর দিল, জুবিলী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী অবসর নিয়েছেন, আসছে সপ্তাহেই সে শূন্যপদে নতুন নিয়োগ হবে।

সংবাদটা আমার অজ্ঞাত নয়। দিন তিনেক আগে স্কুল কমিটির আসন্ন মিটিংএর এজেন্ডা এসে গেছে। কিন্তু সে-খবর মিলীর কাছে পৌঁছলো কী করে?

নিজের কথার জের টেনে মিলী প্রশ্ন করল, "তোমরা কাকে নেবে ঠিক করেছ কি?"

তার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "কেন? তোমার কোনো এ্যাডমায়ারার ক্যান্ডিডেট আছে না কি?"

"ফাজলামি রাখো। আমি বলি কি, বাইরে থেকে কাউকে নেওয়ার দরকার কী? ঐ সুধাকেই প্রমোশন দাও না কেন? মেয়েটি দেখতে বেশ, স্মার্ট, সর্বদাই হাসি-খুশি"। মিলী প্রস্তাব করল।

আমি স্কুল কমিটির সভাপতির যোগ্য গাম্ভীর্যের ভান করে জবাব দিলাম, "না দেওয়ার গুটি চারেক প্রধান কারণ আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি। এক নম্বর,—সুধা যে কে এবং তার যোগ্যতা যে কী তা জানিনে। দুই,—দেখতে ভালো হওয়াটাই

এক্ষেত্রে বেস্ট কোয়ালিফিকেশান নাও হতে পারে ; কারণ স্কুলের জন্য একটি সহকারী শিক্ষয়িত্রী চাই,—বিয়ের কনে নয়। তিন—প্রমোশন দেওয়া না দেওয়ার মালিক কমিটি, আমি তার চেয়ারম্যান মাত্র। চার নম্বর—"

মিলী বাধা দিয়ে বলল, "কমিটি তো ভারি স্কুলের দেখাশোনা করেন। সেই যে কথায় বলে, ভাত-কাপড়ের কেউ নয় কিল মারবার গোঁসাই। স্কুল তো চালান তরলাদি।"

সুধা নাম্নী শিক্ষয়িত্রীটি যিনিই হোন তাঁকে প্রমোশন দেওয়ার ব্যগ্রতাটা যে কার এতক্ষণে তা বোঝা গেল। কেসটা তরলা বিশ্বাসের ; মিলী নিয়েছে তার ব্রীফ।

পরদিন বাদিনী স্বয়ং অত্র আদালতে হাজির হলেন।

সুধা বয়সে ছোট হলেও অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের চাইতে যে কত বেশী দক্ষ, ছাত্রীদের শেখাতে তার যে কী বিপুল যত্ন ও অধ্যবসায় তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। কবে কোন্ ইন্‌সপেকট্রেস অফ স্কুল তাকে কী সাধুবাদ দিয়েছেন তাও উল্লেখ করতে বাকী রইল না।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের নিয়োগ, প্রমোশন ও বরখাস্ত সম্বন্ধে সর্বত্রই কতকগুলি নিয়ম, পদ্ধতি আছে। সিনিয়রিটির প্রশ্নটাও সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না।

সে কথা শুনে তরলা বিশ্বাস জ্বলে উঠলেন। বললেন, "সিনিয়রিটি মানে তো প্রাচীনতা, আগে আসার জোর। তা হলে তো স্কুলের বুড়ী আয়াটাকেই হেডমিস্‌ট্রেস করতে হয় ; তার চেয়ে পুরানো স্কুলে আর কেউ নেই।"

আমি হেসে জবাব দিলাম, "আপনি ইংরেজী লিটারেচারের ছাত্রী ছিলেন, কলেজে বোধহয় লজিক পড়েননি। নইলে তুলনাটা যে লাগসই হয়নি সেটা নিজেই বুঝতে পারতেন।"

তরলা বিশ্বাস বুদ্ধিমতী। আমার মনোভাবটা আঁচ করতে তাঁর কষ্ট হল না।

মাস তিনেক পরের ঘটনা। গৃহিণী কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে গেছেন। বাড়িতে আমি একা। আপিস থেকে ফিরে একটা ইংরেজী উপন্যাস নিয়ে বসেছিলাম। সন্ধ্যার তখনও বাকী। কিন্তু বিকেল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তাই তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে এল। নতুন বেয়ারাটা কেরোসীনের পেট্রোম্যাক্সটা জেবলে দিতে এসেছিল। বলল, "এক মেমসাব হুজুরসে মিলনে আয়ী হৈঁ।"

মেম সাহেব ? কোথায় ?

সে জানাল বারান্দায় যেখানে গার্ডেন চেয়ারগুলি জড় করা আছে, সেখানে বসিয়েছে।

তরলা বিশ্বাস সন্দেহ নেই। স্ত্রীর অনুপস্থিতির কথা কি তিনি জানেন না ?

"মিলী তো এখনও কলকাতা থেকে ফেরেনি" বলতে বলতে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই, আগন্তুকা আমার দিকে মুখ ফেরালেন। একী ? এ তো মিস বিশ্বাস নন। বছর ত্রিশের একটি তন্বঙ্গী তরুণী। মোটামুটি সুন্দরী।

চেয়ার থেকে উঠে দু'হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "ক্ষমা করবেন, খুব বিপদে পড়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। আমি সুধা, জুবিলী গার্লস স্কুলের হিস্ট্রীর টীচার।"

নির্জন সন্ধ্যায় স্ত্রীবিরহিত বাড়িতে এক অপরিচিতা যুবতীর একক আগমনে বিব্রত বোধ করলাম।

বিপদ যে কোনো মানুষেরই ঘটতে পারে। তাই বলে বলা নেই, কওয়া নেই অজানা অচেনা মেয়েমানুষ যখন তখন মহকুমাশাসকের বাংলোতে হানা দেবে? ফটকে পুলিশ পাহারাদারটা করছে কী? আটকায়নি কেন? আমার ম্যাজিস্ট্রেটীয় মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল।

অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললাম, "আপনার বিপদের কথা আপনার হেডমিস্ট্রেসকে বলুন। তাঁর উপরে স্কুলের সেক্রেটারী আছেন, তাঁকে জানান। চোর, গুণ্ডার ব্যাপার হলে থানায় ডায়েরী করতে পারেন। শহরের প্রত্যেকটি লোকই যদি তার নালিস বা সমস্যা নিয়ে রাত বিরাতে সোজা আমার কাছে দৌড়ে আসে তবে তো এ্যাডমিনিস্ট্রেশান চলে না।"

সুধা নিশ্চয়ই এমন রূঢ় আঘাত প্রত্যাশা দূরে থাক, কল্পনাও করেনি। সে ভীত চকিত স্বরে বলল, "হেডমিস্ট্রেস নিজেই যে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। না, আর কাউকে দিয়েই কিছু হবে না। শুধু আপনিই আমাকে রক্ষা করতে পারেন।" বলতে বলতে তার কণ্ঠরুদ্ধ হলো, দুই কোমল গণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তার অশ্রুসিক্ত ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল। একটা চেয়ার টেনে বসলাম। শোনাই যাক না ব্যাপারটা কী?

সুধা মেয়েটি প্র্যাকটিক্যাল। ফেনিয়ে ফেনিয়ে কাহিনীকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করল না। শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু বিবৃত করল।

অল্প বয়সেই সুধার বিয়ে হয়েছিল। ভাগ্যদোষে বছর না ঘুরতেই স্বামীহারা। বর পুজোর ছুটিতে গ্রামে আসছিল, পথে ধলেশ্বরীতে তার নৌকাডুবি হল। অন্য যাত্রীরা কয়েকজন রক্ষা পেল, কারুর বা মৃতদেহ পরে সনাক্ত হলো। শুধু সুধার স্বামীর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। সবাই ধরে নিল, নিশ্চয়ই নদীর প্রবল জলস্রোত তার প্রাণহীন শরীরটাকে অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু সুধার শাশুড়ী সে-কথা মানলেন না। গৃহদেবতা নাকি তাঁকে স্বপ্নে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর ছেলে ডুবে মরেনি, ফিরে আসবে।

গ্রামে দেশীয় খৃষ্টানদের একটা কলোনী ছিল। সেখানে গীর্জার পাদ্রী সাহেব বেলজিয়ান। তাঁর দয়া হলো। তিনি সুধাকে লেখা-পড়া শেখালেন। মিশনের স্টাইপেণ্ড দিয়ে তাকে ম্যাট্রিক থেকে বি-এ অবধি পড়ালেন। অদৃষ্ট বোধহয় সুপ্রসন্ন হয়েছিল, বিনা সুপারিশেই জুবিলী স্কুলের চাকরিটা জুটে গেল। সে শুধু জীবিকা নয়, নতুন জীবনও বটে। হেডমিস্ট্রেস তরলা বিশ্বাস তো কেবল সুধার উপরওয়ালা নন, তিনি তার আত্মীয়ের অধিক। স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, সতর্ক প্রহরিণীর সজাগ দৃষ্টি দিয়ে তিনি সুধাকে নিরাপত্তায় ঢেকে রেখেছেন। এম-এ পড়ার জন্য তাকে স্কুল থেকে দীর্ঘ স্টাডি লীভ পাইয়ে দিয়েছে কে? পড়ার বই যুগিয়েছে কে?

স্কুলের কোয়ার্টার্সের ছোট বাড়িটিতে সুধা শাশুড়ীকে নিয়ে থাকে। বউ রান্নাবান্না করে, স্কুলে যায়, ছাত্রীদের পড়ায়, এগজামীনের খাতা দেখে। শাশুড়ী ছেলের আশায় মালা জপেন, ঠাকুর-দেবতার মানত করেন, গণৎকারকে হাত দেখান, সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই পা জড়িয়ে ধরেন।

বৃদ্ধা বিবিনগরে বুড়োশিবের মেলায় গিয়েছিলেন। দিন কুড়ি আগে সেখান থেকে

এক স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছেন। তিনি নাকি সিদ্ধ পুরুষ, ভগবানের অবতার বললেই হয়, যোগবলে বৃদ্ধার ছেলের সন্ধান বলে দেবেন। সেই থেকে সুধার বাড়িতে তাঁর ভজন পূজন চলছে।

স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে সুধার কোনো সংশয় নেই। কিন্তু পুত্র শোকাতুরা জননী যদি অলীক আশা নিয়ে ভুলে থাকে তবে তাতে সে বাধা দেবে কেন? সাধু-সন্ন্যাসীতে সুধার মতি নেই, ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নিয়েও সে কখনও মাথা ঘামায়নি। কিন্তু বৃদ্ধা শাশুড়ীর মনে আঘাত দিতে তার বিবেকে বাধে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে দুবেলা স্বামীজির পায়ের ধুলো নেয়, অনেক রাত জেগে তাঁর কীর্তন শোনে, তাঁর প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে মুখে নেয়।

স্বামীজী বয়সে তরুণ, চেহারাটাও ভালো। যোগবল বা ঐশী শক্তি তাঁর আছে কি নেই তা সুধা জানে না। তবে লক্ষ করেছে, সিল্কের গেরুয়া ছাড়া তিনি পরেন না এবং সুস্বাদু আহার্যেও তাঁর বিতৃষ্ণা নেই।

খবরটা তরলা বিশ্বাসের কানে যেতে তিনি বিচলিত হলেন। তিনি সুধাকে ডেকে বললেন, এই দণ্ডে স্বামীজিকে বিদায় করা চাই। কিন্তু সুধার শাশুড়ী তাই শুনে অনশন শুরু করলেন, বললেন, স্বামীজিকে কেউ কিছু বললে, তিনি দেয়ালে মাথা কুটে প্রাণ দেবেন।

স্কুলের নিয়মে শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টার্সে তাদের নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য পুরুষের বসবাস নিষিদ্ধ। তরলা বিশ্বাস আল্‌টিমেটাম দিয়েছেন, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে হয় স্বামীজী নয়তো সুধা আর তার শাশুড়ীকে কোয়ার্টার্স ছাড়তে হবে। স্কুলের চাকরিটিও যাওয়ার আশংকা। নিয়ম বা প্রিন্সিপলের বেলায় তরলাদি কত নির্মম ও কঠোর হতে পারেন তা সুধার অজানা নেই। আর কোনো দিকে কোনো পথ দেখতে না পেয়ে সে মরীয়া হয়ে এখানে ছুটে এসেছে।

সুধার ইতিবৃত্ত শেষ হল। সহানুভূতির স্বরে বললাম, "আপনার অবস্থাটা দুঃখজনক। কিন্তু হেডমিসট্রেসকে তো দোষ দেওয়া চলে না। স্কুলের সুনাম, ছাত্রীদের স্বার্থ—এসবের দায়িত্ব তো তাঁরই। খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি কোনো রিস্ক মানে ঝুঁকি নিতে চান না। তা ছাড়া, তাঁর উদ্বেগের কারণটা অন্যত্র হওয়াও অসম্ভব নয়।" কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলতে সংকোচ হলো।

কিন্তু মেয়েটির বুদ্ধি আছে, ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল। তার কর্ণমূল লাল হয়ে উঠল। চোখ নীচু করে লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে বলল, "সে আমি জানি। তরলাদি আমার নিজের বড় বোনের মতো। আমার গভীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আমার সত্তর বছরের বৃদ্ধা শাশুড়িকে আমিই বা ফেলি কেমন করে?"

সমস্যাটা দুরূহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সুধা চায় কী?

বেশী কিছু নয়। আর চারদিন পরেই মঙ্গলবার অমাবস্যা। স্বামীজী আশা দিয়েছেন ঐ দিন মধ্যরাত্রে হোমের পরে বৃদ্ধাকে তার নিরুদ্দিষ্ট ছেলে এনে দেবেন। সুধার ধারণা, তার আগেই সরে পড়বেন। সুধা ঐ কটা দিনের সময় চায় মাত্র।

সুন্দর মুখের সর্বত্র জয় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটা আমার স্মরণে ছিল। কিন্তু সুধার বিপদে সাহায্য করতে যে রাজী হলাম সে শুধু তার কমল আননের খাতিরে নয়।

পরদিন রবিবার। ছুটির দিন, আপিসের তাড়া নেই। তাই একটু বেলা অবধি ঘুমিয়েছিলাম। সাড়ে আটটা নাগাদ বিছানা ছাড়তেই শুনলাম, বৈকুণ্ঠবাবু অনেকক্ষণ ধরে গোল কামরায়—ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছেন। দর্শনপ্রার্থী।

কারণটা অনুমান করতে কষ্ট হল না। ভদ্রলোক স্বামীজীসমস্যায় দিশেহারা হয়ে এই সকালবেলায় পরামর্শ চাইতে ছুটে এসেছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই অসহায় কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "গার্লস স্কুলের সর্বনাশ হয়ে গেছে। ইলোপমেন্ট।"

চমকে উঠলাম। কে, সুধা মেয়েটিকে তো এমন মনে হয়নি। বরং তার চেহারা ও আচার-আচরণে এমন একটি সুকুমার সারল্যের ছাপ আছে যা সহজেই মনে আস্থা সৃষ্টি করে।

কোন এক ইংরেজ কবি বলেছেন, মানুষের মুখ হচ্ছে তার মনের দর্পণ। মনে হয়, নিতান্তই বাজে কথা। সৃষ্টিকর্তা নরনারীর অন্তরের ক্রূরতা ঢেকে রাখার জন্যেই বোধহয় তাদের মুখমণ্ডলে দেন নিষ্কলুষতার রমণীয় আবরণ। বিস্বাদ অষুধের ট্যাবলেটের গায়ে যেমন নানা রঙের সুগারকোটিং। অপাঠ্য উপন্যাসের যেমন সুচিত্রিত ঝলমলে মলাট।

বিস্ময়ের আকস্মিকতায় দুজনেই নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। পরে ধীরে ধীরে অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই মন্তব্য করলাম, "সুধা যে এমন কাজ করতে পারে তা সত্যি আমি ভাবিনি।—"

বৈকুণ্ঠবাবু অবাক হয়ে বাধা দিলেন। তাড়াতাড়ি সংশোধন করলেন, "সুধা? না, না, সুধা নয়। ইলোপ করেছে মিস বিশ্বাস, আমাদের হেডমিসট্রেস!"

স্কুলের সেক্রেটারী মশায়কে নিরীহ অহিংস প্রকৃতির ভালমানুষ বলে জানতাম। তিনি অতর্কিতে আমার মাথায় একটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে মারলেন। অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য আমার তাই মনে হল। মাথাটা বুঝি চৌচির হয়ে টুকরো টুকরো মেজেতে ছড়িয়ে পড়েছে। নইলে চিন্তাশক্তি রহিত হলাম কেন?

খানিক সামলে উঠে ধীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করলাম। বৈকুণ্ঠবাবু হন্তদন্ত হয়ে এত প্রত্যুষে পরিহাস করতে এসেছেন, এমন মনে করা কঠিন। ভুল শুনিনি তো?

বৈকুণ্ঠবাবু জানালেন, খবরটা পেয়েই তিনি সুধার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে সুধার শাশুড়ীর কাছে শুনলেন, কাল দুপুরে হঠাৎ মিস বিশ্বাস এসেছিলেন। উগ্রমূর্তি। দরোয়ান ডেকে স্বামীজীকে তক্ষুণি স্কুল কম্পাউণ্ডের বাইরে বের করে দেবেন, শাসালেন। সুধার শাশুড়ীর কান্নাকাটিতে কান দিলেন না। সোজা ঢুকলেন স্বামীজীর ঘরে। আলনা থেকে তাঁর গেরুয়া বসন ও উত্তরীয় টান মেরে উঠোনে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন। স্বামীজী আসন থেকে উঠে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। সুধার শাশুড়ী শুনেছেন, যোগী ঋষিদের চোখে থাকে তপস্যার আগুন, সে আগুনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবে হেডমাস্টারনীর এমন সাধ্য কী? তরলা বিশ্বাস থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর হম্বি-তম্বি উবে গেল। তার পরে কী ঘটেছে তা' সুধার শাশুড়ী জানেন না। তবে লক্ষ্য করেছে, অনেকক্ষণ মিস বিশ্বাস স্বামীজীর কাছ থেকে নড়েন নি। নিশ্চয়ই নিজের অপরাধের জন্য পায়ে ধরে মহাপুরুষের ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

সন্ধ্যেবেলা মিস বিশ্বাসকে আবার আসতে দেখে বৃদ্ধা পুলকিত হলেন। সাধু সন্তদের লীলা এমনই বটে। তাদের নামে শিলা জলে ভাসে, মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। স্বামীজীর অলৌকিক শক্তি যে নাস্তিক তরলা বিশ্বাসের মনেও ভক্তির উদ্রেক করেছে সে বিষয়ে সুধার শাশুড়ীর মনে সন্দেহ রইল না।

সুধা কী এক জরুরী প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিল, এসব কিছুই জানত না। আজ সকালে অন্যদিনের মতো স্বামীজীর পূজার উপকরণ যোগাতে গিয়ে দেখে, ঘরের দরজা খোলা, স্বামীজী উধাও।

অদূরে হেডমিসট্রেসের শয়নকক্ষেও শয্যা শূন্য, তরলা বিশ্বাস নিরুদ্দেশ।

আমার এক বন্ধু কেমব্রীজ থেকে সাইকলজিতে ডক্টরেট করেছিলেন। ফ্রয়েড গুলে খেয়েছেন। অনেক বছর পরে মিস বিশ্বাসের কাহিনী শুনে বললেন,—··· ।

স্মৃতিমন্থনে ছেদ পড়ল। এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠ শোনা গেল,—"লেডীজ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন,—আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেন পালামে নামবে। প্লীজ, ফাসন্ ইওর সীট বেল্টস এ্যাণ্ড এক্সটিংগুইশ ইওর সিগারেটস।"

সমাপ্ত

গ্রন্থ-পরিচিতি

অমানিবাস-এর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশকাল এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জ্ঞাতব্য কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য নীচে মুদ্রিত হলো।

দৃষ্টিপাত

দৃষ্টিপাত বাংলা ১৩৫৩ সালের আশ্বিন মাসে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তার অব্যবহিত পূর্বেও প্রায় দীর্ঘকাল ব্যাপি সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত ছিল। সে কারণে বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছতে বিলম্ব ঘটে। প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের ফলে "সহরে মানুষের স্বাভাবিক কাজ-কর্মে বিশৃঙ্খলা" এবং "পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশ ব্যাপারে বহু বাধা-বিঘ্নের" উল্লেখ ছিল।

প্রকাশক তাঁর বিজ্ঞপ্তিতে বলেন "আমাদের বিশ্বাস, দৃষ্টিপাত বাংলা সাহিত্যের প্রথম বেলে লেটার্স—Belles Letters—এর আগে বাংলায় ঠিক এই ধরনের কোনো বই বেরিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।" ঐ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় "খণ্ডিতাকারে এই রচনাটি মাসিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল। ১৩৫২ সালের আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকরূপে এবং ১৩৫৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম এগারটি পরিচ্ছেদ এবং ১৩৫৩ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় তেরো ও চৌদ্দ পরিচ্ছেদ দুটি ছাপা হয়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদটি এ বইতে নতুন যোগ করা হয়েছে।"

১৯৫০ সালে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে দৃষ্টিপাত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে এবং গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বহুপ্রতিষ্ঠ নরসিংহ দাস পুরস্কারে সম্মানিত হন।

শ্রীমতী নমিতা লুম্বা অনুদিত হিন্দী দৃষ্টিপাত ১৯৬০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থকারকৃত দৃষ্টিপাতের একটি নাট্যরূপ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশান কর্তৃক ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে বেতারে প্রথম অভিনীত ও প্রচারিত হয়।

দৃষ্টিপাতের পটভূমিকা ক্রীপস মিশন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মিশনের ব্যর্থতা সম্পর্কে গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ, অনুমান ও মন্তব্য সম্প্রতি প্রকাশিত Transfer of Power vol—1 গ্রন্থদ্বারা সমর্থিত হয়েছে। ইণ্ডিয়া আপিস ও ওয়ার ক্যাবিনেটের তৎকালীন গোপনীয় দলিলপত্রের এই সংগ্রহ পুস্তকটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৃষ্টিপাতের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে "লর্ড লিনলিথগো ক্রীপস দৌত্যের সাফল্য কামনা করেন নি।" এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে Transfer of Power vol—1-এর নিম্নোক্ত বিবরণ প্রণিধানযোগ্য, "লিনলিথগো ক্রীপসের কার্যকলাপ সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। লণ্ডনে ভারত সচিবের কাছে চিঠিতে ভাইসরয় পদত্যাগের হুমকি

দিয়ে লেখেন যে ক্রীপস তাঁর সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এর ফলে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ও অধীন কর্মচারীদের কাছে ভাইসরয়ের মর্যাদাহানি ঘটছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দিল্লী আগমনের কথা আছে, "ক্রীপসের বিমান নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসে পেঁছিল দিল্লীতে, বেলা তখন দুটো"। ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রস্তাব নিয়ে ক্রীপস ভারতবর্ষে এসেছিলেন ইংরেজী ১৯৪২ সালের ২৩ শে মার্চ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের প্রথম লাইনে—"স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস দিল্লী পরিত্যাগ করলেন।" দিল্লী পরিত্যাগের এই তারিখ ১২ই এপ্রিল, ১৯৪২। করাচী থেকে বিমানযোগে তিনি লণ্ডন ফিরে যান।

স্বাধীনতার আগেকার যে দিল্লীকে কেন্দ্র করে দৃষ্টিপাত রচিত হয়েছিল, একালের পাঠক সম্প্রদায়ের এক অংশের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তাঁদের অবগতির জন্য গ্রন্থে বর্ণিত কয়েকটি স্থান, পাত্র ও পারিপার্শ্বিকের বর্তমান নাম ও বিবরণ নীচে দেওয়া হলো,—

"সাত ঘণ্টা আকাশচারণের পরে উইলিংডন এয়ারপোর্টে ভূমি স্পর্শ করা গেল" বলে কাহিনীর আরম্ভ। সে এয়ারপোর্টের এখনকার নাম "সফদারজঙ্গ এয়ারপোর্ট"। এই বিমান ঘাঁটিটি আজকাল নিয়মিত যাত্রী চলাচলের জন্য কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। সাধারণ যাত্রীবাহী বিমান দিল্লীতে এখন পালাম এয়ারপোর্ট থেকে যাতায়াত করে।

প্রথম পরিচ্ছেদের "দেড়টা বাজতেই দিল্লী। মাঝে শুধু বামরৌলীতে ঘণ্টাখানেকের বিশ্রাম, প্রাতরাশের প্রয়োজন।" এখনকার বিমানযাত্রীর অভিজ্ঞতার বাইরে। কলকাতা থেকে সরাসরি দিল্লীগামী বিমান—non-stop flight এখন আর বামরৌলীর পথে যায় না। প্রাতরাশ এখন বিমানের ভিতরে নিজের আসনে বসেই পাওয়া যায়।

ঐ পরিচ্ছেদে "বোখারী সাহেব যেখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন তার নাম কুইনসওয়ে।" এখন আর নয়। বর্তমানে তার নাম বদলে হয়েছে "জনপথ" "কিংসওয়ে" ও "ইয়র্কপ্লেস"-এর পরিবর্তিত নাম যথাক্রমে "রাজপথ" এবং "মতিলাল নেহরু প্লেস।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেক্রেটারিয়েটের সাউথ ব্লক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে "বেসামরিক দপ্তরের মধ্যে হোম ডিপার্টমেণ্ট আছে একটি টেরে।" কেন্দ্রীয় সরকারে আগেকার ডিপার্টমেণ্টগুলি এখন "মিনিস্ট্রী" নামে পরিচিত। ১৯৬৭-৬৮ সালে হোম মিনিস্ট্রী সাউথ ব্লক থেকে নর্থ ব্লকে সরে গেছে। এখন "সাউথ ব্লকের সবটাই মিলিটারীর দখলে।"

"গিয়াসুদ্দীনের রাজধানী তোগলকাবাদ আজ বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত" (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) তবে তা এখনও দেখা যায়। কিন্তু যে "বি, বি, সি, আই রেলওয়ে লাইন গেছে তার উপর দিয়ে" তার সেদিনকার নাম ঘুচে গেছে। স্বাধীনতার পরে জোন্যাল নীতিতে ভারতীয় রেল ব্যবস্থার পুণর্বিন্যাস ঘটেছে। বি, বি, সি, আই-এর সংশ্লিষ্ট অংশ এখন ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের অধীন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে উল্লেখিত "লিওপোল্ড এমেরী" তৎকালীন ভারত সচিব Secretary of State for India ছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের "কুইন ভিক্টোরিয়া রোডের" নাম এখন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড। সে রাস্তার তিন নম্বর বাংলো—যেখানে "ভাইসরয়স হাউস থেকে ক্রীপস এসেছেন"—তার এখন অস্তিত্ব নেই। সে বাড়ি ভেঙে ফেলে সেখানে hign-rise 'শাস্ত্রীভবন' নির্মিত হয়েছে। সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখ থেকে দুই বাহুর মত দু'দিকে প্রসারিত দু'টি রাস্তার উপরে" হুবহু একই ধরনের ছ'টি বাড়িও বিলুপ্ত। ভূতপূর্ব "কিং এডোয়ার্ড রোড" অর্থাৎ বর্তমান "মৌলানা আজাদ রোড"-এর উপরে বাড়িগুলির স্থান দখল করেছে সরকারী দপ্তরখানা "নির্মাণ ভবন," এবং আন্তর্জাতিক সমিতি সম্মেলন ও দেশীয় সেমিনার এবং ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের জন্য নির্মিত বৃহৎ সভাগৃহ "বিজ্ঞান ভবন"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নয়াদিল্লীর রিডিং রোডে মন্দিরের উল্লেখ আছে। "একটি নয়, দুটি নয়, পর পর তিনটি। রাস্তাটার নাম টেম্পল ষ্ট্রীট হলে ক্ষতি ছিল না"—এই মন্তব্য বর্তমানে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। নিউ দিল্লীর মিউনিসিপালিটি রিডিং রোডের নূতন নামকরণ করেছেন 'মন্দির মার্গ'; টেম্পল ষ্ট্রীটেরই আক্ষরিক হিন্দী অনুবাদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদে যে "সুপারিনটেণ্ডেণ্ট"-এর কথা আছে তিনি "সেকশান অফিসার" রূপে পরিচিত। "এ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী" পদবীটিও অন্তর্হিত। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির সিঁড়িতে বর্তমানে "সেকশান অফিসারে'র" পরের উঁচু ধাপ "আণ্ডার সেক্রেটারী"।

অষ্টম পরিচ্ছদের ইম্পিরিয়েল দিল্লী জিমখানা ক্লাব এখন শুধু "দিল্লী জিমখানা" নামে পরিচিত। তার "ইম্পিরিয়েল" বিশেষণটি ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বর্জন করা হয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদে যে "সুইস হোটেল"-এর কথা বলা হয়েছে বর্তমানে তার চিহ্ন নেই। সেখানে "ওবেরয় এ্যাপার্টমেণ্টস" নামে কটেজ জাতীয় বাংলো ও ওনারশীপ ফ্ল্যাটস নির্মিত হয়েছে।

জনান্তিক

জনান্তিক বৈশাখ ১৩৫৮ ইংরেজী এপ্রিল ১৯৫১ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। পরের বছর ১৩৫৯ সালের অগ্রান মাসে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

কলকাতার একটি পেশাদার নাট্যসংঘ জনান্তিকের নাট্যরূপ নূতন দিল্লীর আইফাকস হলে একাধিকবার অভিনয় করে। তার আগে এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলার বাইরে অনেক শোখীন নাট্য-সম্প্রদায় দ্বারাও জনান্তিক অভিনীত হয়।

ঝিলম নদীর তীর

ঝিলম নদীর তীর মৌচাক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়েছিল।

পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে তার কিছু অংশ পুনর্লিখিত ও কিছু অংশ নূতন সংযোজিত হয়।

পাকিস্তানী শাসনাধীন পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) বইটির প্রচার বন্ধ হয়। "রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরপত্তার পক্ষে বিঘ্নকর" এই অভিযোগে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট পূর্ব পাকিস্তান নিরপত্তা বিধানের সংশ্লিষ্ট ধারায় "ঝিলম নদীর তীর" এর সমুদয় কপি বাজেয়াপ্ত এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৯৬০ সালে "ঝিলম নদীর তীর" হিন্দীতে অনূদিত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অনুবাদক প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক মন্মথনাথ গুপ্ত।

লঘুকরণ

বাংলা ১৩৭১ সালের ভাদ্র মাসে, ইংরেজী সেপ্টেম্বর ১৯৬৪—লঘুকরণের প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। লঘুকরণের প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছাপা হয়েছিল।

'রামগড়ুরের ছানা' ১৩৫১ সালের মাঘ মাসে সংক্ষিপ্তরূপে "বর্ষশেষ" নামক একটি বার্ষিকী সাহিত্য সংকলনে ছাপা হয়। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই খণ্ডিত রচনার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ।

যাযাবর নামে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে গ্রন্থকার তাঁর সাংবাদিক জীবনে 'শ্রী পথচারী' এই ছদ্মনামের আড়ালে যুগান্তর দৈনিকে রসরচনার একটি নিয়মিত স্তম্ভ-কলাম—প্রবর্তন করেন। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও হাস্যকৌতুক satire and humour প্রধান ইতস্ততঃ শীর্ষক ঐ কলামটি যুগান্তরের আদি যুগে পাঠকমহলে বহু পঠিত ও বহু আলোচিত ছিল। লঘুকরণের 'খাপছাড়া' নিবন্ধের কোনো কোনো অংশে পুরাতন ইতস্ততে'র ছায়া আছে।

'স্ত্রীষু' অধুনালুপ্ত বসুধারা মাসিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় আশ্বিন ১৩৬৫ প্রকাশিত হয়। তখন রচনাটির নাম ছিল 'লঘুকরণ'। পুস্তকে সংকলিত হওয়ার সময়ে ঐ নামটি গ্রন্থের নামকরণে ব্যবহৃত হয়। নিবন্ধের পরিবর্তিত নাম হয় স্ত্রীষু। এই নামান্তরের সঙ্গে বই-এর অব্যবহিত পরবর্তী রচনার শিরোনামায় যে ভাবসঙ্গতি বর্তমান তা তাৎপর্যপূর্ণ।

'রাজকুলেষু' ১৩৭০ সালের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রচনাটি প্রকাশের পরে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের উর্ধতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতার্থে রচনাটির একটি ইংরেজী অনুবাদ দাখিল করা হয়। অবশেষে তথ্য মন্ত্রকের তদানীন্তন প্রধান—সেক্রেটারী—বহু ভাষাবিদ আদিত্যনাথ ঝা আই-সি-এস কর্তৃক ব্যক্তিগত তদন্তের পরে রাজকুলেষুর প্রকাশঘটিত সরকারী উদ্বেগ ও বিরূপতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

'তির্যক অক্ষি' ১৩৬৬ সালের পূজা সংখ্যা বসুধারায় প্রকাশিত হয়। বসুধারার সম্পাদক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও রবীন্দ্রসাহিত্যবেত্তা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন। প্রবন্ধটিতে "বিদ্যাদানের মতো

একান্ত নির্বিরোধী কাজেও প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপক মশাই যে নিকারিপাড়া কলেজের প্রফেসরের চাইতে অধিকতর মনোযোগের পাত্র সে কি শুধু মাইনের পার্থক্যে ?” বাক্যটিতে তার সকৌতুক ইঙ্গিত আছে।

সর্বশেষ রচনা 'নাম্নীতে' “সোনা যখন বাজারেই ফোরটিন ক্যারেট তখন হিরন্ময়ী বা স্বর্ণলতারা নিশ্চয়ই অলীক এবং সোনামণিরা এ্যানাক্রোনিজম।” এই উক্তির পিছনে ষষ্ঠ দশকের ভারতীয় অর্থব্যবস্থার একটি বহু বিতর্কিত বিধানের সংকেত আছে। সে সময়ে বিদেশ, বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যের পারস্য উপসাগর অঞ্চল থেকে ভারতে প্রচুর পরিমাণে সোনা লুকিয়ে বে-আইনী আমদানী হচ্ছিল। গভর্ণমেন্ট কাষ্টমস বা পুলিশী পাহারা দিয়ে এই ব্যাপক চোরাচালান বন্ধ করতে অসমর্থ হওয়ায় তদানীন্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 'গোল্ডকণ্ট্রোল অর্ডার' জারি করেন। এই আইনের ফলে খাঁটি সোনার বেচা-কেনা কার্যতঃ বন্ধ হয়, গহনার জন্য চোদ্দ ক্যারেট-এর উর্ধ্বে সোনার ব্যবহারও নিষিদ্ধ হয়।” “গোল্ডকন্ট্রোল অর্ডারের” যুক্তি ছিল এই যে, দেশের অভ্যন্তরে সোনার চাহিদা না থাকলে বাইরে থেকে সোনার চোরা আমদানী আপনিই বন্ধ হবে। কিন্তু পার্লামেণ্ট, সংবাদপত্র ও নানা সভা-সমিতিতে এই আইনের বিরূপ সমালোচনার ফলে পরবর্তীকালে গোল্ড কণ্ট্রোলের বিধিনিষেধ বহুলাংশে শিথিল করা হয়।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ

বাংলা ১৩৮০ সালের শ্রাবণ মাসে হ্রস্ব ও দীর্ঘ প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থের সবগুলি গল্পই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে বিভিন্ন পত্রিকার পুজো সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

শকুন্তলার আংটি, কৌন্তেয়, জট ও সরীসৃপ শারদীয়া আনন্দবাজারে ছাপা হয়। কৌন্তেয় গল্পটি হিন্দীতে অনূদিত হয়ে দিল্লীর বহু প্রচারিত সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থানে' প্রকাশিত হয়। 'দিনান্ত' গল্পটির হিন্দী অনুবাদ দৈনিক 'হিন্দুস্থানে'র রবিবারের ম্যাগাজীন অংশে মুদ্রিত হয়।

'জট' গল্পটির গোড়াতে নাম ছিল 'সার্পিল'। পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়ার কালে গ্রন্থকার তার বর্তমান নামকরণ করেন।

দিনান্ত ও বারুদ কথাসাহিত্য পত্রিকার পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। শেষোক্ত গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ Reptile নামে Indian Council for Cultural Relations-এর আন্তর্জাতিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা Indian Horizons-এ প্রকাশিত হয়।